ভারতবর্ষ

P30442

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৫৪—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ১৫
অহিংসার ঋত্বিক মহাত্মাজী (প্রবন্ধ)—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ... ২৭৫
আকাশ পথের যাত্রী (ভ্রমণ কাহিনী)
শ্রীসুষমা মিত্র ৪১,১৩১,২২৫,৪১০,৪৬২
আদর্শ মনুষ্যত্ব (প্রবন্ধ)—ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন ... ৪২৬
আগ্নেয়গিরির অতীত (গল্প)—শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪৪
আজ (প্রবন্ধ)—বনফুল ... ৩০২
আততায়ীর হস্তে মহাত্মার জীবনান্ত বার্তা শ্রবণে (কবিতা)
ডাঃ বটকৃষ্ণ রায় ... ২৩৩
আত্মযোগ (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৩৮
আধুনিক বিশ্ব ও মনুষ্য (প্রবন্ধ)—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ... ১৭৭
আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন (প্রবন্ধ)—কৌটিল্য ... ২১৩
আমি সুখী হয়েছি (প্রবন্ধ)—শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় ... ২৭২
ইংরেজ ভারত ছাড়িল কেন (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ৯১
ইংরাজ ভারত ছাড়িল কেন (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৪০৯
এই তো জীবন (গল্প)—শ্রীমতী বেলারাণী দাস ... ১৩০
এপার-ওপার (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় ... ২০০
একখানি কাঁথা (গল্প)—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা ... ৪৫৩
কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তন (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ৪৯৫
কতিপয় সরল আয়ুর্বেদীয় চাক্ষুষ রোগ (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও
কবিরাজ শ্রীনতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ... ৫৫
কথা নয় কথা নয় (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ১১৩
কবি কুমুদরঞ্জন প্রশস্তি (কবিতা)—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ৩৩
কবি নোগুচীর গান্ধী প্রশস্তি (কবিতা)
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৬৪
করিও মার্জনা (কবিতা)—শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ ... ৩৫৩
কর্মযোগী-গান্ধী (প্রবন্ধ)—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় ... ২৮১
কাশ্মীরের যুদ্ধ (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ১৩৪
কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মভূমি (প্রবন্ধ)—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ২০৬
কৃষ্ণা (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী ... ৫৩
কেরাণীর মৃত্যু (গল্প)—শ্রীযামিনীমোহন কর ... ৪৮৫
কৈফিয়ৎ (গল্প)—শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় ... ২১৫
খেলাধুলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ৮৩, ১৭৪, ২৫৯, ৩৩৯, ৪২৬, ৫১৬
খেলা-ধুলা প্রসঙ্গ—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৬২, ৩৪২, ৯৪২
গতি ও প্রগতি (গল্প)—অ-কু-রা ... ১৩৮
গান (কবিতা)—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ২৭
গান ও স্বরলিপি—কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
স্বরলিপি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ৫৪, ৪২৫
গান্ধীজীর সাধনা (প্রবন্ধ)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৭৩
গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ (প্রবন্ধ)—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ... ২৯২
গান্ধীপ্রস্থ (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস ... ৩১৬
গান্ধীজী (কবিতা)—শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৩৮
গান্ধী প্রয়াণে (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ৩৬৮
গান্ধী ভক্তদের কর্তব্য (প্রবন্ধ)—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দত্ত ... ৩৫৬
গান্ধী অর্থনীতির গোড়ার কথা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৪৭
গান্ধী-স্মরণে (কবিতা)—শ্রীমতিলাল দাস ... ৩৫৩
গান্ধীজীর প্রয়াণ (প্রবন্ধ)—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ... ৩৫৪
গুরুদেব (গল্প)—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯৪
চরৈবেতি (কবিতা)—শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ... ৩৮৫
চেনা ও জানা (গল্প)—শ্রীশিশির সেন ... ১৯৬
ছন্দোময়ী (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ২৩০
জাগরণ (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৪২২
জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত (প্রবন্ধ)—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ... ২৮৬
জাহানারার আত্মজীবনী (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী ... ৪৯৩
জ্যোতি যদি নিভে যায় (কবিতা)—শ্রীসুরেশ বিশ্বাস ... ৩০১
টুকরো কবিতা (কবিতা)—শ্রীলীলাময় দে ৪৫, ১০৪, ৪৫০
তবে (কবিতা) শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ... ১৯২
তিরোভাব (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৩০৬
তিস্তার বালুচর (কবিতা)—শ্রীআশা দেবী ... ১৮১
তুমি ও আমি (গান)—কথা ও সুর : শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়,
স্বরলিপি : শ্রীশচীন্দ্র দাশগুপ্ত ... ৪৫১
দুনিয়ার অর্থনীতি (আলোচনা)
অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬, ১৫৪, ২২৮, ৪০৮
দেবদত্ত (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার ১৩, ১৮৪, ৪৪৪
নব জয়ধ্বনি (গান)—কথা ও সুর : শ্রীদিলীপকুমার রায়
স্বরলিপি : শ্রীমতী সাহানা দেবী ... ২৩৪
নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী ৮৮, ১৭৬, ২৬৪, ৩৪৪, ৪৩২, ৫১৮
নামকো বাস্তে (গল্প)—শ্রীকানাই বসু ... ৪৪৭
নীলগিরি (প্রবন্ধ)—শ্রীজনরঞ্জন রায় ... ৫৮
নূতন প্রভাত (কবিতা)—শ্রীপ্রফুল্ল সেনগুপ্ত ... ৮০
পথ নির্দেশ (গল্প)—শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ ... ১৯০
পদ্মিনী (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ ... ৮৯
পন্থ প্রতিভূ (কবিতা)—শ্রীমতী মীরা ভট্টাচার্য ... ৩৬২

পল্লী-গৃহে (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ৬৫
পরীক্ষা (প্রবন্ধ)—শ্রীসুজাতা রায় ... ৪৩৩
পাঁচ বৎসর (প্রবন্ধ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ৪০৪
প্রত্যাবর্ত্তন (প্রবন্ধ)—শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৭৪
বাংলার মাছ ও মাছ ধরা (প্রবন্ধ)—ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ১০০
বাপুজী (কবিতা)—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ... ২৬৫
বাপুজী গো ! ক্ষম ক্ষম (কবিতা)—শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ... ২৯৮
বাপুজী আখ্যার যৌক্তিকতা (প্রবন্ধ)—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি ৩৫৭
বাপুজী (প্রবন্ধ)—শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ... ৩৫৮
বাহির-বিশ্ব (আলোচনা)—শ্রীঅতুল দত্ত ... ৫৬, ১৫২
বিজ্ঞানের কয়েকটি আকস্মিক ঘটনা (প্রবন্ধ)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ১৪০
বিলাতের পুলিশ (প্রবন্ধ)—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার ... ১
বিভ্রম (গল্প)—শ্রীপ্রবোধ ঘোষ ... ২৮
'বিরাজ-বৌ'এর নাটকীয়তা (আলোচনা)—শ্রীকানাই বসু ... ১২২
বিস্ময় (কবিতা)—শ্রীশান্তশীল দাশ ... ৪৯১
বৈষ্ণব (কবিতা)—শ্রীশীতল বর্দ্ধন ... ৩
বোম্বায়ে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (প্রবন্ধ)
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ... ৩১৩
ভয় (গল্প)—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া ... ৩৯৫
ভারতের বহির্বাণিজ্য (প্রবন্ধ)—কৌটিল্য ... ৩২
ভারতবর্ষ (গল্প)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ৪৯, ১১৬
ভারত হায়দারাবাদ চুক্তি (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ৬৬
ভীমপলশ্রী (উপন্যাস)—বনফুল ৬২, ১৫৬, ২০১, ৩১০, ৩৬৩, ৪৩৯
মহা অভিযান (কবিতা)—শ্রীরাধারাণী দেবী ... ২৯৬
মহাত্মা গান্ধী (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ... ২৬৬
মহাত্মা গান্ধী (প্রবন্ধ)—শ্রীভূপতি মজুমদার ... ৪৬৬
মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ২৮০
মহাত্মার তিরোভাব ও গ্রন্থের প্রভাব (জ্যোতিষ আলোচনা)
শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি ... ৪৮৯
মহাত্মাজী স্মরণে (প্রবন্ধ)—শ্রীঅশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ২৯৯
মহাভিক্ষুক (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ... ৩৪৫
মহাপুরুষ (কবিতা)—শ্রীনিরুপমা দেবী ... ৩৫৭
মহাত্মা গান্ধী (কবিতা)—শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৫৮
মহাপ্রয়াণে (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৩৬৭
মহাত্মাজীর বিদায় (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ... ৩৭৩
মহাত্মা স্মরণে (প্রবন্ধ)—মহারাজকুমারী শ্রীপূর্ণিমা ব্রহ্মচারী ... ৪২৪
মহাবলী (কবিতা)—নরেন্দ্র দেব ... ২৭১
মহামানবের মহাপ্রয়াণ ... ২৪৯
মানিনী (কবিতা)—ভাস্কর ... ৪১২
মায়ার ছায়া (গল্প)—শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী ... ৪৬৮
মৃত্যুঞ্জয় মহামানব (কবিতা)—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ... ২৩৩
মোঘল রাজকুমারী (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী ৯৮
মোহন-বীর (কবিতা)—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ... ৪৭৯
মৌনীবাবা (প্রবন্ধ)—শ্রীননীগোপাল গোস্বামী ... ২৫
রবীন্দ্র-সাহিত্যে সরকারী কর্মচারী (প্রবন্ধ)—শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক ৬
রবীন্দ্রনাথের বনানী প্রীতি (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ১৪৬
রসিকমোহন (প্রবন্ধ)—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ... ১৮৭
রাজারামমোহন (কবিতা)—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ৮২
রাজপুতের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)
শ্রীনরেন্দ্র দেব ৩৪, ১১৪, ২১৯, ৩৮৮, ৪৫৭
রাজমহল (কবিতা)—শ্রীলীলাময় দে ... ৪০৬
রাত্রি (গল্প)—শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ ... ১৪৩
রাজধানীর বুকে মহামানবের সাধনা (প্রবন্ধ)
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ২৩৬
রাষ্ট্র পিতা ! জেগে ওঠ (কবিতা)—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ২৬৮
রিক্তা পৃথিবী (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ... ৩০১
রূপান্তর (গল্প)—শ্রীশোককুমার মিত্র ... ৮
শহীদ সূর্য সেন (জীবনী)—শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৬১
শহীদ প্রদ্যোতকুমার (জীবনী)—শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৮২
শান্তিনিকেতনে ২৩ বৎসর পরে (প্রবন্ধ)—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ৩২৩
শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ভিত্তি (প্রবন্ধ)
ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় ... ৪৮৬
শিলালিপি (উপন্যাস)
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২০, ১০৫, ২০৯, ৩০৭, ৩৮০, ৪৭৭
শিল্প-জিজ্ঞাসা—ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ (প্রবন্ধ)
শ্রীঅজুর মুখোপাধ্যায় ... ১৯৩
শুধু একটি শাড়ীর আঁচল (গল্প)—শ্রীনরেন্দ্র দে ... ১৮১
শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি (প্রবন্ধ)—শ্রীনীলিমা মজুমদার ... ৮১
শ্রেষ্ঠ মানব (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ২৬৯
সংক্ষিপ্ত জীবন কথা ... ২৮৭
সংস্কৃতি ও সংস্কার (প্রবন্ধ)—জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য ... ৪০৭
সঞ্চয় (গল্প)—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ... ১১৮
সব হারানো (কবিতা)—শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল ... ৩৭৯
সামাজিক আলোড়ন ও বিপ্লবের জয়যাত্রা (প্রবন্ধ)
শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ... ১১
সত্য ও অহিংসার মহাসাধক (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ৩৫০
সাময়িকী ৬৮, ১৬১, ২৪১, ৩২৯, ৪১৩, ৫০১
সীমান্ত সৈনিক (গল্প)—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য ... ৪
সোমনাথ (প্রবন্ধ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ২৩১
সোমনাথের মন্দির (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৪৩৮
স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন মাত্র (প্রবন্ধ)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১১১
স্মৃতি-সৌধ (প্রবন্ধ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ৩০৩
স্বাধীনতার নবজন্ম (প্রবন্ধ)—শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭৭
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (প্রবন্ধ)—শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য ৫৫৯, ৪৯৭
হিংসা কিংবা প্রতিহিংসা (কবিতা)—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ৪৫৬
হিন্দু (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য ... ৪৬১
হে গান্ধীজী তোমায় প্রণাম (কবিতা)—শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮
৩০শে জানুয়ারী (প্রবন্ধ)—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৬৮
৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৮ (প্রবন্ধ)—শ্রীমতী লীলা মজুমদার ... ৩২৮
১৩৫৫ সাল (জ্যোতিষ আলোচনা)—শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি ... ৩৯৩

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

পৌষ, ১৩৫৪—বহুবর্ণ চিত্র—'বিজ্ঞান' ও এক রং চিত্র ৪১ খানি
মাঘ, " — " —'মা ও ছেলে' ও এক রং চিত্র ৩৯ খানি
ফাল্গুন, " — " —'বাসবদত্তা' বিশেষ চিত্র মহাত্মা গান্ধী ও এক রং চিত্র ৩৬ খানি
চৈত্র, " — " —'মহালক্ষ্মী' ও এক রং চিত্র ৩৭ খানি
বৈশাখ, ১৩৫৫— " —'বনফুল' ও এক রং চিত্র ৩৩ খানি
জ্যৈষ্ঠ, " — " —'প্রভাত ও সন্ধ্যা' ও এক রং চিত্র ৩৪ খানি

বিজ্ঞান

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রণদাকুমার সেন

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

পৌষ—১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চত্রিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

বিলাতের পুলিশ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার আই-পি, জে-পি

বিলাতের পুলিশ প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে আমাদের পুলিশ ও আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সুরু করছি। পাশাপাশি তুলনা ফুটে ওঠে ভাল। ছোটবেলায় কুষ্টিয়া শহরে মানুষ। রাত্রিবেলায় ছোট শহরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে পাহারাওয়ালা হেঁকে যেতো "হুঁসিয়ার রহ"; ভয়ে জড়সড় হয়ে মায়ের কোল ঘেঁসে শুতাম, আর দিনের বেলায় দুষ্টুমি করলে মা ভয় দেখাতেন "দাঁড়া, পাহারা-ওয়ালা ডাকছি।" শিশুকাল থেকে পুলিশের উপর হয়েছিল দুর্বার ভয়। কিছু বড় হয়েও এ ভয় একেবারে কেটে যায়নি; কলেজে পড়ার সময় লালবাজারের পাশ দিয়ে যেতে হলে দূরের ফুট-পাথ ছাড়া হাঁটি নাই।

পুলিশ-ভীতি আমার মত অনেকেরই দেখেছি, অথচ আমরা কেউই আইন-অমান্যকারী নই। আবার আমিই একদিন পিতামাতার অজান্তে আই-পি পরীক্ষা দিয়ে বসলাম। গ্রীষ্মের ছুটী, বাড়ীতে গেছি, সন্ধ্যার ডাকে পরীক্ষার ফল এল—আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছি। মাকে খবরটা দিতে মা বললেন—"এত চাকরী থাকতে তুই শেষকালে পুলিশে ঢুকলি।" বাবা শুনে বললেন "আমার আশা ছিল তুই একটা ভদ্রোচিত চাকরী করবি।" অপ্রত্যাশিত সাফল্যের আনন্দ মুহূর্তে উবে গেল। কয়েক-দিন ধরে অনেক আলোচনার পর মা-বাবার অনুমতি পেলাম, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হল যে জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় কাজ করব না বা অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবো না।

কাজে ঢুকে মনে মনে বললাম—"পুলিশের বদনাম ঘোচাতে হবে। এতদিন সবাই সমালোচনা করেছে, আর পুলিশে ঢুকেই হেয় হয়ে যাবো?" কার্য্যক্ষেত্রে যে কত সুকঠিন তা পদে পদে দেখেছি। আমার পদস্খলন হয়েছে কিনা অনসাধারণ তার সাক্ষ্য দেবেন। পুলিশের লোকের

(ছোট কি বড় যে অফিসারই হউন) উপর জনসাধারণের কিরূপ ধারণা ও অবিশ্বাস আছে তা শিক্ষা-নবিশী করার সময়ই দেখেছি। একটী অভিজ্ঞতার কথা বলি। স্বদেশী মামলা, খবর হচ্ছে—গুলি, বন্দুক পাওয়া যাবে। তোর রাতে বাড়ী ঘেরাও হ'ল। আমার সঙ্গে ঘুরছেন ডিঃ-আই-বি ইন্‌স্পেক্টার; সমস্ত বাড়ী খুঁজে তাঁরা বাক্সের মধ্যে পাওয়া গেল মরচে-ধরা এয়ার-গান একটী। পুলিশের এ সম্বন্ধে মাথা-ব্যথার কিছু আছে মনে হল না; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার বল্‌লেন "কলিকাতায় পাঠিয়ে পরখ করতে হবে; এয়ার-গানের লাইসেন্স লাগে, অস্ত্র-বিশারদের মতামত নেওয়া দরকার।" অনভিজ্ঞ, শিক্ষানবীশ আমি, চুপ করে পদ্ধতি দেখ্‌লাম। লিখিতভুক্ত করে দু'জন সাক্ষীর সামনে জিনিষটী নেওয়া হল। মালিক আমাকে বল্‌লেন "ভাল করে বিবরণটী লিখে দিতে বলুন।" আমি বল্‌লাম—"কি দরকার, এ বন্দুকের জন্য কোন মামলা হবে না; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" তিনি বল্‌লেন "না, মশায়, আপনি লেখান, কে জানে বন্দুক বদলে আমাদের বিপদে ফেলবে কি না।" একথা শুনে আমার বেশ রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি বললাম "আমার উপর এটুকু বিশ্বাস রাখ্‌তে পারেন"। কিন্তু উত্তর পেলাম "আপনি তো পুলিশ-ডিপার্টমেণ্টের বাইরে নন"। কথাটা বলে ফেলেই কথাটা রূঢ় হয়ে গেল মনে করে একটু নরম সুরে বল্‌লেন "আপনি তো বরাবর এখানে থাকবেন না, দুদিন বাদে চলে গেলে অন্য লোক এসে কি করবে কে জানে।" আমি আর বাক্য-ব্যয় না করে নিজে হাতে লিখ্‌লাম "মর্চে-ধরা অবেজো অবস্থায় পাওয়া গেছে।" এ অবিশ্বাস হওয়া যে একেবারে অমূলক নয় তা অন্য ক্ষেত্রে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম এবং নিজের অনভিজ্ঞতার জন্য লজ্জা অনুভব করেছি।

অতএব দেখ্‌তে পাচ্ছি আমরা পুলিশকে করে এসেছি ভয়, ঘৃণা ও অবিশ্বাস। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে তাদের রাখ্‌তে চেয়েছি শত-হস্ত দূরে। অন্ততঃ এ যাবৎ এই ছিল আমাদের পুলিশের উপর ধারণা।

এ ধারণা যে অযথা নয়, তা আপনি ও আমি একবাক্যে স্বীকার করব। 'পুলিশি মেজাজ' কথাটী আমাদের ভাষায় পর্য্যন্ত স্থান পেয়েছে। আমরা পুলিশ বল্‌তে বুঝি—এ বিভাগের প্রায় সকলেই রুক্ষ, উদ্ধত, বদ্‌মেজাজী ও অসৎ, আর কাজে একেবারে অক্ষম।

এবার বিলেতে পৌঁছে কি দেখেছি তাই বলি।

১৮ই এপ্রিল ১৯৪৭ সন, বেলা ৪টা। ক্রাকোনিয়া জাহাজ সাউদ্‌াম্পটন (Southampton) বন্দরে পৌঁছিল। জাহাজে যাত্রী প্রায় এক হাজার; ঘাটে বহু লোক আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধবকে সম্বর্দ্ধনা করতে এসেছেন। সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য, জাহাজে সকলে ডাঙ্গার চেনা-লোকের মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে জাহাজ ঘাটে ভিড়্‌লো; ওঠা-নামার সিঁড়ি লাগানো হল। একটী পুলিশ কন্‌ষ্টেবল অমন্থর গতিতে এসে সিঁড়ি আগ্‌লে দাঁড়াল।

ছবিতে ও বইএ বিলিতি পুলিশের চেহারা দেখেছি, সজীব মূর্ত্তি এই প্রথম দেখ্‌লাম। ধীর, স্থির, নম্র অথচ দৃঢ়; অনাড়ম্বর ঝক্‌ঝকে সদ্য-ইস্ত্রি-করা নীল রঙের পোষাক পরা—৬ ফুট লম্বা, ব্রিটিশ পুলিসের একমাত্র প্রতিনিধি—সারা পৃথিবী থেকে আনা সদ্য আগন্তুকদের যেন বল্‌ছে "তোমরা নির্ভয়ে চলে এসো, আমি তোমাদের রক্ষা করব।"

চারিপার্শ্বে আর কোন পুলিশের লোক নজরে পড়্‌লো না; আশ্চর্য্য ঠেক্‌লো, এত বড় পৃথিবীব্যাপী নাম-করা বন্দর, কিন্তু একটীমাত্র পুলিশ কন্‌ষ্টেবল। কোন অফিসার পর্য্যন্ত আসে নাই। অথচ বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়ার সময় পুলিশের ছড়াছড়ি ও হাঁকাহাঁকি দেখে এসেছি। সারা রাত জাহাজ থেকে মালপত্র নামল, ডাঙ্গায় নামের আদ্য অক্ষর অনুসারে সাজানো হল, কত কুলি আনা-গোনা করলে, কিন্তু কারুর একটী জিনিষ চুরি গেছে বলে শুনি নাই।

আর একটী জিনিষ লক্ষ্য করলাম, সিপাইটী সুদীর্ঘকাল পাহারায় রইল কিন্তু কোথাও একটু বস্‌লে না। কখন বদলী হয়েছিল লক্ষ্য করি নাই। কয়েক মাস লণ্ডন ও আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি; রাস্তায়, ঘাটে, বাগানে বহু পুলিশ টহল দিচ্ছে দেখেছি—কিন্তু কোনদিন একটী লোককেও বসা অবস্থায় দেখি নাই। অথচ আমাদের দেশে পথে, ঘাটে সর্ব্বত্র পাগ্‌ড়ী, পেটী খোলা অবস্থায় বসা তো ভাল, শুয়ে ঘুমন্ত সিপাই নিত্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

তখনকার পুলিশের কর্ত্তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

"তোমাদের সিপাইরা মাস্তার বলে না"। উত্তর পেলাম "প্রকাশ্য স্থানে এরকম অশোভনীয় কাজ আমাদের সিপাইরা করে না।" এদের ডিউটিতে সিগারেট খেতেও দেখি নাই।

১৯শে এপ্রিল সকাল ১১টায় বোট-স্পেশালে লণ্ডন রওনা হলাম। বেলা দুটা নাগাদ ওয়াটারলু ষ্টেশনে পৌঁছলাই। ব্রেক-ভ্যান থেকে মালপত্র নামানো হল, নামের অক্ষর অনুসারে সাজানো হ'ল। কুলিরা হাত-গাড়ী নিয়ে এলে, আমরা প্রত্যেকে নিজেদের মাল বেছে গাড়ী বোঝাই করালাম। কুলি বল্‌লে—"সঙ্গে চলো, পুলিশ মাল দেখে ছাড়্‌বে।" এত ভিড়, কার মাল কার সঙ্গে চলে না যায় বা চুরি না হয়, এই হল উদ্দেশ্য। কুলিরা একজনের পর একজন সার বেঁধে চলেছে আর দুটী পুলিশ কন্‌ষ্টেবল গাড়ীগুলি পরখ করে ছেড়ে দিচ্ছে। ছাড়ার আগে মালিককে জিজ্ঞেস করছে তার নাম ও মালের সংখ্যা। এ কাজে তারা এত পটু যে প্রত্যেকটী মাল দেখে ছাড়ছে, অথচ সময় লাগছে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। নামের লেবেল উঠে গেলে কিংবা সহজে দেখা না গেলেই গোল বাধে; লাইন থেকে সরে দাঁড়িয়ে মালিকানা প্রমাণ করলে ছাড়ান পায়।

প্ল্যাটফর্ম্ম পেরিয়ে এবার গাড়ী-চড়ার পালা। মোটর ছাড়া অন্য কোন যানবাহন নেই। এখানেও দুটীমাত্র সিপাই দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রথম ট্রাফিক পুলিশ দেখলাম; পার্থক্য কিছু নেই, একই রকম পোষাক পরিহিত, লম্বা, চওড়া—যেন একই একশ। বাড়ীর গাড়ী ও ট্যাক্সি সুলাইনে দাঁড়িয়ে আছে; যাত্রিরাও এসে সু জায়গায় কিউ করে দাঁড়াল। পুলিশের ইঙ্গিত মতন গাড়ীগুলি এক এক করে এসে মাল তুলে নিয়ে নিজের গন্তব্যপথে চলে গেল। কোন হট্টগোল, চীৎকার, হাঁকাহাঁকি নেই। এত লোক, এত মাল, কিন্তু অল্প সময়ে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সব পার হয়ে গেল।

কয়েক মাস পরে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে গ্রীষ্ম-অবকাশের ভিড় দেখেছি, আমাদের পূজার ভিড় এর তুলনায় কিছুই নয়। মনে হচ্ছিল লণ্ডন সহর বুঝি খালি হয়ে গেল; কিন্তু অল্প-সংখ্যক পুলিশ কি সুচারুরূপে সমস্ত কাজ সমাধান করছে দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়; আমার লাগতো লজ্জা, আর মনে হত—কবে আমরা আমাদের দেশে এমন সুদক্ষ পুলিশবাহিনী তৈয়ারী করতে পারবো। ভারতবাসী অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন "আপনারা আমাদের দেশে এমন পুলিশ-বাহিনী তৈয়ারী করতে পারবেন?" দেশী, বিদেশী—সকলেই এখানকার পুলিশ দেখে তারিফ করে। অনেক ইংরাজ গর্ব্বের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন "আমাদের পুলিশ দেখে আপনার কি মনে হয়।" ইংলণ্ডবাসী তাদের পুলিশকে জাতীয় গৌরব বলে মনে করে এবং প্রত্যেকটী পুলিশও মনে করে যেন তাদের এ গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। একটা বইএ পড়েছিলাম "লণ্ডন পুলিশের ধীর, শান্ত, নির্ব্বিকার আচরণ জগৎ বিখ্যাত; এরা অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ, বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যেও কখনও রাগান্বিত হয় না।" এতদিন যা বইএ পড়েছিলাম, তা চাক্ষুস উপলব্ধি করলাম।

কোথায় একটু কটু কথা, চীৎকার বা অসৌজন্য চোখে পড়ে নাই। এ পর্য্যন্ত সোষাক-পরা পুলিশের কথাই বলেছি; কিন্তু এদের সি-আই-ডি ও অন্যান্য পুলিশের কথা বারান্তরে বলার ইচ্ছা রইল।

এই কার্য্যদক্ষ সুন্দর পুলিশবাহিনী একদিনে তৈয়ারী হয় নাই। এর পিছনে বহু শ্রম ও শিক্ষা রয়েছে, আর আছে উত্তরোত্তর উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা।

বৈষ্ণব

শ্রীশীতল বর্দ্ধন

কে বলে আকাশ তোমা সর্ব্বৈশ্বর্য্য ত্যাগী?
দ্বারে বসি সীমাহীন প্রেম ভিক্ষা মাগি।
অরূপে বিরাজ রূপ, অসাধ্য সাধন,
ত্যাগ তব সর্ব্বত্যাগী প্রেমের কারণ।

বৈকুণ্ঠ এবের বুকে অশ্রু মন্দাকিনী,
অমৃত উজান বহে মধু ঝঙ্কারিণী।
চলে লেখা মহা লীলা রাসের হরষ,
রূপ-তপ প্রেম-ধ্যান সুখ অহর্নিশ।

সীমান্ত-সৈনিক

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

রাস্তায় হকাররা চীৎকার করে চলেছে—টেলিগ্রাম, ভোর-খবর বাবু, ভোর খবর। বড়লাটের ঘোষণা বেরিয়েছে—স্বাধীন ভারত।

বাসের বাষ্পারে দাঁড়িয়ে সুধাকান্ত শুনলেন, স্বাধীন ভারতের কথা। অফিসেও আজ এই নিয়ে উত্তেজনা লক্ষ্য করেছেন। কেরাণীবাবুরা টেবিল চাপড়ে বলছিল—এইবার একবার শালাদের দেখে নেবো; কী অত্যাচারই না করেছে আমাদের 'পর। কিন্তু সে কথায় কান দেবার সময় পান নি সুধাকান্ত। এমনই অফিসে আসতে আজ তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল। ট্রাম বাসে যা ভীড়, কার বাবার সাধ্যি উঠতে পারে! সাহেব লেট্ মার্ক করেছে, তারপর ষ্টেটমেণ্টের গাদা জমে আছে। পাঁচটার আগেই আবার অফিস থেকে বার হওয়া দরকার, যা দিনকাল। সন্ধ্যের অন্ধকারে কোথায় আততায়ীর ভুল ছোরা লুকিয়ে আছে, কে জানে!

শীওসের মোড়ে ভীড়টা একটু পাতলা হোল। বাষ্পার থেকে নেমে সুধাকান্ত ঠেলাঠেলি করে বাসের ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কানের মধ্যে তখন তাঁর বাজছে কাগজ-ওয়ালাদের চীৎকার—স্বাধীন ভারত!

ফাইভ ষ্টারের পুরাতন সদাগরী অফিসের পাকা কেরাণী সুধাকান্ত। জীবন-সংগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করতে করতে হাড় পাকিয়ে ফেলেছেন তিনি। জীবনে অভিজ্ঞতাও তাঁর কত! কাগজ-ওয়ালাদের এমনি গাল-ভরা কথা ইতিপূর্বে কত না শুনেছেন। সহরের রাজপথে সত্যাগ্রহী ছাত্রদের'পর পুলিশের গোলাগুলি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উন্মত্ত ছোরাছুরি প্রভৃতির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে পরিণত বয়সে এখনও মশটা পাঁচটার নিয়মিত কেরাণী তিনি, জীবনের অভিজ্ঞতা তার কত বেশি! অফিস থেকে বেরিয়ে বাসের বাষ্পারে এখনও তিনি লাফিয়ে ওঠেন, রেশনের সারিবদ্ধ জনতায় ধাক্কাধাক্কি করেন। কাগজ-ওয়ালারা এমন জীবনের কতটুকু খোঁজ রাখে? সুতরাং খবরের কাগজ তিনি পড়েন না। ও একটা অপব্যয় মাত্র, অভাবগ্রস্ত সংসারে বাজে-খরচ করা চলে না।

যুদ্ধের সময় কেবল তিনি নিয়মিত কাগজ কিনতেন—জাপানি বোমা কতদূর এগিয়ে এলো তার খোঁজ রাখবার জন্যে। সেই থেকে যে কী দিনকাল পড়েছে—একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে। তবে কাগজ আর তিনি নিয়মিত কেননা না; কেবল সব হাঙ্গামাবাজীর খবর। কাগজের খবর সত্যি হলে এতদিন কবে সুভাষবাবু দেশে ফিরে এসে এইসব গুণ্ডাদের সায়েস্তা করতেন। তাহলে কী আর এই ঝগড়াঝাঁটি চলে, না বাঙলা দেশের এমনি দুরবস্থা হয়?

কিন্তু হকারদের চীৎকারে আজ অন্য রকম সুর শোনা যাচ্ছে—স্বাধীন ভারত। এ্যাটলি সাহেবও বলেছেন স্বাধীন ভারতের কথা।

চার পয়সার টেলিগ্রাম চার আনা দাম হয়েছে। কাগজের চাহিদা এত বেশি। চার পয়সা এখন আর অপব্যয় বলে মনে করা চলে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। কত দেশ-সেবকের জীবনব্যাপী সাধনায়, কত শহীদের তাজা রক্তের স্বাক্ষরে পরাধীন ভারত স্বাধীনতা লাভ করছে—দিনের কেরাণী সুধাকান্তকেও সে খবর রাখতে হবে বৈকি! চার আনা পয়সার হিসেবকে আজ আর গোণা চলে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, স্বাধীন ভারতের স্পন্দনকে সুধাকান্ত অনুভব করেন চলন্ত বাসের মধ্যে।

বাড়ি ফিরলেন সুধাকান্ত অপেক্ষাকৃত দ্রুত পদে।

গৃহিণীকে সর্বাগ্রে সুখবরটা দেওয়া দরকার। অবশ্য জীবন-সংগ্রামক্লিষ্টা নারী পাবে স্বাধীন দেশের মেয়ের মর্যাদা। যে মেয়েদের তিনি দেখেন ট্রেনে বাসে রাস্তায় শীওসের বাজারে। সম্ভ্রমে যাঁদের পথ ছেড়ে দিতে হয়। মেনানা বলে যাঁদের অপমান করা চলে না; লেডী বলে যাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে হয়। তাঁদের অফিসের মিস্ হেরিস্।

কীই বা কাজ করে, কীই বা বিদ্যেবুদ্ধি! তবুও স্বাধীন দেশের মেয়ে। মোটরে চড়ে অফিস যায়; স্বামী সোহাগ করে।

সুধাকান্তের স্ত্রী লাজ না হয় না পাবে। ওসব অখাদ্য হিন্দু মেয়ের ধাতে সইবে না। মোটরেও না হয় না চড়লো। অত বাবুয়ানিতে দরকার নেই। তা চলেও অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিন তো কাটাতে হবে না। নিত্য অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে নিশ্চয়ই সে বলবে না—ভগবান, কবে যে আমার তোমার পায়ে টেনে নেবে, হাড় ক'খানা জুড়োবে আমার! আর যে পারি নে সইতে!

কিন্তু বাড়ি ফিরে সুধাকান্ত কী দেখলেন?

পায়রার খোপের মতন ঘরখানিতে আসন্ন সন্ধ্যার অবচেতন অন্ধকারের কালিমা—অবরুদ্ধ বাতাসে থম্ থম্ করছে।

ছেলেমেয়েগুলির মুখ গম্ভীর। বড় মেয়ের বিয়ে দিতে যে টাকা ধার করেছিলেন নিকট আত্মীয়ের কাছে চড়া সুদে—সুদে আসলে তা অনেক টাকার অঙ্কে দাঁড়িয়েছে। পাওনাদার আত্মীয় আজ আত্মীয়তার মুখোস ছেড়ে কাবুলীওয়ালার রূপ ধরেছেন। আজ তিনি অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে নালিশের ভয় দেখিয়ে গেছেন।

মেজ-মেয়েটিও মাথায় মাথায় অনেকখানি ডাগর হয়ে উঠেছে। গিন্নী কর্তার আশা ছেড়ে দিয়ে নিজেই পাত্র সন্ধানে মনোনিবেশ করেছেন।

গঙ্গার ঘাটে কোন সহৃদয়া ঘানারিনী একটি পাত্রের সন্ধান দেয়। সন্ধ্যের দিকে শহরের রাজপথ বিপদসঙ্কুল। বিকেলে তারা পাত্রী দেখে অপছন্দ করে গেছে। ক্ষুব্ধা জননী মেয়েকে তাই যথেষ্ট তিরস্কার করেছেন। বাপকে দেখে মেয়েটি ফুকরে কেঁদে উঠলো—অপমানের অসহ বেদনা আজ তাকে অতিমাত্রায় তিরস্কৃত করেছে। সুধাকান্ত বিমূঢ় হয়ে গেলেন। জীবনের নিত্যকার এই গ্লানির সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে বটে, এ তাঁর গা-সওয়া। কিন্তু আসল স্বাধীন ভারতের মানুষ তিনি। পৃথিবীতে যারা মাথা উঁচু করে চলে তিনি আজ তাদেরই একজন। এ চেতনা আজ তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিতে থাকে। তিরিশ বছরের কেরানী-শোণিতে আজ কেন এ উষ্ণ রক্ত-স্রোতের প্রবাহ?

উত্তেজনার আধিক্যে স্নায়ুতন্ত্রীগুলি তাঁর শীত করে ওঠে। স্বাধীনতা? কোথায় স্বাধীনতা? বিক্ষোভের জ্বালায় হাতের টেলিগ্রামখানি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি দ্রুতপদে আবার বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

খোলা গঙ্গার হাওয়ায় সুধাকান্ত স্বাভাবিকতার মাঝে আবার ফিরে এলেন।

তিরিশ বছরের কেরানী তিনি—অফিসে আর গৃহে এমনিতর নিত্যকার জীবন দ্বন্দ্বে মুহ্যমানী। কিন্তু এ মুহ্যমানতাকে তিনি অনুভব করতে পারেন না। অবচেতনার গাঢ় অন্ধকারে যে ছোট্ট ঘরখানি তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন—সেখানে দিনের সূর্য প্রবেশাধিকার লাভ করে না; সেই অন্ধকার কারাগৃহের অধিবাসী তিনি।

রাত্রে আহারাদি সেরে নিত্যকার প্রথা মতন তিনি শুনলেন—সংসারের সংঘাতিক অভাব অভিযোগের কথা। লণ্ঠনের ধূমায়িত আলোকে তিনি পাঠ করলেন—বড় মেয়ের মর্মস্পর্শী চিঠিখানি। জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্বে দরিদ্র পিতার অক্ষমতায় মেয়ের লাঞ্ছনার আর সীমা নেই! কত বেদনার অশ্রু আঁখরে আঁকাবাঁকা লেখাগুলি অশ্রু-মলিন।

কিন্তু কী আশ্চর্য—সুধাকান্তের চিত্তে তার জন্যে এখন আর বিক্ষোভের কোন স্পন্দন নেই। বিদ্রোহও প্রকাশ করেন না তিনি।

গিন্নীকে এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন—গরীবের মেয়েকে এমনি অনেক লাঞ্ছনাই সহ্য করতে হয়? এ কথা আবার বিনিয়ে বিনিয়ে বাপ মাকে জানানো কেন? মনে নেই তোমার কত তত্ত্ব তোমার বাপের বাড়িতে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল; মা তোমাকে কত কথাই তো তার জন্যে বলতেন?

গভীর রাত্রে সুধাকান্ত অতিমাত্রার আবেগের সঙ্গে সৌদামিনীকে মনের কথাগুলি শোনালেন—রামকান্তর বয়স হোল আঠার বছর। অত বড় ছেলে ঘরে থাকতে বাপ মায়ের এত কষ্ট? পড়ে-শুনে আর কী হবে? তার

চেয়ে এই বেলা তার চাকরি-বাকরির চেষ্টা করা দরকার। আর তার বিয়ে দেওয়া উচিত। সেই যৌতুকে বরক বড় মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করা যাবে!

স্বামীর কথায় সৌদামিনী বিস্ফোভ প্রকাশ করে—সে ভাগ্যি কী করেছিলাম? ছেলে কী আমার বশে? চাকরি নাকি সে করবে না। আজকালকার ছেলে। কী যে সব উল্টে কথাবার্তার ছিরি। ওরা মানুষ হলে বুড়ো বাপ-মায়ের এত কষ্ট হবে কেন?

সৌদামিনীর কথায় সুধাকান্ত বলেন—চাকরি-বাকরি করবে না তো কী করবে শুনি? খাবে কী করে? বুড়ো বাপ চিরকালই ওর জন্যে মোট বইবে—না চিরকালই ওর জন্যে বেঁচে থাকবে?

সৌদামিনী সে কথার কী উত্তর দিতে পারে! বলে—আমি তার কী জানি? তুমি তার বাপ, তুমি জিজ্ঞেস করলেই পারো!

সুধাকান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন—হ্যাঁ, বাপের পয়সায় অমন নবাবী চাল সকলেই দেখাতে পারে! বয়েসকালে আমরাও অমন কতই না বলতুম।

সৌদামিনী অন্য পুত্রবেহে হঠাৎ বলে ফেলে—না গো না, সত্যিই তার মতিগতি অন্য রকম। সে নাকি দেশের সেবা করবে? এখন থেকেই কত বড় বড় কথা বলে।

সুধাকান্ত প্রশ্ন করেন—কী কথা সে বলে?

—আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ; আমি কী সে সব জ্ঞান-গম্যির কথা বুঝি, না জানি? বলে কিনা—আমি আনবো দেশের স্বাধীনতা, আমি ভাঙবো সমাজের কুপ্রথা! ভালো, এই দরিদ্র দেশে অনাহারে কত লোক মরে যায়। আমাদের আর তেমন দুঃখ কিসের? আমরা তবু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাই।

সৌদামিনী অকস্মাৎ অত্যন্ত ভীতিগ্রস্তা হয়ে পড়ে। অন্ধকারে স্বামীর অত্যন্ত কাছে সরে এসে ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে অনুনয় জানায়—'দেখো, ওকে নিয়ে সত্যিই আমি বড্ড ভাবনায় পড়েছি। কোনদিন যে কী করে বসে। স্বদেশী করতে গিয়ে কোনদিন হয়ত বাছা আমার পুলিশের গুলিতেই প্রাণ হারাবে।

অন্ধকার ঘরের নিশীথ অন্ধকারের অবচেতনা থেকে মুক্ত হয়ে সুধাকান্ত অকস্মাৎ আবার জীবন-শিখার আলোয় রশ্মি দেখেন। মৃত্যুর মাঝে তিনি অস্বাভাবিক ভাবে জীবন-স্পন্দনকে অনুভব করেন। পরাধীনতার দৃষ্টি হতে মুক্ত হয়ে সমাজের আবর্জনাকে সরিয়ে ফেলে—কারা আনবে দেশের স্বাধীনতা? কারা উপভোগ করবে গৌরবময় জীবন?

তিরিশ বছরের কেরাণী জীবন-মুক্ত সুধাকান্ত স্পষ্টই দেখেন—পরাধীন ভারতে প্রত্যাসন্ন স্বাধীন সূর্যের নব অরুণোদয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে সরকারী কর্ম্মচারী

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক এম-এ, বি-এল

রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'শিশু' হইতে 'ডাকঘর' পর্য্যন্ত আলোচিত হইলেও এ যাবৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যে সরকারী কর্ম্মচারীর স্থান সম্পর্কে কোন আলোচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যে কেন, সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যেই সরকারী কর্ম্মচারীর স্থানই শুধু নয়, স্থানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণদয়াল, অচিন্ত্যকুমার আমাদের দেশের ও সমাজের এই সেবকবৃন্দের জীবন ও মনস্ক, চরিত্র ও আচরণ অকুণ্ঠিত আলোকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত দুইজনই সরকারী কর্ম্মচারী হওয়ায় স্বসম্প্রদায়ের চরিত্র বর্ণনে তাঁহাদের লেখনী আরও স্বাধীন ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' রাজীবলোচন নন্দীর কোন এক মিটিংয়ের পুলিসসাহেবের কথাবার্তে ভীত উপস্থিত এক ডেপুটিবাবুকে পাশের ড্রেসিং রুমে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মুখ টিপে হাসার বর্ণনা পাওয়া যায়। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সরকারী কর্ম্মচারীকে আগাগোড়াই এই মুখ টিপে মুচকি হাসার ভাব নিয়েই দেখিয়াছিলেন; যদিও শাসনব্যবস্থার হৃদয়হীনতা ও অপটুতা এবং ব্যক্তিবিশেষের—বিশেষগন্ধী দাম্ভিকতা ও হীনতাকে তিনি কোনদিন মার্জ্জনা করেন নাই। স্থানে স্থানে কবির লেখনী তাই রুদ্ধ ক্রোধে অতি নিষ্করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শ্লেষ বঙ্কিমচন্দ্রের কশাঘাতের ন্যায় প্রত্যক্ষ, তীব্র ও রুদ্র

হয় নাই। কাহারও কাহারও কুমাণ্ডের ন্যায় অকোপরি অবস্থিতি বর্ণনা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি কোন মুচিরাম গুড়েরও সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ভূধরঞ্জনের ন্যায় কাব্যে একদিকে বিলাতী শ্লেষকে কশাঘাত ও অন্যদিকে কোম্পানী হইতে I. C. S.—ফরীপ-বিভাগ হইতে P. W. Dর সেরা ত্রয়ীদের ব্যষ্টির ক্ষুদ্রতাবিষয়ক সমষ্টির গৌরবময় কর্মপ্রীক্ষণের মহত্ত্ব বর্ণনা করেন নাই। তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবিদের ন্যায় ব্যঙ্গ কাব্য রচনা করেন নাই। তিনি অচিন্ত্যকুমারের ন্যায় সরকারী কর্মচারীর ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা, নীচতা ও পাপ-ছাড়া অমানবতাকে অত্যন্ত ব্যঙ্গচিত্রের উৎকটতায় প্রকাশিত করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ সরকারী কর্মচারীদিগকে সাধারণ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়াছিলেন। তাহাদের বার্থতা তাঁহাকে ব্যথিত করিত, তাহাদের ক্ষুদ্র বাহ্যতা ও দম্ভ তাঁহাকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করিত। কয়েকটী সাধারণ চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে তিনি তাহাদের ক্ষুদ্রতা, অযোগ্যতা ও মানসিকতার আপেক্ষিক অকর্মণ্যতা ও উপযোগিতাকে প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্র সূর্যালোকে অসাধুতার উল্লেখ প্রচুর পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ দুই এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যতীত হৃদয়ের ও বুদ্ধির অসাধুতা ভিন্ন অন্য কোন অসাধুতার উল্লেখ করেন নাই।

সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও বিদ্রূপের কারণ "গোরা"র কথায় অনেকটা ধরা পড়ে। "গবর্মেণ্টের কাজ যারা করে তারা গবর্মেণ্টের শক্তিকে নিজের শক্তি বলে একটা গর্ব্ববোধ করে এবং দেশের লোকের থেকে একটা ভিন্ন শ্রেণীর হয়ে ওঠে—যতদিন যাচ্ছে আমাদের এই ভাবটা ততই বেড়ে উঠছে। আমি জানি, আমার একটি আত্মীয় সাহেব কালেক্টর ছিলেন···। তাঁকে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেছিলেম—বাবু, তোমার বিচারে এত বেশি লোক খালাস পায় কেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন—সাহেব, তার একটি কারণ আছে; তুমি যাদের জেলে দাও তারা তোমার পক্ষে কুকুর বিড়াল মাত্র, আর আমি যাদের জেলে দিই তারা যে আমার ভাই হয়। এত বড়ো কথা বলতে পারে এমন ডেপুটি তখনো ছিল এবং শুনতে পারে এমন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটেরও অভাব ছিল না। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে চাকরির দড়াদড়ি অঙ্গের ভূষণ হয়ে উঠেছে এবং এখনকার ডেপুটির কাছে দেশের লোক ক্রমেই কুকুর বিড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এমনি করে পদের উন্নতি হতে হতে তাদের যে কেবলই অধোগতি হচ্ছে এ কথার অনুভূতি পর্য্যন্ত তাঁদের চলে যাচ্ছে। পদের কাঁধে ভর দিয়ে নিজের লোকদের নীচু করে দেখব এবং নীচু করে দেখা মাত্রই তাদের প্রতি অত্যাচার করতে বাধ্য হবো, এতে কোনো মঙ্গল হতে পারে না।"* ধর্ম্মতন্ত্রের কুমাণ্ডের ছবিতে এমন ভিন্ন শ্রেণীবোধ ও অধঃপতনের প্রতি কশাঘাত আছে, কিন্তু এই শ্রেণীবোধ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই যাহা রবীন্দ্রনাথে পাই।

বিদেশী সরকার ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রবীন্দ্রনাথের চক্ষে যে ঘৃণার বিষ্ণুত তাহারই ব্যাপকতা বিদেশী কর্মচারীকে এবং বিদেশী সরকারের দেশী কর্মচারীকে অনাত্মীয়ভাবে অভিশপ্ত করিয়াছিল। আমাদের সমাজের শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের যোগাযোগহীন শ্রেণী বিভাগ রবীন্দ্রনাথের মতে সরকারী কর্মচারীর সকল উৎসাহ ও কর্মকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করে। "রাশিয়ার চিঠী"তে সমবায় আন্দোলনের আলোচনায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কবির দৃষ্টিতে দেশের নিবিড় দারিদ্র্যের পাশে মোটা মাহিনার শিক্ষিত ও নিরক্ষীয় চাকুরীজীবগণ অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিত। এই মোটা মাহিনার সহিত যখন মোটা অযোগ্যতাও তিনি যুক্ত দেখিয়াছেন তখন তাহার ক্ষোভ আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিয়াছিলেন যে আকিসমুখী সিভিলিয়ানী শাসনব্যবস্থার সমাজের হৃদয়ের সহিত যোগ নাই। কর্মচারীদের কর্মকোলাহল তাই সমাজে বেসুর বাজিয়াছে।

ব্যবস্থা ও ব্যক্তির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের রচনায় একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। ব্যবস্থার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ কঠোর; ব্যক্তির চরিত্র অঙ্কনে তিনি হালকা ভাবে কঠিন কথা বলিয়াছেন। শিক্ষের পথে, শিক্ষার পথে লজ্জাকর বাধা, আপিসের কাজে বোকা লোকের অনুপস্থিতি তিনি হাসিয়া তুলিতে পারেন নাই। তবে যেখানে বিদেশী ব্যক্তির অযোগ্যতার, হৃদয়হীনতার, মানসিকতার ও ক্ষুদ্রতার এবং সহায়হীন ব্যক্তিসংঘাতের যে চিত্র তিনি গল্পে, উপন্যাসে ও কবিতায় আঁকিয়াছেন তাহাতে মৃদু হাস্যের বিদ্রূপ ও বেদনাবোধ দুইই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিসংঘাতের যে কয়েকটী চিত্র পাওয়া যায় তাহা সমাজসাধারণের দৃষ্টিতেই আঁকা। তাহাতে কর্মচারী ব্যক্তিটিকে মানবতার ও সেবাব্রতের নিম্নস্তরেই দেখা যায়। তবে কবি হৃদয়ের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বেদনা ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও ছড়ার তারহীন হালকাছন্দেই বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে।

কয়েকটী চরিত্র চিত্রের উল্লেখ করিলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ কোন রামরাজত্বে বা ওপসাদিনী বোর্ডের যুগে বিচারকগণকে কার্য্যোদ্ধারে পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিতে পরওয়ানার ন্যায় দেখেন নাই। তিনি তাহাদের কর্মব্যস্ত জীবনের ক্ষুদ্রতার একটি ছবি আঁকিয়াছেন "চতুরঙ্গের বিপদ" গল্পে। কোথায় দুই মুন্সেফের খিটিমিটি হইয়াছিল, একজন তখন কিছু করিতে না পারিয়া পরে আপীলের বিচারক হইয়া অপরের রায় দেখিবামাত্র উল্টাইয়া তাহার শোধ লইলেন। ইহাতে বিপদ যাহা হইল তাহা কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরই।

"মেঘ ও রৌদ্র" গল্পে এক জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেখা যায়। তাঁহার মেজরের সাহেবের কুকুরের জন্য চার সের ঘি চাহিয়া নায়েব মহাশয়কে বিপর্য্যস্ত করার ক্ষমতা ও নায়েব মহাশয়ের অবলম্বে সাহেবের কৃপায় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার বক্রতা রবীন্দ্র বিদ্রূপের ব্যাপকতা ও তিক্ততা প্রকাশ করে। এই মৃতঘটিত বিপদের ছবি আমরা রবীন্দ্রনাথের ছড়ায় আর এক জায়গায় পাই।

"বাবু বলে, 'মাস খুব ছোয়া'
কাজে ইতরা দিল পোয়া।"

*"গোরা"—রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—১৩৯-৪০ পৃঃ

এই চাপরাশী শ্রেণীর অত্যাচারও রবীন্দ্রনাথের চক্ষু এড়ায় নাই। "রাজটীকা" গল্পে কলেক্টার সমর্থনে আগত আগন্তুকের মনের অবস্থা ও সমর্থনের ফলাফল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বেসিক চাপরাশীর বকশিশের ঝুলুম চোখে পড়ে।

পুলিশকে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের চক্ষেই অত্যন্ত সরল ও প্রয়োজনীয় দেখিয়াছেন। পুলিশ সাহেব ও দারোগার ছবি অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। তবে "দুর্বুদ্ধি" গল্পের ডাকাতের ডিটা ছাড়ার বর্ণনিপাতে, না দারোগাটীর ক্ষমতার অপব্যবহারের হীনতা ও অধীনস্থকে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোকে ধরা হইয়াছে মনে হয়। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার কবিকে অত্যন্ত ব্যথিত ও লজ্জিত করিত। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রবলপ্রতাপ বিভাগের চৌকীদারের হাঁচি লইয়া ছড়ার তাঁহার কঠিন বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"ঘরপাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়ী
অমনি চটে কাঁধের থেকে বৌ ফেলে দেয় ঘড়া।
কারো হয় হতবুদ্ধি, কারো ভাঙে ধ্যান,
এমনিতেতে চমকে ওঠেন হরিঘোষের মেন।

• • • •

অত দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব হয় তাহার যদি প্রায়শ্চিত্ত কর সে।"

চৌকীদার যা হউক, পুলিশের অমূলী সকালবেলা এমনভাবে বিচারককে চমকিত হইতে দেখা আমাদের দেশে বিরল ছিল না।

শুধু চরিত্রবিশেষের মধ্য দিয়া নয়। দুই এক স্থানে দেখা যায় যে গুরুহীন, শাসনতন্ত্রীন, অপটু শাসনযন্ত্রের বিশেষ কর্মপদ্ধতিই কবির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। 'খাপছাড়া'র নিম্নলিখিত ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

"মহারাজা ভরে থাকে
পুলিশের থানাতে,
আইন থানার মত
পারে না তা থামাতে।
চর ফিরে হাকে ডাকে
সাধু যদি ছাড়া থাকে
খোঁজ পেলে নৃপতিরে
হয় তারা আনাতে,
রক্ষা করিতে তারে
রাখে জেলখানাতে।"

রূপান্তর

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

—"ষষ্ঠা, ওখানে মড়ুতে উঠেছো কেন?" দাঁতে দাঁত চাপিয়া হেমলতা তার তিন বৎসর বয়স্কা সন্তান কন্যাকে সম্বোধন করেন।

ইন্দিরা মায়ের এ ধরণের উক্তিতে অভ্যস্ত। মন খারাপও হয় না, পাল্টা জবাবও আসে না। ধীরে ধীরে খাটের বিছানা হইতে নামিতে নামিতে মায়ের পঞ্চম পুত্র বাসুকে দেখাইয়া সে বলে—"ছেজদা, ছুতোপার…"

কথাটা শেষ করিতে হয় না। হেমলতা সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া পড়েন বাসুর উপর—"লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, দাঁড়া, তোর পিঠি চটকে ঘিই একেবারে, জুতোর সঙ্গে রাত্রির মোজা নিয়ে ঘড়া শোবার ঘরে এসেছো?"

কপাল মন্দ। বাসুর নয়, বাসুর বাবার। তাই ঠিক এমনি সময়, পাড়াপড়শীর সাথে প্রাত্যহিক প্রভাতী পরচর্চা-পরনিন্দা করিয়া ঘরে ফিরিয়াই বিশ্বনাথবাবু তাহার স্ত্রী হেমলতার একেবারে সামনাসামনি পড়িয়া গেলেন। অফিসের সময় হইয়া গিয়াছে, কোন রকমে মাথায় তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ঘরের মধ্যে গামছাটা নিতে আসিয়াছিলেন তিনি। ভুবড়িতে আগুন দিবামাত্র যেমন সেটা আগুনের ফুলঝুরি উদ্গীরণ করিতে থাকে, বিশ্বনাথবাবুর দর্শনমাত্র তার স্ত্রীরও সেই অবস্থা হইল।—

—"ছাখো, অত নবাবীয়ানা চল্‌বে না। তেল মেখে, চান করে, ভাত গিলে যে অফিস যাবে—অত নবাবীয়ানা চল্‌বে না। সকালে উঠে ছেলে ধরেছিলে? বলো না ধরেছিলে?…তা ধরবে কেন? পাড়ার মড়াগুলো আছে তাদের সঙ্গে আমার ছেরাদ্দর ব্যবস্থা করতে গেছিলে!…

বাসু এই তালে ঘর থেকে সরিয়া পড়িল।

স্ত্রীর এই ধরণের বাক্যবাণে বিশ্বনাথবাবু অভ্যস্ত। আসামীর মত নিরুত্তরে এবং নির্বিবাদে কল ঘরের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন তিনি।

—"কথাগুলো যেন কানেও যায় না, কানের মাথা খেয়ে আছেন কিনা।...বাপ্‌রে বাপ্‌। এই পোড়া সংসারে আমার হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেলো।...ঘরে ঢুকেই দেখি একটি খাটের বিছানায় উঠে বসছেন, একটি জুতো পায়ে ঘরে ঢুকে আমার পিঠি চটকাচ্ছেন, আর একটি তো সমস্তক্ষণ আমার কোলেই রয়ছেন।"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া হেমলতা আবার হাঁকিলেন—

—"এই সাবি, আমার কোল থেকে এই মড়াটাকে নিয়ে যা শীগ্‌গির, সমস্তক্ষণ হিঁ হিঁ করেই আছে আপদটা—লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার।"

হেমলতার এই ভৈরবী রূপ তাহার প্রথমা কন্যা সবিতার কাছেও নূতন নয়। কথাটি না বলিয়া, নিরীহ অবোধ ছোট্ট ভাইটিকে মায়ের কোল হইতে নিজের কোলে নিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় সে।

—"উনুনের ছাই দেবো আজ"—বলিতে বলিতে হেমলতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। সত্যই আফিসের বেলা হইয়া গিয়াছে আজ—তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া না দিলে বিশ্বনাথবাবুর ভাল করিয়া খাওয়াই হইবে না।

বাড়ীসুদ্ধ সকলেই হেমলতাকে ভয় করে, এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে। মুখরা হেমলতার বিষোদ্গীরণের সামনে দাঁড়াইতে পারে এমন সাহস কাহারও নাই। হেমলতা বাড়ীর লোক ছাড়া আত্মীয় অনাত্মীয় কাহারও সাথে বড় একটা কথা বলেন না। সমস্ত জগতটাই এঁর কাছে তিক্ত হইয়া গিয়াছে যেন। লোকে যেমন তাহাকে এড়াইয়া চলে, তিনিও তেমনি লোকালয় পছন্দ করেন না। নিজের সংসারে একাধারে ঝি-চাকর-বামুনের কাজ, আটটি ছেলেমেয়ে সামলে রাখা এবং বিশ্বনাথবাবুর সব কিছু খুঁটি-নাটি সুখসুবিধার জোগাড় দিতে দিতেই দিনের পর দিন কাটিয়া চলিয়াছে তার। বৈচিত্র্যহীন এই জীবনে কোন বৈচিত্র্য আসিলেও তা উপভোগ করিবার সময় নাই। মনেরও মৃত্যু হইয়াছে যেন।

• • • •

ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রি। আকাশভরা জ্যোৎস্না ধীর গম্ভীর পৃথিবীটাকে হাস্যমুখরে, চঞ্চল এবং মুখরা করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত দেশটা জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। আবহাওয়ায় একটা ঝল্‌মলে স্নিগ্ধ ভাব। দূরে কোন্ একটা বিবাহবাড়ী হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—বিবাহবাড়ীতে ফুলশয্যার রাত্রি আজ।

হেমলতা ছাদে একা দাঁড়াইয়া ছিলেন। যে দিক হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন তিনি। রাত্রি অনেক হইয়াছে—ছেলেমেয়েরা অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বনাথবাবুও ঘুমাইয়াছেন। আনমনা হইয়া হেমলতা বহুক্ষণ একই জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুক্লপক্ষের এম্‌নি এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রের কথা বার বার মনে পড়িতে লাগিল তার। বিশ্বনাথবাবু এবং হেমলতার ফুলশয্যার রাত্রের স্মৃতি তা'কে পাইয়া বসিল যেন। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বনাথবাবুর পায়ে নাড়া দিয়া ঘুম ভাঙাইলেন তাঁর। চম্‌কাইয়া উঠিয়া বিশ্বনাথবাবু বলিলেন—

—"কি ব্যাপার?"

—"ওগো, আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছো, কি আশ্চর্য্য অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে আজ!"

বাহিরে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, ঘরে দু'জনে আলাপ আরম্ভ করিলেন।

বিশ্বনাথবাবু একটু থমকিয়া গিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে বোধ হয়?"

গভীর আবেগভরা এবং আষাঢ়ের সুরে হেমলতা বলিলেন—"না, অম্‌নি করে বল্‌লে হবে না।"

বিশ্বনাথবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতো হেমলতার পানে চাহিয়া থাকিলেন। হেমলতা আগের আবেগভরা সুর টানিয়া আবার বলিলেন—"এমনি এক পূর্ণিমার রাতে—মনে পড়ে আমাদের ফুলশয্যার কথা?"

বিশ্বনাথবাবুর তখনও যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসে নাই! তিনি বলিলেন—"সে তো বহু বছর আগেকার কথা। কেন বলো তো?"

—"সে রাতের আলাপের কথা মনে আছে তোমার?"

—"না, সব মনে নেই, তা কি থাকে? সে কি আজকের কথা, বিশ বছর আগেকার ঘটনা—তাই না?"

হেমলতা বিশ্বনাথবাবুর অতি কাছে আসিয়া তাঁর ডান

হাতটি নিজের দুটি হাতের মধ্যে নিয়া বলিলেন—"আমি কিন্তু ভুলিনি—না, একটা কথাও ভুলিনি। বিশ্বাস হল না নিশ্চয়ই? কী বিরাট পরিবর্তনই হয়েছে আমার—না? ধূমকেতু পৃথিবীর আকাশে ফিরে আসে কিন্তু রেখে বিশ্বরূপান্তর। সেই বহুদিন আগেকার সেই রাস্তার আবহাওয়া এবং স্মৃতি ফিরে এসেছে আজ, কিন্তু আমি সেই বলে—অদ্ভুত আশ্চর্য্য পরিবর্তন হয়েছে—না?···এই বোধ হয় জগতের নিয়ম।···তোমার সব কথা মনে নেই হয়তো—সংসারের ঝড় কাপ্‌টায় সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি ভুলিনি।···মনে পড়ে—প্রথমে তুমিই কথা বলেছিলে। কথাগুলো সহজ করে বলবার চেষ্টা করলেও গলার স্বর তোমার কেঁপে গেছ্‌লো। তুমি বলেছিলে—'নাম তোমার জানি, তবুও তোমার মুখ থেকে নামটা শুনতে ইচ্ছা করে, বলবে?' আমি ঘাড় নীচু করে খাটের পাশে দাঁড়িয়েই রইলুম—চেষ্টা করেও কথা বলতে পারলুম না। তুমি আবার বল্‌লে—'বলবে না তোমার নামটা?'

অস্ফুট স্বরে কোন রকমে তখন বলেছিলাম—"হেমলতা।"

—"ভারী সুন্দর শুনতে নামটা। আমি কিন্তু আরও সুন্দর ছোট্ট নামে ডাকতে চাই তোমায়। "লতা" বলে ডাকি যদি, আপত্তি করবে না তো?"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই শুধু।

—"তোমার ভয় করছে না তো?"

মুখ নীচু করে ঘাড় নেড়ে জানাই—"না।"

—"তবে ওভাবে একঠাঁয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে? না শুনেও বলতে তো পারো? বাড়ীতে নতুন-বৌ এসে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে এটা কি ভাল দেখায়?"

অনেকটা ভয় কেটে গেছে তখন। সহজ গলায় বলে ফেল্‌লাম—"বলতে বল্‌লেই বলবো।"

—"এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা। শোনো কাছে এসো," বলে নিজেই এগিয়ে এসে মুখটা আমার তুলে ধরে একদৃষ্টে কী যেন দেখেছিলে অনেকক্ষণ। বাইরে ফিনিক-ফোটা চাঁদের আলোতে কোন্ এক বৌ-কথা-কও পাখী তার অভিমানিনীর মান ভাঙাচ্ছিল তখন। আমার কপালের অসংযত চুলগুলো পিছু দিকে সরিয়ে দিতে দিতে বলেছিলে তুমি—"আচ্ছা লতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক উত্তর দেবে বলো?" তোমার স্বর তখন অনেক সহজ হয়ে এসেছে।

ঘাড় নেড়ে শুধু সম্মতি জানাই আবার।

—"আমাকে তোমার ভাল লেগেছে কি? কলেজে পড়ি এখন, পরে কি চাকরী করবো কে জানে···"

—"হয়েছে, হয়েছে, থাক্" বলে থামিয়ে দিয়েছিলাম তোমায়।

—"কিন্তু ভাল লেগেছে কিনা বল্‌লে না তো?"

আবার মাথা নেড়ে জানাই—"লেগেছে।" ভাষায় তা বলতে চাইলেও কিছুতেই ছাই মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না তখন! মনে মনে প্রশ্ন উঠেছিলো—"আর আমাকে?" কিন্তু ভাষা হারিয়ে মূক হয়ে গেছি তখন। সেই প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করা হল না কোনদিনও। হাঁগো, আজ যদি সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ক র, উত্তর দিতে পারো?"

বিশ্বনাথবাবু অভিভূত হইয়া হেমলতার কথাগুলো শুনিয়া যাইতেছিলেন—বহু দূরে পিছনে-ফেলে-আসা স্মৃতিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন তিনি। হঠাৎ যেন চমক ভাঙিল তাঁর। একটু থামিয়া উত্তর দিলেন বিশ্বনাথবাবু—"আশ্চর্য্য, অদ্ভুত এই তোমাদের মেয়েজাতটা। বিশ বছর আগেকার ফুলশয্যার স্মৃতির সাথে, অক্ষরে অক্ষরে আমাদের কথাগুলো, এমন কি হাবভাব, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি পর্য্যন্ত সব মনে আছে তোমার! তোমার অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর হয়তো তখন ঠিক দিতে পারতাম না; কিন্তু আজকের এই আকাশভরা জ্যোৎস্নার মাঝে তোমার স্বরূপ দেখে, তোমাকে সত্যই বড় ভাল লাগ্‌ছে লতা।"

হেমলতা আকাশপানে চাহিয়া ধীর গম্ভীর আবেগভরা সুরে বলিলেন—"আকাশের সব তারাই লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর গভীরে।"

কত আলাপে আদরে বিশ্বনাথবাবু ধীরে ধীরে আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। হেমলতার কণ্ঠস্বরেই ঘুম ভাঙিল তাঁর। কিন্তু এ কী রূপান্তর!

—"মড়া কি মরেছে আজ। একেবারে মরে না কেন, হাড় জুড়োয় আমার। এই একরাশ বাসন নিয়ে এখন আমি—"

বিশ্বনাথবাবুর গত রাত্রের কথা কেবলই মনে পড়িতে লাগিল।…"স্বপ্ন! তাই বা কেমন করে হবে! স্বপ্ন কি কখনও এত সত্য হয়!"

সাহস করিয়া হেমলতাকে এই রহস্যাকৃত রাত্রির কথা কিছুতেই বিশ্বনাথবাবুর জিজ্ঞাসা করা হইল না। দৈনন্দিন নিয়মানুসারে তিনি দাঁতন করিতে করিতে পাড়ার প্রাত্যহিক প্রভাতী আসরের উদ্দেশে হেমলতার সামনে দিয়া চলিয়া গেলেন।

হেমলতা একবার তাঁর দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না পর্য্যন্ত!

সামাজিক আলোড়ন ও বিপ্লবের জয়যাত্রা

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

আজ আমরা এক বিরাট ওলট-পালটের আবহাওয়ায় বাস করছি। চারিদিক থেকে পরিবর্তন আসছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, আর তার ধাক্কা লাগছে সমাজের মর্মমূলে। প্রচণ্ড আঘাতে সমগ্র সমাজ-সৌধই প্রায় ধ্বসে পড়ছে। নিদারুণ বিশৃঙ্খলা, অসন্তোষ ও রক্তলীলা দেশের নানা প্রান্তে প্রবল আকার ধারণ করছে। জনসাধারণ আজ ক্ষুব্ধ অথচ বিভ্রান্ত। নেতাদের কণ্ঠেও গভীর বেদনার বাণী। এক অভূতপূর্ব নৈরাশ্যের দ্বারা নিখিলকে সমাচ্ছন্ন করতে চলছে। জাতীয় স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় স্বপ্নও যেন কটিকাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় ম্লান ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ছে। গান্ধীজীর মতো বরেণ্য নেতাও সেদিন বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে দুঃখপ্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বরাজের দিন অনেক পিছিয়ে গেলো। কংগ্রেস-লীগ বিরোধ যতখানি সত্য, জাতীয় স্বাধীনতার কথা ততখানি সত্য। অগণিত লোকের চেতনায় এধরণের বেদনাদায়ক চিন্তা ক্রমশই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অথচ বাস্তব দৃষ্টিতে এই চিন্তা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। সম্মুখের বাধা-বিপত্তিতে উদাসীন থাকা বিপ্লবীদের পক্ষে যেমন মারাত্মক, তেমনি আবার নিজের শক্তির যথার্থ উৎসগুলিতে অচেতন থাকাও সর্বনেশে। প্রথম বিষয়টিতে সজাগ দৃষ্টি আজ আমাদের অনেকেরই এসেছে, আর সেকাজের দায়িত্ব গ্রহণও করেছেন অনেক বরেণ্য নেতা। তবে দ্বিতীয় পথের সচেতন যাত্রী নিতান্তই কম। তাই সেদিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য।

একথা সত্য, কলিকাতা মোল্লাখালী বিহার অঞ্চলে অনুষ্ঠিত যজ্ঞযজ্ঞ সভ্যতার মাপকাঠিতে যেমন দুঃখের, তেমনি লজ্জার। প্রগতি সমাজের অধিবাসী হয়েও বর্বরতার অভিযানে আদিম যুগের মানুষকে হার মানানো হয়েছে। দুঃসহতা ও পাশবিকতার প্রবলতম সত্যগুলি সমাজ-সেবী প্রত্যেক নর-নারীকে তীব্রভাবে বিঁধছে,—এতে আর সন্দেহ কি? পরিমাণের দিক থেকেও এ নর-হত্যার তুলনা ইতিহাসে আর মিলে না। ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে ও বাদ্-বিচারে বর্তমানের দুঃখ সত্যই সীমাহীন ও অর্থহীন। তবুও বিশাল পটভূমিকায় প্রসারিত দৃষ্টিতে ঘটনাটি অর্থপূর্ণ বলেই মনে হয়, আর তখনই আমরা বুঝতে পারি যে বর্তমানের অতি শুধু ক্ষতিই নয়, তা আমাদের কাছে অমূল্য অফুরন্ত উপহারও বহন করে এনেছে। বিষয়টি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

প্রথমত, সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত যজ্ঞযজ্ঞ মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপকে অতি নগ্ন-মূর্তিতে প্রকটিত করেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পাকিস্থান অর্জনের প্রয়াস একদিকে যেমন লীগের অবাস্তব আদর্শকেই আঘাত করেছে, তেমনি আবার অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের আদর্শকেও পরোক্ষভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে। বর্তমানে এটুকু অন্ততঃ উদ্ঘাটিত হয়েছে যে কংগ্রেস-লীগ বিরোধ আসলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নয়, তা হলো আসলে প্রগতিশীল শক্তির সাথে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংঘর্ষ। কংগ্রেস ছিল জাতীয়তাবাদী ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক, লীগ ছিল সাম্প্রদায়িক ও ফিউডাল। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা, আর লীগের প্রচেষ্টা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগে মিতালি করে একালে অথচ মধ্যযুগ থেকে বহন করে আনা সামন্ত স্বার্থকে কায়েম করা। তাই বলছি, কংগ্রেস-লীগ মিলন কখনোই সম্ভব নয়, যদিও হিন্দু-মুসলিম জনগণের মিলন সম্ভব। হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের মিলন কংগ্রেস-লীগ মিতালির উপর নির্ভরশীল নয়। এ মিলন হতে পারে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের শক্তি দিয়ে ধ্বংস করে, তার আগে নয়। মুসলিম লীগের মতো সম্প্রদায়গত ও রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানের সংগে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের কোনো আপোষই হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেও স্বীকার করবো, আবার জাতীয় স্বাধীনতাও চাইবো এ যেমন হয় না; ধনতন্ত্রবাদকেও বাঁচিয়ে রাখবো আবার সাম্যবাদকেও ছাড়বো না তাও যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি ফিউডালিজম্ ও সাম্প্রদায়িকতার সংগে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের মিল বা মিলন সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, খিলাফৎ আন্দোলনের পর থেকে ১৯৩৯ সনের মধ্যে যতবার গান্ধী-জিন্না বা জিন্না-জওহরলাল আলাপ-আলোচনা চলেছে কংগ্রেস-লীগ মিলন ও তার মারফৎ হিন্দু-মুসলিম মিলন-সাধনের জন্য, ততবারই সে-সকল চেষ্টা হয়েছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। কংগ্রেস-লীগ মিলনের মারফৎ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য-সাধনের সম্ভাবনায় বর্তমান

পরিস্থিতিতে বিপ্লবীদের বিষাদ প্রায় কেটে গিয়ে হয়ে পড়েছে এবং দীপের প্রতি এক আপোষবিরোধী ও অনমনীয় কর্মপন্থা গ্রহণের আহ্বানও এসেছে নানা মহলের কণ্ঠ থেকে। সমাজ-তান্ত্রিক নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া প্রবল এক বক্তৃতায় এই সুরের সুস্পষ্ট ঝংকার তুলে ছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আরও উগ্র হতে হবে এবং যে কোনো উপায়ে হোক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দমন করতে হবে,—এই উক্তিটি ডাঃ লোহিয়া বক্তৃতাকালে করেছিলেন। এই উক্তির ভিতরই কংগ্রেসের ভাবিক কর্মপন্থার ইংগিত রয়েছে। বিশেষ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে আজ গড়ে তুলতে হবে কংগ্রেসী দলের এক বলিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী, আপোষ-নীতি ও তোষণ-নীতির পরিবর্তে তাকে গ্রহণ করতে হবে এক নির্ভীক ও দৃঢ়পন্থা। কংগ্রেস আজ যতটা পরিমাণে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রতি হয় নয় আপোষবিরোধী হতে পারবে, হিন্দু-মুসলিম জনগণের মিলন ও ঘরাজের পথে ভারতীয় মহাজাতির অগ্রগমন ততটা পরিমাণে দ্রুত হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতের পথে বর্তমানের আলোড়ন সুস্পষ্ট আলোক সম্পাত করে বিপ্লবীদের অভিযানকে আরও সুগম করে তুলেছে। এই তো গেলো পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের সকলের উল্লেখযোগ্য আঘাত।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম জনসাধারণের ভিতর ব্যাপক-ভাবে গঠনমূলক কর্মের বিপুল প্রয়োজন কংগ্রেস আজ সামাজিক শিক্ষাদানের ফলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। গঠনমূলক কর্মের পথে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যুবক কংগ্রেস বহুদিন পূর্বে পদার্পণ করলেও মুসলিম জনসাধারণের কাছে,—বিশেষতঃ বাংলা প্রভৃতি স্থানে,—তার ঢেউ গিয়ে তেমন ভাবে পৌঁছায়নি। বর্তমানের প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে কংগ্রেসের দৃষ্টি ঐ পল্লী-অঞ্চলের উপেক্ষিত মুসলিমদের উপর অনেক সজাগভাবে পড়েছে এবং তার আন্দোলনের ব্যাপকতাও বেড়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও উৎপীড়িত মানুষদের দাবীতেও কংগ্রেসের চেতনা বর্তমান আলোড়নের ফলে আরও সজাগ ও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছে।

তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেশের জনসাধারণের কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ বা যেসী খৃষ্টান সকলের জীবনে নিয়ে এসেছে এক অভূতপূর্ব অশান্তি, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তাবোধ এবং তারই অনিবার্য পরিণতিরে এক বিরাট সজাগতা ও বাস্তবতাবোধ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরাগদ চাপে সাধারণ নরনারীর চেতনার প্রচণ্ডতম ধাক্কা লাগছে, আর সেই ধাক্কায় তাদের বিক্ষিপ্ত ও অচেতন মন কঠিন বাস্তবের কঠোরতার চেতনা লেগে উঠছে। সাধারণ অবস্থায় বিবর্তনের প্রায় ধারায় যে পরিবর্তন সাধিত হতে লাগে অন্ততপক্ষে এক যুগ বা তার চেয়েও বেশী, অথচ বিপ্লবের অশান্ত আবহাওয়ায় সেই পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে মাত্র তিনমাসের পরিসরে।

চতুর্থত, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আজ প্রগতিপন্থীরা পূর্বেকার চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ হবার আবশ্যকতা আজ দিয়ে উপলব্ধি করেছে। বিপ্লবের এ-হেন দুর্যোগক্ষণে বিচ্ছিন্নভাবে আদর্শ-পূজার সময় আজ নয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সংঘবদ্ধ আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য প্রগতিপন্থীদেরও গড়ে তুলতে হবে সচেতনভাবে এক প্রচণ্ড সংহতি। গণসংগঠন ও সংঘবদ্ধতার সাধনায় আজ যে-ভাবে স্বাধীনতা-কামী ও বিপ্লবকারীরা আত্মসমর্পণ করেছে, জাতীয় মুক্তি-অভিযানের দুরূহতর পটভূমিকায় তা নিঃসন্দেহে অগ্রগতির লক্ষণ।

পঞ্চমত, অন্যদিকে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার মূলেও বর্তমান আলোড়ন এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে। পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা অনেকদিন থেকেই দুর্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছিল। তাহলের সেই ধারায় বর্তমানে এসে লেগেছে এক বৈপ্লবিক আঘাত। এ আঘাত বিফল হতে পারে, তবুও নিরর্থক নয়। নতুন পথের অভিযাত্রীরা দুঃখের কল্যাণময় পরিণতিকেও বিফল হতে পারে না। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের পুরাণো শাসন-নীতি ও ধর্ম প্রায় সব কিছুরই অন্তঃসারহীনতা বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যুগযুগান্তের জীর্ণ আচার-ব্যবহার, বিধি-বিধানের ভগ্নস্তূপের উপর নতুন সমাজ-দর্শন গড়ে উঠবার পূর্বলক্ষণ সূচিত হচ্ছে দিকে-দিকে। মনুষ্যত্বের সহজ ও সত্যতার দাবী থেকে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ তার যে একটা বৃহৎ অংশকে (অর্থাৎ তথাকথিত হরিজনদের) এতদিন বঞ্চিত করে রেখেছিল, আজ তাকেও সমাজে গৌরবমণ্ডিত আসন দেবার জন্য সমাজ-নেতারা প্রস্তুত হতে চলছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অভিনব উদার-নীতির বারংবার ঘোষণা তার আংশিক সাক্ষ্য বহন করছে।

অতএব বস্তুতঃ বিশ্লেষণ করে pragmatismএর দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ পরিণতি-দর্শনের দিক থেকে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বর্তমানের দুঃখ ও যাতনা যত কঠিন ও তীব্রই হোক না কেন, মহাজাতির উত্থান-পতনের অবিচ্ছিন্ন ধারায় তা একেবারে ব্যর্থ হয় নি; বরং বৃহৎ লক্ষ্যের দিকে অর্থাৎ উন্নতির পথে আমাদের সমাজের ধারায় ঠেলে দিয়ে উন্নতির ভবিষ্য সম্ভাবনাকে আরও নিকটবর্তী করে তুলছে।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৭

পরদিন প্রাতে শেখর ও পুষ্টপালের নিকট সংবাদ পাইলাম যে ধৃত সার্থবাহগণ, তাহাদের অপরাধের কোনও প্রমাণ না থাকায়, মুক্তিলাভ করিয়াছে। ক্ষত্রপ নগরপালকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, কোনও প্রমাণ না পাইয়া, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জনসাধারণকে যেন বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত কিংবা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ধৃত বা অবরুদ্ধ করা না হয়।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, "এই সময়ে কি এই নির্যাতিত বণিক ও সার্থবাহগণের মধ্যে আমাদের ত্রাণসংঘের নীতি প্রচারের সুযোগ হইতে পারে না?"

আমি বলিলাম, "না।"

—কেন? উহারাও ত উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে।

—তাহা হইলেও সংঘে উহাদিগকে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

—কেন? উহাদিগকে কি বিশ্বাস করা যায় না?

—সাধারণতঃ, উহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা নিরাপদ নহে।

পুষ্টপাল জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু দেবদত্ত, বণিক ও সার্থবাহশ্রেণীকে এরূপ সাধারণভাবে অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে কি?"

আমি বলিলাম, "অনেকগুলি কারণে আমি ঐ বিদেশী বণিক ও সার্থবাহসম্প্রদায়ের কাহাকেও আমাদের সংঘে গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারি না। প্রথমতঃ, উহারা সকলেই বিদেশী—বাণিজ্যের ব্যপদেশে উহারা কিছুদিনের জন্য বাহ্লিক ও গন্ধারে আসিয়া বাস করিয়া থাকে—উহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতীচ্যবাসী—যবন, কাল্‌ডীয়, য়ীহুদ্‌ ও পারসিক। আমাদের দেশের প্রতি তাহাদের আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, অর্থের সহিত উহাদের একমাত্র সম্বন্ধ, অর্থের জন্য উহারা অনেক অনর্থ ঘটাইতে পারে। গন্ধারবাসীরা যাহাই হউক—বণিক-শ্রেষ্ঠী-জনসাধারণ। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ-সকল শ্রেণীর লোকের—তাহাদের স্বদেশ ও মাতৃভূমির প্রতি যে প্রীতি, প্রেম ও শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তাহা ঐ বিদেশী অর্থলিপ্সু বণিক সার্থবাহগণের মধ্যে একান্ত অভাব—একেবারে নাই বলিলেই চলে।—কিরূপে তবে উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া সংঘে গ্রহণ করিতে পারা যায়? বিদেশীদিগকে আমাদিগের এই ত্রাণসংঘের মধ্যে আনয়ন করিয়া বিপদ বাড়াইতে আমি অভিলাষী নহি।"

শেখর আমার কথা স্থির হইয়া নীরবে শুনিতেছিল। পরে বলিল, "আমি প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে বিষয়টা বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখি নাই। তুমি যথার্থই বলিয়াছ—উহাদের সংঘে গ্রহণ করা সুবিধাজনক ও সুবিবেচিত হইবে না, বরং বিপদের সম্ভাবনাই সমধিক।"

পুষ্টপালও বুঝিল এবং অবশেষে শেখরও আমার সহিত একমত হইল।

এই সময়ে প্রজ্ঞা ও কীর্ত্তিবর্ম্মন্‌ আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হইল। কীর্ত্তিবর্ম্মন্‌ সংবাদ আনিল যে সাম্রাজ্য-সীমান্ত হইতে বহির্শত্রু তাহাদের বাহিনী আপাততঃ অপসারিত করিয়াছে। সম্রাট্‌কে তাঁহার ভগ্ন প্রাক্তন সন্ধির সর্ত্তগুলির এবং কয়েকটি অভিনব প্রস্তাবিত সর্ত্তের স্বীকৃতি ও তাহাদের প্রতিপালন প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করিয়াযু-এ-চি অধিনায়ক কজুল-কদফিস্‌ বা ষিউ-সিউ-কিওকে প্রভূত অর্থ দানে সন্তুষ্ট করিতে হইয়াছে। সন্ধি সর্ত্তসমূহের সম্যক্‌ প্রতিপালন সুনিশ্চিত করিবার জন্য যু-এ-চি অধিনায়ক কদফিস্‌ সাম্রাজ্য হইতে দুইজন প্রভাবশালী নাগরিককে

তাঁহার পরিবর্ত্তে প্রতিভূস্বরূপ রক্ষা করিবেন। প্রাক্তন সন্ধি সর্ত্তগুলি এ পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হয় নাই, বরং কয়েকটি অমান্য ও ভঙ্গ করা হইয়াছে; ভবিষ্যতে পুনরায় সেরূপ যাহাতে না হয় তাহার সুনিশ্চয় অভিজ্ঞান স্বরূপ সম্রাট্ হেরম্ব তাঁহার ভূতপূর্ব্বা প্রথমা সম্রাজ্ঞীর গর্ভজাতা একমাত্র কন্যার এই বিদেশী বর্ব্বর অধিনায়কের সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অপমানজনক সন্ধি অনুসারে বিবাহ নিষ্পন্ন হইবার জন্য বাহ্লিক, কপিষা ও গন্ধার নগরীর রাজপ্রাসাদ ব্যতীত সাম্রাজ্যের অন্যত্র আর কোথাও এই বিবাহের নিমিত্ত আনন্দোৎসব হইবে না।

আমরা এই অভিনব সন্ধির কথা শুনিলাম, কিন্তু নবগ্রথিত প্রধান সর্ত্তগুলি ব্যতীত অন্যান্য সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিলাম। আমাদিগের সংঘের অন্যতম নায়ক সুকৃতিবর্দ্ধনের পিতা পুরুষপুরের বিষয়পতিও গন্ধার ক্ষত্রপের অন্যতম বন্ধু। এই সন্ধির সকল সর্ত্ত ও প্রতিপাদ্য স্বীকৃতিসমূহ সম্বন্ধে বিশদ সংবাদ হয়ত সুকৃতিবর্দ্ধন কতকটা অবগত আছে এবং আপাততঃ সে সকল বিষয় না জানিলেও, সে যে সচেষ্ট হইয়া সে সকল যথাযথরূপে শীঘ্রই সংগ্রহ করিতে পারিবে তদ্বিষয়ে আমাদের নিঃসন্দেহ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমি কীর্ত্তিবর্দ্ধনকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম, যে আপাততঃ সে এই অভিনব সন্ধির সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে বিশেষরূপে কিছু অবগত হইতে সক্ষম হয় নাই। আমি বলিলাম যে এখন সুকৃতিবর্দ্ধন ব্যতীত আর কেহ এই সন্ধির সর্ত্তগুলি বিশদভাবে জ্ঞাত নহে! তাহার দ্বারা তৎসংশ্লিষ্ট অপর সকল তথ্যও যে যথাযথভাবে সংগৃহীত হইতে পারিবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমি পুষ্টপাল, শেখর ও কীর্ত্তিবর্দ্ধনকে বলিয়া দিলাম যে তাহাদের মধ্যে যে কেহ একজন যেন ফিরিবার পথে সুকৃতিবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাহাকে যেন বলিয়া দেয় যে সংঘের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সে সংগ্রহ করিয়া আমাকে অনতিবিলম্বে জানাইয়া দেয় এবং যদি সম্ভব হয় ত, অদ্য অপরাহ্ণেই যেন ঐ সকল সংবাদ আমি প্রাপ্ত হই। পুষ্টপাল বলিল যে, সে জানে যে সুকৃতিবর্দ্ধন এই কার্য্যেই আপাততঃ ব্যাপৃত আছে, কারণ সংঘের কর্ম্ম নির্দ্দেশে এই সন্ধির সর্ত্তগুলির আলোচনার আবশ্যক বোধ হইতে পারে। সে আরও বলিল যে সুকৃতিবর্দ্ধন এই সংগ্রহ কার্য্যে ইহার মধ্যেই সাফল্যলাভ করিয়াছে এবং অদ্য অপরাহ্ণে সে সুকৃতিবর্দ্ধনকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিবে। অতএব আমি এখন এ সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত রহিলাম। তবে সকল সংবাদ সম্পূর্ণরূপে হস্তগত না হওয়া অবধি সংঘে তাহাদের আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করিতে বিলম্ব হইবে। আপাততঃ কথা রহিল যে অদ্য অপরাহ্ণে সুকৃতিবর্দ্ধন তাহার গৃহীত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আমার নিকট আসিলে, আমরা সকলেই পুনর্ব্বার এখানে মিলিত হইব। এখনকার মত আমাদের সম্মেলন শেষ হইল এবং আমরা পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক সকলে একে একে কার্য্যান্তরে গমন করিলাম।

অপরাহ্ণে সুকৃতিবর্দ্ধন, শেখর ও পুষ্টপালের সহিত আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। প্রজ্ঞা ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন আসিয়া জুটিল। প্রাক্তন সন্ধির সর্ত্তসমূহের অন্য এই পঞ্চবিংশতি বর্ষেও কোনটাই এ পর্য্যন্ত সম্মানিত বা প্রতিপালিত হয় নাই। বর্ত্তমান আক্রমণের ইহাও একটা অন্যতম কারণ। বরং পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ও গৃহীত স্বীকৃতির কোনও কোনওটি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য ও অমান্য করা হইয়াছে। যাহাতে তাহা আর এরূপ না হয় তজ্জন্য বৃদ্ধ সম্রাট্‌কে নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রাচীন সন্ধির সর্ত্তের উপর আরও কয়েকটি অভিনব সর্ত্তও আরোপিত হইয়াছে। সম্রাট্ হেরম্বের দ্বিতীয়া সাম্রাজ্ঞীর গর্ভজাত কোনও সন্তান নাই। অতএব বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পর কজুল কদফিস্ সমগ্র বাহ্লিক-গন্ধার বা কা-ফু ও কা-পিন্* সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইবেন এবং আপাততঃ তিনি যুবরাজ ও ভাবী সম্রাট্ বলিয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবেন; সকলপ্রকার প্রচলিত মুদ্রায় বর্ত্তমান সম্রাটের প্রতিকৃতির সহিত কদফিসের প্রতিকৃতিও অঙ্কিত থাকিবে। যে সকল মুদ্রায় সম্রাট্ হেরম্বের প্রতিকৃতিসহ তাঁহার

* বাহ্লিক রাজ্যের চৈনিক নাম "কা-ফু" ও গন্ধাররাজ্য চীন ভাষায় "কা-পিন্" বা "চি-পিন্" আখ্যা পাইয়াছিল। "কা-ফু" বোধ হয় "কপিষা" শব্দের অপভ্রংশ। "কা-পিন্" ও "চি-পিন্" শব্দদ্বয় কপিশ, নগর, উদ্যান, গন্ধার ও কাশ্মীর এই সকল রাজ্যেরই সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।

বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞী কালিওপ্রের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়া প্রচলিত আছে তৎসমুদায়ের প্রচলন রোধ করিয়া এই নূতন মুদ্রার প্রচলন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এই শেষোক্ত সর্ত্ত সম্বন্ধে বৃদ্ধ সম্রাট্ বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। তরুণী ভার্য্যার তুষ্টি সম্পাদনের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া যুএ-চি অধিনায়ক কজুল কদফিস্ বৃদ্ধকে বিলক্ষণ বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছেন। সম্রাট্ হেরমস প্রথমতঃ এই সর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাকে এই স্বীকৃতিতে বাধ্য হইতে হইল। কারণ, আর উপায়ান্তর নাই। ক্ষমতাশালী বিজেতা শক্র কোষমুক্ত অসি হস্তে সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান। দ্বিধা সন্দেহের বা ইতস্ততঃ করিবার আর সময় নাই।—সম্রাট্ ক্ষণিক চাঞ্চল্যে ও মোহে নিমেষে সব হারাইতে বসিয়াছেন। এক কঠোর আঘাতে প্রাচ্যে যবন সাম্রাজ্যের স্বপ্ন মেঘের প্রাসাদের মত পলকে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।—গত্যন্তর নাই দেখিয়া সম্রাট্ সন্ধিপত্রের সকল কঠোর সর্ত্তই গ্রহণ করিলেন।—কিন্তু ভবিষ্যতে এই সন্ধি হয়ত পুরাতন সন্ধির পথেই প্রয়াণ করিবে এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।—এখনও সাম্রাজ্যের সকল অংশ হইতে পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবেই সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে।—তাহাতে কোনও প্রকার বাধা সৃষ্ট হয় নাই বা তাহার প্রতিরোধকল্পে কোনও অভিনব রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই। ইহা হইতেই অনুমান হয় যে সন্ধির স্বাক্ষরিত সর্ত্তগুলি সম্মানিত ও প্রতিপালিত না হওয়াই সম্ভব এবং পুনর্ব্বার যুদ্ধবিগ্রহ অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা সমধিক। আমাদের কার্য্যেও এখন তদুপযুক্ত তৎপরতা অবলম্বনের আবশ্যক। সমগ্র বাহ্লিকে ও কপিশার এবং তৎসহ গন্ধারে ও পুরুষপুরে সাগ্রহে সৈন্য-সংগ্রহ কার্য্য চলিয়াছে এবং কতকটা গোপনে, কিন্তু অদম্য উৎসাহে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে; সংগৃহীত সৈন্যগণকে ও শিক্ষা-দান করা হইতেছে। এখন আমাদের উদ্যমকে কোন পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক চালিত করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া, অচিরে আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ বাঞ্ছনীয়। এখন হইতে ভবিষ্যতে সাফল্যের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের সম্যক্ বিবেচনার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। বৃথা কালক্ষেপের জন্য আর সময় নাই। সমগ্র পরিস্থিতি উপলব্ধির জন্য আমাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কার্য্যকুশল কাহারও বাহ্লিকে ও কপিশার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন হইয়া গিয়াছে। আমি পুষ্টপালকে বলিয়া দিলাম—সে যেন আর্য্য মহাস্থবিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে অদ্য সন্ধ্যায়, আরাত্রিকের পর, সংঘারামে জ্ঞানসংঘের একটা পরামর্শ সভা আহ্বান করিবার জন্য আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করে এবং এই সভার কার্য্যসূচী মৎকর্ত্তৃক সভায় বিজ্ঞাপিত হইবে। এখন ইহার স্বতন্ত্র বিজ্ঞপ্তির জন্য সময় ও সুযোগের একান্ত অভাব। পরামর্শ সভার আহ্বানের অনুরোধ লইয়া পুষ্টপাল আর্য্য মহাস্থবিরের সহিত সাক্ষাতের জন্য সংঘারামের উদ্দেশে গমন করিল। আমাদের অপরাহ্ণ সম্মেলন তখন ভঙ্গ হইল। স্থির রহিল, যে আমরা সকলেই সন্ধ্যার আরাত্রিকের পর প্রথম যামের প্রথমপাদে পুরুষপুর বিহারের সংঘারামে আর্য্য মহাস্থবিরের কক্ষে সমবেত হইব।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে যবন-বর্ব্বর

সন্ধিনামক সপ্তদশ বিবৃতি　　(ক্রমশঃ)

অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

বৈদিক দার্শনিক সমাজে যখন হইতেই সম্প্রদায়ভেদ হইয়া গিয়াছে। দ্বৈতবাদিগণ প্রভূত পুষ্টিলাভ করিয়াছেন। উপাদনাকাণ্ড ও ভক্তিমার্গের দুর্গ সুদৃঢ় হইয়াছে। তথাপি আশঙ্কা—প্রবল অদ্বৈতবাদীর দুর্ভেদ্য দুর্গ যেন দুর্দ্ধর্ষ অন্ধকারে দুর্জ্ঞেয় রহিয়া গেল। এমনই সময় আবির্ভূত হইলেন নৌড়ীয় ধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বৈদিক সম্প্রদায়সমূহ মধ্যে আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের ত্রাণকর্ত্তা প্রেমবারিধি মহাপ্রভু।

প্রভু দেখিলেন—সকল আচার্য্যই এক সেই প্রতিপ্রমাণেই নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিয়াছেন। প্রতিপ্রমাণেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদও যেমন প্রতিষ্ঠিত, কেবলাদ্বৈতবাদও তো ঠিক তেমনি প্রতিপ্রমাণেই প্রতিপাদিত।

কেমন করিয়া এমন হইল? একই শ্রুতি কেমন করিয়া দুই বিরোধী মতবাদের প্রসূতি হইবেন? তাই স্বয়ং বেদপুরুষই আজ বেদ-ব্যাখ্যায় ব্রতী হইলেন। প্রভু দেখিলেন—অদ্বৈতবাদী শ্রুতিকে প্রবল-যুক্তিসহকারে বিচার করিয়া সকলবাধারহিত সত্যপ্রতিষ্ঠ অভিব্যক্তিপ্রাপ্ত

অর্থকে আবরিত করিয়াছেন। প্রভু আমার তখনই হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—

স্বতঃপ্রমাণ বেদ,—প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হয় হানি॥

কি সর্বনাশ! বেদ যে আমার শ্রীভগবানের বাঙ্ময়ী শ্রীমূর্তি! ইহাতে কি ছেদকল্পনা করিবার অবসর আছে? শাঙ্করভাষ্যকে লক্ষণাদ্বারা বিচারের পক্ষে ব্যাখ্যা করাই বেদানুশাসনের পূর্ণ-পরিচায়ক হইতে পারে না। কবিরাজের লেখনীমুখে কিছু পরার উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রভু কহে—"বেদব্যাসসূত্র ঈশ্বরবচন।
ভ্রমাদিদোষ কহিতেছেন ঈশ্বরগণ॥
ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই অর্থ।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম সমর্থ॥

সমগ্র ভক্তজগতে মহোল্লাসের বন্যা বহিল। প্রভু আমার অভিধাবৃত্তির প্রাধান্য দিয়া সমস্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়কেই খণ্ডবস্তু করিয়া দিলেন। বারাণসীধামে যখন সমস্ত সন্ন্যাসীর পরমাচার্য শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচার প্রসঙ্গে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সিদ্ধান্তটি গৌরবান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। বেদের বিষ্ণু সিদ্ধান্ত উদ্ঘোষিত হইল—

ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ অনূর্ধ্ব সমান॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
* * * *
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্বয়ং পরিবার॥

পূজ্যপাদ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভে এই তত্ত্বটিরই অপূর্ব বিস্তার করিয়াছেন।

জীব সম্বন্ধেও মহাপ্রভু তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন—

ঈশ্বরের শক্তি যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি—কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।

জ্বলিতজ্বলন শব্দে অগ্নিরাশিকে বুঝাইল। ঈশ্বরতত্ত্ব যেন অনল। আর জীবতত্ত্ব হইল সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গকণাস্বরূপ। অগ্নিতে স্ফুলিঙ্গে ইহাদের যেমন অভেদ, তেমনি আবার ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধে ভেদও আছে। রাশীকৃত অগ্নিকে যেমন অন্ধকার কিছুতেই আচ্ছাদিত করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াও ঈশ্বরকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না।

যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার বিকার।

কিন্তু ঘনীভূত অন্ধকার যেমন স্ফুলিঙ্গকে পরাভূত করিতে পারে, তদ্রূপ মায়াও জীবকে অভিভূত করিতে পারে। এই যে একবার ভেদ, আর একবার ভেদ—দুই সমস্যই ঘুচাইতেছে, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিমত্তাবশতঃই ইহা সম্ভবপর। অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাব সাহায্যে এই যে ভেদ ও অভেদের সমাধান—ইহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ।

জগৎ সম্বন্ধেও বিবর্তবাদ অপসৃত করিয়া স্পষ্ট পরিণামবাদ স্থাপন ব্যাপারে ঘোর বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। "পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বর বিকারী হইয়া পড়িবেন, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, তেমনি ঈশ্বরেরও বিকারে বিশ্বরূপে পরিণতি হইয়াছে বলিতে হয়; ইহাতে সমস্ত শাস্ত্রের সহিতই বিরোধ হইবে; কারণ কুত্রাপি ঈশ্বরে বিকারিত্ব দোষ নাই। তারপর বিকারীমাত্রেই বিনাশশীল, যথা দেহাদি। ইহাতে ঈশ্বরের অবিনাশিত্বেরও হানি হইয়া যায়—ফলে বেদ শাস্ত্রেরই সহিত সঙ্গতি থাকে না।"—ইহাই বিবর্তবাদ পক্ষে বড় যুক্তি।

শ্রীমদ্ মহাপ্রভু এ তর্কেরও অবসর রাখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—ইহা কষ্টকল্পনা; বেদের লাক্ষণিক ব্যাখ্যাতেই এই সকল আপত্তির অবসর হয়। অভিধা বৃত্তিতে বেদো যা ইয়াহি ভূতানি—এই শ্রুতি দ্বারা সুস্পষ্ট পরিণামবাদই প্রকাশিত হইয়াছে—উহা বিবর্তবাদের মূল মন্ত্র।

পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপয়ে যে হরি॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ।
বেদে আর সূত্রে এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥

উদ্ধৃত পয়ারগুলির বিশ্লেষণ করিলেই বিবর্তবাদিগণ যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার দূর সমাধান হইয়া যায়।

পরিণামী বস্তু মাত্রেই বিকারী—এই ভাব দ্বারা তুমি যে ব্রহ্মে বিকারিত্বের আশঙ্কা উঠাইয়াছ, তাহা ঠিক নহে। কারণ, তিনি যে অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত, ইহাতো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবেই তিনি বস্তুতঃ অবিকারী থাকিয়াও নিজ ইচ্ছায় জগৎ রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে না পারিবেন কেন? এস্থলে প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্ত উপন্যাস করায় যাহাতে একরূপ নির্জলেই হইতে হইয়াছে। চিন্তামণি বস্তুরাশি প্রসব করিয়াও যেমন বিকার প্রাপ্ত হয় না—তাহার স্বরূপের অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে না, তদ্রূপ পরমেশ্বরও ইচ্ছামাত্রই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরাশি উৎপাদন করিয়াও যে সদা অবিকারী থাকিবেন, তাহাতে আবার বিস্ময়ের কি আছে?

এই প্রসঙ্গে কবিরাজের উক্তিটি কি সুন্দর।
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়?

শ্রীভগবানের এই অচিন্ত্যশক্তিমত্তা সকল শাস্ত্রই কীর্তন করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ ইহাতেই বেশী জোর দিয়াছেন। অচিন্ত্য হইলেও ইহা অনির্বচনীয় নয়। শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী—

বেদ্যং বাস্তবমত্রবস্তু

এই অংশের ব্যাখ্যায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সূচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীব পরমাত্মসন্দর্ভে স্ফুটীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বয়বাদি বিলীকৃত করিয়া অন্ততঃ বাংলা তাহার পরিবেশিত হইবার সুবিধা হয় নাই। বিষমূলের যখন সৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন আশা হয় অতঃপর এ অভাব দূরীভূত হইবে।

বিষয়টি সত্যই অত্যন্ত গুরুতর। আপাতদৃষ্টিতে ভেদ ও অভেদ এই দুইটির যুগপৎপ্রতীতি অসম্ভব। লোকসিদ্ধ এমন কোন প্রমাণও নাই, যাহার দ্বারা দুই বস্তুর যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু গৌড়ীয় আচার্যগণের কি অপ্রাকৃত শক্তি, এ যেন দুরভিসন্ধি তত্ত্বটিও জীব-বুদ্ধির গোচরীভূত করিতে কি অসাধারণী প্রতিভারই না পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। অর্থাপত্তি বা অন্বয়ানুপপত্তি প্রমাণ সাহায্যে তাঁহারা যে অপূর্ব কৌশলে এই অঘটনঘটন ঘটাইয়া গিয়াছেন তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা করিবার কারণ রহিয়াছে। শক্তি-শক্তিমানের বিচার পূর্বক ইহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে—

"অতএব শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তি-শক্তিমতোঃ
পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে
শক্তি ব্যতিরেকাৎ চিদ্বাকিঞ্চেচ্চ কচিৎ
অভেদনির্দেশঃ, একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তি
বৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দেশশ্চ নানয়োরঃ।"

এই ভেদাভেদতত্ত্বের সাবলীল সমাধানেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অদ্বৈতদর্শন ব্রহ্মভাবটিকেই চরমতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের মতে শুধু ব্রহ্মভাব নহে, পরন্তু ব্রহ্মানুভূতিটিই হইল চরম অবস্থা।

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"

এই শ্রুতি অদ্বৈতবাদেরই পরম অনুকূল মনে হইয়াছিল; কিন্তু গৌড়ীয় দর্শন দেখাইলেন যে, ঐরূপ ব্যাখ্যায় অন্যান্য শ্রুতিস্মৃতির সহিত বিরোধ হইয়া যায়।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কুতশ্চন।

ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতি এবং গীতোক্ত—

যাবান্ যে প্রপঞ্চে যারা যেভাবস্থিতি তে—ইত্যাদি স্মৃতি শুধু ব্রহ্মভাব নহে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরই সংবাদ প্রদান করে। গৌড়ীয় দর্শনে ইহার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে এই বলিয়া যে—

"ব্রহ্মৈব সন্ বিতি তৎসাধর্ম্য-তদ্ভাবাপত্তিরেবাত্রোপমানির্দেশঃ।"

অর্থাৎ—ব্রহ্মৈব ভবতি—এই বাক্যে মুক্তাবস্থায় জীবের যে ব্রহ্ম-সমানতা বুঝাইতেছে ঐ ব্রহ্ম-সমানতা শব্দের অর্থই হইল—ব্রহ্মতাদাত্ম্যতা—ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ।

ব্রহ্মভাবাপন্ন বলিতে আমরা কি বুঝি? বুঝি যে, ব্রহ্মের যে যে ধর্ম, জীবও তত্তদ্ধর্মবিশিষ্ট হইল। অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে—

"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"

ব্রহ্মের এই যে আটটি গুণের কথা পাই, মুক্তজীবও তত্তৎ গুণোপেত হইল। অগ্নি সংযোগে লৌহ যেমন অগ্নিধর্ম প্রাপ্ত হয়, মুক্ত জীবটিও তখন ব্রহ্মধর্মবিশিষ্ট সুতরাং ব্রহ্মবৎই পরিলক্ষিত হয়। 'ব্রহ্মৈব ভবতি' বাক্যের ইহাই তাৎপর্য। মুক্তজীবকে ব্রহ্মের সমান দেখাইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্মের সর্বোপাধিত্ব ও অখিলহেয়প্রত্যনীকত্ব ধর্ম তো তখনও রহিয়াই গিয়াছে—জীব মুক্ত হইয়া যতই ব্রহ্ম সমান হউক, ব্রহ্মের অনুর্ধ্বমনানতাধর্মের তো বৈশিষ্ট্য থাকিবেই থাকিবে; সুতরাং অভেদবৎ প্রতীয়মান হইলেও ভেদ তখন রহিয়াছে বলিতে পারি, আবার এ ভেদ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মসমানতা প্রযুক্ত অভেদই বা বলিতে না পারিব কেন?

বৃহদারণ্যক শ্রুতি তত্ত্বটিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অনুকূলভাবেই বরং স্ফুটীকৃত করিয়াছেন—

"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।"

ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন্। এখানে ব্রহ্ম সন্ বলিতে যদি স্বতন্ত্র ব্রহ্মে বিলীনতাই অর্থ হইত, তবে তো পরবর্তী 'ব্রহ্ম অপ্যেতি' বাক্যের বৈয়র্থ্যাপত্তি হইয়া যায়। অপ্যেতি ক্রিয়ার কর্তা তখন কোথায়?

সুতরাং দুইটি অবস্থারই স্বরূপ আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মভাবাপন্নাবস্থায় অভেদ বা তাদাত্ম্যতাও যেমন সত্য, তদবস্থায় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় বলায় ব্রহ্মের প্রাপক জীবের যে প্রাপ্য ব্রহ্ম হইতে ভেদ—ইহাও সত্য। এই বিবিধ আপাত-বিরোধী সত্যের সমাধানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বলিতেছেন—

এই দ্বিবিধ অবস্থাই আছে; উভয়েই তুল্য বলশালী। কেবলাদ্বয়ের স্পর্শমাত্রাবস্থাটিকে লক্ষ্য করিয়াই অভেদ সিদ্ধান্ত, আর মুক্তচিত্তে যেই আনন্দস্পর্শ যেভাবে লীলায়িত হইয়া উঠে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভেদ সিদ্ধান্ত।

প্রমাণাদীন সন্দর্ভ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

উভয়কোক্তেশ্চৈব। অথবাহুঃ
শুদ্ধে শুদ্ধমিশ্রিতং তাদৃগেব ভবতি এবং
মুক্তেরিত্যাদিত আত্মা ভবতি গৌতম ইতি শ্রুতৌ।
তত্রৈব কারণে ন তু তদেব ভবতি, নতুনা
তদবস্থাদর্শনাৎ পৃথগুপদেশাচ্চ ইতি ভোজরাজঃ।
স্বাপ্যে চ—উদকং শুদ্ধং শুদ্ধে মিশ্রমেব যথা
তদেবং তদ্বৈ তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে।
এবমেবং হি জীবোঽপি তাবন্মাত্রং পরমাত্মনা,
প্রাপ্তোঽপি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ
ইতি।

উদ্ধৃতাংশে মর্ম উদ্ঘাটিত করিতে হইলে কঠোপনিষদের (২।১।১৪)

একটি অবতার হওয়া প্রয়োজন। কঠোপনিষদ নচিকেতাকে বলিতেছেন—

"হে নচিকেত! যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশ্রিত হইলে তাহার মতই হয়; তদ্রূপ পরমাত্মস্বরূপদর্শন মুনির আত্মাটিও পরতত্ত্বসদৃশই হয়।"

'তাদৃশের ভবতি'—বাক্যের স্পষ্ট অর্থ হইল—'তাহারই মত হয়।' 'এব'কার অর্থ বাংলা ভাষার নিশ্চয়ার্থক 'ই'। 'তাহার মতই হয়' বলিবার তাৎপর্য্য—ভেদ দূরা যায় না; অথচ ঠিক যে 'তাহাই হইয়া গেল,' তাহাও নহে; অথচ সম্বন্ধবর্ত্তমানিবন্ধন পৃথক্‌ত্বেরও উপলব্ধির বিষয় হয় না; অর্থাৎ ঠিক ভেদও নয় আবার ঠিক অভেদও নয়, অথচ ভেদও বটে আবার অভেদও বটে—ইহাই ব্রহ্মাত্মবাদ। আর ব্রহ্মাত্মবাদের আনুষঙ্গিক ফল হইল ব্রহ্মানুভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দস্বরূপলাভের অর্থাৎ সেব্যসেবক সম্বন্ধজ্ঞানলভ্যসেব্য-সেবাপরমানুভূতি। এই যে ব্রহ্মাত্মবাদস্থায় অভেদের ও ব্রহ্মানুভূতিসম্প্রয়োগে ভেদের সমকালীনত্বস্বীকৃতি—ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শন সিদ্ধান্ত—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ।

স্পষ্টলিঙ্গ ও অস্পষ্টলিঙ্গ উভয়বিধ শ্রুতিরই তুল্য মর্য্যাদা দান করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন দার্শনিকসমাজে এক অভিনব আলোকপাত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আচার্য্য শঙ্করকে কেবলাদ্বৈত-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রবল ও দুর্ব্বল প্রকারে শ্রুতিভেদ স্বীকার করিতে হইয়াছিল—বস্তু হলেই গৌণীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; ইহাতে শ্রুতিবৃত্তির সর্ব্বাবয়বপূর্ণ স্বতঃপ্রমাণতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা অমূলক নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন কিন্তু উভয় শ্রুতিরই সমত্ব তুল্যবলপ্রাধান্য প্রদর্শন করতঃ বৈদিক বাক্য সমষ্টিকে পূর্ণায়ত করিতে পারিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

"তত্ত্ব পরমং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভবতি। অস্পষ্ট-
বিশেষণতয়ে স্পষ্টবিশেষণতয়ে চ।"

বিশেষ শব্দে এস্থলে শক্তি ও শক্তিকার্য্যই বুঝাইয়াছে। শক্তি ও শক্তি-কার্য্যের অনভিব্যক্তিহেতু ব্রহ্ম হইলেন—অস্পষ্টবিশেষ আর শক্তিসমূহের তাহার পূর্ণাভিব্যক্তিহেতু তিনিই হইলেন—স্পষ্টবিশেষ। পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারব্যাপারে এই অস্পষ্টবিশেষকে অবলম্বনে যে প্রয়াস প্রসৃত হইয়াছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রমাণ করিয়াছেন যে, সেই অস্পষ্টবিশেষ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই স্পষ্টবিশেষ ব্রজেন্দ্রনন্দনতত্ত্বে পর্য্যবসিত হইয়াই পরাৎকর্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই তত্ত্বটিই ঘোষণা করিলেন—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

বলা বাহুল্য এই ব্রজেন্দ্রনন্দন তত্ত্বটি সম্যক্ উপলব্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্বটি বুঝা হইল না।

এখানে অদ্বয়জ্ঞান হইল—উদ্দেশ্য। আর ব্রজেন্দ্রনন্দন বিধেয়।—"উদ্দেশ্য করিয়ে তারে যেই বস্তু জ্ঞান।" আমরা অদ্বয়জ্ঞান বুঝিয়াছি, কিন্তু উহা যে ব্রজেন্দ্রনন্দন ইহা বুঝি নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন বেদান্তের এই উদ্দেশ্য অদ্বয়জ্ঞানটির তাৎপর্য্য নিজের ব্রজেন্দ্রনন্দনে পর্য্যবসিত করিয়া অসম্প্রদায়ী শ্রীবৈষ্ণবদের অসম্প্রদায়ীর কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

এই ব্রজেন্দ্রনন্দনতত্ত্বটিকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই বৈষ্ণবের সাধনভজন নামকীর্ত্তন ইষ্টগোষ্ঠী রস-আলাপন—সব কিছুই চূড়ান্ত সার্থকতা। কানু ছাড়া গীত নাই—ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ছাড়িয়া গান কীর্ত্তন পাঠ বৃথাকথা—ফুল বৃথাবাস মাত্র। সাধনার কোন্ স্তরে মনুষ্যত্ব হইতে পারিলে এই ব্রজেন্দ্রনন্দনতত্ত্বটি—এই মূর্ত্তিমানসাত্মীত ব্রহ্মানন্দপর্য্যন্ত পুঞ্জীকৃত রসবস্তু তদপ্যতীত জ্ঞাতাজ্ঞাতসর্ব্ববিরসাধনাতীত ভক্তকৃপাসাধ্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকর্ষিণী কক্ষিণীবীর্য্য করবৈকসাধ্য এই ব্রজেন্দ্রনন্দনতত্ত্বটি হৃদয়রূপে হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবেন—তার্কিকবন্ধুগণ তাহা অনুধাবন করুন।

গৌড়ীয়দর্শনাচার্য্য বলিয়াছেন—জ্ঞানস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহজ ধর্ম্ম থাকিলেও শ্রীত্যাশ্রয়তাই তাঁহার অন্তরঙ্গধর্ম্ম। একমাত্র শ্রীতিই হইল এই শ্রীত্যাশ্রয়কে পাইবার উপায়। তত্ত্ব মূল্যায়ণে সৌজন্যেরও—অর্থাৎ লাভের যা শ্রীতিই হইল তাহাকে পাইবার একমাত্র মূল্য। যাহার যে পরিমাণ শ্রীতিসম্পত্তি তাহার সেই পরিমাণেই এই আনন্দতত্ত্বের সাক্ষাৎকার সম্পত্তি লাভ। তাই এই শ্রীতি বা প্রেমকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন পঞ্চম পুরুষার্থ বা পরম পুরুষার্থরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এই প্রেমতত্ত্ব এক সুবিশাল পরমরহস্যের চিরকুহকের সন্ধান দান করে।

ক্বচিদ্বৃক্ষী গীতঃ ক্বচিদবিলম্বশ্রীশিশিরতা।
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যঃ ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাপানী করকলিতালীমৃগমদো।
হরীকান্যঃ বৃন্দং প্রথয়তি বৃথাবনমিদং।

ইহাই ব্রজভূমি। প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ব্রজভূমি বুঝিতে হইবে, ব্রজগোপী বুঝিতে হইবে, আর সর্ব্বোপরি গোপীযূথেশ্বরী বৃষভানুরাজার মহিষী বুঝিতে হইবে। সাধারণের বুদ্ধিগম্য নহে বলিয়াই তো প্রেমতত্ত্বকে এই চিরাৎ অবগুণ্ঠনবতী প্রেমসম্পত্তিকে প্রদান করিবার নিমিত্ত বহু অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে।

এই শক্তিস্বরূপা প্রেমসম্পত্তিটি অনর্পিতচরী হইলেও কিন্তু অন্য পদার্থ নহে; ইহা নিত্যসিদ্ধ।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদিশুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি নিত্যসিদ্ধই হইল, তবে ইহার স্বতঃপ্রকাশ নাই কেন? গৌড়ীয়দর্শন ইহার উত্তরে বুঝাইয়াছেন যে, বিস্মৃতরূপে অজ্ঞানই ইহার কারণ। বিস্মৃতরূপে অজ্ঞান ও সংসারদুঃখপ্রাপ্তির কারণ হইল আবার—পরতত্ত্বজ্ঞানাভাব।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।

রোগের কারণ নিবৃত্তি হইলেই যেমন রোগনিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ পরতত্ত্ব-জ্ঞানালোক বিরোহিত হইলেই বিশ্বরূপগত অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি, সঙ্গে সঙ্গে সংসার দুঃখেরও একান্ত নিবৃত্তি ঘটে।

কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিতে গেলে ইহাই দাঁড়াইল, এই যে জীবের অজ্ঞান ইহা ভগবদ্‌জ্ঞানেরই অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীব ভগবান্‌কে জানে না বলিয়াই নিজেকেও জানে না। সূর্য্য উদিত না হইলে কেহ নিজেকেও দেখিতে পায় না, ঘটপটাদি কোন বস্তুরই স্বরূপ দেখিতে পায় না। সূর্য্যালোকরূপ তমোনাশী মায়াতেই অভিভূত হইয়া থাকে। কিন্তু একবার সূর্য্যোদয় দেখিতে পাইলে আরও নিজেকে দেখিতে অথবা ঘটপটাদি নিখিলবস্তুরই স্বরূপ দেখিতে স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টার প্রয়োজনই হয় না; তদ্রূপ একবার শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে জ্ঞানের উদয় হইলেই জীব বিশ্বরূপ জানও লাভ করে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানও আপনি সিদ্ধ হয়।

আরও একটু সরল করিবার চেষ্টা করা যাক্—

জীবের নিজস্বরূপ উদ্বোধ না হইবার কারণ কি? না তাহার বৈমুখ্য দোষ। এ বৈমুখ্য দোষ কেন আসিল? যেহেতু সে মায়াযুক্ত। কেন সে মায়াযুক্ত হইল? যেহেতু সে অনাদি বহির্ম্মুখ। হইলই বা অনাদি বহির্ম্মুখ, তাহাতে মায়ার কি। অনাদিবহির্ম্মুখ মাত্রেরই উপর যে মায়ার অধিকার রহিয়াছে। এখন তাহা হইলে এ বৈমুখ্যদোষ কিরূপে দূর হইবে? যদি সে একবার কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে। অনাদিবহির্ম্মুখকে আবার কৃষ্ণোন্মুখ করিতে পারিবে কে? একমাত্র ভক্তিদেবী; কারণ তিনি যে—সাক্ষাদানন্দ বিগ্রহা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা। শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া জীবহৃদয়ে বসাইবার একমাত্র তাঁহারই এই অসাধারণীশক্তি আছে—অন্যান্য সাধনের এরূপ প্রত্যক্ষ শক্তি নাই। তবে এখন এই ভক্তিদেবীকেই বা কেমন করিয়া পাইব? একমাত্র সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রকৃপা হইতেই পাইবে। সে কৃপা পাইবার উপায়? তোমায় চিন্তা করিতে হইবে না; করুণাময় কৃষ্ণই জীবের এই বৈমুখ্যদোষ দূর করিয়া তাহাকে স্বচরণাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন।

মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃকৃষ্ণজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ-পুরাণ।

বেদ কি উপদেশ দিল?

"বেদ শাস্ত্রে উপদেশে—কৃষ্ণ একসার।"

ইহাতে জীবের কি জ্ঞান হইল—

"কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।"

এই জ্ঞানলাভ হইলেই তাহার নিত্যকৃষ্ণদাস স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে। সে বুঝিবে—প্রভুকে সেবা করাই তাহার স্বধর্ম্ম। সে বুঝিবে এই সেবানন্দে নিখিলভুবন ভরিয়া গিয়াছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভালবাসা-ভরা হৃদয় লইয়া প্রাণপ্রভুর প্রেমসেবা করিয়া ধন্য হইতেছে। ইহা বুঝিয়া নির্ম্মলচিত্তে তখন

'কৃষ্ণ তোমার হও' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার।
অকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়—সংসার যায় ক্ষয়।

সাধুসঙ্গে এ ভক্তিফল কবে কে পাইবে?

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীজ।

আর তখন একবার যদি হৃদয়ে এই ভক্তিলতা বীজটি উপ্ত হয়, তবে তো সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়াই গেল। এ লতা তো আর সামান্য নয়; ইহাকে অবলম্বন করিয়াই একদিন নিজের সেই আনন্দবৃন্দাবনের কুঞ্জদ্বারে শ্রীগুরুরূপা সখীর অনুগা হইয়া যুগলকিশোরের দর্শনলাভে ধন্য হইতে পারিবে—সেবার সহযোগিতার সঙ্কেতাদেশ পাইলে তো আর লাভের সীমা রহিল না।

যং প্রাপ্য চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অনুশীলন সেইদিন সার্থক হইবে—যেদিন ভাগ্যবান্ গোপবধূটীবীচিরঙ্গের রসলীলা আস্বাদনে উল্লসিত হইয়া বলিতে পারিবেন—

"আছে আছে এক ভুবন সুন্দর—গোপীসহস্রাবৃত কিশোরাকৃতি—
সে যে—

গোপবেশ বেণুকর নবকৈশোর নটবর

যাঁহার বেণুবাদনময়ী নির্ব্বাণবাসনাকে নির্ব্বাদিত করিতেছে—যে রূপনিধির সৌন্দর্য্যমাধুরী সন্দর্শন করিয়া অযুত অযুত গোপীবৃন্দের জীবনস্বত্ব বিকল হইয়া যাইতেছে—যাঁহার চরণে প্রণতজীবের আজ সর্ব্বাপবর্গের চূড়ান্ত সার্থকতা—সেই অখিলোদার কিশোরাকৃতি বস্তুটির চির জয় হউক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণরসায়ন সেই অপূর্ব্বশ্লোকে আজ আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রতিপাদ্যতত্ত্বের মহিমা ঘোষণা করি—

অস্তি স্বয়ঞ্চিদাস্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাম্বুভৃৎ।
যস্তু প্রস্তুতবেণুনাদলহরীনির্ব্বাণনির্ব্যাকুলঃ।
প্রত্যুদ্যন্নিবরুদ্ধগোপীবিলসদ্ গোপী সহস্রাবৃতঃ।
তদ্ভদ্রস্থলতাপবর্গমখিলোদারাং কিশোরাকৃতি॥

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাড়ার সব-চাইতে বড়লোকের মস্ত বড় বাড়িতে এই প্রথম পা দিলে রঙ্কু।

পরিমলেরা বড়লোক, কিন্তু কত বড়লোক সেটা ধারণা করবার জো ছিলনা এতদিন। বিচিত্র চেহারার একটা মস্তবড় ফটক—পরিমল পরে বলেছিল ওটা নাকি বানগড়ের নাগ-দরজার অনুকরণে তৈরী। দু'দিক থেকে দুটো মস্ত মস্ত সাপ উঠে মাথার ওপরে একসঙ্গে ফণা মিলিয়েছে—সেখানে কালো পাথরের একটা পদ্ম বসানো। চারদিকে ঢেউ খেলানো নীচু পাঁচিল, ভেতরে ফুলের বাগান। লাল সাদা গোলাপে, হলদেয়ে, বড় বড় ম্যাগ্নোলিয়ার আর নানা-রঙের অজস্র ক্রোটনে বাগান আলো হয়ে আছে। লাল সুরকির কালি কালি পথ, কোথাও ছায়াঘন কুঞ্জের ভেতরে দু'তিনটে বসবার বেঞ্চী। এককোণে সমান করে ছাঁটা চিকণ-সবুজ ঘাসের জমি, সেখানে খুঁটির সঙ্গে লোহার একটা সরু শেকল দিয়ে একটা চিতি হরিণ বাঁধা। পায়ের শব্দ পেতেই হরিণটা বড় বড় কান খাড়া করে সজাগ হয়ে উঠল, নাড়তে লাগল বেঁটে ল্যাজটা, তারপর আশ্চর্য সুন্দর দুটি গভীর নীল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

রঙ্কু বললে—চমৎকার বাগান ভাই তোদের। আর কী সুন্দর ওই হরিণটা!

পরিমল হেসে বললে, বাগানটা বাবার সখ, আর হরিণটা মিতার।

—মিতা! মিতা কে?

পরিমল বললে, মিতা আমার বোন। বাবার আবার সেকেলে নামের ওপর ঝোঁক আছে কিনা, তাই নাম দিয়েছেন সংঘমিত্রা। অতবড় নামের সংক্ষেপ হল মিতা।

মিতা! নামটি বড় মিষ্টি লাগল কানে। ওই সুন্দর হরিণটার সঙ্গে নামটির আশ্চর্য একটা যোগাযোগ আছে। কেন কে জানে, একবার মিতাকে দেখবার জন্যে একটা সংকুচিত ভীরু ইচ্ছা জাগল রঙ্কুর মনে।

পরিমল বললে, আমরা যখন ডুয়ার্সে বেড়াতে যাই, তখন মিতা বায়না ধরে হরিণের ছানাটা কিনেছিল। এখন দিব্যি বড় হয়েছে, পোষও মেনেছে। কিন্তু হলে কী হবে, দুরন্তপনার শেষ নেই। একবার ছাড়া পেলেই বাগানের ফুল-পাতা কিছু আর আস্তো রাখবেনা।

হরিণটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। নাড়তে লাগল ছোট ল্যাজটা, নীল চোখ দুটি থেকে যেন নিবিড় স্নেহ উছলে পড়তে লাগল। মনে হচ্ছিল—ওদের সব কথা সে বুঝতে পারছে, বোঝবার চেষ্টা করছে অন্তত।

পরিমল বললে, এখন আমি তোমার আদর করতে পারবনা, আমার অনেক কাজ—বুঝেচ? চল রঙ্কু, আমরা ভেতরে গিয়ে বসি।

ভারী সুন্দর বাড়ি—যেন ছবির মতো সাজানো। উজ্জ্বল তকতকে কালো রঙের মেজে, পা যেন পিছলে পড়তে চায়। এখানে ওখানে নানারকমের ছোটবড়ো পাথরের মূর্তি, বুদ্ধদেব, বাসুদেব এই সব। পরিমলের বাবার খেয়াল। দু-পা এগোতেই মস্ত বড় একটা হলঘর, ওদের ড্রয়িংরুম।

ঘরটায় ঢুকে বিহ্বলভাবে চারদিকে তাকালে রঙ্কু। আকাশী নীলরঙের দেওয়ালে বড় বড় ছবি। চারদিকে নানা আকারের বসবার আসন—সোফা, সেটি, কাউচ। ছোট বড় টেবিলে ব্রোঞ্জের মূর্তি; দুটো ফুলকাটা কাচের ফুলদানীতে একগুচ্ছ টাটকা গোলাপ ফুল, দেখা যায়না, অথচ কোথা থেকে মিষ্টি ধূপের গন্ধ এসে ঘরটাকে ভরে রেখেছে। হঠাৎ রঙ্কু নিজেকে অত্যন্ত অপ্রতিভ মনে করতে লাগল, যেন এমন একটা জায়গাতে এসে পা দিয়েছে যেখানে তার আসা উচিত ছিলনা।

পরিমল বললে, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? ওপরে আয়—

—ওপরে?

—হাঁ, আমার পড়বার ঘরে।

ভীরু পায়ে অগ্রসর হল রঞ্জু। অস্বস্তি লাগছে—পরিমলের ঐশ্বর্য পীড়া দিচ্ছে ওকে। ভোনা, খাঁদু, পূর্ণকে যদি ওর ভালো লাগে, তা হলে এ জগৎটাও ওর জন্যে নয়। রঞ্জুর মনে হতে লাগল এ বাড়িটা থেকে বাইরে না বেরুনো পর্যন্ত যেন ও বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারবেনা।

হলঘরের কোণা দিয়ে লাল ঝকঝকে সিঁড়ি। এত পরিষ্কার যে কল্পনাও করা যায়না। ওই সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠতে হবে? কী আছে ওপরে, কী আশ্চর্য রহস্য আছে সেখানে। সাবধানে পা ফেলে ফেলে উঠতে লাগল রঞ্জু। ভয় করছে, আশঙ্কা হচ্ছে। তার ময়লা পায়ের ছোঁয়া লেগে এমন চমৎকার সিঁড়িটা হয়তো বা নোংরা হয়ে যাবে।

ওপরে ওঠে ডুপা এগোলেই পরিমলের পড়বার ঘর। কাচের দরজা ঠেলে পরিমল ডাকলে, আয় রঞ্জু, বোস।

পড়বার ঘরই বটে। ছোট্ট ঘর, কিন্তু নিখুঁত সুন্দরভাবে গোছানো। সামনেই মস্ত বড় খোলা জানলা, তাই দিয়ে চমৎকার দেখা যায় নাচে ওদের বাগানটাকে, মিউনিসিপ্যালিটির রাঙা সুরকির রাস্তাটাকে, তার ওপারে ছোট ছোট বাড়িগুলোকে পর্যন্ত। সেই নারকেল গাছগুলোর ডুলুনি বয়ে শির শির করে মিঠে হাওয়া ঢুকছে ঘরে। জানালা ঘেঁষে বড় একটা লম্বা টেবিল, কয়েকখানা ঝকঝকে বই তার ওপরে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো; দোয়াত দানি, কলম পেন্‌সিল, ব্লটিং প্যাড। দুখানা গদী আঁটা চেয়ার, কর্সা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। ঘরের তিন দিকে আলমারি—রকমারি অজস্র বইতে একেবারে ঠাসা। একটা ছোট কাঠের ট্যাংএর উপরে রূপোর ফ্রেমে আঁটা দুখানি ছবি; একখানা রঞ্জু চিনল—রবীন্দ্রনাথ; আর একখানা পরিমল পরে বলে দিয়েছিল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পরিমল বললে, এই হল আমার পড়বার ঘর। ঠিক আমার নয়—আমাদের দুজনের—আমার আর মিতার। এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বোস, বাড়ির কেউ এদিকে আসবেনা।

ইতস্তত করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রঞ্জু। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা আধখানা প্রায় নীচের দিকে টেনে নিলে তাকে—ভয় করতে লাগল ছিঁড়ে একেবারে পড়ে না যায়। কিন্তু সহজ বুদ্ধিটা তাকে বলে দিলে এটা স্প্রিংয়ের চেয়ার, এদের ধরণই এই রকম।

পরিমল বললে, দাঁড়া, তা হলে একটু চায়ের জোগাড় করি।

—চা?

—হ্যাঁ, একটু চা না হলে জমবে কী করে?

—কিন্তু ভাই, চা তো আমি বিশেষ খাই না।

—এক কাপ খেলে তো কোনো ক্ষতি নেই। বোস, আমি দু মিনিটের মধ্যেই আসছি—

হরিণের চামড়ার চটিটার শব্দ করে বেরিয়ে গেল পরিমল।

রঞ্জু বসে রইল অভিভূত হয়ে। জলের মাছ ডাঙায় উঠে আসবার মতো কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে তার। নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন আর বিব্রত বোধ হচ্ছে। অসীম আশঙ্কা ভরে রঞ্জু ভাবতে লাগল, এখন যদি এ ঘরে এসে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসেকেউ যে সে কে এবং কেন এসেছে—তা হলে তার অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে। তার মুখে কথা আটকে আসবে—উত্তর জোগাবে না, তারপর আত্মরক্ষার জন্যে মরীয়া হয়ে সামনের জানালাটা দিয়ে সোজা নীচের বাগানটায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে তাকে।

রঞ্জু টের পেলে বাইরে থেকে এত বেশি হাওয়া আসছে বটে, তবু তার জামাটা ভিজে উঠেছে ঘামে, তার কপাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে দু ফোঁটা ঘাম। নিরুপায় হয়ে নিজেকে সে সামলে নেবার চেষ্টা করলে খানিকটা, তারপর ওই বিশ্রী চিন্তাটার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে প্রথমটা কড়িকাঠে, তারপরে চোখ বুলোতে লাগল দেয়ালের গায়ে।

এখানেও ছবি, এখানেও দেওয়ালে খানকয়েক বড় করে টাঙানো। সব চাইতে বড় ছবিখানা অয়েল-পেন্টিং—টকটকে চওড়া লালপেড়ে শাড়ীপরা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা ভারী সুন্দর চেহারার একটি মহিলা। রঞ্জুর দিকে যেন নিবিড় স্নেহভরে তাকিয়ে আছেন তিনি। ছবিটার ওপরে এক ছড়া শুকনো মালা দুলছে। পরিমলের মা নেই শুনেছিল, বোধ করি ইনিই মা। তা ছাড়া আরো

খানতিনেক ছবি আছে, কিন্তু সে সব অপরিচিত মুখ, রঞ্জু তাদের কাউকে চিনতে পারল না।

দেওয়াল থেকে চোখ নামিয়ে টেবিলের দিকে মনোনিবেশ করলে সে। ভীরু হাতে একটা বই টেনে নিতেই নিজের অজ্ঞাতসারে সে খুশি হয়ে উঠল—বাঃ, খাসা বই। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'।

প্রথম পাতাটা ওলটাতেই চোখে পড়ল মুক্তোর মতো সুন্দর অক্ষরে বইয়ের মালিকের নাম লেখা: কুমারী সংঘমিত্রা লাহিড়ী। সংক্ষিপ্ত 'মিতা' নামটি, সোণা হরিণটা আর এই সুন্দর হাতের লেখা—সব যেমন হওয়া উচিত তেমনি। খারাপ হাতের লেখা দেখতে পারে না রঞ্জু, কেমন নোংরা মনে হয়—শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায় মানুষের ওপরে। কিন্তু 'মিতা' তাকে নিরাশ করেনি।

রঞ্জু পাতা ওলটাতে লাগল, তারপর এক জায়গায় গিয়ে দুষ্টুমি যেন শতগুণ তার। লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে ভারী সুন্দর করে দাগানো একটা কবিতা, খুব মন দিয়ে মিতা সেটা পড়েছে। কবিতাটার নাম "গুরুগোবিন্দ।"

গুরুগোবিন্দের নামটা জানা আছে ইতিহাসের পাতায়, কিন্তু সে মানুষটিকে নিয়ে এমন কী কবিতা লেখা সম্ভব—যা এত করে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়তে হবে?

রঞ্জু আকৃষ্ট হল কবিতাটার দিকে। কিন্তু লাইন কয়েক পড়তেই কবিতাটার সুর আর ছন্দ তার রক্তের মধ্যে যেন দোলা ধরিয়ে দিলে। কী আশ্চর্য, কী অপূর্ব উজ্জ্বল কবিতা। কেন সে এতদিন এমন একটা কবিতা পড়তে পারেনি! গুন্ গুন্ করে রঞ্জু দাগানো লাইনগুলো পড়ে যেতে লাগল:

"হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে তব তূণী,
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজা ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে
অত্যাচারের পথে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি—"

নিজেই সে বুঝতে পারল না, কবিতার দ্রুত গতির সঙ্গে সঙ্গে কখন তার অপরিচিত পরিবেশের ভয় কেটে গেছে, মন থেকে মুছে গেছে অনধিকারের সংশয়। তার গলার স্বর ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগল:

তুরন্ত সম অন্ধ-নিয়তি
বন্ধন করি তায়,
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন করে
সমরের পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়—"

পেছন থেকে হাসিভরা মুখে পরিমল বললে, বাঃ, কবি যে একেবারে ভাবের রাজ্যে তলিয়ে গেলি দেখছি।

চটকা ভেঙে গেল রঞ্জুর। মুহূর্তের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সে সজাগ হয়ে উঠল। মনে হল অপরাধ করে ফেলেছে, মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে অনধিকার-চর্চার অপরাধ। সসংকোচে বইটা বন্ধ করে সে সরিয়ে রাখল, একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে বললে, এই—একটু দেখছিলাম।

পরিমল হাসল, পাশের চেয়ারটাতে বসল এসে। বললে, কী বই পড়ছিলি? কথা ও কাহিনী?

মঞ্জু মাথা নাড়ল।

—ঠিক ধরেছি, নিশ্চয় কবি তুই। তাই কবিতার বইয়ের ওপরে এত ঝোঁক—নিজের আবিষ্কারের আনন্দে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল পরিমল।

—বাঃ বাজে কথা—লজ্জায় রঞ্জু আরক্তিম হয়ে উঠল।

—কিন্তু বরাত ভালো, এবারেও পরিমল নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা বদলে দিলে। বললে, বলে এলাম, এক্ষুণি চা আসবে। আচ্ছা, দেওয়ালের ওই ছবিগুলোকে চিনতে পারিস?

—উনি বোধ হয় তোর মা।

—ঠিক ধরেছিস। আর ওগুলো?

—চিনতে পারলাম না।

—তোর দোষ নেই ভাই, দেশের দুর্ভাগ্য। সমস্ত ভারতবর্ষের সত্যিকারের গৌরব, তাঁদের ভুলে যাওয়াই আমাদের রেওয়াজ।

—কিন্তু ওঁরা কারা পরিমল।

পরিমল মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলল: আর একদিন বলব, আজ থাক।

আজ থাক। এ কথাটা আরো দু-একবার রঞ্জু শুনেছে ওর মুখে। প্রথম বোধ হয় বলেছিল সেই নিরালা কাঞ্চননদীর ধারে। কী একটা জিনিস একান্তভাবে

বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না ; কোথায় আটকে যাচ্ছে—কোথা থেকে একটা সংকোচ এসে বাধা দিচ্ছে তাকে। কী এমন একটা কথা, কিসের জন্যে এত সংকোচ পরিমলের ? একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল রঞ্জুর—কিন্তু কী যে হয়েছে পরিমলের ছোঁয়া লেগে, ওরও কথা আটকে এল।

ভালো লাগছে না রঞ্জুর, কেমন বিরক্তি লাগছে একটা। কাছে থেকেও কাছে নেই পরিমল—চোখের দৃষ্টিতে ঘনিয়ে আছে দূরাগত একটা অন্যমনস্কতা। কী যেন ভাবছে, অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভাবছে। অথচ সে ভাবটাকে অনুমানও করবার ক্ষমতা নেই রঞ্জুর—সে ভাবনার সে অংশও নিতে পারবে না। একেবারে পাশটিতে বসে-থাকা মানুষের সঙ্গেও মনের হাজার মাইল জোড়া যে দুস্তর ব্যবধান ছড়িয়ে থাকে তার পরিচয় রঞ্জু পেলো এই প্রথম।

এ ভাবে চুপ করে আর বসে থাকা চলে না। রঞ্জু বললে, কই, বই দিবিনা ?

—হাঁ, দিচ্ছি—

পরিমল উঠল। রঞ্জু আশা করেছিল বড় একটা আলমারীর ভেতর থেকে একরাশ ঝকঝকে বই বার করে আনবে ও। কিন্তু তা করলনা পরিমল। ঘরের এক কোণে একটা সেলফ—সেখানে একরাশ মাসিকপত্র আর খবরের কাগজে ডাঁই হচ্ছে, সেই স্তূপ ঘেঁটে খবরের কাগজের প্যাকেট বের করলে একটা। রঞ্জু বিস্মিত হয়ে গেল।

—দেখি, কী বই ?

—একটু পরে।—প্যাকেটটা কোলের ওপর নিয়ে পরিমল মিনিটখানেক চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বললে, আচ্ছা রঞ্জু !

—কী ?

—সত্যিই কি বিশ্বাস করিস্ অহিংসা দিয়ে স্বাধীনতা আসবে ?

রঞ্জু হাসল : আবার ও কথা তুলছ কেন ?

—না, এমনি।—পরিমল আবার চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত : আচ্ছা, তুই বিপ্লববাদীদের কথা শুনেছিস কখনো ?

—শুনেছি বইকি।—রঞ্জু সোৎসাহে বললে, তারাই বোমা ছুঁড়ছে, গুলি করছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে। ভয়ঙ্কর লোক সব—শৈশবের সংস্কারে কল করে বুক দিয়ে বেরিয়ে গেল : নিশ্চয় ক্ষুদিরামের দল।

পরিমল হঠাৎ নড়ে চড়ে বসল চেয়ারটাতে, কেমন অদ্ভুতভাবে তাকালো রঞ্জুর দিকে।

—খুব ভয়ঙ্কর লোক ওরা, না ?

—নিশ্চয়, কোনো সন্দেহ আছে ? যারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে গুলি মারতে পারে, অসাধ্য কাজ আছে তাদের ?

পরিমল ঠোঁটে আঙুল দিলে। স্-স্-স্—আস্তে।

কাচের দরজা ঠেলে একটা চাকর ঢুকল। বাক্সের ডালার মতো একটা কাঠের পাত্র করে (পরে জেনেছিল ওকেই ট্রে বলে) দু পেয়ালা চা আর দু রেকাবী খাবার এনে রাখল টেবিলের ওপরে।

—সে রঞ্জু।

—সেকিরে, এত খাবার কেন ? না, না, ওসব আমি খাব না।

—আচ্ছা লাজুক ছেলে তো তুই। খাবার নিয়ে কখনো লজ্জা করতে আছে রে বোকা ! পাওয়া মাত্র মুখে পুরে দিতে হয়—এই হচ্ছে বুদ্ধিমানের নিয়ম। নে, নে, চট্‌পট—

থালায় লুচি, মিষ্টি, আলু আর বেগুন ভাজা। দোনালি ফুল-পাতা আঁকা নীল রঙের পেয়ালাতে দোনালি রঙের চা। খাওয়ার চাইতে দেখতেই যেন বেশি ভালো লাগে।

—কেন আবার এত সব—

বাধা দিলে পরিমল : মিতা পাঠিয়ে দিয়েছে, আমার কিছু বলবার নেই।

মিতা ! কী সুন্দর নাম। আদর করে যেন বারবার নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করে। রঞ্জুর চমৎকার লাগল লুচিগুলো, অনভ্যস্তভাবে চায়ে চুমুক দিয়ে জিভ একটু পুড়ে গেল বটে, তবু সে চায়ের স্বাদ এত ভালো লাগল বলবার নয়।

নিঃশব্দে খাওয়া শেষ হল। একটু পরেই চাকরটা এসে যখন পেয়ালা পিরিচগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল, তখন আবার পুরোনো কথার খেই ধরলে পরিমল।

—তুই যেন কী একটা কথা বলছিলি ? ক্ষুদিরামের দল ?

রঞ্জু অপ্রতিভভাবে বললে, তাইতো শুনেছি।

—জানিস, কে ক্ষুদিরাম ?

—রঘু বিব্রত বোধ করতে লাগল, শুনেছি অল্প অল্প।

—কী শুনেছিস্?—তেমনি বিচিত্র ধরণে রঘুর মুখের দিকে পরিমল তাকিয়ে রইল।

—শুনেছি—সন্দিগ্ধভাবে পরিমলের মুখভাবটা লক্ষ্য করে রঘু বললে, মাটির তলায় তার কামানের কারখানা আছে।

—আর?

—আর—রঘু একটা ঢোক গিললে: ক্ষুদিরাম লাটসাহেবকে মারতে চেষ্টা করেছিল।

হঠাৎ শব্দ করে সকৌতুকে পরিমল হেসে উঠল।

কেমন যেন একটা চমক লাগল রঘুর। বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার একটা কথা। ক্ষুদিরামের আলোচনা প্রসঙ্গে এমনি করেই সেদিন অবনীবাবু হেসে উঠেছিলেন। আজ পরিমলের কণ্ঠে যেন তাঁরই সেই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল।

হাসি বন্ধ করলে পরিমল। তারপর শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, তুই ভুল শুনেছিস রঘু।

কোথাও একটা ভুল আছে এটা রঘু নিজেও অনুমান করেছিল। ক্ষীণভাবে বললে, তবে যে বৈরাগী গাইছিল—

—বৈরাগী?—পরিমল আবার হাসল, কিন্তু এবারে নিঃশব্দে।

রঘু অভিভূত হয়ে আসছিল। আস্তে আস্তে বললে, তুমি জানো কিছু ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে?

—জানি।

—জানো?—রঘুর শরীরটা শির শির করে উঠল। সুস্থ কল্পনার একটা অন্ধকার সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে এতদিন পরে কূল দেখতে পেয়েছে যেন। উদগ্র আকুলতার একটা তরঙ্গ এসে তার বুকের পাঁজরায় উচ্ছ্বসিত আবেগে ঘা দিতে লাগল: কী জানো তুমি?

—অনেক কথাই জানি। তুই জানতে চাস?

রঘু মাথা নাড়ল। কথা বলবার শক্তি নেই তার।

পরিমল খবরের কাগজের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। চাপা গলায় বললে, ক্ষুদিরামের কথা আমি নিজে কিছু বলবনা, এই বইগুলোই বলবে। কিন্তু একটা কথা আছে রঘু।

—কী কথা ভাই?

—বইগুলো লুকিয়ে রাখতে হবে—লুকিয়ে পড়তে হবে, লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

—কেন?—রঘুর মুখে ভয়ের রেখা দেখা দিলে।

—কেন?—পরিমল কঠিনভাবে বললে, যারা আমাদের গলা টিপে রাখতে চায়, তারা যে ওদের পরিচয় আমাদের জানতে দেবে না ভাই।

রঘু হতাশভাবে বললে, তোর কথা কিছু বুঝতে পারছি না পরিমল।

—বইগুলো পড়লেই বুঝতে পারবি। পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবীর পরিচয়ই যে প্রথম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসে। দুর্যোগের ভেতরে তারা আমাদের হাত বাড়িয়ে দেয় স্বাধীনতার আলোর এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

সুন্দর ভাবে, যেন ছাপার অক্ষরে সাজিয়ে কথাগুলো বলে গেল পরিমল। আর ওদিকে আবার একটা তীব্র বিদ্যুৎতরঙ্গ চমকে উঠল রঘুর শরীরের মধ্যে।

—বিপ্লবী!

—হাঁ বিপ্লবী। আর সেই শহীদদের প্রথম অগ্রদূত ক্ষুদিরাম।

রঘু বিহ্বলভাবে বলে ফেলল: তুমি কি বিপ্লবীদের দেখেছ পরিমল? চেনো তাদের?

—আচ্ছা ছেলেমানুষ তুই রঘু!—পরিমল যেন লঘু কৌতুকে আবার সহজ হয়ে উঠল: তারা সব ভয়ঙ্কর লোক, আমি নিরীহ জীব, তাদের চিনব কী করে? তবে তুই যদি চিনতে চাস ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—আমি!

—হ্যাঁ, তুই। ভয় কি, তারা বাঘভালুক নয়। তারাও আমাদের মতোই সহজ মানুষ—শুধু তাদের মনটা বজ্র দিয়ে গড়া। আমাদের পাশে পাশেই তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা তাদের চিনতে পারি না!—পরিমল যেন সামলে নিলে নিজেকে: যাক সে ও সমস্ত বাজে কথা এখন থাক। চল, বইগুলো তোর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্যাকেটটা ততক্ষণে পরিমল লুকিয়ে নিয়েছে জামার নীচে। দুজনে উঠে পড়ল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে, হলঘর পেরিয়ে আবার বাগানে চলে এল।

আর সেইখানেই দেখা হল মিতার সঙ্গে।

চকল পায়ে বাগানের মধ্যে ছুটোছুটি করছিল, বোধ হয় প্রজাপতির সন্ধানে। ওদের কথাবার্তার শব্দে ফিরে তাকালো।

তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে, অর্থাৎ বয়সে রঙ্কুর সমান হবে। উজ্জ্বল টকটকে রং, কপালে কাঁচপোকার সবুজ টীপ, পরণে ডুরে-পাড় শাড়ী। আশ্চর্য সুকুমার আর শান্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়েছিল মেয়েটি।

পরিমল বললে—মিতা, এ আমার বন্ধু রঙ্কু—রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

দুখানি সুন্দর হাত কপালে ঠেকিয়ে স্নিগ্ধ কোমল স্বরে মিতা বললে, নমস্কার।

নমস্কার। রঙ্কু নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তাকেও কেউ কোনোদিন দুহাত তুলে নমস্কার জানাবে—ছোট্ট, ভীরু রঙ্কু একদিন নমস্কার পাওয়ার মতো বড় হয়ে উঠবে, একথা কি কখনো কোনো কল্পনাতেও ছিল তার। প্রতি-নমস্কার করল না রঙ্কু, শুধু অর্থহীনভাবে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করে দ্রুত ফটকটার বাইরে চলে গেল।

পরিমল বললে, কি রে, অমন করে দৌড়ে পালাচ্ছিস্ যে? ভয় পেলি নাকি? দাঁড়া, দাঁড়া, আমিও আসছি—

পেছন থেকে রঙ্কু শুনতে পেল—মিতার মিষ্টি খিল্ খিল্ হাসির শব্দে সমস্ত বাগানটা ভরে উঠেছে। তার পালানোটা ভারী উপভোগ করেছে সে।

সেই প্রথম। সেই হাসির শব্দই বালক রঙ্কুকে হঠাৎ জাগিয়ে দিলে কৈশোরের স্বপ্নলোকের মধ্যে। ম্যাগ্নোলিয়া আর গোলাপের গন্ধে মাতাল এক ঝলক বাতাসে একটা নতুন চেতনার চকলতা জেগে উঠল মনে।

বাল্য থেকে কৈশোরে। কল্পনার রূপকথা থেকে জীবনের রূপকথায়। সেই প্রথম নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্কুর কথা শেষ হল, সুরু হয়ে গেল রঞ্জনের কাহিনী।

(ক্রমশঃ)

মৌনী-বাবা

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এম-এ

নবীয়া জেলার আমুদিয়া একটি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে শিবনাথ ঘোষ নামে এক পরমভক্ত সদ্গোপ বাস করিতেন। শিবনাথের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ প্যারীলাল ও কনিষ্ঠ কুঞ্জলাল। সদ্গোপ-প্রবরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্যারীলাল ঘোষই উত্তরকালে মৌনী-বাবা বলিয়া পরিচিত হন।

প্যারীলালের জন্ম হয় ইং ১৮৫৩ সালে। পিতা শিবনাথ কর্ম-ব্যপদেশে পাবনা-শহরে বসবাস করিতেন। প্যারীলালও তখনকার থাকিয়া পাবনার জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। বাল্য হইতেই প্যারী-লালের হৃদয়ে ধর্মবীজ উপ্ত হইয়াছিল, পাঠদশাতেই বিদ্যালয়ের এক ব্রাহ্ম শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় প্যারীলালের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের যাবতীয় ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইল। দরিদ্রের সংসার, দিন চলা ভার। তাহার উপর কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিল। সব দিক চিন্তা করিয়া প্যারীলাল জলপাইগুড়ির এক মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করিয়া পরিবারের ভরণ-পোষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর তিনি রংপুর জেলার গোপালপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়েরও প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া বিশেষ খ্যাতির সহিত কর্মপরিচালনা করিয়া থাকেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর তাঁহার মনে পুনরায় বৈরাগ্যের উদয় হইল। সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্মের পর তিনি অধিকাংশ সময় ভজনানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, আহারাদির সংযম-রক্ষা এবং ব্রত উপবাসে মনঃসংযোগ করিলেন। বাদশ বৎসর-কাল তিনি এইরূপে সংসারে থাকিয়াও সংসার-বিলিপ্তভাবে অতিবাহিত করিলেন। সংসার-আশ্রমে বাস করিবার সময় তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। প্যারীলাল যখন সংসারে থাকিয়াও তাহার সহিত সমস্ত সংস্রব এড়াইয়া চলিয়াছেন, তখন একদিন তাঁহার সুযোগ্য সহধর্মিণী তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক অমর-ধামের যাত্রী হইলেন। কনিষ্ঠ কুঞ্জলাল তখন পাঠ সমাপনান্তর উপার্জনক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন। প্যারীলাল দেখিলেন, কুঞ্জলাল যখন উপার্জন করিতে শিখিয়াছে তখন সংসার-প্রতিপালনের ভার তাঁহার চিন্তা কি? তিনি কনিষ্ঠের উপর সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া পরমানন্দে ঘরের বাহির আসিয়া দাঁড়াইলেন। এতদিনে প্যারীলাল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি যে পথের সন্ধান করিতেছিলেন, আজ তাহার দর্শন মিলিয়াছে।

সংসারাশ্রম ছাড়িয়া প্রথমে তিনি যোগাভ্যাস মানসে চিত্রকূট পর্বতে গমন করেন। তিন বৎসর চিত্রকূটে অবস্থান করিয়া তিনি বোম্বাই

প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত খাজোয়া জেলার ওয়াহাবাদ পর্ব্বতে গমন করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। লক্ষ্মীনারায়ণ শেঠ নামে এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার জন্য ওয়াহাবাদ পর্ব্বত-গাত্রে একটি গুহা প্রস্তুত করিয়া দেন। প্যারীলাল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তপস্যায় রত হন। বহুদিবস একাদিক্রমে গুহার মধ্যে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে থাকেন, ক্ষুধা-পিপাসা, এমন কি প্রাণ ধারণের বেগও তাঁহাকে সে-সময়ে ধর্ম্মচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময় তিনি মৌন অবস্থায় অতিবাহিত করিতেন বলিয়া তদবধিকালে তিনি মৌনী-বাবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তদ্‌পর তাঁহার ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম উপস্থিত হইলে তিনি যোগদ্বারা এ সময় জগতের পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনোচিত ধামে গমন করেন। ওয়াহাবাদের মোহন্ত মহারাজ বলিয়াছেন,—"মৌনীবাবার মত সাধু আমি একজনও দেখি নাই।"

এই সেই নর্ম্মদার পূত-সন্তান, এই সেই মৌনীবাবা—মহান্ এবং সুন্দর, সৌম্যতা মহত্বের অপূর্ব্ব মিলন মাধুরী মণ্ডিত শ্রেষ্ঠ সাধক-প্রবর —এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়া অন্তরবাসের জন্য এক অন্তরীন আবাসগৃহ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।

নীতি-শাসন

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

খোরতর নীতিবাগীশ : দেখ, লোকটা পালিয়ে চিঠি লিখেছে, সে আমায় খুন করতে চায়। খামের ওপর মিশি দিয়ে লেখা আছে—খপাট্যা ও গোপনীয়। এখন কি করা যায় বলত?

অবসরপ্রাপ্ত পাসেব-পন্থী—পেনসন-জোগী : চিঠিটা যখন খপাট্যা ও গোপনীয় তখন তো পুলিসের আশ্রয় নেওয়া চল্‌বে না। ডিসিপ্লিন মানতে হ'লে, আমার মতে, খুন হওয়া ছাড়া তো অন্য কোন উপায় দেখছি না।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

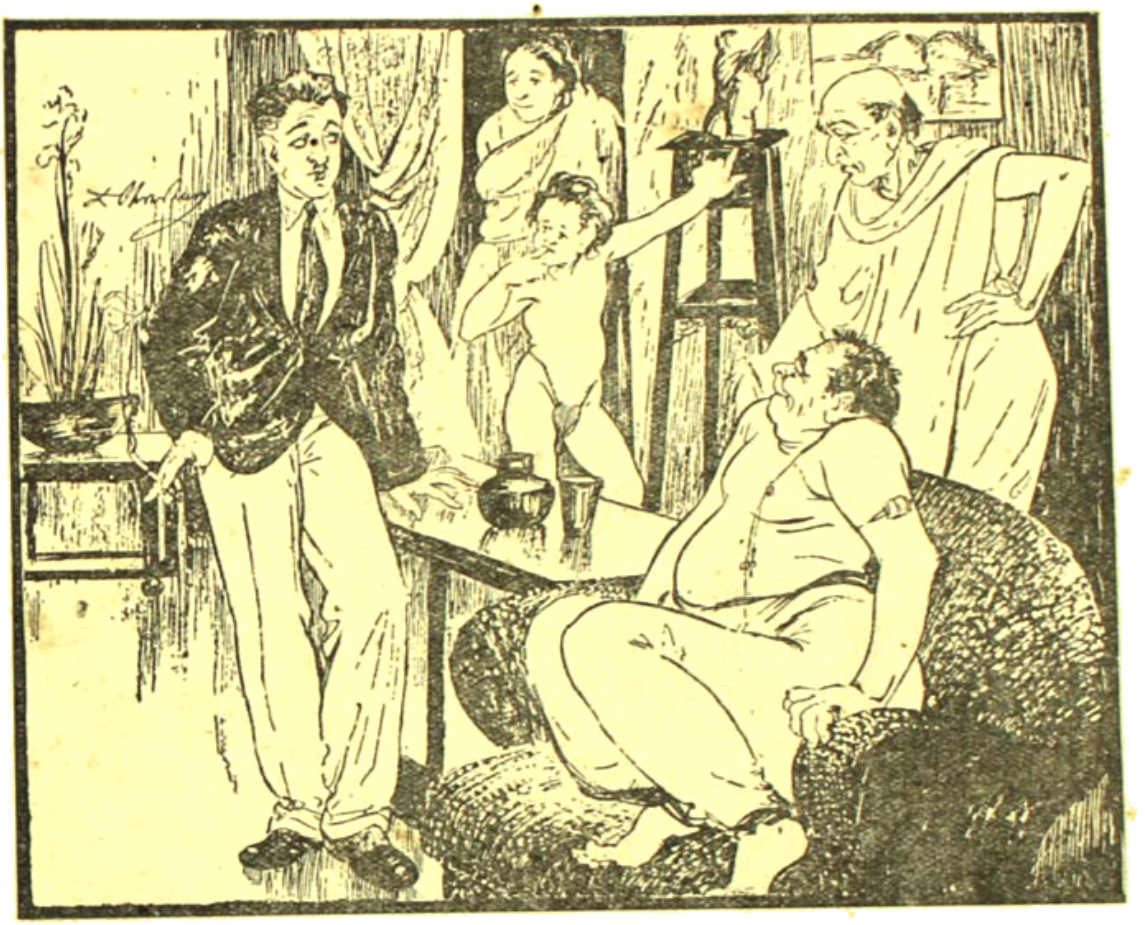

প্রথম আত্মীয় : তোমার ড্রাইভার আর একটা গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে আমার কোমরটা দিলে জখম করে।

দ্বিতীয় আত্মীয় : (প্রসাধনযুক্ত মুখমণ্ডল চোখের রুমাল প্রদান করিয়া) তোমার বসবার জায়গাটা বড় মজার, নীচ থেকে খোলা যায়, এই দেখনা (পুনরায় রুমাল প্রদান)

তৃতীয় (মহিলা) : রাস্তার মাঝে পরী থাকে, কোথাও শুনিনি বাপু, চলা ফেরার অসুবিধা হচ্ছিল, গুটিয়ে রেখেছি কিছু মনে কোরো না।

চতুর্থ আত্মীয় : (ছোট ছেলে, তার প্যান্টের মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) তোমার পুতুল পড়লেই ছেড়ে যায়—ঐ দেখনা কি হয়েছে।

গৃহকর্ত্তা : আপনারা তা হোলে ত বেজায় অসুবিধায় পড়েছেন দেখছি।

প্রথম আত্মীয় : তবু কিছুদিন থাকতে হবে। প্রাণের ভয় আর তাকে বলে, চিন্তা করতে এসে কি নাজালেই বা পড়া গেল। কোমরটা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত বাপু ভাক্তারের ফি-টা তুমিই দিয়ে দিয়ো। হিসেবনিকেশ আমার ঠিক তেমন আসে না।

গান

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমি চ'লে যাবো তবে,
তোমার পৃথিবী এমনি রঙীন রবে ?
ভোরের আলোয় তেমনি ফুটিবে ফুল
পাতায় পাতায় শিশির কোঁটার দুল,
অতীতের কথা হ'য়ে যাবে ভুল···
আমি যে গিয়াছি কবে ?

তুমি ত দাঁড়ায়ে রবে না দ্বারে
চির বিদায় বেলা বিদায় তারে,
অশ্রু সজল হবে না হারে
তাই ত কাঁদিতে হবে।

বিভ্রম

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

ভদ্রলোকের নাম ছিল উইলিয়াম। ব-সহরের প্রধান ধর্মযাজক তিনি। সাধারণ লোকে তাঁকে ফাদার উইলিয়াম বলে জানে। দীর্ঘ ঋজু তাঁর দেহ—উদার সরল তাঁর হাবভাব চালচলন। বয়স তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি—হয়ত বা দুবছর এদিকে, না হয় ওদিকে। লোকটি ভদ্র, শান্ত, মিতুক এবং তার ওপরে সদালাপী। আরো অনেক গুণ আছে ভদ্রলোকের; কিন্তু গুরুতর রকমের খুঁৎ একটা আছে, যার জন্য অনেক তাঁর গুণই চাপা পড়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক অন্ধ—দু চোখের কোনটাতেই কিছু দেখতে পান না তিনি। অবশ্য চিরদিন তিনি এমন ছিলেন না—একদিন চোখে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল, কিন্তু বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই বেচারি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন। চিকিৎসা রীতিমতই হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ সুফল হয়নি তাতে।

অন্ধ হলেও কিন্তু যাজকের কাজ তাঁর চলছিল। সহরের অনেকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং প্রায় সকলেই তাঁকে খাতির করতেন। তার ওপরে গোটা বাইবেলটা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এবং ধর্মের কথা নিয়ে যিনিই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনিই চমৎকৃত হয়ে গিয়েছেন—ভদ্রলোকের গভীর চিন্তাশীলতা এবং শান্ত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে। অন্ধ হওয়ার পরেও তাই তাঁর চাকরি বজায় থেকে গেল।

কিন্তু চাকরি বজায় রাখা দিনে দিনে শক্ত হয়ে উঠছিল ভদ্রলোকের পক্ষে। অনেক পড়ে শুনে ভেবে চিন্তে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ভগবান বলে কেউ কোথাও নেই এবং যাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর বলে জানি, আসলে তিনি মানুষেরই মনের সৃষ্টি। নিজের সেই নাস্তিক ভাব কিন্তু ভদ্রলোককে তাঁর নিজের মধ্যেই গোপন রাখতে হত—মুখ ফুটে বলতে সাহস পেতেন না তিনি কথাটা কাকেও। কারণ হিসাবমত তিনিই ছিলেন ভগবানের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। তাঁর পক্ষে ভগবানকে অস্বীকার করার মানে অন্যের সম্পর্কে নিজের তাঁর প্রয়োজনকেই মিথ্যা করে দেওয়া। অত্যন্ত সাবধানে আত্মগোপন করে চলতে হত তাঁকে, যাতে তাঁর কথাবার্তায় আচারে-আচরণে কেউ যেন তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে কোন সন্দেহ করতে না পারে। সে সন্দেহ হয়ত কেউ করেনি—কেউ হয়ত করেও থাকতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, নিজের আচরণের সেই লুকোচুরির জন্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন ভদ্রলোক দিনে দিনে তিলে তিলে। সময়ে সময়ে এমনও তাঁর মনে হত যে সেইভাবে জীবনযাপন করার মানে নিজেকে ও অন্য সকলকে প্রবঞ্চনা করা—ভুল বোঝানো—ঠকানো। যে ভগবানকে নিজের মনে তিনি মানতে পারেন না সেই ভগবানেরই কাছে সকলের হয়ে তিনি প্রার্থনা করেন—আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন সকলের জন্য? সেই ভণ্ডামি অসহ্য হয়ে উঠছিল তাঁর নিজের পক্ষে এবং এমনও তিনি মনে করছিলেন যে যাজকতার সেই কাজ তিনি ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু মুশকিল সে পক্ষেও। চাকরি ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই কিছু শক্ত ব্যাপার ছিল না—শক্ত হবে বুঝছিলেন ভদ্রলোক, চাকরি ছাড়ার পরে বেঁচে থাকা। কি করে অতঃপর তিনি নিজেদের জীবিকা সংগ্রহ করবেন? কোন কাজই ত তিনি করতে পারবেন না। সে অবস্থায় কি খেয়ে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বাঁচবেন? বহুদিনের অভ্যাস বলেই ঐ যাজকতার কাজ তিনি চালিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু নূতন কোন কাজ যে তিনি ঠিকমত করতে পারবেন না সে বিষয়ে মনে তাঁর অণুমাত্র সংশয় ছিল না। তাঁর তাই মনে হত যে ঐ যাজকতার কাজ ছাড়ার মানে আত্মহত্যা করা—আর শুধু আত্মহত্যাও সে নয়—স্ত্রীহত্যাও তার পরে। অবশ্য নিজের মনের সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্য প্রয়োজন হলে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার জন্যও তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সাধ্বী ধর্মপত্নী মেরীকে মরণের পথে টেনে নিয়ে যাবার কি অধিকার তাঁর আছে? সাত পাঁচ ভেবে তাই ভদ্রলোক বিচলিত হয়ে উঠছিলেন। বিশেষ অসুবিধা তাঁর এই হয়েছিল যে পরামর্শ করবার লোক কেউ কোথাও ছিলেন না। আর কাউকে সে সব কথা বলার যে কোন

মানেই হয় না, তা তিনি বিলক্ষণ বুঝতেন এবং এও তাঁর অজানা ছিল না যে মেয়ীও তাঁর সে মনোভাবের সমর্থন করবেন না।

অস্বস্তির অন্য কারণও ছিল এবং ছোট হলেও মিথ্যা ছিল না তার কোনটাই। ধর্মগুরুর পদমর্যাদায় যাজকের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের সমাবেশ ছিল। মস্ত বড় অট্টালিকায় তিনি বাস করতেন। চারদিকে তাঁর দাসদাসী আশ্রিতজনেরা তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য প্রায় তটস্থ হয়ে থাকে। সহরের গণ্যমান্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। সেই সব সুবিধা ছেড়ে তার থেকে নিজেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত করার মধ্যে আনন্দ বা উৎসাহের কোন প্রেরণা ছিল না এবং তাঁর মনে হয়েছিল যে সর্বনাশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি—একটু অনবধান হলেই আর কোন রকমেই আত্মরক্ষা করতে পারবেন না হয়ত। মনকে তাই তিনি বুঝিয়েছিলেন যে যেমন চলছে তেমনি চলুক। মনের তাঁর ভাবটা এই যে, আর যাই হোক আত্মহত্যা করবেন না তিনি।

স্থির একটা করলেন বটে, কিন্তু মনের অস্বস্তি তাতেও গেল না। দিনে দিনে অবস্থাটা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে গোটা জীবনটাকে অভিনয় হিসাবে চালিয়ে যাওয়া সহজ বা সুখকর হবে না কোনমতেই। সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়তেন তিনি এবং সেই সব অসতর্ক অবস্থায় কৃতকর্মের টাল সামলাতে রীতিমত বেগ পেতে হত ভদ্রলোককে। অগোচর মন তাঁর তাই নিজের বিরোধী হয়ে উঠছিল এবং তাঁর ভয় হচ্ছিল যে নিজের অন্তর বাহির যেন পরস্পরের সতীন হয়ে উঠছে দিনে দিনে ছিলে ছিলে। দেখেশুনে তিনি কথা কম কইতে আরম্ভ করলেন এবং ভাবটা দেখাতে চেষ্টা করলেন যেন ধ্যান-ধারণা নিয়েই দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাতে চান তিনি। বাইরের লোকে অনেকেই তাঁর সে পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন এবং খুশিও ছিলেন তাঁর ওপরে অনেকে। কিন্তু নিজের মনকে মানানো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল ভদ্রলোকের। মনের সেই অবস্থার মধ্যে এক সময়ে তাঁর মনে হল যে তিনি যেমন ভগবানকে স্বীকার করতে পারেন না, তেমনি ত উল্টা দিকে এমন অনেক লোক আছেন দেবতাকে যাঁরা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেন। কথাটা ভাল করে ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে হল যে তিনি বুঝলেন—ঐ দুই বিরোধী মনোভাবের কোনটাই হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়—নইলে মানুষ একই কথা এমন বিসদৃশ করে ভাববে কেন? নিজের মন যাচাই করতে গিয়ে অতঃপর তাঁর মনে হল যে ভগবানের সম্বন্ধে তাঁর মনের অবিশ্বাস সত্যের সন্ধেহ মাত্র—নিশ্চিত হতে পারেন নি তিনি একবারে। সে অবস্থায় তাঁরই মত আর একজন যদি ভগবানকে শুধু বিশ্বাস নয়, তাঁর ওপরে আত্মসমর্পণ করতে পারে—তাহলে তার মানেটা কি এই দাঁড়ায় না যে হয়ত নিজে তিনি ভুল করেছেন এবং তাঁর মনের সন্দেহ হয়ত একদিন বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। তাঁর মনে হল—ভগবান আছেন কি নেই—সে সম্পর্কের যুক্তিতর্কসমূহের পাশ কাটিয়ে সরল মনে সরলভাবে যদি তিনি ভগবানকে স্বীকার করে খোদ ভগবানের কাছে তাঁর নিজের মনের দ্বিধার সমাধান করে নেবার জন্য প্রার্থনা করেন, তাহলে হয়ত এ সম্পর্কে সত্য কথাটা তিনি বুঝতে পারবেন—নিজের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শেষ হবে যাবে হয়ত। অবশ্য ভগবান যদি না থাকেন তাহলে তাঁর প্রার্থনা ব্যর্থ হবে, কিন্তু তার ফলে নিজের মনে তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে ভগবান নেই। যাই হোক এ বিষয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল যাজকের মন, কারণ ভদ্রলোক বুঝছিলেন যে কোন কাজই তিনি ঠিকমত করতে পারছিলেন না—তাঁর যাজকতার কাজও নয়, নিজের মনের মত ভাবে জীবনযাপন করাও নয় এবং ভাল লাগছিল না তাঁর সে অনিশ্চিতের অবস্থাটা। পরের রবিবার সকালের নিয়মিত উপাসনার পরে যাজক মন্দিরে তাঁর নিজের নিরালা ঘরটিতে গিয়ে বসলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে একাগ্রমনে দেবতাকে স্মরণ করে তাঁর কাছে তাঁর নিজের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করলেন—যেন দেবতা অতঃপর তাঁর অন্তরের দ্বিধা মিটিয়ে দেন। প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেন মনের সন্দেহ সংশয়ের নিরসন হয়ে যায়। সেই তাঁর পরম প্রার্থনার মধ্যে যুক্তির অবতারণা না করে পারলেন না ভদ্রলোক এবং তিনি বললেন যে দেবতা যাদের কাছে ভক্তি পান বা চান, তাঁর নিজের সম্পর্কে তাদের অন্তরকে সংশয়াকুল রাখা সঙ্গত হবে না তাঁর পক্ষে—মনে তারা যদি তাঁর

সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারল তাহলে তাদের ভক্তিরও কোন গৌরব থাকল না। আরো কথা এই যে—ভক্তেরা যে ভগবানকে সত্য বলে অনুভব করেন, মানুষের সেই দেবতার কর্তব্য হয় কি নিজেকে তাঁর ভক্তদের কাছে সত্যানুভব করে তোলা। এই ভাবের ভূমিকা করে নিজেদেরকে দুটি প্রশ্ন যাচাই করলেন—আছেন কি সেই যে দেবতা তাঁর আছে। একটিতে তাঁর নিজের দৃষ্টিশক্তি তিনি ফিরে চাইলেন। আর অন্যটিতে তিনি চাইলেন যেন তাঁর স্ত্রী মেরী তার মনে যে বেদনা গোপন করে রেখেছে,যার আভাস সময়ে সময়ে তিনি পেয়েছেন অন্তরিক্ত-তার দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে—সেই বেদনার কারণ যেন দূরীভূত হয়, যেন যা সে মনপ্রাণ দিয়ে চায় তা সে সত্যের স্বরূপে অনুভব করতে পারে, প্রত্যক্ষ করতে পারে।

অন্যদিনের মত যাজকের সেদিনের প্রার্থনাও দেবতার কানে গেল, কিন্তু ঠিক খুশি হতে পারলেন না বা তিনি শুনলেন তা শুনে। কারণ তাঁর মনে হতে লাগল যে তাঁর সংকীর্ণ সীমারেখা দৃষ্টিতে যাজক সৃষ্টির বিচার করতে চাচ্ছে। দেবতার মনে হল যে যাজককে সবচেয়ে দরকার যে নিজের বর্তমান বা ভবিষ্যতের বিষয়ে যে নিজে বিশেষ কিছু জানে না, তার পক্ষে ভগবানের কাজের দোষ ধরতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

গভীর আবেগের সঙ্গে গদ্গদস্বরে যাজক তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন। মনে সংশয় বোধ করছিলেন তিনি—দেবতা তাঁর সে প্রার্থনা শুনবেন কিনা, পূর্ণ করবেন কিনা। তাঁর মনে হল যদি প্রার্থনা তাঁর পূর্ণ হয়, তাহলে আর তাঁর সন্দেহ করবার কারণ থাকবে না যে ভগবান নেই।

তাঁর বরাভয়কর প্রসারিত না করে শুধু মুখের কথায় দেবতা বললেন—তথাস্তু।

অতি কাতর হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন ভদ্রলোক এবং দুচোখ দিয়ে অবিরল জলধারা গড়াচ্ছিল তাঁর—প্রার্থনা শেষ হতে নিজের চোখ মুছতে মুছতে যাজক আশ্চর্য হয়ে বোধ করলেন যে তিনি আবার দেখতে পাচ্ছেন! দেবতা তাহলে তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন—পূর্ণ করেছেন! আছেন তিনি তাহলে! আর কোন সন্দেহ সংশয় নেই তাঁর মনে অপ্রত্যক্ষ দেবতার সম্পর্কে। দেবতাকে অন্তরের নূতন করে তিনি তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেন।

জয় ভগবান—বলে তখনই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মনে তাঁর আনন্দ উৎসাহ উদ্বেল হয়ে উঠল। তাঁর মনে হতে লাগল যে মেরীর সম্বন্ধে যে প্রার্থনা তিনি করেছেন, সত্বরই তাও পূর্ণ করে দিয়েছেন দেবতা। মন তাঁর উৎফুল্ল হয়ে উঠল—কি সুখেরই হবে তাহলে তাঁদের ঘরসংসার-জীবন—যে জীবনের আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ তাঁরা হারিয়েছিলেন নিজের অন্ধ চওড়ার ফলে। আজ আবার সেই হারাধন ফিরে পেলেন তাঁরা।

আর দেরি করতে পারলেন না ভদ্রলোক সেখানে—বাড়ী ফিরবেন তিনি তখনই—দেখবেন তিনি মেরীকে—বলবেন তিনি তাঁকে যে দেবতার বরে তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি তিনি ফিরে পেয়েছেন। নিমেষের মধ্যে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন এবং তাঁর মনে হতে লাগল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মেরীকে সব কথা বলতে পারছেন ততক্ষণ যেন তিনি স্বস্তি বোধ করতে পারবেন না তাঁর নিজের অন্তরে।

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়লেন ভদ্রলোক।

যে লোক চোদ্দ বছর গির্জা থেকে হাত ধরে যাজককে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয়, ঘরের ঘরোই তার নিজের জায়গাটিতে সে হাজির ছিল; কিন্তু ঠিক তৈরী হয়ে ছিলেন না সে সেদিন—কারণ সেদিন যাজকের আচার আচরণ ঠিক অন্যদিনের মত ছিল না এবং লোকটা ঠিক বুঝতে পারে নি কখন উনি বাড়ী ফেরবার জন্য উঠবেন নিজের জায়গা ছেড়ে। তার প্রভুকে হঠাৎ রাস্তার দিকে যেতে দেখে আশ্চর্য হয়েই সে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল এবং আরো আশ্চর্য সে হয়ে গেল—যখন সে শুনল যে তার প্রভু বলছেন যে তার সাহায্যের আর দরকার নেই তাঁর।

চোখে দেখে যাজক তাঁর পথ চলছিলেন। কিন্তু অন্যদিনের পরিচিত সে পথের অনেক পরিবর্তন ইতিমধ্যে হয়েছিল এবং আগেকার দিনের পথের সে ছবিও তাঁর মনে ছিল না। চলতে চলতে তাই তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এবং না দেখে চলার অনুশীলন অভ্যাসের মধ্য দিয়ে পথের যে নতুন পরিচয় তিনি ইতিমধ্যে লাভ করেছিলেন তার হিসাবটা যাচিয়ে নিচ্ছিলেন—এখানে ওখানে সেখানে করবার পেয়ে যেয়ে। চলতে চলতে তাই তিনি থামছিলেন এবং থামতে থামতে চলছিলেন ভদ্রলোক।

মস্ত বড় একটা বাড়ীর সামনে এসে পথ তাঁর

শেষ হয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে হাতের স্পর্শে তিনি বুঝলেন যে তাঁর নিজের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। চোখ চেয়ে একবার তিনি প্রাণস্পন্দনহীন সেই বাড়ীটার বাইরের চেহারা দেখে নিলেন এবং ধারপার্শ্বে দণ্ডায়মান লোকটির অভিবাদন স্মিতমুখে গ্রহণ করে প্রসন্ন প্রফুল্ল মনে সামনের সুসজ্জিত হল ঘরটির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সেখান থেকে পত্নী মেরীর ঘর অনুমান করে অতঃপর ভদ্রলোক সেদিকে অগ্রসর হলেন। আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না তিনি—মেরীকে সেই শুভ সংবাদটি শোনাতে যে আবার তিনি দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু মেরীর ঘরের খোলা দরজার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ভদ্রলোক, কারণ ঘরের মধ্যে চেয়ে তিনি দেখলেন যে এক অপরিচিত যুবকের গণ্ডদেশে মেরী চুম্বন করছেন। অত্যন্ত অভাবিত সেই দৃশ্য দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন ও চলবার শক্তি হারিয়ে ফেললেন যেন নিমেষের মধ্যে। স্থিরভাবে সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন এবং তাঁর মনে হল যে তাঁকে সেখানে দাঁড়াতে দেখেও ঘরের ভেতরের ওদের প্রেম-লীলার অবসান হচ্ছে না—তার কারণ ওরা এখনো জানে না যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। যে কথা মেরীকে বলবার জন্য তিনি এত ব্যস্ত হয়েছিলেন—অতঃপর আর সে কথা তাকে বলবার জন্য কোন আগ্রহই মনে জাগল না তাঁর। অজানিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে গেল তাঁর—যখন তিনি দেখলেন যে মেরীর মুখচোখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে এবং তার তাৎকালিক হাবভাবে যেন মনের আশা আনন্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তার আচারে আচরণে। যাজকের মনে পড়ে গেল—এই মেরীর জন্যই তিনি দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝলেন যে ঐ যুবককে পাবার পথে বাধা ছিল বলেই মেরী অন্তরে বেদনা বোধ করতেন—সে বেদনা তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে ছুটে বিশ্রাম আগিয়ে দিয়েছে তাঁর নিজের মনে করবার।

নিজের মনে তাঁর ধিক্কার বেজে উঠল এবং আর সেখানে না দাঁড়িয়ে পাশের সিঁড়ি দিয়ে যাজক বরাবর ছাদের ওপরে উঠে গেলেন। এই ছাদ একদিন তাঁর অতি প্রিয় বিশ্রাম স্থান ছিল। ছাদের পূর্ব্বদিকের সুউচ্চ গম্বুজের চূড়ায়—যার মাথার ওপরের উদার আকাশ আর নীচের চার পাশের বিচিত্র প্রকৃতির বিরাট চিত্র দেখতে তাঁর বড় ভাল লাগত এবং সেই অপূর্ব্ব ছবির অন্তরের সৌন্দর্য্য তিনি ছাদের ওপরে উপবিষ্টা মেরীকে সমঝে দিতে চেষ্টা করতেন। তাঁর শত অনুরোধেও মেরী যে গম্বুজের চূড়ায় উঠতে সম্মত হন নি এবং সেই না ওঠার জন্য কি যে তিনি হারালেন সেই কথাই ভদ্রলোক বুঝিয়ে দিতে চাইতেন মেরীকে। বহুদিন পরে সেদিনও তিনি সেই গম্বুজের চূড়ায় উঠে গেলেন এবং একবার মাত্র চারদিকে চেয়ে নিমেষের মধ্যে সেই পরিব্যাপ্ত অসীমের অঙ্কে—মায়ের কোলে যেমন শিশু ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ভাবে—ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

চারদিক থেকে লোকজন সব হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল, কিন্তু কোন উপকার কেউ তারা করতে পারল না ভদ্রলোকের—কারণ এত উঁচু থেকে নীচের কঠিন পাথরের ওপরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাজকের প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল—প্রাণহীন চূর্ণবিচূর্ণ তাঁর দেহমাত্র সেখানে পড়েছিল।

গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সমবেত সকলে তাদের প্রিয় যাজকের কথা আলোচনা করছিলেন। তাঁর সেই অকাল-মৃত্যুর জন্য সকলেই তাঁরা অন্তরে বেদনা বোধ করছিলেন এবং সে বেদনা তাঁরা বোধ করে অনুভব করছিলেন এই জন্য যে অন্ধ হওয়ার জন্যই ঐ ভাবে ভদ্রলোকের প্রাণান্ত হল—চোখে দেখতে পেলে আর এ অঘটন ঘটতে পেত না।*

* বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

'কৌটিল্য'

আজ এ পর্যন্ত বিশ্বের বাজারে কাঁচামাল সরবরাহ করে আসছে। কাঁচামাল সরবরাহ করা চলতে পারে দুই কারণে, প্রথমতঃ নিজেদের শিল্প কারখানার প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হলে, দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে শিল্পসংস্থানের অভাবের ফলে দেশের কাঁচামালের বিনিময়ে বিদেশ থেকে শিল্পজাত সামগ্রী আনার জন্য। প্রথম অবস্থায় মোটামুটি বুঝা যায় দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যৌলত উৎপন্ন হচ্ছে; সুতরাং সে দেশের বহির্বাণিজ্য আত্মনির্ভরশীল ও লাভজনক। আর দ্বিতীয় অবস্থা যে দেশে ঘটবার সে দেশ বাণিজ্য ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী, শিল্পজাত বিভিন্নব্যবহার্য সামগ্রীর জন্য তাকে সর্বদাই বিশ্বের বাজারে ভিক্ষুকের মত হাত পাততে হয়, আর ফলের এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তাকে নিজের কাঁচামাল অলাভজনক দরে ছাড়তে হয়। ভারতের অবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ এই দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে। যে কারণে ভারতের এ অবস্থা হয়েছিল তা আজ দূর হয়েছে। পরাধীনতার আকাশচেরী প্রাচীর আজ ধূলিসাৎ, স্বাধীন ভারত বিশ্বের দরবারে আজ উপস্থিত।

জাপান ও জার্মানী আজ বিশ্বের ব্যবসায়বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে সরে পড়াতে শিল্পজাত সামগ্রী চালাবার যোগ্য বিশাল বাজার ফাঁকা পড়ে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, বর্মা, প্রভৃতি স্থানে, মধ্য-প্রাচ্যে মিশর প্রভৃতি দেশে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় শিল্পজাত সামগ্রীর অনুরূপ চাহিদা মেটাবার যোগ্য ব্যবসায়ী আজ নেই। এ যাবৎ আমাদের দেশ থেকে পাট, তুলা, চা, তৈলবীজ, চামড়া, লাক্ষা এবং অন্যান্য কৃষি ও খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়েছে। বিনিময়ে আমরা অল্পমূল্যে কাপড়, সুতা, তেল ও অন্যান্য অনেক জিনিষ আমদানি করেছি। আজ এই অবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। পাটের ব্যবসা ভারতের (পাকিস্তান সহ) একচেটে। তুলা এদেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন হয়, ইচ্ছা করলে এই উৎপাদন আরও বাড়ান যেতে পারে। লাক্ষা ব্যবসায়ও ভারতের একচেটে। টাটা কোম্পানী ও বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিজ চেষ্টায় (এ যাবৎ সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও) যেরূপ লাভজনক লাভ করেছে তাতে এদেশে খনিজ, রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধনের উপযুক্ত সামগ্রী ও সুযোগ আছে প্রমাণ হয়েছে।

১৯৪৬ সালে বহির্বাণিজ্যে মোট ৫০৫ কোটি টাকার মাল এদেশ থেকে রপ্তানী হয়েছে। আর আমদানি (সরকারী খাতে আমদানী বাদ যায়) ২৯১ কোটি টাকার বিদেশ থেকে খরিদ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে রপ্তানী ও আমদানির অনুরূপ অঙ্ক দাঁড়ায় ২৪০ কোটি টাকা ও ১৪১ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪৭ সালে আমদানি রপ্তানি অপেক্ষা ৭ লক্ষ টাকা অধিক হয়েছিল এবং ১৯৪৮ সালে রপ্তানি আমদানী অপেক্ষা ৯১ কোটি টাকা অধিক হয়েছে। দেশের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা ১৯৪৬ সালে পূর্ব বৎসর থেকে একটু ভাল হচ্ছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্মরণ রাখতে হবে যে ১৯৪৬ সালে প্রায় ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য ও ২০ কোটি টাকার সরকারী প্রয়োজনীয় বস্তু (রেলওয়ে ষ্টোর, ষ্টেশনারি ইত্যাদি) আমদানী করা হয়েছে যার হিসেব এতে নেই। সুতরাং মোট হিসেবে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে আমদানি রপ্তানি অপেক্ষা ৮০ কোটি টাকা অধিক হয়েছে। এই অবস্থা দেশের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর।

এতবড় একটা দেশ আমাদের, যার বিশাল জনবল ও সম্পদরাজি অফুরন্ত, আর যার ঠাঁই পাশে এশিয়ার বৃহৎ বাজার পড়ে রয়েছে—তার বহির্বাণিজ্য রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অধিক হওয়া মোটেই উচিত নয়। এশিয়ার বাজারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ। লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্র আমেরিকা অনেকদূর এ বিষয় অগ্রসরও হয়েছেন ইতিমধ্যে। আর আমাদের দেশে শিল্পোন্নতির যে সব কল্পনা হচ্ছে তা সফল হলে আমাদের বহির্বাণিজ্যে আমাদের প্রভূত অর্থ আমাদের অনুকূলে উদ্বৃত্ত থাকবে। অনেকেই এখন ভুল বুঝেছে—যে ষ্টার্লিং পাওনা আমাদের যুদ্ধের সময় জমেছে বলে আমরা উল্লসিত হয়েছিলাম তা প্রকৃত হিসেবে ভুল। অধ্যাপক বি, আর, সিনহা তাঁর 'Sterling assets of the Reserve Bank of India (1946) নামক গ্রন্থে সকল প্রকার হিসেব দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে মোটা পাওনা ও দেনা বরলে আমরা আজও ঋণগ্রস্ত। এ সম্বন্ধে স্মরণ রাখতে হবে—যে ষ্টার্লিং পুঁজি যুদ্ধের জন্য ভারতের জমেছে তার জন্য আমরা কেবল বাংলা থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ মরদালি অর্পণ করেছি ১৯৪০-৪৪ সালের মধ্যে—আরও অর্পিত মরদালীকে অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন রেখে যুদ্ধের সময় বিদেশে পাঠিয়েছি। আজ সেই অজস্র প্রাণের, অপরিমেয় লাঞ্ছনায় বিনিময়ে অর্জিত অর্থ যেমন তেমন ভাবে আমরা বিলিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু আমরা হচ্ছি তাই। কোটি কোটি টাকা প্রতিদিন বেরিয়ে যাচ্ছে—বাইরে থেকে নিতান্ত চাহিদার মূল্যে খাদ্যশস্য আমদানী করতে। এ ছাড়া আরও কত অহিতা হচ্ছে, বিদেশে আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার জন্য যাচ্ছেন, তাঁদের সকল খরচ এই ষ্টার্লিং পাওনা থেকে কাটা হয়। এঁরা আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কারখানায় শিল্প ও উৎপাদনের গবেষণামূলক শিক্ষালাভ করছেন। কথা হচ্ছে অর্জিত শিক্ষালাভ করে যখন এঁরা দেশে ফিরে আসবেন তখন তাঁদের কাজ আরম্ভ করবেন কোথায়? দেশে উপযুক্তরূপ কারখানা ও গবেষণাগার কোথায়? আমাদের আশা ছিল—বহির্বাণিজ্যের স্রোত আমরা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করব যাতে আমাদের আমদানি ও রপ্তানির

সাধ্য অন্ততঃ বজায় থাকে এবং ট্রাক্টর পুঁজির বিনিময়ে যাতে আমরা বিদেশ থেকে উৎপাদক কলকব্জা (Capital goods) আমদানি করে অচিরে দেশের শিল্প-শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারি। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। দেশে যদি পড়ে আছে, কতক অঞ্চলে অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় ½ অংশ কমল জন্মে, বাকী অঞ্চল একেবারেই অনুন্নত হয়ে থাকে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত তুলা আমরা উৎপন্ন করি তবু আমাদের ঘরের মেয়ে লেখিনও বিবস্ত্র থাকার লজ্জায় আত্মহত্যা করলো। ১৯৪৪, ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে আমদানী মাত্র কয়েকটি বস্তুর মূল্যের পরিমাণ পরীক্ষা করলেই বুঝা যাবে যে কিরূপ অযৌক্তিক ও অনুৎপাদক সামগ্রী অগ্নিমূল্যে আমরা গ্রহণ করছি—

	১৯৪৪	১৯৪৫	১৯৪৬
যানবাহন (মোটর সাইকেল ইত্যাদি)	১'৪৪ কোটি টাকা	৭'৪৭ কোটি টাকা	১২'৯৩ কোটি
যাসন ছুরি কাঁচি ইত্যাদি	৩৪৯ কোটি টাকা	—	১৫'৩৪ কোটি
যন্ত্র	—	১'৬৩ কোটি টাকা	৩৬২ কোটি

এ সম্বন্ধে স্মরণ রাখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার যথাবিধ বাধা বিঘ্ন ও নিয়ন্ত্রণ কমবেশি রাখা সত্ত্বেও বাণিজ্যের হাল এই।

কোন দেশের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা ভাল মন্দ বুঝবার আর একটি মাপকাঠি হলো—আমদানী ও রপ্তানী সামগ্রীর বাজারদর সুবিধাজনক রাখবার ক্ষমতা। কোন বস্তুর দাম সর্বদাই উৎপন্ন মালের পরিমাণ ও চাহিদার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। বাজারে যখন মাল কম ও চাহিদা তদনুপাতে খুব বেশি, তখন আমরা অধিকমূল্যে জিনিস কিনতে বাধ্য হই; আর পরদের চাপে নিজের ফসল জিনিস কম মূল্যে বিক্রয় করতে হয়। ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঠিক এই অবস্থা বর্তমান। ১৯৩৯ মূল্যমানকে ১০০ ধরলে তুলনায় ১৯৪৬ সালে আমাদের দেশের মাল আমরা ১৩৩ থেকে ১৩১ মূল্যে ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, আর এই বৎসর বিদেশ থেকে ১৪৫ থেকে ২০০ মূল্যে মাল আমদানি করতে হয়েছে।

এই আলোচনা থেকে আমরা সর্বপ্রথম যে সিদ্ধান্তে পৌঁছি তা এই যে—পাকিস্তান আমদানি অচিরে আমাদের বন্ধ করতে হবে, তাতে ১০০ কোটি টাকা বেঁচে যায়। উপযুক্ত বিনিময়ে টাকা আমাদের বাড়তি হলে ইচ্ছানুরূপ সে টাকা আমরা কাজে লাগাতে পারব। সুতরাং বহির্বাণিজ্য গড়ে তুলবার প্রধান ও প্রথম সোপান হবে—প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে দেশে মিটাবার জন্য যত পরিমাণ উৎপাদন অধিকতর বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সঙ্ঘ (International Trade Organisation) যুদ্ধকালীন বাণিজ্যের বাধা-বিঘ্নের মূল হিসেবে চুক্তি করা ও তুলে দেওয়ার চেষ্টা দেখছেন। ভারত আরও ১৭টি জাতির সঙ্গে জেনেভাতে সম্প্রতি এক বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। হাভানাতে সঙ্ঘের পূর্ণ বৈঠক নবেম্বর মাসেই (১৯৪৭) হচ্ছে। আমাদের প্রতিনিধিগণ (বাণিজ্য-সচিব প্রমুখ) নিশ্চয়ই এ দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। জেনেভার চুক্তির ফলে ভারতকে আমদানী মালের উপর বছরে প্রায় ৩১ কোটি টাকা শুল্ক হ্রাস করতে হবে; আর বিনিময়ে প্রায় ১৮ কোটি টাকা আয় হবে—এ দেশ থেকে রপ্তানী মালের উপর বিদেশে শুল্ক হ্রাস হওয়ার ফলে।

কবি কুমুদরঞ্জন প্রশস্তি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কুমুদ-রঞ্জন কবি, তবে রবি অপরিশ্রমাম
মলিন নলিনী বলে লুটাইলে হসিত কুমুদ,
অন্তর সরসী জলে, মজাইলে বিষাদ বিষুব
কৌমুদী প্লাবনে তব, কেহ মরু কেহ মজুমান।

'বন-তুলসীর' কবি পল্লী বন-বল্লী তব প্রাণ
ঘুঁই-চাঁপা, বর্ণ-চাঁপা, লুটাইয়া তুলিলে অর্ঘ্য
গদ গদ কণ্ঠে তব গান করে আনন্দ মুখর
পল্লীর স্বভাব-কবি ভাগবত ভাষাতুর প্রাণ।

ওগো বাণি তন্ত্রী তব ফেলে চলে তরাবতী মাঝে
শিথিল বকুল ঝরে, চিতাপরে সে কোন বসুধ
আজো তার কাঁকনের রিনিঝিনি স্বর্গে যেন বাজে
স্নান সন্ধ্যা ব্যথাতুর, অবিস্মরণীয় সে মধুর।

উজানি বাহিনী নীরে 'অজয়ে'র যে অজেয় কবি।
কবিকঙ্কণের তীর্থে লোচনের মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

রাঠোর বংশীয় রাজপুতেরাই যোধপুরের অধীশ্বর। কাজেই যোধপুরে রাঠোরদেরই প্রাধান্য। এই রাজবংশের ইতিহাস রীতিমতো রোম্যান্টিক। আমি অবশ্য ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসে ইতিহাস আওড়াতে চাইনি। তবে সংক্ষেপে একটু বললে বোধ হয় এ দেশটাকে ও জাতকে বোঝা সকলের পক্ষে সহজ হবে। যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাওযোধা থেকেই আরম্ভ করা যাক। রাওযোধা ছিলেন রাও রূপমলের জ্যেষ্ঠপুত্র। রাও রূপমল মেবারের একচ্ছত্র অধিপতি হবার লোভে চিতোর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শিশু রাণাকুম্ভকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই হত হন। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। কিন্তু যুবরাজ রাও যোধার সাহস ও বীরত্বের গুণে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠানের পাঁচ ছ' বছর পরে পুরাতন রাজধানী মাণ্ডোরের পরিত্যাগ ক'রে যোধপুরে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর যোধপুর শাসন করে ১৪৮৮ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ১৫টি পুত্র ছিল। এঁদের সকলের বিবরণ জানবার প্রয়োজন নেই। তবে এঁদেরই ষষ্ঠ পুত্র বীকা রাজপুতানার বীকানির রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং এরই প্রপৌত্র রাও জয়মল ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে আকবরের আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষা করবার জন্য তীর্থবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। যোধপুরের আর এক রাঠোর বংশীয় বীরপতি রাও পত্তা ১৪২৭ খৃঃ অব্দে বাবর কর্তৃক মেবার আক্রমণের সময় রাণা সংগ্রামসিংহকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ১৪৩২ খৃঃ অব্দে রাও পত্তার পুত্র রাওমলদেব যোধপুরের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যোধপুর দুর্গ

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী-স্মৃতির মুখবন্ধে মীরজাদী লিখেছেন যে এঁর রাজত্ব কালেই মেবার তার বীরত্ব গৌরবের চরম শিখরে উঠেছিল। মলদেবের সৈন্যবাহিনীতে প্রায় আশী হাজারের উপর শুধু অশ্বারোহী সেনাই ছিল। তা ছাড়া পদাতিকের সংখ্যা ছিল অগণ্য। চিতোর রাণাদের অপেক্ষাও

এঁর শক্তি ও সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মেবারের রাণা মহমদেবই ছিলেন তখন হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নৃপতি। তাঁর রাজ্যসীমা আগ্রা ও দিল্লীর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পাঠান বীর শেরশাহ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে পলাতক হুমায়ুন মহমদেবের শরণাপন্ন হয়ে একটু নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু মহমদেব বীরধর্ম্ম অবলম্বন করে—এই বিপন্ন শরণাগতকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন—তিনি বিধর্ম্মী নৃপতি বলে। কিছুদিন পরেই শেরশাহ রাণা মহমদেবের রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হয়ে কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসেন। পরে অবশ্য শেরশাহ রাজ্যের বিভীষণদের সাহায্যে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে রাণা মহমদেবকে এক যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং শেরশাহের সঙ্গে তাঁর সন্ধি স্থাপিত হয়।

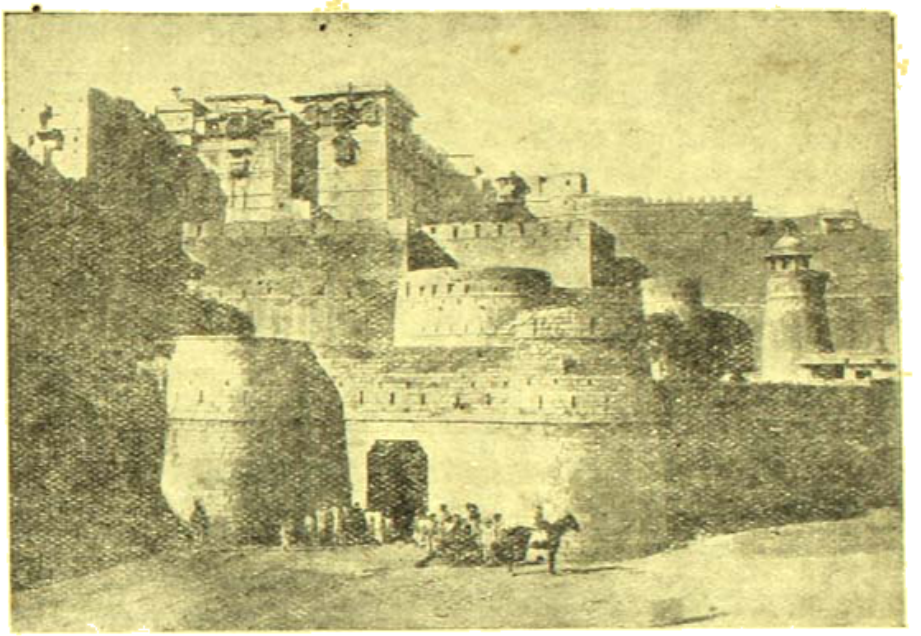

দুর্গের প্রবেশ পথ

১৫৫১ খৃঃ অব্দে আকবর মেবার আক্রমণ করেন। ১৭ বছর ধরে মোগলের সঙ্গে রাজপুতের যুদ্ধ চলে। মহমদেবের সুযোগ্য পুত্র চন্দ্রসেন এই যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করে বার বার শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করেন। কিন্তু আকবর তাঁর সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে অবশেষে মোগলকে পরাস্ত করেন। মহদেব এই পরাজয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ চার পাঁচ বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। চন্দ্রসেন পিতৃসিংহাসন পেলেও তাঁকে আকবরের অধীন রাজা হয়েই থাকতে হয়েছিল।

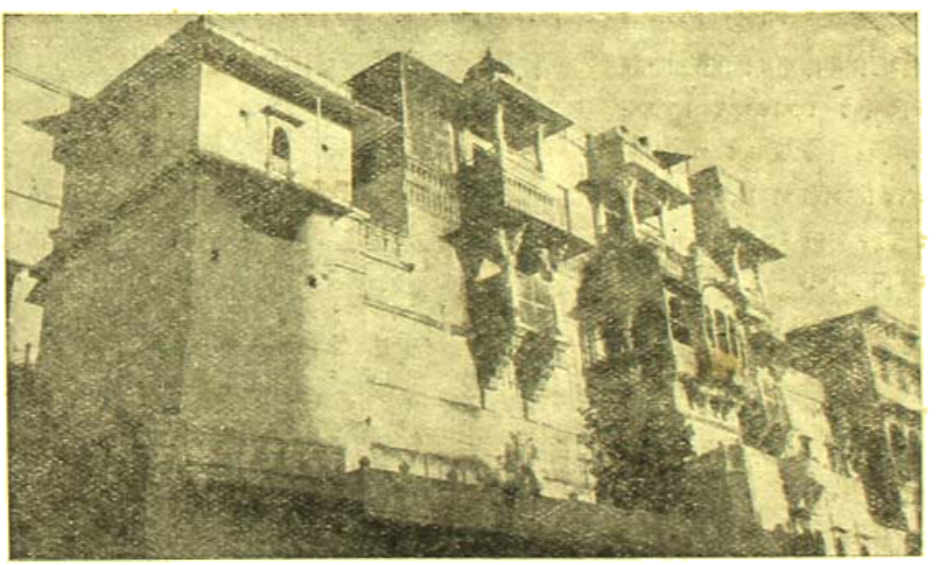

দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদ অঙ্গন

চন্দ্রসেনের পর উদয়সিং যোধপুরের সিংহাসন অধিকার করে নিজেকে 'রাজা' বলে প্রচার করেন। পূর্ব্বপুরুষদের 'রাও' উপাধিটা ইনিই প্রথম বর্জ্জন করে এই 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি ভীষণ দুলকায় ছিলেন বলে এঁকে রাজ্যের সবাই 'মোটারাজ' বলে উল্লেখ করতো। এঁরই এক ছেলে বিষণ সিং রাজপুতানার কিষণগড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

এর পর থেকেই অর্থাৎ ১৫৯১ খৃঃ অব্দ থেকেই যোধপুর প্রকৃত পক্ষে মোগলের দাস হয়ে পড়ে। ধূর্ত রাষ্ট্রনীতিবিদ্ আকবর অসাধারণ কৌশলে এই সিংহতুল্য শক্তিশালী রাঠোর বীরদের বশীভূত করে এদেরই সাহায্যে দেশে সারা রাজপুতানা জয় করেছিলেন। রাজা সুর সিংকে তিনি এক মোগল সেনাবাহিনীর নায়ক করে দিয়েছিলেন এবং তার পিতা বর্ত্তমানেই তাকে 'সবায় রাজ' উপাধিতে ভূষিত

যোধপুরী পিতা-পুত্র (মেহাতী রাজপুত)

গজ সিংহের দুই বীর পুত্র অমর সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ মোগল যুগের ভারত ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। অমর সিংহ মোগলের দাসত্ব স্বীকারে অসম্মত হয়ে পিতার সঙ্গে ইস্তফা ও অসন্তোষ ব্যবহার করায় গজ সিংহ তাঁর মৃত্যুর চার বছর আগেই জ্যেষ্ঠ অমর সিংহকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা ক'রে, কনিষ্ঠ যশোবন্ত সিংহকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইনিই মোগল যুগের ভারত ইতিহাসের প্রসিদ্ধ রাজপুত বীর মহারাজ যশোবন্ত সিংহ। ভারতের তথা মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ একাধিকবার যাঁর অঙ্গুলী-হেলনের অপেক্ষায় ছিল, সম্রাট শাজাহানের পুত্র দারা ও ঔরংজেবের ভাগ্য ছিল একদা এঁরই করতলগত।

ঔরংজেব হিন্দুকে বিশ্বাস করতেন না। যশোবন্ত সিংহকে তিনি রীতিমত ভয় করতেন এবং তাঁর প্রধান শত্রু বলে মনে করতেন। যশোবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে ঔরংজেবের যতবারই একটা তীব্র আক্রোশ ছিল। যদিও গুজরাট, আজমীর, দাক্ষিণাত্য ও কাবুলে পরপর তিনি বাদশাহের প্রতিনিধি রূপে শাসনকর্তার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তবু ঔরংজেব তাঁকে কখনো বন্ধু রূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। ডামরদের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। অসামান্য বীরত্বের গুণে যশোবন্ত সিংহই যোধপুরের রাজাদের মধ্যে প্রথম 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহের জন্ম হয় পিতার মৃত্যুর পর। এই সুযোগে ঔরংজেব সমস্ত মেবার রাজ্য জয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর পর অজিত সিংহ বয়োপ্রাপ্ত হয়েই পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করেন। মোগল সাম্রাজ্য গ্রাস করবার জন্য তিনি ১৭০৮ খৃঃ অব্দে মেবারের রাণা অমর সিংহ ও জয়পুরের মহারাজা জয় সিংহের

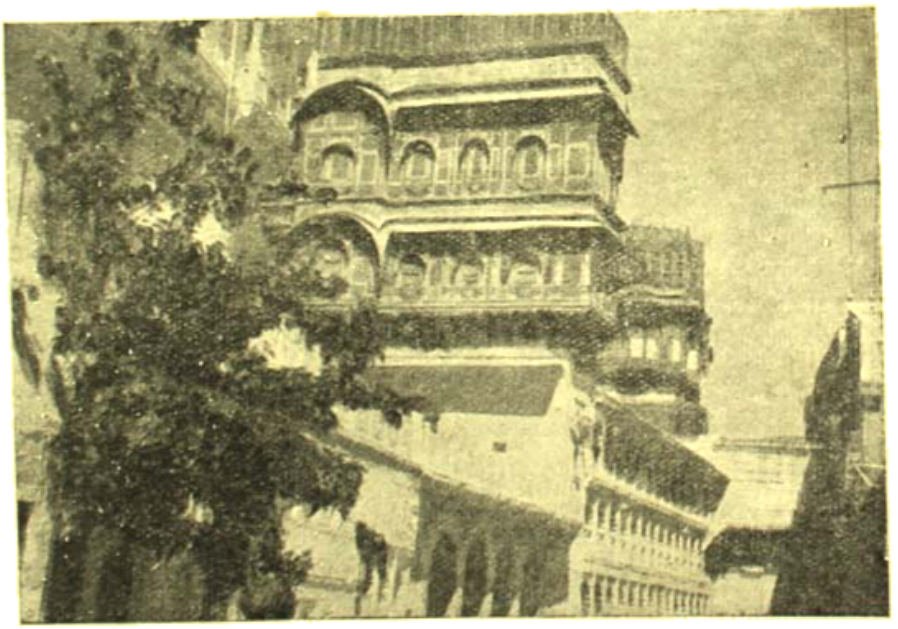

রাণীদের মহল

সঙ্গে একত্র সম্মিলিত হয়েছিলেন। অজিত যৌবনে ঔরংজেব পাশ থেকে

করেছিলেন। ইনি মোগল বাদশাহ আকবরের সেনাধ্যক্ষ রূপে বাদশাহবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ক'রে সিরোহী রাজ্য, গুর্জর রাজ্য ও মুলুক রাজ্য জয় করে মোগলের অধীনে নিয়ে আসেন। সুরসিংহের আমলে যোধপুরের অনেক উন্নতি হয়। রাজধানীকেও তিনি সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন।

সুর সিংহের পুত্র গজ সিংহ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মোগল বাদশাহের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দাক্ষিণাত্য জয় করে তিনি সেখানে মোগল বাদশাহের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আজমীরও তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বহু আজমীর দান করেছিলেন। আগ্রায় এঁর মৃত্যু হয় ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে।

মুক্ত হবার জন্য যাঁর এ প্রচেষ্টার মূলে আমাদের অভিভাবক, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও পরিচালক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাবীর দুর্গাদাসের প্রভাবই নিহিত ছিল। দুর্গাদাস ছিলেন নিঃস্বার্থ এক দেশ-প্রেমিক, একে মাতৃভূমির মুক্তি-সাধক একজন বীর সন্ন্যাসী বলা চলে। যে অর্থ যশ মান রাজা সিংহাসন কিছুরই প্রতি এঁর লোভ ছিলনা। ইচ্ছা করলে অনায়াসে তিনিও একজন রাজপুত সর্দার নৃপতি হ'তে পারতেন। এ সুযোগ ও প্রস্তাব বার বার তাঁর কাছে এসেছিল, বার বার তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে শুধু চেয়েছিলেন—মেবারের স্বাধীনতা।

দুর্গাদাসের মৃত্যুর পর অজিত সিংহকে তাঁর পুত্র শুভত সিং সিংহাসনের লোভে ১৭১৪ খৃঃ অব্দে হত্যা করে। সিংহাসনের জন্য হত্যা, ষড়যন্ত্র, বিষপ্রয়োগ, বিদ্রোহ, রাজোয়াড়ার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। অন্তরাণী ও রাজকুমারীদের অবৈধপ্রেম ও স্বৈরাচার রাজস্থানের অন্তঃপুরকে নিন্দনীয় করেছিল মোগল হারেমের দুঃশাসনের কুৎসার চেয়েও। এরপর ব্রিটীশ বিজয় পর্য্যন্ত প্রায় এক-শতাব্দীকাল রাজপুতানার ইতিহাসে শুধু গৃহযুদ্ধ, মারাঠাদিগের সঙ্গে অবিরত সংঘর্ষ এবং পরাজয়, আর আমীর খাঁর আক্রমণে বিপর্য্যস্ত ও বিশৃঙ্খল এক জাতীয় অধঃপতনের ইতিহাস। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে রাঠোর বংশের শেষ নৃপতি মহারাজা মান সিং ব্রিটীশের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে আত্মরক্ষা করেন।

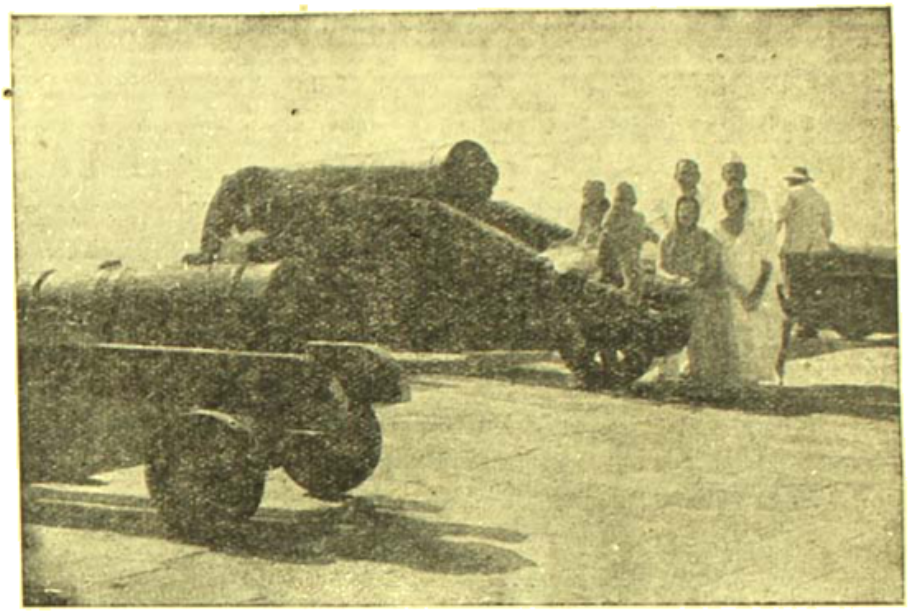

দুর্গপ্রাকারে সজ্জিত কামান শ্রেণী

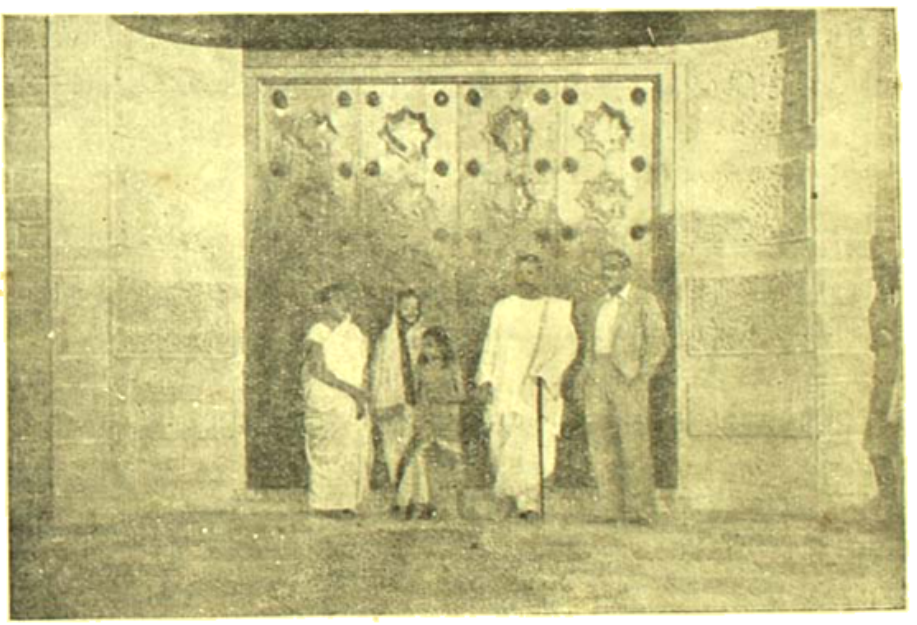

যোধপুর যাদুঘরের সম্মুখে (আমরা ও মিঃ গুপ্ত)

ইনি নিঃসন্তান মারা যান। আহম্মদনগরের মহারাজা তক্ত সিং তাঁর পোষ্যপুত্র রূপে যোধপুর সিংহাসনে বসেন। এঁরই আমলে সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়, কিন্তু ইনি সে যুদ্ধে যোগ না দিয়ে ইংরাজদেরই সাহায্য করেন এবং যোধপুর দুর্গের মধ্যে পলাতক ইংরাজ রাজপুরুষের আশ্রয় দিয়ে তাদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করেন। সমর যুদ্ধের তীব্রতা যে অংশে যোধপুরের অধিকারে ছিল ইনিই সেটা ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টকে দান দিয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

আত্মযোগ

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, রায়বাহাদুর

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাসযোগ বা আত্মসংযমযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই যোগটি যে সকল যোগের মূল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আত্মসংযম সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার পক্ষেই একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইন্দ্রিয় দুর্বার, মনের গতি স্বভাবতঃই চঞ্চল, বায়ুকে বশীভূত করা যেরূপ কঠিন, ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিবেকের অধীন করা তদপেক্ষাও দুষ্কর। অর্জুনের এইরূপ উক্তির উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ গীতার ভূমিকায় বলা হইয়াছেন যে, সত্যই মনকে বশে আনয়ন করা অত্যন্ত কঠিন। মনকে যিনি বশে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি প্রকৃত যোগী। তিনিই শান্তির অধিকারী হইতে পারেন, অপর কেহ নহেন। এই মনঃসংযম, যাহার উপর সমস্ত দুঃখশান্তি ও পরিণামে ব্রহ্মনির্বাণ নির্ভর করিতেছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেই বিষয়ের অতি সুন্দর আলোচনা করা হইয়াছে।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।

যে ব্যক্তি আত্মসংযম লাভ করে নাই, যোগ তাহার পক্ষে দুর্লভ, ইহাই শ্রীভগবানের অভিমত।

সংসারে মিতাভিত্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও কার্যে উন্নতি লাভ করিতে হইলে চাই সাধনা। ছাত্র তাহার অধ্যয়নে, ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ে, তপস্বী তাঁহার তপস্যায় যদি একান্ত ভাবে মন নিয়োজিত করিতে না পারেন, তবে সাফল্যের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এমন কি যাহারা অবাঞ্ছিত কর্মে লিপ্ত, তাহারাও যদি কোন একটি বিষয় মানিয়া না চলে, তাহা হইলে তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে না। সুতরাং সর্ববিধ উন্নতি, সফলতা ও চরিতার্থতা নির্ভর করে মনঃসংযমের উপর। ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে চিত্ত কর্ষণশূন্য অর্বাচীনের মত ভাবপ্রবণতাতাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়।

আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি ইহার অর্থ এখন নহে যে, আমরা এখন হইতে প্রত্যেকে যাহার যাহা খুশী করিতে পারিব, এখন আর আমাদের ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে কেহই নাই। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যখন অতীত পরে স্বাধীনতা করতলগত হইবার সম্ভাবনা আসিয়াছে, তখন এই ধারণাকেই দৃঢ় ও স্থায়িভাবে অবলম্বন করিতে হইবে যে কঠোরতর শৃঙ্খলা, সুদৃঢ় আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ আবশ্যক হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকে রাশিয়ার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন এবং মনে ভাবেন যে, সর্বনিম্ন শ্রেণীর কৃষক এবং শ্রমিকেরাও সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চরম ফল উপভোগ করেন। কিন্তু এই ধারণা যে কত বড় ভুল, তাহা সোভিয়েট রিপাব্লিকের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা বিন্দুমাত্র পরিচিত তাঁহারাও জানেন। সেখানে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হইতে হইলে অনেক নিয়মানুশাসন পালন করিতে হয়। সে সমস্ত নিয়মকানুন অত্যন্ত কঠোর। কাজেই অনেকের পক্ষে উহা সর্বতোভাবে পালন করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সেজন্য একদল সরকারী লোক আছে যাহারা দেখে কে কে নিয়মলঙ্ঘন করিয়াছে। এই সকল নিয়ম-লঙ্ঘনকারীদিগের সমস্তপর বাহির করা হয়। ১৯৩৩ সালে এই পার্টির সভ্যসংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ; কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে এই সংখ্যা ২০ লক্ষে নামিয়া আসিল। অর্থাৎ ইতিমধ্যে প্রায় অর্ধেক সভ্যকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। সুতরাং সভ্য নাইয়া তবে বিশ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, প্রাণ এবং পাশ্চাত্য দেশে যত রাষ্ট্র আছে, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিয়মের কড়াকড়ি এই নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রে। ইহা অসংকোচে বলা যাইতে পারে, যত দিন এই মনগড়া নূতন প্রণালীর রাজ্যে জনগণ নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকিবে, ততদিন এই রাজ্য থাকিবে। নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল হইলে ইহা অল্পদিনের মধ্যেই তাসিয়া মিলিয়া যাইবে।

তাই বলিতেছিলাম যে, আত্মসংযমের প্রশ্ন যে কোন উচ্চ চারিত্রিক ভূমিতেই আবশ্যক তাহা নহে। বর্তমান মুহূর্তের রাষ্ট্রসমূহের রাজনীতিক ও সামাজিক প্রয়োজনেও ইহার আবশ্যকতা অত্যন্তভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

গীতায় এই প্রশ্নটি যে ভাবে উত্থাপিত হইয়াছে এবং যে ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই কথাই মনে হইবে যে, উচ্চতম আদর্শের জন্যই যে কেবল আত্মসংযমের প্রয়োজন, তাহা নহে। অতি সামান্যভাবে জীবনযাপন করিতে হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

আত্মাকে দিয়াই আত্মার উদ্ধার সম্ভব, অন্য কোনও কিছুর দ্বারা নহে। সংসার সাগর হইতে উদ্ধার পাওয়া না পাওয়া তোমার আমার নিজেরই উপরে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আত্মাকে অবসাদিত করিবে না, আত্মাকে অধোগামী হইতে দিবে না, অবসন্ন হইতে দিবে না। কারণ আমি আমার উদ্ধার সাধন না করিলে, আর কেহই আমাকে তুলিতে পারিবে না। আমিই আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু।

আত্মৈব আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

এমন কথা, এমন স্পষ্টভাবে আর কোথাও কেহ বলিয়াছেন কি না জানি না। এই সরল সার্বজনীন সত্যের সহিত বাইবেলের Sermon on the Mount-এর তুলনা হইলেও হইতে পারে। নিজের পায়ে দাঁড়াইতে, নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে যদি শিখা দিতে হয়, তাহা হইলে গীতার ঐ একটি শ্লোকই লক্ষ শ্লোকের সমান মূল্যবান।

নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু এই কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে গিয়া গীতা বলিতেছেন : তোমার অবনীকৃত, অজিত, অসংযত আত্মাই তোমার শত্রু, আর বশীভূত হইলে আত্মার ন্যায় বন্ধু আর নাই।

আত্মা অর্থে এখানে মন, বিবেকবুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় গ্রাম সকলই বুঝাইতেছে। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণ এবং বিবেকের দ্বারা মনের বা চিত্তের বিক্ষোভদমন—ইহাই আত্মযোগ বা অভ্যাসযোগের মূলকথা। গীতা বলেন : দেহাদি প্রাকৃতপদার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম শ্রেষ্ঠ ; মন এই ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং মন হইতে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি—সদসৎ বিশ্লেষাত্মক জ্ঞান—সাধারণ কথায় যাহা বিবেক নামে পরিচিত। মনকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে আত্মসংযম-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। বাহিরের কর্ম বা অনুষ্ঠান সংযত করিলেই আত্ম-সংযম হইল না। একথা গীতা অতি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।

গীতা—তৃতীয় অধ্যায়

যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্‌পাণি প্রভৃতির নিগ্রহ করিয়া ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের ভাবনা করে, সেই বিমূঢ় কপটাচারী বলিয়া পরিগণিত হয়।

কিন্তু প্রকৃত আত্মসংযম অর্থে কর্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়—উভয়ের সংযম। যাহারা বাক্যে, কর্মে, চিন্তায় কখনও প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয় না, তাহারাই আত্মসংযমী, যতাত্মা বা যোগী। এইরূপ যোগী তপস্বী বা তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতেও আত্মসংযমী উৎকৃষ্ট। ইহাই গীতার অভিমত।

এই আত্মসংযমের ভারকেন্দ্র কোথায়? অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও তাহার একান্ত নিরোধ এই উভয়ের মধ্যে যে সুস্থ, সবল স্বাভাবিক মাত্রাজ্ঞান, তাহা কিরূপে লাভ করা যায়? ব্যাপার এই যে, আত্মসংযমের নামে প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন উপদিষ্ট হয় নাই। কেহ ইচ্ছা করুক আর না করুক, প্রকৃতির বশে, প্রকৃতির প্রেরণায় তাহাকে কর্ম করিতেই হইবে। অতএব স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিয়া এমন একটি মাত্রা নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে কর্মপ্রেরণাময়ী প্রবৃত্তিও একান্তভাবে নিরস্ত না হয়, অথচ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে এমন একটি সামঞ্জস্য থাকে যাহা আত্মাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সাধনার অনুপ্রেরণা দিতে পারে। সেই জন্য গীতার এই আত্মসংযমের মূলকেন্দ্র হইতেছে সমতা বা সাম্য। উচ্ছৃঙ্খলতা দূষণীয়, কঠোরতাও বর্জনীয়, মধ্যপন্থাই শ্রেয়ঃ। এরিষ্টট্‌ল্ ইহাকেই বলিয়াছেন Golden mean, বৌদ্ধেরাও এই মধ্যপন্থার গুণগান করিয়াছেন।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।

যিনি নিরাহারী, তাঁহার পক্ষে যোগসাধন কঠিন, আবার অতিরিক্ত ভোজীর পক্ষেও সহজ নহে। যাঁহারা বিষয়ভোগী, এমন কি নিদ্রাও আলস্য ব্যাপারেও মিতাচারী, তাঁহাদের পক্ষেই আত্মসংযমযোগ সুখসাধ্য। 'যুক্তাহার বিহারস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।' আহার বিহার সমস্ত কর্মে যাহার সংযম, যোগসাধন তাহারই পক্ষে সম্ভব।

একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, ভারতবর্ষের সাধনা সন্ন্যাসের আদর্শকেই প্রাধান্য দিয়াছে। বস্তুতঃ সাংখ্যযোগীরা কর্ম-সন্ন্যাস করাকেই শ্রেয় বলিয়া মনে করেন। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সাধন করিতে হইবে, প্রবৃত্তির কণ্ঠরোধ করিতে হইবে, সংসার হইতে পলায়ন করিতে হইবে। গীতা এরূপ Escapism সমর্থন করেন না। আত্মনিগ্রহ বা একান্তভাবে আত্মনিরোধ এবং আত্মজয়—এতদুভয়ের মধ্যে আত্মজয়কে শ্রেয়ঃ বলিয়া গীতা গ্রহণ করিয়াছেন।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

যিনি আত্মাকে জয় করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাপার বশে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে এবং সেই চিত্তে ভগবানের অধিষ্ঠান হয়।

সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির দাস। কিন্তু এই প্রবৃত্তি দুষ্পূরণীয়—ইহার তৃপ্তি সম্ভব নহে। সীমার মধ্যে ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা কঠিন। বায়ু সহযোগে অগ্নি যেমন ক্রমেই লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া সমস্ত পোড়াইয়া ছারখার করিবার জন্য অগ্রসর হয়, আমাদের কামনা বাসনা মানুষের সেইরূপ সংযমের সীমা হইতে মুক্ত হইয়া বহু অনর্থের সৃষ্টি করে। বহ্নি যেমন ধূমে আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন আগন্তুক মলিনতার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, মানুষের জ্ঞান সেইরূপ কামক্রোধের দ্বারা আবৃত থাকে। কাম এবং ক্রোধ একই ; কাম-কামনা বাধা পাইলেই ক্রোধরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু মানবসমাজ এই সুপ্রাচীন সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ভগবদ্গীতায় যে সত্য প্রচারিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য জগতেও তাহা প্রাচীন কাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এমন কি প্রাচীন সুখবাদী দার্শনিকগণ (Epicureans) পর্যন্ত ঐহিক সুখের তারতম্য বিচারে আত্মসংযমের মূল্য মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহার ফল কি হইল? ইয়ুরোপীয় বা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সাধারণতঃ জড়বাদ-প্রধান বলা হয় এবং আমাদের প্রাচ্য সাধনাকে বলা হয় অধ্যাত্মবাদ-প্রধান। আমার বোধ হয় এরূপ শ্রেণীবিভাগের কোনও অর্থ নাই। ঐহিক সুখবাদ যদি জড়বাদের পরিণাম হয়, তবে তাহা আমাদের দেশে কিছু কম নাই। আদর্শের দিক দিয়া পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। কার্যক্ষেত্রে এই আদর্শের অনুসরণ উভয়ত্র ব্যর্থ হইয়াছে—কোনও দেশে কম, কোন দেশে বেশী—এই মাত্র প্রভেদ। বস্তুতঃ আমরা যদি আমাদের আধ্যাত্মিক প্রবণতার বোহাই দিয়া প্রকৃত সাধনা সম্বন্ধে উদাসীন থাকি, তবে আমাদিগকে পরিণামে অনুশোচনা করিতে হইবে, ইহা স্থির। বরং ইহা স্বীকার করাই ভাল যে, আদর্শ সম্বন্ধে সেই সুপ্রাচীনকাল হইতে বিবাদ্বুষ্ট লাভ করিয়াও, আত্মসংযমের গৌরবলাভ করিয়াও, আমরা কৃতকৃতার্থ হইতে পারি নাই। আমরা প্রবৃত্তির তাড়নায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছি। ইহার জীবন-সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান কঠোরতা ইহার একটি কারণ। কিন্তু এই অবস্থার

ব্যাপকতায় যত আমরা সংযম হারাইতেছি, মনের বল যতই হারাইতেছি, বিষয়-সুখের সন্ধানে অন্ধের মত ছুটিতেছি, ততই অসন্তোষ জীবন হইতে জীবনান্তরূপে দেখা দিতেছে। মহা কি? ফলে সাম্প্রদায়িক কলহ তীব্র হইতেছে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রাণান্তকর যুদ্ধ বাধিতেছে এবং পাশ্চি জানুষের অন্তরাত্মা বিদায়া লইতেছে। ইহাতে মানবজাতির ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকার হইয়া উঠিতেছে। পুনরায় কোনও ব্যাপক যুদ্ধ বাধিলে আর রক্ষা নাই, বিশ্ব মানুষের অস্তিত্ব লোপ হইবে এবং সেরূপ বিপদ্ধের সম্ভাবনা দিন দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, একথা আর অস্বীকার করা যায় না।

এখন উপায় কি?—তাহাই প্রশ্ন।

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—ইহারাই মানুষের পরম শত্রু।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ।

—গীতা ১৬ অঃ। শুধু গীতায় কেন? পৃথিবীর সমস্ত সত্য দেশেই এই সত্য পুরাতীত কাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কোন একটি সত্য সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্ববাদিসম্মত বলিয়া যে তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে বা তাহার উপর নিরর্থক মনে করিতে হইবে, তাহা কখনও হইতে পারে না। যাহা যৌলিক সত্য, অর্থাৎ যাহার ভিত্তি মানুষের প্রকৃতির সর্বোচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে অস্বীকার করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। মানুষ সেই আত্মহত্যার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছে, এখন পূর্ণাহুতি দিতে মাত্র বাকী।

মানুষের জীবনে দুইটি অংশ মিলিত হইয়া একটি পূর্ণত্ব নির্মাণ করিতেছে—তাহার একটি প্রবৃত্তি, অপরটি নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লইয়া যে যুক্ত গঠিত হয়, তাহাকে ধর্মচক্র বলা যাইতে পারে। প্রবৃত্তি প্রবল হইলে নিবৃত্তি নিষ্পাপ হয়। এতদিন মানুষ প্রবৃত্তির অশ্ব ছুটাইয়া যতদূর যাওয়া যায়, প্রায় তাহার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন ধীর স্থির ভাবে আত্মসমীক্ষা করে একবার মোড় ফিরাইতে পারা যায় কিনা দেখা কর্তব্য। কিন্তু সেরূপ যে বৈরাগ্য চাই, তাহা এখন এই ভোগপ্রাচুর্যের যুগে কে স্বীকার করিবে? কিন্তু আত্মযোগ বৈরাগ্য ব্যতীত সম্ভব নহে। প্রবৃত্তিকে পুরামাত্রায় তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিব, আত্মসংযমও করিব—ইহা হইতে পারে না। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, মন চঞ্চল, দুর্নিগ্রহ কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে দমন করিতে হইবে। মন স্বভাবতঃ যায় অর্থের দিকে, যায় ভোগের দিকে, মুক্ত হয় প্রকৃতির প্রলোভনে—তাহাকে ফিরাইয়া আনিব কিরূপে? ইহার সমাধানে বলা হইয়াছে যে একবারে বৈরাগ্যের দ্বারাই চিত্তবিক্ষেপ রুদ্ধ করিতে পারা যায় এবং নিরন্তর তাহা করিতে করিতে ইন্দ্রিয়সংযম আয়ত্ত হইয়া আসে ইহাই নিবৃত্তি, ইহাই গীতার শিক্ষা। সর্বকালে এই শিক্ষার উৎকর্ষ মানব সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে ও হইবে। গীতা যদি শুধু এই চারিত্রনৈতিক শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলেও পৃথিবীর ধর্ম-সাহিত্যে ইহা অমরত্বের দাবী করিতে পারিত।

বর্তমান জগতে এই আদর্শের মহিমা স্বীকৃত হইলেও, ইহার অনুসরণ বিরল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ বৈরাগ্যের সে সাধনা নাই, নিবৃত্তির স্থান নাই। ভগবদ্গীতা যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, তাহার মূল্য আমরা স্বীকার করি নাই। সেই জন্যই মানব-সমাজ চরম দুর্গতির পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছে। কিন্তু গীতার উপদেশ অনুসারে কর্ম করা কঠিন নহে। কারণ গীতা কর্মকে বর্জন করিতে বলেন না, প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে বলেন নাই। প্রবৃত্তি-বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অনুশীলন-পূর্বক চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, সমস্ত কর্মফল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করাই গীতার দীক্ষা।

ভারতবর্ষের স্বপ্রচিত যে এই পবিত্র আদর্শের প্রতি এখনও পক্ষপাতী, ইহাই আমাদের একটি পরম সৌভাগ্য-নিদর্শন বলিতে হইবে। এখনও এখানে মধ্যে মধ্যে এরূপ মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, যাঁহারা প্রতিকূল আবেষ্টনীর মধ্যেও সেই প্রাচীন শাশ্বত ধর্মের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া জগতের বিস্ময়স্তব্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করেন। পাশ্চাত্যেরও শ্রীঅরবিন্দের সাধনার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় সংসারের সুখভোগ তুচ্ছ করিয়া তিনি বহুদিন এক সুদূর সমুদ্রতীরে গিয়া নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়া সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই মৌন সাধনার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বিশ্বের মুমুক্ষুরা স্রোতের ন্যায় পণ্ডিচেরির সমুদ্রোপকূলের অভিমুখে চলিয়াছে। সে সাধনায় কিছু বুঝি বা না বুঝি, তাঁহার সেই শান্ত, সমাহিত, আপনাতে আপনি সমস্ত বুঝি বোঝা মনে হইয়াছিল এই ত ভগবদ্গীতার জীবন্ত ভাষ্য! এই কলকারখানাময় ধনবপুরীতে বিংশ শতাব্দীতেও মহা-যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট মানসিক যোগসাধনার মূর্তিমান বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়! মনে হইল, জীবন্মুক্তির সেই চিত্র:

প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি।
তথা তেন প্রাণভূতোঽপি স কৈবল্যাশ্রয়া ভবেৎ।

—যোগবাশিষ্ঠ

প্রাণহীন দেহে যেমন সুখ দুঃখের অনুভূতি থাকে না, প্রাণ থাকিতেও যদি সেইরূপ কাহারও হয় তবে তাঁহাকেই বলা যায় জীবন্মুক্ত পুরুষ।

শ্রীঅরবিন্দের অসামান্য অবদান 'লাইফ ডিভাইন' (Life Divine), তাঁহার চিন্তাশীলতার অপূর্ব নিদর্শন, 'গীতাপ্রবন্ধ' প্রভৃতি ভারতীয় সাধনার সুপ্রাচীন অথচ চিরনবীন আত্মবিকাশ।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাগবত-জীবনের চিত্র তুলিয়া ধরিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তাহারই ধারা আজিও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় ভারতের অধ্যাত্মজীবনের নিম্ন ধারায় প্রবাহিত হইতেছে।

তোমাও কিছু নেই হঠাৎ স্বামী এসে বললেন "বিলেত যেতে হবে। Dublinএর আন্তর্জাতিক-যাত্রীবিদ্যা-কংগ্রেস থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে"। কিছুকাল থেকে বিলেতে যাবার কথা হচ্ছিল। কিন্তু এত শীঘ্রির যে যেতে হবে তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। যাহোক যেতে হবে তো হবে। আমার শ্রদ্ধেয় এক বন্ধু, চলতি ভাষায় তাঁকে আমি ঠিবিবাবি বলি, খবরটা শুনে মহা উৎসাহিত হয়ে বললেন— "ওহহ ইন্দ্র্। আশ পাশের ভাবনা ছেড়ে অর্থাঙ্গিনীর অধিকারটা এইসময়ে পুরো বুঝে নাও। এরকম সুযোগ বেশী আসে না" ইত্যাদি। শেষটায় তিনি বললেন "তোমার ভ্রমণের একটা ডায়েরী লিখে নিয়ে এস, উপভোগ্য হবে"। ঠিবিবাবির বন্ধুর যাববার জন্য লালচটী দেবীর অকৃপণ উপেক্ষা করেই এই ডায়েরী লেখা।

হিসেব করে দেখলাম তিনমাসে আমরা প্রায় ৩২ হাজার মাইল আকাশপথে বেড়িয়েছি এবং এই ৩২ হাজার মাইল ঘুরতে পৃথিবীর প্রায় সবরকম বিমানেই উঠতে হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যাত্রা করবার পূর্বেই সুইডেন আমেরিকার কয়েকটি য়ুনিভার্সিটি থেকে জানবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য আমার স্বামী ডাঃ ঠিত্রের কাছে নিমন্ত্রণ এসেছিল। সুতরাং আমাদের সুইডেন, ইংলণ্ড, আয়ারলণ্ড, আমেরিকা (পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত) এবং ক্যানাডার ঘুরতে মোট ১৩খানি বিভিন্ন বিমানে চড়তে হয়েছিল। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই তিন মাসে যতগুলো প্লেন রাস্তায় ভেঙেছে, এক যাত্রে যুদ্ধের সময় ছাড়া আর কখনও এরূপ হয় নি। প্রতিদিনই সকালে খবরের কাগজ খুলতে দেখতে পেতাম "Plane crash"। ভালো ভালো কোম্পানীর প্লেন ভেঙেছে এবং

বিমান ঘাটিতে চলচ্চিত্র পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং R. W. A. C. সদস্যগণের বিমায় অভিবাদন

তার ফলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। বোধহয় বৃহস্পতির জোর ছিল, তাই বোধহয় আমরা বেঁচে ফিরে এসেছি।

কলিকাতা থেকে ২৭শে এপ্রেল ঠবিবারে আমরা যাত্রা করলাম। ভোর ৬টায় B. O. A. C. কোম্পানীর অফিস ভিক্টোরিয়া হাউসে

মালপত্তর যার নিজেদেরও ওজন দেওয়া হল। ওদেরই কোচে চড়ে এরোড্রমে ১টার সময় পৌঁছলাম। "যাত্রা শুরু হল এবার ওগো কর্ণধার—তোমারে করি নমস্কার—" আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে যেতে মন কেমন করতে লাগলো। দেশের এই সাম্প্রদায়িক গোলমাল এবং অরাজকতার মাঝে তাঁরা সবাই রইলেন; আমরা চলেছি বহুদূরে। —হয় ত খবর ঠিকমত পাব না। হঠাৎ বিমান ঘাঁটিতে দেখে বেখি, দা ভাই বোন ও R. W. A. C.র কর্মীবৃন্দ আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছেন। বিমান ছাড়বার সময় অল্পই বাকি ছিল, তাড়াতাড়ি সকলের সাথে দেখা করে বিদায় নিয়ে বিমানে উঠলাম। বন্ধু বান্ধবের

হঠাৎ বিমান ঘাঁটিতে কন্যা-সহ লেখিকা

কণ্ঠে শেষ-সম্বর্ধনা "জয়হিন্দ" শুনে বিমানের ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলাম। বিমানটি ছোট, ভিতরে মাত্র ১২ জন যাত্রীর স্থান রয়েছে। আমরা চেয়ারে বসে বসে বেল্ট বেঁধে কানে তুলো দিলাম। চলা শুরু হল। আমি জানালার ধারে বসে সকলকে দেখতে লাগলাম। বিমান-ঘাঁটির শেষ প্রান্তে এসে ভীষণ জোরে বম দিয়ে গর্জন করতে করতে বিমান আকাশে উঠে পড়লো। ঢাকা ট্রলী ডানার তিতর ধীরে ধীরে গুটিয়ে গেল। আমরা সুস্থ হতে লাগলাম। হঠাৎ আমার শরীরটা কেমন আনচান করে উঠলো। বিশ্রীরকম অস্বস্তি বোধ করলাম। ঝাঁকুনিতে ও আওয়াজে প্রাণ যায়। নিরুপায় হয়ে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে রইলাম। হাওয়ার ভেসে চলেছি, কখনও উঠছি কখনও নীচে নেমে পড়ছি।

আমরা ১০০০০ ফিট উপরে উঠেছি, ২৫০ মাইল গতিতে বিমান ছুটে চলেছে। এখানে মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে বিমান ঊষার মত ধেয়ে সোজা ছুটে চললো। আমি একটু সুস্থ হয়ে জানালায় তাকিয়ে দেখি নীচে যেন এক পুতুলের দেশ। সহরগুলি খেলনার সাজানো খেলনার মত, পাহাড় যেন মাটির ঢেলা, সুদীর্ঘ নদীগুলি এঁকে বেঁকে সতেজ তন্বী হয়ে চলেছে। পাশেই দেখা যায় জিওমেট্রির বইয়ে টানা সোজা লম্বা রেখার মানপথ। পৃথিবীর এই নতুন রূপ দেখে আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ষ্টুয়ার্ড এসে কাজুবাদাম, লেবু, লজেন্স, চুইংগাম আমাদের দিয়ে গেল। শেষে এক কাপ গরম

বিমানে আরোহণ

কফি পেলাম। পাইলট একটুকরা কাগজে তার বক্তব্য লিখে যাত্রীদের কাছে পাঠিয়েছে। তাতে লেখা আছে—

> এখন যুক্তপ্রদেশের উপর দিয়ে যাচ্ছি। ১০০০০ ফিট উপরে ২৭৫ মাইল ঘণ্টায় চলেছি। বেলা ১২টায় দিল্লী পৌঁছাব। আকাশ পরিষ্কার।

বেল্টবাঁধার হুকুম হল। দেখতে দেখতে আমরা দিল্লীর ভূমি স্পর্শ করলাম। বিমানঘাঁটির সামনেই দেখা যায় দিল্লীর "লাল কেল্লা"। আমরা এখানে একঘণ্টা বিশ্রাম করব। লালকেল্লা দেখে পুনঃ আরোহণ করে উঠলো "লাল কেল্লায় আজীর বিমান তোল—দিল্লী চলো। ডাক আসতে আবার আমরা বিমানে গিয়ে উঠলাম। করাচী অভিমুখে

ছেলেছি। একটু দূরে এসে দেখা গেল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বিমান দুলতে লাগলো। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মেঘের মাঝে পড়ে ওঠানামা করতে করতে চলেছে। আমাদের অবস্থা কাহিল। খুব বমি করে ফেলেছে, আমারও গা গুলিয়ে উঠলো, ইুয়ার্ড একগেলাস জল ও ওষুধ দিয়ে গেল। বমির ভাব তবুও যায় না। ইতিমধ্যে সোঁ সোঁ করে বিমান চড়ে পড়লো ঘোরো ঘাসের কিট উপরে, নীচে ছইল ঘোড়ো মেঘ। ইুয়ার্ড এসে তাড়াতাড়ি সকলকে Gas mask পরিয়ে দিল। অক্সিজেন নিয়ে বেশ সুস্থ হলাম। লাঞ্চ্ এল, খিদে থেতে লাগলাম—কিন্তু টিনের মাংস, সব্জি ও এক পেয়ালা কফি।

আমরা রাজপুতানা পার হয়ে বিকেল ৪টের সময় করাচীতে নামলাম। B. O. A. Co কোং আমাদের করাচীর Palace Hotel এ নিয়ে গেল, কথা ছিল Thos Cook আমাদের জন্য একখানি ঘর এখানে পূর্ব্বেই রিজার্ভ করে রাখবে। অফিসে গিয়ে খবর নেলাম তারা Thos Cook এর কোন চিঠিই পায় নাই। যাহোক্, তারা তখুনি আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দিল। আমার মালপত্র রেখে চা খেয়ে একটা ট্যাক্সিতে করে সমুদ্রপারে বেড়াতে গেলাম। করাচী সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী ও ভারতের একটি বিখ্যাত বন্দর। এখানকার এই সমুদ্রসৈকতটির নাম ক্লিপ্টন্। তীরের উপর দিয়ে একটি বাঁধানো লম্বা রাস্তা সোজা জলের ধার অবধি চলে গেছে, তার উপর দিয়ে হেঁটে আমরা বালির উপর নামলাম। সেখানে আমাদের পরিচিত দু'তিনটি প্রবাসী বাঙ্গালীর সাথে দেখা হল। সন্ধ্যা হতে আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠে চা খেয়ে সহর ঘুরতে বেরোলাম। প্রথমেই গেলাম P. A. Ax অফিসে খবর নিতে যে বিমান কয়টায় লণ্ডন যাত্রা করবে। জানা গেল বিমান তখনও করাচী এসে পৌঁছয়নি, সুতরাং সব অনিশ্চিত। সেদিন আর যাওয়া হবে না জেনে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে দেখা হল Mr. J. C. Gupta'র সাথে; তিনিও লণ্ডনের পথে করাচী এসেছেন। তাঁর এক স্থানীয় বন্ধু সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদের সহর দেখাতে নিয়ে গেলেন।

রাস্তার মালবাহী উটের গাড়ী দেখে খুকুর আনন্দ আর ধরে না। ঘুরতে ঘুরতে বেলা ২টায় স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের ডিরেক্টর ডাঃ শঙ্কর দেবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে উপস্থিত হলাম। তারপর সহর ঘুরে বেড়িয়ে প্রায় ৭টায় হোটেলে ফিরলাম। এরোড্রমে ফোন করে জানা গেল যে পরদিন সকাল ৮।৯টায় আমাদের বিমান লণ্ডন যাত্রা করবে।

পরদিন ২৮শে এপ্রেল সকাল ৭টায় আমরা হোটেল ছেড়ে P.A.Ax কোচে করে এরোড্রোমে পৌঁছলাম। সেখানে শুল্ক অফিস, পাসপোর্ট অফিস ও আস্থ্য বিভাগের হাঙ্গামা সেরে বিমান ঘাঁটির ঘাটে এসে দেখি প্রকাণ্ড এক দৈত্যের মত বিমান ঘাটের মাঝে হাত পা ও ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে বিমানে উঠ্লাম। যথাস্থানে বেল্ট্ বেঁধে বসেছি, বিমান আকাশে উঠলো। বিমানটি চার ইঞ্জিনের। আমরা মোট ১২ জন যাত্রী চলেছি। তার মধ্যে ৪.৫ জন ভারতীয়, আর বাকি সব ইংরেজ-পীয়ান। বিমানের ঘর এয়ার-টাইট, জানলাগুলি ডবল কাঁচের, বাইরের আওয়াজ খুব কমই ঘরের ভিতর পৌঁছায়। খুব আরামে চলেছি, কোন কিছু কষ্ট নেই। আমি জানলার ধারে

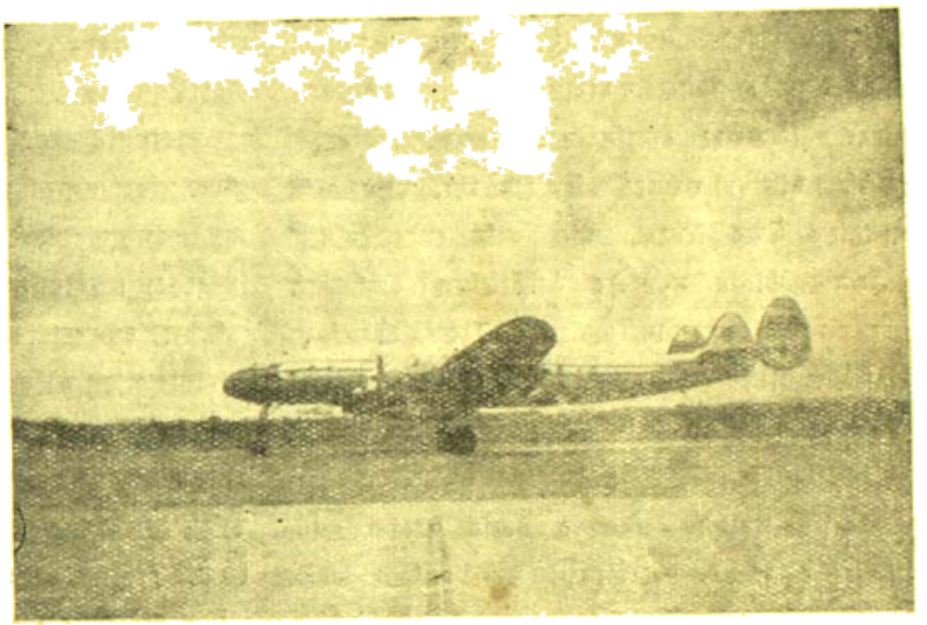

যাত্রা সুরু

বসে বাইরের অপূর্ব্ব শোভা দেখছি—

পৃথিবীর ঘরবাড়ী মাঠ ঘাট নদী পাহাড় ক্রমশ: ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে—দেখতে দেখতে তাও সব কোথায় মিলিয়ে গেল—এই বিশাল পৃথিবী আমাদের দৃষ্টির বাইরে একেবারে চলে গেল। উপরে নীচে পাশে তাকিয়ে দেখি চারিদিক শূন্য। আমরা শূন্যে ভাসছি। আমরা কোথায় আছি ঠিক বুঝতে না পেরে একটু যেন কেমন কেমন মনে হতে লাগলো। পৃথিবীর মানুষ আমরা, সমস্তক্ষণ পৃথিবীর মাটিতে জড়িয়ে থাকি। পায়ের তলায় মাটী নেই জানলেই ভয় করে। আমি আমেরিকান ইুয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করলাম—কত হাজার ফিট উপর দিয়ে বিমান চলেছে। সে বললো প্রায় ১৭০০০ ফিট হবে, বিশ বাইশ হাজার ফিট উপর দিয়ে সারারাত বিমান চলবে। ইতিমধ্যে পাইলটের স্লিপ্ এল, পড়ে দেখলাম—

ঘণ্টায় ২৭০ মাইল বেগে ১৮০০০ হাজার ফিট উপর দিয়ে বিমান চলেছে। বাইরের টেম্পারেচার—১৫°, আকাশের আবহাওয়া ভালোই, বিমানের ঘর গরম, বাইরের ঠাণ্ডা আমরা কিছুই জানতে পারছি না। চারিদিকে নীচে নিস্তব্ধ, উপরে সূর্য্যের রশ্মি হচ্ছে প্রখর, নীচে মেঘের দল ধূ ধূ করে ছুটেছে। আমরা ইরাক ইরান পেরিয়ে ভূমধ্যের প্রায় শেষ সীমানায় এসে পড়লাম। বেশ বাতাস ভালো জমে উঠলো, ধীরে ধীরে আমরা ভূমধ্যের ওপর—ইতালীতে এলাম। বিমান ঘাঁটিতে নেমে ওয়েটিং রুমে ঢুকলাম। তখন প্রায় ৩টা বাজে, আমরা এখানে এক ঘণ্টা থেকে সান্ধ্য আহার সেরে নেব।

(ক্রমশঃ)

আগ্নেয়গিরির অতীত

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হীরাসিং তাহার নিম্নস্থ মেঘের পানে তাকাইয়া ভাবিল প্রথম প্রণয়ীকে কুমারীর স্বাভাবিক সলজ্জতা। আবেগ স্পন্দিত হৃদয়ে হীরাসিং তাহার হস্তস্পর্শ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল "মিঃ সিং, আমি কাল আপনাকে উত্তর দেবো, আজ আমি ভেবে দেখি।" উত্তেজনায় তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। অতিক্রান্ত প্রহরের সীমায় যে ক্ষীণ চন্দ্রালোক বিস্তৃত হইতেছিল, তাহাতে সুখলতার মুখ দেখা যায় নাই। পাংশু বিবর্ণ মুখের ভিতর কালো দুটি চোখ অগ্নি জ্বালায় জ্বলিতেছিল।

৯

বিবাহের পরদিনই সুখলতার ইচ্ছায় তাহারা ফ্রান্স অভিমুখে রওনা হইল। ইউরোপ ভ্রমণ সারিতে চাহে যে? কেমন এক অদ্ভুত হাসি সুখলতার মুখে ফুটিয়া উঠিল। মাকে পত্র দিল যে সে এক পাঞ্জাবীকে সিভিল ম্যারেজ আইনে বিবাহ করিয়াছে। তাঁহারা অনুমতি দিলেই তাহারা দেশে রওনা হইবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক ও মাসিকে তাহার বিবাহবেশে সজ্জিত যুগল ফোটো পাঠাইয়া দিল। বিলাতী পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ছাত্র ছাত্রীর বিবাহ। মিঃ হীরাসিং ও মিসেস সুখলতা সিং। আপন হস্তে প্রত্যেক পত্র প্রস্তুত করিয়া পোষ্ট করিল। হয়ত কোনও একটি কাগজ পড়ে তো?

কিন্তু অবাধ্য চক্ষু জ্বালা করিয়া জল আসে কেন?

ফ্রান্স পৌঁছিয়া ম্যাকাবির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিল যে "সে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের স্কলারসিপ ত্যাগ করিল। প্রেম বিবাহের পর তাহার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। সে রিসার্চ্চের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। তিনি যেন ক্ষমা করেন।" বহু আকাঙ্ক্ষিত থীসিস অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

তাহার পর ভ্রমণ। ফ্রান্স, ইটালী, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মানী ঘুরিয়া ঘুরিয়া অশান্তচিত্ত কোনও মতে শান্ত হইতে চাহে না। বক্ষচ্যুত গ্রহের মত কেবলি যেন স্থান খুঁজিয়া ফিরিতেছে। হীরাসিংও অবশেষে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিল। অর্দ্ধ রাত্রে যখন তাহার আলিঙ্গন পাশ ছিন্ন করিয়া সুখলতা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইত, বিস্মিত ক্ষুব্ধ হীরাসিং ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহারি পাশে আসিয়া দাঁড়াইত। তাহার বিবর্ণমুখের পানে চাহিয়া হয়ত ভাবিত সম্ভোগমুক্ত সুখলতার মস্তিষ্ক এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। কিন্তু তাহাই কি? হায় হীরাসিং, কেমন করিয়া জানিবে যে তাহাদের মাঝে কে বাধা হইয়া আছে? সেই দুস্তর অলঙ্ঘ্য বাধা অপসারিত করিয়া হীরাসিংয়ের নিকটস্থ হওয়া সুখলতার পক্ষে যে অসম্ভব।

প্রতিশোধ লইতে গিয়া সে পরাজিত হইয়াছে। আপনি ব্যথা পাইল—নিরীহ বিশ্বস্তহৃদয় হীরাসিংকে ব্যথা দিল। বিবাহের পরদিন হইতে তাহার ভুল সে বুঝিতে পারিয়াছিল। হীরাসিংয়ের চুম্বন তাহার মেরে মনে অসহ্য জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। ইহা সে চাহে নাই—ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। সন্তোষে মুখ মুছিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিত, "ভাল লাগে না, আমার এসব ভাল লাগে না।" ব্যথিত হীরাসিংয়ের করুণ মুখের পানে চাহিয়া বেদনাবোধ করিত। আপন অস্থির মনের বোঝাই দিয়া ক্ষমা চাহিত।

ক্রমে তাহার রুক্ষ প্রকৃতি তাহার নিজের নিকটই বিস্ময় সৃষ্টি করিত। হীরাসিং? কোথায় হীরাসিং, এই উদ্ধার মত আলাভোলা নারীকে পাইয়া সে নাকি সুখী হইয়াছিল।

দুর্ব্যবহার করিবার পর ক্ষমা চাহিলে হীরাসিং যাহা বলিত, তাহা এখনও যেন কর্ণে আসিয়া বাজে "সু আমি তোমায় পেয়েই সুখী, আমার মত অযোগ্যের ভাগ্যে তুমি যেন কোহিনুর। তোমার কোনও অপরাধ আমি বুঝতে পারি না। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা তুমি অসুস্থ।"

অভাগা হীরাসিং—বিবাহের বৎসর কয়েক পরেই তাহার মৃত্যু হয়। হয়ত হীরাসিং বাঁচিয়া থাকিলে তাহার অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রেমভরে তাহার ব্যথাহত চিত্ত বেদনা ভুলিত।

তাহারি ইচ্ছায় হীরাসিং বোম্বেতে প্র্যাকটিশ সুরু করিয়াছিল।

আশ্চর্য্য তাহার জীবন। যে দিন সে ভারতবর্ষের ভূমি ত্যাগ করিয়াছিল, সেই দিনই সে তাহার পিতামাতা ভ্রাতা-ভগ্নী প্রেমাস্পদ সবাইকেই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। আর কাহারো সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহাদের সহিত কোন সম্পর্কই থাকে নাই।

তাহার বিদেশে থাকিয়া পাঞ্জাবী বিবাহের খবর শুনিয়া পিতা লিখিয়াছিলেন যে "তুমি আর কোন দিন আমাদের সম্মুখে আসিও না, আমরা ভাবিব যে আমাদের প্রথমা কন্যা নাই, কোন দিন ছিল না। তোমার উপর অনেক ভরসা রাখিয়াছিলাম যে তুমি সুশিক্ষিতা হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। তোমার শিক্ষার ফলাফল দেখিয়া আমার ভুল হইয়াছে, বংশের আর কোনও কন্যাকে কোনও দিন লেখাপড়া শিখাইব না।

যাক তুমি আমার উচ্চ আশার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছ। আর কোন দিন তুমি বা তোমার পত্র যেন আমার গৃহে না আসে, তাহাতে আমার গৃহ কলঙ্কিত হইবে।"

টাকার অভাব কোনও দিন সুখলতা অনুভব করে নাই। হীরাসিং যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন কি যাপন করা যায়? একাকী বোম্বে আর ভাল লাগিতেছিল না। কোথায় যাইবে ভাবিতেছিল। এমন সময় সুদূর বিহার প্রদেশের একটি উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে এই চাকুরীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিয়াছিল।

তাহার শিক্ষার অথবা ডিগ্রীর উচ্চতা দেখিয়া কর্তৃপক্ষ সানন্দে তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করেন।

ক্রমে জীবনে অনাথা বালিকা রেবার স্থান হইয়াছে, কন্যা স্নেহে তাহাকে সে প্রতিপালন করিতেছে।

কত বৎসর তাহার পর চলিয়া গেল? উঃ তাহার পর আরো কত বৎসর আসিবে? আরো কতদিন? কতদিন এই নিঃসঙ্গ মরুভূমির মত জীবন যাপন করিতে হইবে? হে ভগবান!.....

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল। রেবা আসিয়াছে। সুখলতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, অবিরাম প্রবাহিত অশ্রুধারায় তাঁহার সমস্ত মুখটা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য!

বিস্মিত রেবা সেদিকে একবার চাহিয়া মুখ নত করিয়া বলিল—"খাবে এস মা, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, তুমি ঘুমিয়েছ ভেবে কেউ তোমায় ডাকতে পারে নি।"

ঘন কৃষ্ণ মেঘের অন্তরালে চাঁদ একবার দেখা দিয়া আবার অবলুপ্ত হইয়া গেল।

টুক্‌রা কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

কত যে আশার বাসুকা বেলায়
ধাঁধে সবে সুখে ঘর
কালের চক্র ঘুরিতে ঘুরিতে
তোলে আসি সেথা ঝড়।

যত কিছু আশা মৃদু ভালবাসা
মিশিয়ে উড়িয়া যায়
বিফল রজনী সুধা বাতাসে
করে শুধু হায় হায়।

স্বাধীন ভারতের প্রথম রেল বাজেট

গত ২০শে নভেম্বর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যানবাহন সচিব মিঃ জন মাথাই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে স্বাধীন ভারতের প্রথম রেল বাজেট উপস্থাপিত করেন। এই বাজেট একটি সম্পূর্ণ বৎসরের নয়, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট অর্থাৎ বর্তমান কর্তৃপক্ষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার হাতে লওয়ার দিন হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ বা চলতি (১৯৪৭-৪৮) আর্থিক বৎসরের শেষ পর্যন্ত এই সাড়ে সাত মাসের সাময়িক রেলপথ-সমূহের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতবিভাগের পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে, তজ্জন্য বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের অবশিষ্টাংশের বাজেট পৃথকভাবে উপস্থাপিত করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বাজেটের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও একথা খুব দুঃখের সঙ্গেই বলিতে হয়, তাঃ জন মাথাই আলোচ্য বাজেট দেশবাসীকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। যুদ্ধের চাপে এ দেশের লোক দীর্ঘকাল যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, যুদ্ধ থামিবার পর স্বস্তিলাভের আশা করিলেও সে আশা তাহাদের পূর্ণ হয় নাই। এখন স্বাধীনতালাভের পর তাহারা মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার লাভের যে স্বপ্ন দেখিতেছে, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপরিচালকদের দিক হইতে এ সম্বন্ধে উৎসাহ বাণীও তাহারা শুনিয়াছে যথেষ্ট, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আলোচ্য রেল বাজেটের ন্যায় ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা হতাশ না হইয়া পারে না। আলোচ্য বাজেটে রেলকর্ম্মচারীদের কিছুটা সুখ সুবিধা বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্ভাব্য ঘাটতি রোধ করিতে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে বিপন্ন দেশবাসীর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠা স্বাভাবিক। তাছাড়া যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পয়সায় রেলের আয়—অথচ যাহারা এতকাল কৃপাপ্রার্থীদের মত কোনমতে ভারবহী হইয়া রেল ভ্রমণে বাধ্য হইয়াছে, এবারের স্বাধীন ভারতের রেল বাজেটেও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা হয় নাই।

বাজেটে অনুমান করা হইয়াছে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ, এই সাড়ে সাত মাসে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথসমূহের মোট আয় হইবে ১০৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা (সাধারণ খাতে ১০৭ কোটি টাকা। বিবিধ খাতে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা) এবং মোট ব্যয় হইবে ১২০ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা (সাধারণ খাতে ১০৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ও মূলধন খরচ ১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা), কাজেই এই সময়টুকুর মধ্যে ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য যানবাহন সচিব ভাড়া মাশুল বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে মোট ৯ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে এবং ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বাকী ঘাটতি মজুত তহবিল হইতে পূরণ করা হইবে।

দেশব্যাপী যাত্রা-যাতায়াত ও রেলপরিচালনায় খানিকটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে এবং ইহাতে রেলপথের আয় কিছুটা কমিয়াছে। তবু গত ফেব্রুয়ারী মাসে উপস্থাপিত ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে মোট ১৯৩ কোটি টাকা (সাধারণ খাতে ১৯০ কোটি টাকা, বিবিধ খাতে ৩ কোটি টাকা) আয়ের যে অনুমান হইয়াছিল, ভারতের মোট রেলপথের এক পঞ্চমাংশ মাত্র পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ার তদনুসারে আলোচ্য সাড়ে সাত মাসের আয়ের হিসাবে এতটা অবনতি অবশ্যই আশা করা যায় না। পাকিস্তানে রেলপথ পড়িয়াছে মাত্র ৬,৭৪৮ মাইল, পক্ষান্তরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ২৪,০০০ মাইল রেলপথের মধ্যে ২১,১৮০ মাইল ভারত-বিভাগের ফলে কোনদিক হইতে আঘাত পায় নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে আয় হ্রাস যদি আশঙ্কা করাই হয়, তাহা সামান্য মনে করাই উচিত এবং তদনুসারে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবের সহিত তাঃ মাথাইয়ের উচিত ছিল—পরবর্ত্তী বৎসরের আশঙ্কাকৃত আয় হ্রাস না ঘটিলে বর্দ্ধিত ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইবে,—এই ধরণের একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

ভারতীয় রেলপথের ব্যবস্থা একেবারে জঘন্য। নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের কথা না তোলাই ভাল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাও অধিক ভাড়া দিয়া কোন দিক হইতেই আশানুরূপ সুখ-সুবিধা পান না। এইজন্যে একে সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়া আছে, তাহার উপর, আবার যাত্রীসাধারণের স্কন্ধে ভাড়াবৃদ্ধির চাপ পড়িল। বৃদ্ধির হারও উপেক্ষার মত নয়। তৃতীয় শ্রেণীর ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের মাইল পিছু যথাক্রমে ৩/৬ পাই ও ৫/৭ পাই ভাড়া দিতে হইত, নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতি মাইলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মেল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেণে যথাক্রমে ৫ ও ৪ পাই হিসাবে এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের মেল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেণে যথাক্রমে ৯ পাই ও ৮½ পাই হিসাবে ভাড়া দিতে হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরও অবশ্য ভাড়া বাড়িয়াছে (প্রথম শ্রেণী মাইলে ২৫ পাইয়ের স্থলে ৩০ পাই এবং দ্বিতীয় শ্রেণী মাইলে ১২ পাই স্থলে ১৩ পাই), তথাপি এই শ্রেণীর যাত্রীদের ব্যয়-সামর্থ্য বেশী বলিয়া তাহাদের তুলনায় দরিদ্র তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের উপর অনেক বেশী হইবে। যাহারা রেলিপ্যাসেঞ্জারী করেন, বাজেটে তাহাদের ভাড়াও শতকরা ১২½ ভাগ হইতে শতকরা ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলা চালানে রিবেট দেওয়ার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং টারমিনাল চার্জ্জ ও সারচার্জ্জ বাড়ানো হইয়াছে,

এইভাবে রেলবিভাগে কিছু আয় বাড়িতে পারে, কিন্তু কয়লার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ইহাতে দেশবাসীর দুর্গতি বৃদ্ধিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এবারের বাজেটে রেলকর্মচারীদের সুখ-সুবিধা বিধানের যে সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দরিদ্র ভ্রমণকারীদের উপর এতটা চাপ না পড়িলে তজ্জন্য আমরা অবশ্যই উচ্ছ্বসিত আনন্দপ্রকাশ করিতাম। গে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রেলকর্মচারীদের বেতন বাড়াইবার ও তাহাদিগকে সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য এবারের বাজেটে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এইভাবে কর্মচারীদের কল্যাণসাধন ছাড়া যানবাহন-সমস্যা আর একটি ভাল কাজ করিয়াছেন। এতদিন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মিলিটারী যাত্রীরা অর্ধ ভাড়ায় যাতায়াত করিতেন, এবার এই অযৌক্তিক সুবিধা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ছাড়া আসাম ও উত্তর অঞ্চলের যোগাযোগের জন্য, বি-আই-পি রেলপথে জীমসেন-বৈরাগী ও পূর্ব পাঞ্জাবে ফেরোজ-চালোরা লাইনের জন্য যানবাহন সমস্যা যে ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন, নূতন লাইনের প্রয়োজনের বিবেচনায় তাহাও দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে। একমাত্র অযোধ্যা-তিরহুত রেলপথ যে কোন প্রকৃতির ফলে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির দুর্ভোগ হইতে রেহাই পাইল, যানবাহন সমস্যা সে সম্বন্ধে কিছুই খুলিয়া বলেন নাই।

১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে ৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত অনুমান করা হইয়াছিল এবং ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল, যানবাহন সমস্যা জানাইয়াছে যে অর্থাভাব হওয়ায় রাজস্ব তহবিলে এই টাকা এবার আর দেওয়া হইবে না। বলা নিষ্প্রয়োজন ইহার ফলে রাজস্ব তহবিলের বিশেষ ক্ষতি হইবে। রেলপথ উন্নয়ন তহবিলেও (Betterment fund) এবার কোন টাকা রাখা হইবে না, পরন্তু এই তহবিল হইতে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা তুলিয়া লইবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে এই প্রয়োজনীয় তহবিলটিকে একান্ত দুর্বল করিয়া ফেলা হইবে। এই তহবিলটি মাত্র ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্তমানে ইহাতে জমা আছে ৮ কোটি ৭ লক্ষ টাকা।

মোটের উপর স্বাধীন ভারতের জনপ্রিয় মন্ত্রী যে বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন, কিছু অসুবিধা হইলেও সহানুভূতির সহিত তাহা বিবেচনা করা দেশবাসীর কর্তব্য। যুদ্ধের সময় অত্যাবশ্যক পরিস্থিতিতে রেল-পথসমূহের যে আয় বাড়িয়াছিল, যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একাংশ হ্রাস পাইয়াছে, অথচ যুদ্ধের সময়কার বর্দ্ধিত ব্যয়ভার এখনও কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এ অবস্থায় ভাড়া বাড়াইয়া বা অন্য কোন উপায়ে আয়বৃদ্ধি ছাড়া রেল কর্তৃপক্ষের উপায়ও নাই। সকল দিক হইতে দেশবাসীর জীবনযাত্রার ব্যয় যার পর নাই বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে, আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে রেলের ভাড়া বাড়িলে তজ্জন্য খুব বেশী গণ্ডগোল করিয়া কর্তৃপক্ষকে উত্যক্ত করার পূর্বে দেশবাসীর উচিত দেশের সমগ্র আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা।

অবশ্য যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় এখনই রেলের ভাড়া ও মাশুলের হার শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে এই বৃদ্ধিও কম নয়। ইহার উপর নূতন ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাবে তাহাদের আতঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। এইভাবে ক্রমাগত ভাড়া বাড়াইয়া যাওয়া অপেক্ষা রেলের বিভাগীয় দুর্নীতির প্রতিরোধে এবং বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের গতিরোধের ব্যবস্থার কড়াকড়ি করিলে রেলকর্তৃপক্ষ অনেক বেশী বাড়তি আয়ের সন্ধান করিতে পারেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কতটা বাধা পাইতেছেন তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যদিও যানবাহন সমস্যার বাজেট প্রস্তাবে চারিদিকে এত বেশী বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। শুধু জনসাধারণ নয়, রেল কর্মচারীদের অনেকে পর্যন্ত এই ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাব রেলের বর্তমান অবস্থায় অযৌক্তিক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। নিখিল ভারত রেলওয়ে রেল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এল গুরুস্বামী গত ২০শে নভেম্বর মিরি হইতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, দেশের স্বাভাবিক পণ্যমূল্যের কথা বিবেচনা করিলে বর্তমান ভাড়া-বৃদ্ধির প্রস্তাবকে ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না।

'কনট্রোল' রহিতের আন্দোলন

দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে 'কনট্রোল' বা নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হইয়া থাকে। ইহার দুটি দিক আছে,—পণ্যযোগান সাধ্যমতন করা এবং ন্যায্য মূল্যে দেশবাসীর প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়তম পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করা। বিশেষ করিয়া মুদ্রাস্ফীতির যুগে পণ্যাভাবগ্রস্ত দেশে যদি 'কনট্রোল' চালু না হয়, তাহা হইলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দেশবাসীর পক্ষে আয়ত্তাধীন মূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ একান্ত অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। পণ্যমূল্য যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল বলিয়া এ অবস্থায় নিয়ন্ত্রণমুক্তির জন্য বাড়তি দাম দেওয়া শুধু বিত্তবান শ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময়কার নিয়ন্ত্রণপ্রথা এখনও চলিতেছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে জনপ্রিয় হয় নাই তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। রসদনীতি সর্বাঙ্গসুন্দর তো হয়ই নাই, রেশন এলাকাকেও যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের মাথাপিছু যোগান দেওয়া হইতেছে, তাহা লোকের নিয়তম প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনেক কম। বলা বাহুল্য, দেশবাসী চিরকাল এইভাবে অভাব সহ্য করিয়া খুব বুঝিয়া থাকিতে পারে না। লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি যে সব পণ্যে পারমিটের ব্যবস্থা আছে, তাহাদের অবস্থাও আরও শোচনীয়। ইহার মানা না থাকায় ওষুধ তৈয়ারের অভাবের জন্য এবং মুরুব্বির সুপারিশ সংগ্রহ করিতে না পারায় সাধারণ দেশবাসী অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও ন্যায্যদরে এই সব পণ্য সংগ্রহে ব্যর্থকাম হইতেছে এবং ইচ্ছা না থাকিলেও বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে চোরাকারবারীর দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। সরকারী কর্তৃপক্ষের দুর্নীতিমূলক আচরণের সম্পর্কে কোন কথা না তুলিয়াও বলা যায় যে, সরকার অবশ্যই দেশের উৎপন্ন পণ্যের সঠিক হিসাব রাখিতেছেন না, না হইলে এত অধিক পরিমাণ পণ্য কোথা হইতে চোরাবাজারে আসিতেছে? ঘোর বরা পড়িলেই অসাধু পণ্য-

উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের অধীনে শান্তিবিধানের-ব্যবস্থা হইলে দেশের পণ্য পরিস্থিতির অবস্থাই লক্ষণীয় হইতে হইত।

এই অবস্থার জন্যই কিছুদিন হইতে কন্ট্রোল তুলিয়া দিবার জন্য দেশে জোর আন্দোলন চলিতেছে। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বর্তমান দুর্নীতিমূলক অবস্থাগুলির বিরুদ্ধ হইয়া কন্ট্রোল রহিতের পক্ষে মত দিয়াছেন। ভারতের সাধারণ খাদ্যশস্য নীতি কমিটি (Food Grains Policy Committee) এবং এ আই সি সি যত সত্বর সম্ভব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার পক্ষে। তবে অব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইয়াও এবং কন্ট্রোল রহিতের আন্দোলনের তীব্রতা স্বীকার করিয়াও ভারত সরকার বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা পরিস্থিতি এখন যতটা খারাপ হইবে, কন্ট্রোল একেবারে তুলিয়া দিলে ইহা তদপেক্ষা অনেক বেশী শোচনীয় হইয়া পড়িবে। দেশে এখন খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যকীয় পণ্যের দারুণ ঘাটতি রহিয়াছে, তাহাই ভারত সরকারের আশঙ্কা কন্ট্রোল তুলিয়া দিলে উৎপাদক, ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীরা অবসরের সুযোগ লইয়া পণ্যমূল্য এত বাড়াইয়া দিবে যে সাধারণ দেশবাসী সেই চড়া মূল্যেরও জিনিষপত্র কিনিতে পারিবে না। বোটের উপর ভারত সরকার যদিও নীতির দিক হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রথা রহিতের সপক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। তবুও বিশেষ কিছু চিনি ছাড়া কাপড়, ওষুধপত্র, কাগজ প্রভৃতির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাইবে। মহাত্মা গান্ধী ভারত সরকারের মন্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই আশঙ্কার যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে পারে নাই। তিনি সাধারণতঃ মানুষের অন্তরের কাছে আবেদন করিয়া অসাধুতার বিরোধী, এক্ষেত্রেও সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে তিনি ব্যবসায়ীদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বিড়লার এক প্রার্থনাসভার বক্তৃতায় তিনি ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের উদ্দেশ করিয়া আবেদন জানাইয়াছেন, তাঁহারা যেন সরকারের আশঙ্কা দূর করেন ; তাঁহারা যেন সরকারকে এই আশ্বাস দেন যে কন্ট্রোল তুলিয়া দিলে জিনিষপত্রের দাম তাঁহারা বাড়াইয়া দিবেন না এবং খোলাবাজারে চোরা-কারবার ও দুর্নীতির অবসান ঘটিবে।

কন্ট্রোল রহিতের আন্দোলনকারীরা সরিষার তৈলের দৃষ্টান্তটিকে খুবই কাজে লাগাইতেছেন ; কলিকাতার সরিষার তৈলের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে বাজারে অনুরূপ তৈল প্রচুর পরিমাণে কিরিয়া আসিয়াছে, ইহা সত্য কথা। তবে আমাদের অভিমত সরিষার তৈলের ন্যায় একটি ছোট জিনিষের উপর ভিত্তি করিয়া সমস্ত নিয়ন্ত্রণ প্রথা বাড়াবাড়ি করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। তাছাড়া সরিষার তৈলের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্য করিতে হইবে। দেশের খাদ্য পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়। বস্ত্র, সিমেন্ট লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, কয়লা, কেরোসিন, তৈলবীজ, চিনি ও গুড় ইত্যাদি যে সব পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে, ইহাদের অধিকাংশের উৎপাদন যেখানেই অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি আশা করা যায় না। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে চাহিদা ও যোগানে যে বিরাট অসামঞ্জস্য দেখা দিবে, তাহাতে পণ্যবাজারে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হইয়া উঠিবে। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার এখন আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যার চাপে বিপন্ন, এসময় তাঁহাদিগকে জোর করিয়া নূতন এবং অন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন করা বিবেচনাহীনতার পরিচায়ক হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের বর্তমান অবস্থায় অত্যাবশ্যক জিনিষগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকা অত্যাবশ্যক। তবে বিভিন্নরূপ দুর্নীতি এবং চোরা-কারবার বন্ধের জন্য সরকার যতদিন তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া চরম কঠোরতার পরিচয় না দিবেন, ততদিন এই ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপরিচালকমণ্ডলের নিকট হইতে দুর্নীতি দমনের এই কঠোরতা অবশ্যই আশা করা যায়।

পণ্যমূল্য সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য ভারতসরকার বিশেষজ্ঞদের লইয়া যে বোর্ড (Commodity Prices Board) গঠন করিয়াছেন, সেই বোর্ডের সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে কন্ট্রোল তুলিবার বিপক্ষে যুক্তি অতিমত জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অবশ্যে শুধু খাদ্যদ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখিয়া বাকি পণ্য খোলা বাজারে ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়া বোর্ড বলিয়াছেন যে,—(১) এইরূপ করিলে খাদ্যশস্য বহু এমন সব কৃষিজাত পণ্যের বর বাড়িয়া যাইবে এবং ফলে কৃষিজীবীরা অধিক মূল্যের আশায় খাদ্যশস্যের চাষ কমাইয়া দিবে। এবং (২) এক্ষেত্রে তাঁহারা খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের উপর কন্ট্রোল চালু রাখিয়া অতি বীকার করিতে রাজী হইবে না। বলা নিষ্প্রয়োজন ভারতের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতিতে বোর্ডের এই যুক্তিগুলির মূল্য কিছুতেই অসঙ্গত মনে করা যায় না।

কন্ট্রোল রহিতের পরিবর্তে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রথায় পরিবর্তন সূচনা করিবার চেষ্টা করা অধিকতর সুবিবেচনার কাজ হইবে, এ সম্পর্কে বোর্ডের ইহাই মূলতঃ অভিমত (*)। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া বিশেষজ্ঞদের এই সকল মূল্যবান পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রথাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তথা বিরুদ্ধ দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইবেন।

* "Not abolition but improvement of the system of controls will have to be undertaken, especially if long-term plans involve regulation and direction of economic activity by the state." ২৮।১১।৪৭

ভাগ্যচক্র

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

হাবের সান্ধ্য-সম্মিলনে সেদিন শনির দৃষ্টি লাগিয়াছিল। সভা জমা ত দূরের কথা, এক সময়ে সভ্যাবরণের ছদ্ম ছল চোখে বর্ষার ঢল আসিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিয়োগান্ত নাটকাভিনয়ের মত মনগুলা খিঁচড়াইয়া রহিল। ঘটনাটা প্রথমাবধি এই :

মুকুল বস্ত্রাগার হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। হাবের সান্ধ্য-সভায় আলো থাকে না, অতএব ছিল না, 'কার চিঠি?' বলিয়া জয়দ্রথ দীপাধারে আলো জ্বালিয়া দিয়া আসিয়া আর্ম চেয়ারে বসিয়া, শিরোনামাটুকু পড়িয়া লইয়া কহিল, মার চিঠি।

হুঁ।

পত্র পাঠ করিয়া জয়দ্রথের মুখ দিয়া কথা সরিল না; মুকুলের পানে চাহিতে দেখিল, তাহার পানেও মুখ নিরুত্তর পাইই লিখিত রহিয়াছে। মুকুলের চোখ দুটি ব্যথায়, বেদনায় ও লজ্জায় ভরা। বিপাকমানে মুক্তিপত্রের ন্যায় মুকুলের উদাস যাদুল নয়ন দুটি অভ্যাসবশে স্বামীর পানেই চাহিয়া আছে। জয়দ্রথ তাহাতে আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া কহিল, এখন উপায়?

উত্তর যাচ্ঞা করিয়া এই প্রশ্ন করা হয় নাই। ইহা হতাশার অভিব্যক্তি মাত্র! আকাশে নক্ষত্রের মেলা বসিয়াছে, তাহাদের পানে চাহিয়া উপায় পাওয়া যায় না; বন্ধুর সুরক্ষিত সমীরণ সন্ধান জুড়াইয়া দিতে পারে: কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারে না।

অবিনাশ ও মনোরমা হাসে আসিতে, জয়দ্রথ ম্লানমুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া বলিল—মুখ্‌কিল হয়েছে ভাই, কাশী থেকে আমার শ্বশুর শাশুড়ী আসছেন।

"হাই অফি?" বলিয়া অবিনাশ ও তাহার স্ত্রী মনোরমা হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সান্ধ্য বেশ বাসে সুসজ্জিত হইয়া এই সম্পত্তি প্রচুর আনন্দে প্রাত্যহিক সান্ধ্যসভা জমাইতে আসিয়াছিল: এক মুহূর্তে, দূত মেঘিলে মানুষের চেহারা যেমন বদলাইয়া যায়, অবিনাশ সম্পত্তিরও মুখ যেন ভাই হইয়া গিয়াছিল। অবিনাশ শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কবে আসছেন?

পরশু, মঙ্গলবার।

'ও বাবা, সময়ও ত নেই!

কিছুক্ষণ নিঃশব্দেই কাটিল; তারপর অবিনাশ বলিল, তাঁদের মেয়ে জামাইয়ের ঘর, তাঁরা ত আসবেনই: না আসাই অন্যায়! কিন্তু আমরা কি করি ভাই? তোমাদের কাছে তাঁদের যে রকম নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণদের পরিচয় শুনেছি, তা'তে আমরা কোনও দিন এ বাড়ীতে বাস করেছি জানলে, তাঁরা হয়ত এখানে উঠতেই চাইবেন না।

কথাগুলি অপ্রিয় হইলেও সত্য, সেই জন্য কেহই তাহার প্রতিবাদ করিল না। অথচ সত্য কথা এই যে—জয়দ্রথ ও মুকুল উভয়েই অন্তরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। অবিনাশ আবার বলিল, আমার ভয়ে আমি একটুও ভাবি নে, অফিসের মেসে কারও সঙ্গে একটা পাট

মনোরমা মুকুলের পা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—

বিছিয়ে প'ড়ে থাকতে পারি, মুশকিল মনোরমাকে নিয়ে। ওর যে থাকার কোনও যায়গাই নেই!

অথচ একদিন তাহার সবই ছিল। তাহার বাপ ছিলেন, দু'টি বড় ভাই ছিল। মুখিয়াটীয় বড় কারবার ও বাসা ছিল। আদরের বয়সের-অন্তে সব বলি গিয়াছে। মরিয়ম তাহার স্বামী আব্বাসের বাসায় ছিল এবং জয়দ্রথ মিলিটারী ট্রাক্ লইয়া গিয়া তাহাদের উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিজেদের গৃহে হিন্দু পরিচয়ে হিন্দু মতে আশ্রয় দা দিলে,

পাড়ারেরও চিহ্ন থাকিত না। কথা ছিল, কলিকাতা পাস্ত হইলে, মামার বাড়ী যাইবে। ইহারা এখান হইতে চলিয়া গিয়া হিন্দু-বেশ ও হিন্দুয়ানী পরিত্যাগ করিয়া আত্মপরিচয়েই প্রতিষ্ঠিত হইবে। অবিনাশকে লইয়া কোন অসুবিধাই হয় নাই, খুব সহজেই সে অবিনাশ হইতে পারিয়াছিল; কিন্তু মনোরমাকে মনোরমা করিতে মুকুলকে প্রতি পদে কত যে প্রতিবন্ধকতা, কত যে অসুবিধা, কত যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা সেই জানে। মুকুলের বুড়ী দাসী সরোজিনী মনোরমার হাত ও পায়ের আঙুলের আকর্ষিক দেখিয়া কত আপত্তি যে তুলিল, সে আর বলিবার নহে। মুকুল বুঝাইল, বাঙ্গাল্ দেশের মেয়েরা মেমি পাউডার বেশি করে। দাসী বলিল, কিন্তু বাঙ্গাল্ মাগীরা লম্বায় কাল খাটো, এ কেন তবে লম্বায় নামে আঁৎকে ওঠে? মুকুল বলিল, ওর বাপ কলকাতাতেই থাকেন কি-না—অনোরমাও

ওরা কেউ ঠিক্ই বলে নি, আমি বাঙালি বলতে পারি

কলকাতাতেই জন্মেছে, তাই কলকাতার মেয়েদের মত বাল খেতে দেখে-ছি। সরোজিনী উকিল হইলে তাল জেরা করিতে পারিত; বলিল, মর্-মুখ্পুড়ি, চোখে সুর্মা দেয় কেন? মুকুল ব্যারোস্কোপ ও হলিটিজের সংশ্লিষ্টকরণ করিল। সরোজিনী শেষ পর্য্যন্ত সওয়াল করিয়া কহিল, তুমি যাই বল আর যাই কর বৌদিদিমণি, ও দুঁড়ী নির্ঘাৎ ছোট জাতের মেয়ে। নইলে রাবণীতার গন্ধকে ভূতের গন্ধ বলে। খাঁটা যায়, খাঁটা যায়—বাঙ্গালদের দশাই ঐ!

তাহার পর প্রায় দশ-এগারো মাস কাটিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা ঈগল জননী যেমন হিংস্র পক্ষপুটে শাবকগুলিকে রক্ষা করে, মুকুলও তেমনই সতর্ক স্নেহাবরণে আবৃত করিয়া মুসলমান যুবক যুবতীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ছেলেবেলায় মুকুল তাহার বোনেদের যেমন ভালবাসিত, দেখিতে দেখিতে মনোরমাকেও তেমনই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। মনোরমা যে তাহার কেহ নহে, সে যে তাহাদের জাতির বা সমাজেরও কেহ নহে এবং ছেলে ও জলে মিলিবার কোন সম্ভাবনা যে কোন কালেই নাই তাহা খুলিয়া গিয়াই ভালবাসিয়াছিল। তাই আর সে অনোরমার মুখের পানেও চাহিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ এক সময়ে অনোরমা উঠিয়া গিয়া মুকুলের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, আমি কোথায় যাব দিদি? কোন্ জাগাড়ে আমার যে কেউ নেই দিদি!—বলিতে বলিতে মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিল। মুকুল অকস্মাৎ কিছুই বলিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল, মাসীমারা যতদিন থাকবেন, আমি যদি তোমার ঘর ঝাড়ু দিই, উঠোন্ দুই, সরোজিনী-দির ঘরের পাশের ঘরে থাকি, তা হলেও কি আমাকে তুমি বাড়ীতে থাকতে দিতে পারবে না, দিদি?—তবু মুকুলের মুখে কথা নাই দেখিয়া মনোরমা মুকুলের একটা পা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না।

এতক্ষণে যেন মুকুলের হুঁশ হইল; দু' হাতে অনোরমাকে তুলিয়া ধরিয়া নিজের কিরোজা-রঙের নতুন বেনারসীর আঁচলে তাহার চোখের শতধারা মুছাইতে মুছাইতে বলিল, ছি, ভাই, পায়ে হাত দিতে নেই।

মনোরমা বৃষ্টি-ধোওয়া ফুলের মত ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বলিল, তুমি বলো, আমায় রেখে না?

মুকুল বলিল, তোমাকে ফেলবো আমি কি এমনই পিশাচী, মনু?

অবিনাশ বলিল, কিন্তু মাসীমা যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী। সে গল্প ত তোমাদের কাছেই শুনেছি বৌদি! যে বাড়ীতে তাঁরা থাকবেন সেই বাড়ীতে মুসলমান থাকা যে সত্যিই অধর্ম্ম হবে বৌ-দি! তাঁরা জানুন আর নাই জানুন, আমরা মুসলমানের ছেলে মেয়ে জেনে শুনে এত বড় অধর্ম্ম করলে কেরাকতের দিনে, আমরাই বা আল্লার কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব?

মুকুল বলিল, আজ রাত্রি, কাল সমস্ত দিনরাত সময় ত রয়েছে, ভেবে একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে। কি বল গো, তাই না?

নিশ্চয়, বলিয়া অবিনাশ গড়গড়া টানিতে লাগিল।

মুকুলের মা'র চোখ কাটাইতে হইবে, তাই তাঁহারা কলিকাতার অশান্তি ও হাঙ্গামা উপেক্ষা করিয়াই কলিকাতায় আসিতেছেন। কাশীর ডাক্তাররা স্পষ্টই বলিয়াছে, শক্ত অপারেশন কলকাতাতেই সম্ভব, অন্য কোথাও নয়। এইটুকু হইতে মুকুলের মা'র দুঃখময় সংক্রান্ত কাহিনীর পর কাহিনী রচিত হইতে লাগিল। মুকুলের বাবা রিটায়ার্ড ডিপুটি জজ, কত লোককে ফাঁসী, কত লোককে দ্বীপান্তর ও যাবজ্জীবনের জেল দিয়াছেন, জেলায় জেলায় 'হুজুর' বলিয়া তাঁহার নামে থরহরি কম্পমান ছিল যত লোক; কিন্তু বাড়ীতে তাঁহার অবস্থা, লোকে বলে—কাঁচপোকা ও তেলাপোকার মত। জীবনে একদিন তিনি থিয়েটার বোধের "খলিফান" নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। গল্প শুনা যায়, রাত্রি দু'টার সময় জামাজুতাসমেত চৌবাচ্চায় অবগাহন করিয়া শুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। তদবধি তিনি থিয়েটারে গমনাগমন

করেন নাই। দশাশ্বমেধ ঘাট ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ত্রিশীমানায় আসিতে অত্যন্ত ক্লেশ নিশ্চিত, তাই তাহাদেরই তাঁহার তনুমনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া কালাতিপাত করিতে হইতেছে।

দ্বিতীয় ভাগ

মঙ্গলবার মেলট্রেন এক্সপ্রেস বেড় ঘণ্টা লেটে হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিবে পদ্মিনী ও পুলকেশ ছুটাছুটি করিয়া একটা ইণ্টার ক্লাশ গাড়ীর মধ্যে আরুঢ়বক্তাবস্থায় প্রাক্তন জজ ত্রিভুবনেশ্বর মুখার্জি ও তাঁহার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিল। পুলকেশ হাসিয়া পদ্মিনীকে বলিল, ঐ ভিড়ে মানুষ বসতে পারে? পদ্মিনী হঠ কটাক্ষে কহিল, বাবা মা না হয় মানুষ ন'ন, দেবতা; কিন্তু অন্য লোকগুলোও কি তোমাদের বিচারে ছাগল ভেড়া? পুলকেশ স্ত্রীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, ওরা কেউ ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিল না, আমি বাজি ধরতে পারি। পদ্মিনী

কাল অপারেশন করবে কখন বলুন?

হাসিয়া পরাজয় স্বীকার করিল। সকলে নামিয়া গেলে, গাড়ী খালি হইলে অগ্রে জজ সাহেব নামিয়াই বলিলেন, মুকুলরা আসে নি?

না। কাল রাত্রে এসে আমাদের ব'লে গেলেন, হাওড়ায় আসতে।

অসুখ বিসুখ নয় ত?

না। আসাই ও দেখছুন। তাদের গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জজ সাহেব বলিলেন, ডাক্তারী কাজ কর্ম পড়েছে বোধ হয়; তাই আসতে পারে নি।

জজ-পত্নী অভিমানক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, মুকুলেরও কাজ পড়লো!

এ কথার উত্তর কেহ দিল না। জজপত্নী আবার বলিলেন, ভাল আছে ত?

আছে বৌ, পুলকেশ কহিল।

হাওড়ার সেতু পার হইয়া গাড়ী উত্তর কলিকাতার রাস্তা ধরিতেই জজ সাহেব বলিলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

পদ্মিনী বলিল, আমার ওখানে বাবা।

তোর যে ছোট বাড়ী রে, পদ্ম!

ছোট ত বটেই, তবে, বাড়ীওয়ালার কাছ থেকে তার ওপরের একখানা ঘর পাওয়ায় এখন আর অসুবিধে হয় না।

জজপত্নী বলিলেন, মুকুল যেখানে এলো না, তার বাড়ীতেও আমাদের যাই দোষ না! এতই হতশ্রদ্ধা!

পুলকেশ অপরাধীর মত বলিল, ডাক্তারী কাল বললেন বটে, বিশেষ অসুবিধা আছে।

জজপত্নী আগুন হইয়া উঠিয়া কহিলেন, অসুবিধে আছে! হাঁ তা থাকবে বৈ কি, অসুবিধে থাকবে বৈ-কি! সাহেবি চালের মধ্যে গেঁয়ো খণ্ডর শাশুড়ী এলে অসুবিধে ত হবেই!—একটু থামিয়া আবার বলিলেন, ভাল। ও মেয়ের আমি মুখদর্শন করি ত—

কর্ত্তা আহা-হা—আহা-হা—কর কি—কর কি—বলে আমাইয়া দিলেন। জয়রথ জামাইয়ের অনুরোধেই তিনি স্ত্রীর চক্ষু চিকিৎসা করাইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। প্রথমেই তাহাদেরই মুখদর্শন বন্ধ হয় ইহা আদৌ অভিপ্রেত হইতে পারে না। কাজেই বলিলেন, এক তরফা রায় দিতে নেই গিন্নি, দিতে নেই। আগে দেখা হোক্, তারের কথা শোন, তার পর ডিগ্রি যা ডিসমিস্, যা খুশী করতে পারো।

কথা যুক্তিযুক্ত বটে। কাজেই জজপত্নী তখনকার মত ক্রোধ সম্বরণ করিলেন; কিন্তু সমস্ত দিন কাটিয়া সন্ধ্যা হয়-হয় তবুও মুকুলের দেখা নাই, জজপত্নী আবার মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিতেছিলেন—ঠিক সেই সময় জয়রথ আসিয়া খাস খবরটা করিল। "মুকুল এলো মা?"

"না। একটা বেজন্মা—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই গৃহিণী কহিলেন, ওঃ, বেয়ন্নয়!

পাছে আরও কিছু ব্যক্ত হইয়া পড়ে, জজ সাহেব বলিয়া উঠিলেন, ওঁর চোখ দুটো ও বেতে বসেছে বাবা! তোমার ত অনেকের সঙ্গে আলাপ আছে, ভাল চোখের ডাক্তার কে আছে বল ত?

জয়রথ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল; বলিল, কর্ণেল সেন! সেনই এখন ঘি খেই! কাল সকালেই মা'কে নিয়ে যাই, চলুন।

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ফি কত?

জয়রথ বলিল, আমার কাছে কি নেবে কি আবার! প্রেফ্ জিনিসের দাম নিয়ে বাড়ী ক'রে দিয়েছি না! বলিয়া জয়রথ হাসিল।

তবে তজাল, বলিয়া জজ সাহেব উৎফুল্লভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জজ-গৃহিণী তখনও ভিতরে ভিতরে ফুলিতেছিলেন, তিনি স্বামীর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাশীর সিভিল সার্জ্জন যে খুব ভাল একজন 'আই-স্পেশালিষ্টের' নাম করেছিলেন। তুমি ত পকেট বুকে নাম টুকে রেখেছিলে। সে নামটা কি বেশ না?

জজ মনে মনে খিলিত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, তা'লে পকেট বই আন, তোমার ওষুধের বাক্সের ভেতর

আছে।—গৃহিণী পকেট বই আনিতে উঠিয়াছেন দেখিয়া জজ বাহাদুর পুরস্ক করিলেন, অমন চাখাচাখি না করাই ভাল। বিশেষ জজের যখন অসুখ, টনিই সব চেয়ে ভাল।

গৃহিণী বলিলেন, বেশি না, মাসটা।

মাস খানির হইল, কর্ণেল ব্রিয়ণ লেখ।

জজসাহেব বলিল, আমি ত ওর কথাই বলছি।

গৃহিণীর আনন যে পরিমাণ শুষ্ক ও ক্ষুব্ধ, জজ সাহেব সেই পরিমাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিলেন, তাহ'লে কাল সকালে কখন্ যাওয়া?

আটটায় তৈরী থাকবেন, বলিয়া জজসাহেব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই পত্নিনী বলিল, ছোট বি কি আসবেই না?

জজসাহেব চুপি চুপি বলিল, বাড়ীতে ওঁদের না তোমার একটা কৈফিয়ৎ খুঁজে পেলেই আসবে। এদিকে খুব রাগ ত?

পত্নিনী মুকুলের ফ্রেঞ্চ বোন্।

পত্নিনী সহাস্যে কহিল, হুঁ, খুব। মা সমস্ত দিন আপসাচ্ছেন। বাবা অবিশ্যি চুপ্ চাপ্। আচ্ছা জজী বা, সত্যি কথাটা বলে ফেললে কেমন হয়?

খুব পালি! মুসলমানের সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া, এক সঙ্গে থাকা শুনলে তোমার ছোট-বি-টির তাজ্য-কন্যা হওয়া ছাড়া ও আর অন্য গতি দেখি নে। তোমার অবশ্য তাতে দু'জনের ভাগ এক পাবার সম্ভাবনা হলেও হতে পারে।

আমি ত সেই আশায় যাত্ত ঘুরে বসে আছি কি-না। চলুন, চা খাবেন চলুন।

কফি খাওয়ান্ ত বল্, বলি।

কফির পাট নেই, জজী-বা। বল ত আনাই।

না, দরকার নেই, এক পেয়ালা চা'ই দে।

খানিক পরে জজসাহেব যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, জজ সাহেব তাহাকে একটু দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া গোপনে শুটিকতক সৎপরামর্শ দিয়া দিলেন। মোদ্দা কথাটা এই:

স্ত্রীলোকের স্বভাবই ঐ, মুখলে না যাবা জন! ওঁরা নিজের বুদ্ধিকে অসুদ্ধিটাই ভাল বোঝেন, পরেরও যে বুদ্ধিকে-অসুদ্ধিকে আছে সেটা ওঁরা বর্দাস্তই করেন না। পাঁচ বছর পরে মা বাপ এসেছে, তবু যে মুকুল এসে দেখা করতে পারলে না, নিশ্চয়ই তার কারণ আছে —সমস্ত কারণই আছে। কিন্তু ওঁরা? তুমি তাকে যেন রাগের কথা কিছু বলো টলো না বাবা। আচ্ছা, আর তাহ'লে ঠিক আটটায়? হ্যাঁ, টনিকে কফি তাহলে সঙ্গে নেব না, কি বল?

আজ্ঞে না। আর আমি আটটার সময় গাড়ী নিয়ে আসবো। বলিয়া জজসাহেব আর একবার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

ডিয়ন সেন ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া জজসাহেবকে বলিল, হাসপাতাল ছাড়া এ অপারেশন করা যাবে না। বল ত একটা বেডের খোঁজ করি।

তা ছাড়া আর উপায় কি!

ডাক্তার সেন তখনই মোটাকতক ফোন করিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দিয়া বলিলেন, ১৩৩ নম্বর বেড, আপনি গিয়ে শুইয়ে দাও গে, কাল দুপুর নাগাদ অপারেশন হবে।

জজসাহেব বলিল, তুমিই অপারেশন করবে ত?

নিশ্চয়।

জজসাহেবরা পাখে ধরিয়া ফাঁসীকাঠে লটকাইতে খুবই পোক্ত, ডিয়নের অস্ত্রে কাঁটাটি ফুটিবার আশঙ্কা হইলে ভাবিয়াই সারা। প্রায় এক ঘণ্টা প্রশ্নোত্তরমালা সাজাইয়া তাঁহারা বাহিরে আসিলেন। জজসাহেব বলিলেন, হাসপাতাল যখন, তখন সেই স্ত্রি বোধহয়।

কি জানি, সেটা ত জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আপনি বাঁকে গিয়ে ওয়েটিংরুমে একটু বসুন, আমি ফোন আসছি, বলিয়া জজসাহেব ভিতরে চলিয়া গেল। কিয়ৎপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চলুন।

জজসাহেব তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পান্ নাই, উৎকণ্ঠিত ছিলেন, প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করিলেন। জজসাহেব বলিল, না, স্ত্রি নয়। তবে তার জন্যে ভাববার কিছু নেই।

জজসাহেব খুশী হইলেন এবং অখুশীও হইলেন। টাকার পরিমাণটা না জানিলে কখনও শান্তি পাওয়া যায়? পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, বেডের মূল্য দৈনিক পঞ্চাশ টাকা। জজসাহেব একখানা কাগজ বাহির করিয়া খশুরের হাতে দিয়া বলিল, পনেরো দিনের জন্যে বেড নেওয়া হয়েছে।

কাগজটা আর কিছুই নয়, আই-হসপিটালের টাকার রসিদ। জজসাহেব ডিয়নের লিখিত অঙ্কটার উপর বার বার চক্ষু বুলাইয়া জামাতাকে বলিলেন, পনেরো দিনের বেশী লাগবে না, কি বল?

না। ডাক্তার বলেছে, দিন দশেকের মধ্যেই মা ভাল হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, সেন ব'লে দিলেন সন্ধ্যার আগেই যেন বেড়ে এসে মা শুয়ে পড়েন। বোধ করি শুধুর টুধুর খাওয়াবে।

জজগিন্নি এতক্ষণ নীরব ছিলেন, এইবার একটি কথা কহিলেন। বলিলেন, বাড়ীতে দারুণ টারুণ থাকলে বাড়ীতেই অপারেশন হয় না?

জজসাহেব কথাটার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিতেছিল ব'লিয়া মনে হয় না। সে যেন খুবই বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল, জজসাহেব জামাতাকে বিপন্মুক্ত করিলেন; কহিলেন, অপারেশন বাড়ীতে কখনও ভাল হয় না। এত আদবাব, এত যন্ত্রপাতি, এত নার্স, এত শুশ্রূষকর বাড়ীতে যেওয়া কি চাট্টিখানি কথা। বাড়ীতে সম্ভব নয় বলেই হাসপাতালে লোকে আসে।

গৃহিণী বলিলেন, যাদের বড় বাড়ী নেই—

জজ তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন—না, না, তা হয় না।

তৃতীয় ভাগ

বিকালে হাসপাতালে আসিয়া দেখা গেল, মুকুল সমস্ত সাজাইয়া বসিয়া আছে। জজসাহেব হাসিয়া বলিলেন, দূর থেকে আবলুম, নার্স টার্স বুঝি কেউ এসে আছে। তুই কতক্ষণ এলি মা?

গৃহিণী বলিলেন, বেশ্ন, আছ ত?

মুকুল. জননীর এই শুষ্ক, স্নেহলেশশূন্য প্রশ্ন শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া (পাছে ধরা পড়িয়া যায়) বলিল, হাল আমি না ; কিন্তু এক বছর ধরে আমাদের যে দিন যাচ্ছে তা আমরাই জানি। কার কাছায় দশ পুটে পুটে দিয়ে মেয়ে. সে ত জানই , হাত পা থেকেই পাড়ায় একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে। অতিথি সজ্জন, ঘর-পোড়া, বাপ-না বরা, খাবী-খাওয়া লোক দিনে বাড়ী যেন হাট বোল করে তুলেছে।

মুকুলের মা কথাগুলি শুনিলেন কি-না কে জানে—ইচ্ছাও আদৌ করিলেন না এবং মুকুলও যেন ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। কর্ণেল যেন তাহাকে যেরূপ যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন সেই-ভাবে সে কেবিন চেঁবিন গুছাইয়া যাহাবার দিয়া বাবার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। রাত্রে তাহার বাড়ী হইতে তিন জনের খাবারই আসিল—মা'র জন্য ডাক্তারের নির্দ্দেশানুযায়ী তরল বার্লি পিতার জন্য মহবিধ এবং সেই সঙ্গে মুকুলেরও। মুকুল খাইতে বসিয়াছে, তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন. তুমি বাড়ী যাবে না ?

মুকুল হাসিয়া বলিল, বাড়ীতে এত লোক সমাগম, আমি দু' দশদিন না খেলেও কারও নজর পড়বে না।

সত্য সত্যই সে বাড়ী গেল না। পিতার অন্যপার্শ্বে শুইয়া শুইয়া পড়িল। গভীর রাত্রে মুকুলকে নিদ্রিত বুঝিয়া জজ সাহেব স্বগতোক্তি করিতে লাগিলেন, মুকুল আমার মেয়ে বড় মেয়ে,আমি জানি কি-না ! অতিথি অভ্যাগত কাউকে ত না বলতে পারে না ও, বাড়ীটি ভরে গেছে মানুষ জনে। তাই, তা নইলে কি মুকুল তার অমন ছবির মত বাড়ীতে বাপ মা'কে না ভুলে—

গৃহিণী মাঝখান হইতে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, কাল অপারেশন করবে কখন্ বললে ?

জজ সাহেব বলিলেন, সে ত আমি জানিনে, জয়ন্ত জানে।

তোমার বুদ্ধি লোপ পাবারই যোগাড় নেই। বলিয়া গৃহিণী ওপাশ ফিরিলেন। কিন্তু ও-পাশ ফিরিয়া থাকিতে পারিলেন কতক্ষণ ? পুনরায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, খরচ পত্তর ত সব অন্য লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে. সে ত বুঝতেই পারছি. মুখে মুখে খবর রাখা, তাতে ত আর পয়সা খরচ নেই ; সেটুকুও পার না ?

জজ সাহেব কহিলেন, খরচপত্র আমি দিয়ে যাব না বুঝি ?

সে আর আমি জানি নে ; পঁয়ত্রিশ বছর ঘর করেও যদি না চিনে থাকি···

খাবাইয়া দিয়া জজ বলিলেন, আচ্ছা, দেখো তখন।

ও আমার দেখা আছে ! বলিয়া জজগৃহিণী পুনশ্চ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। জজ সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ কত সহজেই না মানুষকে ভুল বুঝে ! ইহাতে যে তাহাদের নিজেদের মনই নীচু ও ঘাটো হইয়া যায় তাহাও তাহারা জানে না কেন ! অন্যে কেন জানে না, সেই দুর্ভাবনাতেই জজ সাহেব যখন চিন্তিত হইয়া মানী মানটুকু মনঃকষ্ট কাটাইয়া দিলেন। এই মনঃকষ্ট যে তাঁহার একার তাহা নহে ; দুনিয়ার অধিকাংশই এই দুশ্চিন্তা এবং তাহার অবসানও নাই।

মুকুল ভোরে উঠিয়াই হাসপাতালের লোকজনের হাক ডাক করিয়া মা'র জন্য বাবস্থা সাজাইতে নির্দ্দেশ দিয়া পিতাকে কহিল,বাবা তুমি মুখটুখ ধোও, এখনি তোমার চা আসবে, আমি ততক্ষণ বাড়ীতে একটা, আর ডাক্তারকে একটা—দুটো ফোন ক'রে আসি। আগামীবারে সমাপ্য

কৃষ্ণা

শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী

কৃষ্ণা তুমি নও তো 'কালো' বলে
　　কৃষ্ণ তোমায় কারণ দু'টি চোখ।
পাকালে তো নয়কো বাপের বাড়ী,
　　তোমরা তুমি এই দেশেরই লোক।
এ-কটু বটে তোমার মাঝে বেশি
　　নাথের মোহে যাজ্ঞসেনীর রূপ,
আগুন আছে, থাকলে অনির্বাণ ;
　　হোমের আলো হোক্ সে স্নেহের ধূপ।
কিন্তু যিনি এমন নজির কৈ
　　মহাভারত পর্ব্বে কোথাও নেই,—
পতিত্ব পূর্ণ করেছো যাজ্ঞসেনী
　　কৃষ্ণা তবু···তাই তো ধারাই খেই।

পরীক্ষিৎ ছিলেন তোমার গর্ভের মেলে—
　　মাতৃভূমির মুক্তিসাধক জানি।
পুত্র যেমি দুরন্ত রণজিৎ,
　　লক্ষ্যভেদে কুণ্ঠিত তার পাণি।
আজ যদিও 'একতন্ত্র'র যাবে,
　　ইন্দ্রপ্রস্থে হবেই হবে রাণী।
মহামানবের মহান্ ঘটক পুরী
　　তোমার তরেই তৈরী হবে জানি।
বীরের দেয়া রণজিতেরই প্রাণে
　　প্রেরণা দান করবে জীবন-রণে,
এই ভারতের শ্রেষ্ঠ নারীর মাঝে
　　থাকবে ভারত রাখুক তোমার মনে।

(ডাক্তার শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসুমল্লিকের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে)

গীতি

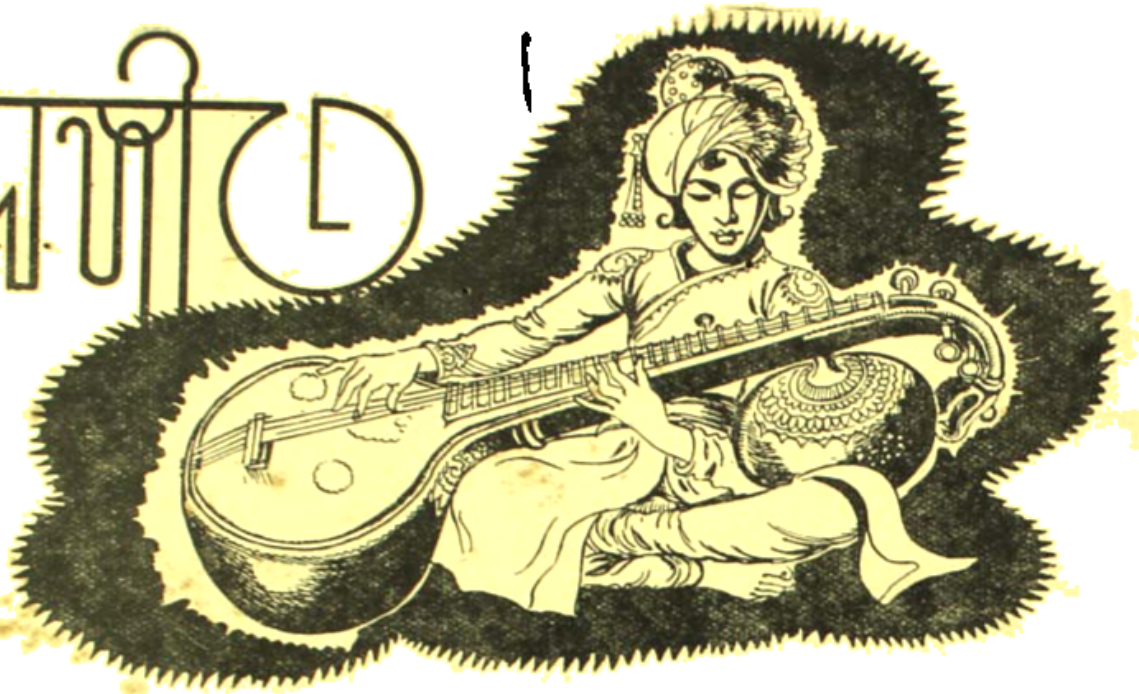

গান ও স্বরলিপি

পিলু। একতালা

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালোবাসে সুখে দুখে
ব্যথা সহে হাসিমুখে,
মরণেরে করে চির-জীবননির্ভর॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী

[রজ্ঞপা মা জ্ঞমজ্ঞা
• • • ক রে • •

{ সা সরসা - না ‖ নসরা - জ্ঞা -া | -া জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা -া | রা রজ্ঞমা - জ্ঞরা ‖
এ রা • • • প • • • • যু কে আ প ন • ক রে • • • •
-রা -সা }

‖ -সা সা | সজ্ঞা সজ্ঞা সনা | সা -া -া } | -া -া -া ‖ -া -া গা |
• আ প • না • রে • প • যু • • • • • • বা

| গা গা গা | গা মা -া | গা মা -া ‖ -া -া মা | পা মা - জ্ঞরা |
হি রে বাঁ শি র • র বে • • • ছে ড়ে যা • য়

| রজ্ঞমা -জ্ঞরা জ্ঞা | রা সা -রসনা ‖
য • • • • যু "এ রা" • • •

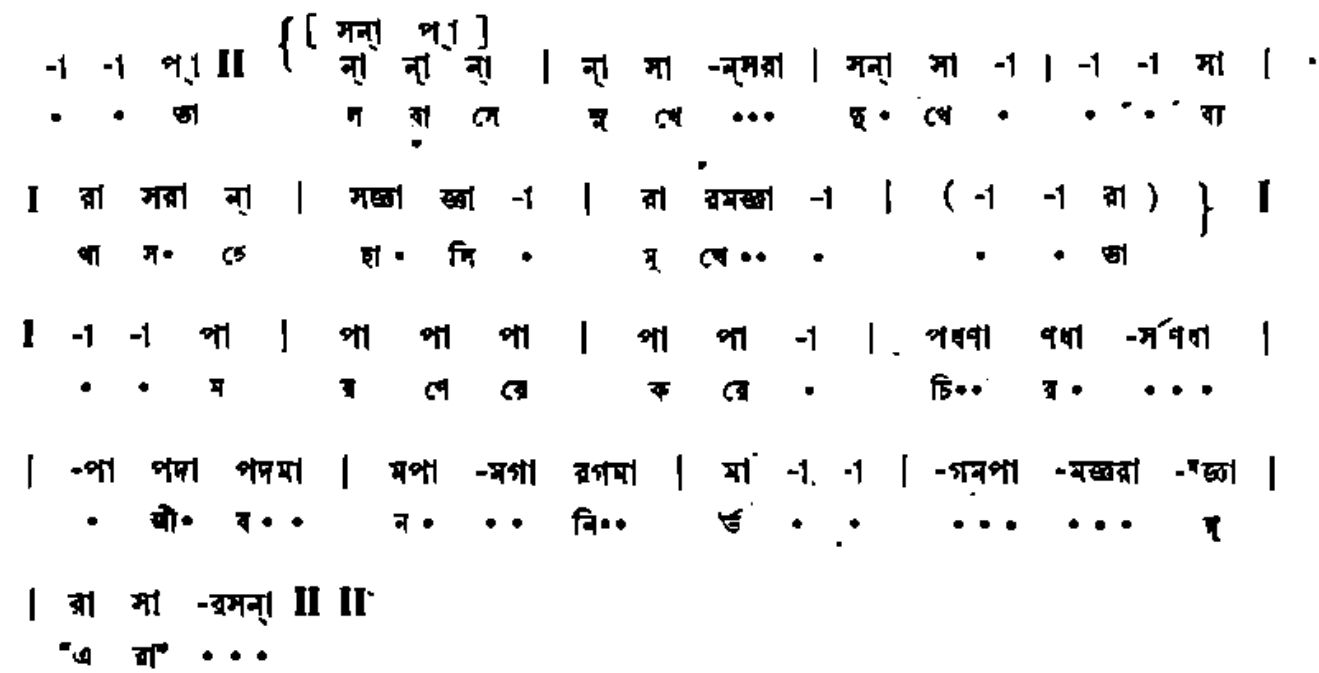

রবীন্দ্র-সংগীত স্বরলিপি

রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার জন্য উৎসুক্য দেশে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বর্তমান অবস্থায় তদনুপাতিক সত্বরতার সহিত স্বরলিপি-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলিয়া, বিশ্বভারতী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-সংগীত-স্বরলিপি প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক নিযুক্ত স্বরলিপি-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এই স্বরলিপিগুলি প্রকাশিত হইবে। ভারতবর্ষ পত্রিকায়ও ভবিষ্যতে এইরূপ স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক, ভারতবর্ষ

কতিপয় সরল আয়ুর্বেদীয় চক্ষুষ্য যোগ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও কবিরাজ শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ভিষগ্‌রত্ন

চক্ষুষ্য—চোখের হিতকর। যোগ কথাটি আয়ুর্বেদে প্রেসক্রিপসন্ (prescription) এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শার্ঙ্গধর হইতে :—

(১) তুল্যা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুর্মার্দ্দবি যীয়তে।
জাতা রোগা বিনশ্যন্তি তিমিরাণি ভবেদ্ধ্রুবং।

অনুবাদ : তোজনান্তর হস্ততল ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে শ্লৈষ্মিক (শ্লেষ্ম) রোগ বিনষ্ট হয়। তিমির রোগ (চক্ষুর সামনে অন্ধকার দেখা) রোগও নষ্ট হয়।

(টীকা) ভোজনের পর হাতে কিছু স্নেহময় পদার্থ লাগিয়া থাকে। ঘৃত, দুগ্ধ, পক্কজাত স্নেহ এবং জান্তব যকৃৎ আদি হইতে জাত স্নেহে—ভিটামিন এ (Vitamin A) থাকে। উহা চক্ষুর হিতকারী। চক্ষুর পাতায় হাত এমন ঘষড়াইতে হইবে যেন উহা অঞ্জনের মত পাতার কিঞ্চিৎ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

(২) শার্ঙ্গধর হইতে :—

শীতাম্বুপূরিত মুখ প্রতিবাসরং যঃ
কালত্রয়েন নয়নং পরিতর্পয়েন।
আসিদ্ধতি প্রকরণো ন কদাচিদক্ষি—
রোগব্যথা বিধুরতাং ভজতে মনুষ্যঃ।

অনুবাদ : যে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে এই তিন সময় মুখ জলপূর্ণ করিয়া নেত্রদ্বয়কে উত্তমরূপে জলে প্রক্ষালিত করে সে অক্ষিরোগ ব্যথায় কষ্ট পায় না।

(টীকা) চক্ষুরত্ত এইরূপ একটি শ্লোক করিয়া বেশ জোর করিয়া চক্ষু মার্জন করিতে বলিয়াছেন (নির্ঘণ্টকার)। চক্ষুর উপর সযত্ন মর্দন (massage) বেশ চক্ষুরোগ পদ্ধতিতে আছে। উদাহরণ :—(১) Perfect Sight without Glasses—by Dr. W. D. Bate of New York. (২) Better Sight without Glass by Hagy Benjamin, London। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এলডুস্ হাক্সলি এই প্রণালীর সুখ্যাতি করিয়াছেন। ভারতেও অনেকজন এই প্রথায় সুবোধ-চক্ষু আই-সি এস পরীক্ষার্থীর চক্ষু কার্যক্ষম করেন।

(৩) চক্ষুরত্ত হইতে :—

ত্রিফলা ঘৃতং মধু খবঃ পাণ্ডাভ্রাজ শতাবরী মুলানাং।
চক্ষুস সংক্ষোপার্থং কথিতো ভিষগ্ভিরত্র ॥

অনুবাদ। ত্রিফলা, ঘৃত, মধু, খব, পাণ্ডাভ্রাজ, শতমূলী, ও মূল ভিষগ্‌গণ এইগুলিকে সংক্ষেপে চক্ষুস—চক্ষুর হিতকর বলেন।

(টীকা) ত্রিফলা—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। বীজ বাদ দিয়া সমান মাত্রায় লইতে হইবে। অথবা হরীতকী ১টা, বহেড়া ২টা ও আমলকী ৩টা লওয়া যাইতে পারে। সমবেত মাত্রা প্রায় দুই তোলা হইবে। ত্রিফলার কল্ক (বাটা) কাথ (১ তোলা ত্রিফলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া অবশেষ সিদ্ধ জল) অথবা চূর্ণ আধ তোলা মধু বা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব চিকিৎসা (অন্তত) বিনাশ হয়। এই শ্লোকটি চক্ষুরত্তে আছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিফলা ঘৃত চক্ষু রোগের মহৌষধ।

পাণ্ডাভ্রাজ :—পায়ে উষ্ণবীর্য্য তেল মালিশ করা। পায়ের সহিত চক্ষুর নাড়ি যোগ আছে। উহার ফলে চক্ষু ও পায়ের বিবিধ প্রতিক্রিয়া (reflex action) ঘটে। Starling's Principles of Human Physiology গ্রন্থে এইরূপ reflex actionএর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। একটি সংক্ষেপ উদাহরণ—অন্ধকারঘরে চলিতেছি, সামনে একটা সাপের মত বস্তু দেখিয়া পা হঠাৎ তুলিয়া ফেলা বা পশ্চাতে বা পার্শ্বে লম্ফ দিল। পায়ে উষ্ণবীর্য্য তেল মালিশ করিলে কিঞ্চিৎ তৈল ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মর্দ্দনে রক্ত সঞ্চালনের সুবিধা হইয়া স্নায়ুশেষগুলি (nerve endings) পুষ্ট ও পুষ্ট হয়। অল্পকালে উহারা চক্ষুর আবেশ সহজে পালন করে বলিয়া চক্ষুর শ্রম (strain) কম হয়।

ঘৃত :—ঘৃতের ভিটামিন এ চক্ষুর পরম হিতকর। মধু, খব, শতমূলী ও মূল সেবনে—যে চক্ষুর হিত হয় তাহা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ অভিজ্ঞতার ফলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাহির বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

ঘর সেণ্টেমর মাস হইতে মিউ ইয়র্কে জাতি সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন চলিতেছে। জাতি সঙ্ঘ এখন দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির প্রবাহ ঘাতের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এক দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে সোভিয়েট রুশিয়া। প্রায় সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রই এই দুইটি শক্তির নেতৃত্বে দুইটি বিবদমান শিবিরে সমবেত হইয়াছে। যে দুই একটি রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান, তাহাদের মধ্যে ভারতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতি-সঙ্ঘের ভারতীয় প্রতিনিধিবিশ্বস্ত ঔপনিবেশিক প্রথার ঘোরবিরোধী। কোন রকমের বৈদেশিক সৈন্যের অবস্থিতির তাঁহারা বিরোধী। এই নীতি অনুসরণে তাঁহারা জাতি-সঙ্ঘে ভোট দেন; কোনও দলের মুখ চাহিয়া নীতি স্থির করেন না।

নিরাপত্তা পরিষদ ও ভারত

জাতি-সঙ্ঘের গত সাধারণ অধিবেশনে ভারতবর্ষ সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের (কর্ত্তৃ পরিষদ) সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছিল। কিন্তু বলাবাহুল্য চক্রান্তের ফলে সে নির্ব্বাচিত হইতে পারে নাই। এবারও প্রধান দুইটি দলের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া ভারতের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে নির্ব্বাচিত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ভারতীয় প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়ান।

জাতি-সঙ্ঘের গঠনতন্ত্র অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের মোট সভ্য-সংখ্যা এগার। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েট-রুশিয়া, চীন ও ব্রিটেন—পরিষদের স্থায়ী সভ্য। অবশিষ্ট ছয়টি অস্থায়ী সভ্য নির্ব্বাচনের পদ্ধতি এইরূপ—সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ প্রতি বৎসর তিনটি সভ্য নির্ব্বাচন করিবে; উহাদের সভ্য থাকিবার মেয়াদ দুই বৎসর। জাতি-সঙ্ঘের প্রথম সাধু-প্রচেষ্টাকে অধিবেশনে সকলে এই ব্যবস্থা করিয়া গেল যে, দক্ষিণ আমেরিকা হইতে দুইটি, পশ্চিম ইউরোপ হইতে একটি, মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে একটি, আরব রাষ্ট্রগুলি হইতে একটি এবং বৃটিশ ডোমিনিয়ন অথবা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে একটি—এই মোট ছয়টি রাষ্ট্র অস্থায়িভাবে নিরাপত্তা পরিষদে নির্ব্বাচিত হইবে। এই বৎসর দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, বৃটিশ ডোমিনিয়নের অষ্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব্ব ইউরোপের পোলাণ্ডের নিরাপত্তা পরিষদের সভ্য থাকিবার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষ হইতে আর্জ্জেন্টিনা মনোনীত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য সকলে পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে ইউক্রেন নির্ব্বাচিত হইবার পক্ষপাতী ছিল। মার্কিণ সমর্থিত প্রার্থী ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া। বৃটিশ ডোমিনিয়ন হইতে ভারত ও কানাডার মধ্যে কে নির্ব্বাচিত হইবে, সেই প্রশ্ন ওঠে। মার্কিণ সমর্থন ছিল কানাডার প্রতি। প্রথম ব্যালটে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাইয়া আর্জ্জেন্টিনা ও কানাডা নির্ব্বাচিত

হইয়া যায়। মার্কিণ সমর্থিত চেকোস্লোভাকিয়া অন্যায় কম ভোট পায়; তাহার সম্পর্কে দ্বিতীয় ব্যালটের আর প্রশ্নই থাকে না। তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ ভারত-বন্ধু হইয়া ওঠে এবং ইটকেপের পরিবর্তে ভারতবর্ষের নির্বাচন চায়। অর্থাৎ স্বীকৃত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া মধ্য-পূর্ব ইটরোপকে প্রতিনিধিবিহীন রাখা এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের দুইটী রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদে বসানো তাহার চেষ্টা হয়। ইটকেপ সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থিত প্রার্থী। তাই, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পক্ষাবলম্বন করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে নামিয়াছিল। কানাডা ও ভারতবর্ষের মধ্যে কিন্তু কানাডাই ছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিক প্রিয়। চেকোস্লোভাকিয়াকে দিয়া ইটকেপের দাবী ব্যর্থ করিবার চেষ্টা যখন সফল হইল না, তখন মার্কিণ প্রতিনিধিরা ভর করিলেন ভারতবর্ষের স্কন্ধে। যাহা হউক, ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডল নির্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের অবসান ঘটান।

দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রসঙ্গ

গত বৎসর জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সম্পর্কে দুইটি ডোমিনিয়নের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা হউক এবং সে আলোচনার ফলাফল জাতি-সঙ্ঘকে জানান হউক। এই প্রস্তাব অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করায় এই সম্পর্কে কোনও মীমাংসা হয় নাই। এবার পুনরায় জাতি-সঙ্ঘে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এবার আলোচনা-বৈঠক সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পাশ হইতে পারে নাই; প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের মাত্র তিনটি কম ছিল। ইহার ফলে জাতি-সঙ্ঘের বর্তমান অধিবেশনে এই প্রসঙ্গ আর উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডল পরিবর্তিত আকারে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত-বন্ধু (?) মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্র জিদ্ ধরে যে, নূতন প্রস্তাব তুলিতে হইলে পরিষদের পরিচালন কমিটীর দ্বারা সে প্রস্তাব বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। পূর্বে এবং এই সময়ও ভারতের প্রধান সমর্থক ছিল সোভিয়েট রুশিয়া।

ভেটো প্রসঙ্গ ও "ক্ষুদ্র পরিষদ"

জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব হইয়াছে "ভেটো" প্রসঙ্গ লইয়া। জাতি-সঙ্ঘের বিধান এই যে, নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সকল সিদ্ধান্ত পাঁচটি বৃহৎ শক্তির সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে—ভোটাধিক্যে গ্রহণ করিলে চলিবে না।

অসুবিধা এই যে, রুশিয়ার সম্মতি ব্যতীত "ভেটো" অর্থাৎ সর্ব-সম্মতি সংক্রান্ত এই বিধান পরিবর্তন করা অসম্ভব। সাধারণ পরিষদ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সঙ্ঘের নিয়মতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে বটে, কিন্তু এই দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে বৃহৎ পাঁচটি শক্তি থাকা চাই। অর্থাৎ "ভেটো" ব্যবস্থা রহিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সে প্রস্তাবও "ভেটো" করিবার অধিকার সোভিয়েট রুশিয়ার আছে। এই অসুবিধা এড়াইবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ প্রতিনিধিরা এক নূতন প্যাঁচ খেলেন। তাহাদের নেতা মিঃ মার্শাল প্রস্তাব করেন যে, জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের সকল সদস্যরাষ্ট্রের এক এক জন প্রতিনিধি লইয়া একটী স্থায়ী "ক্ষুদ্র পরিষদ" গঠিত হউক; নিরাপত্তা পরিষদের মত ইহা শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল কাজ করিবে। নিরাপত্তা পরিষদকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন করিবার উদ্দেশ্যেই যে এই কূটনৈতিক প্যাঁচ, তাহা স্পষ্ট।

সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ হইতে প্রবল আপত্তি ওঠে; সোভিয়েট প্রতিনিধি বেধান যে, সকলের সহযোগে এবং সকলের সম্মতিক্রমে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা জাতি-সঙ্ঘের আদর্শ; আমেরিকার প্রস্তাবে সেই মূল আদর্শই পরিত্যক্ত হইতেছে। তখন ক্ষুদ্র পরিষদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা হয়—যে বিষয়গুলি নিরাপত্তা পরিষদের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহা আর ক্ষুদ্র পরিষদে আলোচিত হইবে না; জাতি-সঙ্ঘের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর উপর ও ক্ষুদ্র পরিষদের কর্তৃত্ব থাকিবে না; বিবাদ মিটাইবার ব্যাপারেও ক্ষুদ্র পরিষদ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র পরিষদের উপর কেবল বিরোধের বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক তদন্তের এবং সাধারণ পরিষদে সুপারিশ করিবার ভার থাকিবে। মার্কিণ প্রতিনিধিরা এই ব্যবস্থায় সম্মত হওয়ার কারণ আছে। এই ব্যবস্থায় আপাততঃ ক্ষুদ্র পরিষদ ক্ষমতাহীন হইলেও উহাকে ভবিষ্যতে ক্ষমতাশালী করা অসম্ভব না হইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য যদি উহার নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় ক্ষুদ্র পরিষদে স্থানান্তরিত হইতে পারিবে। বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র যেন্নায় তাহাদের সেনাবলকে ক্ষুদ্র পরিষদের কর্তৃত্বাধীন করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারিবে। রুশিয়া সঙ্গতভাবেই সন্দেহ করে যে, ভেটো অর্থাৎ সর্বসম্মতি সংক্রান্ত ব্যবস্থা রহিত করিবার প্রাথমিক ব্যবস্থারূপে এই ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হইল।

প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গ

কিছুকাল পূর্বে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে একটী কমিটী নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটীর অধিকাংশ সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্যালেষ্টাইনকে ইহুদী রাষ্ট্র ও আরব রাষ্ট্রে বিভক্ত করাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। অন্য সংখ্যক সদস্য প্যালেষ্টাইনকে একটি যুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করিবার সুপারিশ করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ সমর্থন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্যালেষ্টাইনের ইহুদী বা আরব কোন পক্ষই জাতি-সঙ্ঘ কমিটীর সংখ্যালঘিষ্ঠ রিপোর্ট মানিয়া লইয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করেন নাই; তাঁহারা দুইটি রিপোর্টই অগ্রাহ্য করেন।

জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে এখন কমিটীর সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্ট অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহুদী রাজ্যের স্বাধীন সত্তা হইবে। সোভিয়েট রুশিয়াও প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। তবে, তাহার চেয়ে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, এই

বিতর্ক করিবার কাজ জাতি-সঙ্ঘ সম্পাদিত করিবে; অন্তর্বর্তীকালে প্যালেষ্টাইনে কর্তৃত্বও থাকিবে জাতি-সঙ্ঘের, বৃটেনের নহে। ইহুদী ও আরব রাষ্ট্র যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়, সে জন্যও লোহিরেট কমিশন সুস্পষ্ট দাবী করিয়াছে। বৃটেন প্যালেষ্টাইনে তাহার ম্যাণ্ডেট ত্যাগ করিবে; অক্টোবর মাসের মধ্যে তাহার সমস্ত সৈন্য প্যালেষ্টাইন হইতে অপসারিত হইবে। প্যালেষ্টাইনকে বিতর্ক করার এই ব্যবস্থায় আরব রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহারা অবশ্যে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। প্যালেষ্টাইন সমস্যার প্রকৃত সমাধান কিছুই হইল না। এখানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও অসন্তোষ চলিবে; ইহার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা চলিতে থাকিবে। জাতি-সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ করিবার জন্য আরবদের সমর-প্রচেষ্টা বন্ধের অনুরোধে জাতি-সঙ্ঘের শান্তি লইয়া বৈদেশিক শক্তি প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে।

৩০।১১।৪৭

নীলগিরি

শ্রীজনরঞ্জন রায়

সাম্প্রতিক ঘটনা নীলগিরিকে লোকচক্ষের অত্যন্ত সম্মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে। আজ আমরা একটু ঘনিষ্ঠভাবে তাহার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিতেছি।

নীলগিরি একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইহার উৎকট স্বৈরাচারের কাহিনী উড়িষ্যার রাজকর্মচারী ইতিহাসে কলঙ্কপাত করিল!

যে "পূর্ব্ব ভারতীয় দেশীয় রাজা ইউনিয়ন" ১৯৩৫ সালে গঠিত হয়, ইহা তাহার তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেছিল। উক্ত ইউনিয়নের প্রথম শ্রেণীতে পড়িত—ময়ূরভঞ্জ, ত্রিপুরা ও কুচবিহার। দ্বিতীয়ে—ঢেঙ্কানল, আটগড়, কালাহাণ্ডি প্রভৃতি। তৃতীয়ে—খালসা, নরসিংহপুর, নীলগিরি প্রভৃতি।

বাঙ্কিপাতাপ্রবণকারী পশ্চিম বাঙ্গালার জঙ্গল সকলের পার হইয়া, উড়িষ্যা প্রদেশে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে কঠিন প্রস্তরে নীলাঙ্কিত বালেশ্বরের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়েন। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার আকাশচুম্বী মহিমা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। নীলগিরি এই পর্ব্বতমালারই অন্যতম। বালেশ্বরের ১১ মাইল দক্ষিণে তাহা অবস্থিত। এজন্য রেল লাইন হইতে তাহা ঠিক দৃষ্টিগোচর হয় না। নীলগিরির একাংশের নাম 'ধর্মচূড়'। উদ্ধত সূর্য্যরশ্মি উদ্ভাসিত এই চূড়াটির শোভায় মুগ্ধ হইয়া কে কবে এই নামকরণ করিয়াছিলেন তাহা কালের অজ্ঞাত-ক্রোড়ে চিরদিন লুক্কায়িত থাকিবে। কিন্তু যিনিই ইহার নাম দিয়া থাকুন, আমাদের ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, শুরুগম্ভীর এই নগ্ন পর্ব্বত চূড়ার প্রতি তাঁর অন্তরের কত গভীর ছিল এবং তাহার একমাত্র শোভা ঐ সূর্য্য কিরণের প্রতিফলনটিকে তিনি কি সৌরব দান করিয়াছেন!

রাজ্যের চতুঃসীমা সম্বন্ধে জনৈক উড়িয়া কবি এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"উত্তরে বালেশ্বর, পশ্চিমে ময়ূর,
দক্ষিণে কটক, পূর্ব্বে অসীম সাগর,
মধ্যে 'জগন্নাথ-ঘাণ্ড' কটকে যেবলা,
ইষ্ট কহর গেরুবাটি অন্তে খোলা।"

নীলগিরির অবস্থান এই কবিতাটি হইতে অনেকটা অনুমান করা যায়। কোন্ পথ দিয়া এখানকার 'আদিবাসী'রা আনাগোনা করিত তাহা জানা যায় না। নীলগিরিতে উড়িষ্যা অধিবাসীগণপরিচালিত 'প্রজা মণ্ডলের' বিরুদ্ধে আদিবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে এখনও গিরিপথে যাতায়াত করা যায়। তবে তাহা শুধু ঐসব পাহাড়িয়া আদিবাসীগণের পক্ষেই সম্ভব। এখন একমাত্র পথ বালেশ্বর দিয়া এবং সেখানে আসিয়া 'জগন্নাথ ঘাণ্ড' অর্থাৎ—পুরী যাইবার ট্রাঙ্ক-রোড (ঘাণ্ড অর্থে বড় রাস্তা) দিয়া বহির্জগতে যাতায়াত করা চলে। এখন বালেশ্বরে আসিয়া রেলে চড়িলেই হইল।

নীলগিরি রাজ্যের পরিধি ২৮৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৪০০০, আয় প্রায় ৩ লক্ষ টাকা (নীলগিরি সম্বন্ধে বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদত্ত ১৪।১১।৪৭ তারিখে প্রকাশিত বিবরণী মতে)।

নীলগিরির প্রাচীন রাজবংশ রাজপুত, অথবা প্রাচীনকালের উড়িষ্যা ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের উপাধি ছিল মর্দ্দরাজ। এখন পোষ্যপুত্রে আসিয়া ময়ূরভঞ্জের রাজবংশ এখানকার অধীশ্বর। ময়ূরভঞ্জের রাজ উপাধি ভঞ্জদেও। ভঞ্জদেওগণ নিজেদের সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ জয়সিংহ নামক জনৈক ভাগ্যান্বেষী আকবর বাদশাহের সময় ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের পার্ব্বত্য বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করেন। তত্র রাজবংশের একাংশ ময়ূরকে দেববাহন বলিয়া মনে করেন। এজন্য ময়ূরভঞ্জে ময়ূর শিকার নিষিদ্ধ। তাঁহারা ময়ূরভঞ্জ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াও থাকেন। হয়তো পূর্ব্বকালে ভঞ্জ-রাজবংশ ময়ূরাঙ্কিত ছিল, এখন কিন্তু তাহা নাই। এইসব পার্ব্বত্য উপজিবেশকারীগণ ময়ূর, নাগ প্রভৃতি দিয়া নিজেদের বংশকে কেন আখ্যায়িত করিতেন তাহার কারণ জানা যায় না। ভঞ্জবংশের

ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবার যেমন ময়ূরবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন, তদ্রূপ কপিলেন্দ্র রাজবংশ সেইরূপ নাগবংশীয় বলিয়া নিজেদের পরিচিত করেন।

আকবরের সময়ে ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবার স্থাপিত হইয়া থাকিলে উহা ১৩শ শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু নীলগিরি রাজবংশ কবে স্থাপিত হইয়াছে তাহা জানা যায় না। তবে সমকালে হওয়াই সম্ভব।

ময়ূরভঞ্জের রাজা শ্রীরামচন্দ্র কেশব সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুচারু দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল শ্যামচন্দ্র। শ্যামচন্দ্র রক্ষণশীল ও কিছু অদূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্রাহ্ম বিবাহের জন্য তিনি রাজা মধ্যে ঘোর প্রতিবাদ তুলেন। যাহার জন্য সুচারু দেবীর বিবাহিত জীবন অশান্তিপূর্ণ হয়। এই শ্যামচন্দ্রই ভবিষ্যতে নিঃসন্তান নীলগিরিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের পোষ্যপুত্ররূপে নীলগিরিতে আসেন। এখনকার নীলগিরির রাজা তাঁহার পুত্র শ্রীকিশোরচন্দ্র ভঞ্জদেও-মর্দ্দরাজ ত্রিবরবর-রায় শ্রীচন্দন-মহাপাত্র। এত বড় নামের দ্বারা কোন্ পরিচয়

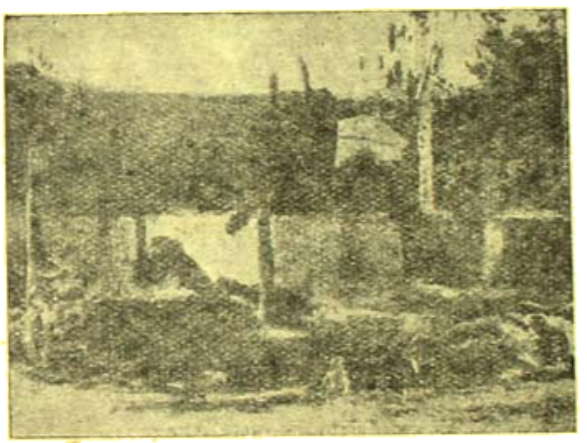

মহারাজার প্রয়োচনায় আদিবাসীদের দ্বারে স্বীকৃত প্রজামণ্ডল অধিল

পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বুঝা শক্ত। আমরা জানি কটকের কেন্দ্রাপাড়া ময়ূরভঞ্জার প্রধান ভঞ্জবার বংশের জ্যেষ্ঠের উপাধি মর্দ্দরাজ। কনিষ্ঠদের উপাধি যথাক্রমে হরিচন্দন ও শ্রীচন্দন। নীলগিরির রাজার নামের সঙ্গে এইভাবে ময়ূরভঞ্জের রাজোপাধি, নীলগিরির রাজোপাধি প্রভৃতি অনেক পরিবারের উপাধি আছে, তার সঙ্গে 'মহাপাত্র' উপাধিও আছে। মহাপাত্রের অর্থ কিন্তু প্রধান-অমাত্য। কেন তিনি এই উপাধিও বহন করেন তাহা আমরা জানি না। তবে সম্প্রতি তিনি প্রধান অমাত্যের কোনো কার্য করিতেন না তাহা আমরা জানি।

সন ১৯২৮ সালে ২১ বৎসর বয়সে তিনি গদি পান।

তাঁহার এই ৪৩ বৎসরের জীবনেতিহাস ছিল বৈচিত্র্যময়। বারবার আঘাত পাইয়াও তাঁহার বিচার বুদ্ধির মোড় ঘুরে নাই। ফলে তাঁর পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক জীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

রাজা ছিলেন সুপুরুষ। তিনি রায়পুরের রাজকুমার কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ইংরাজ, বাঙ্গালী ও সংস্কৃতি বিরোধী শিক্ষা দিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ নৃপতিবৃন্দকে কিরূপ অমিতব্যয়ী ও বেহেড়াচারী করিয়া তোলা হয়, ইংরেজ চালিত এই রাজকুমার কলেজ তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। সেই শিক্ষাগুণে স্বাধীন ভারতের চক্ষে এই রাজকুমারগণ প্রায় সকলেই একান্ত হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন।

রাজা ভাল শিকারী এবং বিলিয়ার্ড খেলার পারদর্শী। তাস অভিজ্ঞতা ও সঙ্গীতানুরাগী। থিয়েটারের শখ তাঁহার এই প্রবল ছিল যে, তিনি নিজে এখানে অতি আধুনিকভাবের একটি রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করাইয়াছেন। গদি প্রাপ্তির পর তিনি একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। তদানীন্তন ইংরেজ রাজনৈতিক-প্রতিনিধি তাঁহাকে তখন একটি প্রবল সংস্কারহীন পথের অনুবর্তী করিয়া দিয়া গেল। যেন রাজকুমারের শিক্ষাক্ষেত্রে এইটুকুর পরিচয় যথেষ্ট নাই বাকী ছিল! যে পথের অভিযাত্রী হইয়া আজ তিনি সমস্ত রাজ-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছেন।

রাজা প্রথমে বিবাহ করেন ওড়ানীয় (ওড়য়াটের) রাজ-কন্যাকে।

নীলগিরির একটি গ্রামে বিদায়ী মুক্তিসেনাগণ

তাঁহার একটি কন্যা সন্তান হওয়ার পর তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন রাঁচির এক জমিদার কন্যাকে। তিনি তাঁর মামাতো ভগ্নী। ইহা এই দেশে প্রচলিত অন্যতম হেয়েও প্রথা বলিয়া মনে হয়। হেয়েও সমাজে অবশ্য ভগ্নীকে বিবাহ করা শ্রেষ্ঠ বিধি। তাঁহারা মামাতো ভগ্নীকেও বিবাহ করে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রাজার একটি পুত্র হইয়াছে। এখন তাহার বয়স ১৭ বৎসর। রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক জুড়িয়া সংরক্ষিত শাল বন। এখানে ময়ূর যথেষ্ট কোনও বাধা নাই, কিন্তু বাঘ যথেষ্ট নিষিদ্ধ। কেবল রাজা নিজে ও ইংরেজ অতিথিগণ ব্যাঘ্র শিকার করিয়া থাকেন। এই সব জঙ্গলের সাধুদেশে বাস করে সাঁওতাল, মাকড়িয়া ও কোল জাতীয় লোকেরা। তাহারাই আদিবাসী বলিয়া পরিচিত। রাজা ইহাদের অনেককে আরেয়াস্ত্রে শিক্ষিত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। রাজ্যের উড়িয়া অধিবাসীদের

সঙ্গে সম্প্রতি ইহাদের যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই আছে। উড়িষ্যা প্রত্যাবর্ত 'প্রজামণ্ডল' স্থাপন করিয়া রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইলেন। প্রজা-বর্গের মধ্যে ইহারা প্রায় অর্দ্ধাংশ। সাঁওতালগণ এখনও বাঙ্গালা ভাষা ভাষী।

রাজার উড়িষ্যা প্রদেশে কতকগুলি জমিদারীও আছে। সেগুলি অবশ্য রাজার নিজস্ব হইলেও 'ঠাকুর মহাল' অথবা দেবোত্তর বলিয়া পরিচিত। সিঙ্ক রাজ্যের মালিক জমিদারী রাখা বৃদ্ধিমানের পক্ষে (ইংরেজী) আইন বিরুদ্ধ। তাই বোধ হয় ঐ সব সম্পত্তি দেবোত্তর করা হইয়া থাকিবে। জনকল্যাণ মূলক অন্যান্য বন্দোবস্তও আছে। প্রত্যেক বিগ্রহের উৎসবাদি প্রতিপালিত হয়।

রাজকার্য্যে যেখানেরই আয়ত্তে সব ক্ষমতা ছিল। কিন্তু রাজার আদেশমতই শাসন-শোষণের পরিচালিত হইত। রাজকর্ম্ম চারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দেওয়ান, তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৩০০৲। তৎপরে বন বিভাগের কর্ত্তা, বেতন ছিল মাসিক ২০০৲। তৎপরে সহকারী দেওয়ান ও ডাক্তার—তাঁহাদের প্রত্যেকের ১০০৲ করিয়া এবং পুলিশ

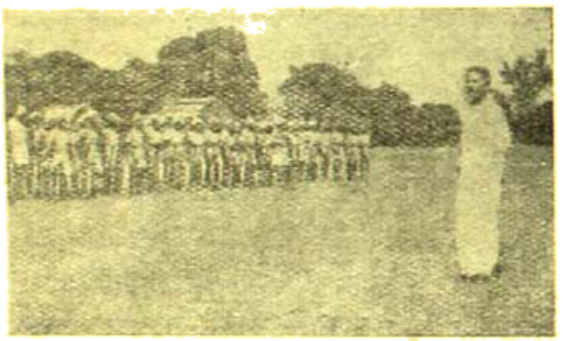

নীলগিরি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে ভারতীয় ইউনিয়নের সেনাগণের পুরোভাগে বক্তৃতারত উড়িষ্যার নেতা শ্রীবরুক্ষ চৌধুরী

বিভাগের কর্ত্তার মাসিক ১০০৲ করিয়া বেতন ছিল। রাজার খাস মুন্সির বেতন মাসিক ২০০৲ ছিল।

রাজার পিতা মৃত্যুকালে রাজকোষে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান। স্বর্ণচূড় পর্ব্বতের পাদদেশে রাজা বিজলীবাতি সংযুক্ত অত্যাধুনিক-ভাবে স্বর্ণমণ্ডিত ছিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। তাঁহার স্বাসনটি হস্তী ও ২৮ খানি মূল্যবান মোটর গাড়ি ছিল।

নীলগিরির প্রধান উৎসব হোলাচ। উড়িষ্যার একশ্রেণীর হিন্দুগণ সারা চৈত্র মাস বসন্তোৎসবে মত্ত থাকে। পার্ব্বত্যজনের মধ্যে সেই সময়ে হোলাচ অনুষ্ঠিত। ওল্লারাজ গোষ্ঠির মধ্যে নীলগিরি ও সরাইকিলাতে ব্রাহ্ম অনুগ্রহে এই মৃত্যু সবধিক উন্নতির কলানৈপুণ্য প্রকাশে সমর্থ হয়। নীলগিরিরাজ সস্ত্রীক বিদায় হইলেও নিজে নৃত্য করিতেন না। কিন্তু সরাইকিলার চতুর্থ কুমার নৃত্য শুরুজনাশীর্বাদ নিয়ে নিজে হোলাচ দাদা ইটালী, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানের বিস্ময় উৎপাদন করেন। কবিগুরু স্বয়ং তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ইহা ভারতের যুদ্ধজয় নৃত্যের রূপটি ফুটাইয়া তুলে। ছৌ অর্থে ছাউনি (camp)। এজন্য ছৌনাচকে আমরা যুদ্ধজয় নৃত্য বলিতেছি। নৃত্যকারের মুখোস, মাল-কোঁচা আঁটা বস্ত্র, গায়ে অলঙ্কারাদি যেন অসুরের কল্পনা আনে, মাথায় পাগ্‌ড়ি যেন বিরূপাক্ষের অনুকৃতি বলিয়া মনে হয়। হাতে ঢাল ও তরবারি, কখনও বা ঢাল ও বর্শা। কোমরঘুঙ্গুর বাজে। পুরুষগণই নাচে। রবীন্দ্রনাথ এই নাচ দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—"আমি এই নৃত্য দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমাদের ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকলা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবার পথে চলিয়াছে। তাহার একটি বিশিষ্ট রূপকে এই রাজবংশ দীর্ঘকাল সুরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন, ইহা তাঁহাদের গৌরবের বিষয় এবং সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার কামনা এই যে, আধুনিক কালের কোনও অনুকরণ যেন ইহাকে আবিল না করে—বর্ত্তমান রুচিবিকারের আক্রমণ হইতে ইহা যেন আত্মরক্ষা করিতে পারে" (বিশ্বভারতী হইতে ৬।২।৪২ সালে সরাইকিলাস্থ লিখিত বিশ্বকবির পত্রের একাংশ)।—ইহা হইতে প্রমাণ হইবে

নীলগিরি প্রজামণ্ডল আন্দোলনের নেতা শ্রীকৈলাশ মণ্ডলীকে সম্বর্দ্ধনা

ছৌনাচের মৌলিকতা কি। এই ছৌনাচের নৃত্যরাজকে ইউরোপ প্রভৃতি স্থানের অভিজ্ঞ সমাজের নিকট সমুপস্থিত করিয়া প্রসিদ্ধ কলাবিৎ বর্গীয় হরেন ঘোষ মহাশয় ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেন। আততায়ীর নির্ম্মম হস্ত আজ তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে। স্বাধীন ভারত তাঁহার অভিজ্ঞতাসর্জ্জিত সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। ছৌনাচের কলা-নিপুণ যুবক গুরুদেবের অকাল মৃত্যুতেও আমরা দুঃখ অনুভব করি। আরও একান্তভাবে দুঃখিত হই নীলগিরিরাজ কিশোরচন্দ্রের জন্য। তিনি এতবড় কলাবিৎ হইয়াও সেবে ছৌনাচকেই নিজ স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র স্বরূপে ব্যবহার করিলেন। বার্ষিক নৃত্যের পর পারিতোষিক বিতরণ কালে তাঁহার অনুগত জনকে নির্ব্বিচারে তিনি পুরস্কৃত করিতেছিলেন। যাহার ফলে প্রজাগণের মনে অসন্তোষের বীজ বপন করেন। যে অগ্নি-

কথা তাঁহার নিরন্তর অত্যাচারের ইন্ধনযোগে আজ তাঁহারই ধ্বংসের জন্য সর্বগ্রাসিনী দাবানল সৃষ্টি করিয়াছে।

নীলগিরি রাজ্যে প্রথম প্রজাবিদ্রোহ হয় রাজপ্রবর্তিত 'বাগন' (চাষা) আদায়ের প্রতিবাদে ১৮৩০ সালে। রাজাবেশে অতি নির্মমভাবে তখন প্রজাদমন হইয়াছিল। এই অত্যাচারের ধূমায়িত অগ্নি 'প্রজামণ্ডল' আন্দোলনের জন্মদাতা। তাহার শক্তিসঞ্চয় করিতে বারো বৎসর লাগে। ১৯৪২ সালে প্রজামণ্ডল মূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নীলগিরির মুক্তিসংগ্রামের জন্য এই প্রজামণ্ডল আজ দেশবাসীর কাছে জয়মাল্যে ভূষিত হইলেন। ইহার পূর্বে কয়েক বৎসরে উড়িষ্যার বিশেষ-বিশেষ নৃপতিবর্গ প্রজাদমনে সদাসাচী হইয়া উঠেন। এই সময়ে আটগড়ের রাজা ও ঢেঙ্কানলের রাজা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিতাড়িত হইলেন। ইতিপূর্বে ১৯৪০ সালে রণপুরের রাজা পরিচ্যুত হইয়াছেন। নীলগিরিতে সিংবিগারে বহু প্রজাহত্যা হওয়ায় ১৯৪৩ সালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রাজার ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া রাজা শাসনের জন্য একজন দেওয়ানকে নিয়োগ করেন। শাসনকার্যে

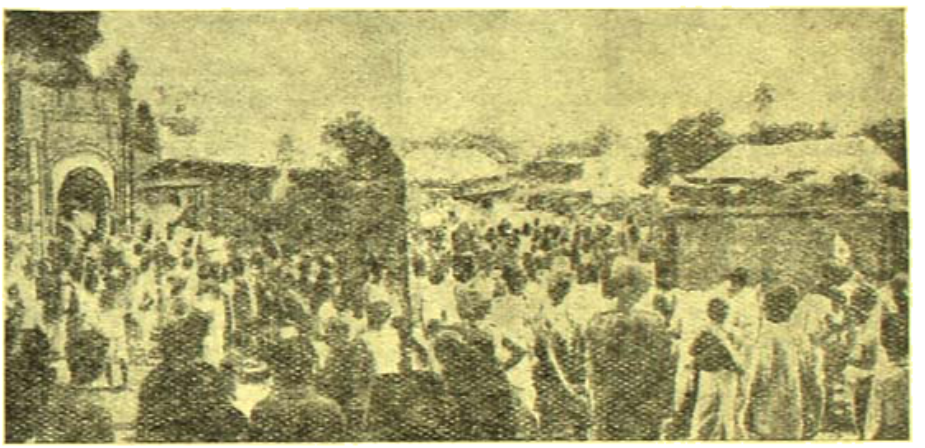

নীলগিরির রাজার সম্মুখে আত্মসমর্পণের ঘরিল পাঠ

তথাপি রাজা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে থাকিলে তাঁহাকে উক্ত কর্তৃপক্ষ রাঁচিতে স্থানান্তরিত করেন। ১৯৪৭ সালের প্রথমভাগে রাজা পুনর্বার ক্ষমতা পান এবং নীলগিরিতে প্রত্যাবর্তন করেন। আদিবাসীদের উত্তেজিত করিয়া প্রজামণ্ডলের সভ্যদের প্রতি অত্যাচার করিবার অপকৌশল যেন তিনি প্রবাসে বসিয়াই ঠিক করিয়া আসেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজকে লোকমতের প্রবলশক্তি বেসামাল করিল, ইহা দেখিয়াও এই ক্ষুদ্র নৃপতির চৈতন্যোদয় হয় নাই। এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের হাতে শাসনক্ষমতা থাকা অত্যন্ত ভয়াবহ। কেন্দ্রে যদি শক্তিশালী ভারত-সরকার না থাকিতেন, তবে উড়িষ্যার প্রাদেশিক সরকার ইঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না।

নীলগিরিকে কোন খনিজ সম্পদ আছে বলিয়া প্রকাশ নাই। সেখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পাথরের বাসন। কিছু কিছু পাথরের দেবমূর্তিও প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ ধোঁয়াটে রঙের 'মুগ্‌নি' পাথর দ্বারা এইসব প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। খণ্ডাপাড়া রেল ষ্টেশনের নিকটে এই ধরণের দ্রব্য প্রস্তুতের বহু কারখানা আছে। খণ্ডাপাড়া হইতে চালান হইয়া ইহা দেশবিদেশে যায়। এই কুটীর শিল্প ক্রমে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। প্রধানতঃ প্রস্তরময় পাহাড়ের পরিত্যক্ত সম্বন্ধে হিন্দুর সংস্কার পরিবর্তন ইহার কারণ। প্রাদেশিক সরকার সময় মনোযোগী না হইলে এই প্রাচীন প্রত্নশিল্প-কেন্দ্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। কাঁচনির্মিত বহুদ্রব্য আমাদের নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ প্রস্তরনির্মিত দ্রব্যসকল গঠিত করিয়া প্রচলনের চেষ্টা করা বিশেষ আয়াসসাধ্য নয়।

সম্প্রতি ভারতসরকারের দেশীয় রাজ্যবিভাগ নীলগিরি রাজ্যের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। নীলগিরি রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ভাঙিয়া যাওয়ার ফলেই ভারতসরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১৪ই নভেম্বর (২৭শে কার্তিক) তারিখে উড়িষ্যা প্রাদেশিক সরকারের বিশেষ দূত হিসাবে রাজস্ব বিভাগের কমিশনার নীলগিরির রাজাকে তাঁহার হস্তে রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করিতে বলেন এবং রাজপ্রাসাদ ও রাজাকে রক্ষা করার আশ্বাস প্রদান করেন। এক্ষণে বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নীলগিরির শাসনকার্য চালাইতেছেন।

এইরূপে নীলগিরির স্বৈর-শাসনের অবসান হইল এবং ওখানকার প্রজামণ্ডলের আন্দোলন ক্ষান্ত হইল। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই গণ-আন্দোলনের কর্মী ও নেতাগণকে অভিনন্দন করিতেছি। অচিরেই তাঁহারা অনগ্রসর আদিবাসীদের বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিয়া একযোগে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়া নিজেদের হস্তে শাসনভার গ্রহণে সমর্থ হইবেন আশা করা যায়।

উড়িষ্যার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ১৭টি রাজ্য পূর্বে ভারতীয় ব্রিটিশশাসিত মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ১লা আগষ্ট হইতে যে মিত্র সংঘ গঠিত করিয়াছিল, ভারতসরকার তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং ঐসব রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে সেগুলিরও শাসনভার সরকার নিজেরা লইবেন। ইহাতে উড়িষ্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলা প্রবর্তিত হইবে। ইহাও নীলগিরির গণ-আন্দোলনের অন্যতম ফল। এই প্রদেশের দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত নীলগিরি প্রজামণ্ডল ইহার জন্যও অভিনন্দনীয় হইয়া থাকিবেন।

বনফুল

১২

মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছের ছায়ায় সদারঙ্গবিহারীলাল তাঁর মোটরবাইক থেকে অবতরণ করলেন, রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে চারিদিকে চাইলেন একবার। রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, কোন্‌টা ধরবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। মনে হল কাছাকাছি এসে গেছেন এইবার, এ সব সম্ভবত দিগ্বিজয়বাবুরই জমিদারি। তবু একটু খোঁজ করতে হবে। কুঞ্জ ভাবলে তার বিদ্যুদ্বিত-হলেও অনিবার্য্য মৃত্যু এবার আসন্ন হয়ে এসেছে—হঠাৎ কোটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে সে একবার প্রাণপণে—পারলে না। সদারঙ্গবাবু দেখলেন—অদূরে আর একটি বটগাছের নীচে একটি গরুর গাড়ি রয়েছে এবং তাতে একটি বৃদ্ধ বসে আছেন। ভদ্রলোক বলেই মনে হল। এগিয়ে গেলেন সেদিকে। বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি তাদৃশ প্রখর নয়, সদারঙ্গবিহারী যে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন বলে' মনে হল না। আপন মনেই কি যেন বলছিলেন তিনি এবং মাথা নাড়ছিলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতে তিনি মুখ তুলে চাইলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল কুঞ্জর মুখটা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। দাড়ি-গোঁফওলা একটা জানোয়ার একজন ভদ্রলোকের কোটের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত এবং অস্বস্তিকর। এ আবার কি বিপদ ঘটল এসে। নিজের জ্বালাতেই তিনি অস্থির হয়ে আছেন—এ আবার—

"নমস্কার। আচ্ছা, একটা খবর বলতে পারেন—"

"খবর? একটিমাত্র খবরই এখন মস্ত হয়ে রয়েছে আমার কাছে, সেটা যদি শুনতে চান বলতে পারি"

সদারঙ্গবিহারীলালের পরোপকার-বিকীর্ষু অন্তঃকরণ কৌতূহলী হয়ে উঠল, মনে হল ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন হয়তো।

"নিশ্চয় শুনব, কি বলুন"

"ধানের চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম, দাম শুনে চক্ষু কপালে উঠেছে। থলি বোরাগুলি নিয়ে মানে মানে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা-ও দেখতে পাচ্ছি না। জল খেয়ে আসি বলে' গাড়োয়ান ব্যাটা সেই যে কোথায় সরেছে এখনও তার পাত্তা নেই"

"ও। তাহলে তো মুস্কিলে পড়েছেন আপনি"

"সারাজীবনই একনাগাড়ে মুস্কিল চলেছে মশাই। এই করেই সত্তরটা বছর কাটিয়ে দিলাম, আরও যে ক'টা দিন কর্ম্মভোগ আছে করতে হবে। কিন্তু ধানের অবস্থা যদি এই দাঁড়ায়, তাহলে লোকে বাঁচবে কি করে' বলতে পারেন"

সদারঙ্গবিহারীলাল বুঝতে পারলেন—এ ব্যক্তির উপকার করা তাঁর সাধ্যাতীত। ধানের দর কমাতে তিনি পারবেন না।

"আচ্ছা, একটা খবর—"

"খবরই তো বলছি মশাই, শুনুন না। এই খবরই তো আসল খবর। আপনারা শহুরে বাবু, এ সব খবরের ধার ধারেন না হয়তো, কিন্তু ধানের খবরই আসল খবর। ধানের এই অবস্থা হলে জান বাঁচবে না কারও তা' বলে দিচ্ছি—বাইশ টাকা মণেও দিতে চাইলে না মশাই—"

"ও, তাই না কি। তাহলে চালের দর আরও চড়বে? বার্মা-রাইস না আসাতেই এ রকম হচ্ছে—"

"ওই এক ঘুঘো তুলেছেন আপনারা। বার্মা রাইস নাই এল, বিষ্ণুমোড়লের গোলায় ধান ঠাসা রয়েছে দেখে এলাম, বদমাইসি করে' ছাড়ছে না। আমি দেখব কেমন খদ্দের জোটে ওর। লক্ষণ ব্যাপারীকে চেনেন নি বাছাধন এখনও—"

আপন মনেই আর একবার মাথা নাড়লেন। সদারঙ্গ-বিহারীলালের হঠাৎ একবার মনে হল, বার্মা-রাইসের সঙ্গে বিষ্ণু মোড়লের গোলার ধানের অর্থনৈতিক যোগাযোগটা কোথায় তা চট করে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

"সেদিনকার ছোঁড়া বিনে—এখন বিষ্ণু মোড়ল হয়েছেন। তার বাপকে চরিয়েছি, ঠাকুরদাকে চরিয়েছি—সে ওপর-টপকা চাল মারবে আমার ওপর—"

সদারঙ্গবিহারীলালের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে' বৃদ্ধ নিজের মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে উল্লিখিত অর্ধ-স্বগতোক্তি করাতে সদারঙ্গবাবু থমকে গেলেন একটু। তাঁর রসনায় যে অর্থনৈতিক বক্তৃতাটা উদ্যত হয়ে উঠেছিল তা বাধ্য হয়ে সংযত করে' ফেলতে হল তাঁকে!

"আচ্ছা, একটা খবর বলতে পারেন। মুচুকুন্দ—"

"এই বলে' দিলাম আপনাকে ওই বিনেকে পলবস্ত্র হয়ে পৌনে একুশ টাকায় ধান ছাড়তে হবে—না যদি হয় নাক কেটে ফেলব আমি—"

বলে' ভদ্রলোক নিজের নাকে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে চাইলেন। সদারঙ্গ-বিহারীলাল আড়চোখে একবার তাঁর নাকের দিকে চেয়ে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

"তোর ধান তুলসী-মঞ্জরীও নয়, রূপশাগীও নয়—"

"মুচুকুন্দ কুসুমেশ্বরী এখান থেকে কতদূর বলতে পারেন"

"পারি বই কি। সেখানে যাওয়া হচ্ছে কেন"

"এই কুকুরটাকে পৌঁছে দিতে হবে"

"ওটা কি কুকুর না কি"

"হ্যাঁ, কুকুর বই কি। বিলিতি-কুকুর"

"তাই বলুন বিলিতি-কুকুর। বিলিতি-কুকুর কুকুর নয়, বিলিতি-কুকুর। বিলিতি-বেগুন যেমন বেগুন নয়, বিলিতি-বেগুন। মাল নিয়ে কেনা-বেচা করি আমি, আমার কাছে বেঁচাল কথা চলবে না"

সদারঙ্গবাবু অবাক হলেন। ভদ্রলোকের শুধু অর্থ-নৈতিক নয় প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান নেই। আশ্চর্য্য! এঁর মনে আলোকপাত করা কর্তব্য। অন্তত চেষ্টা করা কর্তব্য—নিশ্চয়ই।

"কুকুর বলতে আপনি কি বোঝেন"

"ওতে আবার বোঝাবুঝি কি আছে। আপনি যা বোঝেন আমিও তাই বুঝি"

"তবু শুনি না আপনার ধারণাটা কি রকম"

"আপনার ধারণা যে রকম"

"আমি যদি বলি আমার ধারণা এটাও কুকুর"

সদারঙ্গবাবু কুহকে দেখিয়ে হাসলেন একটু।

"তাহলে আমি বলব আপনার ধারণা ভুল। ওটা বিলিতি কুকুর"

"বিলিতি কুকুর কি কুকুর নয়?"

"আপনিই আগে বলুন বিলিতি-আমড়া কি আমড়া? বিলিতি-দুধ কি দুধ? বিলিতি রুটি কি রুটি?"

সদারঙ্গবিহারীলাল উপলব্ধি করলেন—এ ব্যক্তির মনে আলোকপাত করতে হলে অনেক ধৈর্য্য এবং সময়ের প্রয়োজন। ধৈর্য্য তাঁর আছে, কিন্তু সময় আপাতত নেই। অন্য সময়ে চেষ্টা করা যাবে—করতেই হবে—ভদ্রলোকের বাড়িটা কোথা জেনে নেওয়া যাক।

"আচ্ছা, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। আপনার নিবাস কোথা?"

"কেন"

"সুবিধে পাই তো গিয়ে পড়ব একদিন"

সদারঙ্গবিহারীলালের চক্ষু প্রদীপ্ত এবং হাসি আকর্ণ হয়ে উঠল।

"আমার বাড়ি কাঁটকে"

"সে কোন দিকে"

"কাঁটকের নাম শোনেন নি। শালিকপুর কাঁটকে"

"এখান থেকে কতদূর"

"এখান থেকে বার ক্রোশ হবে। সোজা উত্তর দিকে গিয়ে ভগবানগঞ্জের কাছ বরাবর পশ্চিমে বেঁকতে হবে। মাঝে নদী আছে গোটা দুই। বৈতি আর চাকা—"

"মশায়ের নাম কি"

"লক্ষণচন্দ্র কুণ্ডু"

"আচ্ছা, খেতে চেষ্টা করব একদিন"

নোটবুক বার করে' সব টুকে নিলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল।

"আচ্ছা, মুচুকুন্দ কুণ্ডলেশ্বরী কতদূর এখান থেকে"

"গরুর গাড়িতে গেলে ঘণ্টা দুই লাগবে—তাও অবশ্য নির্ভর করবে গরু কেমন তার উপর, শুধু তাই নয় —গাড়োয়ান কেমন হাঁকায় তার উপরও। আমার ভাগ্যে যেমন জুটেছে এইরকম পক্ষীরাজ গরু আর সুমন্ত্র গাড়োয়ান যদি হয় তাহলে—"

"কোন দিকের রাস্তাটায় যাব"

"সোজা চলে যান না"

"বাঁ-দিকে, না ডান-দিকে"

"ডান-দিকের রাস্তাটা কি সোজা? বেঁকে গেছে দেখছেন না?"

সদারঙ্গবিহারীলাল আর অধিক বাক্‌বিস্তৃতি না করে' বাইকে সওয়ার হলেন।

আর মিনিট পাঁচেক আগে যদি তিনি পৌঁছতে পারতেন তাহলে দিগ্বিজয়-দম্পতির সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুদের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে' অবশেষে তাঁরা যে কজন এসে পৌঁছেছিলেন তাঁদের নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন শিকার-অভিযানে। সুরেশ্বরী দেবী গিয়েছিলেন নানাবিধ আহারের সরঞ্জাম নিয়ে। তিনি তাঁবুতে থাকবেন।

সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুরা না আসতে দিগ্বিজয় ভাবছিলেন তিনিই বোধহয় গোলমাল করে' ফেলেছেন সব। কোনও কারণে না আসতে পারলে তারা একটা খবর দিত নিশ্চয়। দুজনে দু'জায়গা থেকে আসবে, দুজনেই যখন আসে নি এবং কোনও খবর দেয় নি, তখন তিনিই গোলমাল করে' ফেলেছেন নিশ্চয়।

"বুঝলে তারিখের গোলমাল করে' ফেলেছি সম্ভবত। দুজনকেই একসঙ্গে চিঠি লিখেছিলাম তো, দুজনকেই ভুল তারিখ জানিয়েছি, মানে দু'দুবার ভুল করেছি। তারা বেরোয় নি। হঠাৎ কবে এসে পড়বে কে জানে! তারা ভাববে আমরা তাদের প্রত্যাশায় আছি, আমি যে তারিখ ভুল করেছি তাতো জানবে না তারা—"

সুরেশ্বরী দেবীর কণ্ঠে হাসির জল-তরঙ্গ বেজে উঠল। দিগ্বিজয় বললেন—"কিন্তু তাদের চিঠি এসেছিল তো। তাতে লেখাও ছিল কোন তারিখে কোন ট্রেণে আসছে তারা। চিঠি দু'খানা তোমাকেই দিলাম কি সেদিন?"

"হ্যাঁ, দিলে তো"

সুরেশ্বরী টেবিলে, তাকে এবং অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানে খুঁজলেন। পাওয়া গেল না।

"পেলে?"

"কই না। টেবিল থেকে মেজেতে পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। চাকরটা হয়তো পাঁশ-গাদায় ফেলে দিয়েছে"

"কোথায়?"

"পাঁশ গাদায়—ওই যে বাগানের ওধারে ছেঁড়া কাগজপত্তর ওঁড়ো ফেলে দেয় যেখানে"

"ও, ছাই গাদায়"

"ছাই গাদাও বলতে পার। পাঁশগাদা বললেও ভুল হয় না বোধহয়। আমি তো বরাবর পাঁশ-গাদাই বলি। আমার বাপের বাড়িতেও পাঁশ-গাদাই বলে"

সুরেশ্বরীর কণ্ঠে অভিমানের সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠল। পত্নীর দিকে চকিত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দিগ্বিজয় বললেন—"ও, তাই না কি"

"আমরা নুণ্যা মানুষ, যা শুনে এসেছি বরাবর, তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে"

দিগ্বিজয় প্রমাদ গণলেন মনে মনে।

"তাতে আর হয়েছে কি। পাঁশ-গাদাও বলে তো অনেকে। ওইটেই সম্ভবত বেশী শুদ্ধ, পাংশু কথার অপভ্রংশ—"

"তা হোক, পাঁশ পাড়া-গেঁয়ে কথা। ছাইটাই শুদ্ধ বাংলা"

"যাক ও নিয়ে তর্কাতর্কি করে' আর কি হবে। অনর্থক সময় নষ্ট শুধু। তবে একটা আমি ঠিক জানি পাঁশ অশুদ্ধ নয়। সে যাক গে, এখন কি করা যায়—"

সুরেশ্বরী দেবী বললেন—"নিজে দাঁড়িয়ে পাঁশ-গাদাটা —মানে, ছাই-গাদাটা—একবার খোঁজাই না হয় ভাল করে'। যদি পাওয়া যায় চিঠি দুটো—"

"না, তার দরকার নেই। চিঠি পেলেও তারা তো আর আসছে না। আমি তারিখেরই গোলমাল করেছি ঠিক। কিন্তু কি করে' যে গোলমাল করলাম। ছকুবাবু আর গোবর্দ্ধনবাবু, এঁরা দু'জন তো ঠিক এসেছেন। এঁদেরও তো আমিই লিখেছিলাম—"

ছকুবাবু এবং গোবর্দ্ধনবাবু দু'জনেই সুরেশ্বরী দেবীর বাপের বাড়ির সম্পর্কিত লোক। অনেকদিন থেকে আসতে চেয়েছিলেন বলে' এঁদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সুরেশ্বরী বললেন, "কিন্তু তুমি তো সাধারণতঃ ভুল কর না এ রকম। আমারই বরং ভুলো মন—"

"না, না, কি যে বল সুরো। তোমার আবার ভুলো মন হল কবে থেকে। ভুলো মন আমার—"

"কেন বাড়িয়ে বলছ মিছিমিছি। কোথায় কোন পেরেকটি কুড়িয়ে রাখ তা মনে থাকে তোমার—তুমি ভুল করবে তারিখ"

সুরেশ্বরীর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ঝাঁজের আমেজ পাওয়া গেল। বাইরের কোন লোক উপরোক্ত কথোপকথন শুনলে ভাববে যে ভুলো-মন হওয়াটা যেন একটা লোভনীয় গুণ এবং তা না হতে পেরে সুরেশ্বরী দেবী যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

দিগ্বিজয় বললেন—"আমার স্বভাবই গোলমাল করে' ফেলা। তুমি ঠিক মতো সামলে নাও বলেই গোলমাল হয় না"

"কি যে বাজে কথা বল। আমি আবার কখন সামলাতে যাই তোমাকে? তোমার কোন কাজটায় আমি হাত দিতে চাই? যেখায় দরকারই হয় না, দিলেই বোধহয় গোলমাল হ'ত। এমনিতে তো কখনও কোন বিষয়ে গোলমাল হতে দেখিনি তোমার—"

দৃঢ়কণ্ঠে দিগ্বিজয় বললেন, "একটা কারণে মনে হচ্ছে যে চিঠিতে ভুল তারিখ দিই নি। চিঠি খামে ঢোকাবার আগে তোমাকে দেখিয়েছিলাম যে। ভুল থাকলে নিশ্চয় চোখে পড়ত তোমার"

"মোটেই না। তোমার চিঠি শোধরাবার দরকার হবে একথা ভাবতেই পারি না—"

"যাই বল, গোলমালটা আমিই করেছি। ট্রেণ ফেল করলে সান্ত্বনা অন্তত টেলিগ্রাম করত একটা। সুশোভন ছোকরার সঙ্গে তেমন আলাপ নেই অবশ্য, কিন্তু ওর বাপকে চিনতাম তো, ট্রেণ ফেল করে চুপচাপ থাকবে এ কথা তার সম্বন্ধেও ভাবা যায় না। তারিখেরই গোলমাল করে' ফেলেছি আমি—" (ক্রমশঃ)

পল্লী-গৃহে

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম-এ

এই সেই গৃহ!—
প্রতি ধূলিকণা এর—তাও মোর প্রিয়!
এই শুভ মুখখানে আজি মোর হর্ষ মানে
ফুল হ'য়ে ফোটে তব হাত রঙীন।
মন্দ এ পবন
শ্রীঅঙ্গসুরভি তব করিয়ে বহন।
বহুদিন-ভুলে-থাকা তোমার চোখের চাওয়া
প্রতি বাতায়নে সখি, জাগে অনুক্ষণ!
তব কণ্ঠস্বর
কপোত-কূজনে যেন শুদ্ধ দ্বিপ্রহর
আকুল উদাস করি, সঞ্চারিয়া ফিরে ধরি,
স্মৃতির ব্যথায় ভরি' আমার অন্তর!
রেখা ফুটিতেছে—
ও কোমল পদাঘাত মোহাগ উতল—
বহিমুখে—ব্রীড়াভরে লুটাইয়ে থরে থরে
আজো ঐ অপরূপ ফুলল কমল!
রোমা তব মায়া
ললিত লতায় লাজে ধরিয়াছে কায়া!
শ্যামল এ তরুতলে বিছায়ের ফুলফুলে
শ্রাবণ মেঘের মত চিকুরের ছায়া।
এ সরসী জল
তোমার কমল পায় আজিও উজল
উল্লাসে আসিয়া ছুটে পড়িতে কি চায় লুটে
যৌত করিবারে তব রক্ত পদতল?
শুধু তুমি নাই—
এ নির্জ্জন পল্লীগেহে জাগি ব'সে তাই!
পাখী ডাকে 'পিউ কাঁহা'. হৃদয় করিয়ে হারা.
যদি একবার আহা. কাছে তোমা পাই!

ভারত-হায়দরাবাদ চুক্তি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

১ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের বাসভূমি হায়দরাবাদ, আয়তনে ভারতের প্রায় ৬শত দেশীয় রাজ্যের মধ্যে যেমন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, শক্তি ও সম্পদের দিক হইতেও তেমনি ভারতের অন্যান্য বড় বড় দেশীয় রাজ্যগুলি অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। এই রাজ্যের নিজাম উপাধিধারী বৈরাচারী শাসক দেশের শাসনতন্ত্রে কোনও গণতান্ত্রিকনীতির আমল না দিয়া, নিজের একান্ত অনুগত একটি শাসক-গোষ্ঠীর দ্বারা এতাবৎকাল রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। রাজ্যে জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ জন অমুসলমান হইলেও, শুধু মুসলমান নবাবের রাজ্য বলিয়া শাসনব্যবস্থায় অমুসলমানের কোনও উপযুক্ত স্থান ছিল না। বরং অমুসলমান-প্রজা-প্রধান রাজ্যকে কঠোরভাবে শাসন করিবার জন্যই নিজাম পুলিশ ও সেনাবিভাগে শতকরা ৯০ জন মুসলমান নিয়োগ করিয়া একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করিয়া রাখেন। সম্প্রতি দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের ব্যাপারে ও ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত হায়দরাবাদের এক বৎসরের জন্য স্থিতাবস্থা চুক্তির ফলে, নিজাম বাহাদুর নূতন করিয়া একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য তাঁহার অনুগত মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নিজামের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য ১০ বৎসর পূর্বে রাজ্যের জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হইয়া প্রথম ষ্টেট কংগ্রেসের পত্তন করেন। ক্রমে এই কংগ্রেস জনসাধারণের সমর্থন পাইয়া একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। তখন নিজাম ষ্টেট কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে চিন্তিত হইয়া উঠিলেন এবং রাজ্যের মুসলমানপুষ্ট সেনাবাহিনীর সহায়তায় উহাকে নানা উপায়ে দমন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ষ্টেট কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া উহার নেতাদের গ্রেপ্তার করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলন কাবু হইল না, তখন নিজাম বাধ্য হইয়া ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে এই কংগ্রেসের উপর হইতে সকল নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইলেন।

বর্তমান বৎসরের গত জুন তারিখের ঘোষণায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, বৃটিশ-ভারতকে ভারত ও পাকিস্থান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিলে, হায়দরাবাদের নিজাম ১১ই জুন এক ফরমাণে ঘোষণা করিলেন—১৫ই আগষ্ট হইতে হায়দরাবাদের উপর হইতে বৃটিশের অধিরাজ ক্ষমতার লোপ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই হায়দরাবাদও ঐ দিন হইতে স্বাধীনরাজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

হায়দরাবাদের শতকরা ৮৭ জন অমুসলমান প্রজা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নিজামের এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে অস্বীকার করিল। প্রজারা জানাইল, ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ন্যায় হায়দরাবাদকেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টও মন্ত্রীবিপ্লবের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের স্মারকলিপি—যাহাতে দেশীয় রাজ্যের নীতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কোনও দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণাকে মানিয়া লইবেন না বলিয়া জানাইয়া দিলেন। তবে একথাও তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, দুইটি ডোমিনিয়নের কোন একটিতে যোগদান লইয়া যেখানে কোনও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে গোলমাল হইবে, সেখানে প্রজা সাধারণের গণভোটের দ্বারাই তাহা স্থিরীকৃত হইবে।

এদিকে বৃটিশ-ভারতের শেষ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ২৫শে জুলাই তারিখে নয়াদিল্লীতে সকল দেশীয় রাজ্যের শাসক ও মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনে তিনি জানাইয়া দিলেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্থান একটি ডোমিনিয়নে যোগদান করা কর্তব্য এবং মন্ত্রীবিপ্লবের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার ও যোগাযোগের ব্যবস্থা সেই ডোমিনিয়নের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। বড়লাট ইহা বিবেচনা করিবার জন্য দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দকে আরও ৭ দিনের সময় দিলেন।

যে সকল দেশীয় রাজ্য ইতিপূর্বে কোন ডোমিনিয়নে যোগদান করে নাই, এই সাতদিনের মধ্যেই তাহাদের অধিকাংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের কথা ঘোষণা করিল। কেবল অল্প কয়েকটি দেশীয় রাজ্য মাত্র কোনও মত প্রকাশ করিল না। এই অল্প কয়টির মধ্যে হায়দরাবাদও ছিল।

হায়দরাবাদ কোন ডোমিনিয়নে যোগদানের কথা বলিল না বটে, তবে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও হায়দরাবাদের ভৌগোলিক অবস্থার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে কোনরূপ না চটাইয়া তাহার সহিত একটা সন্তোষজনক সর্ত করিবার জন্য আলোচনা চালাইতে থাকিল।

হায়দরাবাদের সহিত এই আলোচনা চলিতে থাকিলেও ১৫ই আগষ্টের পূর্বে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। তবে সমস্ত আলোচনা যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজাম বাহাদুর আরও দুইমাস সময় চাহিলেন। নিজামের অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্ট আলোচনা চালাইবার জন্য তাঁহাকে আরও দুইমাস সময় দিলেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মন্ত্রিসভার সদস্যদ্বয়ে ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন হায়দরাবাদের প্রতিনিধিদলের সহিত আলোচনা চালাইতে থাকিলেন। স্যার ভি পি মেনন হায়দরাবাদ প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। কয়েক দফা আলোচনার পর অক্টোবরের শেষ দিকে উভয়ের জন্য একটা মীমাংসা দেখা দিল। তখন হায়দরাবাদের প্রতিনিধি দল নিজামের চূড়ান্ত অনুমোদন ও চুক্তিপত্রে তাঁহার স্বাক্ষর আনিবার জন্য হায়দরাবাদ গেলেন। কিন্তু হায়দরাবাদের

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ইত্তেহাদ-উল মুসলিমিনের আন্দোলন ও কিছোভ প্রদর্শনের ফলে প্রতিনিধিদলের চেষ্টা সফল হইল না। নিজাম কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ভাণে পড়িয়া পুনরায় নূতন করিয়া একটি প্রতিনিধিদল গঠন করিলেন। এবার নবাব মইন নওয়াজ খাঁ এই প্রতিনিধি দলের নেতা হইলেন।

এই প্রতিনিধিগুলী ভারত সরকারের সহিত আলোচনাকালে, প্রথম দিকে প্রস্তাব করিলেন যে হায়দরাবাদকে ভারতের তুল্য মর্যাদাসম্পন্ন দেশ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত দেশসমূহে তাহার কূটনৈতিক দূত প্রেরণের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদের উক্ত প্রস্তাবই অস্বীকার করিলেন এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তা দেখাইলেন। ফলে প্রতিনিধিমণ্ডলী তাঁহাদের প্রস্তাব সংশোধন করাইবার জন্য হায়দরাবাদে নিজামের নিকটে ফিরিয়া গেলেন।

এবার নিজাম ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তা দেখিয়া এবং চারিদিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে নিজ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত একটা চুক্তি সম্বন্ধপর করিবার জন্য প্রতিনিধিমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষমতা দান করিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তার জন্য হায়দরাবাদ প্রতিনিধিমণ্ডলীকে ক্রমশঃ তাহাদের অসঙ্গত দাবী হইতে নামিয়া আসিতে হইল। ফলে হায়দরাবাদের স্যার নবাবের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের যে চুক্তি হইয়াছিল, সেই হায়দরাবাদের নূতন প্রতিনিধিদল ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত এক বৎসরের জন্য দ্বিতীয়বার চুক্তিই মানিয়া লইল।

হায়দরাবাদের সহিত আলোচনাকালে ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশীয় রাজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হায়দরাবাদ প্রতিনিধিদলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, যাহা করিবার ২৭শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই তাহা স্থির করিতে হইবে; আলোচনার জন্য আর মোটেই সময় দেওয়া হইবে না। তাই প্রতিনিধিদল ২৭শে তারিখেই আলোচনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং নিজামের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর আনিবার জন্য পরদিন বিমানযোগে দিল্লী হইতে হায়দরাবাদ যান। ২৯শে তারিখে প্রতিনিধিদল নিজাম বাহাদুরের স্বাক্ষর লইয়া হায়দরাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে, ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন উক্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং ঐদিনই ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত হায়দরাবাদের দ্বিতীয়বার চুক্তির কথা সর্বত্র ঘোষণা করা হইল।

এইভাবে বহু সময় ব্যয় করিয়া সাময়িক ভাবে ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে এক বৎসরের জন্য একটি দ্বিতীয়বার চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই চুক্তি ১৯৪৭ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে পরবর্তী বৎসরের ঐ তারিখ পর্যন্ত কার্যকরী থাকিবে বলিয়া স্থির হইল।

চুক্তিতে বলা হইল—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে ভারতে বৃটিশরাজ ও হায়দরাবাদের মধ্যে পররাষ্ট্র, যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল চুক্তি ও বিধিব্যবস্থা বলবৎ ছিল, তাহাই বলবৎ থাকিবে; তবে নিজাম রাজ্যের উপর বৃটিশের যে অধিকার বা প্রভুত্ব ছিল, ভারত সরকারের তাহা থাকিবে না অর্থাৎ নিজামের সার্বভৌম অধিকার থাকিবে। নিজাম বিদেশে কোথাও কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন না, শুধু মাত্র ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাপারে এজেণ্ট জেনারেল নিয়োগ করিতে পারিবেন; কিন্তু তাহাকেও আবার ভারত গবর্ণমেণ্টের বিদেশস্থ প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে।

চুক্তি পত্রে আরও বলা হইল যে, হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন না এবং যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে হায়দরাবাদে ভারত গবর্ণমেণ্ট সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিবেন না। চুক্তি যথাযথ পালিত হয় কিনা তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য দিল্লীতে নিজামের এবং হায়দরাবাদে ভারত গবর্ণমেণ্টের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত হায়দরাবাদের এই দ্বিতীয়বার চুক্তির ফলে হায়দরাবাদ পাকিস্থানে যোগদান করিল না বটে, তবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও যোগ দিবে কিনা তাহাও পরিষ্কার হইল না। কোনও দেশীয় রাজ্যের উপর বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে বাধ্য করা ভারতের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের নীতি নহে। তাই সাময়িক হইলেও, সীমাংসা-আলোচনার মধ্য দিয়া হায়দরাবাদের সহিত চুক্তিটা ভারত গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতি এই যে, দেশীয় রাজ্যের ডোমিনিয়নে যোগদান লইয়া যদি কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে রাজ্যের প্রজাসাধারণই গণভোটের দ্বারা তাহা স্থির করিবে। হায়দরাবাদের শতকরা ৮৭জন অমুসলমান প্রজা হায়দরাবাদকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাঁহারা গত ৭ই আগষ্ট সমগ্র হায়দরাবাদে "ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান কর দিবস" পালন করিয়া, তখন হইতে সত্যাগ্রহ চালাইয়া আসিতেছেন। নিজাম সরকার এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে রোধ করিবার জন্য গুলিবর্ষণ, লাঠিচালনা প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং ঐই কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দতীর্থ ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় প্রায় ১০০০ কর্মীকে গ্রেপ্তার করেন।

এই আন্দোলনে সত্যাগ্রহীদের অনেকেই হতাহত হইলেন, কিন্তু তবুও সত্যাগ্রহ ত্যাগ করিলেন না। নিজাম তাই এবার উপায়ান্তর না দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত তাড়াতাড়ি একটা চুক্তি করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলেন। চুক্তির পরদিনই নিজাম গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মুক্তি দিলেন এবং পুরাতন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাদের সহযোগিতায় রাজ্যে একটি সর্বদলীয়-মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কারণ নিজাম বাহাদুর এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে গুলি ও লাঠির দ্বারায় সত্যাগ্রহীদের দমন করা অসম্ভব, তাই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে জনগণের প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা ভিন্ন উপায় নাই।

আমরা

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ—

জনৈক পত্রপ্রেরক পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলের উদ্দেশ্যে এই নিবেদন প্রচার করিতে জানাইয়া পত্র দিয়াছেন—"পচনশীল, পূতিগন্ধময় পাকিস্থানী পরিকল্পনার প্রতীক বেসামরিক সরবরাহ বিভাগটিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন। উক্ত বিভাগের পাপ-পরিবেশের মধ্যে কোনরূপ রদবদল করিয়া ইহার আবর্জ্জনা অপসারিত করা সম্ভব হইবে না। খাদ্য-সামগ্রী ও বস্ত্র বণ্টনের জন্য যদি নিয়ন্ত্রণের যথার্থ প্রয়োজন এখনও বর্ত্তমান থাকে, তবে উহা বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল সম্পূর্ণ স্থান বিধিবিধানে নূতন নূতন ব্যক্তির দ্বারা যেন পুনরায় গঠিত করেন। বাস্তবিক এই বিভাগের অচিন্তনীয় অযোগ্যতা এবং অমার্জ্জনীয় অপরাধের আবর্জ্জনা আজ দেশবাসীর সকল সহ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কেন যে এই পাকিস্থানী পূতিগন্ধময় পর্যুদিত পদ্ধতির বিলোপ সাধন ঘটে নাই, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।" দেশের সকল লোক এই অভিমত একবাক্যে সমর্থন করিবে।

চোরাকারবার দমন আইন—

পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট চোরা কারবার দমনের জন্য কঠোর বিধান সম্বলিত এক আইনের খসড়া অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন। উহা ব্যবস্থা পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই উপস্থিত করা হইবে। এই আইনে অপরাধীকে জামীন না দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলটি আইনে পরিণত হইয়া তদনুসারে কাজ হইলে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া লোক বিশ্বাস করে।

যুক্তপ্রদেশের স্থায়ী গভর্ণর—

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর পদ গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় বড়লাট ও তাঁহার মন্ত্রিসভা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে যুক্তপ্রদেশের স্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীমতী নাইডু মহিলা—তিনি দ্বারা জীবন কংগ্রেসের মধ্য দিয়া দেশ-সেবা করিতেছেন—তিনি বাঙ্গালী—কাজেই বাঙ্গালার মহিলা সমাজ এই নিয়োগে বিশেষভাবে গৌরবান্বিত হইবেন।

ইংরেজ ভারতপ্রকাশ নায়ারের সাম্প্রতিক কলিকাতা আগমনে কলিকাতাবাসী কর্ত্তৃক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

ফটো—হে·কে·সান্যাল

কাঁচড়াপাড়ায় ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা—

গত ৮ই ডিসেম্বর সোমবার ভোর ৫টায় কলিকাতার ২৮ মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ার নিকট একটি মালগাড়ীর সহিত ১৬নং ডাউন নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের সংঘর্ষের ফলে ৭ ব্যক্তি নিহত ও ৪৫জন আহত হইয়াছে। এরূপ দুর্ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটিয়া থাকে—এগুলি নিবারণের কোন ব্যবস্থাই হয় না।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা—

গত ৫ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলেম লীগ কাউন্সিলে স্থির হইয়াছে যে উর্দ্দু পূর্ব্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে না। ঐ কথা ঘোষণা করার ভার লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁর উপর অর্পিত হইয়াছে।

সূতা ও বস্ত্রের উপর রপ্তানী শুল্ক—

ভারত গভর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধির জন্য কাপড়ের উপর প্রতি গজে ৪ আনা ও সূতার উপর প্রতি পাউণ্ডে ৬ আনা রপ্তানী শুল্ক ধার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ৬ই ডিসেম্বর অর্থসচিব সার সমুয়েল্ কোটী উহা ঘোষণা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় চিকিৎসক সম্মিলন—

গত ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা মেডিকেল কলেজ গৃহে বঙ্গীয় চিকিৎসক সম্মিলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার বিধানেন্দ্র রায় সম্মেলনের

ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ

উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন—স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অর্থ নিয়োগ জাতির পক্ষে পরম মিতব্যয়িতার কাজ। যে যে কাজেই থাকুক না কেন, জনস্বাস্থ্য না হইলে সে তাহার শ্রেষ্ঠতম শক্তি নিয়োগ করিতে পারে। সম্মেলনের বিদায়ী সভাপতি অধ্যাপক বি-এন-ঘোষ বলেন—যেখানে শতকরা ৯০জন অশিক্ষিত, অধিকাংশ লোক অর্দ্ধাভাবে ও অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দিন কাটায়, সেখানে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা ফলপ্রদ হইবে না। নূতন সভাপতি ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষ বলেন—বর্ত্তমান চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা-প্রণালীর এরূপ সংশোধন করা চাই—যাহাতে পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা ব্যবহারিক বিদ্যারই ব্যাপক শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্মিলনে কলিকাতা অঞ্চল ছাড়া উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলার ৩০০জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ২৪পরগণা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাক্তার অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বিধান পরিষদে বক্তৃতা রত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারত-হায়দ্রাবাদ চুক্তি—

২৯শে নভেম্বর দিল্লীতে সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ও নিজামের মধ্যে স্থিতাবস্থা চুক্তি ঐ দিন সকালে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের সহিত ভারতের রাজপ্রতিনিধির যে সব চুক্তি ও শাসন ব্যবস্থা এতদিন চলিয়া আসিতেছিল বর্ত্তমানে এক বৎসর কাল তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না। ইহার পর ৭ই ডিসেম্বর মাদ্রাজে এক জনসভায় হায়দ্রাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থ ঘোষণা করিয়াছেন—হায়দ্রাবাদবাসীরা হায়দ্রাবাদের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান ও তথায় লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠা চাহে। ইহা ভিন্ন কিছুতেই হায়দ্রাবাদবাসীরা সন্তুষ্ট

হইবে না। সেজন্য কংগ্রেস তাহার আরব্ধ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

সিঁথিতে ব্যায়াম প্রদর্শনী—

সম্প্রতি উত্তর কলিকাতা সিঁথিতে যে সপ্তাহ চর্চ্চা বক্সিং, কুস্তি ও ব্যায়াম প্রদর্শনী হয় তাহাতে বরাহনগর ব্যায়াম সমিতি, হাওড়া ওয়েষ্ট এণ্ড ক্লাব, উত্তর কলিকাতা ব্রতচারী সমিতি, নেতাজী ব্যায়াম মন্দির, বেঙ্গল বক্সিং এসোসিয়েশন, এমারাল্ড ক্লাব, হেমচন্দ্র পাল মন্দল সমিতি, কাশীপুর ব্যায়াম সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান-বৃন্দের সভ্য ও সভ্যাগণ বিশেষভাবে যোগদান করেন। ডাঃ জে-সি-মুখার্জ্জীর দলের সহিত ২৪পরগণার শ্রীপঙ্কজ গাঙ্গুলীর দলের কুস্তি ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী শ্রীসুকুমার সেনের দলেরসহিত পুলিস কমিশনার মিষ্টার এস্-এন্-চ্যাটার্জ্জীর দলের বক্সিং প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন দলের কুচকাওয়াজ, ব্রতচারী নৃত্য, ভারতের শ্রেষ্ঠ পেশী-সঞ্চালক শ্রীবিজয় মল্লিকের পেশী সংকোচন ও সম্প্রসারণ, কণ্টক শয্যায় শায়িত শ্রীদেবেন বিশ্বাসের বুকের উপর দিয়া শ্রীঅজিত ঘোষের মোটর বাইক চালান প্রভৃতি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত সভানেত্রীর ও মেজর জেনারেল শ্রীমনিলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীবিজয়সিং নাহার পারিতোষিক বিতরণ করেন।

শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান—

কলিকাতা ৯৯ ল্যান্সডাউন রোডস্থ রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের নামে শুধু কলিকাতাবাসীদের নিকট নহে, বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। বর্ত্তমানে তথায় একশত গ্রন্থতিকে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যহ বহু গ্রন্থতিকে স্থানাভাবে ফেরত যাইতে হয়। সেজন্য সম্প্রতি ১লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ২ বিঘা সাড়ে ৩ কাঠা জমি বর্ত্তমান গৃহের পার্শ্বে ক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ গৃহের উপর কর্ম্মীদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ও বর্ত্তমান গৃহের চতুর্থ ও পঞ্চম তলা নির্ম্মাণ করিতে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা—বর্ত্তমানে মোট ৪ লক্ষ টাকা এখনই

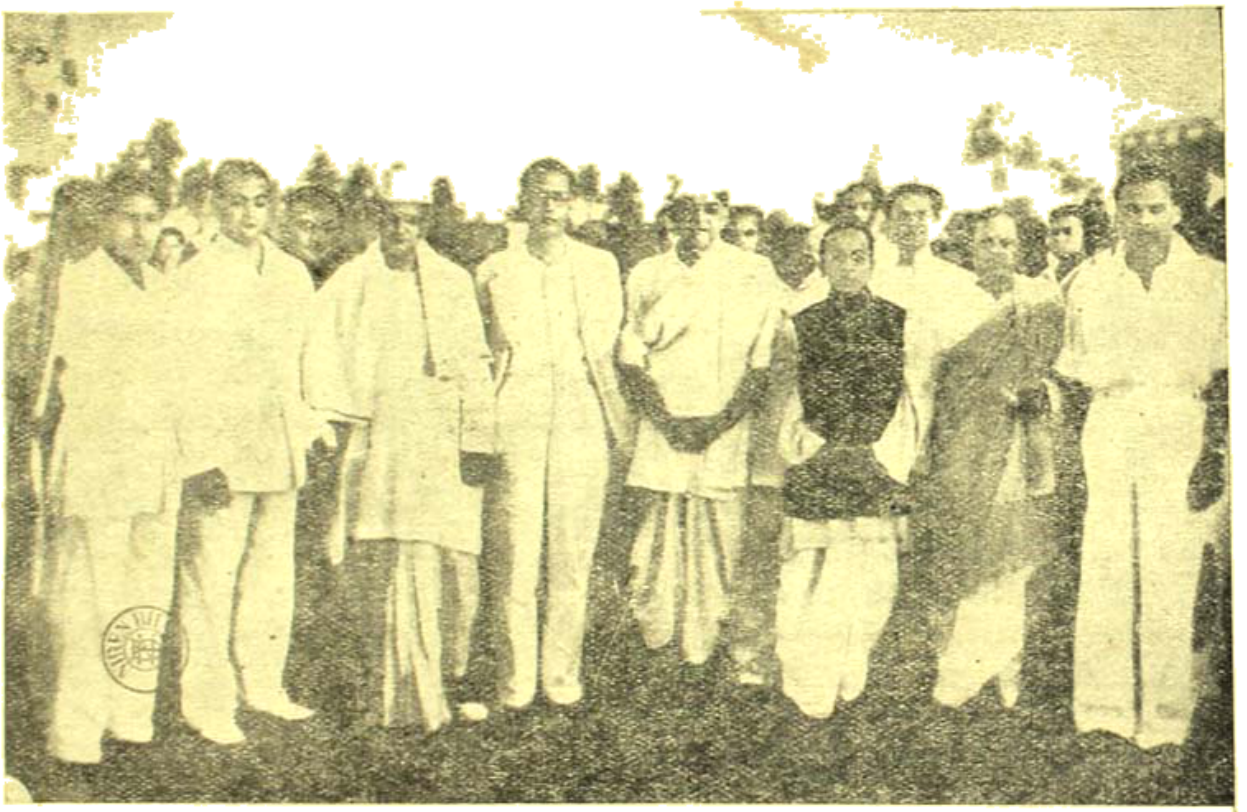

সিঁথির ব্যায়াম প্রদর্শনীতে সমাগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

প্রয়োজন। সম্পাদক স্বামী দয়ানন্দের এ বিষয়ে অক্লান্ত চেষ্টার অভাব নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন দিন অর্থের অভাব হইবে না।

জব্বলপুর সাহিত্য পরিষদ—

বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা ও প্রচারার্থে গত আষাঢ় মাসে জব্বলপুরে "সাহিত্য পরিষদ" নামে একটী সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্য পরিষদ জব্বলপুর দেবেন্দ্র বেঙ্গলী ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই পরিষদের পাক্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ ও পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাহিত্য পরিষদের যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীদের সংস্কৃতি প্রচার চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

আসামের পাটের উপর শুল্ক—

পাকিস্থান সরকার আসামের পাটের উপর শুল্ক ধার্য্য করার প্রস্তাব করায় সে বিষয়ে গত ৬ই ডিসেম্বর ভারতের অর্থসচিব সার সন্মুখম্ চেটি বলিয়াছেন—পাকিস্থান সরকারের ঐ কার্য্য আন্তর্জাতিক বিধি বহির্ভূত হইবে। সে ক্ষেত্রে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের সকল চেষ্টা ত করিবেনই, প্রয়োজন হইলে অন্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করিবেন।

সুভাষচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি—

কলিকাতা কর্পোরেশন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। মূর্ত্তিটি প্রস্তুত করিতে ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে—আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান অধিনায়করূপে সামরিক বেশের মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইবে।

গোরক্ষা ও স্বামী করপাত্রীজি—

অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে আমরা সংবাদ দিয়াছিলাম যে মথুরাতে গোবধ নিবারণ করিতে হইবে এইরূপ আন্দোলন করার দরুণ স্বামী করপাত্রীজি গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। বিচারে তাঁহার ছয় মাসের কারাদণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু দুই মাস কারাবাসের পর তাঁহাকে আগ্রা জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার যে সকল সমর্থক মথুরাতে গ্রেপ্তার হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মথুরা মিউনিসিপ্যালিটি এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে ঐ মিউনিসিপ্যালিটিতে গোবধ হইবে না। মথুরা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি যুক্তপ্রদেশের ৮।১০ স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন।

ব্যায়াম বীরের বিলাত গমন—

কলিকাতা বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্রীযুত উমেশ মল্লিক সম্প্রতি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি

শ্রীউমেশ মল্লিক

তথায় শরীর-চর্চ্চা প্রদর্শন ও শিক্ষায় সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় বই বিলাতের বাজারে যাহাতে চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয়, সেজন্য চেষ্টা করিবেন। তিনি শিক্ষিত যুবক—দেশ-প্রেমিক, তাঁহার বিদেশলব্ধ জ্ঞান যেন দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বায়ে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। তথায় শ্রীযুক্ত শিব বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি, শ্রীজগদীশ মিত্র, ডাঃ সুধীর বসু, গণেশ মিত্র ও বিভূতি সেনগুপ্তকে সহ-সভাপতি, শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্যকে সাধারণ

সম্পাদক, শ্রীসত্যপ্রিয় গুহ ও শ্রীপ্রফুল্ল বাগচীকে সহকারী সম্পাদক, শ্রীদক্ষীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোষাধ্যক্ষ করিয়া ও ১৬জন সদস্যকে লইয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ও ভারতের অন্যান্য সকল স্থান হইতে বাঙ্গালীদের এই অধিবেশনে অধিক সংখ্যায় যোগদান করিয়া প্রবাসী সমস্যার সমাধানে তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে বোম্বাই পোষ্ট বক্স নং ২৯৮এ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে।

পরলোকে গৌরীহর মিত্র—

বীরভূম সিউড়ীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ স্বর্গত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের পুত্র গৌরীহর মিত্র গত ৭ই

গৌরীহর মিত্র

অক্টোবর মাত্র ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বীরভূমের ইতিহাস ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং সিউড়ীর সংগৃহীত বিরাট গ্রন্থাগার ও বহুসহস্র পুঁথি সযত্নে রক্ষা ও ব্যবহার করিতেন। সিউড়ীর 'রতন লাইব্রেরী' বাঙ্গালার গবেষক পণ্ডিত মণ্ডলীর তীর্থস্থান ছিল।

পশ্চিম বঙ্গে চাউলের অবস্থা—

পশ্চিম বঙ্গে সরবরাহ মন্ত্রী গ্রামাঞ্চল হইতে ধান্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সহরাঞ্চলের জনগণের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করায় গ্রামাঞ্চলের লোক তাহাদের ধান ৬ টাকা ৪ আনা দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। এখন সেই সকল স্থানে সকলকে ১৫ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হইতেছে। অথচ গ্রামের লোক আজো কাপড় ও কেরোসিন তৈল পাইতেছে না, তাহাদিগকে সে সকল জিনিস সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

ডাকঘরের অসুবিধা—

বাঙ্গালা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর হইতে পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে প্রেরিত মণি অর্ডারের টাকা বা পশ্চিম বঙ্গ হইতে প্রেরিত ভি-পি'র টাকা প্রায়ই আসিয়া পৌঁছিতেছে না। সে জন্য সকল ব্যবসায়ীকেই কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এই কারণে পূর্ব্ববঙ্গবাসী 'ভারতবর্ষে'র গ্রাহকগণের নিকট অতঃপর আর আমরা ভি-পি ডাকে ভারতবর্ষ প্রেরণ করিব না। তাঁহারা যেন—যে কোন উপায়ে—ভারতবর্ষের চাঁদা এখানে পাঠাইয়া দেন। চাঁদা পৌঁছিলেই আমরা ঠিকভাবে ভারতবর্ষ প্রেরণের ব্যবস্থা করিব। পুস্তক-ক্রেতাগণকেও আমরা এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি। পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে প্রেরিত পাকিস্থানী ডাক টিকিট এখানে ব্যবহার করা চলে না—কাজেই কেহ পাকিস্থানী ডাকটিকিট পাঠাইয়া আমাদের বিব্রত না করেন—ইহাই আমাদের নিবেদন।

আগ্রায় বাঙ্গালী ডাক্তার সম্মানিত—

আগ্রা প্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার টি-সি-বসু চৌধুরী তাঁহার গবেষণা ও চিকিৎসা বিষয়ে নৈপুণ্যের জন্য যুক্তপ্রদেশের ঐক্ট মেডিকেল ফ্যাকালটীর 'ফেলো' হইয়াছেন। এল-এম-এস্-দের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান পাইয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ঐ অঞ্চলে সকলের দ্বারা সম্মানিত। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি এই সম্মান প্রথম লাভ করায় তাহা বাঙ্গালীদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

পণ্ডিত জহরলালের জন্মোৎসব—

গত ১৪ই নভেম্বর স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উনষাট বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর কাল ভারতের জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহার মত চিন্তাশীল পণ্ডিত, সুলেখক ও বক্তা ভারতে কেন, পৃথিবীতেই অল্পসংখ্যক। আমরা এই শুভদিনে তাঁহার সুদীর্ঘ ও সাফল্যমণ্ডিত জীবন কামনা করি।

নির্ব্বাচন সাফল্য—

পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বীরভূম জেলা কেন্দ্র হইতে পশ্চিম বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ২২হাজার ৪ শত ৮০ ভোট ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু মহাসভা-দলের প্রার্থী শ্রীশিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ১০ হাজার ৯ শত ৪২ ভোট পাইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বাচন সাফল্যে তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হইলেই বাঙ্গালা দেশের পক্ষে তাহা শোভন হইত।

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী—

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের 'গ্রামে পুনর্ব্বসতি বোর্ডের' সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। গ্রামে যাইয়া লোক যাহাতে পুনরায় সুখে বাস করিতে

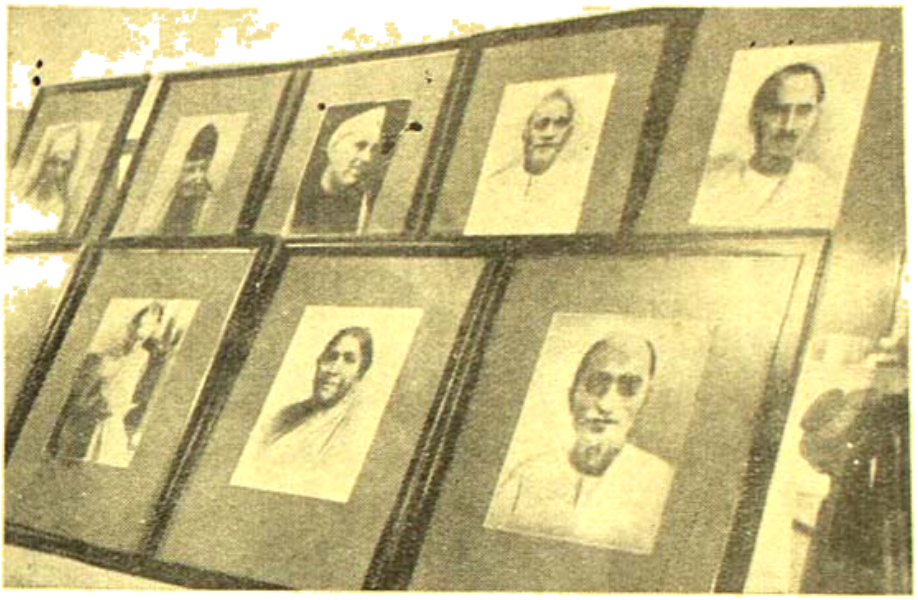

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি ফটো—বি.পাত্রা সেন

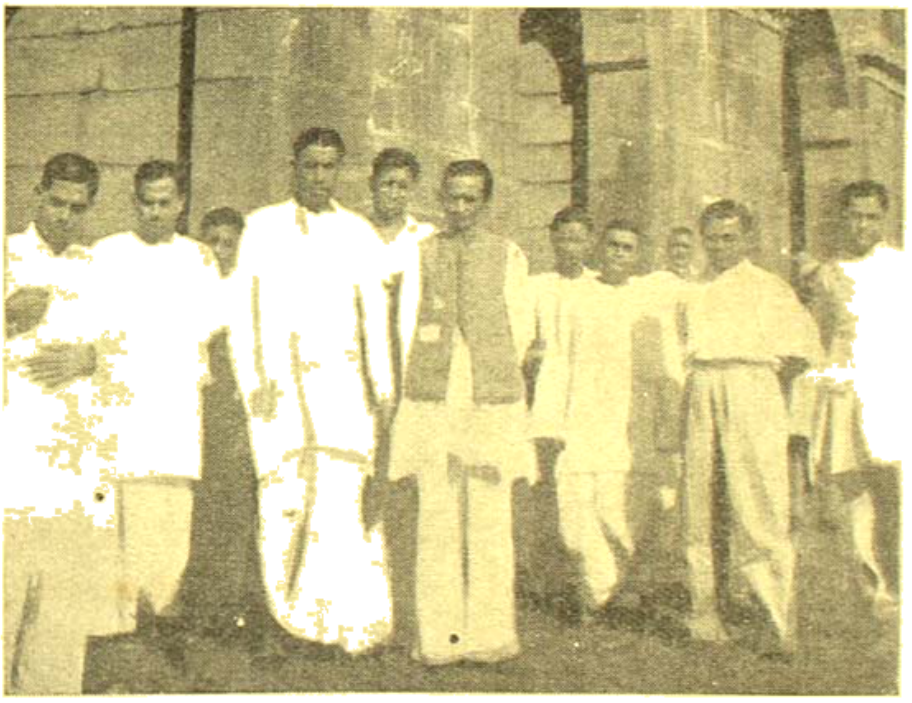

মকদুমপুর—বালুরঘাট মহকুমার সহকারী মহকুমা শাসক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়

পারে ও কুটীরশিল্পের যাহাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, এই বোর্ড হইতে সে বিষয়ে স্থায়ী ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইবে। শ্রীযুক্ত সুচেতা নোয়াখালির দাঙ্গা হুর্গতদের সাহায্য করিতে যাইয়া

এ বিষয়ে যে আগ্রহ ও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনাই দেখা যায়।

সম্বর্ত্তন উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার পরিচালনায় ছাত্রীদের ব্রতচারী নৃত্য

ফটো—শ্রীপান্না সেন

সম্বর্ত্তন উৎসবে উপাধিপ্রাপ্ত মহিলাবৃন্দ

ফটো—শ্রীপান্না সেন

দুই স্থানে স্বতন্ত্র কংগ্রেস গঠন—

গত ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর মেদিনীপুর জেলার তমলুক সহরে পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সম্মিলনে দুই স্বতন্ত্র বঙ্গে দুইটি স্বতন্ত্র কংগ্রেস কমিটী গঠনের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ঐ সম্মিলনের প্রস্তাবানুসারে গত ৯ই নভেম্বর কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডস্থ রামমোহন লাইব্রেরী হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পশ্চিম বঙ্গের সদস্যগণের এক সম্মিলনেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন ও তথায় ১৩০ জন সদস্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভায় রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী উত্তর বাঙ্গালায় দুইটি আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটী গঠনের প্রস্তাব করেন এবং উহার কারণ স্বরূপ উল্লেখ করেন যে, উভয় প্রদেশের সমস্যাসমূহ বিভিন্ন এবং সে জন্য পূর্ব্ব বঙ্গের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পশ্চিম বঙ্গের সহিত সংযুক্ত রাখিতে পারা যায় না।

শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কমিটী—

পশ্চিম বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বর্ত্তমান পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া সে বিষয়ে আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে নির্দ্দেশ দানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া এক কমিটী গঠন করিয়াছেন—(১) প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—সভাপতি (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ৺স্যর রমেশচন্দ্র মজুমদার (৪) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (৫) শ্রীযুক্তা সুজাতা রায় (৬) মিঃ হুমায়ুন কবীর (৭) রাঁচী ভবানী স্কুলের প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (৮) পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী (৯) পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার (১০) অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষা—

পূর্ব্ব পাকিস্থানের আক্রমণ হইতে পশ্চিম বাঙ্গালার পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বর্ম্মদাস ভট্টাচার্য্য আই-পি, এস-পি বিশেষ ডেপুটী-ইন্সপেক্টার-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। বারাকপুরে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র হইবে। তিনি বীরভূমের এস-পি ছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন প্রধান মন্ত্রী—

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সত্যব্রত ঘোষোপাধ্যায় পদত্যাগ করায় মহারাণী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব প্রেস এডভাইজার শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় আই-সি-এসকে নূতন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন।

নূতন পদ প্রাপ্তি—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ও যুক্তপ্রদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ অমরনাথ ঝা ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-কমিশনার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ তারাচাঁদ কাবুলে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। খ্যাতনামা সাংবাদিক ডাক্তার সৈয়দ হোসেন ২৫ বৎসর আমেরিকা বাসের পর সম্প্রতি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন—তিনি মিসরে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি—

গত ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতীয় আইন সভায় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ঘোষণা করিয়া বলেন—ভারত পারতপক্ষে কোন যুদ্ধে যোগদান করিবে না। যদি একান্তই যুদ্ধে যোগদান করিতে হয়, তাহা হইলে ভারত ভারতের স্বার্থরক্ষাকারী বলেই যোগদান

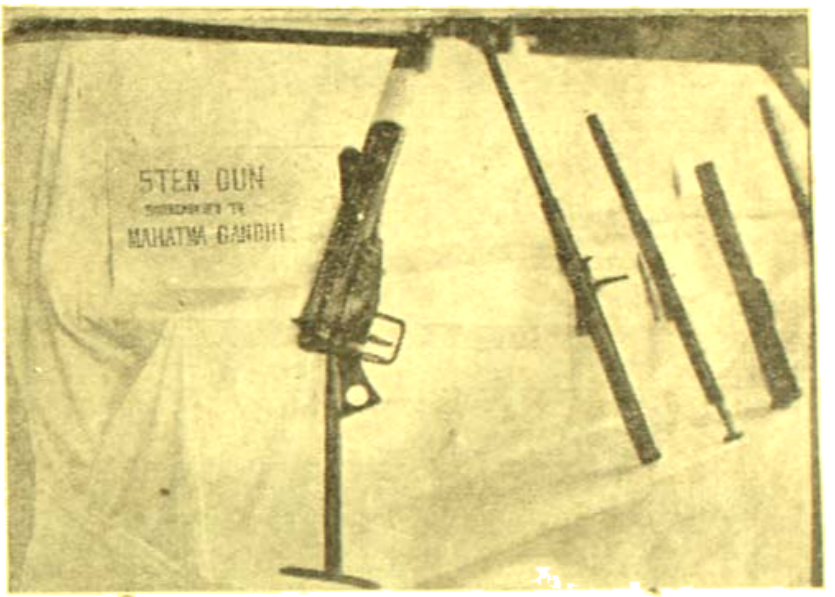

মহাত্মাজীর কলিকাতাস্থ অন্ধকারাগারে ব্যবহার নিমিত্ত প্রদত্ত ষ্টেনগান ও রাইফেল

ফটো—ইণ্ডিয়া ফেন

করিবে। ভারত আমেরিকার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে। দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়ের সহিতই ভারত পূর্ণ সহযোগিতা করিবে এবং বিশ্বশক্তি-চক্রের বাহিরে থাকিবে।

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ সেন ১৯৪৮ সালের জন্য কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলার আসনপুরের সেন বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও বাঙ্গালা দেশে বহু ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

রাজকীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—

রাজকীয় বিহারের পাটনা জেলায় একটি স্বাস্থ্যনিবাস—তথায় প্রায়ই বহু বাঙ্গালী পরিবার গমন করেন। তাঁহাদের সকল প্রকার সাহায্য দানের জন্য স্বামী কৃপানন্দ তথায় 'রাজকীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' নামক একটি প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ

করিতেছেন। সেবাশ্রমের চারিদিকে ও বহু বাঙ্গালা জমি ক্রয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন—এখনও তথায় জমি পাওয়া যায়। স্বামীজির পরিকল্পনা অনুসারে সেবাশ্রম সম্পূর্ণ করিতে এখনও ৭৫ হাজার টাকা প্রয়োজন। সেবাশ্রম সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালী স্বাস্থ্যান্বেষীদের বাসস্থান ও আহারের কোন অসুবিধা থাকিবে না।

মালব্য-সেতু—

পবিত্র তীর্থ কাশীধামের প্রবেশ মুখে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথী বক্ষে রেলের যে সেতু আছে, যে সেতুর উপরে ট্রেণ উঠিবা-মাত্র শতসহস্র মন্দির গৃহসৌধ অট্টালিকা-পরিশোভিত,

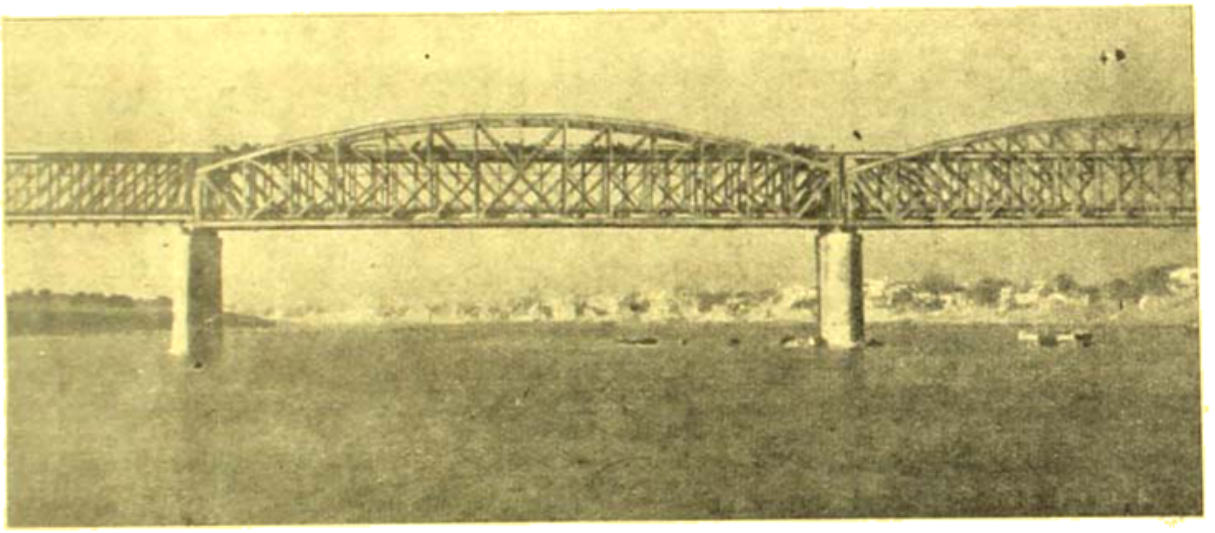

কাশীতে গঙ্গার উপর মালব্য-সেতু

অর্দ্ধচন্দ্রকারগ্রথিত অনন্ত ঘাটশ্রেণী নয়নগোচর হইবামাত্র হিন্দু রেল যাত্রী "জয় বাবা বিশ্বনাথের জয়," "জয় জননী অন্নপূর্ণার জয়" রবে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠেন, তাহা ১৮৮৫ সালে তখনকার আউধ-এণ্ড-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া বৃটিশ প্রধান পুরুষ লর্ড ডাফরিণের নামানুসারে ডাফরিণ ব্রীজ নামে খ্যাত ছিল। ভারতবাসী জানিয়া আনন্দিত হইয়াছেন যে সম্প্রতি ঐ ব্রীজটির আয়তন ও পরিসর বৃদ্ধি হইয়াছে, এক লাইনের পরিবর্ত্তে দুইটি লাইন সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং নামকরণ হইয়াছে, মালব্য সেতু। পণ্ডিতবর মদনমোহন মালব্য কাশীধামে বাস করিতেন, কাশীতেই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত এবং গত বৎসর মোরাখানির নারকীয় কাণ্ডের বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর পুণ্য বারাণসীতেই তিনি দেহ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। রাজা শ্রীযুত দীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা করেন ও সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ দশম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ প্রকাশ করেন। কয়েকদিন ধরিয়া সম্মিলনের অধিবেশন হয় ও তাহাতে ভারতের বহু সঙ্গীতজ্ঞ যোগদান করেন।

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন—

গত ৮ই ডিসেম্বর সোমবার হইতে কলিকাতায় নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সম্মেলনের উদ্বোধন

ভারতে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ—

৪ঠা ডিসেম্বর দিল্লীতে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের জন্য তিনটি কারখানা প্রস্তুত হইবে—২টি বোম্বাইয়ে ও একটি কলিকাতায়। তিনটি কারখানায় বৎসরে ২০

হাজার মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইবে। সরকার এই সকল কারখানা নির্ম্মাণে সাহায্য করিতেছেন। আরও দুইটি অনুরূপ কারখানা নির্ম্মাণের জন্য সরকারী সাহায্য দান করা হইবে স্থির হইয়াছে।

কাশীধামে নিখিল ভারত পি-ই-এন সম্মেলন

কাশীহিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইকোয়াড় লাইব্রেরী হলে মুক্তপ্রাঙ্গণের অধিবেশনে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কর্ত্তৃক পি-ই-এন (লেখক) সম্মেলনের উদ্বোধন

ডেনমার্কের প্রতিনিধি মিঃ পি-ব্রানকোর্ড হ্যানসেন

ব্রাজিলের প্রতিনিধি ডাঃ জনর হ্যানসেন

শ্রীযুক্তা নাইডুর সম্বর্দ্ধনার জলযোগ—শ্রীযুক্তা নাইডুর সহিত গাইকোয়াড় লেখক ইণ্ডিয়া মুক্তপ্রাঙ্গণের আনন্দের আলোচনা।

ছবি—শ্রীরমণিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব্ব পাকিস্থানে ডাক বিভ্রাট—

গত ৩রা ডিসেম্বর ঢাকার পলাশী ব্যারাকের সম্মুখস্থ ময়দানে ডাক ও তার বিভাগের ইউনিয়নের এক সাধারণ সভা হয়। লোকাভাবে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ডাকবিলি প্রায় বন্ধ হইয়াছে। শুধু ঢাকা অফিসে ৭৫ হাজার মণিঅর্ডার ও লক্ষ লক্ষ পত্র জমা হইয়া আছে। হাজার হাজার রেজিষ্টার্ড ও ইনসিওর পর্য্যন্ত বিলি হয় নাই। ডাক-বিভাগের কর্ত্তারা এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করেন না। কর্ম্মচারীদের বাসস্থান, বেতনদান প্রভৃতির ব্যবস্থা না হওয়ায় কাজও বন্ধ আছে।

এসিয়ার একতা প্রয়োজন—

ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইউ-টিন-টুট কলিকাতায় আসিলে ৮ই ডিসেম্বর মহাবোধি সোসাইটীতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী সভায় বলেন—এসিয়ার সকল স্বাধীন দেশকে এখন একতাবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। সে জন্য তিনি এসিয়ার স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে অধ্যাপক, ছাত্র, শিল্পী প্রভৃতির বিনিময়ের প্রস্তাব করেন। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতীয়গণকে তাড়াইবার চেষ্টার কথা মিথ্যা, বরং ব্রহ্মদেশে যাহাতে ভারতীয়গণ ভাল ভাবেই বাস করিতে পারে, অতঃপর তাহার চেষ্টা করা হইবে।

পরলোকে ভাই পরমানন্দ—

হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ভাই পরমানন্দ ৭৪ বৎসর বয়সে গত ৮ই ডিসেম্বর পঞ্জাব গুলদস্তে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি এম-এ পাশের পর ১২ বৎসর অধ্যাপকের কাজ করেন ও তাহার পর রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া ১৯০৯ ও ১৯১৩ সালে দণ্ডিত হন। দণ্ডিত হইয়া তিনি অনেক বৎসর আন্দামানে দ্বীপান্তরবাসও করিয়াছিলেন। ১৯১০ সাল হইতে কংগ্রেসের সহিত ও পরে হিন্দু মহাসভার তিনি কার্য্য করেন ও ১০ বৎসর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় বুনিয়াদী শিক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন —(১) প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (সভাপতি) (২) শ্রীযুক্তা আশা আর্য্যনায়কম (৩) শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ (৪) শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালানী (৫) ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু (৬) শ্রীযুক্তা যমুনা ঘোষ (৭) শ্রীযুত পঞ্চানন বসু (৮) শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন (৯) পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী (১০) শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার (১১) বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ কর্ম্মচারী (সম্পাদক)। বোর্ডে আরও ৪জন সদস্য গ্রহণ করা হইবে। বোর্ডে শুধু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই লওয়া হইয়াছে। যাহারা শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত, সেরূপ কয়েকজনকে বোর্ডে গ্রহণ করা হইলে কার্য্যকরী প্রস্তাব গ্রহণের সুবিধা হইবে।

ছুটীর দিন ঘোষণা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৮ সালের ছুটীর দিন ঘোষণায় মহাষ্টমী অন্যদিন ২রা অক্টোবর, নববর্ষ ১লা বৈশাখ ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ দিবস ১৫ই আগষ্ট সাধারণ ছুটীর দিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আগামী বৎসর ১৫ই আগষ্ট রবিবার পড়িয়াছে। অন্যান্য ছুটী প্রায় পূর্ব্বের মতই আছে। খৃষ্টীয় পর্ব্ব খৃষ্টমাস-ডে, গুডফ্রাইডে, ইষ্টার মণ্ডের ছুটি এবং মুসলমান পর্ব্ব কতেয়াদোয়াজদাহাম, ঈদঅলফেতর, ইদুজ্জোহা (২দিন) ও মহরমের ছুটী পূর্ব্বের মতই থাকিবে। ১লা জানুয়ারী নববর্ষের ছুটী না বলিয়া ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশের দিন বলিয়া ছুটী দেওয়া হইবে।

লীলা-লেকচার—

কিসলয়ের কবি লীলা দেবীর স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার পিতা শ্রীরবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কয়েক সহস্র টাকা দিয়াছেন। এই টাকার উপস্বত্ব হইতে লীলা-লেকচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম লেকচারার ছিলেন শ্রীঅনুরূপা দেবী। এ বৎসরের লেকচারার ছিলেন কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়। লীলা দেবীর মৃত্যু দিবস হইতে তিন দিন (৩,৪।৫ ডিসেম্বর) কবিশেখর মহাশয় বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ববিচার ও রস-বিশ্লেষণ নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘারভাঙ্গা হলে ঐ লেকচার দিয়াছেন। ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বক্তৃতা সভায় উদ্বোধন করেন। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সভাপতি। এই বক্তৃতামালা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। আমরা একজন বাঙ্গালী কবির বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই সম্মানে আনন্দিত হইয়াছি। কবিশেখর একাধারে গদ্যনিবন্ধ রচনায়, কবিতা রচনায়, শিক্ষকতায় এবং সৎশিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনায় দ্বারা কৃতী হইয়াছেন।

চাংড়ীপোতায় প্রসূতি-সদন—

গত ১৬ই নভেম্বর ২৪ পরগণা চাংড়িপোতা গ্রামে "রাজলক্ষ্মী প্রসূতি ও শিশুসদনে"র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মেজর-জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন ও অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ভিত্তি স্থাপন করেন। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু তাঁহার মাতার স্মৃতিরক্ষার্থ ভবন নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবেন। ঐ দিনই তথায় ডাঃ বিধেন্দ্রনাথ মৈত্রের সভাপতিত্বে এক সভায় ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর বয়স ৭৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

বাঙ্গালার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার মহাশয় গত ১২ই নভেম্বর এবং মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার
ফটো—পল্লী মত

গত ১৪ই ডিসেম্বর আরিয়াদহ (২৪ পরগণা) অনাথ ভাণ্ডার পরিদর্শন করায় উভয় দিনই জনসভায় তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথম দিনে কংগ্রেস সেবক শ্রীযুক্ত যোগেশ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় দিনে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

জন-নিরাপত্তা আইন—

পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা যে বিশেষ ক্ষমতা বিলের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা জন-নিরাপত্তা বিলে রূপান্তরিত হইয়াছে ও তাহার কয়েকটি আপত্তিকর ধারার যথেষ্ট পরিমার্জ্জন সংশোধন করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবিত আইন কি কি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইবে, তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ্যে ও সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে এই আইন বলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি লইয়া কোন দলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবেন না এবং কাহারও ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা আন্দোলনও বন্ধ করা হইবে না। কোন বামপন্থী আন্দোলন কিম্বা আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক আন্দোলন দমনও ইহার উদ্দেশ্য নহে। গুপ্তচরী, বেআইনী কার্য্য, দস্যুতা, চোরাই অস্ত্রের কারবার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গুপ্তচরবৃত্তি, পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপ —এক কথায় যাহা জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের মঙ্গল এবং নিরাপত্তার বিরোধী, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই এই আইন প্রয়োগ করা হইবে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলিও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার
ফটো—পল্লী মত

আইনের স্বরূপ—

পশ্চিম বাঙ্গালায় যে জন নিরাপত্তা আইনের প্রস্তাব হইয়াছে, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে ইতিমধ্যেই সেরূপ আইন করা হইয়াছে। ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ অবশ্যই অবহিত হইবেন। আইনের আপত্তিকর ধারাগুলির বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে

কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। অবৈধ আন্দোলন হইলেই দেশে অশান্তি সৃষ্টি হয় ও তাহার ফল বর্ত্তমান ক্ষেত্রের মত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

কলিকাতার প্রতিবাদ—

এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার সুযোগ লাভের পূর্ব্বেই কলিকাতায় ইহার প্রতিবাদের নাম করিয়া জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী সকল শক্তি ও উপাদান একত্র হইয়া বিপ্লবী, প্রতিক্রিয়াপন্থী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ সাম্প্রদায়িক-পন্থীরা মিলিয়া গণতন্ত্রের নামে গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই ডিসেম্বর উচ্ছৃঙ্খল জনতারাজ সৃষ্টি করিয়াছিল। উহাতে কলিকাতার ছাত্রসমাজের এক অংশের মাথা খোলাইয়া দিয়াছে। তাহারই ফলে গত ১০ই তারিখে শিশিরকুমার মণ্ডল নামক এক নিরীহ যুবক পুলিশের গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছে ও বহু ছাত্র আহত হইয়াছে। সেজন্য সকলের মত আমরাও অতীব মর্ম্মাহত ও সকলের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। পুলিশ সেদিন যদি অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, সেজন্য প্রকাশ্য তদন্ত করিয়া অপরাধীদের শাস্তিবিধান ঘোষ-মন্ত্রিসভার অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। এই ঘটনার পর ছাত্র-কংগ্রেসের পরিচালকগণও জানাইয়াছেন যে ডাঃ ঘোষ ও তাঁহার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও কোন অভিযোগ নাই। কাজেই আমরাও সকলে ঘোষ মন্ত্রিসভার সুবিবেচনার উপর নির্ভর করিতে অনুরোধ করি। যাহারা তিন দিন ধরিয়া শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়াছিল, তাহারা যে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়াছে, সকল বিবেচক ব্যক্তিই তাহা স্বীকার করিতেছেন—কাজেই ছাত্রদের মনোভাব পরিবর্ত্তনে সকলের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

নতুন প্রভাত লাগি—

শ্রীপ্রফুল্ল সেনগুপ্ত এম-এ

নতুন প্রভাত লাগি তমু দিন গণি,—
আগন্তুক জীবনের পদধ্বনি শুনি।
পুরু হোক, হোক শেষ, হোক অবসান—
ঘৃণিত নিয়মে বন্ধ প্রাণ।
নিষ্পেষিত বেদনার ভারে,
ক্লিষ্ট এই তনুর কণ্ঠ জীবনের পারে—
পূর্ণতার নতুন স্পর্শে মিলাক আঁধার,
দুর্ণ হোক জীবনের দুর্বিষহ ভার!
অনাহার, অনাচারে, ক্লিষ্ট দেহ প্রাণ—
জীবনের ইতিহাসে তমু অপমান:
পরমায়ু ভিক্ষা মাগি,
তমু যেন বাঁচিবার লাগি,—
সহস্র বেদনা বহি,
আমাদেরি তমু অপরাধ।
প্রতিপদে হানা যার বিশ্বের বঞ্চনা,—
মূর্ত্তসিত প্রেমের মোহে
মুক্তির কেবলি মন্ত্রণা:
শেষ হোক—কলুষিত ইতিহাসখানি,—
নতুন সূর্য্যের দেশে
ডুবে যাক বিশ্বেষের বাণী।

দুর্গাচরণ রায় প্রণীত

—দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন—

একাধারে মধুর উপন্যাস, ভ্রমণ-গ্রন্থ, রস-সাহিত্য, পুরাণ-কথা ও জীবন-কাহিনী। পুস্তকখানি সঙ্গে না থাকিলে ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না; আর যিনি ভ্রমণে যাইবেন না, তিনিও ইহা পাঠে ভ্রমণের আনন্দ পাইবেন। ৭৯২ পৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট গ্রন্থ। সুরঞ্জিত প্রচ্ছদপট।

দাম—পাঁচ টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি

শ্রীলীলিমা মজুমদার

বর্তমান যুগে ভারতে যে কয়জন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ লোকালয়ে আছেন শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি তাঁহাদের অন্যতম। বাংলা দেশে অতি অল্প লোকই তাঁহার নাম শুনিয়াছেন। সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও তাঁহার অনেক ভক্তবৃন্দ আছেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি কেবল সুপরিচিত নহেন, তাঁহার উদ্দেশে বহুস্থানে স্তব ও পূজা হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে তিনি 'অচল অরুণাচলেশ্বর' রূপে পূজিত হইতেছেন।

মাদ্রাজএর মাদুরার নিকট এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৭৯ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আইনজীবী ছিলেন। পূর্বাশ্রমে তাঁহার নাম বেঙ্কটরমণ ছিল। সপ্তদশ বৎসর বয়সে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় তিনি ভগবৎ প্রেরণায় গৃহত্যাগ করেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ তিরুবল্লুরালাই সহরের অরুণাচল শৈলের পাদমূলে অবস্থিত জ্যোতির্লিঙ্গ অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে প্রথমে স্থানত্যাগ হন। লোকালয়ের স্থান বারংবার বিঘ্ন ঘটে বলিয়া অরুণাচল পর্বতে

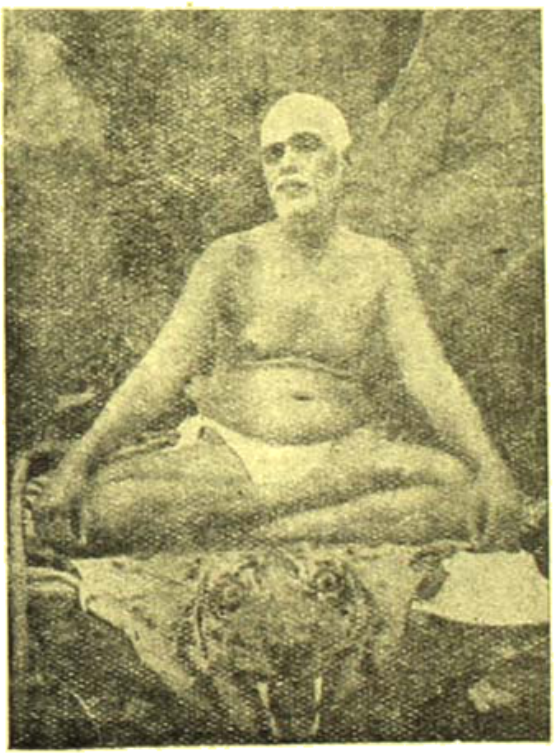

অরুণাচলের ঋষি

পরে তিনি চলিয়া যান। তথায় বিভিন্ন গুহায় ভগবৎ আরাধনায় নিমগ্ন থাকেন। বর্তমানে তিনি অরুণাচল শৈলের পাদমূলে তাঁহার জন্য ভক্তবৃন্দ কর্তৃক নির্মিত আশ্রমে বাস করিতেছেন। এই আশ্রম 'শ্রীরমণাশ্রম' বলিয়া পরিচিত।

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষিকে দেখিবার সৌভাগ্য এইবার ঘটিয়াছিল। এই অপোদ্ধল কৌপীনধারী মূর্তিমন্তকে অরুণাচলের স্বচ্ছিক চক্ষে না দেখিলে তাঁহার শান্ত সমাহিত মূর্তি কল্পনা করা যায় না। দেশদেশান্তর হইতে আগত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইংরাজ, পার্শী একাসনে বসিয়া ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে প্রত্যহ তাঁহার সন্নিধ্য লাভ করিতেছেন। চতুর্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজমান। মাঝে মাঝে আশ্রমবাসিত অবস্থা হইতে জাগিয়া স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তিনি ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই দৃষ্টিপাতেই যাহার যা কিছু বক্তব্য বা জ্ঞাতব্য তাহা পূর্ণ হইয়া যায়। প্রাণে অভূতপূর্ব শান্তি আসে। দীক্ষা বা মৌখিক কোন উপদেশ সাধারণতঃ তিনি দেন না। তবে কাহারও কোন বিশেষ জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। যদিও তামিল ভাষাতেই কথাবার্তা বলেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল ভাষাতেই তিনি সুপণ্ডিত। অধিকন্তু সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন।

অধিকাংশ সময় মহর্ষি ভক্তদের সহিত অতিবাহিত করেন। নিজস্ব কোন সময় তাঁহার নাই বলিলেই চলে। প্রত্যহ প্রাতে সকলের সহিত একই ঘরে তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন এবং চিঠিপত্র সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। মাঝে মাঝে কৌতুকচ্ছলে মৃদুমধুর হাসি হাসিয়া কথাবার্তাও বলেন। এই সকরুণ দৃষ্টিপূর্ণ শিশুসুলভ হাসি ভুলিবার নহে। প্রতিদিন সকলের সহিত তিনি একসঙ্গে আহারে বসেন, সকলের আহার শেষ হইলে, সবাই উঠিয়া গেলে তিনি আসন ত্যাগ করেন। এই বৃদ্ধ বয়সে দৈনন্দিন নিয়মের কোন ব্যতিক্রম তাঁহার নাই। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁহার সম্মুখে বেদপাঠ হয়, বাথারেঙ্গনিতে চারিদিক সুরক্ষিত হইয়া উঠে—আশ্রমের মৃদু কাঠবিড়ালীগুলি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, তখনমনে হয় সেই বুঝি আমাদের গ্রামান্তর মহাভারত-বর্ণিত মুনি ঋষিদের আশ্রম। মনপ্রাণ অনির্বচনীয় শান্তিতে পূর্ণ হইয়া যায়। জীবজন্তুর প্রতি মহর্ষির অসীম মমতা। বন্যপশু তাঁহাদের খাবার দিয়া থাকেন।

কোন গুরু শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষির জীবন্মুক্তি লাভের জন্য আবশ্যক হয় নাই। স্বতঃই তাঁহার মন ভরপুর হইয়া সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে পর্যবসিত হইয়াছে। তাঁহার উপদেশ সহজ সরল। "আমি কে" এই আত্মানুসন্ধান হইতেই আত্মোপলব্ধি হয়, ইহাই এক কথায় মহর্ষির আত্মোপদেশ।

দাক্ষিণাত্য বাস্তবিকই ধন্য। তেলুগুভূমি বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতের দুই বিপরীত দিকে প্রায় সমভূমে, পণ্ডিচেরীতে যোগীর যুগের অদ্বিতীয় শ্রীঅরবিন্দ, অন্যদিকে তিরুবল্লুরালাইএ অরুণাচলের ঋষি শ্রীরমণ মহর্ষি। উপনিষদ বর্ণিত এই দুই আধিব্যাবরণ মহাপুরুষদ্বয়কে দেখিবার সৌভাগ্য বিগত আগষ্ট মাসে হইয়াছে বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করি।

রাজা রামমোহন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এ সায়াহ্নে বহু বর্ষ পরে
বীর্য্যশুল্কা ধাত্রীর কবি সতর্পিয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে
তোমারে স্মরণ করে
হে পুরুষোত্তম কর্ম্মবীর
সত্যদ্রষ্টা সাধক প্রধান !
দূর অতীতের প্রাচ্য ইতিহাস দিতেছে প্রমাণ
এ-কথাই অক্ষরে অক্ষরে
অন্ধকার অমা রজনীর ঘন দুর্য্যোগ তিমির
করে যেন দূর ;
জ্ঞানের দিশারি তুমি, করিয়াছ ভাবে দূরদূর
এ-বঙ্গের চিত্তক্ষেত্র যে ছিন্নান্বেষী তেজস্বী ব্রাহ্মণ
আপনার বীর্য্যবলে ; স্বজাতির কল্যাণ সাধন
আজীবন আব্রতব্রত তব
নির্ভীক পৌরুষহীন সমাজের প্রাণে অভিনব
দিয়েছে স্পন্দন।
সহমরণের বুকে পদাঘাত নিরুদ্ধ ক্রন্দন
ধর্ম্মের বিকৃত ভাষ্য মুখরিত শাস্ত্রের বচন
পথহারা আঁধারের নির্জ্জীব স্থাবর যাত্রীদলে
ব্যথিত করেছে যারা, তব তপস্যার শক্তি বলে
সে ক্রন্দন অবলুপ্ত ঘুমে ;
সত্যতার চির অন্তঃপুরে
রাজরাজেশ্বর তুমি দৈব-লব্ধ জীবন্ত বিগ্রহ,
অমিতায়ু মৃত্যুঞ্জয় আলোকের চির বার্ত্তাবহ।
এনেছিলে চিন্তারাজ্যে অনাগত যুগের পাথেয়,
সত্যতা সঙ্কট দিনে যাহা কিছু আপনার ধেয়
দিয়ে গেলে নব সংগঠনে
লোকোত্তর প্রতিভার পুণ্যরশ্মি পূর্ণতার মনে।
অধ্যাত্ম পথের যাত্রা মঙ্গলের মহামন্ত্র বাণি
উষর বিপ্লবে অনুরণি
বঙ্গের গৈরিক মৃত্তিকা—চৈতন্যের দিলে সাড়া
মানবিকতার প্রাণবন্ত প্রেরণার ভাবধারা
বহায়েছে বিশ্বমাঝে জ্যোতির্ম্ময় জীবন তোমার
সুন্দর উদার।
জীবনের উর্দ্ধতন সত্তার সংবাদ দিলে আনি
তর্ক দম্ভ যুক্তি মত হানি
অসত্যের পুঞ্জীভূত গুরুবিদ্যা পরাজিত করি
মহত্তর আদর্শের বরি
তপঃশুদ্ধ প্রাণে শুনায়েছ উপনিষদের বাণী
শুচি করি মত কদাচার।
রাজপথীর সব দীপ্তি তব হেরি অনিবার।
বিজাতির সভ্য পদাবর্ত্ত
মুগ্ধ ভাগ্যাহত
দেশিনের ক্লান্ত-অবনত বিপন্ন ঐতিহ্য ধারে
এসেছিলে আজিকার দিন ফিরাইয়া আনিবারে
পথ প্রদর্শক।
শুধু নহ ধর্ম্মপ্রচারক নবযুগ প্রবর্ত্তক।
অহংমন্য আত্ম-প্রচারের করো নাই অভিনয়,
প্রকৃতির মহাগ্রন্থে চিরদিন তুমি যে বিস্ময়
হে সূর্য্য সারথী !
অন্ধকারে করিতে আরতি
প্রাচ্য প্রতীচ্যের দ্বারা সমন্বয়ে উষার অগ্রণী
পাশ্চাত্য শিক্ষায় তরী পূর্ব্বঘাটে করি শঙ্খধ্বনি
ভিড়ায়ে দিয়েছ অনুরাগে
সুর সভ্যতার ঊর্দ্ধভাগে।
বঙ্গভারতীর সাহিত্যের তুমি নব জন্মদিনে
বর্ত্তমানীতি যেখানে নিখিলে
দিনগুলি করি বর্ণময়
জানিয়া উঠিল তব জয়।
প্রতিভায় তুমি অধীশ্বর,
পাষাণের বক্ষ ভেদি উৎসারিয়া অমৃত নির্ঝর
এ জাতির সর্ব্বক্ষেত্রে সমাজের সর্ব্ব স্তরে স্রোত
এনে দিলে, পারে নাই কেহ তারে করিবারে রোধ।
শিখায়েছ অন্ধকারে সহ করি অন্ধের দুর্গতি
সত্যশক্তি উপাসনা সার্ব্বভৌম প্রথম পদ্ধতি
হে রামমোহন !
শুশ্রূষা-সাধন মাঝে করে দেছ শক্তি উদ্বোধন।
মন্বন্তর মহামারী সনে
যুদ্ধকার তীব্র জ্বালা সনে
এ জাতির অর্দ্ধমৃত সমাজের বিপর্য্যয় মাঝে
অগ্নিযোগী ! তোমারে যে কাজে
পেতে চাই, আজ কোনো কাজে
লাগেনাক মন, লক্ষ জীর্ণ কুটীর প্রাঙ্গণে
বহিতেছে মন্বন্তর বায়
হে বিরাট তোমারে প্রণাম
তোমার উদ্দেশে মোর ভিন্ন অর্ঘ্য আজি রাখিলাম।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

শুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলা ঃ

৭ই নভেম্বর—১১ই নভেম্বর

নিউ সাউথ ওয়েলস : ৫৬১ (৮ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)
ভারতীয় ক্রিকেট দল : ২৯৮ ও ২১৫

সিডনিতে নিউসাউথ ওয়েলস দলের সঙ্গে খেলে ভারতীয় দল এক ইনিংসে পরাজিত হয়। অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের পরাজয় এই খেলা থেকে প্রথম আরম্ভ। নিউ সাউথ ওয়েলস দল প্রথম ব্যাটিং ক'রে ৮ উইকেটে ৫৬১ রান তুলে প্রথম ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার্ড করে। মরিস ১৬২ এবং মোরোনে ৯৬ রান করেন। ঘানকাদ এবং অধিকারী যথাক্রমে ১৫৬ ও ১৭৬ রানে ৩টি ক'রে উইকেট পান। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের খেলা ১০ই নভেম্বর তারিখে শেষ হয় ২৯৮ রানে। হাজারী ১৪২ রান করেন। ঘানকাদের ৬৭ রান উল্লেখযোগ্য। টসাক ৫২ রানে ৪টে উইকেট পান। অসুস্থতার জন্য খেলায় অমরনাথের যোগদান সম্ভব হয়নি। প্রথম ইনিংস ৩২০ মিনিটে শেষ হয়। ২৬৩ রান পিছনে পড়ে ভারতীয় দল 'ফলো-অন' ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে দিনের শেষে ৭ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। খেলার শেষ দিনে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৫ রানে শেষ হয় ৯ উইকেটে। অমরনাথ মাঠে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু খেলতে পারেন নি। অধিকারী দলের সর্বোচ্চ ৬৫ রান করেন। অমরনাথ উভয় ইনিংসেই খেলতে নামেন নি, নতুবা 'ফলো-অনে'র হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভারতীয় দল দলের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়ত পারতো। টসাক এবারও মারাত্মক বল দিয়ে ৬৫ রানে ৪ এবং জনস্টোন ৮৭ রানে ৩টে উইকেট পান।

১৪ই নভেম্বর—১৮ই নভেম্বর

ভারতীয় দল : ৩২৬ ও ৩০৪ (৯ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)
অষ্ট্রেলিয়া একাদশ : ৩৮০ ও ২০৩

বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্বে এবং একাধিক অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ম্যাচ খেলোয়াড় পরিপুষ্ট শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়া একাদশকে ৪৭ রানে ভারতীয় দল পরাজিত ক'রে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। শেষ পর্য্যন্ত ব্র্যাডম্যান এ পরাজয় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য দুঃসাহসিক চেষ্টা করেন।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় দলের ৯ উইকেটে ২৯২ রান উঠে।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩২৬ রানে শেষ হয়। গুলমহম্মদ দলের সর্ব্বোচ্চ ৮০ রান করেন। তারপরই কিবেণচাঁদের নট আউট ৭০ রান উল্লেখযোগ্য। লক্সটোন ৭০ রানে ৩টে উইকেট পান। দ্বিতীয় দিনের খেলায় শেষে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের ৪ উইকেটে ৩৪২ রান উঠে।

তৃতীয় দিনে পূর্ব্বদিনের রান সংখ্যায় আর মাত্র ৩৮ রান যোগ হ'লে পর অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ভারতীয় দলের সোহনীর বোলিং মারাত্মক হয়েছিল, ৮৯ রানে তিনি ৪টে উইকেট পান। ডন ব্র্যাডম্যান ১৭২ রান করেন। বিদায় করেন ৮৬ রান। মোট ৩৮০ রান উঠতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে।

ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে তৃতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৭২ রান করে।

খেলার শেষ দিনে ভারতীয় দলের ৯ উইকেটে ৩০৪ রান উঠলে পর ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করা হয়। দলের উল্লেখযোগ্য রান—বিজেশচাঁদ নট আউট ৬৩, সারডাতে ৫৮, অধিকারী ৪৬।

অষ্ট্রেলিয়া দল হাতে আড়াই ঘণ্টা সময় নিয়ে এবং ২৪০ রান পিছনে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং এই অল্প সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলবার চেষ্টা প্রথম থেকেই পিটিয়ে খেলতে থাকে। সে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। কিন্তু ভারতীয় দলের পূর্ব্বাপেক্ষা

কুইন্সল্যাণ্ড ক্রিকেট দল বনাম ভারতীয় দলের খেলাটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে শেষ হয়েছিল—ভারতীয় দল মাত্র ২৪ রানে পরাজিত হয়।

কুইন্সল্যাণ্ড খেলার প্রথম দিন সারাদিন ধরে ব্যাট ক'রে এবং দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের কিছু পূর্ব্বে ৩৪১ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করে। দলের রান—মরিস ১১৩, রেমার ৮২, ম্যাক্কুল ৪৫। মানকাদ বিপক্ষকে ৭৬ রান দিয়ে ৬টি উইকেট পান।

খেলার দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দলের প্রথম

আই-এফ-এ ইলেভ কাইমাল বিজয়ী মোহনবাগান দল এবং মধ্যভাগে সম্রীক পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণর ফটো—জে কে লাহিড়ী

উন্নত শ্রেণীর বিল্ডিং এবং মানকাদের মারাত্মক বোলিংয়ের সামনে শেষ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া একাদশ দলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ২০৩ রানে অষ্ট্রেলিয়া দলের ২য় ইনিংস শেষ হয়। মানকাদ ৮৪ রানে ৮টা উইকেট নিয়ে মারাত্মক বোলিংয়ের পরিচয় দেন। ভারতীয় দলের এ জয়লাভ খুবই কৃতিত্বপূর্ণ হয়েছিল।

২১শে নভেম্বর—২৫শে নভেম্বর

কুইন্সল্যাণ্ড : ৩৪১ ও ২৬৯ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)
ভারতীয় দল : ৩৬৯ ও ২১৭

ইনিংসে ৪ উইকেটে ২৪৯ রান উঠে। অমরনাথ ১০১ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

খেলার তৃতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৬৯ রানে শেষ হয়। অমরনাথ নট আউট ১৭২ রান করেন। মানকাদ করেন ৬৫ রান। কুইন্সল্যাণ্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে কুইন্সল্যাণ্ড ৩ উইকেটে ১১৭ রান করে।

খেলার শেষ দিনে কুইন্সল্যাণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ২৬৯ রান উঠলে পর ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড

করা হয়। ম্যাকুল নট আউট ১০১ রান করেন। হাতে ১৫৫ মিনিট সময় এবং জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪২ রান করার দুর্জ্জয় সংকল্প নিয়ে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে; কিন্তু নাটকীয় পরিস্থিতির জন্য শেষ পর্য্যন্ত তাদের সংকল্প রক্ষা হয় নি। জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান দ্রুত তুলতে গিয়ে ভারতীয় দলের দারুণ ভাঙ্গন দেখা দেয়। শেষ উইকেটে পি সেন যখন কিষেণচাঁদের স্থলাভিষিক্ত হ'লেন তখন খেলা শেষ হ'তে আর মাত্র ১৫ মিনিট সময় বাকি এবং ভারতীয় দল ৩৭ রানের ব্যবধানে ছিল।

কুইন্সল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা উইকেটের সন্নিকটে ব্যাটসম্যানদ্বয়কে বেষ্টিত ক'রে মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে লাগলেন। শেষ ওভার বলে তিনটে রান করার পর সকলেই ভাবলেন খেলা অমীমাংসিতভাবেই শেষ হয়ে গেল, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ শেষ ওভারের চতুর্থ বলে কিষেণচাঁদ বোল্ড আউট হয়ে গেলে খেলা শেষ হয়ে গেল। ফলে কুইন্সল্যাণ্ড মাত্র ২৪ রানে খেলায় বিজয়ী হ'ল। ম্যাকুল ৬৮ রানে ৫টা উইকেট পান।

আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনালে সম্বীক পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর স্যার বি-এল মিত্র ফটো—হে কে লাহাদ

প্রথম ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়া দল : ৩৮২ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ভারতীয় দল : ৫৮ ও ৯৮

ভারতীয় দল বনাম অষ্ট্রেলিয়া দলের ১ম টেষ্ট ম্যাচের প্রথম খেলায় ভারতীয় দল শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস এবং ২২৬ রানে পরাজিত হয়েছে। খেলায় দলের যোগ্যতা যে জয়লাভের একমাত্র মাপকাঠি নয় তা ক্রিকেট খেলা সম্পর্কেই বেশী বলা চলে; কারণ ক্রিকেট খেলায় যোগ্যতার মাপকাঠি ছাড়া প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপর যথেষ্ট নির্ভর করতে হয় এবং এই প্রাকৃতিক সুযোগের সুবিধা নিয়ে অনায়াসে একদল অপর দলকে বিপর্যস্ত ক'রে শেষে খেলায় যে জয়ী হয় এরূপ ঘটনা ক্রিকেট খেলায় নৈমিত্তিক ব্যাপার। এরূপ অবস্থায় ভাগ্যবান দলই প্রাধান্য লাভ করে, দক্ষতার প্রভাব খুব কার্য্যকরী হয় না। অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের প্রথম টেষ্ট ম্যাচেও ইন্দ্রদেব অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ অবলম্বন করায় ভারতীয় দলকে যে এই শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে তা খেলার বিবরণ এবং মাঠের অবস্থাই তার সাক্ষ্য দেয়। 'Winning of toss an important factor' ক্রিকেট খেলায় এই মূল্যবান উক্তি এক্ষেত্রে অযুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে হয়েছে।

ভিন্নু মানকাদ প্রশংসিত ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব টেষ্টম্যাচ ক্যাপটেন ভিক্টর রিচার্ডসন কুইন্সল্যাণ্ড বনাম ভারতীয় খেলার আলোচনা প্রসঙ্গে এরূপ মন্তব্য করেন যে, ভিন্নু মানকাদ বর্ত্তমানে পৃথিবীর ক্রিকেট জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড়। তাঁর মতে ইংলণ্ডের বিখ্যাত টেষ্ট বোলার ভেরিটি অপেক্ষা মানকাদ উচ্চাঙ্গের বল করেন। ক্রিকেট খেলার দেশ অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় মানকাদ সম্পর্কে যে প্রশংসা সেই দেশের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে তা আমাদের গর্ব্বের বস্তু সন্দেহ নেই।

২৮শে নভেম্বর ভারতীয় দল বনাম অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয় ব্রিসবেনে। ব্র্যাডম্যান টসে জয়লাভ করলে অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করে। প্রথম দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেটে ২৭৩ রান উঠে। ব্র্যাডম্যান ১৬০ রান ক'রে নট আউট থাকেন। প্রথম দিনের খেলার পূর্ব্ব রাত্রে এবং খেলার দিনের চা পানের সময় বৃষ্টি হয় কিন্তু পিচের অবস্থা ভালই ছিল। খেলার দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির জন্য মাত্র এক ঘণ্টা খেলা হয়েছিল এবং তাও চারটার পূর্ব্বে সম্ভব হয়নি। খেলার প্রথম দিনের রাত্রে ছ' ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়।

স্যার বি-এল মিত্র মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করছেন

ফটো—জে কে সান্যাল

অপরাহ্ণ চারটায় পূর্ব্বদিনের নট আউট ব্যাটসম্যান ব্র্যাডম্যান এবং মিলার খেলা আরম্ভ করেন। তাঁরা খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলতে থাকেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই দিন কোন উইকেট না খুইয়ে ৩ উইকেটে ৩০৯ রান উঠে। ব্র্যাডম্যান ১৭৯ এবং মিলার ১৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন। খেলার তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১লা ডিসেম্বর অষ্ট্রেলিয়া দল ৮ উইকেটে ৩৮২ রান উঠলে পর তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করা হ'ল। উল্লেখযোগ্য রান করেন ব্র্যাডম্যান ১৮৫, মিলার ৫৮, হ্যাসেট ৩৮, মরিস ৩১। গত রাত্রেও প্রবল বারিপাতে মাঠের জায়গায় জায়গায় কাদা দেখা যায় এবং পিচের অবস্থাও ভাল ছিল না। ব্রিসবেন মাঠের এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ভারতীয় দল মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। খেলার ফল যে শুভ হবে না তা সূচনাতেই আভাস পাওয়া গেল। মানকাদ ও গুলমহম্মদ দলের কোন রান হবার আগেই আউট হলেন। ১০ মিনিট খেলার পর ৭ উইকেটে ভারতীয় দলের মাত্র ৫০ রান উঠলো। বাকি তিনজন হাজারে, অমরনাথ এবং ইরাণী আর ৮ রানের মধ্যে আউট হয়ে যান। এ বিপর্য্যয় ঘটালেন অষ্ট্রেলিয়ার বোলার টমাক। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৫৮ রানে শেষ হ'ল। পূর্ব্বদিন রাত্রে এক ইঞ্চি বৃষ্টির জন্য এই দিন নির্দ্ধারিত সময়ের ৩৯ মিনিট পর খেলা আরম্ভ হয়। পিচের অবস্থা ভাল ছিল না। খেলোয়াড়দের ব্যাটে কাদা উঠতে দেখা যায়; বলও অত্যধিক লাফ করতে থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া দলের থেকে ৩২৫ রানে পিছনে থাকায় ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা 'ফলো-অন' হিসাবে আরম্ভ করলো চা পানের পর। এবারও ভারতীয় দলের ভাগ্যে কোন শুভ পরিবর্ত্তন হ'ল না। দিনের শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৪১ রান উঠলো। দ্বিতীয় ইনিংসেও টমাকের বল মারাত্মক হ'ল। তিনি ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের শেষদিকে মাত্র ২ রানে ভারতীয় দলের ৫জনকে আউট করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসের মাত্র ১২ রানে তিনটে উইকেট পান। কোন টেষ্ট ম্যাচেই এ পর্য্যন্ত কোন বোলারই তাঁর মত কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

খেলার চতুর্থ দিনের পূর্ব্ব রাত্রেও বৃষ্টি হওয়ায় ঐদিন মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্ব্বে ভারতীয় দল পূর্ব্ব দিনের পরিত্যক্ত

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে পারে নি। চতুর্থ দিনেও খেলার মধ্যে বারিপাত হ'তে থাকে এবং খেলার উপযুক্ত আলোকাভাব হওয়ায় বেশীক্ষণ খেলা হয়নি। অপরাহ্ণ ৪-৩৫ মিনিটে ভারতীয় দলের আবেদনক্রমে খেলার উপযুক্ত আলোকাভাব হেতু দু'জন আম্পায়ারই খেলা বন্ধ করেন। ঐ দিনের কোন উইকেট না হারিয়ে ভারতীয় দলের ৪ উইকেটে ৭০ রান উঠলো।

খেলার পঞ্চম দিনে প্রবল বারিপাত এবং মাঠের খারাপ অবস্থার জন্য টেষ্ট ম্যাচ স্থগিত রাখা হয়।

খেলার ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ শেষদিনের পূর্ব্ব রাত্রে বৃষ্টি না হওয়ায় নির্ম্মল আবহাওয়ার মধ্যে ভারতীয় দলের পরিত্যক্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ হয়। সূচনা ভাল হ'ল না। সূচনাতেই হাজারে নিজস্ব ১৮ রান করে আউট হলেন। মোট ৭০ মিনিট খেলায় ভারতীয় দলের ৯৮ রান উঠলে পর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি হয়। ভিজা মাঠের সম্পূর্ণ সুবিধা অষ্ট্রেলিয়ান ফাষ্ট স্পিন বোলার টসাক হাত ছাড়া করলেন না। তিনি দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ রান করতে দিয়ে ৬টা উইকেট পেলেন। ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ২২৬ রানে অষ্ট্রেলিয়া দলের কাছে প্রথম টেষ্ট ম্যাচে পরাজয় স্বীকার করলো; প্রসঙ্গত ভাগ্যের বিড়ম্বনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে আত্মসমর্পণ বলা চলে।

অষ্ট্রেলিয়া: ডি ব্র্যাডম্যান (অধিনায়ক) ডবলউ এ ব্রাউন, মরিস, এল হাসেট, কে মিলার, সি ম্যাক্কুল, আর লিণ্ডওয়েল, টি ট্যালন, আই জনসন, ই টসাক।

ভারতীয় দল: এল অমরনাথ (অধিনায়ক), ভি এস হাজারা, ভি মানকাদ, জে কে ইরাণী, বি বিবেশচাঁদ, এইচ আর অধিকারী, গুলমহম্মদ, সি এস নাইডু, সি টি সারভাতে, কে এম রঙ্গনেকার, এস ডবলউ সোহনী।

জো লুই ও

নিউ ইয়র্কস্থ ম্যাডিসন স্কোয়ারে পৃথিবীর বিখ্যাত হেভিওয়েট মুষ্টি যুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান জো লুই তাঁর এই 'খেতাব' অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর্নি জো ওয়ালকট নামে অপর এক নিগ্রো মুষ্টি যোদ্ধার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে কোনক্রমে জয়ী হয়ে নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছেন। জো লুই সর্ব্বক্ষণই নৈরাশ্যজনকভাবে লড়েছিলেন এবং তাঁর এ লড়াই সম্পর্কে রেফারী এবং বেশীর ভাগ ক্রীড়ামোদীদের মতে জো লুই প্রকৃতপক্ষে পরাজয় স্বীকারই করেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে নিউইয়র্ক ষ্টেট এ্যাথলেটিক কমিশনে বিচারকদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। জো লুইয়ের বর্ত্তমান বয়স ৩৩ বছর। এই নিয়ে পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁকে ২৪বার লড়তে হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ফর্শনী হিসাবে ২৫০,০০০ ডলার সংগৃহীত হয়েছে; এই বাবদ জো লুই শতকরা ৪৫ এবং ওয়ালকট শতকরা ১৫ হিসাবে লভ্যাংশ পাবেন।

জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নয়ন পরিষদ—

(সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত)

গত ২৩শে কার্ত্তিক ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'দি জিমনাসিয়ামের' ক্রীড়া প্রাঙ্গণে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষের সভাপতিত্বে জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নয়ন পরিষদের সম্মানপত্র বিতরণ ও ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৪৩ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে ব্যায়াম শিবিরে প্রবেশ করেন এবং সম্মানের সঙ্গে শিক্ষা শেষ করেন। ডাঃ অমর মুখার্জ্জি এইরূপ অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে যে সব ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শিত হয়, তার মধ্যে বলাই চাটুয্যের বাংলা ভাষায় আদেশ দ্বারা কুচকাওয়াজ, বিষ্ণু ঘোষের আসন ব্যায়াম শিক্ষা, রবার সরকারের ডাম্বল ড্রিল শিক্ষা ও বৃষব্যাধ নৃত্য ও অপরাপর ব্যায়াম বীরদের ব্যায়াম কৌশল বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, স্বাধীন ভারতে স্বাস্থ্যহীন দেহ থাকা মোটেই সুলক্ষণ নয়। প্রত্যেকে যাতে নিয়মানুযায়ী ব্যায়াম শিখতে পারে তজ্জন্য এইরূপ শিক্ষা শিবিরের প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ব্যায়াম করা হয় না—এই উক্তি যাঁরা করেন তাঁরা শিক্ষা শিবিরে যোগদান ক'রে জাতির উন্নতিসাধন করতে পারেন।

অনুষ্ঠানের শেষে মেজর জেনারেল অনিলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি শিক্ষার্থীদিগকে সম্মানপত্র প্রদান করেন এবং মনোরম বক্তৃতা দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

হে গান্ধীজী তোমায় প্রণাম

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে অনেক সূর্য, এক সূর্য পরিভ্রমান,
এদেশে অনেক লোক, একা তুমি শাশ্বত মানুষ,
হে গান্ধীজী তোমায় প্রণাম।
তোমায় প্রণাম করি হে প্রবীণ বোধের প্রতীক,
তোমায় প্রণাম করি, চক্ষুষান তুমি নরোত্তম।

পাপ যতো, ঘৃণা যতো, ক্লেদের বিকৃতি বিলাস,
দেহের দীনতা যতো, আত্মার যা কিছু পরাজয়,
হে আত্মবিস্মৃত করি সকলের ঊর্দ্ধে তুমি, তাই
অবজ্ঞানাপুক্ত মাথে তোমার আসন হ'ল পাতা।
অতীত প্রত্যুষ কথা তোমায় দেখিলে মনে পড়ে,
—মনে পড়ে সর্ব্বহারা সম্রাটের কাঁটার মুকুট।

নৃতকোণে বন্ধমুষ্টি, যে দৃষ্টি মাটিরে নাহি চাহে,
যে দৃষ্টি আকাশপটে লেখে না দেবের রক্ষিমেলা,
যাথে যাথে হানাহানি, ছোট ছোট সিন্ধির সংঘাত
পৃথিবী ভরিয়া আছে এ নগণ্য জনতার ভিড়ে।
এই বন্দী ভগবান, এদেরই মুক্তির মহাব্রত
হে তোমার জীবন স্বপ্ন। তব কীর্ত্তি হ'তে তুমি বড়,
তাই তুমি কাছে এসে মানবেরা মাটিতে মিশায়।
তোমায় ঘিরিয়া যারা দিনরাত করে কলরব,
তাদের মহত্ব আর তাদের দীনতা অতিক্রমি
হে সূর্য্য তোমার আলো সঞ্চারিত সারা পৃথিবীতে।

স্রষ্টা তুমি, দ্রষ্টা তুমি, আলোক বর্ত্তিকা জনতার ;
সে বর্ত্তিকা পানে চাহি মুমূর্ষু ধরণী রাত্রি জাগে,
রাত্রি জাগে আর দেখে দুঃখ-স্বপ্ন নব জীবনের।

* * * *

অনেক পাতার নীচে ক্ষুদ্রকণ্ঠে যে প্রাণকোরক,
সূর্য্য তপস্যার জ্যোতি তারও মাঝে সঞ্চারিত হোক্।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বিমলাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "হেমাঙ্গিনী"—২৷৷০
হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত ডিটেকটিভ উপন্যাস "ট্রেন ডাকাতি"—১৷৷০
শ্রীমতী পুষ্প বসু প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "প্রদীপ ও পতঙ্গ"—২৲
নরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "পৃথিবী সরাই"—২৷৷০
বিভূতি চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "বিনির কাণ্ডকারখানা"—১৷৷০
জ্যোতিপ্রসাদ বসু-সম্পাদিত গল্প-গ্রন্থ "আহ্বানী"—১৷৷০
শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভারতের মুক্তি কথা"—১৷৷০
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু অনূদিত "চীনের সেরা কাহিনী"—৩৲
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত উপন্যাস "তন্দ্রাতুরা"—১৷৷৹
শ্রীবসন্তিকুমার বসু প্রণীত "পরম ধর্ম"—৵৹
শ্রীঅমরকুমার বসু প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মুক্তি পথের গান"—।৹
শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত "রাশিয়ার সেরা গল্প" (১ম ভাগ)—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

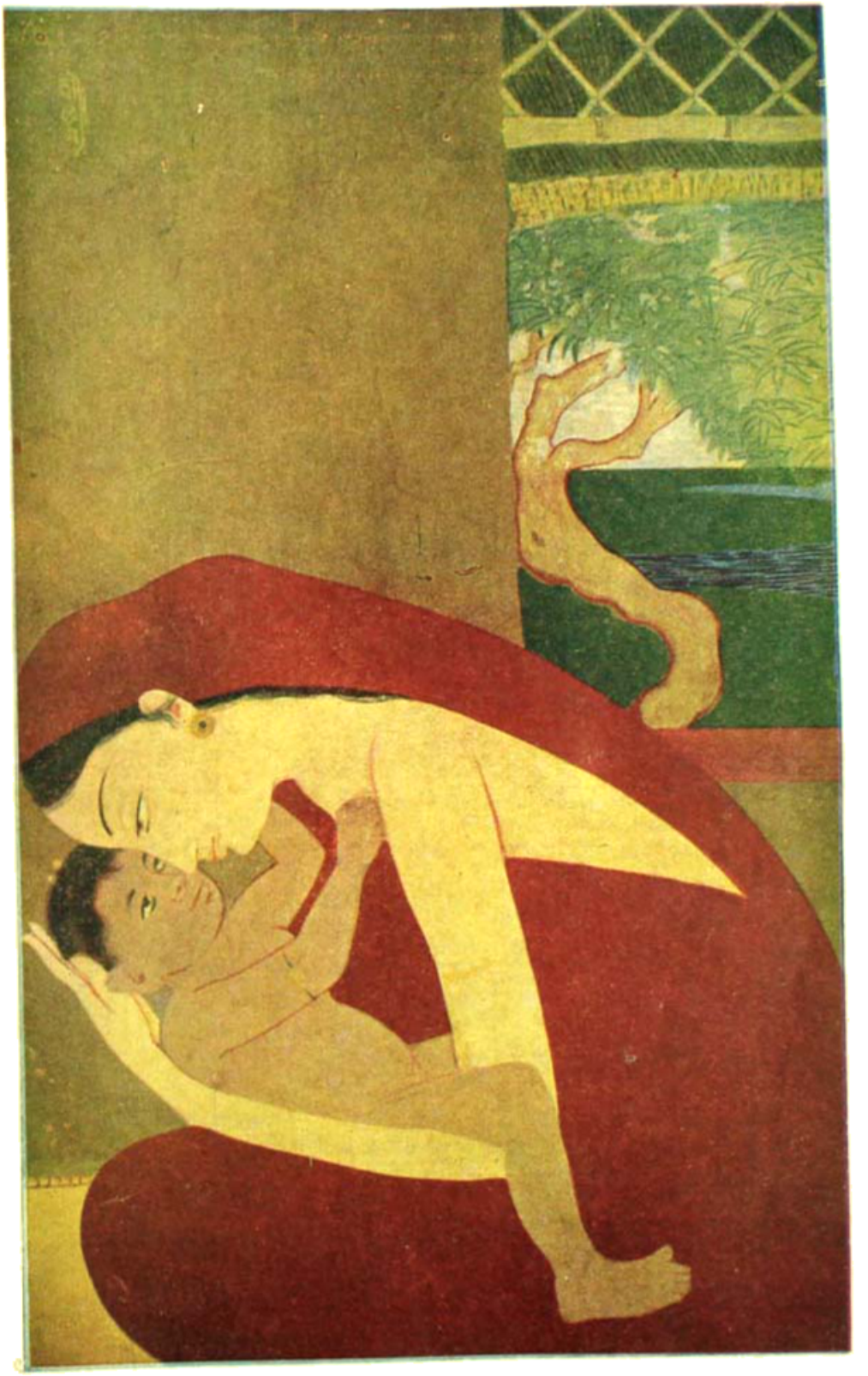

শিল্পী—ইন্দ্রকুমার নীরেন ঘোষ

মা ও ছেলে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

মাঘ—১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চত্রিংশ বর্ষ	দ্বিতীয় সংখ্যা

পদ্মিনী

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস্

রূপের পূজারী আমি দিবাযামী রূপমুগ্ধ কবি,
হে রাণী পদ্মিনী,
ভুলে যাও রণভেরী মহাবৈরী ঝঞ্ঝার ভৈরবী
সমর রঙ্গিণী,
ভুলো পাঠানের হিংসা অগ্নিলিপ্সা স্পর্দ্ধা কামুকের
মানব কাহিনী ;
তোমার আঁখির রোষে বজ্র ঘোষে জানো কামুকের
অভিযান হানি।

২

সৃষ্টির পরম পুষ্প, ত্রিলোকের রূপের প্রকাশ,
বহ তুমি নারী ;
সুকুমার শিল্প তুমি, যৌবনের সোপন বিকাশ
সমুখে বিথারি'
নয়নে আনন্দ যাও, অধরে মধুর প্রেমনীতি
ত্রিলোক মাঝে আশা

অধরে অনন্ত জ্যোতি ইন্দ্রধনুবর্ণবিচ্ছুরিত
তৃষায় পিপাসা।

৩

সে তুমি ও বধূ নারী, মৃত্তিকায়ি মর্ত্যের মাধবী,
চিতোর মহিষী।
চিত্তের বন্দিতা রাণী ; অনিন্দিতা কল্পনায় কবি
চির দিবানিশি
তোমারে সৃজন করে। অন্তরাত্মি লক্ষিতে তোমারে
বিশ্বিজয়ে চলে
রক্ষিতে রূপের পদ্মে দিনমণি কিরণ বিস্তারে
ডুবে অস্তাচলে।

৪

সে তুমি অরূপ সাজে ধরামাঝে রাজো নিশিদিন,
অনন্ত রূপসী,

তোমারে সন্ধানে কবি কিংবা ছবি বিরাম বিহীন
দেশে দেশে পথি
সেই তুমি চিত্ত ভরে চিরতরে নগরে প্রান্তরে
বাজাও কিঙ্কিনী
তব পরাজয় হবে এই ভবে পাঠানের তরে
বিশ্ব-বিজয়িনী ?

৪

নানন পদ্মের রাণী প্রেমবাণী শ্রেষ্ঠ উপহার
কবিতায় ভাসি
নিখিল অবিশ্বাকান্তি বিশ্বশান্তি সৌন্দর্য্যসম্ভার,
রাজার দুলালী,
এত বিভা মনোলোভা এক সাথে মোহনাচে শোভে
পূর্ণিমা প্রভাতা,
আনাও অনল আশা, রহি "আশা" বিরহ গৌরবে
কামনার ব্যথা।

৫

চাও দেবী আঁখি মেলে আঁখি মেলে অতন্দ্র বিকাশে
বহু প্রতিক্ষিতে যেন কমুগ্রীবা রমণীরে ছলে,
খোলো বদনেরে,
ওই ওষ্ঠাধরে তলে রেখা তলে পৌরানন শিরা-
রেখাও তাহারে ;
তব পুণ্যপ্রভা ছলে দুর্গতলে শক্র বিভীষিকা
নত হয়ে হারে।

৬

তার পরে ক্ষণ তরে বাসনার উন্মাদিনী ঘূর্ণি
সাথে করিতে
বিশ্বাসে বিলোপ কর, যুদ্ধের রণনাদ শুনি'
এলো বর নিতে,
মন্দির অন্তরে দেবী, রেখা কবি প্রার্থনায় বসি
রূপে "যোগমায়া"—
হিংসের হিংসায় পরে জিনে যেন অসীম রূপসী,
চিত্ত জিনে কায়া।

৭

প্রকৃতির বৈতালিক মাঙ্গলিক গেয়ে ওঠে সাথে,
গাহে তব জয়,
পুরনারী ভরি' ঝারি শান্তিবারি তুলে নেয় মাথে
নিশ্চিত নির্ভয়,
মুক্ত কোষে অগ্নি হাসে চমকিয়া সৌরকর তলে,
বাজে ঘর ভেরী ;
মধুরে ভাসিয়া যায় শাখ যায় নাচাইয়া জলে
ওইনী "পাঞ্চেরী"।

৮

চিরকাল ঘুমঘোর জড়াইয়া রাত্রির তিমির
আলোর কমলে
চাকিয়া ভাকিয়া যায় স্থিরীভূতে নিশির শিশির
ঘরে অশ্রুজলে
তবু আমি তব কবিপদ্মছবি রচে রচে যাই
বাসনা বাঁধনী,
দেহের বেতস প্রান্তে একান্তে অদেহী গাথা গাই
বেদনা পুলকি'।

১০

ক্ষণের পূজারী হয়ে স্মৃতি ভরে রূপমুগ্ধ কবি
রচি তব গাথা
বাসনা বিনাশ করি চিত্তে ভরি তব রূপচ্ছবি
সম্ভোগ-অতীতা
সৃষ্টির আনন্দ-পদ্মে লক্ষ অন্তর তুমি নারী
প্রেমাশ্রুতে জিয়ে
যে রূপ ধরন করে তার 'পরে ঢালো শান্তিবারি,
ধরিয়ো না নিয়ে।

ইংরেজ ভারত ছাড়িল কেন ?

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পিএচ্-ডি

১৯৪৭ সনের ১৫ই অগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইয়াছে। ছয়মাস পূর্ব্বেও কেহ কল্পনা করে নাই যে এত শীঘ্রই ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান হইবে এবং আমরা দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইব। ঘটনাপরম্পরা যে অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং মনে স্বতই প্রশ্ন ওঠে—কি কারণে ইহা সম্ভবপর হইল।

কেহ কেহ মনে করেন যে ইংরেজ জাতি স্বীয় ঔদার্য্য-গুণে এবং স্বাধীনতার প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি ও অনুরাগ-বশত স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষের উপর স্বীয় অধিকার ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বিগত শতাব্দীর ইংরেজের ইতিহাস এই ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ মুক্তকণ্ঠে এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং অদূর ভবিষ্যতেও যে এই দেশ স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা লাভ করিবে সে সম্ভাবনাও তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। ইহা কোন রাজনৈতিক দল বিশেষের মতামত নহে। উদার ও রক্ষণশীল উভয় দলের লোকই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রমিকদলের প্রধান ব্যক্তিগণও যে কেবল এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন তাহা নহে, কার্য্য দ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টবাদী, তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইলে জগতে ইংলণ্ডের প্রাধান্য ও প্রভুশক্তির এত হ্রাস হইবে যে ইহা প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। চার্চ্চিল কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে প্রতি পাঁচজন ইংরেজের মধ্যে একজনের জীবিকানির্ব্বাহ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করিতেছে। কথাটা খুবই খাঁটি। আর মুখে সব সময়ে স্বীকার না করিলেও ইংরেজ রাজপুরুষেরা যে প্রধানত এই কারণেই ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরেজদের যে আর্থিক অবস্থা ছিল এখন তাহা অপেক্ষা অনেক হীন হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের সম্পদ আগের চেয়ে এখন তাদের আরও বেশী প্রয়োজনীয়। এখন জগতে প্রাধান্য বজায় রাখা তো দূরের কথা, কেবলমাত্র জীবনধারণ করার জন্যই ইংলণ্ড পরমুখাপেক্ষী। সুতরাং এই বিষম সঙ্কটের কালে স্বেচ্ছায় ইংরেজরাজ ভারতবর্ষের বিপুল সম্পদভোগের লোভ ত্যাগ করিবে ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

অতএব ইহাই অধিকতর সম্ভব যে ইংরেজ বুঝিয়াছে—ভারতবর্ষে তাহাদের আধিপত্য করা আর সম্ভব নহে—এবং ইহা বুঝিয়াই সময় থাকিতে ঔদার্য্যের ভাণ করিয়া তাহারা ভারতবাসীর সহিত যথাসম্ভব সদ্ভাব বজায় রাখিবার জন্য তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা দিতে মনস্থ করিয়াছে। ভারতবর্ষে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজের আগ্রহও এই ধারণাই সমর্থন করে। ইহার মূলে হয়ত এই অভিসন্ধি আছে যে আপাতত এটুকু দিয়া যদি ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখা যায় তবে তাহাও মন্দের ভাল—কারণ অন্যথায় হয়ত এই দেশ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া সাম্রাজ্যের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন করিবে।

এইরূপ কোন মত গ্রহণ করিলে প্রথমেই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে সম্প্রতি এমন কি ঘটনা ঘটিয়াছে বা অবস্থার এমন কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে যাহাতে আর অধিককাল ভারতবর্ষ স্বীয় অধীনে রাখা ইংরেজ অসম্ভব মনে করিতে পারে। যখন বিগত যুদ্ধে ইংলণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তখনও যে ইংরেজের মনের ভাব এইরূপ ছিল না—ক্রিপস সাহেবের দৌত্যের নিষ্ফলতাই তাহার প্রমাণ। আজ ইংরেজ বিজয়ী, ফ্রান্স হতবল, পরমশত্রু জার্ম্মাণী ও জাপান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, এক রাশিয়া ভিন্ন আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই—ইউরোপের ইতিহাসে ইংরেজের পক্ষে এরূপ সুবিধাজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আর কোন দৃষ্টান্ত বড় একটা পাওয়া যায় না। আমেরিকা প্রবল হইলেও মিত্রশক্তি—সেদিকে কোন ভয় বা উদ্বেগের কারণ নাই। সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ যে সিদ্ধান্ত

করিয়াছে তাহার সহিত জগতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কোন সম্বন্ধ আছে এরূপ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই।

অতএব আমাদিগকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে ইংলণ্ডের ধারণা জন্মিয়াছে যে তাহার নিজের সামরিক শক্তি এত হ্রাস পাইয়াছে যে ভারতবর্ষকে দাবাইয়া রাখা তাহার সাধ্যের অতীত। যদি ইহাই সত্য হয় তবে কি কারণে ইংরেজের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল তাহাই আমাদের প্রধান বিচার্য্য বিষয়। বিগত যুদ্ধের ফলে ইংরেজের মোট সামরিক শক্তি হ্রাস পাইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব কোন সামরিক শক্তিই নাই। সমুদয় সৈন্যই ইংরাজের অধীন। সুতরাং ভারতবর্ষের দিক দিয়া দেখিলে ইংরেজ পূর্ব্বাপেক্ষা নিজেকে হীনবল মনে করিবে এরূপ কোন কারণ নাই। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ নীতিই এই দুর্ব্বলতার কারণ। কিন্তু ১৯৪২ সনের কংগ্রেস আন্দোলনের পরিণাম আলোচনা করিলে এ কথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে এতদিন ইংরেজ সামরিক শক্তি দ্বারা ভারতবর্ষ দমন করিতে সমর্থ বলিয়া নিজেকে মনে করে এতদিন এই সত্যাগ্রহের বা অন্য কোন আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। বিশেষত যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিরোধ উত্তরোত্তর যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা যে ইংরেজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার যথেষ্ট অনুকূল এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় একথাটা ইংরেজ খুব ভালরূপেই জানিত। সুতরাং নিজের সামরিক শক্তি ভারতবর্ষ দমন রাখিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত মনে করিলে ইংরেজ কেবলমাত্র কংগ্রেসের আন্দোলনের ভয়ে নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিবে—এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই।

সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজের সামরিক শক্তি আপাত-দৃষ্টিতে অক্ষুণ্ণ থাকিলেও কি কারণে ইংরেজ তাহা ভারত রক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট মনে করে নাই—অতঃপর আমাদিগকে তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। কারণ জড়-জগতের ন্যায় মনুষ্য সমাজের ঘটনাপ্রবাহ কোন সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা নিরূপিত হয় না, তবুও ইহার মূল সূত্রগুলি পদার্থবিজ্ঞার ন্যায় আমাদের অধিগত নহে। সুতরাং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। এই জন্যই এ বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা থাকে এবং ভবিষ্যতে নূতন কোন তথ্য বা ঘটনার কথা জানিতে পারিলে অনেক সময় পূর্ব্ব মতের পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ইতিহাসের এই মূল সূত্রটি মনে রাখিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হইব।

গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে যে সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে ইংরেজের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে —ভারতীয় সেনাদলের উপর আর নির্ভর করা চলে না। প্রথমত তাহাদের মধ্যেও স্বাধীনতামূলক মনোবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধভাবে ইংরেজ প্রভুর আদেশ মানিয়া তাহারা ভারতবর্ষ দমন রাখিতে বদ্ধপরিকর হইবে এরূপ আশা পোষণ করা যায় না। দ্বিতীয়ত জাপানের সহিত যুদ্ধে ইংরেজের যে নিদারুণ পরাজয় ঘটে তাহাতে এদেশে ইংরেজের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে যে একটা উচ্চ ধারণা ছিল তাহা প্রায় সমূলে নাশ হয়। ইংরেজ সংখ্যায় অল্প হইলেও এই সর্ব্ববাদীসম্মত প্রতিপত্তির জোরে এবং এদেশীয় সৈন্যের সাহায্যেই বিশাল ভারতবর্ষ শাসন করিত। যে মুহূর্ত্তে সে জানিতে পারিল যে সাম্রাজ্যের এই দুই স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না—ভারতে বৃটিশ শক্তির অবসানের আর বিলম্ব নাই। অবসান হইবে কি না এ প্রশ্নের আর অবসর নাই—এখন একমাত্র প্রশ্ন—কবে অবসান হইবে। ব্রিটিশ জাতি রাজনীতি বিষয়ে বিচক্ষণ। তাই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী জানিয়াই বিশ্বের দরবারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য তাহারা ঔদার্য্যের ও মৈত্রীর মুখোস পরিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে।

এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তাহা হইলে বঙ্গগৌরব সুভাষচন্দ্রের নিকট সমগ্র ভারত স্বাধীনতালাভের জন্য বিশেষভাবে ঋণী। কারণ সুভাষচন্দ্র যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন তাহাই ভারতে ইংরেজ সামরিক শক্তির মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করে। সুভাষচন্দ্রের অদ্ভুত

অধ্যবসায় ও কর্মশক্তি দ্বারা গঠিত এই সৈন্যদল মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য দৃঢ় পণ করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধে যে অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহাতেই ইংরেজ সর্বপ্রথমে বুঝিতে পারিল যে ভারতীয় সৈন্য দ্বারা ভারতবর্ষ দমন রাখিবার দিন অতীত হইয়াছে। আর দিল্লীর লাল কিল্লায় বিচার প্রহসনের ফলে যুদ্ধ বিশ্বিত ভারতবাসী যেদিন এই ফৌজের বিশদ বিবরণ জানিতে পারিল সেই দিনই ইংরেজের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি ধ্বংসের সূচনা হইল। একটি জনরব প্রচলিত আছে যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের "বিদ্রোহী" সৈন্যদিগের শাস্তি বিধান সম্বন্ধে ভারতের প্রধান সেনাপতি এ দেশীয় সামরিক কর্মচারীগণের মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতীয় সৈন্যদল একবাক্যে বিদ্রোহীদের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানায়—এবং এই প্রকার মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়াই ইংরেজরাজ আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে উদারনীতি অবলম্বন করে। এই জনরব সত্য না হইলেও একথা ঠিক—আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের ফলে ইংরেজ একথা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারে যে এ দেশীয় জনসাধারণ ও সৈন্যদল মনে মনে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধভাব পোষণ করে এবং যাহারা প্রকাশ্যে ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে, প্রত্যেক ভারতবাসীই তাহাদের কার্য্য অনুমোদন করে এবং প্রশংসার চক্ষে দেখে।

শীঘ্রই ইহার সমর্থনে আর একটিপ্রমাণও পাওয়া গেল। ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই, করাচী ও মাদ্রাজে ভারতীয় নাবিকগণ প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা ও নিষেধ সত্ত্বেও জনসাধারণ ইহার প্রতি সহানুভূতি জানায়। এই বিদ্রোহের কাহিনী সুপরিচিত, সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। কিন্তু এই ঘটনায় ভারতীয় নৌসৈন্যের যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে ইংরেজের সন্দেহমাত্র থাকে না যে তাহার বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি খসিয়া পড়িতেছে—সম্পূর্ণ ধ্বংসের আর বিলম্ব নাই। এই প্রসঙ্গে একটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী এই নৌবিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ঠিক পরদিন অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলি কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে ভারতের রাজনীতি সমাধানের জন্য ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে যাইতেছে।

কি কারণে ইংরেজ ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিলাম। ইহা যে একেবারে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত অথবা অবিসংবাদিত সত্য আমরা এমন কথা বলি না। তবে যে সমুদয় ঘটনা এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে তাহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। আমাদের স্বাধীনতা লাভে সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্ব যে কতখানি ভারতবাসী তাহা যথাযথ উপলব্ধি করে নাই এবং তাহার ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান ও গৌরব তাহাকে দান করে নাই। নিতান্ত দুঃখের সহিতই এ কথার উল্লেখ করিতে হয় যে দিল্লীতে ভারতীয় গণসভার স্বাধীনতা উদ্বোধনের জন্য ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে যে বিরাট অনুষ্ঠান হয় তাহাতে প্রধান প্রধান নেতাগণের উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষণের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই।

যদি কোনদিন দাসত্ব হইতে মুক্তির স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতে কোন মন্দির স্থাপিত হয় এবং তাহার মধ্যে এই স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষ যাহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণী তাহাদের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে যে তিনজনের মূর্ত্তি প্রথম পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য আমাদের মতে তাহাদের নাম—

১। মহাত্মা গান্ধী
২। আডলফ হিটলার
৩। সুভাষচন্দ্র বসু

হিটলারের সহিত যুদ্ধে অন্তঃসারশূন্য না হইলে ইংরেজ ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য ছাড়িবার কল্পনাও করিত না। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন না করিলে ১৯৪৭ সনে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইত না। মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব না হইলে আজ ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ক্ষেত্রই প্রস্তুত হইত না। হিটলার পরোক্ষভাবে যে মহদুপকার করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ভগবানের নিকট সুভাষচন্দ্রের আত্মার কল্যাণ এবং মহাত্মা গান্ধীর ৭৯তম জন্মদিনে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।

গুরুদেব

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল থেকেই হৈ হৈ, রৈ রৈ উৎসব আয়োজন লেগেছে রাজবাড়ীতে।

কতদিন পরে শ্যামসুন্দরের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গুরুদেব আসছেন তাঁর আশ্রম ছেড়ে। গত সাত বছরের মধ্যে তিনি তাঁর জপতপ ভজনপূজন শাস্ত্রাধ্যয়ন সেবাব্রত ফেলে কোন শিষ্যবাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে আসেন নি। রাজরাণীর কোন পুণ্যে বা কি গূঢ় কারণে আবার তিনি রাজবাড়ীতে আসতে রাজী হলেন তা কেউ জানে না। শুধু বুড়ো শিবু গোমস্তা মাথায় জোড়হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বলেছিল—সাক্ষাৎ মহাপুরুষ, একটা অঘটন না ঘটিয়ে যাবেন না, সেই যে দেবার এসেছিলেন রাণীমার কান্নাকাটিতে।

প্রাচীন বনিয়াদী জমিদার বংশ, যেমন ধর্ম্মাধাগৌরব তেমনি কুলকীর্ত্তি, ধনখ্যাতি। শাহান্ শাহ আকবর যে বাদশাহী পাঞ্জা দিয়ে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ রামনারায়ণ-রায়কে মহারাজা করেছিলেন, তা তাঁর ছবির সঙ্গে ঝুলছে বড় হলের সিঁড়িতে ওঠবার দেওয়ালে—আশেপাশে অন্য কীর্ত্তিমান পূর্ব্বপুরুষদের পুরাণো তসবীর, সনদ সার্টিফিকেটের ছড়াছড়ি; শাহ আলমের কড়চার সঙ্গে ক্লেমেন্সি ক্যানিংএর ধন্যবাদের চিঠিটাও আছে। দুশো বছর হেসে খেলে যাবে গরুতে একঘাটে জল খাইয়ে কেটে গেল, চঞ্চলার ধৈর্য্যচ্যুতি হবার উপক্রম। যাবার জন্য তাঁর রক্তজলকুঙ্কুমরাগ-রঞ্জিত পা দুখানা বাড়াতেই সূর্য্যনারায়ণের জমিদারী লাটের পর লাট কিস্তীর খেলাপে সূর্য্যাস্ত আইনের ঘুঘুর আস্তার নিলেমে ওঠে আর কি; কিন্তু শক্ত হাল ধরে তাঁর ছেলে কীর্ত্তিনারায়ণ নৌকো বানচাল হতে দিলেন না। কুঠিয়ালদের ভাগা-ভাগির বাবসা ও কোম্পানীর হৌলের বেনীয়ানী করে মা-লক্ষ্মীকে আর একবার তিনি সিন্দুকে পুরে চাবি দিলেন। এমনি তালাবন্ধ যে আরো একশো বছরের মধ্যে তিনি উস্‌খুস্ করেও বেরুতে পারলেন না। হঠাৎ একদিন শঙ্করনারায়ণ মদের বোঁকে সিন্দুকের ঢাকা খুলতেই সুযোগ বুঝে দেবী হলেন উধাও। কিন্তু পালাতে পারলেন না তিনি, চুপি চুপি ঘাটে গিয়ে দেখেন, নৌকো সব আটক, দূরদিগন্তে কোথায় লেগেছে রাম-রাবণের যুদ্ধ। এই সুযোগে শঙ্করনারায়ণের মদের প্যাকিং কেসগুলো কাদে লেগে গেল, সময় বুঝে কায়দা করে নৌকো বানিয়ে আবার তিনি মাঝদরিয়ায় পাড়ি জমিয়ে ফেরেন। সঙ্গে সঙ্গে চাষী-প্রজাদের বাড়তি ধানগুলো গিয়ে জমল জমিদারের বিরাট গোলায়, দালাল ফোড়েদের হাত গিয়ে ধরে উঠল কলকাতার বড় আড়তে। ধানাভাবে মা-লক্ষ্মীকে ফিরে আসতে হোল শঙ্করনারায়ণের সেফ্ ডিপসিট্ ভল্টে।

সাতমহলা বাড়ী, সেকেলের পক্কের, মার্বেলের পাঁচমহলার পাশে হাতি বাঁধা সিংদরজা, তারই পাশে উঠেছে একালের দুমহলা ষ্টীল্ কংক্রিট্, রং বেরংএর মোসেইক্ মরশুমী ফুলের মত রঙে রঙীণ্।

ও রাণী, ও শ্যামা, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নে মা তোরা।

যাই রাণীমা।

ষ্টেশনে মোটর গেছে?

হ্যাঁ, মা, দাদাবাবুকে নিয়ে মহারাজ নিজে গেলেন এইমাত্র, ফুলের মালাগুলো নিয়ে।

আঁ, দাদাবাবু গেছে—বলে তিনি শ্যামসুন্দরের মন্দিরের উদ্দেশে সকরুণ কাতরোক্তে প্রণাম করলেন—আজ-কালকার বিলেত-ফেরত ছেলেরা গুরুটুরু মানে না—ঠাকুর দেবতাতেও বিশ্বাস নেই, বলে—বোগাস্ রাবিশ! যদি গুরুদেবের অসম্মান হয়?

সতের বছর আগের কথা মনে পড়ে, তাঁর নারীজীবনের এক দুঃখাক্রান্ত রাতে গুরুদেব এনেছিলেন এক অমৃত সান্ত্বনা।

ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামল—লোকজন, আমলাকারদা বাজি বাজনা; কত রকমের সমারোহ—স্বয়ং মহারাজা তাঁর শঙ্করনারায়ণ অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবেন গুরুদেবকে। কলকাতায় ম্যানেজারের উপর হুকুম গেছে—ফাষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করে সঙ্গে নিয়ে আসতে। কোথায়

কী—জনকোলাহল হতে দূরে ভিড়েঠাসা থার্ডক্লাশের একটি ছোট্ট কামরা থেকে ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে নামলেন এক সাদাসিধে বৃদ্ধ—হাতে বাঁশের লাঠি, পরণে কটিবস্ত্র, মোটা বহির্বাস গায়ে, শিষ্যদের প্রসাদে ক্ষীর সর দুধ খাওয়া নবনীততুল্য তপ্তকাঞ্চন বর্ণ নয়, অসাধারণত্বের মধ্যে মুখে শুধু একটু নির্বাক্ প্রশান্ত হাসি, আর চোখের স্নিগ্ধ দীপ্তিতে অনির্বাণ করুণার ঝরণা। অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন শঙ্করনারায়ণ ও তাঁর ছেলে, মনে মনে বিশেষ ক্ষুণ্ণও হলেন। গুরুদেবের এসব কি কাণ্ডকারখানা। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে সে প্রণাম গ্রহণ করলেন না মোটেই—শুধু সেই অপার্থিব হাসি হেসে বল্লেন—কাকে প্রণাম করছো শঙ্কর—সত্যিকারের প্রণাম পাবার যোগ্য কে—মতানুগতিক ভাবে আশীর্ভাষণও করলেন না যে—ধনে পুত্রে আরো লক্ষ্মী লাভ হোক্। শুধু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লেন—আশীর্বাদ করি, তোমাদের কল্যাণ তোমরা নিজেই বোঝো।

ইন্দ্রনারায়ণ এযুগের ছেলে—আমেরিকা-রাঙ্গা ফেরত—দুটো বিশ্বতাণ্ডবের মাঝে মানুষ—কত ইজমের বুকনী দিতে জানে, ভাবলে—এও আর এক রকমের ভণ্ডামী।

চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে পুষ্পমাল্য শোভিত বড় গাড়ী দেখে গুরু হেসে বল্লেন—কতটুকুই বা পথ, হেঁটেই যাই। রাস্তায় নেমে চমকে ওঠেন—কোথায় সেই উন্মুক্ত দিগন্তপ্রসারিত হেমন্ত লক্ষ্মীর পাদপীঠ, ধানের সোনায় ঝলমল! মনে হোল, ধুলোয়, ধোঁয়ায়, কুয়াশায় সন্ধ্যাসবেলার মহিমা যেন এক অজানা মলিনতায় আচ্ছন্ন।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন—ওগুলো কি শঙ্কর?

বাপ্ উত্তর দেবার আগেই ছেলে ইন্দ্রনারায়ণ একটু বিজ্ঞ ভঙ্গীতেই উত্তর দেয়—ঐগুলিই ত আমাদের নতুন মিল।

আর এগুলো।

অবজ্ঞার হাসি হেসে ইন্দ্র উত্তর দেয়—ওগুলো ছোট-লোকের বস্তী, মেথর ডোমপাড়া।

গুরুদেবের মুখে একটু ম্লান করুণ হাসি ফুটে ওঠে, দৃষ্টি হয় উদাস গম্ভীর।

তাড়াতাড়ি শঙ্করনারায়ণ বলেন—ঐ যে বড়ো দিঘীর ধারে নতুন বাড়ীটা, ঐটেই হাসপাতাল মায়ের নামে, দশহাজার টাকা খরচ পড়েছে।

গুরুদেব চুপ করে গেলেন—মাতৃঋণ শোধ? হবেও বা—

ছেলে পাল্টা জবাব দিয়ে যায়—পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমাদের নফরখানায় দিন খেতো পাঁচ হাজারের ওপর।

সারাদিন রাজবাড়ীতে উৎসবের উন্মত্ত স্রোত বয়ে গেল। যাকে নিয়ে এত কলরব সেই ছোট মানুষটি কিন্তু এসেই চুপচাপ। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর মহারাণী পাদ্যঅর্ঘ্য দিতে এলে গুরু তাঁকে বল্লেন—তোমায় আশীর্বাদ করি মা, সতীকুলরাণী তুমি—কিন্তু মনটা বড়ই বিচলিত হয়ে আছে, শ্যামসুন্দরের মন্দিরেই আজ সারাদিনটা কাটাব স্থির করেছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস্ করতে চাই—সত্যিই কি তুমি দরিদ্রের নারায়ণ?

খাওয়া-দাওয়া, বাবা?

সন্ধ্যের পর নিবেদন করে প্রসাদ পাব—স্বপাক্ হবিষ্যান্নের দুটি আয়োজন করো—এক ব্যঞ্জন ও ভাত।

সে কী গুরুদেব?

যে দেশে ত্রিশ লক্ষ লোক না খেয়ে মরে, সে দেশে বিনাশ্রমে অর্জ্জন না করে অন্ন মুখে তুলব কোন্ লজ্জায় মা? শুধু প্রাণধারণ শরীরের ধর্ম্ম, তাই যতটুকু না করলে অপরাধ হয় ততটুকু—

এত আড়ম্বর, এত আয়োজন, এত রন্ধন, সব মিথ্যার সবই কি বৃথায় যাবে! মহারাণীর কান্না আসে।

সন্ধ্যের পর সুবিস্তৃত আলোকোজ্জ্বল নাটমন্দিরে বসল শ্রোতাদের আসর, থরের মুংএর জাজিমের ওপর ধবধবে সির্জাপুরী গালচে পাতা—গুরুদেব স্বয়ং আজ কথকতা করবেন। সেকেলের হাজার বাতি কাঁচের সঙ্গে একালের বিজলী বাতির রোশনাই ঝম্‌ঝম্ করছে। কাতারে কাতারে পঞ্চগ্রাম থেকে লোক এসেছে, কত ছেলে, কত মেয়ে—সিদ্ধপুরুষ পরম বৈষ্ণবের কথা শুনবে। অভিজাত অতিথি অভ্যাগত নিমন্ত্রিতেরা ত আছেনই। স্বয়ং মহারাজ শঙ্করনারায়ণ যোড়হস্তে আপ্যায়ন্ করছেন—বহু-মূল্য কৌষ্য কাবার বস্ত্র পরিধানে—গলায় ঝুলছে বড় মতির মালা—সেকালের নবাবী আমলের প্রসাদ। ছেলে ইন্দ্র-নারায়ণও সপারিষদ বসেছে অনেকটা মজা দেখতে।

শ্যামসুন্দরের সান্ধ্য আরতি করলেন্ গুরুদেব নিজে।

সমাহিত বিভোর হয়ে। সুললিত স্তোত্র পাঠের মাঝে পক্ষ-প্রদীপ ভাস্বর হয়ে উঠল সুঠাম অঙ্গচালনায়। কী অপূর্ব দীপ্ত ভঙ্গী, কী অপরূপ রসরচনা। বাইরে ছায়া নটে বাজছে ঠাক্কি-রহো মেয়ে আঁখনকে আগে। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ মূর্ত হয়ে উঠলেন চিরকালের প্রেমের ঠাকুর, মহাভাবের আবির্ভাবে। চতুর্দিকে ধূপ ধুনো ধোঁয়ার মধ্যে প্রাণময় বাষ্পের হোল এক বজ্র-সম্ভব মূর্তি—রামনাম মণিদীপ জ্বালিয়ে এক অনুভূত উদ্বোধনায় বিবশ।

তারপর আরম্ভ হোল আলাপ—মহাপুরুষ আরম্ভ করলেন—কবে কোন শারদোৎফুল্ল রজনীতে যোগমায়া উপাশ্রিত হয়ে চির রাসরসিকের অনুভবে এসেছিল প্রেম-বৃন্দাবনে—সে আসার বিরাম নেই—অনুক্ষণ সেই লীলা করে গৌর রায়। প্রতি মুহূর্তেই তিনি আসছেন, প্রতি ক্ষণে, প্রতিটি অণুতে, স্পন্দনে কম্পনে তাঁরি বাঁশি বাজছে। জড়চেতন জগজ্জীবন সকলই রাসময়—কোথায় সে নব-দুর্বাদল শ্যাম, রঘুপতি রাঘব রাজারাম। অহল্যা কেন পাষাণী হোল—জন্মতো শবরী আজও তার প্রতীক্ষায়—কোথায় সে ধ্রুব, কোথায় উত্তানপাদ—কি স্নেহ নিয়েই মহারাজ ভরত পালন করেছিলেন মৃগ শিশুকে। শুরু শোনালেন হরিশ্চন্দ্রের কথা, দধীচি শিবের কথা, মহাবীর কর্ণের প্রাণারাম উক্তি—দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্—কোন বংশে, কোন বাপের ঔরসে কোন মায়ের কোলে কে কোথায় জন্মগ্রহণ করে, সেটা দৈবাধীন; কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব, বীর্যপৌরুষ নিজের আয়ত্তে—অর্জন করতে হয় নিজেকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল সবাই, কি আবেগ, কি শ্রদ্ধা, কি দরদ নিয়েই এই সত্যসন্ধী মানুষটি নিত্যকালের শাশ্বত কথাগুলি শোনাচ্ছেন—যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে কানে।

সব শেষে তিনি আরম্ভ করলেন রন্তিদেবের কাহিনী—কোথায় সে প্রাণচঞ্চল মহারাজ—সমদুঃখসুখক্ষমী—কুবেরের ভাণ্ডার বিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন তিনি। এত ঐশ্বর্য, এত ধন—অথচ অন্ন নেই, আহার্য নেই, আশ্রয় নেই, সংস্থান নেই—আটচল্লিশ দিন নিরম্বু উপবাস। সামান্য কিছু আহার্য জোগাড় করে বসবেন তিনি আহারে—এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ। অতিথিদেবো ভব—বরণ করে তিনি হাসিমুখে দিয়ে দিলেন তাঁর খাবারের প্রায় সবটুকু জোর করে। যেটুকু খুঁদকুড়ো অবশিষ্ট রইল তাই দিয়েই পারণ শেষ করবেন ভাবছেন, এমন সময় সামনে এলো এক দীনহীন শূদ্র অন্ন ভিখারী—ক্ষুধার্ত আমি মহারাজ। প্রসন্ন মনে শ্রদ্ধার সহিত তিনি দিলেন তাকে বাকী আহার্যের অংশ। তারপর এলো এক দুর্ধান্ত চণ্ডাল, সঙ্গে কুকুরের দল—তারাও বাদ গেল না—পরিতুষ্ট হয়ে চলে গেল। প্রাণ যায়—তবু শুষ্ক, একটু জল মুখে দিয়ে কোন রকমে প্রাণধারণ করবেন মনে করছেন—এমন সময় এলো এক অতি অন্ত্যজ চণ্ডালের ব্যক্তি—তৃষ্ণার্ত আমি মহারাজ। নাও বন্ধু বলে কোষ-সঞ্চিত তৃষ্ণার জলটুকুও সাদরে তিনি দিলেন সমাদর করে। স্বর্গ তিনি চাননি, মুক্তি তিনি চাননি, ঐশ্বর্য নয়, সিদ্ধি নয়, শুধু এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে, অভাব অনশনের দিনে চেয়েছিলেন দুঃখের মুখে একটু ক্ষুধার অন্ন, এক গণ্ডুষ তৃষ্ণার জল দেবার অধিকার, চেয়েছিলেন জন্মজন্মান্তরে বারে বারে এই শ্যামলা মাটিতে আসতে—দুস্থ ভগবানের, দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য। কোথায় সে রাজাধিরাজ, আবার তুমি এলো এই দুর্গত দেশে, সেবার দিব্য আত্মার পরশ নিয়ে।

চঞ্চল হয়ে উঠল জনমণ্ডলী, শঙ্করনারায়ণ উসখুস্ করতে লাগলেন—চালের কারখানে চোরাগলির ছায়াগুলো চোখের সামনে অবস্তির কালো পর্দার মত ভেসে বেড়াতে লাগল। ইন্দ্রনারায়ণেরও রক্ত তপ্ত—কি সব রাবিশ প্রোলেটারিয়েট তোলাবার বেশ মজাদার আফিংএর মৌজই বের করেছিল ক্যাসিষ্ট ব্রাহ্মণরা।

আপনভোলা নিরভিমান তপস্বীর কণ্ঠবীণায় করুণ সুর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে লাগল সেই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে। সার্থক হয়নি দিনের বেলার আলো, ব্যর্থ হয়েছে সন্ধ্যাশঙ্খের প্রদীপ দেওয়া, রাত্রের শুদ্ধতাও বুঝি ব্যর্থ হয়। হে ঠাকুর, দিনে রাতে মায়ার দেহনে ঘুরছে, ছায়াকে পেয়েছে, কোথায় তুমি অমল সুন্দর। 'পথ জানিনে, আলো নেই, ভিতর বাহির কালোয় কালো, শুধু তোমার চরণ স্মরণ করে চলেছে। তুমি এলো প্রেমময়, যেমন করে ধরা দিয়েছিলে মীরার কাছে—মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, চরণকমল বলিহার রে—হে পীতম্ প্রিয়। প্রিয়তম তোমার

চরণকমল বুকের মাঝে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস্—সত্তর তুমি অন্তরঙ্গের বেশেই এসো, তাও সহ্য হবে।

ঝরঝর করে জল গড়িয়ে গেল দুচোখ বেয়ে। সম্‌সম্ করতে লাগল আদর—নিশুদ্ধ নাটমন্দির।

অনেক দূরে ছোঁওয়া বাঁচিয়ে—শীতের হিমেল হাওয়ায় গুটিসুটি মেরে বসেছিল একদল মেয়ে আর ছেলে, ঠাকুর দেখতে আর ঠাকুর মশায়ের কথা শুনতে, অবাধা হরিজনের দল—ডোম মেথর চাঁড়াল গঙ্গাপুত্রেরা। তাদেরই ভিতর একজন বিগতযৌবনা মেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। সমস্ত কালপাত্র ভুলে চেঁচিয়ে বলে—সত্যি বলছ ঠাকুর—সত্যি।

প্রকাণ্ড এক ধমক্ দিলেন শঙ্করনারায়ণ—নিকালো দিঁয়াসে, এই সব ছোটলোকেদের এখানে আসতে দিলে কে? অশুচিদের নিয়ে কোন শুভ কাজ হয়? যত সব অলুক্ষণে কাণ্ড।

দরোয়ান নায়েব মোসাহেব ছুটে গেল হুঙ্কার করে লাঠি নিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে সেই মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল তার ঘরবর। হীরু বাগ্দীর মেয়ে রঙ্গী ও—লোকে বলে স্বভাব চরিত্তির ভালো নয়।

গুরুদেব নির্বাক্, উঠে দাঁড়ালেন, সরে গেল স্তব্ধ জনতা, কথার মোহ গেছে ভেঙে, কেটে গেছে তাল—তিনি গিয়ে ঢুকলেন ঠাকুর ঘরে। এত বড় জনতার মধ্যে একটি হীন হরিজন মেয়ের বুকে গিয়ে লেগেছে তাঁর কথা—এত বড় সম্মান—এই করেছো ভালো ঠাকুর। সমাজ, আচার, বিচার তাঁকে রেখেছে নীচে।

সারারাত অশান্ত মন নিয়ে সকাল বেলা গুরু চলেছেন স্নানে। আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসছে কালোর রেখা—সপ্তাশ্ব বাহিত সবিতার নবোজ্জ্বল দীপ্তি আকাশের দিগন্তরে দোদুল। অবাকুসুমসংকাশ সূর্য্যোদয়ের দিকে চেয়ে গুরু মনে মনে বলেন—স্নানে যে গ্লানি গেলনা প্রভু, অন্তরে বাহিরে অশুচি—নিয়ে এসো তোমার বিশ্বপাবনধারা, হে সবিতা তোমার কল্যাণতমরূপ।

শ্মশানের ধারে নদীর কোলে তিনি বসে পড়লেন হতাশ হয়ে, সামনে জ্বলছে চিতা—অনৎপাদক জ্বাল জ্বালাতিভাস্বৎ। হঠাৎ চোখে পড়ল পাশে দাঁড়িয়ে একটি নীচ জাতের মেয়ে—ধরবিগলিত ধারা চোখে, তার কোলের ছেলেকে তুলে দিয়েছে আগুনের রাঙা কোলে। অকাল অনন মৃত্যুর দুয়ারে—ক্ষুৎক্ষীণা কোটরাক্ষী, মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী রমণী। চমকে উঠলেন গুরুদেব—সন্দেহ মিটে গেল তাঁর।

শান্ত পদক্ষেপে তিনি এগুলেন, সকাল বেলার আলোয় দিগন্তর। পেছনে পড়ে রইল উৎসবমুখরিত রাজবাড়ী, দূরে নহবতের ইমন্ ভূপালীর তান্। সোজা ডোমপাড়ার ভিতর দিয়ে ঢুকলেন অপাংক্তেয়দের বস্তীতে—শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফালি বকুল বিছানো পথ সে নয়, আঁস্তাকুড় দুর্গন্ধ আবর্জনার নরকের মধ্য দিয়ে।

রঙ্গী তখন তাদের কুঁড়ের আঙিনাটা ঝাঁট দিচ্ছিল—সামনে ধুলোয় বসে একটা হৃষ্টপুষ্ট কালোকোলো ছেলে, তৃপ্ত মনে খেলা করছে একটা ছাগলের সঙ্গে—সামনে থোড় থোড় করছে এক পাল শূয়োর। গাঁয়ে সেবার যখন কলেরার অনুগ্রহ লেগেছিল তখন বাপ মা দুজনেই ছুটি পেলে বৈতরণীর ধারে, কচি ছেলেটাকে এনে সুদ্ধ করে তুলেছিল রঙ্গী, কারুর কথা না শুনে।

সন্তস্নাত শুচিস্নাত গুরুদেবকে দেখে সে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। আরো অবাক্ তাঁর অদ্ভুত কথা শুনে—বোল কি?—তোমার কুঁড়েতে থাকতে দেবে মা কয়েকদিন? এই দাওয়ার একটা চাটাই আর চারপাই হলেই চলে যাবে—ছেলেটাকে তিনি কোলে তুলে নেন্—আদর করেন।

কি হয়েছে যে রঙ্গী—বলে ধীরু বেরিয়ে আসে, রাতের জমাটী নেশাটা সবে কেটেছে।

তারপর হড়োহুড়ি ছুটোছুটি লেগে যায়—ডোমপাড়া মেথরপাড়া সরগরম হয়ে ওঠে।

খবর পৌঁছয় মহারাজের কাছে। উত্তেজিত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি হুকুম দেন্ বরকন্দাজদের—সমস্ত ডোমপাড়া জেঁটে চুরমার করে গুরুদেবকে ধরে নিয়ে এসে বেদে তুলে দিতে—মাথা হেঁট হয়ে গেল তাঁর, তাঁরই গুরুদেব কিনা ছোটলোক চাঁড়ালের ঘরে, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে।

ছেলে ইন্দ্রনারায়ণ বলে—রাবিশ, বোগাস্।

মহারাণী শুনে অতন্ত আপত্তায় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন।

শান্ত সংযত মহাপুরুষ, মুখে সেই মন-মাতানো হাসি, অশুচি খাটিয়ার বসে তাঁদের শোনাচ্ছেন তুলসীদাসের সোজা কথা—

"বন্ধ উ সন্ত সমানচিত হিত অনহিত নহি কোই
অঞ্জলিগত শুভ সুমন জিমি সম সুগন্ধ কর দোই।"

মোঘল রাজকুমারী *

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

"বহুদূরে স্রোতপ আমার সমাধির আস্তরণ ক'রো না,
এই সবুজ তৃণগুচ্ছই অধমবিতার সমাধির আবরণ হোক।"

ইতি, দুখী কিস্‌তি পিতা, সাহজাহান দুহিতা জাহানারা,
কণভঙ্গুর জাহানারা, বিনীতা জাহানারা,
জিলকাদা ১০৩২ হিজ্‌রী (১৬৮০ খৃঃ অব্দ, জুলাই)

ওগো মরণ! তুমি মানুষের রূপ পরিগ্রহ ক'রে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার প্রাণহীন আঁখি নিয়ে আমার সম্মুখে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ ক'রছ! তোমার শীতল নিঃশ্বাস আমার মুখমণ্ডলকে শীতলতর ক'রে দিচ্ছে,—সঙ্গে সঙ্গে আমার শেষ আশা বিলীন হ'য়ে আসছে, ধারায় ছিন্ন পিন্ন তুলিতে লুটিয়ে পড়ছে। পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড পিতা শাহজাহানের নিকট প্রেরিত হয়েছে। তারপর কারাগারে সেই মুণ্ড আমার নিকট এসেছে। দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থান, তোমার নাম বাঁশীর সুরে করতালের কলরোলে একদিন পৃথিবীতে ধ্বনিত হয়েছিল। যে রক্তধারায় তোমার পুণ্যভূমি পরিধৌত হয়েছিল—তা তোমাকে খণ্ডিত দেহ করেছে, তোমাকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করতে পারে নি। কেন পারে নি বলত? আমার সুকোমল কেশদাম আমি ছিন্ন ক'রে ফেলেছি, আমার কণ্ঠ থেকে মণিমালা ছিন্ন করে দিলাম—কিন্তু কই? উত্তর ত পেলাম না।

আধার নয়নের সম্মুখে অন্ধকার নেমে আসছে, আমি আমার অন্তরকে প্রশ্ন করেছি—আমি অতীতের দিকে চেয়ে দেখেছি। আমি কোন উত্তর পাই নি।

আমি দেখছি সৈন্যের স্রোত একটীর পর একটী ঝঞ্ঝার বুকে উর্ম্মিমালার মত ভারতের প্রান্তর পর্ব্বত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই ঝঞ্ঝা সমস্ত দেশকে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে, দেশের যুগ যুগ সঞ্চিত ধনরত্ন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর একদিন শান্তি এসেছিল। দেবতার আশীষের মত প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল ভারতের পুণ্যভূমিতে। তারপর আবার ঝঞ্ঝা এসেছে—সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যের অবিশ্রান্ত পদধ্বনি আর অবিরাম রক্তস্রোত। যমুনা হয়ে চলেছে আগ্রাদুর্গের শিলাতল পরিধৌত করে সেই রক্ত-স্রোত পরিণত হ'ল রক্তস্রোতে। যুগ যুগ সঞ্চিত রক্তস্রোত বয়ে চলেছে সমুদ্রের পানে—সমুদ্র-জলরাশি রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। রক্তরাগরঞ্জিত ঊর্ম্মিমালা ঊর্দ্ধে আকাশে তাদের বিরুদ্ধে আস্ফালন ক'রছে। নীলমেঘপুঞ্জ আমার মাথার উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই মেঘ বন্যজন্তু আর জলধারায় সমস্ত গ্লানিমা নিঃশেষ করে নিয়েছে। বর্ষণমুখর মেঘ রক্ত মোক্ষণ ক'রছে।

এখনো এক বৎসর অতীত হয়নি আমরা আগ্রার দুর্গে বন্দি হয়েছি। সে দিন যুবরাজ দারা আওরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হল। আমি আজও দেখতে পাচ্ছি—এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সুবর্ণমণ্ডিত প্রকাণ্ড এক সরীসৃপের মত ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অতিক্রম ক'রে চলেছে দিক্‌চক্রবালের দিকে। আমি সহস্র সহস্র গজ উষ্ট্র অশ্বের পদধ্বনি আজও শুনতে পাচ্ছি। রাজসূতের উচ্ছল বর্ণাবাহিনী পরিবৃত হয়ে যুবরাজ দারা তার প্রিয় হস্তী ফতেজঙ্গের (১) উপর সমাসীন—আলোকস্তম্ভের মত সৈন্যরাজির মধ্যস্থলে যুবরাজ দারা সুকো সমস্ত মানবের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

উঃ! যুবরাজ দারার পরাজয়ের দুঃসংবাদ আগ্রার দুর্গে প্রচারিত হ'ল, আমি আকুল ক্রন্দন ক'রলাম, কেবল ক্রন্দন। কি ভীষণ দুর্ভাগ্য আমার ভ্রাতার। আমি তার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করতে পারিনি। যুবরাজ দারা! তোমার প্রাণে ছিল অপূর্ব্ব মহিমা, তোমার অন্তরে ধ্বনিত হ'ত সম্রাট আকবরের বিজয় যাত্রার পদধ্বনি, একই ভগবান যেমন জগতের ভাগ্যবিধাতা, তেমনি একই বিধান সমগ্র সাম্রাজ্যের নিয়ন্তা। যুবরাজ দারা! তোমার ছিল দুর্ব্বলতা, তোমার ছিল অহঙ্কার। তারাই রচনা ক'রল তোমার পতন। তোমার বিরুদ্ধ দলের ছিল শক্তি, আওরংজেবের ছিল কৌশল।

তোমাকে আমি ঘৃণা করি, হে দলরাজ আওরংজেব। তোমাকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি। তোমার প্রতিভা যেমন তীব্র, তোমার হৃদয় তেমনি কঠিন। তোমার একমাত্র চিন্তা তুমি হ'বে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট, তুমি হ'বে মানুষের দেবতার দুইয়েরই অধীশ্বর। তোমার নয়নে ভাসছে অপূর্ব্ব সস্মিত হাসি, আর তোমার পদতলে দলিত হ'চ্ছে—

---

* এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আগ্রাপ্রাসাদের—জেসমিন প্রাসাদের (শাহান বুরজ) ওয়মর্ম্মর শিলাতলে আবিষ্কৃত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিখানি অসম্পূর্ণ। খণ্ডিত অংশগুলিকে একত্রিত করে মুসাবিক পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীতে পরিবর্ত্তিত করা হয়েছে। সেই কৃতিত্ব মার্কিণ মহিলা আন্‌ড্রিয়া মুডেনস্‌মের। আগ্রার অসহায়া রাজকুমারী—ভ্রাতার মৃত্যু, পিতার কারাজীবন ও মোঘলসাম্রাজ্যের ধ্বংসের মৃত্যুর সাক্ষী জাহানারার করুণকাহিনী মোঘল-যুগের অপূর্ব্ব-সম্পদ। এই বাহিনীতে আছে সৌন্দর্য্য বিভীষিকার অপরূপ সমন্বয়।

(১) মোঘল সম্রাটগণের হস্তী ও অশ্ব প্রীতি অসীম, প্রত্যেকটী রাজকীয় হস্তীর নামকরণ করা হত। "হস্তী যুদ্ধ" সম্রাট পরিবারের একাধিকার ছিল, হস্তী রাজোপহারের অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। পরাজিত শত্রুর সম্পদের মধ্যে হস্তী অন্যতম সম্রাটের প্রাপ্য ছিল। আকবরের হস্তীর নাম ছিল ফিল্‌-ই-ইমাদি। জাহাঙ্গীরের হস্তীর নাম মুক্ত-ই-ফিল্‌, শাহজাহানের হস্তী ছিল ফতেজঙ্গ—"যুদ্ধ বিজয়ী।"

তোমার বিরুদ্ধাচারী শত্রু। মনে পড়ে তোমার? মৈলদে সেই পরিব্রাজকের ভবিষ্যৎ বাণী? (২)

আমার শুনছি—অন্ধ রাজের পরাজয়, কিন্তু এবার সৈন্যদল অতি ক্ষুদ্র। তারা প্রত্যাবর্তন করছে দিল্লীর পথে—প্রত্যাহত, পরাজিত বিপর্যস্ত দারা। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুগণ দারাকে পরাস্ত করে নি, শত্রুর অস্ত্র ছিল ষড়যন্ত্র কৌশল। যে যুবরাজ দারা এক বৎসর পূর্বেও পিতার পার্শ্বে স্বর্ণ সিংহাসন অলংকৃত ক'রত, সে চলেছে দিল্লীর রাজ পথে আবরণহীন অনাবৃত রুগ্ন হস্তী পৃষ্ঠে নিরাভরণ দারা, ছিন্নবস্ত্রপরিহিত দারা, "দারাপি হীনতম" পৃথ্বীবল্লভ দারা। প্রজাকুল এই দৃশ্যে বিচলিত, পুরবাসী আওরংজেবকে অন্তরে অভিশাপ দিচ্ছে, পুরমহিলারা অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অশ্রুসিক্ত; কিন্তু সাহস নেই যে স্পষ্ট প্রতিবাদ করে। আমি আগ্রার দুর্গে এক বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে মৃদু আলোক শিখার পার্শ্বে বসে কম্পিত হস্তে লিখছি আমার এই আত্মকাহিনী, কিন্তু আমার অন্তরের গোপন কথা আমি গোপনই রাখছি। যদি তাই না করি, তবে আমি জীবনধারণ করব কি করে? আমি যে নারীমাত্র। কিন্তু এইখানে এই নির্জন রাত্রিতে আমি আমার দুঃখের সঙ্গীত বিশ্বস্তিকে দিয়ে যাব, আমি বিস্মৃতির কাছে গচ্ছিত রেখে যাব আমার জীবনের দুঃখ আর গাথা।

আমার প্রিয় ছিল আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে দারা, আমি তার অনুরক্ত ভক্তি ছিলাম। দারার অভিপ্রায় ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ সম্রাট আকবরের স্বপ্ন সফল ক'রে তুলবে, শাশ্বত হয়ে থাকুক সেই শাশ্বত পুরুষের শাশ্বত প্রয়াস। অন্ধকার গহ্বরে সুপ্তপ্রায় ভারতের মন রুদ্ধ সম্রাট আকবরকে প্রবুদ্ধ করতে পারে নি, অযুত যুগ ধরে মানুষ যে চিন্তা করেছিল, যে সত্য উপলব্ধি করেছিল, সম্রাট আকবর সেই প্রবুদ্ধ মন উদ্ধারের প্রয়াস করেছিলেন। সম্রাট স্বপ্ন দেখেছিলেন—ভারত তার অতীত আত্মার সন্ধানে ফিরে যাচ্ছে, ভারত যেন কোন বিদেশীর ক্রীতদাসী না হয়ে—ভারত তার আত্মার সৌন্দর্যগৌরবে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে উঠবে—সৌন্দর্য একদিন ভারতকে ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।

যমুনার অপর তীরে ফুটে উঠেছে তাজমহল—পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে তার ফুটে উঠেছে যেন শুভ্র হীরক খণ্ড—মৃত্যু-পরীর পাখার মতন শুভ্র নমুজল। সমাধি পরিবৃতা মাতা তাজবিবির কানে কানে মৃত্যু গুঞ্জন ধ্বনিত হ'ত কোরাণের পুণ্যবাণী (৩)। আজ আর তাজবিবির কর্ণে প্রবেশ করে না সেই সঙ্গীত। মাতার সমাধি পার্শ্বে প্রোথিত হয়েছে দারার রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড। আজ যমুনার অস্থি খণ্ড লাগছে এক ভিন্নের কম্পন—তার কি আজ তার চির নিদ্রার মাঝে ভাবছে—আমার পুত্রের মুণ্ড যে দিন স্কন্ধচ্যুত হয়েছিল, সেই দিনই পৃথিবীতে একটা বিরাট আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল?

"ঐ দেখ সূর্য উঠছে তাজমহলের শুভ্র মিনারের অপর পার্শ্বে—তাজ আর শুভ্র হীরক খণ্ড নয়, এক বিরাট রক্তবিন্দু মাত্র।

আওরংজেব! তোমাকে অভিসম্পাত করি, ভাগ্যহীন দারাকে তুমি পথ দলিত ক'রছে, তুমি তাকে নিরীশ্বর অপবাদ দিয়ে হত্যা করেছ (৪)।

আওরংজেব! তুমি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ ও ভ্রাতুষ্পুত্রের গোয়ালিয়র দুর্গে পত্নীর (আফিংয়ের) বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছ (৫)—আমাকে সে বিষ দিলে না কেন? তা হ'লে আমার, অনুভূতি লুপ্ত হ'য়ে যেত, আমার চিত্ত বৈরাগ্যের গভীরতা অনুভব করতে পা'রত না, আমি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতাম।

আজ রজনীতেও আমি বেঁচে আছি—আমি চিন্তা ক'রতে পারছি, আমি নীরব অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তোমাকে আমার বার্তা প্রেরণ করছি, মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম ক'রে আমার বার্তা তোমার নিকট পৌঁছবে। আমার নিশ্চিত এক গুপ্ত শক্তি আমার ইন্দ্রিয় গ্রামকে আচ্ছন্ন করেছে……

যমুনার ছায়ারাশি বাটির উপরে ফেলে আসছে, তুমি বোধ হয় দেখতে পাচ্ছ না, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, ঐ যে কালো ছায়া মূর্তি কৃষ্ণ পৃষ্ঠ শুভ্র দেহ—হঠাৎ সেই ছায়া মূর্তিগুলি এক সঙ্গে আকাশে উড়ছে, ঐ যে তারা মেঘে রূপান্তরিত হচ্ছে। তারপর ঝড়া, ঐ দেখ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অগ্নির লেলিহমান শিখা উঠছে, সবস্ব সাম্রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাবে। কৃষ্ণ পৃষ্ঠ থেকে তোমার মুখল মনে পড়বে। জীবন ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সম্রাট আকবরের স্বপ্ন—তৈমুর বংশের হস্তাধীনে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন-বিলীন হ'য়ে যাবে।

---

(২) কথিত আছে যে একজন পরিব্রাজক মোঘলরাজবাশধরদের হস্ত পরীক্ষা করে সমস্ত রাজকুমারদের ভবিষ্যৎ বলেছিলেন, আওরংজেবকে বলেছিলেন—তুমি হবে তিমুরবংশের বিনাশকর্তা। মোঘল রাজগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র ও সামুদ্রিক বিদ্যায় বিশ্বাস করতেন। এমন কি যুদ্ধযাত্রার পূর্বে নক্ষত্রের গতির উপর সৈন্যচালনা নির্ভর করতেন। রাজবংশের সমস্ত সন্তানের জন্মকুণ্ডলী ও কোষ্ঠি তৈরী করা হ'ত।

(৩) অভিজাত মুসলিম পরিবারে সমাধির পার্শ্বে কোরাণ আবৃত্তি করার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়। দূর হতে সমাধিতে কোরাণের আবৃত্তি শুনলে দূর থেকে সঙ্গীত মনে হয়।

(৪) পরাজিত দারা-সুকোর "নিরীশ্বরবাদী" অপবাদে বিচার করা হয়, মুসলিম রীতি অনুসারে নিরীশ্বরবাদীর মৃত্যু দণ্ডের বহু বিবরণ আছে, কিন্তু সে দণ্ডের বৈধতা সম্বন্ধে মত ভেদ আছে, যারা যথার্থ ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৫) মোঘল যুগে রাজবংশের সন্তানদের রাজদ্রোহিতার অপরাধে প্রায়ই গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করা হ'ত। গোয়ালিয়র দুর্গ অনেকটা ইংলণ্ডের টাওয়ার অব লণ্ডন অথবা ফরাসীদেশের বেস্টিল দুর্গের মত। মোঘল রাজবংশের সন্তানদের অনেক সময়ে হত্যা না ক'রে স্বল্প মাত্রায় আফিংয়ের জল পান করে দেওয়া হ'ত। ক্রমশঃ পত্নীর বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তার বুদ্ধি ভ্রংশ ক'রে দিত, অনুভূতি লুপ্ত হ'য়ে যেত। পত্নীর বিষে জর্জরিত মানুষের জীবন মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টদায়ক। তুর্ক জাতির মধ্যেও এই পত্নীর বিষ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তুরস্কে ওসমানলী বংশে প্রথা প্রচলিত ছিল—রাজকুলের কোন আত্মীয় নেই, একাধিক ভ্রাতার জন্য রাজকুলে অমঙ্গল ফল বিবেচিত হ'ত।

আওরংজেব। আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি—যে শক্তিমান, তুমি ভগবানকে ভয় কর, তাঁকে ভালবাস না। তোমাকেও মানুষ ভয় ক'রবে, ভালবাসবে না; যখন সম্রাট আকবর একখণ্ড তাম্রমুদ্রা দান ক'রতেন, সে মুদ্রা স্বর্ণ-খণ্ডে পরিণত হ'য়ে যেত, কিন্তু তুমি যা' দান কর, তা' কণ্টকে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠে। সম্রাট আকবর হিন্দুদের প্রধান করেছিলেন—আর তুমি তাদের অপমান ক'রে চলেছ, আমি তোমাকে অভিসম্পাত ক'রছি—আওরংজেব! তুমি তোমার পিতার প্রতি যে ব্যবহার করেছ তা' তুমি সমস্ত জীবনে ভুলতে পারবে না, তুমি যে পথে চ'লবে, সমস্ত জীবন ধ'রে সে পথে তোমার ছায়া তোমাকে অতিক্রম ক'রে যাবে, তোমাকে বিপথে চালিত ক'রবে। পক্ষির তোমাদের কোন বাণী তোমাকে তোমার ছায়ার মোহ থেকে মুক্তি দিতে পা'রবে না।

হিন্দুস্থান আজ ছিন্নতার ক্রীতদাসী, কখনো লোভে, কখনো ঘৃণায় হিন্দুস্থান লুণ্ঠিত হ'য়েছে, যদি কোন বিরাটের প্রেরণা নিয়ে ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনা করা হ'ত তবে ভারতবর্ষ মিস্কর তার সমস্ত সন্তানের জননী হতে পারত। আজও হয়ত দিল্লীর প্রাসাদে ময়ূরসিংহাসনে তার উদ্ধারের শোভা পাচ্ছে, কিন্তু সিংহাসনের মর্ম্মরশিলা দূর থেকে আহ্বান ক'রছে বিপথ—যেমন দূরক আহ্বান করে লৌহকে।

পশ্চিম থেকে আসছে এক ইতিহাস প্রভঞ্জন, আমি শিউরে উঠ্‌ছি, সে হ'চ্ছে ঝঞ্ঝার ইঙ্গিত, রক্ত নক্ষত্রের দূত। শক্তিশালী সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত হয় রাজ্যের বিধান, রক্তপ্রবাহ মুছে দিয়ে যায় সে পদচিহ্ন। রাত্রিতে শুনতে পাচ্ছি সমস্ত দিল্লীব্যাপী এক বিরাট ক্রন্দন রোল—যেমন উঠেছিল আর একবার তৈমুরের দিল্লী অভিযানের দিনে। আর একবার উঠ্‌ছে পাশবিকতার প্রবল ঝড়।

মৃত মানবই একমাত্র শান্তির অধিকারী—না না, তারাও নয়। বলদৃপ্ত লোভে কি মৃতের সমাধি অবমানিত হয়নি? আমি কিন্তু মূল্যবান্ প্রস্তর অথবা মর্ম্মরবেদীর নিম্নে সমাধিস্থ হ'ব না, একমাত্র তৃণই হবে আমার সমাধির আবরণ। যদি কোনদিন চরণাঘাতে ধূলিসাৎ হয়, তবু তৃণখণ্ড আবার নতুন হয়ে জন্মাবে।

ভগবান পথশ্রান্তকে কোলে তুলে নেন।

বাংলার মাছ ও মাছধরা

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এস-সি, ডি-ফিল

পূর্ব প্রবন্ধে খাদ্য হিসাবে মাছের স্থান ও মাছধরার দুই একটি প্রণালীর আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে মাছের যে প্রচুর প্রচলন ছিল—ভারতচন্দ্র, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি বাঙ্গালী কবির কাব্য হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'বর্ষা' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হইল। ইহাতে তৎকালে প্রচলিত বর্ষার রন্ধনের বিবিধ প্রণালীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"কাতলা সেঁকুট কই বাল তাজা ঝোল
শিকপোড়া মুড়া কাঁঠালের বীজে ঝোল।
বাল ঝোল তাজা রাঙ্গে চিতল কলাই
কই মাগুরের ঝোল ছিঁচ তাজে কই।
মাজা সোনা খড়কির ঝোল তাজা সার
চিংড়ির বাল বাগা অমৃতের তার।
কঠালাখি রাঙ্গে রই কাতলার মুড়া—
তিতা দিয়া পলা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া।
আম দিয়া পোলমাছে ঝোল চড়চড়ি
আর রাঙ্গে আমাসে দিয়া ফুলবড়ি।
বাটায় করিলা ঝোল খরসার তাজা
অমৃত অধিক ফলে অমৃতের রাজা।
সুখার বাদের বাহ আর মাহ যত
বাল ঝোল চড়চড়ি ভাজা ভৈলা কত।
রই কাতলায় তৈলে রান্ধে তৈলপাক
মাছের ভিমের বড়া মুতে দেয় তাক।

মাছ যে অতিশয় লঘুপাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে। প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর খাদ্য অতিশয় উচ্চস্তরের ও সারবত্তাপূর্ণ ছিল, কারণ অপর্য্যাপ্ত সুলভ মাছের সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যাপ্ত খাঁটি দুধ ও টাটকা শাকসব্জির সরবরাহ ও ছিল যথেষ্ট। তাই সেকালের বাঙ্গালী সন্তানেরা ছিলেন ব্যায়ামপটীয়সী—সৌষ্ঠব বীর্য্যের জীবন্ত প্রতীক। অশোকের মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং উত্তরবঙ্গের তথা ভারতের প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ দীবা ও তাঁহার বীরত্বকাহিনী ইহার জলন্ত নিদর্শন।

এখন মাছধরা সম্বন্ধে বলা যাইতেছে :—

মাটীর পাত্র সাহায্যে মাছধরার একটি উদাহরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত মাটির হাঁড়ি বা ডাঁবরের সাহায্যে মাছধরার কথা বেশী লোকের জানা নাই। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বড় বৃষ্টির পরে রৌদ্র উঠিলে বহু বাংলার যে সব আমন ধানের ক্ষেত ছিলের উঁচু আলেপোতা জমির নিকটে—সেই সব ধান ক্ষেতের ভিতর হইতে সরু অসংখ্য নালি কাটিয়া শুকনো আলের নিকট আনিয়া

একটি গর্ত করিয়া নালির মুখে ঝাঁঝির পাতা হয়। ঝাঁঝরের পশ্চাৎ দিকে ২ হাত গভীর ও ২।৩ হাত লম্বা গর্ত খোঁড়া হয় এবং ধানের ক্ষেতের জল নালি বাহিয়া ঝাঁঝরের ভিতর দিয়া আসিয়া গর্তে পড়িলে উহার পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে যথাসম্ভব নিঃশব্দে গর্তের জল অপর দিকে ফেলিয়া নালিতে একটি স্রোতের সৃষ্টি করা হয়। ঐ স্রোতের সঙ্গে পুঁটি, চাঁকি, শিঙ্গি, ফেলে, বাইন প্রভৃতি মাছ আসিয়া ঝাঁঝরের মধ্যে পড়িয়া আবদ্ধ থাকে। অনেকগুলি মাছ পড়িলে মাছগুলির ঝাঁঝরটি সরাইয়া তাহার স্থলে তাড়াতাড়ি আর একটি ঝাঁঝর পাতিয়া দেওয়া হয়।

শুধু হাতে মাছধরা। শরতের চালু উর্বর ক্ষেতে যে সব স্থানে জৈষ্ঠ মাসে নূতন জল আসার সঙ্গে সঙ্গে জলিধান কাটা হয় সেই সব ক্ষেতে সাধারণতঃ সন্ধ্যার পূর্বে গ্রামের লোকেরা হাতড়াইয়া চিংড়ি, ফেলে, আড়কাটা প্রভৃতি মাছ ধরিয়া থাকে। নদীতে জল বেশী হইলে উহার পাড়ের সহিত গা-লাগিয়েরা দিবা ও গ্রীষ্মকালে যে গর্ত করে সাহসী লোকেরা জলের মধ্যে নামিয়া ঐ গর্তের ভিতর হাত ঢুকাইয়া বড় বড় ফেলে মাছ ধরে। বর্ষার প্রারম্ভের বড় ঝড় বা আষাঢ় শ্রাবণের কূলের কাছে জলের ভিতর থাকিলে বর্ষান্তে ঐ সব মাছের শিকড়ের নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত আড় প্রভৃতি মাছও অনেকে ডুব দিয়া ধরিয়া থাকে। শীতকালে মৎস্যবহুল কোনে 'বাইতেরা' মাছ ধরিবার সময় জল ঘোলা হইলে অনেকে ৩।৪ জন একসারিতে দাঁড়াইয়া জল টানিয়া কৃত্রিম স্রোত সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত বাহিত পুঁটি, মৃগেলপোনা, চাঁকি প্রভৃতি মাছ ধরিয়া থাকে। রেল লাইনের ধারের বা গ্রামের নালির জল বর্ষান্তে যখন কমিতে থাকে তখন স্রোতহীন জলে নালার এপার ওপার পর্যন্ত ৪।৫ হাত ঘুরে ঘুরে ২টি কাথার শক্ত বেড়াজাল দিয়া মাঝখানের জল সেঁচিয়া ঐ স্থানটি শুকাইয়া ফেলা হয়। সাধারণতঃ রাত্রিকালে চাঁকি, পোনা, পোল মাছ প্রভৃতি দুধারেই কাথার বাঁধ পর্যন্ত আসিয়া লাফাইয়া ঐ শুকনো মাঝখানে পড়িতে থাকে। প্রাতে উহা ধরিয়া লওয়া হয়। বলা বাহুল্য, মাছ বেশী পড়িতে থাকিলে উহা উঠিয়াদের না খায় বা কেহ চুরি না করে এজন্য রাত্রে পাহারা দেওয়া হইয়া থাকে। বৈষয়িক ধান কাটার প্রাক্কালে অগভীর বিলের নিম্নতম স্থানে ৩।৪ হাত ব্যাসার্ধ লইয়া গোলাকার জায়গা কাথা ও বাঁশের শক্ত বাঁধ দিয়া ২টি বা ৩টি ১ হাত প্রশস্ত মুখ রাখা হয়। ঐ স্থানকে 'আপা' বলে। আপার মধ্যে গাবতুলসী, নেবু ও ছাওড়ার পাতাসহ ডাল ফেলিয়া ৩।৪ বা ৭।৮ দিন পর পর আপার মুখ কাথা দিয়া বন্ধ করিয়া উহার জল সেঁচিয়া চাঁকি, পুঁটি, ফেলে, বাইন, পোনা, কলি, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি মাছধরা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য আপার জল বাঁশের চটার তৈরী ঝোঁচার ভিতর দিয়া ফেলা হয় সুতরাং সে জলের সহিত বাহির পুঁটি, খলসে প্রভৃতিও পলাইতে পারে না। বিলের জল প্রায় শুকাইয়া গেলে বিলের নিম্নতম স্থানে কখনও কখনও শিঙ্গি মাছের ঝাঁক মাটির নীচে 'গোর' করিয়া থাকে। লোকে মাঠের মধ্যে হঠাৎ 'খলবল' শব্দ শুনিয়া অনুসন্ধান করিয়া ঐ 'গোরের' মাছ ধরিয়া থাকে। চৈত্র বা বৈশাখ মাসে প্রখর রৌদ্রে বড় 'ছলের' পরে পুরাতন পানাপুকুর বা বড় বিলের ধারে মাঠে কই প্রভৃতি মাছ গুঁড়া ও ধরার কথা অনেকে জানেন।

বাঁশের কাঁদে মাছধরা। যে সব বিল-বাওড়ে শিঙ্গী মাইন মাছ বেশী সেখানকার লোকেরা জলের মধ্যে বাঁশের বড় বড় চোঙা ডুবাইয়া রাখে ও ২।৩ দিন পর পর উহা সন্তর্পণে তুলিয়া উহার ভিতরের মাইন বা শিঙ্গি মাছ পায়।

বাঁশের চটা দিয়া পাতলা বুনানি ছোট ঝরমার ঝুড়ি, দুই কোণ একত্র করিয়া বাঁধা হয় এবং সম্মিলিত কোণও অপর বাহুর মধ্যস্থানে একটি বাঁশের দণ্ড সংযুক্ত হয় তবে তাহাই হইতেছে ঝোঁচা। ঝোঁচার নীচের ২ কোণের সহিত একগাছি শক্ত দড়ির দুই প্রান্ত বাঁধা থাকে। ধানকাটার পর ঝোঁচার দড়ি ডান হাতে ও বাঁ হাতে দণ্ডটি ধরিয়া অল্প জলে ধানে কোণের নিকট ঝোঁচা পাতিয়া সামনের জল ও ধান পা দিয়া নাড়াচাড়া দিলে চাঁকি পুঁটি প্রভৃতি মাছ ঝোঁচার ভিতর ঢোকে ও ঝোঁচা উঁচু করিয়া ঐ মাছ ধরা হয়। নদীর জল কমিবার বা বাড়িবার সময় কোলপাড়ির নিকট অল্প জলের মধ্যেও উহার সাহায্যে মাছধরা হয়। ঠিক ঝোঁচার আকারে প্রকাণ্ড খাঁচাকে সাপড়া বলে। বর্ষার প্রারম্ভে বা শরৎকালে নদীকূলের লোকেরা লম্বা কঞ্চি বা শক্ত দড়ি বাঁধিয়া সাপড়া জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। মাঝে মাঝে কঞ্চি বা দড়ি ধরিয়া তুলিলে তাহার মধ্যে চিংড়ি ফেলে আড়কাটা প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। খাঁচা শক্ত বাঁশের আধ ইঞ্চি চওড়া চটা মোটা দড়ি দিয়া বুনিয়া চিকের মত যে জিনিষ হয় তাহাকে বানা বলে। বিল বা বাওড়ের জল বর্ষান্তে যখন নালা দিয়া বাহির হইয়া নদী বা বড় খালে পড়িতে থাকে তখন ঐ নালার অপ্রশস্ত অংশে এপারে ওপারে উঁচু বানা দিয়া ঘেরিয়া মাঝখানে জলের কয়েক ইঞ্চি নীচু পর্যন্ত বানা বা শক্ত বেড়া দিয়া তাহার উপর দিয়া জলের স্রোত যাইতে দেওয়া হয়। এই তীব্র স্রোতের মুখে ডাল বা বাঁশের ছিলের তৈরী ঝোঁচার আকারের জিনিষ পাতিয়া রাখা হয়। স্রোতের সঙ্গে আগত পোনা পোল প্রভৃতি মাছ লাফ দিয়া ঐ জালের বা ঝোঁচার মধ্যে পড়িতে থাকে। ইহাকে স্থান বিশেষে 'চাঁচি পেতে' মাছধরা বলে।

বাঁশের ছিলে প্রস্তুত বিবিধ আকার ও প্রকারের খাঁচার সাহায্যে মাছধরা যথা বাংলার মত প্রচলিত, এত বোধ করি বাংলা দেশের কোথাও নাই। এই সব খাঁচার নির্মাণ-কৌশল ও পারিপাট্য অতীব মনোহর। ঘোড়ার পিঠের মত ছোট বড় নানা আকারের দুপ্রস্থ 'পার' ও সম্মুখে 'জিভ' সংযুক্ত দুয়াড়িগুলিতে মাছ 'পার' অতিক্রম করিয়া ভিতরে যাইতে পারে কিন্তু বাহির হইবার উপায় নাই। সাধারণতঃ নদীর কূল হইতে বানা পাতিয়া তাহার শেষপ্রান্তের সহিত ত্রিভুজাকার করিয়া শক্ত নোটা নলির সাহায্যে দুয়াড়ি পাতিয়া পরদিন প্রাতে তুলিয়া তাহার মাছ বাহির করা হয়। বাক্সের মত আকারের চতুষ্কোণ খাঁচার একদিকে 'পার' লাগান থাকে এগুলি চারো বলে। ইহারই রাঙ্গুলে মাইনের শুঁটকে ছাবানি বা ঝাঁকরা বলা হয়। এগুলিতে বড় বড় কই কাতলাও পড়িয়া থাকে। ব্যাধিদের ব্যাগের মত পটলাকারে কাঁদের দুই পাশেই মুখ—সেগুলিকে ফুল বিছেল। এগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প জলে

স্রোতের মুখে পাতা হয়। কোনও ঝিল ডেলাইয়া বুজাইতে অনেক স্থলে গ্রামা ভাষায় 'ঝিলের মুখে মেখ' বলে। চারোয় মত অথচ ছোট ও শক্ত ঝিলে তৈরী 'খাদুর' 'খামার' সাহায্য বা লইয়াই বাস্তুক্ষেতের মধ্যে কাশকোশ প্রভৃতির সহিত বাঁধিয়া পাবনা জেলার ঝিল অঞ্চলে কই মাছ ধরা হইয়া থাকে। বাঁশের মোটা ঝিলে তৈরী 'পলো'তে মাছধরা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। উল্লিখিত ক'ঝিলগুলির ঝিল বোনা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাকিকলের দড়ি, বেত বা এজপ্রকার দড়ির দ্বারা লতার সাহায্যে। পাটের দড়ি জলে টেকে না। পলা বা অপর নদীর অগভীর অংশে যেখানে শরপোলা, শিংরালি প্রভৃতি ঘাস বেশী সেখানে আশ্বিন কার্তিক মাসে মজাপাড়ার তৈরী চাটাইএর মত ঝিলির জলের উপর ভাসাইয়া তাহার মাঝে মাঝে কলার মাল খোলা রাশিয়া টানিয়া লওয়া হয়। মাছগুলি লাফাইয়া ঐ চাটাইএর উপর পড়িলে উহা ধরিয়া লওয়া হয়।

বাঁশের বেতের অগ্রভাগে সরু বা মোটা অনেকগুলি লৌহকলক সংযুক্ত করিয়া খুরচুরি, চেঁচা ও জুতি প্রস্তুত হয়। বর্ষার জল সঞ্চয়ে খাল বা ডোবে প্রবেশের কালে আধার প্রাবণে জুতির সাহায্যে বড় বড় বোয়াল ধরা হইয়া থাকে। গ্রামের প্রাচীন লোকদের মুখে শুনিয়াছি, সেকালে যখন বেশে মাছ বেশী ছিল তখন নূতন বর্ষায় বড় বড় বোয়ালের 'পীঢ়' লক্ষিত। অর্থাৎ বোয়ালেরা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিত তখন জুতি দ্বারা সেগুলি অনেক ধরা হইত। জানিনা প্রাণীতত্ত্বে এই 'পীঢ়' ধরার কোনও গূঢ় অর্থ আছে কি না! বড় বড় বিলে আমন ক্ষেতের মধ্যে ডিঙি নৌকায় চড়িয়া ধানগাছ নড়িতে দেখিয়া জুতি দ্বারা বড় বড় মাছ ধরার কথা শুনা যায়। এই সময় জুতি হস্তে লোক এত অন্যমনস্ক হয় যে নৌকায় কেহ ফুসের ঘোরে জলে পড়িয়া গেলে জুতি নিক্ষেপে তাহার প্রাণরক্ষা হওয়ার প্রবাদও চলিত আছে।

জালের সাহায্যে মাছধরা—জাল দিয়া মাছধরা প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) কাপড়ের দুইপ্রান্ত দুইজনে ধরিয়া ফেলেরা যে ভাবে পুকুরে মাছধরার চেষ্টা করে অনেক প্রকার জালের মূল কৌশল উহাই। টানাজাল, মইজাল, খোঁয়াড় ঘেরাজাল ও বেড়জাল ইহার উদাহরণ। (২) মশারি বোকানোর ফুটন্ত ফেলের ফড়া হইতে ঝিলিপি যে ভাবে ছাঁকিয়া তোলা হয় অনেক প্রকার জালে ঐ কৌশল অবলম্বিত হয় যেমন—হাত ছাকনা ও ছাকনা জাল, ফেলাল, ধরা ও বাউলি জাল। (৩) কয়েকপ্রকার জলের পাশ এরূপ বাঁড়ায় ভাবে প্রস্তুত যে জাল পাতা থাকিলে মাছ চলিবার সময় পাশের মধ্যে তাহার মাথা আটকাইয়া যায়। যেমন—বাশিনী জাল, কই জাল ও ঝাঁড়ি জাল। (৪) অপেক্ষাকৃত জটিল কৌশল সংযুক্ত—ফেপলা জাল, সাপলে ও কোণা জাল। অবশ্য ১ হইতে ৩ পর্যন্ত শ্রেণীর জালগুলির মূলসূত্র সহজ হইলেও কার্যক্ষেত্রে বিশেষতঃ সাকলোর সহিত তাহাদের বিরাট রূপ দেওয়া যে অথচ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন বিভিন্ন প্রকার জালের মোটামুটি গঠন ও পরিচালনার কথা বলা যাইতেছে। খোঁড়া জাল—১৬ সুত লম্বা ৭ হাত চৌদ্দ ১৪।১৫ গুণ সুতা পাকাইয়া মোটা সুতায় তৈরী। পাশ ক'ঝিলা। মুখের পূর্বে ১খানি জাল তৈরীতে ৪।০ টাকা খরচ পড়িত। জালের প্রত্যেক দিকে দুইপ্রান্তে ২টি বাঁশদণ্ড সংযুক্ত থাকে; উহা ধরিয়া দুইজন লোকে জলের মধ্যে টানিতে থাকে, মাছ পড়িলে গুটাইয়া লয়।

মইজাল—নদীর খরস্রোত অগভীর অংশে বা ডাঙ্গলের মধ্যে চালানো হয়—ইহাতে চিংড়ি মেলে প্রভৃতি সাধারণতঃ পড়ে। উহা খুব ঝুঁঝালি। দৈর্ঘ্যে ১৫ ও প্রস্থে ৭ হাত ৪ গুণ সুতায় তৈরী। মূল্য আগে ৩।১০ টাকায় এই জাল প্রস্তুত হইত।

খোঁয়াড় ঘেরা জাল—পদ্মার অগভীর চরে অল্প মাটি খাকিলে তাহার মধ্যে আড় মাছ আসে। দূর হইতে জাল দিয়া ঘিরিয়া ক্রমশঃ কেন্দ্রের দিকে জাল গুটাইয়া আনা হয়; মাছগুলিও ক্রমশঃ কেন্দ্রের দিকে সরিতে থাকে তাহাই পরে জাল দিয়া জড়াইয়া ধরা হয়। বলা বাহুল্য ইহা কাহারও একাকী ধরা সম্ভব নয়। সেগুলি মানুষের আভাস পাইলেই দূরে পলাইয়া যায়।

ফেলাল জাল—ত্রিভুজাকৃতি জাল। দুই বাহুর সঙ্গে ২খানি শক্ত বাঁশাগ্র সংযুক্ত থাকে। কোণের দিকে থলি। চালক কোণের নিকটে দুটি বাঁশদণ্ড যেখানে মিশিয়াছে সেখান ধরিয়া আস্তে আস্তে সামনে চালায়। মাছ পড়িলে সামনের আগ জল হইতে উঁচু করিলে জালের মাছ থলের মধ্যে প্রবেশ করে। জলের সম্মুখের দিকটা চালক এক হাতে ধরিয়া থাকে। ১৫ হাত লম্বা মুখে ১৮ হাত ৭ হাত ঝুলে (সাধারণতঃ পাতলা কাপড়ের) পাঁচ গুণ সুতায় তৈরী ১খানি জাল করিতে পূর্বে ৪।০ টাকা পড়িত এখন ১৩।১৭ টাকা পড়ে।

ধরা জাল—ফেলাল জালের মতই গঠন, তবে নদী বা ঝিলের যে পথে মাছ চলাচল করে সেই পথে অনেকগুলি শক্ত বড় বড় বাঁশ পুঁতিয়া ঠেঁকি জলের সাহায্যে টানান হয়। পাশে ছোট ডিঙি নৌকা থাকে। কিছুক্ষণ জাল জলের মধ্যে রাখিবার পর চালক জালের কোণের বাঁশের উপর ভর দিয়া জাল উঁচু করিয়া তোলে এবং ডিঙির মধ্যে যে লোক থাকে সে মাছ ঝাড়িয়া উহাতে রাখে।

পদ্মার বা অপর স্রোতবতী নদীতে ক'ঝিলা পাশযুক্ত ফেলাল জাল ধরিয়া স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাটিয়া যায় ও সাধারণতঃ ইলিশ মাছ পড়িলে জাল উঁচু করিয়া মাছ নৌকার মধ্যে রাখে। এই জালকে বাঙ্গালি জাল বলে।

যেমিস ন্যাবেটোর মত আকারের ৪।০ হাত লম্বা বাঁশের ফ্রেমের সহিত সংযুক্ত ৭০ হাত চৌদ্দ বিশিষ্ট জাল স্রোতের মুখে ধরিয়া ধরা, বাঁশপাতা, আড়কাটা এমন কি সময় সময় ইলিশও ধরা হয়, ইহাকে হাত ছাকনা জাল বলে।

ঠিক ঐরূপ দেখিতে অথচ দুটি মোটা বাঁশে ফ্রেম তৈরী এবং স্রোতের মুখে পাড়ের নিকট শক্ত বাঁশ পুঁতিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত ঠেঁকিজলের জাল চালান হয়—তাহাকে বলে ছাকনা জাল। ইহাতে সাধারণতঃ ইলিশ মাছ ধরা হয়।

বাগিনী জাল—৪০।৫০ হাত লম্বা ও ৫ হাত প্রস্থ চৌদ্দির জালের মত, বাঁশগুলি আধ ইঞ্চি হইতে ১ ইঞ্চি ক'ঝিলা। কেলে বা ডাঙ্গলের মধ্যে

দুই প্রান্তে দুই শক্ত বাঁশের লগির সঙ্গে বাঁধিয়া জাল পাতা হয় ও উহাতে আবদ্ধ কাঁকলা, বাঁশপাতা, খয়রা প্রভৃতি মাছ মাঝে মাঝে তুলিয়া লওয়া হয়। কই জালও নাগিনা জালের মতই, তবে অপেক্ষাকৃত শক্ত সুতায় তৈরী এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থেও নাগিনী জালের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। বিল শুকলে ধান ক্ষেতের আলের পাশে সন্ধ্যায় দরন পাতিয়া—সাধারণতঃ পরদিন ভোরে ঐ জালে আবদ্ধ মাছ সংগ্রহ করা হয়।

ছাঁদি জালের পাশ ১½ ইঞ্চি হইতে ২½ ইঞ্চি; জাল দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ মাইল প্রস্থেও ১০।১২ হাত। উহার উপরের কাছির সহিত বাঁশের বড় বড় চোঙা ও নীচের কাছির মাঝে মাঝে মাটির টালীর মত ভারী বাঁধা থাকে—ফলে উহা নদীর মধ্যে ফেলিলে ঢেঁসিদের জালের মত খাড়া হইয়া ভাসিতে ভাসিতে আটনের দিকে যাইতে থাকে। মাঝারি সাইজের নৌকায় ৪।৫জন লোক থাকে। তাহারা পরার যে অংশে ঐ জাল চলিবে বুঝিতে পারে সেখানে মাঝ নদীতে গিয়া জালের একপ্রান্ত জলে ফেলিয়া দেয় ও অবশিষ্ট জাল ক্রমাগত ফেলিতে ফেলিতে নৌকা বাহিয়া কূলের দিকে আসিতে থাকে। জাল সম্পূর্ণ ফেলা হইলে স্রোতের সহিত ১½ বা ২ মাইল ঐ নৌকা ভাটাইয়া যায় তারপর জাল তুলিতে তুলিতে ও তাহার পাশে আবদ্ধ ইলিশ মাছ ধরিতে ধরিতে মাঝ নদী পর্য্যন্ত যায় এবং সব জাল নৌকায় তোলা হইলে নৌকার পাল তুলিয়া—উজাইয়া পূর্ব্বস্থানে আসিয়া নৌকা বাঁধিয়া মাছ ব্যাপারিদের কাছে বিক্রয় করে। বলা বাহুল্য, অনেকগুলি নৌকা পালা করিয়া এইরূপ জাল ফেলে; সুতরাং এক নৌকার জাল তুলিতেছে দেখিলে অপর নৌকার লোকেরা উজানে জাল ফেলিতে সুরু করে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ হইতেই এই জালে মাছ ধরা আরম্ভ হয়। ৪।৫টি হইতে ২০।২৫টি বা সময় সময় আরও বেশী ছোট ও মাঝারি সাইজের ইলিশ প্রতিবারে ধরা হইয়া থাকে। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে পদ্মা প্রভৃতি স্রোতবতী নদীতে ইলিশ মাছ সর্ব্বদাই স্রোতের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উজানের দিকে এবং বিশেষ করিয়া তীব্র স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়ার পক্ষপাতী।

খেপলা বা ফেও জাল বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সাধারণ একখানি জাল প্রায় ৯ হাত লম্বা এবং সুতায় তৈরী; জালের মুখে মাদুলির আকারের দুই মুখ খোলা লৌহ খণ্ড লাগান থাকে। একখানি জালে প্রায় ৫সের লোহা প্রয়োজন। যুদ্ধের পূর্ব্বে এইরূপ একখানি জাল তৈরী করিতে ৮।১০ টাকা খরচ পড়িত। খেপণ করা বা ছুঁড়িয়া ফেলা হয় বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম খেপলা জাল হইয়াছে। এই জাল ফেলা অভ্যাস সাপেক্ষ। জাল ফেলিবার কৌশল এবং জালের মুখে ভারী লোহা থাকায় ইহার সমস্ত মাটি লাগেয় হয় ও পরে আস্তে আস্তে টানিলে মাছগুলি একটি ফাঁদের মত ফাঁসে আটকাইয়া জালের সহিত উপরে উঠিয়া আসে।

লাগেয় জালে ইলিশ মাছ ধরা সন্ধ্যাতেও দেখা যায়—পদ্মা প্রভৃতিতে তো আছেই। এই জালেও কৌশলে মাছকে ফাঁদে ফেলা হয়। সাধারণতঃ একখানি ডিঙ্গি নৌকায় তিনজন লোক থাকে—একজন মাঝি ও দুইজন নৌকার দুই প্রান্তে জাল ফেলিয়া বসিয়া থাকে। এ জালও বাগদি জালের মতই গঠিত। টেঁসিদের জাল লম্বালম্বি ২ ভাঁজ করিলে যেরূপ হয় সেইরূপ, তবে লম্বালম্বি দুই প্রান্তে শক্ত বাঁশের বাঁখারির সংযুক্ত। উপর ও নীচের বাঁখারির মধ্যবিন্দুর সহিত শক্ত সরু দড়ি সংযুক্ত থাকে চালকের হাতে দড়ির অপরপ্রান্ত থাকে। নীচের বাখারির সাথে ৮।১০সের ওজনের একটি পাথর জালকে নীচে ইচ্ছামত জলের ভিতর ঠিকভাবে রাখিতে সাহায্য করে। উপরের দড়িগাছি একটু বেশী টানিয়া উক্ত বাখারির মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁক রাখা হয় যাহাতে মাছ সেই পথে জালের মধ্যে ঢুকিতে পারে। মাছ জালে ঢুকিলে দড়িতে ঝাঁকুনি পড়ে এবং চালক তখন তাড়াতাড়ি নীচের দড়িগাছি টানিয়া উপরের দড়ির সমান করায় বাখারি দুইটী জালসহ মুখে মুখ লাগিয়া যায়, ফলে মাছটি ফাঁদে আটকাইয়া পড়ে। তখন জাল তুলিয়া মাছ বাহির করিয়া নৌকায় রাখা হয়। সাধারণতঃ ইলিশ মাছ এই জালে বেশী পড়ে। জাল উপরের দিকে ফেলিয়া স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আটনের দিকে নির্দ্দিষ্ট জায়গা পর্য্যন্ত গিয়া আবার পাল তুলিয়া যে ভাবে টানিয়া পূর্ব্বস্থানে নৌকা আনিয়া পুনরায় জাল ফেলা হয়।

কোণা জাল। অধিকাংশ ছাঁদি জালের মতই চালান হয়; তবে ইহার শেষ প্রান্তে ঘুরাড়ির 'পারের' মত জালের তৈরী একটি ফাঁদ তালমান বড় বাঁশের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। এই জাল ছাঁদি জালের চেয়ে আকারে বড়, চালাইতেও ৮।১০ জন লোক লাগে। ইহারও উপরের অংশ কাছি সংলগ্ন বড় বড় বাঁশের চোঙার সাহায্যে ভাসাইয়া রাখা হয় ও নীচের অংশ পোড়ামাটির টালির দ্বারা জলের মধ্যে টান রাখা হয়। মাছেরা কতক ছাঁদি জালের মত পাশে আটকায়, কিন্তু বড় বড় ইলিশ জালে বাধা পাইয়া সরিতে সরিতে ফাঁদের মধ্যে গিয়া পড়ে। সুতরাং জাল তুলিতে তুলিতে কয়েকটি ছোট মাছ ও ফাঁদ তুলিলে প্রচুর বড় ইলিশ পাওয়া যায়। একেবারে ২০।৩০ হইতে শতাধিক বড় ইলিশ এই জালে পড়িয়া থাকে। বলা বাহুল্য কোণা জাল ও লাগেয় জালেই সাধারণতঃ বড় ইলিশ পাওয়া যায়। ছাঁদি জালে ছোট এবং যে বেড় জালের কথা আগে বলা হইয়াছে তাহাতে ছোট বড় মাঝারি কেউ বাদ পড়ে না। কোণা জাল তৈরীতে যুদ্ধের পূর্ব্বেই প্রায় হাজার টাকার উপর খরচ পড়িত।

পদ্মার জালের রাজা বেড়-জালের কথা বলিতেছি। ইহার কৌশল সোজা হইলেও ইহার বিরাটত্ব বিস্ময় উৎপাদক। এক একটি জাল লম্বায় ২ মাইলের বেশী ছাড়া কম নয়, প্রস্থেও ১০।২০ হাত। লম্বার দিকে সেই অনুপাতে মোটা কাছি এবং জাল জলের মধ্যে খাড়া রাখিবার জন্য কোণা জালের মতই এর বাঁশের চোঙা ও নীচে পোড়া মাটির ভার বাঁধা। বেড়জালের জন্য এমন জায়গা চাই যেখানে নদীর এক পারে চালু শক্ত বালির চর ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত আছে। কারণ জাল সমস্ত নদীটি বেড় দিয়া ২।১ মাইল যাওয়ার পর জালের ২ প্রান্তের কাছি ধরিয়া টানিয়া ঐ চরে জাল গুটান ও মাছ সংগ্রহ করা হয়। জাল ফেলা অনেকটা কোণা জালেরই মত, তবে কোণা জালের যা ছাঁদি

জালের শেষ প্রান্ত মধ্য নদী দিয়া ভাসিতে ভাসিতে যায় বেড় জালের শেষ প্রান্ত কিন্তু অপর বড় নৌকাতে জালির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সে নৌকা ২।১ মাইল ভাটীয়া গিয়া চরের পারের দিকে আসে ও তখন উভয় নৌকার লোক জলে নামিয়া কাছি ধরিয়া জাল টানিয়া ক্রমশঃ ওটাইতে থাকে। বড় দুই নৌকা দূরের নিকটে জালের কাছাকাছি থাকে। ছোট ২।৩ খানি ডিঙ্গিতে কয়েকজন জালের ধারে ধারে ঘোরে এবং কোনও বড় চাঁই, দুই বা কাতলা মাছ পালাইবার উপক্রম করিলেই সেখানে টোটা বিদ্ধ করিয়া ধরে। বড় দুই সাধারণতঃ প্রথমেই লাফ দিয়া পলাইয়া যায়। তাহার জালের উভয় প্রান্ত যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই জল দুখলিত হইয়া ওঠে। জীবন্ত ইলিশের বর্ণাভ রজতশুভ্র কান্তি পদ্মার রজতশুভ্র বালির উপরে এক অভিনব দৃশ্য উদ্ঘাটিত করে। শত শত মাছ একত্রে বদ্ধ জলের মধ্যে কি ভাবে ছুটাছুটি করে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না। এই সময় ছিপ্র হাতে মাছ ধরিয়া নৌকায় রাখা হয়। ফলতঃ এক ক্ষেপে ৪।৫ শত হইতে হাজার ইলিশ মাছ পড়িয়া থাকে; তাহা ছাড়া বড় পাঙাস, চাঁই ও দুই একটি দুই কাতলা প্রায় সেপেই ওঠে। মাছ সংগ্রহ করা হইলেই মুসলমান ব্যাপারি (বিক্রেতাগণ) ও অন্যান্য গ্রাহকের কাছে উহা বিক্রয় করা হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরাও গিয়া কিনিয়া আনে। বেড় জালের বিশেষত উহার দলপতির দক্ষতা সহানিষ্ঠা ও চরিত্রবলের উপর। বাঙ্গলার শিল্পক্ষেত্রে যৌথ কারবার প্রচলিত হইবার কতকাল পূর্বে এই যৌথ ব্যবসা শিকার চলিয়া আসিতেছে, কে জানে? ৪০।৫০ হইতে ১০০ জন পর্যন্ত দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় লোক যখন ২ দলে বিভক্ত হইয়া কাছি ধরিয়া জাল ওটাইতে থাকে তাহা দর্শনীয় বটে! জালকেলা প্রভৃতি কাজ, বিশেষতঃ ঢেউএর মধ্যে, দুষ্কর নৈপুণ্যের কিপ্রতা ও দক্ষতাকেও হার মানায়; ফলতঃ এই জাল তৈয়ারীতে বহু হাজার টাকা খরচ হয়—এদিকে আষাঢ়ের পরে চর ডুবিয়া গেলে আর এ জাল চালান হয় না। এই সব বিরাট দলপতির দক্ষতা ও সাহসিকতা সাধারণতঃ এত উচ্চস্তরের যে এত টাকার জাল খাটাইয়া এপর্য্যন্তেও কোনও দিন খোলসাল বা মাহলাদোকদমা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

অনেকেই হয়ত জানেন এতাবৎকাল পদ্মা নদীতে ডিঙ্গির জন্য নৌকার সাহায্যে মাছধরা হিন্দু মৎস্যজীবীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান বিক্রয়ী শ্রেণী এঁদের নিকট মাছ কিনিয়া বিক্রয় বা চালানী কারবার করিতেন মাত্র। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভূমিহীন এমন কি চাষী গৃহস্থ মুসলমানগণও চাষের অবসরে মাছ ধরিয়া বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্বে পূর্বে ইঁহারা ছাকনা জালে বা লাংলে জালে ইলিশ মাছ ধরিলেও তাহা নিজেদের ব্যবহারের জন্যই করিতেন। ইহাতে হিন্দু মৎস্যজীবীগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। মুসলমান বিক্রয়ীগণও প্রবল প্রতিযোগিতা করিতেছেন। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গের অনেকাংশের হিন্দু মৎস্যজীবীগণের জীবিকার্জনের পথ যাহাতে সঙ্কুচিত বা রুদ্ধ না হয় সেদিকে রাজনীতিকগণের সজাগ দৃষ্টি এখন হইতেই নিবদ্ধ হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গলার মৎস্যজীবীগণ সমাজে অতিশয় হেয় হইয়া আছেন। প্রচণ্ড ঝড় তুফান ও প্রলয়ঙ্করী নদীর খেয়ালের সহিত যাঁহারা পুরুষানুক্রমে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আধুনিক শিক্ষা পাইয়া নৌ-বিভাগে উচ্চপদ লাভ করা এমন কি বিদেশ হইতে যন্ত্রচালিত মৎস্যধরা শিখিয়া আসিয়া সরকারের মৎস্য সম্পদ সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করা উচিত ছিল। জৈব রসায়নশাস্ত্রকে যিনি নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করেন এবং বায়োকেমিষ্ট্রির যিনি জন্মদাতা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সেই এবিন ডিগ্যের পূর্বপুরুষগণের বৃত্তি উপার্জনেই প্রকাশ। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে অনেক বিষয়েই জ্ঞান-বিজ্ঞানে নৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কেহই এ যাবৎ সমুদ্রে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হন নাই। অতীতে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, এখন দেশের এই সব শ্রেণীর লোকেও যাহাতে নিজেদের জাতীয় ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানেও উন্নতিলাভ করিতে পারেন এবং আর্থিক ও চারিত্রিক বলে বলীয়ান হইয়া মানুষের অধিকার অর্জন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে দেশবাসী সকলেরই সমবেত সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

টুক্‌রা কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

ভালবাসা সেত যায়না ভুলন
হৃদয় কুঞ্জে ফোটে
যা পাওয়ার আশা মরিতে নারে সে
অধিক আঘাতে চোটে।

প্রেমের খেউলে যে জনি আসিয়া
ফিরে ছড়ায়ে যায়
সীমা মাঝে থাকি অসীমে সে জনি
গানের মুরতি পায়।

মিসেস সেপয়

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—সাত—

পরিমল এল তার দিন দুই পরে।

এর ভেতরেই বই দুখানা পড়ে ফেলেছে রঞ্জু, গিলেছে গোগ্রাসে। একখানার নাম 'ফাঁসির ডাক', আর একখানা 'শহীদ সত্যেন'। একখানার ওপরে একটা ফাঁসির দড়ির ছবি—একটি ছেলে হাসিমুখে সে দড়ি গলায় জড়িয়ে নিচ্ছে; আর একখানার মলাটে একটা রিভলভার আঁকা—তার মুখ থেকে লাল আগুন আর কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। বই দুটোর মলাটের দিকে তাকালেই যেন গা শির শির করে ওঠে।

কিন্তু শুধুই কি মলাট? ভেতরের প্রতিটি পাতায় আশ্চর্য সব লেখা, তার প্রতিটি পংক্তিতে যেন বজ্রের গর্জন, তার প্রতিটি হরফ থেকে যেন রক্তের বিন্দু আর আগুনের কণা পড়ছে ঠিকরে ঠিকরে। রঞ্জুর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, টগবগ করে ফুটতে লাগল তার বুকের ভেতরে।

এই তো এতদিন পরে পাওয়া গেল তার সত্যিকারের পথ, উত্তর মিলল মনের ভেতরে সঞ্চিত এতদিনের পুঞ্জ পুঞ্জ জিজ্ঞাসার। উনিশ শো তিরিশ সালের লবণ-সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য, বিলাতী-বর্জন—এই চরকা-লাঞ্ছিত অহিংস-পথ—এ আমাদের জন্যে নয়। এ স্ত্রীবিয়ের ধর্ম, কাপুরুষের মনোবিলাস। পলাশীর মাঠে যে সূর্য ডুবেছিল—তা রক্ত মাখা, রক্তের মধ্য দিয়েই ইংরেজ কোম্পানি সেদিন পথ করে নিয়েছিল সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর থেকে দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসন পর্যন্ত, কাশ্মীরের তুষার-শুভ্রতা থেকে কুমারিকা-অন্তরীপের নীলিমা-বিস্তার পর্যন্ত। আজ সেই অধিকার থেকে তাকে তাড়াতে হলে সেই রক্তের পথ ছাড়া আর কোনো পথই নেই—উত্তরের শুভ্র তুষার থেকে সুরু করে দক্ষিণের নীল সমুদ্র পর্যন্ত রক্তে আজ রাঙা করে দিতে হবে। দেশমাতার যে রূপ আজ আমরা 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্রে বন্দনা করি তা ষড়ৈশ্বর্যময়ী কমলদলবিহারিণী কমলার রাজরাজেশ্বরী মূর্তি নয়; সমস্ত ভারতবর্ষের কালো আকাশে তাঁর খেটক-খর্পর প্রসারিত করে দিয়ে দাঁড়িয়েছেন ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা, মহামেঘের মতো বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে তাঁর উত্তাল কেশপাশ, রুধিরস্রুতি হচ্ছে তাঁর কণ্ঠ-বিলম্বী নরমুণ্ডের চারে, রক্তলোলুপার অট্ট হাসি ধ্বনিত হচ্ছে দিকে দিকে—'মার মুখা ধ'—

বইয়ের পাতায় পাতায় সেই চামুণ্ডার আবাহন, ছত্রে ছত্রে সেই ভয়ঙ্করীর বন্দনা। রুদ্ধশ্বাসে রঞ্জু পড়ে যেতে লাগল: 'চক্রান্ত, শঠতা এবং প্রচণ্ড দমন-নীতির সাহায্যে পৌনে দুইশো বছর ধরিয়া ইংরেজ আমাদের শাসন করিতেছে। কিন্তু ইহা শাসন নয়, শোষণ। রক্তলোভী শয়তানের মতো সে প্রতিমুহূর্তে আমাদের বুকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে, কাড়িয়া লইয়াছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি। দেশ-জোড়া একটা গোলামখানা বানাইয়া ইংরেজ আর তার পোষা কুকুরের দল, তার ঘৃণ্য টিকটিকিবাহিনী অবাধে রাজত্ব করিতেছে; তাহাদের চাবুকের ঘায়ে যখন পিঠের চামড়া রক্তাক্ত হয়, তাহাদের বুটের লাথি খাইয়া যখন প্লীহা ফাটে, তখনো এই গোলামেরা দাঁত বাহির করিয়া হাসে, সরকারকে সেলাম বাজাইয়া এবং রায়বাহাদুরী খেতাব পাইয়া ধন্য হয়।'

পড়তে পড়তে রঞ্জুর যেন দম আটকে আসতে লাগল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো পাতার পর পাতা উল্টে চলল সে:

"কিন্তু সে গোলামের দলে আমরা নই। স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা স্বাধীন মানুষ হইয়া দাঁড়াইব। ভারতবর্ষের এক ইঞ্চি জমিতে একজন ইংরেজেরও জায়গা হইবে না। নীল চাষের নামে যারা বাংলার কৃষককে নির্মমভাবে নির্যাতন করিয়াছে; বাংলার তাঁতীদের আঙুল কাটিয়া যারা আমাদের বুকের ওপর ফাঁসিয়াছে ম্যাঞ্চেস্টারী শোষণ যন্ত্রের বনিয়াদ; সিপাহী বিদ্রোহ দমনের নামে যারা শত শত নিরপরাধ মানুষের গায়ের চামড়া উপড়াইয়া হিন্দুর

গায়ে গোবর—আর মুসলমানের গায়ে শুয়োরের ছাল ছাড়াইয়া চর্বি মাখাইয়া ধ্যাস্তে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছে, কামানে গোলার বদলে যারা মানুষকে ব্যবহার করিয়াছে; জালিয়ানওয়ালার শত শত নিরস্ত্র অহিংস-নরনারীকে বেলিন গান চালাইয়া হত্যা করিতে যাদের বাধে নাই; যাদের ফাঁসিকাঠ আমাদের শত-শহীদের মৃত্যু দিয়া চিহ্নিত, যাদের কারাগারে শত শত সেবাসেবক ভিলে ভিলে আত্মদান করিয়াছে—সেই শয়তানদের জন্ত কোনো ক্ষমা আমাদের অভিধানে নাই। ইহার প্রতিটির জন্ত আমরা বিচার করিব, এই অত্যাচারের প্রত্যেকটির প্রতিশোধ আমরা লইব। অহিংসার ভাঁওতায় ভুলিয়া দক্ষিণ-পন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া রিফর্মের অথবা স্বায়ত্ত-শাসনের কাঁচ-কলা হজম করিতে আমরা রাজী নই। বাঘের মুখের শাসনে ছাগলের অহিংস-নৃত্য জাতির অপমান, মনুষ্যত্বের অপমান। দেশমাতার পূজা-মণ্ডপে আজ ইংলণ্ডের শাদা-পাঁটাদের বলি দিয়াই আমরা স্বাধীনতার বোধন করিব।"

এ শুধু লেখা নয়—লেখার মধ্য দিয়ে যেন সেই বলির বাজনা বাজছে। রক্ত চাই—অত্যাচারীর রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতাকে শোধন করে নিতে হবে। ভারতবর্ষের মাটিতে যতদিন একজন ইংরেজ থাকবে ততদিন জানব আমাদের মুক্তির মোচন হয়নি। আর তার উপায় হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লব, রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথে অভিযাত্রা।

এই ভয়ঙ্কর অভিযানের কাহিনী আছে দ্বিতীয় বইটিতে। আছে ক্ষুদিরামের কথা। রহুর স্বপ্নে দেখা ক্ষুদিরাম, বেড়ে ছেলে অশ্বিনীর মুখে শোনা 'নিখিলিস্ট' ক্ষুদিরাম বৈরাগীর গানের ক্ষুদিরাম। বালক রহুর অপরিণত ভাব-বিলাসী মন মাত্র কয়েকটি পাতার মধ্য দিয়ে যেন হাজার হাজার বছরের নিষ্ঠুর কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতার পথ পার হয়ে গেল। আশ্চর্য, কোথায় লুকিয়েছিল এসব, কোথায় প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল এই অপরূপ জগতের কাহিনী। এই সামান্ত কয়েকটি পাতার মধ্য দিয়ে যেন অনেকগুলো কালো পর্দা তার দৃষ্টির সামনে থেকে সরে গেল, আবিষ্কৃত হয়ে গেল রহস্যের এক বিশাল রত্নভাণ্ডার।

মা এসে বাইরে থেকে ডাকলেন, ছেলের আজ হল কি?

রহু চমকে উঠল, ঝক্ ঝক্ করে জ্বলে উঠল হৃৎপিণ্ড। নক্ষত্রবেগে বইখানা চালান হয়ে গেল 'সয়েল ফ্যামিলি'র তলায়। মা টের পাননি তো।

মা আবার বললেন, গল্পের বই জুটিয়েছ বুঝি? তাই মনলাতলার দিকে মন নেই?

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে রইল রহু—মা যদি বই দেখতে চান তা হলেই সর্বনাশ। কিন্তু ছেলেলে হাঁড়ি চাপিয়ে এসে তাঁর দাঁড়াবার সময় ছিল না, মা চলে গেলেন।

রহু আবার বই খুলল। এক অজ্ঞাত অদ্ভুত জগতের বিচিত্র ইতিহাস। এ ইতিহাস মেলে না স্কুলে-পড়া তোগলক-বংশ আর লর্ড বেন্টিঙ্কের সুশাসনের মধ্যে, এ ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না অ্যালফ্রেড্ দি গ্রেটের মহত্ত্বের বিবরণীতে। মাটির তলায় ক্ষুদিরামের গোপন কারখানার মতো একটা অদৃশ্য পাতালপুরী থেকে কাল-নাগিনীর ফণার মতো এ উদ্যত হয়ে উঠল, এর প্রতিটি পাতায় পাতায় সাপের বিষের তীব্র জ্বালা।

রহু পড়ে যেতে লাগল:

"কিন্তু মীরজাফর-আমিরচাঁদ-জগৎশেঠের বংশধরদের মৃত্যু নেই। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল মাণিকতলা বোমার মামলায়। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামী হল রাজসাক্ষী। বিভিন্ন বন্দীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সে ভেতরের খবর বের করবার চেষ্টা করতে লাগল। সত্যেন বসু আর কানাইলাল দত্ত এই বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেবার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

ঘটনার দিন হাসপাতালে অসুস্থ সত্যেন নরেন গোস্বামীকে ডেকে পাঠালেন তার কাছে জবানবন্দী দেবার জন্ত। নতুন শিকারের আশায়, নতুন তথ্য জানবার লোভে বিশ্বাসঘাতক নিশ্চিন্ত মনে দেখা করতে গেল।—দু চারটে কথার পরই সত্যেন রিভলভার বের করে গুলি করলেন, আহত দেশদ্রোহী আর্তনাদ করে ছুটে বেরুল।'

কিন্তু মাঝপথে মৃত্যুদূতের মতো আবির্ভূত হলেন কানাইলাল। রিভলভার হাতে তিনি অনুসরণ করলেন পলাতক বিশ্বাসঘাতককে। জেলারের আফিসে পৌঁছুবার আগেই জাতির কলঙ্ক নরেন গোস্বামীর রক্তাক্ত মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ইংরেজের কাছ থেকে ইনাম

পাওয়ার আগেই ঘরশত্রু বিভীষণ দলের বিপ্লবী বীরদের কাছ থেকে পেল তার দেশদ্রোহিতার চরম পুরস্কার।'

ঠিক হয়েছে। অসহ্য আক্রোশে গর্জন করে রঞ্জুর মন বললে, ঠিক হয়েছে। আজ এমনি করেই একটার পর একটা দেশের শত্রুদের নিপাত করা দরকার। দেশ জুড়ে নরেন গোস্বামীর রক্তবীজেরা টিকটিকি রূপে ছড়িয়ে আছে, তারা নিজেদের শত্রু—তারা জাতির আবর্জনা। এই আবর্জনাগুলো পরিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ একটা অসম্ভব কল্পনা, একটা অবান্তর ব্যাপার।

রক্তের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ছুটতে লাগল। সেও যদি এই মুহূর্তে একটা রিভলভার হাতে পায় তা হলে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। ক্ষুদিরাম, সত্যেন, বীরেন গুপ্ত, গোপীনাথ সাহা কিংবা চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর মতো সেও বেরিয়ে পড়তে পারে হত্যার অভিযানে। একটা রিভলভারে কটা গুলি থাকে—পাঁচটা, ছ'টা? যদি ছ'টা গুলি থাকে তা হলে তার পাঁচটা দিয়ে সে পাঁচজন বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করবে, আর বাকীটা—বাকী বুলেটটা সে খরচ করবে নিজের বুকে, হাসতে হাসতে প্রাণ দেবে বীর প্রফুল্ল চাকীর মতো।

দেশের জন্যে মরা! সে কি আশ্চর্য গৌরব—সে কি অপূর্ব সার্থকতা! ফাঁসির দড়ি হোক গলার মণিহার, পিস্তলের গুলি হোক দেশমায়ের আশীর্বাদ! নতুন দিনে স্বাধীন ভারতবর্ষে যে ইতিহাস লেখা হবে অক্ষয় অক্ষরে, সে ইতিহাসের পাতায় জ্বল জ্বল করতে থাকবে আরো অগণিত শহীদের সঙ্গে তারও নাম। সেদিন দেশের ছেলেরা তারও উদ্দেশে প্রণাম জানাবে, 'ফাঁসির সত্যেন'এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নামও লেখা হয়ে যাবে: 'ফাঁসির রঞ্জন।'

রঞ্জু উঠে দাঁড়ালো। পায়চারী করতে লাগল ঘরময়। মনটা একটু অন্তর্মুখী হলেই তার পুরোণো পাগলামি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তি করে যেতে ইচ্ছে করে। পায়চারী করতে করতে রঞ্জু আউড়ে চলল:

"সুখমুখে যে আসে মরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে,
বিধা হয়ে যাবা হতেছে ভিন্ন
পিছে পড়ে থাকে চরণ চিহ্ন
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয় বহ্নি ঘুমে—"

আচমকা থেমে গেল রঞ্জু। বেছে বেছে এই লাইন-গুলোই তার মনে পড়ল কেন, মাত্র দু তিনবার পড়া 'গুরু-গোবিন্দ' কবিতার পংক্তি তার মনের ভেতরে এমন ভাবে বাঁধাই বা পড়ে গেল কী করে? স্মৃতি-শক্তির গর্ব অবশ্য রঞ্জু করতে পারে, বাড়ির 'চয়নিকা'-খানা প্রায় তার কণ্ঠস্থ, কিন্তু নিতান্তই পরের বাড়িতে বসে পড়া এই কবিতাটা এমনভাবে তার স্মৃতির ভেতরে এত সহজে বাসা বেঁধে নিলে কেমন করে?

মনের আকাশে থম থম করছিল ঝোড়ো মেঘ, তার ফাঁক দিয়ে যেন এক টুকরো জ্যোৎস্না গলে পড়ল। অদ্ভুতভাবে একটা মোড় ঘুরে গেল চিন্তাটা। চোখের সামনে ছবির মতো দেখা দিল একখানা সাজানো বাড়ি, ফুলে ফুলে ভরা তার বাগান, সে বাগানের মাঝখানে হেনার কুঞ্জে ঘেরা একটা শ্বেত-পাথরের ফোয়ারা। একটুখানি জমিতে ঘনঘন করছে শিশিরে ধোয়া উজ্জ্বল ঘন-ঘাসের আনন্দ, চেনে বাঁধা ছোট একটি চিতি-হরিণ, তার দুটি গভীর নীল চোখে অফুরন্ত স্নেহ। সেই ফুল, সেই হেনার লতার আড়ালে শাদা পাথরের ফোয়ারা, বাতাসে টাট্‌কা ফোটা গোলাপ আর ধূপের গন্ধ, ফুলে ফুলে ছোট বড় প্রজাপতি, আর সব কিছুর ভেতরে ফুলের মতো, প্রজাপতির মতো, গোলাপ আর ধূপের সৌরভে জড়ানো একটি মেয়ে—যার ভালো নাম সংঘমিত্রা, ডাক নাম মিতা!

অন্যমনস্ক রঞ্জু ভাবতে লাগল, সংঘমিত্রা নয়, মিতাই ভালো। চেনে-বাঁধা হরিণের মতো শান্ত নীল চোখ, আনন্দ আর কৌতুকে উজ্জ্বল তার চলচলে মুখ। দুটি হাত জড়ো করে নমস্কার জানিয়েছিল, আশ্চর্য, নমস্কার জানিয়েছিল ছোট আর ছেলেমানুষ রঞ্জুকে।

আচ্ছা, মিতা কি পড়েছে এই সব বই, এমনি করে ভেবেছে তারও মতো? তাই সম্ভব, নিশ্চয়ই তাই। পরিমলের বোন সে, পরিমলের মতো একই চিন্তায়, একই সুরে তারও মন বাঁধা। রঞ্জুর ভাবতে ইচ্ছে করে এই বইগুলো পড়ে মিতারও কি তার মতো উত্তেজনা জাগে রিভলভার হাতে নিয়ে কাঁপিয়ে পড়তে, 'অত্যাচারের বক্ষে

পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি?' ছোট মেয়ে মিতা, সোমা হরিণের সঙ্গে যে মিতার মিতালি, সেও কি—

কিন্তু কল্পনাটা কেমন ভালো লাগল না। ফাঁসির দড়িতে মিতাকে ভাবতে কষ্ট হয়। রঞ্জুর কিশোর মন, কল্পাবতী মালক-মালায় স্বপ্ন-বিভোর মন বলল, না, না, ভারী সুন্দর মিতা। দিনের পর দিন ও আরো সুন্দর হয়ে উঠুক, মিতা বেঁচে থাকুক—এ আগুনের হলকা যেন কোনোদিন ওকে ছুঁয়ে না যায়।

—রঞ্জু, রঞ্জন?

বাইরে থেকে কে চেঁচিয়ে ডাকল।

রক্ত চমকে উঠল সর্বাঙ্গে। পরিমল? দরজা খুলে রঞ্জু বেরিয়ে এল বাইরের বারান্দায়: কে?

কিন্তু পরিমল নয়। পাকাশি-ভরা গালের পাশ দিয়ে ভ্যাংচানির ভঙ্গিতে আধখানা জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছে ভোনা। সঙ্গে সঙ্গে দলটিও ঠিক আছে তার—কালী, খাদু, পূর্ণ। ভবেন মজুমদারের সেই কেলেঙ্কারীটা কবে চুকে-বুকে গেছে, দলবলের মধ্যে ভোনা আবার পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার হয়ে উঠেছে মনসাতলা মার্বেল পার্টির একমাত্র নেতা।

বিরক্তিতে রঞ্জুর মুখ কুঞ্চিত হয়ে গেল: ডাকছিস কেন?

ভোনা জিভের ডগাটায় একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে সেই পুরোণো কবিতার লাইন দুটো শুনিয়ে দিলে:

"Jim is a good dog,
Is he catching a frog?"

হ্যালো গুড্ ডগ জিম, কী করছিস?

রঞ্জু বললে, সকালবেলা কী ইয়ার্কী এ সব?

—এ সব ইয়ার্কী নয়? ওরে বাবা, ভালো ছেলে এখন ধম্মো কথা শুনতে চায়। শুনবি ধম্মো কথা? সংস্কৃত?—ভোনা বিশ্রী মুখভঙ্গি করে শুরু করলে, ওঁ শম্ন আপো ধন্বন্যা শমন সন্তুন্যা, শমো সমুদ্রিয়া আপঃ শমন সন্তুকুপ্যা—

কিছুদিন আগে শৈতে হয়েছে ভোনার, তারই খানিকটা মন্ত্র গড়গড় করে আউড়ে গেল সে।

খাদু বাধা দিয়ে বললে, থাম্‌না, কেন বাজে কথা বলছিস। শোন্ রঞ্জু, আজ সন্ধ্যের পর বেরুতে হবে।

—কেন?

—বাঃ, তুই আছিস কোথায় রে? আজ যে নষ্টচন্দ্র। অতুল ঘোষের লিচু বাগানে আজ—হুঁ-হুঁ।

মনটা কালো হয়ে গেল রঞ্জুর। দিনের পর দিন এই দলটা সম্পর্কে তার অশ্রদ্ধা বেড়েই চলেছে সমান ভাবে। সেই কুৎসিত কদর্য কথাগুলোকে সে ভোলেনি, ভোলেনি গোঠের খেলার সে অতি তিক্ত অভিজ্ঞতাটা। তবুও সে বিরক্তিটা চাপা পড়ে গিয়ে একটা নতুন শ্রদ্ধা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—দেখা দিয়েছিল একটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়। 'থাওা উচে রহে হামারা'। ছাব্বিশে জানুয়ারীর স্বাধীনতার সংকল্প। পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছে ভোনা। তারও পরে—

ভবেন মজুমদার। পেছনে পেছনে ক্যানেস্তারার শোভাযাত্রা। তার পরে আবার যেমন ছিল ঠিক সেই রকম। বান ডেকেছিল, এসেছিল নতুন আত্মাইয়ের কূলপ্লাবী নতুন বন্যা—একাকার হয়ে গিয়েছিল গ্রাম-প্রান্তর, নদী-নালা, দিগ্‌দিগন্ত। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ নেমে গেল সে জল। পড়ে রইল সেই পচা ডোবা, সেই দুর্গন্ধ জল, কচুরিপানা, আর ব্যাঙাচির ঝাঁক। মনসাতলা থেকে সেই মার্বেল কাটানোর শব্দ: 'হাত ইস্টেট্—উড্ডু কিপ্'—, আজ আবার সেই পুরোণোর পুনরাবৃত্তি—অতুল ঘোষের লিচু বাগানে নষ্টচন্দ্র।

রঞ্জু বললে, না।

—না কেন? চমৎকার লিচু, ভালো মধুকরপুরী লিচু। একটা খেলে আর ভুলতে পারবি না। আর ভালো ছেলেগিরি করতে হবেনা, সন্ধ্যেবেলা ডেকে নিয়ে যাবো, কেমন?

রঞ্জু ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। না। একটা বিস্বাদ-বিরক্ত-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এদের দিকে। শুধু এরা খারাপ ছেলে বলেই নয়, আজ একটা নতুন ধাক্কায়, নতুন একটা আশ্চর্য পথের সংকেতে এদের সঙ্গে তার ব্যবধানটা আরো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এই মনসাতলা নয়, রহস্যময় কাঞ্চননদীর বালিডাঙা নয়, এই শহর মুকুন্দ-পুরের খোয়াওঠা রাস্তা, নড়বড়ে ল্যাম্প্ পোষ্ট্, বাজারের নোংরা দাড়োয়াড়ীপট্টি কিংবা ইঁট বার করা একতলা দোতলা জীর্ণ বাড়ীগুলোও নয়। অন্ধকার রাত্রে নক্ষত্রভরা আকাশে প্রসারিত আকাশগঙ্গার মতো আজ তার মনের মধ্যে

শুরু হয়েছে একটা সুদূর অপরিচয়ের ছায়াপথে। আলো আঁধারের অচেনালোকে সেখানে বিকট শব্দে বোমা ফেটে পড়ছে কুলকুরির মতো, ছুরির নীল উজ্জ্বল ধলার মতো রিভলভারের ছুটন্ত আগুন ; ফাঁসিকাঠ রঞ্জু দেখেনি—তবুও সে চিনতে পারছে ফাঁসির দড়িতে দুলছে উজ্জ্বল করেকটি জ্যোতির্ময় মূর্তি—ওরা কারা ? ক্ষুদিরাম ? সত্যেন বসু ? কানাইলাল ? বীরেন গুপ্ত ?

এই ভোনা, এই কালী, খাঁদু আর পূর্ণ—এরা সে অপূর্ব মায়ালোকের কল্পনাও করতে পারে না। নিতান্ত নীচুতলার জীব এরা, এরা করুণার পাত্র। রঞ্জু বললে, মাপ করতে হবে ভাই, ও সবের মধ্যে আমি নেই।

—অঃ ?—গালের পাশ দিয়ে জিভ বের করে ভেংচে দিলে ভোনা, পিট্‌পিট্ করে উঠল শয়তানী-ভরা চোখদুটো। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, থাকো বাবা, ঘরে বসে গুড্ কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাও। চলে আয় খাঁদু, ওই গঙ্গা-কড়িংটাকে দিয়ে কাজ হবে না।

দলটা চলে গেল। যেতে যেতে উচ্চৈস্বরে গান ধরলে ভোনা :

'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে—

খাঁদু চীৎকার করে উঠল, এন্‌কোর, এন্‌কোর।

ইস্কুল ছুটি। দুপুরে নিঃসাড় পায়ে রঞ্জু বেরিয়ে এল খিড়্‌কি দরজা দিয়ে, এসে বসল ঠাণ্ডা ছায়ায় ঘেরা পাখিডাকা নির্জন ছাইগাদাটার পাশে। বই দুটো সঙ্গে করে এনেছে, আর এনেছে খাতা পেনসিল। খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল রেললাইনের কালো রেখা দুটোর দিকে, মোটা মোটা পাতার আড়ালে গাঢ় সবুজ উজ্জ্বল কচি বাতাবীগুলোর দিকে, যেখানে আমগাছে মোটা একটা লতার সঙ্গে পাকা একটা লাল টুক্‌টুকে বন-কাকুড় দুলছে, তার দিকে। তার পর পেন্‌সিলের পেছনটাকে কামড়ালো খানিকক্ষণ, গোটা কয়েক দাঁতের দাগ ফেলল, খাতার মলাটে এলোমেলোভাবে একটা পাখি আঁকল, সেটা হাঁস আর ময়ূরের মাঝামাঝি একটা প্রাণী, নিজের নামটা জড়ানো ইংরেজিতে সই করবার চেষ্টা করলে বারকতক, তারও পরে লিখতে শুরু করল।

কতক্ষণ লিখেছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ পেছনে তনল হাসির শব্দ। কেমন ভয় করল, থর থর করে কেঁপে উঠল হাতটা, পেন্‌সিল গড়িয়ে পড়ল নীচে।

আর কে ? পরিমল। এম্‌নি করে চমক লাগিয়ে দিতেই ভালোবাসে।

সেই পরিচিত উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত পরিমলের মুখ। বললে, ধরে ফেলেছি।

খাতাটা রঞ্জু লুকোবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু এর মধ্যেই সেটাকে ঝাঁ করে ছিনিয়ে নিয়েছে পরিমল। তার পর দু পা ঘুরে সরে গিয়ে, যাতে রঞ্জু কেড়ে নিতে না পারে, পরিমল পদ্য পড়ার বিশ্রী ঢংয়ে পড়তে আরম্ভ করল : 'কানাইলাল'।

—'কানাইলাল ?'—বিস্মিত দৃষ্টি রঞ্জুর মুখের ওপরে ফেলল পরিমল : কানাইলালকে নিয়ে তুই কবিতা লিখছিস কেন রে ?

—যদি লিখি তো তোমার কী। খাতাটা ফেরত দাও।

—দাঁড়া, দাঁড়া, ভারী ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।—পরিমল আরম্ভ করল :

মৃত্যুর রূপ এত সুন্দর এ কথা জানিনি আগে,
চিরচঞ্চল প্রাণের লীলায় মত্ত-পিনাকি জাগে।

বেদনা-বিহ্বল কাজল নয়নে
বিদ্যুৎশিখা হেরি ক্ষণে ক্ষণে

একটি মানবে যুগমানবের মূর্ত প্রতীক হেরি,
মৃত্যুর মাঝে বাজারে গেলে সে সত্যের জয় ভেরী।

আরে, আরে !—পরিমলের কৌতুকভরা সরসকণ্ঠ হঠাৎ শ্রদ্ধা আর মুগ্ধতায় নিবিড় হয়ে উঠল : এ যে সত্যিকারের একজন নারব কবিকে আবিষ্কার করা গেল। এত ভালো তুই লিখতে পারিস তা তো জানতুম না। বলতুম টুক্‌লি করেছিস, কিন্তু তাও তো বলতে পারি না। কারণ কানাইলালকে নিয়ে কেউ আজ পর্যন্ত কবিতা লেখেনি, এ ব্যাপারে তুই-ই বাংলার প্রথম কবি।

রঞ্জু সঙ্কুচিত হয়ে বললে, থাক, রেখে দে।

—রেখে দেব কি রে ! এ যে আবিষ্কার।

শত শ্যামলা বাংলা মায়ের স্নেহ-অঞ্চলে,
রুদ্র বিষাণ উঠেছে বাজিয়া, খড়্গ উঠেছে জ্বলে !

এই সব কচি কিশোরের প্রাণে
আছিল সুপ্ত কোথা কোন্‌খানে
রক্তের হেন উগ্র পিপাসা বহ্নির এই জ্বালা,
রচিল কেমনে বুকের রক্তে মায়ের বরণ-মালা!

না, এ কবিতা তোরে পড়া যাবে না।—পরিমল নীহুরে লেখাটার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল। পড়া যখন শেষ হল, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে চুপ করে রইল সে, কোনো কথা বললে না, ভালো মন্দ কোনো মন্তব্যও করলে না। মাটি থেকে একটা চোরকাঁটার শিষ তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বললে, তুই যা লিখেছিস তা কি তুই বিশ্বাস করিস রহু?

—কেন করব না?

পরিমল ছোট্ট করে হাসল: ঠিক তা নয়। বই দুটো তুই পড়েছিস তা বুঝতে পারছি। কিন্তু হঠাৎ কোঁকের মাথায় পাখিকটা লিখে যাওয়া এক জিনিস, আর তাকে মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করা একেবারে আলাদা ব্যাপার। এ সব উচ্ছ্বাসের কোনো দাম নেই, কাজের বেলায় দেখা যায় সবটাই ফাঁকি।

পরিমলের বলার ধরণের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে অপমানিত বোধ করলে রহু, ভেতে উঠল মন। চঠাৎ শিরদাঁড়াটা সোজা করে বললে, তোকে কে বললে এর সবটাই উচ্ছ্বাস?

—না, এমনি।—পরিমল কথাটাকে ঘুরিয়ে নিলে, থাক ও-সব। কেমন লাগল বই দুটো?

ক্ষুণ্ণ স্বরে রহু বললে, চমৎকার। আর বই নেই এ রকম? সেই 'পথের দাবী'?

—আছে, সবই আছে। দেব আস্তে আস্তে। কিন্তু পরিমল আবার ঘুরিয়ে নিলে কথাটাকে: আজ বিকেলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি রহু?

—কোথায়?

—পুব পাড়ায় আমাদের একটা জিম্‌নাষ্টিক ক্লাব আছে, লাইব্রেরীও আছে। নাম 'তরুণ সমিতি।'

ক্ষুদিরাম কানাইলালের সঙ্গে যে মন আকাশ গঙ্গার মায়াস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার 'তরুণ সমিতি'র পরিণতি রহুর ভালো লাগল না। নিরুৎসাহিত গলায় বললে, কী হয় সেখানে?

—একসারসাইজ হয়, বক্সিং হয়, লাঠি আর ছোরা খেলা শেখানো হয়। তা ছাড়া লাইব্রেরীতে অনেক ভালো ভালো বই আছে, তুই তো পড়তে ভালোবাসিস।

রহুর আগ্রহ আবার সজাগ হয়ে উঠল: এ সব বই পাওয়া যাবে? এই ফাঁসির ডাক, এই শহীদ সত্যেন?

—পাগল নাকি রে? কী ছেলেমানুষ তুই!—পরিমল হাসল: এ সব যে বাজেয়াপ্ত বই। এ সমস্ত বই রাখলে পুলিশে ধরবে না?

—বাজেয়াপ্ত বই!—বইগুলো যে সাধারণ নয়, তা তো পড়েই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু 'বাজেয়াপ্ত' কথাটা—আর তার সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগের উল্লেখ শুনে যেন সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠল তার।

পরিমল মিটিমিটি হাসল: হ্যাঁ বাজেয়াপ্ত বই।

—তবে এ সব বই তুমিই বা পেলে কোথায়? তুমিও কি পুলিশকে ভয় করো না?

—চুক্—জিভে আর তালুতে মিলিয়ে হতাশভরা একটা শব্দ করলে পরিমল: তুই একেবারে হোপ্‌লেস। যচ্ছ বেশি তোর কৌতূহল। এত সহজেই কি সব কথা জানা যায়—না জানতে দেওয়া যায়? ধৈর্য ধরতে হয়, অপেক্ষা করতে হয়, তৈরী করে নিতে হয় মনকে। সে সব হবে পরে। কিন্তু একটা কথা তোকে বলি রহু। এ সব কবিতা যদি লিখতে হয় তা হলে সামলে চলিস। এ সব বই পড়া যতটা অন্যায়, এ রকম কবিতা লেখাও তার চাইতে কম অন্যায় নয়।

মুখ গোঁজ করে রহু বললে, আমি কাউকে ভয় করি না।

পরিমল বললে, বোকার মতো কথা বলে না। এ তোর অহিংসে খদ্দর-মার্কা ব্যাপার নয় যে হৈ চৈ করতে করতে জেলে যাবি আর কাশীর ষাঁড়ের মতো ফুলের মালা চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে আসবি। সি-ই-ডির ঘা কতক হাণ্টার, আর হাতের নোখে গোটা কয়েক পিন্ ফুটলেই বুঝতে পারবি কত ধানে কত চাল বেরোয়।

রহু চুপ করে রইল। কল্পনার ছায়াপথের আগে পাশে আরো কতগুলো নতুন জিনিসের আভাস পাচ্ছে মন। কিছু একটা প্রায় বুঝতে পারছে, অথচ ধরতে পারছে না। মনের-এ অবস্থাটা সব চেয়ে অসহ্য।

পরিমল উঠে পড়ল।

—বই দুটো তো পড়া হয়ে গেছে, আমি নিয়ে চললাম।

—নতুন বই?

—পরে দেব। আর ভালো কথা, যদি তুই আজকে আসবি আমাদের ক্লাবে? ঘণ্টা দেড়েক পরে ডাকতে আসব?

—আসিস।

পরিমল চলে গেল। পেন্‌সিল মুখে দিয়ে রঞ্জু ভ্রূকুটি-ভরা চোখে নিরীক্ষণ করতে লাগল সদ্যরচিত কবিতাকে। এ কি সত্যিই একটা সাময়িক আবেগ, না রক্তে রক্তে শিরায় মেলে দেওয়া দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ একটা প্রতীতি? (ক্রমশঃ)

স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন মাত্র

শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-টি

ফরাসী পণ্ডিত যখন রাজা হবুচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, তাঁর "হিং টিং ছট্" এর স্বপ্নটা 'শুধু স্বপ্নমাত্র', তার অর্থ কিছু নাই, তখন সভাজন তাঁহাকে ধিক্ ধিক্ করিয়া উঠিল; তাহারা বলিল—

"স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন মাত্র মস্তিষ্ক বিকার,
এ কথা কেমন করে করিব স্বীকার?
জগৎ বিখ্যাত মোরা "স্বপ্নপ্রাণ" জাতি
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে! হুঁসুরে ডাকাতি!

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যঙ্গ শুনিয়া আমরা হাসি বটে, কিন্তু স্বপ্নটাকে আমরাই কি সহজে "মস্তিষ্ক বিকার" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি?

তাই যদি হইবে তাহা হইলে আত্মীয়ের রোগ-মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন দেখিলে আমরা অত বিচলিত হইয়া পড়ি কেন? তিথি-বিশেষের সু-স্বপ্ন দেখিলে উল্লসিত হই কেন? স্বপ্নাদ্য মাদুলী, স্বপ্নাদ্য ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই কেন? স্বপ্নাদেশ পাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দেবমন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া দেই কেন?

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ইহা হয় মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বশতঃ। যাহারা স্বয়ং-সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্যের ধ্বজ লইয়া সব জিনিষকেই যাহা হউক একটা ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহাদের কথা বাদ দিয়া দেখি বহু প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ছোট বড় অনেকেই এই জিনিষটি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং এ জিনিষটার গুরুত্ব যে একেবারেই নাই, তাহা বলিতে পারি না এবং স্বপ্ন সম্বন্ধে পাঁচ জনে কি বলে তাহাও জানিয়া রাখা মন্দ নয়।

কেহ কেহ বলেন, স্বপ্নে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরীক্ষাতে হয়ত স্বপ্ন দেখিলাম পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছি। কিছু দিন পরে যখন ফল বাহির হইল তখন দেখা গেল কথাটা মিথ্যা নয়—। এ ক্ষেত্রে স্বপ্ন সত্যের নির্দ্দেশ দেয় বটে, কিন্তু এ জাতীয় স্বপ্ন হইতে কোনও সত্যের বা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না; কারণ স্বপ্ন যে শুধু ভবিষ্যতের কথাই বলে তাহা নহে, ইহাতে অতীতের কথাও মাঝে মাঝে থাকে এবং অসম্ভব ও অসঙ্গত কথাও থাকে। আমি যদি স্বপ্নে দেখি যে আমি পাখী হইয়া উড়িতেছি, তাহা হইলে এই বুঝিব না যে এই উড়িবার ব্যাপারটা আমার একটা ভাবী ঘটনার নির্দ্দেশ দিতেছে।

এই জন্য এক জাতীয় পণ্ডিত শরীরতত্ত্ব ও অনুষঙ্গ (association) দ্বারা সমস্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন—ভিজা জামা বা কাপড় পরিয়া নিদ্রা যাইলে হয়ত জলে ডুবিয়া যাইবার স্বপ্ন দেখিব, শুইবার সময় হাত পা খাটের বাহিরে ঝুলিয়া থাকিলে হয়ত স্বপ্ন দেখিব ছাদ হইতে পড়িয়া যাইতেছি, বুকে সর্দ্দি বসিলে হয়ত স্বপ্ন দেখিব কেহ আমাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, ইত্যাদি।

আমাদের অনেক স্বপ্নকেই এই জাতীয় একটা ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝান যাইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা রাজা হবুচন্দ্রের হিং টিং ছট্ এর স্বপ্নের কথাটি ধরিতে পারি। হবুচন্দ্র স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—তাঁহার শিয়রে বসিয়া তিনটি বাঁদরে 'পরম আদরে' উকুন বাছিতেছিল এবং একটু নড়িলে চড়িলেই তাহারা তাঁহার গালে চড় মারিতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে এক বেদে তাঁহাকে তাহার পোষা পালান-পাখী মনে করিয়া ধরিতে বলাইয়া দিল এবং কোথা হইতে এক বুড়বুড়ি বুড়ি আসিয়া তাঁর পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিতে লাগিল। রাজা ঘুমাইলে পড়িলেন; পায়ে সুড়সুড়ি লাগে, পা দুটি তুলিতে চাহেন, তাও পারেন না! এ জাতীয় স্বপ্নও আমরা কম দেখি না—ইহাদের সম্বন্ধে কি ব্যাখ্যা দিব?

অনুষঙ্গবাদী পণ্ডিতেরা অনেক কথাই বলিবেন। তাঁহারা বলিবেন হবুচন্দ্রের স্বপ্নে যে বাঁদর হইতে বেদে এবং বেদে হইতে বুড়ির দিকে তাঁহার চিন্তা-স্রোত মোড় ফিরিয়া চলিয়া গেল তাহার একটা সঙ্গত কারণ আছে। একজন সংবিৎ (hypnotised) লোককে যদি বলা হয় "তুমি ইঁদুর হইয়া যাও" তাহা হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে লোকটি সত্য সত্যই ইঁদুরের মত স্বরের কোন ধরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কেন এমন হয়? তাহার উত্তর হইতেছে এই যে, স্বল্প আলোক অবস্থায় আমাদের

মূল মস্তিষ্কের (cerebrum) কাজ ঠিক থাকে বলিয়া আমরা সাবধান থাকি। কাজেই তখন যদি আমাকে বলে আমি ইঁদুর হইয়া গিয়াছি, তৎক্ষণাৎ বিচার বুদ্ধি দিয়া আমি বুঝিতে পারিব যে আমি ইঁদুর নই, সুতরাং "তুমি ইঁদুর হইয়া গিয়াছ" এই জাতীয় নির্দেশ (suggestion) আমি মানিয়া লইব না। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের মূল-মস্তিষ্কের ক্রিয়া ঠিক থাকে না বলিয়া এই জাতীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া আসে না, ফলে আমাকে কেহ ইঁদুর বলিলে আমি সত্যই নিজেকে ইঁদুর বলিয়াই মনে করি ও তদনুরূপ আচরণ করিতে চেষ্টা করি।

স্বপ্নের সময় এই জাতীয় একটা ব্যাপার হয়। তখন মূল মস্তিষ্কের কার্য্য খানিকটা লুপ্ত থাকে, ফলে অনুষঙ্গ (association) আমাদের চিন্তাগুলিকে যেভাবে ইচ্ছা ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং আমরা তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার না করিয়া, সম্ভাব্যতা বিচার না করিয়াই তাহাতে সায় দিই।

জিনিষটা এইভাবে হয়—

ধরুন আমি একদিন নৌকা করিয়া যখন গঙ্গা পার হইতেছিলাম তখন আমার নৌকায় একটি ছাগ শিশু এবং তাহারই অনতিদূরে একটি সুন্দরী যুবতী বসিয়াছিল। এই ছাগ শিশুর সহিত সুন্দরীর অনুষঙ্গ আমার মনের মধ্যে গাঁথিয়া গেল। পরে একদিন হঠাৎ একটি বৃহৎ মুৎসিৎ রামছাগল দেখিয়া আমার হয়ত একটি সুন্দরীর মুখ মনে পড়িয়া গেল। ছাগলের সহিত সুন্দরীর কি সম্পর্ক তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিবে না ; কিন্তু এই দুইটির মধ্যে আমার মনে হয় যে, একটু অনুষঙ্গের বন্ধন তৈয়ারি হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য্য।

এই অনুষঙ্গ-প্রচেষ্টা বিরহই একটা জিনিষের সঙ্গে আর একটা জিনিষকে জোড়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জাগ্রত বুদ্ধি তাহাদের সবগুলিই মানিয়া লয় না। স্বপ্নের সময় এ সতর্কতা থাকে না, ফলে স্বপ্নে যদি কেহ দেখে লর্ড ওয়াভেল্ ছেঁড়া লুঙ্গি পরিয়া তাহার বাড়ীতে ঘরানির কাজ করিতেছে তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই যে তাহাকে পাগল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এমন কোনও কারণ নাই। কারণ লর্ড ওয়াভেলের সহিত যে ছেঁড়া লুঙ্গি অথবা ঘরানিগিরির কোনও সম্পর্ক নাই, এটুকু বিচার করিবার মত পাকা অভিজ্ঞতাটি নিদ্রার সময় তাহার মাথার ছেড়া কোয়ার্টারে কর্ম্ম নিরত ছিল না।

এই জাতীয় ব্যাখ্যায় বুঝান যাইতে পারে—হুভেচ্ছের ঘরটির অথবা এই অনুষঙ্গের অযাচ জোড়া-তালির ব্যাপার আছে।

কিন্তু অনুষঙ্গ কি নিতান্ত অকারণেই এই সমস্ত জোড়া তালির ব্যবস্থা করে? একটা জিনিষকে ছাড়িয়া যে আর একটাকে ধরিয়া লয়, ইহার মধ্যে কি ইচ্ছা-শক্তির লীলা নাই?—নিতান্ত অকস্মাৎ ও কোন জিনিষ ঘটে না—তাহা হইলে স্বপ্নের মধ্যেই বা তাহা হইবে কেন?

সেইজন্য ফ্রয়েড্ বলেন সমস্ত স্বপ্নের মধ্যেই ইচ্ছার ইঙ্গিত আছে। যখন আমরা কোনও জিনিষ পাইতে চাই অথচ পাই না তখন স্বপ্নের মধ্য দিয়া তাহাকে পাইতে চেষ্টা করি। সেইজন্যই পূজার সময় ছেলেরা স্বপ্ন দেখে নূতন জামা কাপড়ে ঘর বোঝাই হইয়া গিয়াছে, দরিদ্র লেখক দেখেন ভাগ্য ওয়ালা, সম্পাদক অযাচিতভাবে তাঁহাকে তাঁহার পুরাতন লেখার জন্য টাকা পাঠাইয়া দিতেছেন—আর কেরাণী দেখে "বোনাস্" বা "ইন্‌ক্রিমেন্ট্"এর স্বপ্ন।

একটি ছাত্র কয়েক মাস বাড়ীতে পড়িয়া পরীক্ষায়ে টিউশনির টাকাটা না দিয়া পলাইয়া গেল। দরিদ্র মাষ্টারির জীবনে এই হিসাবের টাকাটা না পাওয়াতে পারিবারিক বাজেটে ঘাটতি পড়িল। এমন সময় মাষ্টার-গৃহিণী স্বপ্ন দেখিলেন—ছেলেটি বাড়ীতে আসিয়া টাকা কয়টি দিয়া গেল। বলা বাহুল্য—এই তোষের স্বপ্ন হওয়া সত্ত্বেও সফল হয় নাই।

এ জাতীয় স্বপ্নের সহিত আমাদের পরীর জন্মের কোনও সম্পর্ক নাই। এগুলি আমাদের অসম্পূর্ণ ইচ্ছাকে পূর্ণ করে মাত্র।

ফ্রয়েড্ বলেন—স্বপ্ন মাত্রেরই এই গুণ আছে। সমস্ত স্বপ্নই ইচ্ছা-পরিপূরক। তবে ঠিক যেটি বা যেমনটি আমরা করি ঠিক সেটি হয়ত স্বপ্নে পূর্ণ হয় না।

ব্যাপারটা এইভাবে ঘটে—

ফ্রয়েড্ বলেন মানুষের মনের মধ্যে তিনটি শক্তির লীলা চলিতেছে। প্রথম শক্তিটি হইতেছে ইদ্ (Id)। ইহা হইতেছে জীবনের মূল প্রেরণা, যাহা দিয়া আদিম কামাদি লোপের দ্বারা নিজের তৃপ্তির চেষ্টা করে। ইহা নীতি-জ্ঞানের ধার ধারে না, সমাজ, আদর্শ, পরিবেশ প্রভৃতিকেও খাতির করে না। দ্বিতীয় শক্তিটি হইতেছে অহম্ (Ego) যাহা পরিবেশ, আদর্শ প্রভৃতির সহিত ইদ্ এর দাবীর একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করে। আর তৃতীয় শক্তিটি হইতেছে অধিশাস্তা (Super-ego)। ইহা অভিভাবক স্থানীয় হইয়া নীতির শাসনে মানুষের 'ইদ্'এর দাবীগুলিকে শাসিত করে। ইহার কাজ 'ইদ্'এর ঠিক বিপরীত।

এখন ইদ্এর অন্যায় কামনা যদি মনের মধ্যে দানা বাঁধিয়া প্রতিনিয়ত তাহার দাবী জানাইতে থাকে তাহা হইলে অধিশাস্তা সেই কামনাকে অবদমিত করিয়া মনের নির্জ্জন গুহে তাহাকে নির্ব্বাসিত করে।

কামনা ও নীতির বিরোধে মন যখন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠে এবং কামনার উত্তাপে মনের মধ্যে একটা ফুট (Complex) সৃষ্টি হইয়া যখন মানুষকে পাগল করিবার চেষ্টা করে, তখন "অহম্" এই দুইটি বিরোধী শক্তির মধ্যে একটা আপোষের চেষ্টা করে। সে তখন স্বপ্নের মধ্য দিয়া এই অপূর্ণ-কামনাকে খানিকটা তৃপ্তি দেয়।

ধরুন একটি যুবক এমন একটি নারীর প্রতি আসক্ত হইয়া উঠিয়াছে—যাহার সহিত মিলন নীতির দিক দিয়া অনুমোদিত হয় না। এ অবস্থায় অধিশাস্তা মন নিশ্চয়ই সেই কামনাটিকে নির্জ্জন গুহে পাঠাইয়া দিবে। কামনাটি তখন অবদমিত হইল বটে, কিন্তু মরিল না এবং তাহার দাবীও গেল না। ব্যক্তিজীবনে যে আশা পূর্ণ হইবার নয়, স্বপ্ন দিয়াও যাহাতে তাহা পূর্ণ হয় সে চেষ্টা তখন "অহম্" করিতে লাগিল। কিন্তু স্বপ্নের দ্বারদেশেও অধিশাস্তার (Super-ego)

প্রহরী (Censor) বসিয়া আছে। দুজনেই স্বপ্নে তাহার সহিত আত্মীয় সহিত মিলনের ছবি দেখিতে চাহিল, প্রহরী মহাশয় তখন তাহা অনুমোদন করিলেন না। শেষ পর্যন্ত দুজনেই স্বপ্ন দেখিল, একটি সুন্দর কুসুমকে সে বুকে জড়াইয়া আদর করিতেছে। প্রহরীর (Censor) চক্ষে ধূলা দিয়া 'অহম' এইভাবে প্রিয়াকে রূপান্তরিত করিয়া তাহার অপূর্ণ কামনাটিকে পূর্ণ করিল।

ফ্রয়েড্ বলেন, স্বপ্ন মাত্রই ইচ্ছাপূরক। অপূর্ণ ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়া, অনেক সময় দুঃখের ভার ঘোলে মিটাইয়া মনের কষ্ট ও অস্বস্তিভাব বিদূরিত করিয়া স্বপ্ন আমাদের মনের সুস্থতা আনয়ন করে।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? যদি ইচ্ছা পূরকই হইল তাহা হইলে আমরা এমন স্বপ্ন দেখি কেন যাহা কোনও দিনই আমরা ইচ্ছা করিতে পারি না! প্রিয়তম আত্মীয় বন্ধুর মৃত্যু, আকস্মিক বিপদ্ প্রভৃতির দুঃস্বপ্নও ত আমরা দেখি। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে আমাদের প্রিয়তম আত্মীয়ের মৃত্যু প্রভৃতিই আমরা কামনা করিয়া থাকি?

ফ্রয়েড্ বলেন—না। প্রিয়তম আত্মীয়ের মৃত্যু হয়ত কামনা করি না। অথচ যাঁহার মৃত্যু দেখিলাম তিনি হয়ত স্বরূপে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন;—হয়ত অফিসের বড়বাবু, হয়ত ক্লাবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি,—যে সরিয়া গেলে আমাদের উন্নতির পথ অধিক প্রশস্ত হইবে। স্বার্থপর মন দিয়া হয়ত আমরা ইহাদের মৃত্যু কামনাই করি—আর রীতি-নিষ্ঠ অধিশাস্তা মন তাহাতে বাধা দেয়। তখন স্বপ্ন আসিয়া আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দেয়। পাপ করিলে বা অন্যায় কার্য করিলে অধিশাস্তা মন যেমন অনুতাপ দিয়া, অনুশোচনা দিয়া আমাদের শাস্তি দেয় তেমনই এই জাতীয় দুঃস্বপ্ন দিয়া ইদ্ এর স্বার্থপর বাসনার জন্য আমাদের শাস্তি দেয়।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যার জন্য কতকগুলি প্রতীকের সাহায্য লওয়া হয়। যথা রাজা হইতেছে পিতার প্রতীক, রাণী মাতার প্রতীক,—সাপ কলম প্রভৃতি পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক,—বাক্স দেরাজ প্রভৃতি স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই প্রতীকগুলি সার্বজনীন হইতে পারে না; দেশ, কাল, পাত্র এবং পরিবেশ বিশেষে প্রতীকগুলির বিভিন্ন অর্থ হওয়াই সম্ভব।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব স্বপ্নতত্ত্বের উপর অনেকখানি নূতন আলোকপাত করিয়াছে সত্য; স্বপ্নের দ্বারদেশে প্রহরীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, স্বপ্নটি বাস্তবিক বা বস্তুটি অন্য একটি জিনিষের ছদ্মরূপ হইতে পারে তাহা স্বীকার করিয়া ফ্রয়েড্ আমাদের মনের অনেক গোপন কথার আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তবু আমাদের মনে হয়, এই সমস্ত আধিভৌতিক ব্যাখ্যা ছাড়া ইহার একটা আধিদৈবিক ব্যাখ্যাও থাকিতে পারে। এমন অনেক স্বপ্ন আমরা কখনও কখনও দেখি যাহা জড়বিজ্ঞান দিয়া ঠিক বুঝান যায় না। তাহারা স্বপ্নের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরিচয় পায় জড়বিজ্ঞান তাহার সম্বন্ধে কি ব্যাখ্যা দিবে? মাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবনে অবস্থান কালে দেখিলেন, গোবর্ধনে একটি কিশোর গোপাল বালক এক ভাঁড় দুধ বিক্রি করিতে আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মাধবেন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল ব্রজের গোপাল শ্রীকৃষ্ণের কথা। রাত্রে মাধবেন্দ্র স্বপ্ন দেখিলেন—সেই গোপাল বালক বলিতেছেন—"আমি অরুট পর্বতে গভীর আরণ্যের মধ্যে প্রোথিত আছি, যবনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণ আমাকে এই স্থানেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল; আমি এতদিন তোমার জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছি, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা কর।" মাধবেন্দ্র তখন স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে সমস্ত করিয়া সযত্নেই গোপালের মূর্তিটিকে আবিষ্কার করিলেন এবং বৃন্দাবনে নূতন করিয়া গোপালজীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনেক ভক্ত সাধু লোক এই জাতীয় স্বপ্ন দেখেন এবং তাহাতে প্রত্যক্ষাতীত অতীন্দ্রিয় জিনিষের সন্ধান পান। তাঁহাদের এই সমস্ত স্বপ্নের গল্পগুলিকে যে মিথ্যা, তাহা বলিতেও সাহস হয় না; সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা কোন স্বার্থের জন্য মিথ্যা গল্প প্রচার করিবেন?

জড়বিজ্ঞান এ জাতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা এখনও দিতে পারে নাই।

কথা নয় কথা নয়

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ওগো কথা নয় কথা নয়
আঁখিতে আঁখিতে অতল-বিজন
ভাষাহীন পরিচয়।

আঁখি তুলি' শুধু মোর পানে চাও
আর কথা আজ সব ভুলে যাও।
নয়ন বিভাড়ি' যাও ফেলে যাও
সঙ্গীত প্রণয়।
কথা নয়, কথা নয়।

নব অনুরাগে অন্তরলোকে
পিয়াসী মনের আশা
চকিত চমকে চকিল লুটিয়া
বুকভরা ভালবাসা!
জেগে ওঠে তবু কোন্ মরমিয়া
কেঁদে মরে তাই বিরহীর হিয়া।
প্রাণে প্রাণে আর চোখে চোখে আজি
হৃদয়ের বিনিময়—।
কথা নয় কথা নয়।

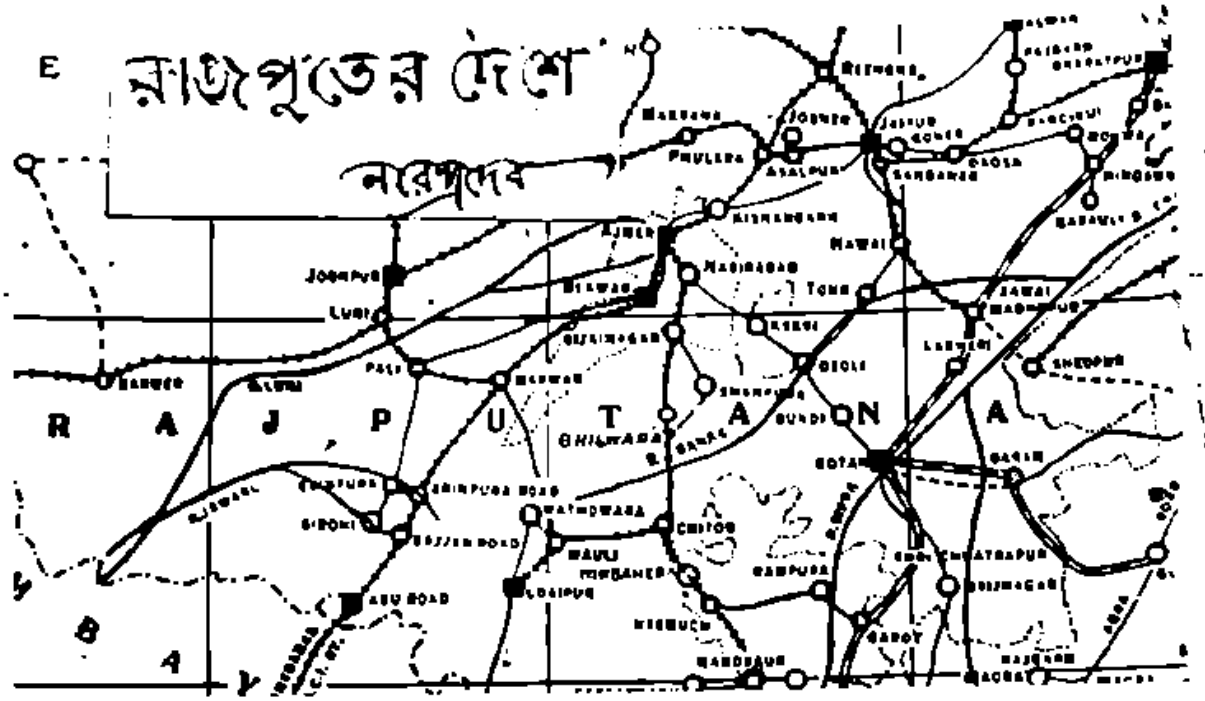

এর পরবর্ত্তী রাজাদের কথা বলে কোনও লাভ নেই। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পর পর যে চারজন ব্রিটীশের একান্ত বশম্বদ নৃপতি ছিলেন। যাকে বলে তাদের গোলাম। আমরা যাঁর অতিথি হবার সৌভাগ্য

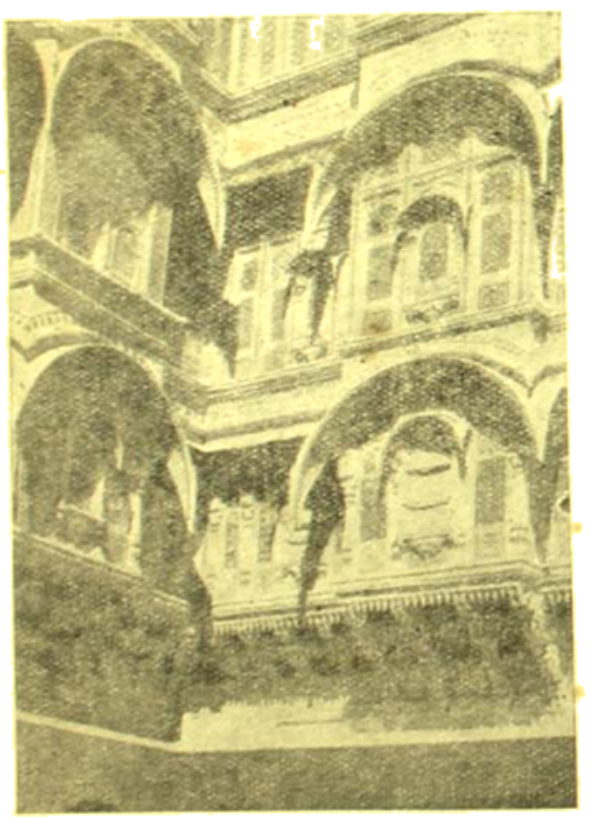

জেনানা মহল—(দ্বিতীয় দিক)

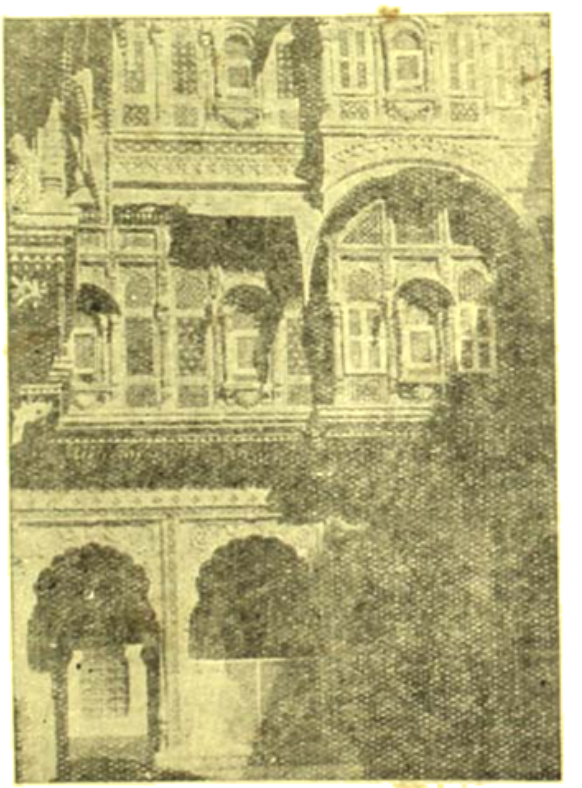

জেনানা মহল—(তৃতীয় দিক)

রাজা যোধপুরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন তাঁরা সকলেই প্রায়—কম বেশ ইংরাজের অনুগত ও বিনিতী সভ্যতানুমুদ্ধ লাভ করেছিলুম তাঁর মধ্যে ইদানিং বেশ একটী পরিবর্ত্তন আসছিল এবং তিনি ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছুটা ভারতীয়

তাব অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমরা এখানে চলে আসবার কয়েক মাস পরেই তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে।

তদানীন্তন যুবরাজ শ্রীহানোবাৎ সিং সাহেব—বর্তমানে যিনি যোধপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, তাঁর যতটুকু পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম তাতে আশা হয় যে ভারতের প্রতি এঁর অনুরাগ কারুর চেয়ে কম নয় এবং

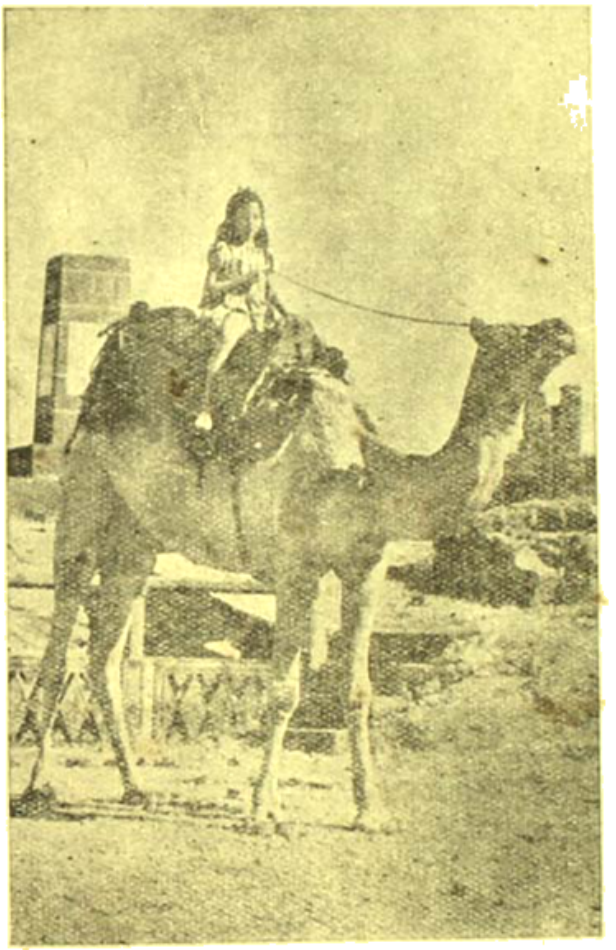

যোধপুরের পথে (উট পৃষ্ঠে নবনীতা)

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, বর্তমান যুগধর্মকে ইনি অস্বীকার করেন না এবং কালের হাওয়ার প্রতি ইনি অন্ধ হয়ে বা মুখ ফিরিয়ে বসে নেই। যে কোনও মুহূর্তে তাঁর রাজবেশ ফেলে দিয়ে তিনি জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়াবার মতো মনোবল ও সহজ বুদ্ধি রাখেন।

এঁদের সঙ্গে নিম্নলিখিত রাজা মহারাজাদের আত্মীয়তাও বিবাহসূত্রে কুটুম্বিতা আছে—উদয়পুর, জয়পুর, যশলমীর, রেওয়া, বুন্দি, সিরোহী, নরসিংগড় ও জামনগর। রাঠোর বংশের ছেলেরাই রাজত্ব করছে বীকানির, কিষেণগড়, ইদার, রাইলাম, সীতামাও, শৈলানা ও ঝাবুয়ায়।

এঁরা নিজেদের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বলে প্রচার করেন। এঁদের কোন পূর্বপুরুষ নাকি অযোধ্যা থেকে নির্বাসিত হয়ে এখানে এসে বাস করেছিলেন। এসব কিম্বদন্তিকে অবশ্য ইতিহাসের মর্যাদা দিতে বলি না,

অন্তঃপুরের সম্মুখে (অন্তঃপুরের প্রহরীর হাতে যে প্রকাণ্ড তরবারিখানি দেখা যাচ্ছে আমরা তুলতে পারিনি—এত ভারী। কিন্তু যোধপুর নৃপতি মহারাজ নাকি এখানি অবহেলে তুলে নিয়ে অবলীলাক্রমে ব্যবহার করতেন।)

তবে যা শুনে এসেছি তাই জানাচ্ছি। 'মেবার' বা 'মাড়ওয়ার' শব্দের উৎপত্তি 'মরুবর' অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ মরুভূমি' কথাটা থেকে কিনা ভাষাতত্ত্ববিদেরা সেটা বলতে পারবেন। রামায়ণের নজীর দেখিয়ে এঁরা বলেন, শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন রামেশ্বরে এসে তিনি সমুদ্রের কাছে বাধা

পান। তখন সমুদ্র শাসনের জন্য তিনি ধনুতে এক প্রচণ্ড অগ্নিবাণ সংযোগ করেন। সেই অগ্নিবাণের শক্তিতে সপ্ত সাগরের জল নিঃশেষে শুকিয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল, তাই সিন্ধুপতি বরুণদেব আবির্ভূত হয়ে বহু স্তব-স্তুতির দ্বারা

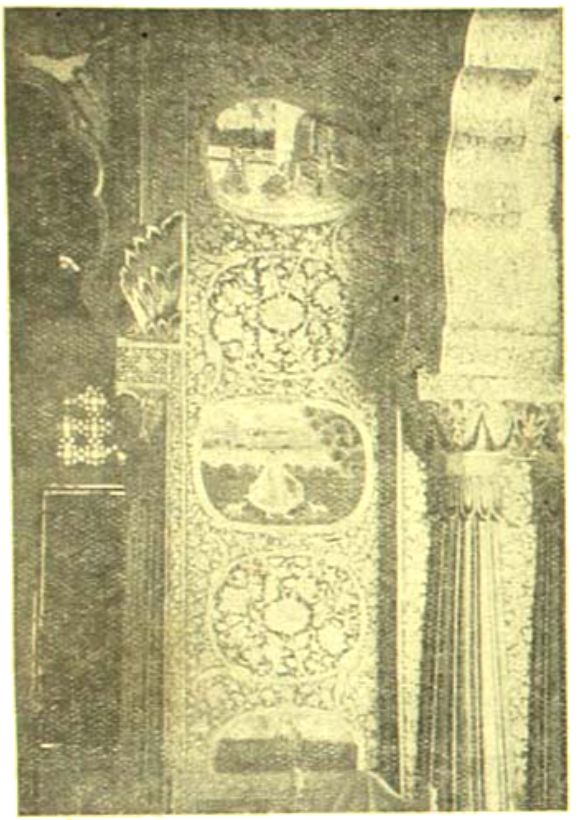

প্রতাপ ভবনের স্বর্ণাঙ্কিত চন্দ্রাতপ—(যাহে যাহে রাজা রাজ্ঞিদের দিনা-করা রত্নীয় ছবি)

রামচন্দ্রকে শান্ত করেন। কিন্তু লক্ষ্য নির্দিষ্ট শর তাঁর পক্ষে সম্বরণ করা অসম্ভব, কারণ নিষ্ক্রান্ত শর ফিরিয়ে নিয়ে আত্মস্তুতি তোলা নাকি বীরের ধর্ম্ম নয়। দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিম কোণে রামচন্দ্র সেই শর ত্যাগ করেন। ফলে বিরাট জলযুক্ত 'থর' বা 'থার' মরুভূমির সৃষ্টি হয়। হয়ত 'পাথার' শব্দেরই অপভ্রংশ 'থার'—ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ বন্ধুবর সুনীতিবাবু সেটা বলতে পারবেন। আমার বিদ্যায় কুলোবে না!

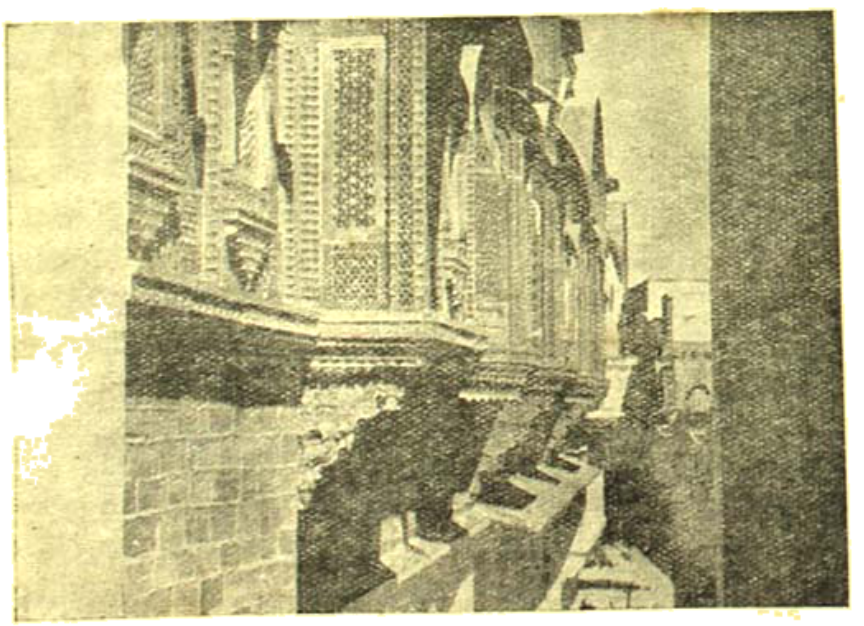

যোধপুর দুর্গাভ্যন্তরস্থ প্রাসাদের কারুকার্য্য—(বহির্ভাগ)

যোধপুরে লোকসংখ্যা ২২ লক্ষের মধ্যে। পরিধি কিঞ্চিদধিক ৩৬০০০ বর্গমাইল। শতকরা ৮৬জন অধিবাসী হিন্দু, আটজন মুসলমান, জৈন জন পাঁচ ছয়ের বেশী নয়।

কাজেই, যোধপুরের সামরিক শক্তি অহিংসার অমৃত সেবনে পঙ্গু হ'য়ে পড়েনি। রাজপুতানার মধ্যে যোধপুর রাজ্যই নাকি সবচেয়ে বিশাল। এর উত্তরে বিকানীর, উত্তর পশ্চিমে জয়সলমীর, পশ্চিমে সিন্ধুদেশ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে যথাক্রমে সিরোহী ও পালনপুররাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদিকে উদয়পুর ও আজমীর, মাড়ওয়ার ও কিষণগড় এবং উত্তর পূর্ব্বে জয়পুর রাজ্য।

জমী ভাল নয়। বিশেষতঃ পশ্চিম দিকটা বালি ভরা। পুবের মাটি অনেকটা উর্ব্বর। উর্ব্বরাও বলা যায়। আব-হাওয়া, শুষ্ক ও উত্তপ্ত। বারিপাত সামান্য। শস্যের মধ্যে বাজ্‌রাই প্রধান

পাঠানবীর শেরশাহ্ একবার মাড়োয়ার জয় করতে এসে কোনও মতে প্রাণ নিয়ে পালান। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন—"আরে তোবা! ও আবার একটা দেশ? এক মুঠো বাজরার জন্য আমার হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য হারাতে বসেছিলুম আর একটু হলে!"

কিন্তু কালের গুণে, সুশাসনের ফলে, শিক্ষার বিস্তারে, আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই একমুঠো বাজ্‌রার দেশ যোধপুরের মরুভূমিতে আজ সোনা ফলছে। যোধপুরের বার্ষিক আয় এখন প্রায় দেড় কোটি টাকার কাছাকাছি। কৃষি ছাড়া যোধপুরের শিল্পও উল্লেখযোগ্য। মাকরানার মার্বেল পাথরের কাজ, বাগরির গালার রং করা কাঠের কাজ, মার্তার হাতী-দাঁতের কাজ, বোরাবারের তাঁতে বোনা সূক্ষ্ম বস্ত্র, আর খাস্ যোধপুরের সুন্দর রং করা রেশমী আর সূতির কাপড় এবং পাইপারের ছাপা বাঁধনী শাড়ী ভারতে বিখ্যাত। আমাদের হাতে বেশী টাকা

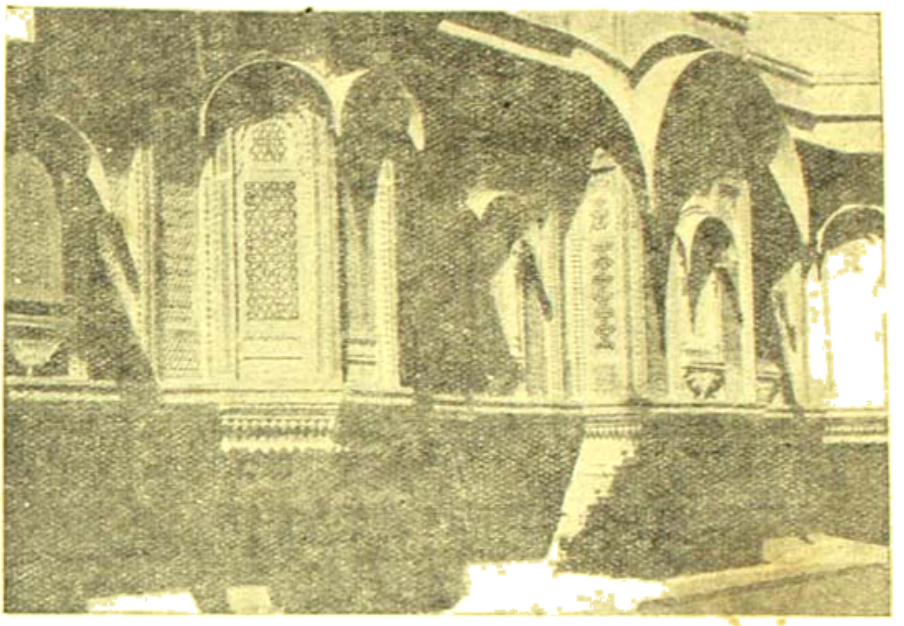

যোধপুর দুর্গাভ্যন্তরস্থ প্রাসাদের কারুকার্য্য—(ভিতর দিক)

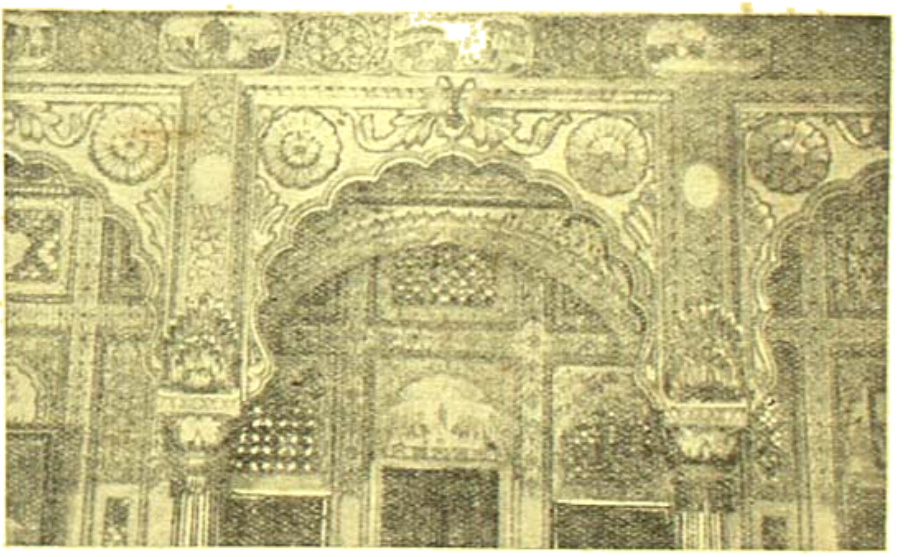

প্রমোদ ভবন—(দুর্গাভ্যন্তরে)

ছিল না, তবু আত্মীয় বন্ধুদের জন্য যোধপুর শিল্পের—যৎসামান্য নমুনা যা এনেছিলুম তা' দেখে সবাইকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হয়েছে।

ধর্ম্মাচরণে যাঁদের মতিগতি বেশী তাঁরাও যোধপুরে

বেড়াতে এসে একেবারে হতাশ হবেন না। এটা হিন্দুর রাজ্য সুতরাং দেবদেবীর মন্দিরের অভাব নেই। বালকিষণজীর মন্দির, ঘনশ্যামজীর মন্দির, কুঞ্জবিহারীজীর মন্দির, একেবারে বৃন্দাবন বললেই হয়! এ ছাড়া, তিজা মাঈজীর মন্দির ও দেবনাথজীর মন্দির অবৈষ্ণবদেরও ধর্ম পিপাসা মেটাতে পারবে।

যোধপুরের আশে পাশে চারটি বেশ বড় বড় হ্রদ বা জলাশয় আছে—পদ্মসাগর, বাঈজী তালাও, কতে সাগর-আর গোলাপ সাগর। নগরে পানীয় জল সরবরাহের ভাণ্ডার ছিল এরা এক সময়। এখুনা সহায়ক মাত্র।

যোধপুর দুর্গের অভ্যন্তরস্থ সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কথা কিছুই বলা হয়নি এখনো। (ক্রমশঃ)

সঞ্চয়

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

বেঁচে থাকতে গেলেই বিপদ আছে এ কথা জানি, কিন্তু সেদিনের বিপদটা ভুলবার নয়। নানা কারণে তা স্মরণীয় হ'য়ে আছে।

গ্রামে গ্রামে ঘোরাটা আমার চাকুরীর অঙ্গ। সেদিন সাইকেলে ফিরছিলাম—একটা মাঠের মাঝে পড়িতেই দেখি বাঁকুকোণে মেঘ সঞ্চিত হ'য়েছে—ঘন কালো। দক্ষিণা বাতাস নাই—বুঝতে বিলম্ব হ'ল না ঝড় আসন্ন। মাঠটা পাড়ি দিতে পারলেই গৃহে ফেরা যায়।

দ্রুত সাইকেল চালাচ্ছিলাম, কিন্তু মাঠের মাঝামাঝি আসতেই ঝড় এসে প'ড়লো—সামনে সাইকেল চালানো চলেনা, তবে দক্ষিণ-পূব কোণের রাস্তাটা ধরলে বাতাসেই নিয়ে যাবে। একটা গ্রামও দেখা যায়—অতএব তাই করলাম। সন্ধ্যারও দেরী নেই।

গ্রামের ভিতরে জনমানব বা বাড়ী নেই, অন্ততঃ চোখে পড়লো না। কয়েকটী রাখাল ছেলে আম কুড়োচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতে বললে—পাগল ঠাকুরের শিবমন্দির আছে—ওই রাস্তা দিয়ে যাও—

কিছুদূর যেতেই বৃষ্টি এসে পড়লো—ছায়াঘন পথে, মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অদূরে একটা মন্দিরের আভাস পেলাম। সেখানেই উঠে পড়লাম—বহুপুরাতন জীর্ণ মন্দির—জীর্ণ বাড়ী, বট-পাকুড় গাছে সমাচ্ছন্ন। একটী ঘরে মানুষ বাস করে মনে হ'ল।

বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক খড়ি তুলছিলেন। প্রশ্ন করলাম—একটু আশ্রয় পাব?

—বিলক্ষণ! পাবেন বৈকি? আসুন আসুন—সাইকেলটা বারান্দায় রাখুন। খড়ি ভিজলে ত আর উনুন জ্বলবে না, তুলেনি—

বারান্দায় আমি সবাহন উঠে দাঁড়াতেই আকাশের বুক চিরে জল ঝাঁপিয়ে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বায়ু গাছ পালাকে ওলট-পালট করে দিতে লাগলো।

গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে বারান্দায় উঠলেন, বললেন—আসুন ভিতরে। আলো জ্বালি। বাহনটী বাইরেই থাক, ভিজতেও পারে—আবার নাও পারে—

বহুপুরাতন একটা লণ্ঠন জেলে, একখানা ছোট চৌকি এগিয়ে দিয়ে বসতে বললেন। তারপর তামাক সেজে, হুঁকা টানতে সুরু করলেন—

আমি লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে দেখছিলাম ঘরখানা—একটি লোকের যা কিছু প্রয়োজন সবই রয়েছে ঘরে। পিছনের আঙ্গিনায় রান্না চলে—দুই একটা জিনিষ অতীত সম্পদ ও আভিজাত্যের সাক্ষ্য দেয়। খাটখানা মূল্যবান—একটী সেকালের মূল্যবান বেতের প্যাটরা—

একাকী এই বনে, একটিমাত্র লোক, বৃদ্ধ অকর্মণ্য, কেমন ক'রে বাস করে, কেন বাস করে, ভাবতে ভাবতে মনে হচ্ছিল—লোকটা হয়ত রহস্যময়। হয়ত এর পিছনে ইতিহাস আছে—

বৃদ্ধ বললেন—ইচ্ছে করেন কি? আপনি?

—ব্রাহ্মণ। আমি তামাক খাই না।

—বেশ, তা হলে একটু চা করি, গরম হওয়া যাক্, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। খানিক হেসে বললেন—আশ্চর্য্য হচ্ছেন? চা আমি খাই—আমি যাকে বলে আপ-টু-ডেট বুড়ো।

একটা তোলা উনুনে খানিতে চা'র জল তুলে দিয়ে বৃদ্ধ বললেন—রাত্রে খিচুড়ীই রাঁধবো। কেমন?

—কিন্তু?

—ভেবে লাভ নেই। ঝড়বৃষ্টি থামবে অনেকরাত্রে, তখন সাইকেলে যাওয়া যাবে না। অতএব থাকতেই হবে, —আর এ গ্রামে এখানে ছাড়া থাকবারও জায়গা নেই। বসুন—একটু আলো দেবেন। আমি ঠাকুর-বৈকাণী দিয়ে আসি—

বৃদ্ধ গামছা মুড়ি দিয়ে লণ্ঠন নিয়ে চলে গেলেন মন্দিরে। আমি উনুনের আলোয় দেখলাম—সামনের দেয়াল চুয়িয়ে জল পড়ছে—কেমন যেন ভয় ভয় ক'রতে লাগলো। জীবনে যত ভূতের গল্প শুনেছি, সব মনের মাঝে কিলবিল করে আমাকে আরও ভীত ক'রে তুললো। ঘরের মেঝের মাঝে মাঝে গর্ত—হয়ত সাপ আছে—ভাঙা দালানে হয়ত আরও কত কি……বাহিরে কেবল অন্ধকার—আর ঝড়ের সন্ সন্ শব্দ—কদাচিৎ বিদ্যুতের আলোয় মথিত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা দেখা যায়—

সংশয় হ'ল—বৃদ্ধ মানুষ ত! না অশরীরী কোন…

বৃদ্ধ লণ্ঠন হাতে ফিরে এলেন। উনুনে জালটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ভয় করে নি ত?

—না।

—ভয় করবার স্থান বটে কিন্তু করে না। আমি খুঁজি ক'রেছি, কারও সাধ্যি নেই এদিক মাড়ায়।

মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম বৃদ্ধ সুপুরুষ—সুন্দরকান্তি, মুখে পাকা দাড়ি প্রায় নাভি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বয়স অনুপাতে শরীরটা শক্ত। মেদাধিক্য নেই, কিন্তু মাংসপেশীর স্ফীতি আছে। প্রশ্ন করলাম—আপনার বয়স?

—প্রায় সত্তর হ'ল।

—একাই থাকেন?

—হ্যাঁ। সাধন ভজন করি, আর সাথীর মধ্যে বাবা বিশ্বেশ্বর।

চা প্রস্তুত হল। কলাই করা একটা কাপে চা পেলাম। বৃদ্ধ বললেন—বাবা ভোলানাথের প্রসাদ হয় কি?

ছোট কলকে আর আনুসঙ্গিক আসবাব পত্র বের করে বললেন—হ'বে?

—আজ্ঞে না!

বৃদ্ধ অকারণ খানিক হেসে নিয়ে বললেন—আমার এতে লজ্জা নেই, এটী প্রসাদ কিনা। প্রসাদ পেয়ে তারপর খিচুড়ী চাপিয়ে দেওয়া যাবে—

বৃদ্ধের কার্যকর্ম্মে ক্রমশঃ ভীত হয়ে উঠছিলাম। চারপাশে তাকিয়ে আরও ভীত হ'লাম, বাহিরে ঘনীভূত কালির মত অন্ধকার, ঝড়ের একটানা শব্দ।

বৃদ্ধ যথাসময়ে রান্না চাপিয়ে এসে ব'সলেন। আমি প্রশ্ন করলাম—আপনি একা থাকেন? এ গ্রামে কি কেউ নেই আর?

—গ্রাম? গ্রাম কোথায়? এ সব ত জঙ্গল—ঐ মাঠের পারে গ্রাম আছে।

—একাই থাকেন?

—একাই—তবে এ গ্রাম ছিল—এখানে আড়াই শ' ঘর লোকের বাস ছিল। শহরের মত জমজমাট করতো।

আমার কৌতূহল হ'ল—এত বড় গ্রাম নিঃশেষে এমনি জনহীন হ'ল কি ক'রে? প্রশ্ন করলাম—কিন্তু এ দশা কেন?

—হাওয়া মশাই—হাওয়া। আমাদের ছোটকালে দেখেছি, একটা কতুয়া আর চাদর গায়ে দিয়ে ভদ্রলোক হওয়া যেত। মাঠের ধান, বিলের মাছ পাওয়া, আর নানা আমোদ-প্রমোদ করাই ছিল কাজ। কত ইতিহাস আছে গ্রামের, সে সব আজও চোখে ভাসছে—

বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছিল, মনে হচ্ছিল সত্যিই যেন অতীত তার সামনে রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে।

—গ্রামের জমিদার চক্কোত্তিরা ছিল—তাদের বাড়ী ওপাড়ায়। বিজন জঙ্গল, বাঘ ডাকে দিনে এখন। শোনা যায় পূর্ব্বপুরুষ তাদের ডাকাত ছিল, রংপুরের ওদিকে কোথায় নায়েবী করতেন বিষ্ণু চক্কোত্তি, আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে আসতেন বাড়ীতে। এমন প্রতাপ ছিল তাদের যে এই রাস্তাটা একরাত্রিতে বেঁধে দিয়েছিলেন। তাদের পুরুষরা নাকি পাল্কীর বাঁকিতে অহর্নিশ হয়ে পড়েছিলেন

তাই। সাতটা চৌকি ছিল বাড়ীতে! আমরা দেখেছি একবার এক বিয়ের দল ঝড় বৃষ্টিতে পড়ে তাদের বাড়ীতে আসে। এক ঘণ্টার মধ্যে মাছ মাংস পোলাও সমেত ২৭ রকম পিঠে দিয়ে তাদের খাওয়ানো হয়। সেই থেকে তাদের নাম ছিল সাতাশ পিঠের চক্কোত্তি।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—ছেলেরা লেখাপড়া শিখ্‌লে, তারপর বিদেশে চলে গেল, বাড়ী করলে কিন্তু দেশে আর এল না। আর গ্রামের লোক তাদের বাড়ীতে পাতা পাতলে না—

—গ্রামের হরে খুড়ো ছিলেন একটু পাগলা। পাগল হ'বে ছিল তার নাম, কিন্তু খুব দুষ্টু বুদ্ধি ছিল তার ঘটে। যাত্রা গান হচ্ছে পূজার সময়, নাটমন্দির লোকাই লোক—খুড়ো আমার কোথা থেকে বাঘের চামড়া পরে হালুম করে এসে পড়লেন আসরের মাঝে। সে কি হট্টগোল—কে যেন লাঠি দিয়ে দিলে একঘা—তখন চীৎকার—ওরে আমি হরে খুড়ো।

বৃদ্ধ আপন মনে খানিক হেসে পুনরায় তামাক সেজে নিয়ে ব'সলেন—তার কত কাণ্ড আছে। তরণী বাড়ুয্যে বাজার থেকে দু'টো ইলিশ ও এক ভাঁড় দুধ কিনে নিয়ে আসছে হরে খুড়োর বাড়ীর উঠোন দিয়ে। হরে খুড়ো বললে—একটী মাছ দিয়ে যাও—তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে একটা মাছেই হবে। তরণী দিলে না। কিন্তু খালে এসে দেখে পার হওয়ার উপায় নেই। প্রথম বর্ষার জলে ভরে উঠেছে। বললেন—হরে, পার ক'রে দিবি? হরে খুড়ো সঙ্গে সঙ্গে তালের ভোঙা নিয়ে হাজির। তরণী মাছ পিছে রেখে দুধের ভাঁড় ধরে আগে ব'সলেন—হ'রে খুড়ো পেছনে দাঁড়িয়ে এক লগির খোঁচায় ভোঙা ডুবিয়ে দিয়ে মাছ হাতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে গিয়ে গাছে ডিঙি বাঁধলেন, আর মাছ দুটোকে বাঁধলেন ভালে। তরণী ভাঁড় ছাড়েন নি, কিন্তু দুধ জলে জল হ'য়েছে। তরণী বাড়ী ফিরলেন শূন্য হাতে, হ'রে খুড়ো একবাটি ইলিশ মাছের ঝোল নিয়ে তরণীর বৌকে দিয়ে এল—বললে আমাদের পুকুরে মাছ ধরেছিল, তাই দিয়ে গেলাম—

বৃদ্ধ আপনমনে আবার হেসে উঠলেন। তারপর তামাক টানতে টানতে ব'লতে লাগলেন—তরণী সেকথা ভুলতে পারেন নি। কত চেষ্টা হরে খুড়োকে জব্দ করবার, কিন্তু কিছুতেই না। অবশেষে হরে খুড়ো বিয়ে পাগলা হ'য়ে উঠ্‌লেন—প্রেমীর বলে তার বিয়ে হয়নি। তরণী বিয়ে ঠিক ক'রলেন—তার আপনার সঙ্গে। কিন্তু পাড়ার নটবর পরামাণিকের ছেলেকে বৌ সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া হ'ল—যাদের ঘরে নবোঢ়া বধূ আর হরে খুড়োর মারামারি—

বৃদ্ধ হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। হুকাটা হাতে ক'রে খিঁচুড়ী খুটে দিয়ে এসে ব'সলেন—একটু দেরী আছে।

আমি ব'লনাম—বলুন না—এসব গল্প শুনতে বেশ লাগে—

—কত শুনবেন। গ্রামের সব কথা শিখ্‌লে মহাভারতেও ধ'রবে না। নিত্য নিয়মিত তিন পাড়ায় তিনটী পাশার আড্ডা হ'ত, তার মাঝে মুখুজ্জেদের দপ্তরের আড্ডাটাই জ'মত। সেখানে আদাড়ী মল্লিক আসতেন—লম্বা পাতলা চেহারা—পাশায় একটী ভাল আড়ি মারলেই কাপড় মাথায় বেঁধে এক পাক নেচে নিতেন। আমরা আদাড়ী মল্লিকের নাচ দেখবো বলে লুকিয়ে থাকতাম। কদিন পর পর তিনদান জিতে তিনি কাপড় ফেলে দিয়ে নাচ্‌তে সুরু ক'রলেন। মুখুজ্জে কাপড় নিয়ে এই অনুরোধ, তাই কাপড় পর। মল্লিক ব'ললে—তিনদিন কাপড়ই পরব না, বলে সেই অবস্থায় বাড়ী চলে গেল—

আমিও হাস্‌ছিলাম। বৃদ্ধ ব'ললেন—কত রঙ্গ, কত স্ফূর্তি ছিল গ্রামে। তিনপাড়া নিমন্ত্রণ ক'রতেই কেউ সাহস পেত না। তিন পাড়ায় প্রায় হাজার লোক—চক্কোত্তিদের বড় বৌ মাঠের ওই বট-পাকুড় উৎসর্গ ক'রলেন—একুশ এল সাতদিন গ্রামে হাঁড়ি কেউ চড়াতে পারবে না। তাই হল, হাজার লোক সাতদিন বসে খেল।

—এ বাড়ীটা কা'দের?

—আমাদের; আমরা চাটুয্যে—এই যে শিব মন্দির এর বয়স জানেন? দু'শ বছর—সাক্ষাৎ আশ্রয় আমার ঠাকুর। চক্কোত্তিদের বাড়ীতে তখন প্রায় ৩০০ লোক খেত। আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, তারা যুক্তি ক'রলে বেকুব ক'রবে—সব পায়েস খেয়ে ফুরিয়ে দেবে। কিন্তু ভোলানাথ সহায়—কড়াই খালি করে নিয়ে পরিবেশন করে এসে দেখে কড়াই পূর্ণ। লোকলজ্জা থেকে বাঁচালেন

—তাইত ঠাকুরকে ছাড়িনি আমি—বলি, ঠাকুর তুমি আর আমি। ঠাকুরের কৃপায় আজ ৩২ বছর কোন অসুখ নেই আমার।

খিঁচুড়ী হ'ল। দুইজনে আহারাদি সমাপ্ত করে শোবার জোগাড় ক'রলাম। অতিথির বন্দোবস্ত তাঁর ছিল—মাঝে মাঝে দু'একজন বিপন্ন ব্যক্তি আমার মতই আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

বাহিরে তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চ'লেছে—ঝড়ের শন্ শন্ শব্দ। ভাঙ্গা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ঝাট্ আসে। মেঝেয় দিয়ে জল চুঁয়িয়ে পড়ছে—চারি পাশে নিবিড় অন্ধকার।

বৃদ্ধ ব'ল্লেন—এখন ঘুমোবেন না, দ্বিপ্রহর না হ'লে ঘুমোনো ঠিক হবে না।

—কেন?

—বাবার আদেশ। বাবার সঙ্গে ত অপদেবতারা চলা-ফেরা করেন, তারা আবার আস্তে পারেন।

—তার মানে?

বৃদ্ধ হেসে ব'ল্লেন—বুঝলেন না? ভূত-পেত্নী এরা সব এমনি রাত্রেই বেরোয় কিনা। আপনি ছেলেমানুষ—একজন নাকে কাঁদলেই ভয় পাবেন শেষে।

বৃদ্ধের কথায় এবং এই নিবিড় অন্ধকারের দিকে চেয়ে সত্যিই ভয় হচ্ছিল। এই সামান্য আলোক শিখাটা যদি নিভে যায় তবে এই নিবিড় জঙ্গলে আমি একান্তই নিরুপায়। ভূত থাক্ বা না থাক্—সাপ-খোপেও ত জীবনটাকে শেষ ক'রতে পারে।

—হ্যাঁ, দেখুন। আমি পত্নী সাধনা ক'রেছিলাম—একটা পত্নী আস্তো এ ঘরে—রাত্রিবাস ক'রে চলে যেত। তাকে ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু সে মাঝে মাঝে আসে, ভয় পাবেন না। কিছু ক'রতে পারে না ওরা—তবে আপনি ভয় পেতে পারেন।

আমি চারিপাশে একবার চেয়ে দেখলাম। গায়ের মাঝে কেঁপে উঠ্লো—লোমগুলো খাড়া হ'য়ে উঠ্লো। বৃদ্ধ তা বুঝেছিলেন—বললেন—ভয় নেই। আপনার বিশ্বাস হ'চ্ছে না? আমার কিছু আছে—আমার কথা ওদের মান্তেই হবে। আচ্ছা আপনার সাহস যাতে হয়—বৃদ্ধ গর্জন নিয়ে উঠ্লেন।

—কি ক'রবেন? কোথায় যাবেন?

—একটু বাগান থেকে আসি।

—না না, আপনি যাবেন না। আমার ভয় ক'রছে।

বৃদ্ধ হেসে বললেন—জানি। কিন্তু দেখবেন বাবার দয়া—আমি থাকতে আপনার কোন ভয় নেই। দেখবেন?

—কি?

—আমারও কিছু ক্ষমতা আছে। দেখুন—

বৃদ্ধ একটা বাঁশী নিয়ে বাজাতে সুরু ক'রলেন। কিছুক্ষণ বাদে শুনলাম হিস্ হিস্ শব্দ—বাইরের দিকে তাকিয়ে কোনও অশরীরী ছায়া দেখবো ভেবেছিলাম। তাই ঘন ঘন তাকাচ্ছিলাম—বৃদ্ধ বল্লেন—আর কেনো, আর ভুলো—

বাহিরে দেখি দু'টি গোখরো সাপ তার সামনে এসে ফণা মেলে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ সস্নেহে বললেন—কিছু নেই রে আজ। একটু দুধ আছে—

একটা দুধের বাটী সাম্নে রাখতেই তারা দুটিতে দুধটুকু খেয়ে ফেল্লে। তিনি ব'ল্লেন—যা, আজ। কাল আবার ভাল ক'রে দেব।

সাপ দু'টি চলে গেল! আজ সন্দেহ হয়, হয়ত ভুল দেখেছিলাম।

খাটিয়ার উপর বসে কাঁপছিলাম—মনে হচ্ছিল ছুটে পালাই; কিন্তু এ নিবিড় অন্ধকারে কোথায় যাবো?

বৃদ্ধ হেসে ব'ললেন—কেমন? আর ভয় ক'রবে না ত? চান্ ত তাদেরও দেখাতে পারি।

—না না—যা দেখেছি তাতেই ত ভয় আরও বেড়ে গেছে। আপনি একা কি ক'রে থাকেন?

—আমি? বৃদ্ধ হেসে উঠলেন। তার বিকট হাসির শব্দ বাহিরের জমাট অন্ধকারে প্রতিহত হ'য়ে যেন ফিরে এল। আবার কেঁপে উঠ্লাম—কোলের উপর হাতটা ভয়ে কাঁপছে—তাকে থামানো যায় না। কেমন ক'রে এই লোকটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব! আর পাব কিনা, তাই বা কে জানে?

বৃদ্ধ বল্লেন—মনে করেন আমি একা—না? তা নয়। আমার কত সাথী। বাবা বিশ্বম্ভর আমার দুঃখ বোঝেন তাই সাথী দিয়েছেন। আমি একা একা গিয়ে বনের ধারে দাঁড়াই। বাবার আদেশে বন উজোয়, আবার ফিরে আসে গ্রামের তারা, যারা চলে গেছে। গ্রাম

আবার জম জম করে—তরণী, হরে মুড়ো, আমাড়ী, সব ফিরে আসে আমার সঙ্গে কথা কয়—সেই তেমনি করে নাচে। আমি আর তরণী যেমন মাছ ধরতে যেতাম তেমনি যাই—বিলে গিয়ে কই মাছ ধরি।…

—কতজনে বলেছে আমাকে যেতে কিন্তু আমি যাই না। কোথায় যাবো? তারা যদি না আসে, তবে কোথায় যাবো? সেখানে আমার সাথী কে? সব ত নতুন লোক, তারা আমার কে? এখনও মনে পড়ে ভট্টাচার্য্যের কথা, —যখন ঘর বিক্রি করে চলে যায় তারা তখন বাড়ীর চেহারা কি! ঘর ভেঙ্গে ফেলেছে—বাড়ীটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে হয়েছে শ্মশান—কত আনন্দ হ'য়েছে তাদের বৈঠকখানায়। যাবার সময় চোখের জল ফেলে তারা উঠ্‌লো নৌকোয়—সে কথা মনে হ'লে বুক ফেটে যায়…বাবার পুজো করি, বাবা আমায় স্বপ্ন দিয়েছেন—আমি জানি তারা ফিরে আস্‌বে, গ্রাম আবার তেমনি হবে, আবার কীর্ত্তন হবে, যাত্রা হবে—তাই না?

চেয়ে দেখি—বৃদ্ধের ভেজাচোখ দু'টো আনন্দের আলোয় ঝক্ ঝক্ ক'রছে—ঘরের ক্ষীণ আলোয় শ্বাপদ চক্ষুর মত জ্বল্‌ছে।

হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে এসে হাত ধ'রে বল্‌লেন, —আপনি কি বলেন? আসবে না? বাবার দেওয়া স্বপ্ন মিথ্যে হবে? দেখলেন ত, সাপ বাঘ ভূত পেত্নী সব আমার বশ, তবুও কি পারবো না তাদের আন্‌তে—তারা চলে যাবে, আর আস্‌বে না? বলুন,—আপনারা শিক্ষিত—তারা আস্‌বে—না?

এমনি ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে কেমন করে বলি—তারা আসবে না, তারা গেছে এই জঙ্গলকে পিছনে ফেলে—আর আসবে না। তাই ব'লনাম—আস্‌বে বই কি? বাবার স্বপ্ন মিথ্যে হবে না—

—আস্‌বে আস্‌বে—ওরে তারা আস্‌বে, বলে বৃদ্ধ নাচতে আরম্ভ ক'রলেন। তাঁর পায়ের ধাক্কা লেগে লণ্ঠনটী পড়ে নিভে গেল। বৃদ্ধ তবুও নাচ্‌তে লাগ্‌লেন—

ভয়ে কাঠ হ'য়ে বিছানায় বসে ছিলাম। হঠাৎ বৃদ্ধ নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে অত্যন্ত কাতরস্বরে ব'লে উঠ্‌লেন—বাবা, বাবা ভোলানাথ—যদি তারা না আসে তোমার পায়ে মাথা খুড়ে ম'রবো। বাবা—বাবা গো!— বৃদ্ধ যেন কাঁদছেন ব'লে মনে হল—

বাহিরে ঝড় তখন শান্ত হ'য়ে এসেছে—হাওয়া ধরিত্রীর শীতল দীর্ঘশ্বাসের মত গায়ে এসে লাগ্‌ছে—নিবিড় বনের অন্ধকারের মাঝে টুপটাপ্ বৃষ্টির শব্দ—আর পাশের খাটে বৃদ্ধ বোধ হয় উৎসারিত অশ্রুধারা ভোলানাথের পায়ে সমর্পণ ক'রছেন।

রাখাল ছেলেটি ব'লেছিল—পাগলা ঠাকুর। বৃদ্ধ উন্মাদ সন্দেহ নেই—তবুও কি পরম আগ্রহভরেই না আর একবার জীবনের অতীতকে ভোগ ক'রবার বাসনা নিয়ে এই জনহীন অরণ্যে বসে আছে। যৌবনকে, জীবনকে ফিরে পাবার কি অনন্ত আগ্রহ এঁর অন্তরে!

অন্ধকার ঘরের মাঝে কাঠের মত বসে রাত্রিবাস ক'রলাম। কিন্তু সেকথা ভাবলে আজও মনে হয়, পাগলদেরও কি এমনি এক একটা বাসনা আছে, যা নিয়ে তারা আপনার খেয়ালে চলে—আপনার জগত আমাদেরই মত হাসি-কান্নায় ভরে তোলে?

'বিরাজ-বৌ'-এর নাটকীয়তা

শ্রীকানাই বসু

যাহা হইবার নয় তাহাই হইয়া গেল, যে দুঃখের আশঙ্কা মাত্র করি নাই সেই দুঃখ পাইতে হইল, যে সুখ প্রত্যাশার অতীত তাহাই লাভ হইল, যে রাজাধিরাজের সিংহাসনে ছিল সে দীন ভিখারীর ধূলিশয়নে নামিয়া আসিল, অতি মানী যে ছিল কলঙ্কভারে তাহার মাথা নীচু হইল, যে পাষাণ-হৃদয় বলিয়া বিদিত তাহার হৃদয়-পাষাণ ভেদ করিয়া অকস্মাৎ স্নেহ নির্ঝর বহিল—ইত্যাদি প্রবল পরিবর্ত্তন যদি নাটকের উপাদান হয়—তবে "বিরাজ-বৌ"-কাহিনীতে উপন্যাসাকারে শরৎচন্দ্র নাটকই লিখিয়া গিয়াছেন।

দ্বন্দ্ব—ভালোর মন্দর বিরোধ, প্রবল ইচ্ছা ও দুর্বল শক্তির অসামঞ্জস্য, মনের ভাবে ও মুখের কথায় অনৈক্য—এ সকল নাট্যবস্তুর প্রাচুর্য্য আছে 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসে।

আরও একটি নাটকীয় সদ্গুণ ইহাতে শরৎচন্দ্র অকৃপণ হস্তে দান

করিয়াছেন, তাহা আয়রনি (Irony—Dramatic Irony and Irony of Fate .)

বিরাজ অসামান্যা সুন্দরী। সেই বিরাজ সকল সৌন্দর্য্য, তাহার রূপের শ্রী ও স্নেহের সৌরভ, সব দ্বারাইয়া অতি কুৎসিত হইয়াছে। "অতীত হইতে ছিঁড়িয়া ভগবান তাহাকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন।" "অথচ এই তাহার পঁচিশ বৎসর বয়স হয়।"

তারপর, বিরাজ সাধ্বী স্ত্রী। যেমন সাধ্বী বাংলা দেশের সকল ঘরেই বিদ্যমান। কিন্তু বিরাজকেই বা এই নিদারুণ দুর্ভাগ্য ভুগিতে হইল কেন? বিরাজের স্বামীপ্রেম সাধারণ, কিন্তু তাহার স্বামীপ্রেমের গর্ব্ব অসাধারণ। তাহার সতীত্ব নির্য্যাতিত হইল তাহার সতীত্বের অহংকারের কাছে। সংসারে বিরাজ সবার উপরে স্থান দিয়াছে নিজেকে। তাই তাহাকে নামিতে হইল সবার নীচে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে বিরাজের দুরদৃষ্ট অ-দৃষ্ট নয়। সে যে সুন্দরী, সে যে সতী, সে যে ভাগ্যবতী, সে যে কর্ত্রী, নিজের সম্বন্ধে এসকল কথা সে নিজে তো ভোলে না ঘটেই, আর কাহাকেও ভুলিতে দেয় না।

অসতী মেয়ে মানুষের সম্বন্ধে তাহার অদ্ভুত কৌতূহল ও প্রশ্ন এই না ভোলারই পরিচয়। তারপর, সতীত্বের শক্তির প্রমাণ তুলিয়া যে আলোচনা সে করিয়াছে তাহা কোনও রমণী কখনও করে নাই। সতী, সীতা, সাবিত্রীগণও নয়, সাধারণ ঘরের মা বোন বধূ কন্যা ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ সতী সাধ্বীরাও নয়!

"সতীত্বে আমিই যা কম কিসে?" ইত্যাদি গর্ব্বোক্তির পরিণাম, অপ্রত্যাশিত শোচনীয় পরিণাম, না থাকিলে এমন কথা মিথ্যামিছি বিধাতা কেন বলাইবেন? মানুষের বিধাতাও যেমন ভাগ্যবিপর্য্যয় করেন, গ্রন্থের বিধাতাও তেমনি নাটক রচনা করাইবার জন্যই এমন সব কথা বলাইয়াছেন।

নিজের সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধেও তাহার গর্ব্ব আছে। 'আচ্ছা, আমি কালো কুৎসিত নই তো?' এবং তারপর তাহার স্বামীর এই কথা—"তাহলেও (অর্থাৎ কালো কুৎসিত হইলেও) তুমি আমাকে এমনি ভালবাসতে" ভবিষ্যৎ নাটকীয় পরিণতিই সূচিত করে। এমন কি সে এই কথাও বলিয়াছে—"তাই আমি জানি, যদি আমি কাণা খোঁড়াও হতুম, তবুও তোমার কাছে এমনই আদর পেতুম।" অতি অল্পদিন পরেই, তাহার কন্যা যৌবনের প্রান্তেই, তাহাকে কাণা ও বিকলাঙ্গ করিয়া এই স্বামীপ্রেম গর্ব্বের সত্য বিধি যথোচিত রূপে প্রকট করিয়াছেন, তিনি ঔপন্যাসিক নন, তিনিই নাট্যকার।

গর্বিতা বিরাজ অনেক অদ্ভুত কথা বলিয়াছে, অনেক অত্যুক্তি করিয়াছে। সে সকলের অপ্রত্যাশিত পরিণতি না থাকিলে লেখকের বুদ্ধির উপর অশ্রদ্ধা আসিত। "নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাও না যে, আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি?" এমন অর্থহীন অহঙ্কার কে শুনিয়াছেন? যত বড় প্রেমিক পুরুষই হোন এবং যত বড় প্রেমময়ী স্ত্রীর স্বামীই হোন, মানুষ নিজের গায়ে হাত দিয়া কেমন করিয়া অনুভব করিতে পারে যে তাহার অনুভূতি সহিত তাহার প্রেয়সীও মিশিয়া আছে? ইহা গর্বিতা নারীর অতিভাষিতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র এমন অত্যুক্তি বৃথাই করান নাই। যে স্বামীর অঙ্গের সহিত সে মিশিয়া আছে, তাহাকেই ত্যাগ করিয়া বিরাজ একদিন নিজে গিয়া উহাদের সম্পর্ক পরমুহূর্তের খবরদার।

সংসারে বিরাজ তাহার স্বামীর স্ত্রী নয়, নীলাম্বর তাহার স্ত্রীর স্বামী। বিরাজ বলে—"আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে লোকে তোমাকে অপমান করে যাবে, কাণে শুনে আমি সহ্য করে যাব—এ ভরসা যদি তাই দিও না।" বলিতে পারিল না—"তোমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তোমাকে অপমান করে যাবে।" এই আমার জ্ঞান তাহার অত্যধিক, তাই এমন দিন আসিল যেদিন কিছুই তাহার আর 'আমার' রহিল না।

"শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হন, তিনি আমার কষ্ট বুঝবেন।" "তোমার কষ্ট বুঝবেন" একথা বিরাজের মুখে আসিল না। অথচ শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া শপথ সে করে নাই, নীলাম্বরই করিয়াছে।

সরল নীলাম্বর বিরাজের অনেক বাক্যজ্বালা সহিয়াও সহজ ভাবে বলিল—"ভেবে দেখ বিরাজ, নিজের কপালে স্পর্শ করিয়া এইখানে লেখা ছিল বলে অনেক রাজা মহারাজাকে গাছতলায় বাস করতে হয়েছে, আমি ত অতি তুচ্ছ।"

মুখরা বিরাজ এমন শান্ত কথাটিতেও শান্ত হইল না, বলিল—'তুমিই না হয় গাছতলায় বাস করতে পার, আমি তো পারি না! মেয়েমানুষের লজ্জা সরম আছে,—আমাকে খোসামোদ করে হোক, সাধীবৃত্তি করে হোক, একটুখানি আশ্রয়ের মধ্যে বাস করাতেই হবে।' হা রে হতভাগিনী! সেই গাছতলায় বাসই তুমি করিতে পারিলে তো। খোসামোদ করিলে, সাধীবৃত্তি করিলে, কিন্তু আশ্রয়ের মধ্যে বাস করা তবু হইল না। এমন Irony শরৎচন্দ্র প্রচুর পরিবেশন করিয়াছেন।

এই অহঙ্কার, এই মিথ্যা বিরাজের পরম শত্রু। আর এক শত্রু তাহার নিজের উপর অটল বিশ্বাস এবং স্বামীর বুদ্ধির প্রতি একান্ত অবিশ্বাস। এ অবিশ্বাস সে জানতঃ করে না, বলিলে স্বীকারও করিত না, কিন্তু নীলাম্বরের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করিলে হয়তো শেষ রক্ষা হইত। নীলাম্বর বুদ্ধিয়াছিল, অধিকন্তু হারাইয়া আসা ঘরের মায়া কাটাইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহাদের নিশ্চিত মরণ। তাই সে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু নিজের ভালবাসার ছলনায় ভুলিয়া বিরাজ তাহাকে নড়িতে দিল না! দুবুদ্ধি বজ্জাতই ছোট বৌ বলিল—তুমিও ঘুরে এস মাথায় ঘাটী। 'যাও দিদি, ওঁকে পুরুষ মানুষের মত উপার্জ্জন করতে যাও, ওঁকে বন্ধ করে রেখ না দিদি…।"

কিন্তু বিরাজ সে হিতকথা শুনিবে কেন? সে বলিল—'দুদ্দিন উঠে ওর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পারবো না। যা পারবো না ছোট বৌ, সে কাজ আমাকে বল না।'

কিন্তু সে-ই পারিতে হইল। স্বামীর মুখ দেখা দূরে থাক, স্বামীর গৃহ, স্বামীর গ্রাম, স্বামীর কূল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তাহাকে অনেদিন কাটাইতে হইল। দূর হইতে উদাসী স্বামীর মুখ দেখার নিষ্ফল আয়াস

নাই. সুতরাং বিরাজের কথা তাহার ভালবাসার তত পরিচয় নয়, যত তাহার ভালবাসার অহঙ্কারের পরিচয়।

বিরাজের পরমুখাপেক্ষী সহায়হীনতার গৃহত্যাগ এবং তার পরের অসহনীয় দুঃখদুর্দশা নাটকীয়তার মনে আনন্দ দান করে। নাটক সরল পথে সুবিধির অস্তিত্বে চলে না। পরিবর্তনই জগতের ধর্ম, কিন্তু পরিবর্তন নাটকের প্রাণ বলিলেও হয়। পরিবর্তন এক রকমের নয়, যেমন—ঘটনা পরিবর্তন, রূপ পরিবর্তন ও ভাব পরিবর্তন।

নীলাম্বর নায়ক বটে, কিন্তু কৃতী নায়ক নহে সে। বলিবার মত কাজ সে একটি মাত্র করিয়াছে, চিরা ছুঁড়িয়া বিরাজকে আঘাত করিয়া। বাকী সমস্তক্ষণ সে কথা কহিয়াছে, প্রেম করিয়াছে এবং কাঁদিয়াছে। সে কাঁদিতে জানে, তাই তাহাকে তাহার সৃষ্টিকর্তা প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার সুযোগ দিলেন। হ্যামলেট নাটকের হ্যামলেট একটি অকৃতী-কর্মজীবনপরায়ণ-নায়ক। বিশেষ কিছু কর্মতৎপরতা না থাকিলেও নায়কত্ব করা যায়, কারণ তাহারই সুখদুঃখের চতুর্দিকে কাহিনী আবর্তিত হয়। কিন্তু অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ঘোড় ফিরাইলে যে নাটকীয় ঘনীভূত হয় তাহারও অভাব নাই নীলাম্বর চরিত্রে।

একদিন কঠিন দুর্বাক্য দ্বারা স্বামীর মর্ম ভেদ করিয়া বিরাজ ঘর আলিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া পড়িয়াছিল। নীলাম্বর গভীর পুত্রস্নেহের প্রয়োচনায় সেই রুদ্ধদ্বারে ঘা দিয়া আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিল—বিরাজ! বিরাজ তার পাইয়া সরিয়া দুঃখিতে পারে নাই। দ্বারের বলাতে সে "কাঁদ-কাঁদ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল—তুমি যাবে না বল?"

"যাবব! কথাটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত নীলাম্বরের হৃৎপিণ্ডে গিয়া প্রবেশ করিল। বেদনায় লজ্জায় অভিমানে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল. সে সংজ্ঞাহীনের মত একটা ঢোঁকাট আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ইত্যাদি।"

তারপর অনুতপ্ত বিরাজের সহিত নীলাম্বরের যোগাযোগ হইতে বেরি হইল না বটে, কিন্তু সেই তীক্ষ্ণছুরীর ফলাটা বহুক্ষণ হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা দিয়াছিল। "তবুও ভাবিতেছিল—একথা বিরাজ মুখে আনিল কী করিয়া? সে তাহাকে যাদব করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে এত বড় হীন ধারণা তাহার জন্মিল কেন?"

অথচ এমন যে নীলাম্বর, যাহার কাণে প্রবেশ করিয়াই কথাটা তীক্ষ্ণ ছুরীর আকার ধারণ করিয়া হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল, সেই নীলাম্বরকে দিয়া তাহার বিধাতা শুধু উপযাচিনীকে পায়ে ধরাইলেন না, কপাল (ভাগ্য?) কাটাইয়া চরিত্রে অযথা কলঙ্ক আরোপ করিয়া স্ত্রীকে গৃহত্যাগ করাইলেন।

নানারকম বিপরীত ভাবের সংমিশ্রণ ঘটে একটা মানুষের চরিত্রে ও মনে। নাটকীয় চরিত্রেরও মূলধনে এই সকল বিপরীতমুখী মনোভাব। নীলাম্বর দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, কথায় কথায় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, একলা ঘরে ঠাকুর দেবতার ছবির সামনে মাথা কোটে। কিন্তু সেই নীলাম্বর যখন শুনিল বিরাজ প্রাণত্যাগ করে নাই, কুল ও সতীধর্ম ত্যাগ করিয়াছে, তখন সে-সংবাদ যত মর্মান্তিক হোক না কেন, সেই অসতী বিরাজকে ক্ষমা করিবার জন্য চিরকালের তাহার একটুও অভাব হইল না এবং সত্যই যখন বিরাজ, ব্যাধিগ্রস্ত, কলঙ্কিনী পত্নীর দেখা পাইল তখন তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে আনিতে সে একমুহূর্ত বিলম্ব করিল না। দুর্বলচিত্ত নীলাম্বর সর্বথা দুর্বল নহে।

"ছোটলাই পীতাম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক।" ভিন্ন প্রকৃতির লোকদেরই নাটকের উপাদান, তাহা বলা বাহুল্য। পীতাম্বর বাবার মত বোকা নয়, সে পয়সা চিনে, সে প্রয়োজনমত মিথ্যাকথা কহিতে পারে, ভণ্ডামিতে, অথবা কোনও প্রেমেই, গলিয়া গিয়া সে নিজের আখের নষ্ট করে না। এ সকল গুণের ছাড়াও একটা বড় গুণের আছে দুই ভাইয়ের প্রকৃতিতে। পীতাম্বর স্ত্রীকে যখন তখন প্রহার করিতে কাতর নয় এবং স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করে না। (সুতরাং তাহার স্ত্রী যে কুলত্যাগ করিল না ইহা বিচিত্র নয়।)

সহোদর দুইজন দুই ব্যক্তি ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া যেমন নাটকীয় প্রয়োজন, তেমনই একই ব্যক্তির প্রকৃতি পূর্বে এক রকম, পরে অন্য রকম হওয়া আরও প্রয়োজন—তাহা শরৎচন্দ্র অবশ্যই জানিতেন।

বিরাজের গৃহত্যাগের পর পীতাম্বর "যেন আদাদা মানুষ হইয়া গিয়াছিল।" "যৌবনের জন্য আজ হঠাৎ তাহার প্রাণটা খারাপ হইয়া গেল।" পীতাম্বরই বিরা বাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়া পৃথক হইয়াছিল, এবং উহাদের মধ্যে বেড়া বাঁধাটা অবশ্য তাহারই কাজ হইবে। কিন্তু এই পীতাম্বরই বলিল—"বহুকে দিয়ে উঠোনের বেড়াটা ভাঙিয়ে দাও, আর যা খরচ হয় করো। বাবার মুখের পানে চাইতে পারা যায় না।" মাত্র তিন দিন আগে পর্যন্ত পীতাম্বরের কোন কষ্ট হয় নাই দুঃখী বাবার মুখের পানে চাহিতে। তবে তখন অবশ্য সে বাবার মুখের পানে চাহে নাই কোন দিন।

এই ধূর্ত শঠ স্বার্থপর স্নেহমমতাহীন লোকটি, যে একদিন তাহার সাধুপ্রকৃতির স্নেহময় অগ্রজের অপেক্ষা ছোট বোনের শ্বশুরকে বড় গুরুজন বলিয়া জ্ঞান করিবার জ্ঞান করিয়াছিল, এই লোকটিই যখন আচম্বিতে নিশ্চিত মৃত্যুর বন্ধনের মধ্যে পড়িল, তখন "বাবার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—আমার কোন গুণপনা চাই না বাবা, শুধু তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও, এতে যদি না বাঁচি তো আর বাঁচতেও চাইবে।" মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া সে মিথ্যাকথা বলে নাই, সে "সর্বপ্রকার বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমাগত তাহার (বাবার) পায়ের নিচে মাথা ঘষিতেছিল।"

বিরাজ যে আখ্যায়িকাতে বিরাজ এমন চরিত্র বটে, কিন্তু মোহিনী শ্রেষ্ঠতম চরিত্র। মোহিনী স্বল্পভাষিণী, শান্ত, সহনশীলা এবং স্থিরবুদ্ধি। সে স্বামীর নিকট দুর্বাক্য ও প্রহার পাইয়াও স্বামীকে ভালবাসে, তাহার কল্যাণকামনায় আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। সে অন্যের সুখদুঃখের দিকে চক্ষু কর্ণ সজাগ রাখে, কিন্তু নিজের সুখদুঃখও আপনাকে লইয়া অস্থির হয় না। তাহাকে কেহ আঘাত করিলে সে ফিরাইয়া আঘাত করে না। "পুঁটির নির্বাক্ষণ

উপেক্ষা ও অত্যধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার ছোটবৌকে যে কিরূপ বিঁধিল, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ জানিল না।...চিরদিনই সে বিমুখ প্রকৃতির, আজিও নীরবে সকলের সেবা করিতে লাগিল, কাহাকেও কোন কথাটি বলিল না।"

বিরাজের প্রতি মোহিনীর অপরিসীম শ্রদ্ধা বিশ্বাস, অচলা ভক্তি, বিরাজের খর জিহ্বা, অধীর প্রকৃতি, অমূল জিদ, দুরন্ত অভিমান ইত্যাদির ফলে দুঃখের সংসারে যত অশান্তিই আসুক, মোহিনী তাহার বিধির দোষ দেখিতে পায় না। এমন কি যাহার বড় দোষ স্ত্রীলোকের আর নাই, বিরাজকে সেই দোষে দোষী বলিয়া জানিয়াও মোহিনী তাহা বিশ্বাস করিবে না। পল্লীগ্রামের সমাজে থাকিয়া সে জানে, যে-পথে বিরাজ গিয়াছে সে-পথ হইতে বিন্দু রমণীর আর ফিরিবার দরজা নাই। তথাপি সে জানিবে না। তাহার কাছে তখনও বিরাজ "সতীলক্ষ্মী দিদি আমার" এবং "নিশ্চয় ফিরে আসবেন—যতদিন বাঁচব, এই আশায় পথ চেয়ে থাকব।" বিরাজ যে একদিন সত্যই ফিরিয়াছিল, তাহা একমাত্র মোহিনীর বিশ্বাসের জোরেই।

বিরাজের যত কিছু দোষ, ত্রুটি, ভুল, ভ্রান্তি সব শোধন করিয়া দেয় মোহিনীর সুবুদ্ধি, ধৈর্য্য, সেবা, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলী।

বিরাজচরিত্রের পরিপূরক মোহিনী চরিত্র।

চিত্র অঙ্কনে যেমন ভিন্ন চিত্র-শিল্পী চিত্রের ভারসাম্যতা (balance)র দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বস্তু ও বর্ণ-বিন্যাস করেন, তেমনি নাট্যরসজ্ঞ কথাশিল্পী বিরাজের সংসারে মোহিনীকে স্থাপনা করিয়া উপাখ্যানের ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছেন।

প্রধান প্রধান চরিত্রের কথাই উল্লেখযোগ্য, তাহাই করিলাম। এই সঙ্গে একটি বিশেষত্বের কথাও বলা দরকার। সেটি আখ্যায়িকার ঘটনা বর্ণনে শরৎচন্দ্রের মনোরম কৌশল। নাটকে বিশেষভাবে রসসঞ্চার করে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বা আবিষ্কার। ইহা চমক লাগায়, বিস্ময় আনে ও প্রভূত আনন্দ দান করে। যে লোকটিকে নিবিড় অরণ্যে নিশ্চিত ষড়যন্ত্রের জালে নিশ্চিত মৃত্যু গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, চরমমুহূর্তে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য 'আতঃ' বলিয়া এমন লোকের আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক, যাহাকে দর্শক বা পাঠক একেবারেই আশা করিতে পারে নাই। যে সংসার সম্পদে ও সৌহার্দ্যে, সুখে ও শান্তিতে আনন্দময়ীর লীলাভূমি রূপে প্রকাশ হইল, সেই সংসারেই তো পরক্ষণে বাজ ফেলা চাওয়ার এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের চক্রান্তের আয়োজন দরকার। স্থিতধী শক্তির জন্যই তো মনের বোতল প্রয়োজন। এই চমক (Dramatic Surprise) নাট্যরসের একটি মূল্যবান উপাদান। উপন্যাস হইলেও এই উপাদান শরৎচন্দ্র বিরাজ-বৌ গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন—বিরাজের অন্তর্ধানের আসল অবস্থাটি প্রকাশ করিবার সময়।

বিরাজ যে আত্মহত্যাই করিয়াছে এই ধারণা সকলেরই হইয়াছিল। এই ধারণা সৃষ্টি করিতে শরৎচন্দ্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বিরাজ বাহির হইবার পর তিনি দুই-কূল ভাসানো সরযূর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অনর্থক নহে। স্থান কাল যতদূর ভয়ঙ্কর ও কালো করিতে পারা যায় তাহা করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে বসিয়া বুকের ভিতর আরও কালো আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি লইয়া বিরাজ "নিজের আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিয়া জড়াইয়া নিজের হাত-পা বাঁধিতে লাগিল।" তারপর একটা পরিচ্ছেদ চলিয়া গেল, অনেকগুলি দিন চলিয়া গেল। বিরুদ্ধপক্ষ বিরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ না রাখিয়া, পনের মাস পরে হঠাৎ নীলাম্বরের মুখ হইতে পাঠক শুনিল "আমার সীতাদেবীর মত বিরাজকেও যদি ভগবান ফিরিয়ে দিতেন তো আর আমার সুখের দিন। পুঁটি এখন বড় হয়েছে, তার মায়ের মতন বৌদির এ কলঙ্ক শুনলে তার বুকের ভিতর কী করতে থাকবে।"

এ সকল কথা উপন্যাস পাঠকের জন্য নহে, নাট্যাভিনয় দর্শকের জন্য। বিরাজের কপালকাটার ঘরাট কাটাইয়া যে-দর্শকের মন বিরূপস্বর আরাধে গল্প শুনিতেছিল, সে অকস্মাৎ যেন চাবুক খাইয়া চমকিয়া পিঠ সোজা করিয়া বসিবে এবং চোখ বড় করিয়া কাণ খাড়া করিয়া অপেক্ষা করিবে। বলিবে—সে কী?

এই চমক পাইয়া নাট্যমোদী মন পুলকিত হইয়া উঠিবে। নূতন আগ্রহে নূতন আনন্দে নাটকে মনোনিবেশ করিবে। তারপর আসিল—সাবিত্রী-সৌরভ-প্রতিদ্বন্দ্বিনী পরমাসতী, বিরাজের আত্মহত্যার সঙ্কল্প শোচনীয় পরিবর্তনের বিবরণ। নবীন স্কুলে বসিয়া হাত পা ধোয়ার পর বিরাজের অভিমানের কাহিনী শরৎচন্দ্র যদি আগেই, অর্থাৎ যখন ঘটিল তখনই বলিয়া দিতেন, তাহা হইলে পাঠকের মন আত্মঘাতিনী বিরাজের জন্য শোক ও সহানুভূতির অশ্রুতে অমন করিয়া উর্বর না এবং সেই আর্দ্র মন পরে এমন নির্মম বিস্ময়ে চমকিত হইয়া উঠিত না।

এই চমক (Surprise) নাটকীয় বটে, কিন্তু ইহার সবটাই নাটকে স্থান পাইবার যোগ্য নয়। অর্থাৎ চমকটুকুই স্থান পাইবে, ঘটনাটা নহে। কারণ উপন্যাসে একটা সুবিধা আছে ঘটনার পারম্পর্য্য, কার্য্যের ধারা রাখিবার আবশ্যকতা নাই। দিনান্তকালে নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করিবার পর উপন্যাস-পাঠককে এ আহ্বান করার প্রথা আছে :—পাঠক একবার দেখিয়া আসিবে চল গজেন্দ্র সিংহ প্রভাতে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল এবং প্রভাতকালে ফিরিয়া গিয়া গজেন্দ্র সিংহের অনুসরণ করিয়া পুনরায় সন্ধ্যায় আসা বেশ চলে।

কিন্তু নাটক অগ্রগতির ক্ষেত্র, সেখানে পশ্চাৎপদ হইবার রাস্তা নাই। নাটকের ঘড়ির কাঁটা একদিকেই ঘুরিতে পারে, দুইদিকে নয়। সুতরাং বন্যা হইতে কেমন করিয়া বিরাজ ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল সে বৃত্ত যথাসময়ে প্রত্যক্ষ করাইলে, তারপর আর বিরাজের সম্বন্ধে কোনও Surpriseএর অবকাশ থাকে না। উপন্যাসকার ঘটনার কার্য্যক্রম মানিতে বাধ্য নহেন। তিনি চমকটুকুও দিলেন, আবার ছয় মাস পূর্বের ঘটনা.—কেমন করিয়া বিরাজ আত্মহত্যার পথ ধরিল, কূল ছাড়িয়া বন্যার উহাও কূলত্যাগ করিল না, সে ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যেও সেই নাটকীয় চমক পরিবেশন করিয়া 'বিরাজ-বৌ'কে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ সমাদরের বস্তু করিয়াছেন।

পরিশেষে নীলাম্বরের বিরাজকে ফিরিয়া পাওয়া, অথবা বিরাজের নীলাম্বরকে ফিরিয়া পাওয়া (উভয়েই উভয়কে পাইবার জন্য পথে পথে ঘুরিতেছে) সম্পূর্ণ নাটকোচিত (Dramatic meeting) তাহা বলা বাহুল্য। এমন কি অতি নাটকীয় বলিয়াও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা ভিন্ন উপায়ও ছিল না। আর সংসারে,—উপন্যাসে বা নাটকেই শুধু নয়, সংসারেও নাটকীয় পরিস্থিতি ঘটে বই কি।

ভাগ্যচক্র

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

পিতা স্নেহস্বরে কহিলেন, তুমি চা খাবে না মা ?

ও বাবা, চা না খেলে বাঁচবো কেন ! কোনটা ক'রে এসে খাবো। আর নার্স কেন এলো না এখনও, সেটাও ত দেখতে হয়।

সে চলিয়া যাইতেই বাস্পত্যাগীলা আর একবার প্রকট হইয়া উঠিল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, নার্স কেন ? কর্তা কিছুই জানিতেন না, তাহাই বলিলেন ; কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনা, গৃহিণী সদর্পে কহিলেন, তোমার গাঁট থেকে যখন পয়সা খরচ হচ্ছে না, তখন আসুক না যতটা নার্স। কেমন, তাই না ? অজ প্রবল প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে মুকুলের বেয়ারা হরিচরণ চায়ের সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইল, উপস্থিত তাঁহাকে অপমান খণ্ডনে-বিরত থাকিতে হইল। গৃহিণীও বোধ করি চাকর বাকরগুলাকে মনুষ্যমধ্যে গণ্য করেন না ; তাঁহার মুখবন্ধ হইবে কেন ?

"চিমটা কাল কি ছাই পিঁপড়ের—টিপে মধু বার করেই কাটলো ! খোদা মরি, মা, খোদা মরি।"

"মধু—মধুটা কি হোল" বলিয়া ভীষণ ক্রোধান্ধ হইয়া অজ সাহেব চায়ের ট্রে টানিতে গিয়া টুলটাই উল্টাইয়া ফেলিলেন। ঝন্-ঝন্ ঝনাৎ শব্দ থামিতে না থামিতে মুকুল ঘরে আসিয়া কৃতা হরিচরণকেই বকিয়া দিল। হাসপাতালের ভাঙা-চোরা টুলগুলাও নিস্তার অংশভোগে বঞ্চিত রহিল না ! হরিচরণ বলিল, গাড়ী হাজির আছে মা, আমি এখনই আবার চা-খাবার তৈরী ক'রে আনছি।

অজগৃহিণী উচ্ছ্বসিত অশ্রু-রাশি গোপন করিতে করিতে বলিলেন, সেটটা দামী সেট ছিল। আজকাল কিনতে গেলে পঞ্চাশ ষাট টাকার কম নয়।

অজ বলিলেন, হাসপাতালের জিনিষ ত, আমি একটা কিনে দিয়ে যাব।

গৃহিণী কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, মুকুল বলিল, না বাবা, হাসপাতালের নয় ; আমার !

তবে আর কি ! তোমার পয়সা বেঁচে গেল !—গৃহিণী কহিলেন।

কর্তা হাত পা নাড়িতে সুরু করিয়াছিলেন, মেয়েরও প্রতিবাদ করিবেন, কিন্তু শুভকার্যে বাধার বিরাম নাই ; অজরথ আসিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গে নার্স। নার্সে গৃহিণীর ভীষণ আপত্তি। নার্স নার্সকে তিনি ছুঁইতে দিবেন না। অজরথ বুঝাইল, নার্স না থাকিলে ডাক্তাররা অপারেশনই করে না। গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, ঐ যারা খাঁটা ছুঁড়িগুলো ডাক্তারদের পোষা মানুষ বুঝি। ওদের না দেখলে হাতের ছুরি নড়ে না ? মরণদশা আর কি !

যাহাই হৌক, অজ্ঞান করিয়া অপারেশন হইল এবং সকলেই বলিল, অপারেশন খুবই সাকসেসফুল ! তবে রোগিণী বাঁচিয়া রহিলেন। সাকসেসফুল অপারেশনে রোগী মরে, ইহা শাস্ত্রের বচন।

কয়েকদিন মধ্যে নার্স সম্বন্ধে গৃহিণীর মতের পরিবর্তন ঘটিল ; বলিলেন, না, ছুঁড়ি দু'টোই ভাল। তা দেখ, ওদের টাকা তুমি দেবে মা, সে আমি জানি, বখ্‌শিসটা কিন্তু তুমিই দিও। আর, একটা একটা টাকা দিও না যেন, হাতটা একটু দরাজ ক'রে দু'টো দু'টো চারটে টাকা দিও, বুঝলে। কর্তা শশব্যস্তে কহিলেন, বেশ, তুমিই মা-র নিজের হাতে দিও।

কিন্তু, যেদিন চোখের ঠুলি খোলা হইল, সেইদিন রাত্রের বাস টিকে রাখিয়া, দিনের নার্সকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। গৃহিণী কর্তার মুখের পানে চাহিয়া পুরাতন কথাটা মনে করাইয়া দিবার প্রয়াস করিতেছেন, মুকুল তাহার হাত-ব্যাগ খুলিয়া একশ' টাকার একখানি নোট নার্সকে দিয়া কহিল, তোমার দিনের টাকা পেয়েছ ত ? মেয়েটি হাসিয়া, গলিয়া, চলিয়া কহিল,—সে ত রোজ রোজই নিয়ে যাই। আজকের টাকাটাও পেয়েছি একটু আগে। তারপর, ত্রিভঙ্গমকে নমস্কার করিয়া কৃতজ্ঞকণ্ঠে মুকুলকে বলিল, "থ্যাঙ্ক।" গৃহিণীকে বলিল, মা আর দু'চার দিন পরেই বাড়ী যেতে পারবেন। আর হাসপাতালে থাকবার দরকার হবে না। গৃহিণী গুরুগম্ভীর চালে বলিলেন, হাঁ, কাশী যাব।

মুকুল বলিল, কাশী সিকরৌলে আমাদের একটা বাড়ী কেনা হয়েছে।

পরবর্তী সংবাদ শুনিবার জন্য জননীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু অসাধারণ সংযম সহকারে আত্মসম্বরণ করিলেন ; কর্তা তাহা পারিলেন না। সোৎসুক্যে প্রশ্ন করিলেন, বেশ, বেশ। তা কোন্‌খানটায় কার বাড়ী, কিছু জানিস ?

জানি বৈ কি ! লালা দুনিচাঁদের বাগান ব'লে। নাম হচ্ছে—

অজ আগে ভাগেই বলিলেন, প্যারাডাইস্, মা, প্যারাডাইস্।

হাঁ।—তুমি জানলে কি ক'রে বাবা ?

সিকরৌলে ক্যান্টনমেন্ট বাগান বলতে ঐ একটাই আছে। কতবার

আমরা অফিস পো দেখতে গেছি যে! চমৎকার বাগান, চমৎকার বাড়ী, পুকুরটিও সুন্দর। তা ভাল; শুনে বড়ই আনন্দ হোল।

জজ-গৃহিণী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, ভাল ত বটেই। জামাইয়ের বাড়ী এমনি খালি পড়ে থাকবে, তার চাইতে শ্বশুরকে যদি থাকতে দেয়, বাড়ীতে লক্ষ্মীও পড়ে, আর—

এই 'আরটা' যে কি হইতে পারে তাহা না ও মেয়ে দু'জনেই অনুমানে বুঝিতেছিল। তবে সেটা অনুমানের ভিতরেই থাকে এই বাসনা করিয়া মেয়ে বলিয়া উঠিল, জামাই নিজেই সেই কথা বলেছিলেন যে—মা বাবা কেন সেই এঁদো পড়া কেয়ারঘাটে পড়ে থাকেন—

তিন টাকা ভাড়ার এঁদো পড়া বাড়ী হবে না ত কি হবে! গৃহিণী ক্ষণার হিলেন। জজ এবারে জজীয়ের উপর ভার সম্পূর্ণ করিয়া কহিলেন, তিন টাকা ভাড়াটাই দেখলো, কাশীতে বাড়ী পাওয়া যে কি শক্ত, সেটা বুঝি কিছুই না?

গৃহিণী বলিলেন, ভাগ্যিবানের ধোবা ভগবানে বয়! বাবাই ত আর কলাই হয়ে শ্বশুরের কাছ থেকে ভাড়া নিতে পারবে না; ভালই হোল তোমার। আমি কিন্তু দশাশ্বমেধ ছেড়ে, বিশ্বনাথ ছেড়ে, সিকরৌলে যাচ্ছি না, সেটা ভাল ক'রে মনে রেখো।

প্রীতির ঘটে কবে বুদ্ধি জন্মিবে এবং কবে তাহা সুবুদ্ধি পর্য্যায়ভুক্ত হইবে তাহা ভাবিয়া জজসাহেব যখন কূলকিনারা পাইতেছিলেন না, তখন কন্যা কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান করে কহিল, যুদ্ধের সময়, পেট্রোলের কষ্টের দিনে যে ক্রহাম গাড়ী ও ঘোড়া কেনা হয়েছিল, সেগুলো এখন কাশী পাঠাবার কথা হচ্ছে।

জজসাহেব মনে মনে উৎফুল্ল হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ হইতে দিলেন না; অতি সন্তর্পণে নীরবে রহিলেন; কিন্তু জজগৃহিণী এই নীরবতার যে কদর্থ করিলেন, ছিঃ ছিঃ অজসমাজে কি তাহা করিতে আছে? তিনি যেন কর্ত্তাকেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন, জামাই কি আর গাড়ী ঘোড়া-সহিস-কোচম্যানের খরচ না পাঠাবে, কি বল গো? তবে ভুলভ্রান্তির কথা বলা ত যায় না, মনে ভাবতেও পারে যে, শ্বশুর গাড়ী চড়ছেন, ঘোড়ার ঘাস জলটা শ্বশুরই দেবেন—এ রকম ভুল করতে পারে বৈ কি। উঁহু, যাতে ভুল না হয়, অন্ততঃ যাবার সময়ে সেটা চুপি চুপি বলে দিয়ে যেতে হবে।

পাছে পিতা কথার জবাব দেন এবং কথার পৃষ্ঠে কথা বৃদ্ধি হয়, মুকুল বলিল, আমরা তোমাদের সঙ্গে একদিনেই গাড়ী রিজার্ভ ক'রে যাব বাবা, কাল বারান্দায় ব'সে আমাকে তাই বলছিলেন।

বহুক্ষণ হইতেই কর্ত্তা ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য ধারণ করিতেছিলেন; কিন্তু গায়ে গা ও পায়ে পা লাগাইয়া কলহ করা যাহাদের জন্মগত অভ্যাস, তাহাদের থামাইবে কে? জজগৃহিণী কহিলেন, ঐ দেখ, একেই বলে, বরাত। ফেরবার গাড়ীভাড়াটাও বেঁচে গেল। জামাই নিশ্চয় গাড়ী রিজার্ভ করবে—করবেই; সে কি আর শ্বশুরের কাছে টিকিটের টাকা নিতে পারবে হাত পেতে?

কথার পিঠে কথা যোগান দেওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন। যোগাও ভর্ত্তি কালী ও টীন পেন্ পাইলে দিব্যি দিব্যি কাগজে রায় লিখিতে কষ্টও হয় না, ভাবিতেও হয় না; কিন্তু যাহারা যুক্তি মানে না, আইন জানে না, সওয়াল বুঝে না, হায়, হায়, তাহাদের সঙ্গে কে আঁটিয়া উঠিবে। জজ সাহেব নীরব। কিন্তু মানুষের ধৈর্য্য বজ্রবল্লীর ধৈর্য্য নয়। জজগৃহিণীর সে খেয়াল হয় ত ছিল না, কিন্তু কন্যার ছিল। মুকুল কৌতুকচ্ছলে কহিল, অনেকদিন বাড়ী যাই নি মা, আজ যদি একবার অনুমতি কর—

গৃহিণী কণ্ঠস্বরকে যতখানি সম্ভব সুস্থ ও রক্ষিত করিয়া কহিলেন, কেন যাও নি বাছা। জামাইয়ের কত কষ্টই না জানি—

মুকুল কহিল, "বাবা-মাকে একলা হাসপাতালে রেখে এসে কি ব'লে" ক'রে রাত্রেই আবার না আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যায় ত বাঁচি।

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, তা না-হয়, রাত্রেই আবার এসো।

কিন্তু জজপত্নী যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—রাত্রে ত খরচ টরচের ভয় নেই, আঁৎকে নাই বা চঠ্‌লে।

মুকুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ফেলে তারী রাগ করবে, কিন্তু কি করবো—কালকে ইনসিওরগুলোর টাকা দেবার দেখবিন, বোতল টোতল সব আমার বাক্সে কিনা, তাই একবার যেতেই হবে। কাল আবার সকালেই আসবো।

একসঙ্গে কাশী যাওয়ার 'প্ল্যান'টা মুকুলের নিজস্ব এবং মাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পরিকল্পনাটি তাহার মাথায় গজাইয়াছে। কেন গজাইয়াছে তাহাও কি আবার বুদ্ধিমতী সুধীরা পাঠিকা দেবীদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে? তবে, যাঁ, পাঠক মহাশয় অবশ্যই বলিতে পারেন, গল্প পড়িতে গিয়া প্রোব্লেম সল্‌ভ করিয়া মরিব কেন হে বাপু? কথাটা খুলিয়া বলাই না কেন ভাল। ইহার পরে আর না বলিয়া থাকি কেমন করিয়া?

মুকুলের প্রধান চিন্তা জননীর চোখের ঠুলি খোলা হইয়াছে; সুতরাং লোকের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে, অতঃপর হাসপাতাল হইতে বিদায় লইতেই হইবে। পত্নিনী আসন্নপ্রসবা, কয়েকদিন হইতে মা'কে দেখিতেও আসিতেছে না, এমতাবস্থায় বাবা মাকে আবার তাহাদের খাঁচায় পাঠাইতে মন সরে না, অথচ, নিজের বাড়ীতে আনিবার পথে যে বিঘ্ন তাহাও অল্প রহিয়াছে। সুতরাং সেবা যত্ন করিতে করিতে কাশীর নতুন বাগান বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিলে সব দিকেই যেন মানান্ হয়। অন্তরাত্ম 'না' করিবে না, মুকুল তাহা জানিই; কিন্তু তাহাকে অগ্রিম তালিম দিয়া না রাখিলে সে যদি ইহাদের সামনে আকাশ হইতে পড়ে, তাই আজ একবার বাড়ী যাওয়া বিশেষ দরকার। আর মন কেমনের কথা, সে কথাও কি আবার বলিতে হইবে? মানুষ যে যতই বড় হোক্ আর ছোট হোক, নিজস্ব ভূমিটুকুর উপর মানুষের কি মর্ম্মন্তুদ মমতা। পুরীতে পুরুষোত্তম দেবের মন্দিরাভ্যন্তরে দাঁড়াইয়াও কোথাকার কোন্ জমিতে একখণ্ড পুঁইলতা দেখিবার জন্য মানুষ মাথা খুঁড়িয়া মরিতে চায়ে, মূলে সেই একটুকরা নিজস্ব ভূমি।

মনোরমা মুকুলকে বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া আর ছাড়ে না। মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কিন্তু কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দেয়। অবিনাশ বলিল, বৌদি এইক'দিনেই কি রকম রোগা হয়ে গেছেন!

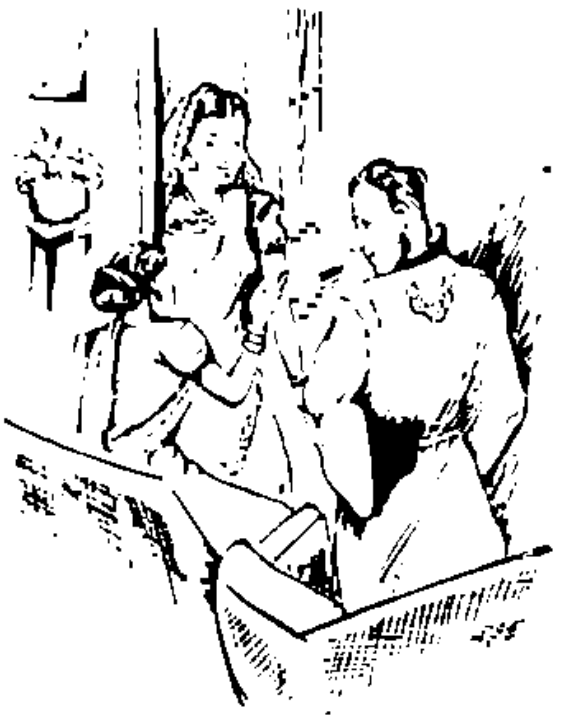

বৌদি একদিনেই কিরকম রোগা হয়ে গেছে

মনোরমা আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না : দু'টি চোখে অজস্র ধারা লইয়া মুকুলের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া পদ্মের উপর পদ্ম রাখিয়া বলিতে লাগিল, রাজ-রাণী দিদি আমার, এই অভাগীর জন্যে পনেরো দিন আর বাড়ী ছাড়া। রাজার মত বাড়ী, রাজার মত স্বামী, রাজার ঐশ্বর্য্য ছেড়ে হাসপাতালের কেবিনে রাতটা কাটাতে মানুষ পেরে, দিদি আমার রাজে শুয়ে থাকেন। ধারা যখন এসে বললেন, আমি বেঁচে আর বাঁচি নে। কি কাল সাপই আমি তোমার ঘরে ঢুকেছিলুম দিদি। ইচ্ছে করে গুণ্ডার হাতে মরুক, বা যা হোক্, যেখানে হোক্ চলে যাই। তুমি যে ছেলে ছেলে বেড়াও সে আর আমি চোখে দেখতে পারি নে, দিদি।

মুকুল এক গাল হাসিয়া মনোরমার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া, অধিনাশ ও অজয়কে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মনোরমা সাকি আমার কথা জানে না! কেমন ইজিরে ইজিরে বিজিয়ে বিজিয়ে তথায় চলছিল থাকবে দেখ ত!—তারপর তাহার মুখখানাকে নিজের বুকের উপরে চাপিয়া বলিল, ওরে বোকা মেয়ে, বাপ মা হাসপাতালে থাকলে ছেলে মেয়েকেও কাছে থাকতে হয়; নইলে কর্ত্তব্যের হানি হয়।

মনোরমা বলিল, কিন্তু অপারেশন কি তোমার রাজবাড়ীতে হতে পারতো না? দিদি আমি কি কচি খুকি, আমি কি কিছুই বুঝি নে। ক্যাপ্টেন সেনকে কোন্ ক'রে হাসপাতালের জন্যে মাথার দিব্যি দিতে আমি তবি বি বুঝি!

হাসপাতালে চিকিৎসা ভাল হয় যে, অঞ্জলি, চিকিৎসা ভাল হয়। পাড়াগেঁয়ের ভূত, তুই এ সব জানবি কোত্থেকে বল্!

অধিনাশ বলিল, এ কথাটি বৌদি ঠিক বলেছেন। কৃত্ত হয়েই আমরা আপনাদের ঘাড়ে চেপে বসেছি বটে!

মুকুল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, তোমাকেও কি মনোরমার রোগে ধরলো নাকি? ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও; কাজের কথা আছে, বলি শোন। কৈ রে হরিচরণ, চা-টা একটু কিছু যে না খাব, গলা শুকিয়ে যে কাঠ হয়ে গেল!

হরিচরণ অন্তরাল হইতে সাড়া দিল; বলিল, করি বলিয়েছি মা।

বেঁচে থাক্ বাবা!—তারপর অজয়কে বলিল, গাড়ী রিজার্ভ করো, অন্ততঃ পনরো দিন কাশীবাস করতেই হবে।

কাশীর বাড়ী রি-ভিল্ড হচ্ছে, কমপ্লিট হতে এখনও যে অনেক দেরী।

টেলিগ্রাম করো; চাই কি, কাল মাষ্টার মশাইকে পাঠিয়ে দাও, উপর তলাটা দু'চারদিনের মধ্যে শেষ করতেই হবে। সিকরোলের প্যারাডাইসেই কনক্লোসেপী হোক্।

অজয় খুসী হইয়া পরমোৎসাহে কহিল, এটা ত ভালই মতলব করেছ। খুলো পায়ে বিদায়।

"দূর্! মা যে। ও কথা কি বলতে আছে?"—মুকুল হাসিয়া বলিল। অজয় বলিল, বলতে নেই; করতে আছে; কেমন? তা উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমি না গেলে চলে না?

মুকুল সপক্ষে কহিল, উঁহুঁ, বোমা-ফাইটি প্রমাণ করতে হবে ত।

রাইট্-ও; "ওক্! ওক্!"

চতুর্থ ভাগ

কিন্তু কর্ম্মের নাকি একটা ফল আছে এবং সেটা হাতেনাতে বড়ো। কি রকম চেহারা এই ফলের, তাহা জানি না; তবে বোধ হয় বিলাতে উইণ্ডচ ছিলের যে ছবি দেখিয়াছি, সেই রকম একটা কিছু হইলেও হইতে পারে। সেদিনটা ছিল, রবিবার। কলিকাতা সহরে, রবিবারের মত বর্ব্বরতা! কেরাণীর জাতি আর অলস ঘোড়া, অবসরের আনন্দ, উভয় ও পরমানন্দ। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া হরিচরণ ও ক্ষীরোদা ঝিচাকর বেলা আট-টা পর্য্যন্ত অঘোরে রবিবাসরীয় নিদ্রায় মগ্ন, হাসপাতালে চা খায় নাই, অন্ততঃ অসম্ভব বিলম্ব হইয়াছে, অতএব, ডাক্তার সাহেবের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। হোটেলে, রেস্তোঁরায়, চা-ঘরে ডাক্তার সাহেবের বিরহ বিহ্বলতা। কিয়ৎকাল হাসপাতালের বারান্দায় পায়চারি করিয়া, বাইনোকুলার নয়নযুগলকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে রূপান্তরিত করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ট্রে-ধৃত হরিচরণ-নামধেয় বীজাণুর তথ্যানুসন্ধানে বিফলযত্নেরথ হইয়া রাজা সীতারাম কর্ণের দিকে চরণযুগল পরিচালিত করিয়া দিয়াছিলেন। "উদয়ন" উদ্যানে, ও কে, ধমনী বেগম না কি? ললিত ললনাঙ্গ, প্রভাত সমীরণে ধমনীর বীণা ধ্বনি ধমনীকেও বিমোহিত করিয়াছিল কি-না আমি জানি-না, দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ ওর শ্মশ্রু সজ্জাটি (ছদ্মবেশও কি?) সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নবাব পত্নী তাহা দেখিতেও পাইল না। বীরকাশেম কি বেগ্রাম হইতে জ্যোতির্বিদ ছদ্মবেশধরকে আহ্বান দিয়াছে, গণনা

করিতে বলিবে "তখন বলনী কোথায় থাকিবে ?" বীণা-বাদন শেষ করিয়া চক্ষু তুলিতেই "বলনী" সভয়ে দেখিল, "দীর্ঘাকার পুরুষ গঙ্গার পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই আম্রবৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল।" "দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া ভয় জন্মিয়াছিল।" কি জানি কেন, বলনীর পা দু'টা সুরঙ্গ চরণের প্রেরণা লাভ করিয়া তাহাকে লইয়া পলায়ন করিতেই উদ্যত হইল। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' গুরু গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, দাঁড়াও। "কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর হইল। কণ্ঠ অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ।" তুলসীর বলিয়া কোন লোক সেখানে ছিল না, তাই "আপনি কে ?" এ প্রশ্ন কে করিবে ?

দীর্ঘাকার পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গা বাছা, তুমি কি মরিয়ম নও ? আমার সেরেস্তাদার মহম্মদ জলিলের মেয়ে—মরিয়ম কি তুমি নও ?

এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে 'বলনী বেগম' বেতস পত্রের মত কাঁপিতেছিল ; "দাঁড়াও" শুনিবামাত্র তাহার হাত-পায়ের শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল ; নহিলে ব্যাধবাণবিদ্ধ হইবার পূর্ণাশঙ্কা সত্ত্বেও কি সেখানে সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত ? হায় কুরঙ্গিণি, লতাগুল্মে আপাদমস্তক বদ্ধ, পলায়নেরও সাধ্য নাই, আত্মরক্ষারও সম্ভাবনা নাই ! বিপদকালে বিপন্নীত বুদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভগবান সুপ্রসন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মরিয়মকে আশ্রয় করিল।

মরিয়ম যেন স্থান কালপাত্র ভুলিয়া অকস্মাৎ সোল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া কহিয়া ফেলিল, জ্যাঠামশাই ! আপনি ! আপনি এখানে ?

সে বলছি ; কিন্তু মা জননী আমার, আমায় তুমি চিনতে পারলে না কেন ?

আপনার ত তখন দাড়ি ছিল না জ্যাঠামশাই ? আমার, জ্যাঠামশাই, আমার। আপনি বুঝি ঐ রাঙ্গা থেকেই আমায় চিনে ফেলেছিলেন ? তাই বুঝি—

দীর্ঘাকার পুরুষ কহিলেন, না মা, চোখের অত জোর নেই। ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করি ; তুমি একমনে বাজাচ্ছিলে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই শুনলুম। কি মা-লক্ষ্মী, হরিচরণ কোথা গেল বলতে পার ? সে সাতটায় ভেতর রোজ চা দিয়ে যায়, আজ কেন গেল না, তারই খোঁজে এতদূর আসতে হোল মা !

মরিয়ম মুহূর্ত্তে অন্যোরমা হইয়া পড়িল ; মুহূর্ত্তে প্রফুল্লচম্পকসদৃশ মুখখানি বাসি শুষ্ক টগর হইয়া গেল। জজ সাহেব বলিলেন, তোমার বাবা রিটায়ার ক'রে কলকাতায় বিলিতি শুধুর আমদানীর কারবার করেছিলেন; না মা ? জলিল এখন কোথায়, তোমার ভাই দুটিই বা কোথায় ?

মাটিতে বসিয়া পড়িয়া মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ওঁরা কেউ নেই, জ্যাঠামশাই !

জজ সাহেব তাহার মাথায় হাত দিয়া, আদর করিয়া উঠাইয়া স্নেহস্বরে কহিলেন, বাড়ীর ভেতর চল মা, সব শুনবো। তুমি জান না বোধ হয়, এটি আমার জামাই বাড়ী ; মুকুল আমার বড় ছেলে ! এই যে হরিচরণ, এত বেলা করলে কেন বাপ্ !

হরিচরণ চা-সজ্জা লইয়া বাহির হইতেছিল, আচম্বিতে যেন ভূত দেখিয়া রাম রাম হরে রাম করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল ; জজ

জ্যাঠামশাই আপনি !

সাহেব থ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর মনোরমাকে বলিলেন, চল মা, ভেতরে চল। মরিয়ম, ছেলেবেলায় তোকে আমরা কি বলে ডাকতুম, বল্ দেখি।

মরিয়ম গুরুকণ্ঠে কহিল, আপনি বলতেন, ছবি ; জ্যাঠাইমা বলতেন, ছাবি। দু'য়ে দু'য়ে কেন্দে জ্যাঠাইমা বড্ড রাগ করতেন।

মনে আছে, দেখছি !—বৃদ্ধ মরিয়মের বাহুধারণ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু মরিয়মের পা চলেনা। 'বলনী'ও সে রাত্রে চলচ্ছক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল—যেদিন গুরগন্ খাঁয়ের আদেশে দুর্গদ্বারসমূহ "বলনী"র মুখের উপরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মরিয়মও দেখিল, এই বৃদ্ধের দ্বারও তাহার চোখের সামনে রুদ্ধ হইতে চলিয়াছে। বৃদ্ধ কি বুঝিলেন অথবা কি জানিলেন কে জানে, স্নীয় দুহিতার ন্যায় সানে মৃদুকণ্ঠ হইয়া বলিতে বলিতে চলিলেন, মুকুল আমার বড় ভাল মেয়ে। মুকুলের মত বুদ্ধিমতী, ধরাবতী মেয়ে আমি আর দেখি নি। মুকুলের মত মেয়ে হাজারে একটি—উঁহুঁ, লাখে একটি—না বোধ হয়, কোটীতেও একটি হয় কিনা সন্দেহ। না বাছা, আমি ত এমনটি আর কখনও দেখি নি।

পঞ্চম ভাগ

অনেক বেলায় হাসপাতালে ফিরিবার সময় জজ সাহেব মুকুলকে বারম্বার আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মুকুল, তুই মা আমার ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মানুষকে অন্ন দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে। তাই পরাধীন, পরপদানত ভারতবর্ষকেও পৃথিবী ভক্তি করেছে, শ্রদ্ধা জানিয়েছে। তুই মা আমার সেই মহান্ ভারতের মহৎ মেয়ে!—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিলেন; আবার বলিলেন, হাঁরে মহৎ মেয়ে হবে, না মহতী মেয়ে হবে, তুই ত বাঙ্গলায় কি-এ পাশ করেছিলি, বল্ দেখি, ভুল হোল নাকি?

তুমি ভুল করবারই লোক বটে! কিন্তু বাবা, মা—

জজ সাহেব জিভ্ কাটিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, বাপ্রে! খবর্দ্দার, খবর্দ্দার! ওঁর আছে কোন কথা নয়! কিন্তু মা, তুই আবার ভারতবর্ষ। তুই আমার ভারতবর্ষ! নিজের মেয়ে ব'লে বলছি তা নয় মা, তোর মুখের পানে চেয়ে সত্যি বলছি মুন্নু, আমি যেন ভারতবর্ষকে দেখতে পাচ্ছি। মা, তুই আমার ভারতবর্ষ—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখে জল আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি কাপড়ে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন।

মুন্নু পিতার পদস্পর্শ করিয়া কহিল, চল বাবা, ওখানে মা আমার ব্যস্ত হচ্ছেন হয় ত!

জজসাহেব আগে আগে কহিলেন, চল মা ভারতবর্ষ।

এইতো জীবন

শ্রীমতী বেলারাণী দাস

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার তখনও ভাল করে পড়ে নাই। সুমায়া সমস্ত দিনের পরে কর্ম্মক্লান্ত দেহ নিয়ে ফিরে আসে তার ছোট্ট ঘরটীতে। এ সময়টুকুতে সে ফিরে পায় নিজেকে। জানালার কাছে এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয়—এই মুহূর্ত্তটুকুই সে সমস্ত কাজ থেকে মুক্ত, সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে—নিঃসঙ্গ। নিবিড় মমতাভরা অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে নিজের জীবনের কতকগুলি দিনের কথাই মনে পড়ছে। যে দিনগুলি চলে গিয়েছে। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। মনে পড়ে গেল অতীতের একটি কাহিনী:

মাত্র ক'বছর আগের কথা। বিয়ে ঠিক হোলো। সুমায়া ভবিষ্যত জীবনের কতকগুলি সুন্দর ছবি স্বপ্নের মত জাল বুনে চলেছিল। মনে মনে ঠিক করলে, পড়াশুনা ছাড়বে না কিছুতেই। তারপর? হাঁ তারপর নতুন জীবনের মোহ কেটে গেল কিছুদিনের মধ্যে। দেড় বছর পর এলো একটী ছেলে। পড়াশুনা কোথায় গেল—জীবনে এলো বাস্তব—রূঢ় সত্যের সংঘাতে সব কিছু কল্পনা স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল—অন্ধকার রাত্রির পরিব্যাপ্তির মাঝে। একঘেয়ে—একটানা—বৈচিত্র্যহীনভাবে চলেছে দৈনন্দিন জীবন।

সুমায়া হাসে মনে মনে। কত কথাই আজ মনে পড়ছে। সেবার 'জীবনের উদ্দেশ্য' নাম দিয়ে একটী বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সুমায়া পেয়েছিল প্রথম পুরস্কার। আজ সেদিনের সেই বক্তৃতার প্রতিটী কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে। "সাধারণতঃ নারীরা যাহা লইয়া সুখে থাকে—আমি কেবল তাহা লইয়াই সুখী হইব না। স্বামী-পুত্রবেষ্টিত একটী সুখের নীড়—তারপর মৃত্যুর কোলে শান্তি শয়ান—ইহাই নারীদের সারা জীবনের একান্ত কাম্য। কিন্তু তাহারা অজ্ঞাত, অখ্যাতভাবে পৃথিবী হইতে বিদায় নিল, পরন্তু জগতের কোন উপকারই যদি না করিল, তবে এমন জীবন ধারণ করিয়া লাভ কি? প্রথমতঃ চাই শিক্ষা, শিক্ষা নারীদের একান্ত দরকারী। অশিক্ষিতা কন্যা, অশিক্ষিতা স্ত্রী, অশিক্ষিতা মাতা সংসারে দুর্বহ বলিয়া মনে হয়। সেই শিক্ষাই আমি লাভ করিব, সেই শিক্ষা দ্বারা জগতের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিব। সমাজের এবং সংসারের অন্ধ সংস্কার মানিয়া আমি চলিব না। যাহা খাঁটি সত্য, যাহা ধ্রুব, তাহার সন্ধানই হইবে আমার জীবনের ধ্রুবযাত্রা ·····। আমি হইতে চাই একজন আদর্শ নারী। সতীত্বে সাবিত্রীর মত, বীরত্বে দুর্গাবতীর মত, ত্যাগে মীরাবাঈয়ের মত।·····

মাঝখানের অনেক কথাই মনে পড়ছে না। সেই দিনের সেই উত্তেজনা, সেই কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে সুমায়ার কানে। সুমায়া সব ভুলে যায়, ভুলে যায় তার বর্ত্তমান জীবন, চোখের সামনে যেন দেখতে পায় সে ফিরে এসেছে এক নতুন জীবনের মাঝে। ত্যাগে মীরাবাঈয়ের মত, বীরত্বে দুর্গাবতীর মত, দেশের জন্য সে জীবন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোথায় ফেলে গেছে তার সাজান সংসার, তার স্বামী, তার দুটী ছেলে।

"ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে? বৃষ্টিতে সমস্ত ঘর যে ভিজে গেল। জানালাগুলো বন্ধ করবার সময় হয়নি বুঝি?"

সব কল্পনা, সব স্বপ্ন মিলিয়ে যায়—বাস্তব-জগতের স্বামীর কণ্ঠস্বরে। সুমায়া চমকে ওঠে। ভাবে—কখন আবার বৃষ্টি হোলো? জানালার কাছ থেকে স'রে আসে। অকারণে চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে—ঝাপসা হ'য়ে আসে অশ্রুভারে।

(২)

কলিকাতার সময় হ'তে ২½ ঘণ্টা বাদ দিলে তুরস্কের সময় হয়। আমরা ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে নুরিয়ে চলেছি। বিমানঘাঁটী হ'তে কোচে করে ৪।৫ মাইল দূরে একটি হোটেলের রেস্টুরেণ্টে খেতে গেলাম। রাস্তার দু'ধারে তুরস্কের ঘর বাড়ী মাঠ ঘাট দেখতে দেখতে চলেছি। সবুজ ঘাসে ঢাকা পতিত জমিগুলি বেশ উর্ব্বর বলেই মনে হল। ওয়েটাররা আধা-ইংরেজী ও আধা-তুরস্ক ভাষায় কথা বলে আমাদের বেশ যত্ন

লণ্ডনের রাজপথ

আপ্যায়িত করে খাওয়ালে। খাওয়া শেষে আমরা বাইরের বারান্দায় কিছুক্ষণ বসে রইলাম। চোখে পড়লো সাম্নের একটি বাড়ীতে একপাটি পুরাণো জুতা জানলায় ঝুলছে। স্বামীর এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে এখানে গৃহদেবতা শুভ ও মঙ্গলের জন্য ঐ একপাটি পুরাণো জুতা বাড়ীতে ঝোলায়—এটা এদেশের সংস্কার।

যা হোক্, আমরা জানি কামালপাশার নেতৃত্বে ও সাধনায় তুরস্কের জাতীয় জীবনে এক নব জাগরণের সাড়া এসেছে—আর তারা সর্ব্ব বিষয় উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

যথাসময়ে আমরা ফিরে গেলাম, বিমান আকাশে উঠলো। খুকু আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমালো, যাত্রীরাও একে একে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো, এর মধ্যে আবার নাক ডাকাও শোনা যেতে

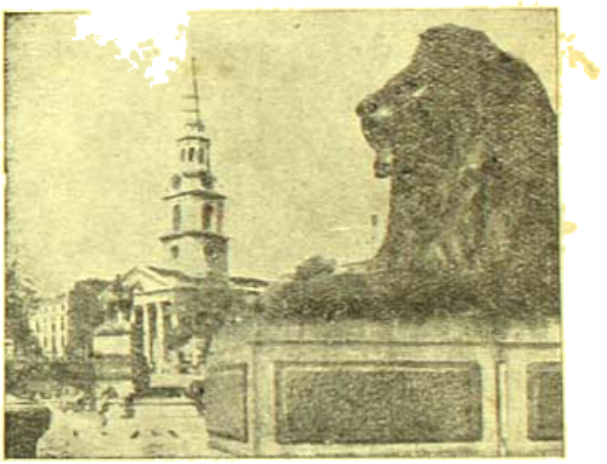

নেলসন স্মৃতিস্তম্ভের পাদমূলে

লাগলো। আমি চুপচাপ বসে আছি; ভীষণ ভাবনা হচ্ছে কি করে চোরের হেফাজত দিয়ে ঘুমানো যাবে, সারারাত হয় তো জেগেই কাটবে। রাত তখন ৩টে, পূর্ব্ব সহরের রাস্তার আলো দু'ধারে দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বেতারের আলো জ্বললো। ষ্টুয়ার্ডেস্ এসে সকলকে জাগিয়ে দিলে। এরোড্রোমের বাঁশী বেজে উঠলো, আমরা ধীরে ধীরে লণ্ডনের ষ্টিচলো বিমানঘাঁটিতে নামলাম। বিমানের দরজার সামনে

আসতেই ঝড়, বৃষ্টি ও হিমে কেঁপে উঠলাম, হিমে কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে বিমানঘাঁটির বসবার ঘরে ঢুকলাম। ঘর গরম করা হয়েছে—কি আরামই না হ'ল। পরক্ষণেই আবার হাঙ্গামা সুরু হল—মালপত্র পরীক্ষা, পাসপোর্ট দেখানো ও কাগজপত্রে সই করা। সব কিছু সারা হলে ফিরে গেলাম বসবার ঘরে। Thos Cookএর লোকের

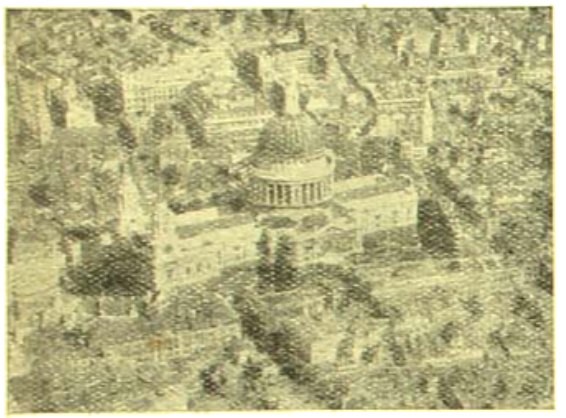

লণ্ডনের আফিস অঞ্চল

সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরছি, আমাদের হোটেলের ঘর রিজার্ভ করার ভার তাদেরই উপর। কিন্তু কোথায় তারা! তাদের একটি লোকেরও দর্শন মিললো না।

এই অন্ধকার রাতে কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় একজন পোর্টার একখানি টেলিগ্রাম আমাদের দিল। আমাদের জনৈক

চার্লস ডিকেন্সের গুড ওল্ড ফিউরিয়সিটি শপ্

লণ্ডনবাসী বন্ধু—Mr. and Mrs. Jacob লিখে জানিয়েছেন যে একটি হোটেলে আমাদের জন্য ঘর রিজার্ভ করা হয়েছে। যুদ্ধলাভ তা: মিত্র Thos Cookএর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে এঁদেরও ঘরের জন্য লিখেছিলেন। যা হোক্, খুব খুশী হয়ে আমরা মালপত্র নিয়ে কোচে গিয়ে বসলাম। চারিদিক অন্ধকার, জনমানবহীন রাস্তার দুধারে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। নির্জন নিস্তব্ধ পথে আমাদের একখানি মাত্র গাড়ী চলেছে। ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করে বাকিংহাম প্যালেস্ রোডে এয়ারওয়ে টারমিনাসে এলাম। তখনও আকাশ অন্ধকার, নিস্তব্ধ নগর নিষুপ্তীর মত ঘুমিয়ে আছে। আমরা টারমিনাসের বসবার ঘরে বসেছি। এক একবার রাস্তায় বেরিয়ে দেখছি গাড়ী চলাচল সুরু হল কিনা। লণ্ডনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছি—ক্রমে আকাশ আলো হয়ে উঠলো, রাস্তায় ২।১টি পথিকের চলাফেরাও সুরু হল; ভীষণ ঠাণ্ডায় আর দাঁড়ানো গেল না, আমরা ঘরের ভিতর ফিরে একজন এয়ার-অফিসারকে একটি প্রাইভেট ট্যাক্সি আনিয়ে দিতে বললাম। তিনি তখনই Phone করলেন—গাড়ী এসে গেল; আমরা Hotel Mapletonএর দিকে রওনা হলাম। পথের দুধারে

গুড ওল্ড

কালো পোড়া ভাঙ্গাবাড়ীর সারি দেখতে দেখতে চলেছি। বাকিংহাম প্যালেস্ পেরিয়ে পার্লামেণ্টের জোড়াবাড়ীর সামনে দিয়ে এসে চৌরাস্তার একটি বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড়ালো। আমরা Mapleton Hotelএর ভিতর প্রবেশ করলাম, এত ভোরে হোটেলের সবটাই নিস্তব্ধ; কেবলমাত্র একটি লোক নীচের Reception অফিসে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে ঘর আমাদের রিজার্ভ হয়েছে। তবে বেলা ১২টার আগে মিলবে না। কি করা যায়। লোকটি পরামর্শ দিল, উপরে বসবার ঘরে খানিকটা বিশ্রাম করে নিতে এবং নিজেই আমাদের মালপত্র সঙ্গে নিয়ে ঘর দেখিয়ে দিল। তখনকার অবস্থা যখন ঠিক হল, তখন আমরা অনুভব করতে লাগলাম

যে 'বিলেতে' এসেছি। এই সেই বিশ্ববিশ্রুত বিলেত, যা ছাত্র সমাজের তীর্থস্থান, বিজ্ঞান সমাজের আদর্শপীঠ, ব্যবসায়ীর কর্মস্থল—এক কথায় আধুনিক পৃথিবীর আকর্ষণ কেন্দ্র।

বসবার ঘরের পাশেই ছিল স্নানের ঘর, আমরা সেখানে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিলাম। বসবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখি—রাস্তায় সবেমাত্র ২।১টি গাড়ী চলাচল সুরু হয়েছে, মাল বোঝাই করে ঘোড়ার গাড়ী ধীরে ধীরে চলেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের রাস্তা সরগরম হয়ে উঠলো, যানবাহনও পথচারীতে রাস্তা ভরে গেল. ভীড় ঠেলে রাস্তায় হাঁটা দায়। আমরা একটু বেড়িয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। তিনতলার দু'খানি ঘরে বাস্ত গুছিয়ে রেখে প্রাতরাশ হোটেলেই সারলাম. তারপর স্নেহময় পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। লণ্ডনের Underground tube Stationগুলিতে যাত্রীদের যাতায়াতের অতি উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত রয়েছে। মাটির তলায় ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণগুলি যাত্রী নিয়ে অনবরত সহরের দূর দূরান্তে ছুটে চলেছে. প্রতি ষ্টেশনে প্রায় ১ মিনিট অন্তর ট্রেণ আসছে. যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় না। আমরা ৩ মিনিটের মধ্যেই বন্ধুর বাড়ীর কাছে পেলাম। সেখানে গল্প করে বেলা ১টায় Rotary clubএ উপস্থিত হলাম। বিদেশী রোটারিয়ানরা খুবই আলাপ আপ্যায়িত করলেন, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট তাঁর পাশে আমাদের স্থান করে দিলেন। লাঞ্চ খাওয়া আরম্ভ হল ; সেদিনের বক্তব্য বিষয় ছিল 'World Peace' ; বক্তার পাঠ শেষ হলে আলোচনা চললো।

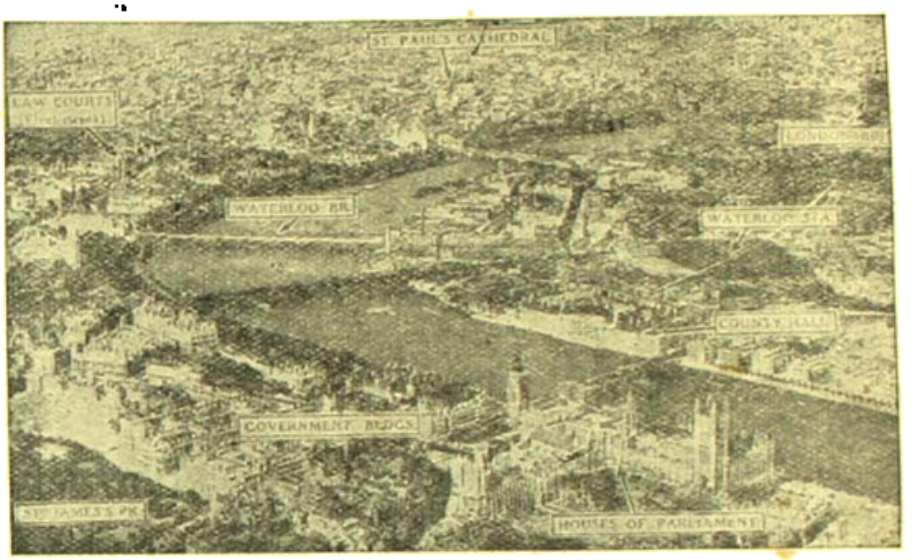

বিমান থেকে লণ্ডনের দৃশ্য

সেণ্টপলস ক্যেথিড্রালের চূড়া

উনি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের একটু মতামত প্রকাশ করে বলেন—"শান্তির একমাত্র পথ হল পরার্থে আত্মদান। এ ছাড়া নিজের জাতির বা জগতের শান্তি আশা অসম্ভব। আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি—যে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষদের আত্ম-ত্যাগের কাহিনী ইতিহাসে লেখা রয়েছে। তাঁরা নিজের জীবনে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন শান্তি আগেই মেলে। সেই বুদ্ধের যুগ হতে আজ এই গান্ধীর যুগ অবধি সেই একই বাণী আমরা শুনে আসছি। এটাবিশ্বাসের পক্তি যে অসীম তাতে সন্দেহ নেই, তা নিয়ে মতান্তরে বিশেষ যুক্তি তোলে দেওয়া যায়. কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনা হতে পারে না।"

রোটারিয়ানরা পরস্পর একটু মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন। তারপর, মুখে প্রশংসা ও খুশীর ভাব প্রকাশ করলেন ; সভা ভঙ্গ হল।

আমরা হোটেলে ফিরলাম। বিকেল বেলা চা খেয়ে আবার রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছি। লণ্ডনের রাস্তার দু'ধারে আকাশ-ছোঁয়া পোড়া বাড়ীর

নাড়ি দেখতে দেখতে চলেছি, লাইনের পর লাইন, রাস্তার পর রাস্তা বাড়ীগুলি জলে ডুবে ঐ একই অবস্থায় আছে। এই সকল স্থানে গুপ্তের মাঝে কোথাও বা বড় বড় গর্ত হয়ে রয়েছে। সন্ধ্যা হ'তে একটি রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে সেদিনের মত বেড়ানো শেষ করে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন ১লা মে, আমরা সকালেই মালপত্র গুছিয়ে বাঙ্কে তুলে ফেললাম। হোটেলের হিসাব চুকিয়ে বেলা ১২টার সময় ঘর ছেড়ে দিলাম। বাইরে খেলাম লাঞ্চ খেয়ে। বেলা ৩টার সময় ফিরে এসে মালপত্র নিয়ে এয়ারওয়েটারমিনাসে উপস্থিত হলাম; ইকফলমের লাইনের একটি বড় বিমানে উঠ্‌লাম। দু'জন ইংলিশ মহিলা ষ্টুয়ার্ড আমাদের জিনিষগুলি যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়েই রইল, শেষে একটু সিক্ হয়ে হেসে একটু ইতঃস্তত করে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল—আমরা কোন দেশ থেকে আসছি। হাসতে হাসতে বল্লে "কি সুন্দর তোমাদের পোষাক" (costume)।

বিমান আকাশে উঠে পড়লো। আমরা মোট ১৬ জন যাত্রী চলেছি, অথচ এতে বেশী ভোর খালি পড়ে আছে। ষ্টুয়ার্ডেরা অনবরত কেক্, বিস্কুট, চা, কফি, দিয়ে যাচ্ছে। খুব আর উনি অনর সাথে মিশিয়ে অনবরত মিষ্টি খেয়ে চলেছেন। খুব খুসী হয়ে শেষে মন্তব্য করলেন যে ইষ্টার্ণ এয়ার লাইনের বিমানই সব চেয়ে ভালো।

আমরা ৮ হাজার ফিট উপরে উঠে চলেছি। উপরে গাঢ় নীল আকাশ, নীচে ছেঁড়া মেঘের টুকরো চারিদিকে ছড়ানো, ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে পৃথিবীর সব বাড়ী ঘাট ঘাট।—মনে হচ্ছে কে যেন তুলো তুলে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। মনে মনে নানা কল্পনা করছি এমন সময় ডেকে আসছে, পলকের পর পলক ওরে পলে পলে উঠ্‌লো—পৃথিবীর সব কাঁক ঢেকে দিয়ে অসংখ্য রকমারী আকার জুড়ে জেগে রয়েছে—এ যেন এক মেঘলোক—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমি অনিমিষে চেয়ে আছি। নীরব নিস্তব্ধ সন্ধ্যা। আমরা যেন কোন অজানার যাত্রী, মেঘলোকের যাত্রীর দল থেকে ছিটকে একা হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে—তাকায় এ রাঙ্গা আমার কারা এল! বিশ্ব যেন মৌন বুঝি।

ঘরের ভিতর ফিরে যেতে সামনের কাঁচা দশ হাজার ফিট অবধি উঠছে। আমি ওদের সকলকে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে বললাম।

(ক্রমশঃ)

কাশ্মীরের যুদ্ধ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্থান ও আফ্‌গানিস্থান এই কয়টি রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত হইয়া, পর্বত, হ্রদ, নদী ও বৃক্ষের মালায় পরিশোভিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রম্য নিকেতন সুবর্গ কাশ্মীর রাজ্য অবস্থিত। ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আমল হইতে এতদিন পর্যন্ত এই ভূস্বর্গের ভূপতিভুক্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে দুইটি কাশ্মীরী শাল ও তিনখানি রুমাল মাত্র করভরূপে প্রদান করিয়া, নিরুপদ্রবে নিশ্চিন্তে বৃটিশের ছত্রছায়ায় অবস্থান করিয়া আসিতেছিলেন। গত ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হওয়ায় কাশ্মীর হইতেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিরাজ ক্ষমতার লোপ হইল। তখন কাশ্মীরের মহারাজা স্যার হরিসিং ইচ্ছা মহীন্দ্র বাহাদুর বিতস্ত ভারতের দুইটি ডোমিনিয়নের কোনটিতেও যোগ না দিয়া, নিজ রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেন। তবে অর্থনৈতিক কারণে ১৭ই আগষ্টের অব্যবহিত পরেই পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সহিত তিনি স্থিতাবস্থা চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন।

ভারত বিভক্ত হইলে ভারতের অধিকাংশ দেশীয় রাজাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। যে সকল দেশীয় রাজ্য বিভক্ত ভারতের কোন অংশে যোগদান না করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে বা স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার মনস্থ করে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের এই স্বাধীনতার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণাকে অস্বীকার করিবার কথা জানাইয়া দেয়। ঠিক এই সময়ে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্না কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্বীকার করিয়া লইলেন। এ সম্পর্কে তিনি এক বিবৃতিতে বলিলেন—আমার মতে দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে, কারণ তাহাদের সে অধিকার রহিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মিঃ জিন্নার এই বিবৃতির পর কিছু দিন যাইতে না যাইতেই, পাকিস্থানের সহিত কাশ্মীরের স্থিতাবস্থা চুক্তি সত্ত্বেও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরকে খাদ্য, লবণ, পেট্রোল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি দিতে অস্বীকার করিলেন। এই ভাবে অর্থনৈতিক দিক হইতে জব্দ করিয়া পাকিস্থানে যোগ দিবার জন্য তাহার উপর চাপ দেওয়া আরম্ভ হইল। ইহাতেও যখন দ্রুত কাজ হাসিল হইল না, তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট উপজাতি পাঠানদের দ্বারায় কাশ্মীর আক্রমণ করাইয়া দিলেন। এই আক্রমণের অন্তরালেই শুধু পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট থাকিলেন না। প্রকাশ্যভাবে নিজেদের সৈন্য অফিসার, অস্ত্র, ট্রাক, রসদ প্রভৃতি দিয়া আক্রমণকারীদের সাহায্য করিলেন। এই আক্রমণের পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্য রহিল—কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি আক্রমণাত্মক

ধ্বংসের ভিতর দিয়া একটা প্রবল ভীতির সৃষ্টি করিয়া কাশ্মীরকে পাকিস্থানে যোগদান করিতে বাধ্য করা।

একটি সুপরিকল্পিত সামরিক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া এই আক্রমণ আরম্ভ করা হইল। প্রথমতঃ অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে পঞ্চকাল ধরিয়া পশ্চিমপাঞ্জাবের সীমান্তে কাশ্মীর রাজ্যে ছোটখাট লুঠপাঠ ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা হইল। তাহাতে কাশ্মীরের মহারাজা গণ্ডগোল থামাইবার জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া জম্মুতে পাঠাইয়া দিলেন। এই সেনাবাহিনী বিক্ষিপ্ত হইয়া যখন জম্মুতে দাঙ্গা নিবারণে ব্যস্ত ছিল, তখন প্রবল সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারায় কাশ্মীর আক্রমণ সুরু হইল। ২২শে অক্টোবর তারিখে দুইটি বিরাট সশস্ত্র পাঠান বাহিনী—একটি রাওলপিণ্ডির দিক হইতে, অপরটি এবটাবাদের দিক হইতে আসিয়া ডোমেলের নিকটে একত্র হইল, তারপর পাকিস্থানে জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিল। কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে মনসেরাবাদ দখল ও ভস্মীভূত করিল এবং উরি সহর ঘেরিয়া ফেলিল। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ ও নারীহরণ করিতে করিতে হানাদাররা কাশ্মীরের ভিতর আগাইয়া চলিল। ২৪শে তারিখে উহারা বরমুলা সহর দখল করিয়া, সেখানে একটি শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করিল এবং সেখান হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হইল।

এই আক্রমণকারীরা সৈন্য, লুণ্ঠনকারী ও অনুগামী এই তিনটি দলে বিভক্ত হইল। সৈন্যরা বন্দুক রাইফেল, ব্রেণগান, মর্টার প্রভৃতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এবং শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মুসলমান অফিসারদের দ্বারায় পরিচালিত হইয়া নির্বিবাদে ধ্বংস চালাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। লুণ্ঠনকারীরা সৈন্যদলের ঠিক পরে পরে থাকিয়া যাহা পায় সমস্তই লুটিয়া লইতে থাকিল। আর পশ্চাতের অনুগামী দল উক্ত দুই দলের খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য ব্যবস্থার ভার রহিল।

সীমান্তের প্রধানমন্ত্রী খান আবদুল কোয়ায়ুম হাজারায় তাঁহার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করিয়া, সেখান হইতে কাশ্মীর আক্রমণকারীদের পরিচালিত করিতে থাকিলেন এবং সীমান্ত সরকার আক্রমণকারীদের জন্য সমস্ত শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে সীমান্তের খোদাই খিদমতগার কর্মীরা সীমান্তের জনগণ ও উপজাতিদের কাশ্মীর আক্রমণ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে, সীমান্ত গবর্ণমেণ্ট খোদাই খিদমতগার কর্মীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে লাগিলেন।

কাশ্মীরের এই আকস্মিক বিপদ দেখিয়া কাশ্মীরের মহারাজা ২৬শে তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ঐ দিন তিনি ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিকট এক জরুরী পত্র লিখিয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ মহাজনকে নয়াদিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাশ্মীরের যোগদানের কথাও জানাইয়া চুক্তিপত্র পাঠাইলেন। কারণ মহারাজা বুঝিয়াছিলেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করিলে তাঁহাকে সাহায্য করা ভারতের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

মহারাজা তাঁহার পত্রে লিখিলেন—পাকিস্থানের সহিত আমার গবর্ণমেণ্টের স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও, পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট আমার রাজ্যে খাদ্য, লবণ, পেট্রোল প্রভৃতি সরবরাহ অত্যধিক পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছে। উপরন্তু সাম্প্রতিক যে পশুবল আমার রাজ্যে আসিয়া হত্যা ও ধ্বংস সুরু করিয়া দিয়াছে, তাহাদের বাধা দিবার জন্য আমার গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টকে উপরি উপরি অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাহারা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। এই অরাজক অবস্থা দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন। আমি আপনাকে আরও জানাইতেছি যে, শীঘ্রই আমি রাজ্যে একটি অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিব। এই জরুরী অবস্থায় কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি শেখ আবদুল্লাকেই প্রধান মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিব।

ঠিক এই সময়ে কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি শেখ আবদুল্লাও কাশ্মীরের জনসাধারণের পক্ষ হইতে নয়াদিল্লীতে আসিয়া বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

কাশ্মীরের মহারাজা ও শেখ আবদুল্লার আবেদনে ভারত গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরকে দ্রুত সাহায্য করার কথা ২৬শে তারিখেই স্থির করিলেন। ভারতের বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ২৭শে তারিখে কাশ্মীরের মহারাজার পত্রের উত্তরে জানাইলেন—আপনার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের প্রস্তাব আমার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছে। তবে আমার গবর্ণমেণ্টের নীতি এই যে, কোন রাজ্যের কোন ডোমিনিয়নে যোগদান লইয়া বিরোধ দেখা দিলে, সেখানের জনসাধারণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। অতএব কাশ্মীর হইতে দুর্বৃত্তদল বিতাড়িত হইলে এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলে, তখন জনসাধারণের ভোটের দ্বারাই কাশ্মীর কোন ডোমিনিয়নে যোগদান করিবে তাহা চূড়ান্তভাবে স্থির হইবে। তবে আপনার রাজ্য ও আপনার প্রজা সাধারণের ধন, মান, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য আমরা ভারতীয় সামরিক বাহিনী আপনার সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য পাঠান হইতেছে।

২৮শে অপরাহ্নে ভারতগবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণের কথা সিদ্ধান্ত করিলে, ঐদিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই সৈন্যরা প্রস্তুত হইল। পরদিন ২৯শে অক্টোবর অতি প্রত্যুষেই লেঃ কঃ ডি, আর, রায়ের পরিচালনাধীনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রথম বিমানযোগে কাশ্মীর রওনা হইল। এই ভারতীয় সেনাবাহিনী শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করিয়াই আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিবার জন্য বরমুলা অভিমুখে যাত্রা করিল। আক্রমণকারীরা এই সময়ে বরমুলা অধিকার করিয়া সেখানে লুটতরাজ করিতেছিল। লেঃ কঃ রায় ২৯শে তারিখ প্রাতে বরমুলার উপর আক্রমণ চালাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু আক্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, শত্রুপক্ষ কামান, মেশিনগান, মর্টার প্রভৃতি

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। ইহাই প্রতিপক্ষ শক্তিশালী বুঝিয়া এবং পার্শ্বপরিবেষ্টনের আশঙ্কা করিয়া তিনি ঘাঁটি স্থান গ্রহণ করিয়া মূল সেনাবাহিনীকে পশ্চাৎ অপসরণ করিতে আদেশ দিলেন। এই পশ্চাৎ অপসরণকালেই মেঃ কং রায় শত্রুপক্ষের গুলিতে নিহত হইলেন। তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘাঁটি গ্রহণ করিয়া ও ঘাঁটি আগলাইয়া ২৬শে তারিখ হইতে শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশের উপরে সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন।

২৬শে হইতে আরম্ভ করিয়া উপরি উপরি কয়েকদিনই কেবল সৈন্য ও সমরোপকরণ দ্রব্যাদি ভারত হইতে বিমানযোগে কাশ্মীরে প্রেরিত হইতে থাকিল। নভেম্বরের প্রথমদিকে ভারত গবর্ণমেণ্ট পাঠানকোটের মধ্য দিয়া প্রথম স্থলপথে সাঁজোয়া গাড়ী ও কামানের কতক কাশ্মীরে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে নেপালের মহারাজা কাশ্মীরের জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ১০ হাজার গুর্খা সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার কথা জানাইলেন।

কাশ্মীরে মোটেরভাবেই উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কাশ্মীরের আক্রমণকারী উপজাতিরা যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহিত সম্মুখযুদ্ধে পারিয়া উঠিল না, সেখানে ধরিয়া যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিল। তাহারা পাহাড়ের আড়াল হইতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপরে গোরা আক্রমণ চালাইতে থাকিল। আক্রমণকারীরা সহরে ঢুকিয়া গ্রামাঞ্চলেও দলে দলে গিয়া প্রবেশ করিল এবং সেখানেও হত্যা, লুণ্ঠন সুরু করিল। ৩রা নভেম্বর বারমুলার গ্রামাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর এক টহলদারী সেনাদলের সহিত হানাদারদের এক ভীষণ সংঘর্ষ হইল। এখানে হানাদারেরা টহলদারী সেনাদের তুলনায় সংখ্যায় প্রায় দশগুণ ছিল। এই টহলদারী সেনাদলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন ৪র্থ ব্যাটেলিয়ন ডুরান্দ রেজিমেণ্টের মেজর সোমনাথ শর্মা। এই ক্ষুদ্র সেনাদল অতুল বীর্যের সহিত আক্রমণকারীদের সহিত সংগ্রাম চালাইল। প্রায় তিনঘণ্টা ধরিয়া সম্মুখযুদ্ধ হইল, যুদ্ধে হানাদারদের অনেকে হতাহত হইল, কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর মেজর সোমনাথ শর্মা এই যুদ্ধে অসম বীরত্বে লড়াইয়া শেষ পর্যন্ত নিহত হইলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে পৌঁছিবার পূর্বেই ২৬শে অক্টোবর হানাদারেরা বারমুলা সহর অধিকার করিয়া সেখানে যে লুট পাট করে, তাহাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও মোটরযানই শুধু তাহাদের ছিল না, সেখানে বিমান বিধ্বংসী কামান পর্যন্তও ছিল।

৮ই নভেম্বর ভারতীয় মোটর সজ্জিতবাহিনী ভারতীয় বিমানবাহিনীর সহায়তায় এই বারমুলা সহর আক্রমণ করিল এবং শত্রুপক্ষের উপর প্রবলভাবে চাপ দিল। ফলে ঐদিন অপরাহ্ণেই ভারতীয়বাহিনী বারমুলা উদ্ধার করিতে সক্ষম হইল। এই সৈন্যবাহিনী ব্রিগেডিয়ার এল, পি, সেনের অধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া হানাদারেরা বারমুলা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, ভারতীয়বাহিনী শত্রুদের অস্ত্র, গোলাবারুদ, মোটর, লরী প্রভৃতি হস্তগত করে এবং শত্রুদের পশ্চাৎধাবন করিয়া বারমুলা পর্যন্ত আগাইয়া যায়। তবে শত্রুরা পলায়ন করিবার কালে পথের সেতুগুলি ভাঙিয়া দেওয়ায়, ভারতীয়বাহিনীকে অনেক সময়ে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

বারমুলা শত্রুকবলমুক্ত করা হইলে, কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট বারমুলায় ছুটিপুর টেলিফোন করিবার এবং আরও কয়েকজন সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিলেন। কারণ বারমুলা আক্রমণে তাঁহারা হানাদের সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, কাশ্মীর যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করিবার জন্য শ্রীনগরে গমন করিলেন। সেখান হইতে তিনি কাশ্মীর অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে সঙ্গে লইয়া বারমুলা পরিদর্শন করিলেন।

বারমুলায় হানাদারেরা স্থানীয় অধিবাসীদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার চালায়। হত্যা, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ ব্যাপকভাবেই চলে। বারমুলার একটি ভগ্নী খ্রীষ্টান ইস্কিয়া গার্ডকে জানায় যে, কাশ্মীর-হানাদারেরা বারমুলার হিন্দু ও শিখ তরুণীদের ধরিয়া তাহাদের ক্যাম্পে লইয়া যায়। সেখানে প্রথমে তাহাদিগকে লুণ্ঠের মাল বহনে নিযুক্ত করা, পরে নরপশুদের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে মুসলমান তরুণীরাও বাদ যায় নাই।

প্রায় ১৫ হাজার নরনারীর মধ্যে অধুনাবিত বারমুলা সহরের ৩ হাজার নরনারীকে বিনিচারে হত্যা করা হয়।

বারমুলায় হানাদারেরা ইউরোপীয়দের উপরও অত্যাচার করিতে বাকি রাখে নাই। বারমুলার মেট্রন মিস ফর্বিজেট তাহারা লুঠ করে। কনভেন্টের হাসপাতাল ও লাইব্রেরী ভস্মীভূত করে। চার্চগুলির জানালা কপাট ভাঙিয়া দেয়। শেষে মঠের ৫ জন সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণ ও হত্যা করে।

কাশ্মীরের দেওয়ানের উপরেও এইরূপে অত্যাচার আরম্ভ হইলে কাশ্মীরে অবস্থিত ইউরোপীয়গণ ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া বিমানযোগে ভারতে চলিয়া আসে। অনেকে বাধ্য হইয়া স্থলপথেও কাশ্মীর ত্যাগ করে। ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক কাশ্মীরের অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসিলে, তখন অল্প কয়েকজন ইংরাজ সেখানে কাশ্মীরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।

১৯শে নভেম্বর ভারতের সেনারক্ষা দপ্তর হইতে যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়, তাহাতে বলা হয়—কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী শত্রুর হাত হইতে মোহরা উদ্ধার করিয়াছে এবং শত্রুর পশ্চাৎধাবন করিয়া অনেকটা দূর পর্যন্ত তাহাদের তাড়াইয়া দিয়াছে।

এই মোহরা শ্রীনগরসহ কাশ্মীর উপত্যকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। হানাদারেরা মোহরা অধিকার করার পর হইতে শ্রীনগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুরা যখন মোহরা ত্যাগ করিল, তখন যাইবার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ও গৃহগুলির কিছু কিছু ক্ষতি করিয়া গেল।

১৩ই নভেম্বর আক্রমণকারী উপজাতিরা ভারতীয় বাহিনীর চাপে ওলহার্ণ সহর ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ভারতীয় টহলদারী সেনারা সহরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, শত্রুরা পলাইবার কালে কতকগুলি দোকান ও গৃহ ভস্মীভূত করিয়া দিয়া গিয়াছে।

১৪ই নভেম্বর অপরাহ্নে ভারতীয় বাহিনী শ্রীনগরের ৬৩ মাইল দূরে অবস্থিত বরমূলা-চোমেল প্রধান সড়কের উপর অবস্থিত উরি সহর শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার করিল। এই উরি সহর তিন সপ্তাহ যাবৎ শত্রুদের অধিকারে ছিল। ভারতীয় সৈন্যরা উরি সহরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায় যে, হানাদাররা সহরটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। উরি সহর দখল করিবার পর ভারতীয় সৈন্যরা বরমূলা-চোমেল সড়কে তাহাদের ঘাঁটি দৃঢ় করে। এই স্থানে উচ্ছেদকারী সৈন্যরা বহু আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে তাহাদের পূর্ববাসস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

উরি সহর অধিকৃত হওয়ার পর কাশ্মীর উপত্যকা একপ্রকার নিরাপদ হইয়া যায়। কেবল গ্রামাঞ্চলে হানাদারদের ছোটখাট দলগুলিকে বিতাড়নের কাজটা বাকি থাকে। কিন্তু এই সময়ে জম্মু প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চল—মহুরাবাদ প্রভৃতির অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে। এই অঞ্চলগুলি পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের ঠাণ্ডায় জেলার সংলগ্ন হওয়ায় হানাদাররা পাকিস্থান হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশ করিতে থাকে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ অতি সহজেই পাইতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত কাশ্মীরী সেনাবাহিনী শত্রুদের চাপে পড়িয়া বহু স্থান হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয় এবং কোথাও কোথাও তাহারা শত্রু সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে।

ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর উপত্যকা অনেকটা আয়ত্তে আনিয়া, এইবার জম্মু প্রদেশের এই সব অঞ্চলে কাশ্মীর সেনা বাহিনীর সাহায্যে আগাইয়া আসিল। ভারতীয় বিমানবহর উপর হইতে হানাদারদের আক্রমণ করিয়া পদাতিক বাহিনীর অগ্রগতির পথ সহজ করিতে লাগিল। এই-ভাবে আগাইতে আগাইতে ভারতীয় বাহিনী বেরিপাটান প্রভৃতি শত্রু-কবল মুক্ত করিল। পরে মীরপুর এলাকায় কাশ্মীর সেনাদল পরিখা খনন করিয়া নিজেদের ঘাঁটি দৃঢ় করে। শ্রীনগর হইতে ১৪০ মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত। হানাদাররা এই সহরের অধিকাংশই ভস্মীভূত করে। ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির ফলে হানাদাররা যে সকল স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া সীমান্ত প্রদেশে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। তবে তাহারা স্থান ত্যাগ করিবার সময় সেগুলি পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া দিয়া যায়।

এইভাবে ভারতীয় সেনা বাহিনী কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মু প্রদেশে প্রধান প্রধান সহরগুলি হইতে হানাদারদের হটাইয়া দিতে সক্ষম হয়, তবে আক্রমণকারীদের যে সব দল গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতেই বাকি রহিল। কারণ কাশ্মীরে বহু পর্বত ও জঙ্গল থাকায় হানাদাররা পল্লী অঞ্চলে অনেকস্থলে সহজেই আত্ম-গোপন করিবার সুযোগ পায় এবং সেখান হইতে গেরিলা পন্থায় যুদ্ধ করে। তবে কাশ্মীরের জন সাধারণের সহায়তায় তাহাদিগকেও তাড়াইতে ভারতীয় বাহিনীকে বিশেষ-বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। হানাদাররাও অবশ্য নূতন করিয়া আবার শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এসম্পর্কে দেশীয় রাজ্য বিভাগের মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন—কাশ্মীরে যদি দিন যুদ্ধ চলিলেও আমরা কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া আসিব না।

কাশ্মীরের এই যুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ায় ভারতীয় বাহিনী এত সহজে এতটা অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। কাশ্মীরের মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সহিত এই যে সহযোগিতা, ইহার জন্য কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি শেখ আবদুল্লাহই কৃতিত্ব সর্বাধিক।

ভারতীয় সেনা বাহিনী কাশ্মীর হইতে হানাদারদের হটাইয়া দিবার সময় —একদিকে যেমন তাহাদের অনেককে হতাহত করিয়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করে, তেমনি বহু হানাদারকেও তাহারা বন্দী করে। এই বন্দী শত্রুদের অনেককেই বিমানযোগে দিল্লীতে চালান দেওয়া হয়। এই সব বন্দীদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বহু কাগজপত্র পাওয়া যায়। কয়েকজন বন্দীকে কাশ্মীর আক্রমণের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে, তাহারা আক্রমণ পরিকল্পনার অনেক চাঞ্চল্যকর কথা প্রকাশ করে। বরমূলা-শ্রীনগর রোডে ধৃত পাকিস্থানসেনার সিপাহী হুসরত খাঁ বলে—কাশ্মীর দখল করিয়া অন্যান্য অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য।

আবদুল হক নামে অপর একজন বন্দী ব যে, সে আগে পাঞ্জাবের পুলিশ বাহিনীতে ছিল। পরে সে কাশ্মীর আক্রমণে যোগ দেয়। কাশ্মীর আক্রমণের জন্য পাকিস্থান এলাকায় অবস্থিত রাওয়ালপিণ্ডি ক্যাম্পে ৮ হাজার লোক সংগ্রহ করা হয়। সে আরও বলে যে, বরমূলা যুদ্ধ পরিকল্পনায় আক্রমণ ছিল, ফৌজের ভূতপূর্ব ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদ আরব, ক্যাপ্টেন আজম, মেজর খুরশেদ আনওয়ার, মেজর আসলামও ছিল।

কাশ্মীর আক্রমণকারী হানাদাররা কাশ্মীরের মুসলমানদিগকে হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেও প্রবল চেষ্টা করিয়াছিল। যে সকল মুসলমান তাহাদের আক্রমণে সহায়তা না করে, তাহাদিগের উপর হিন্দু ও শিখদের ন্যায় অত্যাচার চলে। হত্যা ও লুণ্ঠনের সহিত নারী-হরণ ও নারী ধর্ষণ ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে। শত্রুর লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করে।

কাশ্মীরের এই সকল অত্যাচারে মর্মাহত হইয়া কাশ্মীরের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বিশ্বের সকল দেশকে—বিশেষ করিয়া মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে কাশ্মীর পরিদর্শনের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়া ১৮ই নভেম্বর যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি বলেন—ইসলামের নাম লইয়া হানাদাররা কেন কাশ্মীরে যুদ্ধ করিবার যে ভান করিয়াছিল, তাহাতে কাশ্মীরবাসীদের গৃহাদি ধ্বংস করিয়া কি করিয়াছে তাহা একবার দেখিয়া যান। যাহারা এই হানাদারদের কাশ্মীরের অধিবাসীদের মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল, ইতিহাসের চক্ষে তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়াই আমি মনে করি। হানাদাররা জঙ্গল দেখাইয়া কাশ্মীরকে পাকিস্থানের রাবেবার রাজ্যে পরিণত করিয়া দাসত্ব করেম করিবার জন্য আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। এই আক্রমণে আমাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। কাশ্মীরের নরনারীদের শত শত গ্রাম ও সহস্র সহস্র ঘর বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে।

পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনা ও সহায়তায় কাশ্মীর আক্রমণ

হইয়াছে এবং তাহাতে কাশ্মীরের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপরিমেয়; কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, এই আক্রমণের ফলে কাশ্মীরের অধিবাসীদের উপকারও হইয়াছে নিতান্ত কম নহে। শুধু এই আক্রমণের ফলেই এত দ্রুত কাশ্মীরের বহুদিনের স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং কাশ্মীরের জনগণের প্রতিষ্ঠান জাতীয়-সম্মেলন সহর ও গ্রামসমূহের শাসনভার গ্রহণ করে। বৃটিশশক্তির আওতায় থাকিয়া কাশ্মীরের স্বৈরাচারী শাসক জাতীয়-সম্মেলনের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া জাতীয়-সম্মেলনের আন্দোলনকে দমন করিতে কম চেষ্টা করে নাই। এমন কি কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকেও নিষেধ অমান্য করার জন্য একবার গ্রেপ্তার করিতে ছাড়েন নাই; কাশ্মীরের মহারাজার এই স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তন ব্যতীত, হানাদারদের আক্রমণের ফলে কাশ্মীরের আর একটি উপকার এই হইয়াছে যে, কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ আরও প্রশস্ততর হইয়াছে এবং মুসলমান ও অমুসলমান পরস্পর সম্প্রীতি স্থাপনে আরও সহায়ক হইয়াছে। আর কাশ্মীর মুসলমান সম্মেলনের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন সহজে বিনষ্ট হইয়াছে।

কাশ্মীর হইতে দুর্বৃত্তরা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইলে এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলে, তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে কোন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীনে কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে না পাকিস্থানে—কোন ডোমিনিয়নে যোগদান করিবে তাহা স্থির করিবার জন্য গণভোট গৃহীত হইবে। ইহাই ভারত গবর্ণমেণ্টের ঘোষিত নীতি। এই গণভোটে কাশ্মীর তখন কোন ডোমিনিয়নে যোগদান করিবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই এবং কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ রাজনীতি কোনপথে চলিবে তাহাও অনিশ্চিত। তবুও ভবিষ্যতের কথা বাদ দিয়া এই সময়কার কাশ্মীরের সম্বন্ধে বলিতে গেলে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথায় বলিতে হয়, "ভবিষ্যৎ যাহাই হউক কাশ্মীরের ইতিহাসের এই অধ্যায় চিরদিনই গৌরবের সহিত পঠিত হইবে।"

২৪।১২।৪৭

গতি ও প্রগতি

অ-কু-রা

১

থ-র্-র্-র্···ঘ-র্-র্-র্···ঘ-র্-র্-র্···

তিন ঝাঁক বিমানের নেতৃত্ব লইয়া চলিয়াছি।

রেঙ্গুন আমাদের লক্ষ্য।

গুপ্ত সংবাদ আসিয়াছে, রেঙ্গুনের সমরঘাটিতে শত্রু নাকি গড়িয়া তুলিতেছে নূতন আক্রমণের আয়োজন। গুঁড়াইয়া দিয়া আসিতে হইবে তাহার এই আক্রমণোদ্যম। অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত না মিত্রপক্ষের প্রস্তুতি শেষ হইতেছে ততদিন যেন তাহার প্রসারিত বাহু পঙ্গু হইয়া রহে।···

তিনটি ঝাঁকে আমরা চলিয়াছি—বঙ্গোপসাগরে প্রভাত সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া।

একশ···দুইশ···তিনশ···স্পীডোমিটারে থর থর করিয়া গতিবেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। তিনশ'র ঘরে আসিয়া কাঁটার কম্পন স্থির হইল।···

তিন ঝাঁক লৌহপক্ষী ছুটিয়া চলিয়াছে ঘণ্টায় তিনশ মাইল বেগে। গর্ভে উহাদের সহস্র পাউণ্ড তীব্র বিস্ফোরণ—যাহা ভূপতিত হইয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধূলিসাৎ করিয়া দিবে।

পাইকারী মড়ক ছড়াইবার কাজ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। বম্বিং মিশন! সভ্য সাময়িক নাম ইহার।

দুম্ দুম্ দুম্।

নিমেষের মধ্যে কতটা স্থান ধূলিসাৎ করিলাম চোখে তাহা দেখিতে পাইলাম না। শুধু বুঝিলাম, অগ্নি ও ধূম্র-কুণ্ডলীর অন্তরালে নিচের পৃথিবীতে মানুষের গড়া মূর্ত্ত অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া আসিয়াছি!

ছয় ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসি বিমানক্ষেত্রে—যেখান হইতে বোমা বহনের অভিসারে বাহির হইয়াছিলাম।···

বসিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকি তাজ্জব এই সভ্যতা! তাজ্জব মানুষের বিজ্ঞান সাধনা। মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে সহস্র সহস্র মাইল ব্যবধানের কোন এক অজানা দেশে আমায় পৌঁছিয়া দিবার ব্যবস্থা করিল শুধু ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতে! এ অভিযানে কত লোক মারিয়া আসিলাম কে জানে!···

নির্ব্বিকারচিত্তে টী-রুমে বসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকি।

২

আবার আমাকে আর একটি মিশন লইয়া ছুটিতে হইয়াছে।

পিসিমার জরুরী চিঠি আসিয়াছে, তাঁহার একমাত্র পুত্র খ্যাঁদার সঙ্কটাপন্ন পীড়া। অনেক বাড়ফুঁক পড়তির পর পিসিমার কোলে একমাত্র খ্যাঁদাই শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে। খ্যাঁদাই এই দুখিনী বিধবার ভবিষ্যতের অবলম্বন!

পিসিমা একটা ফর্দ্দ পাঠাইয়াছেন। ঔষধ ও ইনজেকসনের। এই অজ পাড়াগাঁয়ে যুদ্ধের বাজারে এসব এখন মেলা দুঃসাধ্য। তুমি মিলিটারীতে চাকরী কর বাবা, তোমার অনেক হাত আছে। এইগুলি যদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দাও ত এ যাত্রা তোমাদের খ্যাঁদা রক্ষা পায়।

হাত অবশ্য নাই। কিন্তু হাতিয়ার ছিল—টাকা। মুক্তহস্তে চোরা-বাজারের দক্ষিণা মিটাইয়া ঔষধগুলি সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

অতএব আবার চলিয়াছি আর একটি মিশন লইয়া।

এবারকার মিশন মানুষ বাঁচানোর মিশন। সঙ্গে আমার খ্যাঁদার মৃতসঞ্জীবনী তুল্য ঔষধ ও ইনজেকসনসমূহ।

কিন্তু আশ্চর্য্য। এবার আর সভ্যতা আমার বাহককে সে তীব্র গতি বেগ দিতে পারে নাই।

চলিয়াছি ঘণ্টায় এগারো মাইলবেগে। মাটিনের লাইনে।

পঞ্চান্ন মাইল পথ যাইতে লাগিবে নাকি পাঁচ ঘণ্টা সময়। কেহ কেহ বলিল, রাস্তায় অষ্টাদশ শতাব্দীর আদি ইঞ্জিন অসুস্থ হইয়া পড়িলে নাকি পাঁচদিনও লাগিতে পারে।

ডিকির ডিকির করিয়া মাটিনের রেল চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্য ইহার মন্থর গতি!

হায় এখন যদি সেই তিনশ মাইল বেগের প্লেনখানা পাইতাম।

৩

ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

সহসা চাহিয়া দেখি সৌম্যমূর্ত্তি এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কি ভাবিতেছ?

বলিলাম: খ্যাঁদাকে বাঁচানোর ঔষধ ইনজেকসন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি। এই সময় সেই তিনশ মাইল বেগের বোমা-বাহী প্লেনখানা যদি পাওয়া যাইত। নহিলে ঔষধ পৌঁছিতে পৌঁছিতে খ্যাঁদাই যে কৃতান্ত সদনে পৌঁছিয়া যাইবে। পাওয়া যায় না উহা?

গম্ভীর মূর্ত্তিতে ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন: আপাততঃ নয়।

তাহা হইলে কবে পাওয়া যাইবে? আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি।

সহসা তিনি শূন্যাকাশে অঙ্গুলি হেলনে একটি বৃত্ত আঁকিলেন।

বলিলেন: চাহিয়া দেখ।

দেখিলাম: ধীরে ধীরে বৃত্তের মধ্যে যেন একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে। ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

একটি টেবিলের ধারে তিন ব্যক্তি পাঞ্জা কষিতেছে। বৃহৎ গুম্ফ, বিশাল বপু, পাইপমুখী একব্যক্তি এক দিকে, আর দুই দিকে দীর্ঘ কপোল, কুটমূর্ত্তি দুই ব্যক্তি। বিশ্বের তিন প্রধান।

তিনি বলিলেন: দেখিতেছ ত ইহারা পাঞ্জা কষিতেছে। ফলাফলের উপরই তোমার প্লেন পাওয়া নির্ভর করিতেছে।

ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলাম: কবে ইহাদের পাঞ্জা-কষা শেষ হইবে প্রভু। এদিকে খ্যাঁদাদের দশা যে শেষ হইতে চলিল!

রাগত স্বরে তিনি বলিলেন: তাহা কে জানে যে বাপু—অতএব ফ্যাকড়া কোশ্চেন করিও না। আপাততঃ চলিতেছে ইহাই জানিয়া রাখ।

বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন।

৪

লোকটা কে তাহা চিনিতে পারি নাই।

স্বপ্নবৃত্তান্ত আমার এক বন্ধুকে বলিলাম।

আমার দিকে বিজাতীয় দৃষ্টি হানিয়া তিনি বলিলেন: লোকটা কে তাহা চিনিয়াছি। ও কোন লাল কাগজের মৃত সম্পাদকের ভূত। দেখিও উহার পাল্লায় পড়িয়া তুমিও লাল বনিয়া যাইও না। চাকুরী যাইবে।

লাল অবশ্য আমি হই নাই। লাল সাদার পার্থক্যও বুঝি না!

তবে লাল হইয়াছিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া পিসিমার চোখ।

খ্যাঁদাকে বাঁচানো গেল না।

মাটিনের রেল বরাদ্দের উপর আরও পাঁচ ঘণ্টা দেরী করিয়া ফেলিয়াছি!

পিসিমার কান্নার রেশ এখনও আমার কানে আসিতেছে:

ওরে খ্যাঁদা, খ্যাঁদা রে—

বিজ্ঞানের কয়েকটি আকস্মিক ঘটনা

শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়

আপনা হতেই মরচেধরে, প্রবাদটী একটী পুরাতন সত্য—কিন্তু তাই বলিয়া বসিয়া থাকিলেও আপনা কি তাহার বরমালা নিয়ে সোজা এসে হাজির হয়। সুপ্ত সিংহের মুখে খাদ্য কি পাশে হেঁটে এসে পৌঁছে? পাস্তুর বলিতেন, ঘৃষ্টবান্ এই দুনিয়ায় তাদের গলায় মালা দিয়া থাকেন যাঁহারা ইহার জন্য বহু আগে থেকেই সাধনা করিয়া আসিতেছেন। ডারউইন বড় চমৎকার একটী কথা লিখিয়াছিলেন, দুনিয়ায় চালাক লোকের সংখ্যাই বেশী, আবিষ্কারকদের চেয়েও অনেকেই বেশী চালাক, কিন্তু ইঁহাদের দ্বারা জগতের কোনও উপকারই হয় না। তাঁহার মতে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে নূতন কোন ঐশ্বর্য যাঁহারা দান করেন তাঁহারা স্বভাবতই খুব অনুসন্ধানী, তাঁহাদের সামনে যখন যে ঘটনা ঘটে তাহার কারণ ও অর্থ অনুসন্ধানে অহরহ নিযুক্ত বলিয়াই কিকিয়া ও সন্ধান তাঁহারাই বলিতে পারেন। যে বিষয় অনুসন্ধানে, তাঁহারা আপাদ তাহা সম্যক অবগত না হইয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেন না। অজানা তথ্যটুকু জানিবার জন্য তাঁহাদের মনোনিবেশ ও মনঃসমীক্ষণ কত তীক্ষ্ণ এবং কত সামগ্রীক। সাধারণলোকে যে চোখে দেখে, তাহার চেয়ে কত সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবল প্রচেষ্টার সহিত তাঁহারা দেখেন। হাঁ, তাঁহারা কৌশলী নিশ্চয়ই, কিন্তু তীক্ষ্ণ ও নিখুঁত দৃষ্টিশক্তিই তাঁহাদের কৌশল। যাঁহাদের জীবন নূতন কিছু আবিষ্কারে ব্যস্ত হইয়াছে তাঁহাদের কাজ আপাদগোড়া আলোচনা করিলে এই কৌশলের ধারাটী অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। পরীক্ষণীয় বিষয়ে প্রত্যেক বারের ফলাফল তাঁহাদের কত প্রখর যায়। প্রত্যেক খুঁটিনাটি রূপান্তর তলাইয়া, খুঁজিয়া দেখিবার মনোবৃত্তির জন্য তাঁহাদের নজরে কুদ্র ব্যর্থতাও এড়াইতে পারে না। প্রত্যাশা করেন নাই এমন নূতন ফলাফল যদি কিছু তাঁহারা দেখেন, বুঝিতে পারিতেছেন না এমন অঘটন যদি ঘটিয়া বসে তবু তাঁহারা হাল ছাড়েন না, অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও শেষ সমাধানে পৌঁছিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন; প্রশ্নের উত্তর যতক্ষণ না সহজ সরলভাবে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হয় ততক্ষণ তাঁহাদের শান্তি নাই। অথচ এই একঘেঁয়ে প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন স্বভাব বলিয়াই বিজ্ঞানীর নিকটে হঠাৎ কিছু হাজির হইলে তাহা কিনিয়া যায় না। সাধারণ লোকে এই 'হঠাৎ' কিছু ঘটিয়া যাওয়াকে অঘটন পটীয়সী ভাগ্যের খেলা বলিয়া প্রবোধ দেয় ও শান্তিলাভ করে।

পাস্তুরের কোন চিকিৎসাজ্ঞান ছিল না। তাঁহার ভেষজ বিদ্যাও জানা ছিল না, কিন্তু তাঁহার ছিল নিখুঁত দৃষ্টিশক্তি, প্রত্যেক ঘটনার কারণ জানিবার জন্য বিপুল ছিল তাঁহার অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টা; এই জন্যই তিনি "আন্থ্রাক্স" ও "জলাতঙ্ক" রোগের ঔষধ আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে আলো বাতাসে জীব জীবনধারণ করে, যাঁহাদুয়া সেই আলো বাতাসের বিরুদ্ধে, ভিতরে বাহিরে, অহরহ লড়াই করিয়া মানুষকে যে দুই জীবন টেনে নিয়ে চলিতে হয় পাস্তুরই তাহা প্রথম আবিষ্কারকে শোনান্।

পরীক্ষণীয় বিষয়ের সাফল্য কিম্বা পরাজয় বৈজ্ঞানিকের নিকটে একটী বড় ঘটনা নহে। ফলাফলের কারণ নির্ণয় বিজ্ঞানীর সাধনা ও সাধ্য হওয়া উচিৎ। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া বসে বিজ্ঞানী যাহার জন্য মোটেই সচেষ্ট কিম্বা প্রস্তুতই ছিলেন না। সাধারণ লোকে সেই অবাঞ্ছিত ফলাফলকে আকস্মিক উপস্থিত হইতে দেখিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া পড়েন এবং বিজ্ঞানাগার পরিত্যাগ করিয়া যান; কিন্তু বিজ্ঞানীরা সেখানেই না থামিয়া সত্য লভ্য ফলাফলের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বহু আবিষ্কার এইভাবেই আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়াছে। চিরকাল ধরিয়াই পাকা আপেলফল বৃন্তচ্যুত হইয়া ধরণীর ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতেছে, কিন্তু একদিন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাপুক নিউটনের চোখে এই ঘটনায় হঠাৎ এক চিন্তার রাজ্য উদ্ঘাটিত হইল। কুদ্র কুদ্র এইরূপ 'হঠাৎ' মানবজাতির কি কল্যাণ সাধনই না করিয়া চলিয়াছে। ইতিহাস তাহার কতটী হদিস রাখিতে সক্ষম হইতে পারে। তার্কিক মিথাই গয়ার বিষ্ণুপাদ-পদ্ম দেখিয়া 'হঠাৎ' প্রেমিক গৌরাঙ্গে পরিণত হইলেন। সচকিত পিতার রাজঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে লালিতপালিত গৌতমের সামনে বয়স্থিল মানুষের চতুর্থদশার ছবি এমন কি বৈরাগ্য আনিল যে ভোগজীবন তাঁহার বিতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নির্বাণের পথে তিনি ঘরের বাহিরে বেরিয়ে এলেন।

বিজ্ঞানের ঝরাপাতা হইতে 'হঠাৎ' ঘটিয়া যাওয়া এই রকম কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভবিষ্যতের অস্পষ্টতা ঘুচাইয়া করিয়া মানবকল্যাণের রাজপথ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছে।

জল যখন বাষ্পে পরিণত হয় তখন অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া লয়। তখন তাহাকে বলপ্রয়োগে কম স্থানে করিয়া দিলে সেও বাহির হইতে চাহিবে। এই স্থিতিস্থাপকতাগুণের সুবিধা লইয়া মানুষে ইঞ্জিন তৈয়ারী করিয়াছে। কিন্তু ইঞ্জিন তৈয়ারী করিবার পূর্বে অনেকেই জলকে বাষ্পে পরিণত হইতে দেখিয়াছেন, চা'য়ের কেটলীর জল হইতে যে "ভাপ" নির্গত হয় তাহাও একরকম বাষ্প। কেটলীর ভিতরে এই বাষ্পের পরিমাণ কিছু বেশী হইলেই উপরের ঢাকনী সরিয়া গিয়া খানিকটা অতিরিক্ত বাষ্প বাহির হইয়া যায়। জল ফুটাইবার সময় বরাবর এইরকম ঘটনা ঘটিতেছে কিন্তু কাহারও খেয়াল আগে নাই। হঠাৎ একদিন বালক "ওয়াটের"

(James Watt) বাষ্পের কেটলীর ঢাকনা উঠাপড়া করিতে দেখিয়া কল্পনার একরাজ্য খুলিয়া যায়। কেন? ওজনহীন বালকের মনে এই প্রশ্ন জাগে? পরিশ্রমী ও ভীরুণী এই বালকই বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জনক।

"আর্গনের" ব্যবসায়িক ও ব্যবহারিক মূল্য সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। বিজলী বাতিতে (electric bulb) পূর্ব্বে "নাইট্রোজেন" গ্যাস ভরা হইত। এখন ইহা "আর্গন" গ্যাসে পূর্ণ করা হয়। বাতাসে আর্গনের উপস্থিতি মাত্র শতকরা ১ ভাগ। ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত বাতাসে ইহার অস্তিত্ব কেহই জানিত না। লর্ড র‍্যালেই সর্ব্বপ্রথম বাতাসে 'নাইট্রোজেনের' চেয়েও ভারী এই গ্যাসের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। এখানেও "হার্বং" এই ব্যাপার ঘটাইয়া বসে। ১৮৯২ সালে "র‍্যালে" বায়ুস্থের গুরুত্ব পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দুই ভাবে 'নাইট্রোজেন' গ্যাস তৈয়ার করেন। প্রথমতঃ বাতাস হইতে "অক্সিজেন" "অঙ্গার গ্যাস", জলীয় বাষ্প দূরীভূত করিয়া, দ্বিতীয় "এমোনিয়াম" "নাইট্রাইট" কিম্বা অন্য কোন নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়ন দ্রব্য উত্তপ্ত করিয়া। তিনি বাতাস হইতে প্রস্তুত "নাইট্রোজেন" গ্যাস-এর আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী পাইলেন, কারণ না বুঝিয়া আরও কাজ করিতে লাগিলেন, দুই বৎসরের পরিশ্রমের পরে বাতাস হইতে "আর্গন" প্রস্তুত করিয়া তিনি সর্ব্বের নিরসন করিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথেই "র‍্যামজে" "হিলিয়ম" "মিয়ন" প্রভৃতি গ্যাস আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়াই "উল্কাজাহাজ" ও বিজ্ঞাপনীয় কদর বাড়াইতে ইহার কত আদর।

১৮৫০ সালে "ম্যাগডীবার্গ" নামক স্থানে জল ফুটাইবার বাষ্প তৈয়ারীর যন্ত্র স্থাপিত হয়, এখানে একই উত্তাপকে দুইবার ব্যবহার করা হইত। এই বৎসর অষ্ট্রিয়ার "লেকলো ইঞ্জ" নামক স্থানে কোন চিনি তৈয়ারীর কলে ঐরূপ একটী যন্ত্র সরবরাহ করা হয়, যাতায়াতে যন্ত্রের অনেকগুলি অংশ, বিশেষতঃ জল ফুটাবার কয়েকটী নল হারাইয়া যায়। কোম্পানীর মালিক যে কোনও উপায়ে যন্ত্রটীকে কার্য্যোপযোগী করিবার প্রার্থনা হন, নলের সংখ্যা কম ছিল বলিয়া তিনি নেওলিকে আড়াআড়ি না লাগাইয়া খাড়া করিয়া লাগাইলেন এবং এমনভাবে সংযুক্ত করিলেন, যাহাতে বাষ্পের উত্তাপ ক্রমাগতঃ তিনবার ব্যবহার করা সম্ভব হয়। কিন্তু এইভাবে জল বাষ্পীকরণ এত বেশী হইল যে খাড়াভাবে সাজান পদ্ধতি-যুক্ত জল তাপাইবার যন্ত্রের খুব প্রচার হইল, এই ঘটনা হইতে, "triple effect" তিনবার ফলপ্রদ উত্তরীযন্ত্রের সূচনা হইল।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ছুয়াপে পশম রঞ্জীণ করিতে হইলে পশম ও রঞ্জীণ জল ফড়াইতে সিদ্ধ করিতে হইত এই পদ্ধতিতে এক দফা পশম রং করিতে ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগিত। তখন ধারণা ছিল—সিদ্ধ করিবার মধ্যেই পশমে রং ধরিবার কোন রাসায়নিক কারণ আছে, এখন এই কথায় ছেলেরাও হাসিয়া উঠে, কিন্তু তখন সত্যই ধারণা ছিল রাসায়নিক কারণেই, ফুটাইলে রঞ্জীণ জলের খুব শীঘ্র পশমের পরদায় লাগিয়া যায়। এই পদ্ধতিতে যেমন সময় অপব্যয় বেশী হইত, তেমনি এক দফা আলের সহিত দ্বিতীয় দফার রং-এও পার্থক্য হইত, এই সাধারণ জ্ঞান যা পড়িল "ব্রিটিশ ডাই ষ্টাফ কর্পোরেশনের" অনুসন্ধান সমূহে একজন কর্ম্মচারীর ভুলের ফলে। এখন জানা গেল—কারণ আর রাসায়নিক নহে বরঞ্চ যান্ত্রিক। তারপর থেকে উষ্ণ রঞ্জীণ জলের মধ্যে পশমী মাল রাখিয়া বাতাসের চাপ দেওয়া আরম্ভ হইল, বাতাসের ক্রমচাপে রঞ্জীণ জলের খুব কাপড়ের প্রতি রন্ধ্রে আক্রমণ সুরু করিল। ইহাতে পূর্ব্বের প্রয়োজনীয় ১৷৩ ভাগ সময়ে কাপড়ে রং ধরান কাজ সমাধা হইল; পরন্তু কাপড়ের উজ্জ্বলতা ও টেকসই অনেক বাড়িয়া গেল, আজকাল কখন কিম্বা কেন আরোর মোটা রঙ্গ ও রঞ্জীণ করিবার কোন অসুবিধা নাই।

রঙ্গের অথবা রঙ্গন রশ্মির উপরে আধুনিক পদার্থ বিদ্যা রসায়নী বিদ্যা বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল. ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বুর্টজবুর্গ (Wurtzburg) বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক W. K. Rontgen রঙ্গহীন শূন্য (Vacuum) নলের মধ্যে বিদ্যুতের তরঙ্গলীলার পরিবহন (conductivity) পরীক্ষা করিতেছিলেন, ঘটনাচক্রে সেখানে নিকটেই 'বেরিয়াম্ প্লাটিনো-সায়ানাইড্' মাখান কাগজের একটী পরদা টাঙ্গান ছিল। বৈদ্যুতিক শক্তি কাল কাগজের বাক্সে রক্ষিত একটী নলের মধ্যে প্রবাহিত হইবার সময় তিনি লক্ষ্য করিলেন—পরদাখানা নলের দিকে উল্টিয়া যাইতেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। এই অদৃষ্ট আলোকে প্রথমতঃ তিনি অবাক হইয়া গেলেন; কিন্তু সেখানেই সমাপ্তি না টানিয়া ক্রমাগতঃ অনুসন্ধানের পরে ঐ আলোর বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিলেন। তিনি এই নূতন অজানা রশ্মির নামকরণ করিলেন X' Ray, 'এক্স রে'। তাঁহার মৃত্যুর পরে গুণমুগ্ধ ভক্তকুলের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতায় এই অজানা রশ্মির নাম রন্টজেন রশ্মি দেওয়া হইয়াছে।

১৮৫৯ সালে ডাঃ হেনরিখ্ ক্যারো নামক জার্ম্মাণ দেশীয় 'ক্যালিকো-প্রিন্টার' মানচেষ্টার নগরে 'রবার্ট ডেল' নামক প্রতিষ্ঠানে 'এনিলিন' রং তৈয়ারীর কাজে সহকারী কর্ম্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন। ঘটনাক্রমে তিনি দুই দুইটী আবিষ্কারের কারণ হন। প্রথম ঘটনা ঘটে ১৮৬২ সালে, এই সময় ক্যারো নাইট্রিক এসিডের মধ্যে কয়লা গ্যাস অনুপ্রবেশ করাইয়া ফলাফল লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি কাজ করিতেছেন, এমন সময় অধ্যাপক ষ্টাই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহার গবেষণা গৃহে প্রবেশ করিলেন। ক্যারো অনেকটা দুষ্ট বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া তাঁহার গবেষণার বিষয় বস্তু লুকাইবার জন্য হাতের কাছে অপর কিছু না পাইয়া আদালার পরদা দিয়া গবেষণাবস্তু ঢাকিয়া রাখিয়া কথা বলিবার অনুহাতে ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। পরে মাঞ্চেষ্টারের পথে তিনি 'নাইট্রিক এসিড্' ও গ্যাসের কথা একদম্ ভুলিয়া গেলেন। পরদিবস গবেষণা গৃহে আসিয়া পূর্ব্বদিনের কাজ তাঁহার স্মরণে আসিল। তাড়াতাড়ি পরদা সরাইয়া পাত্রের ডালা খুলিয়া ভিতরে "নাইট্রিক এসিডের" উপরে ভৈলাক্ত পদার্থ দেখিয়া গভীর অনুসন্ধানে 'নাইট্রো-বেন্জিন' ও 'বেন্জিন' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ১৮৪৪ সালের গবেষণার ফলে কয়লা গ্যাস হইতে "বেন্জিন" তৈয়ারীর পথ আবিষ্কৃত হইল।

ইহার পরে "ক্যারো" জার্ম্মানীতে ফিরিয়া আসিয়া "বার্লিনে

এনিলিন ও সোডা ফেরিক" প্রতিষ্ঠানে "এন্থ্রাকুইনোন" (anthraquinone) সম্পর্কে কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। একদিন তিনি "অক্সালিক এসিড" (oxalic acid) এবং গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric Acid) একত্রে ফুটাইতেছিলেন। নানারকম কাজের ভিতরে ও অন্যমনস্কতায় পূর্ব্বোক্ত কাজ ভুলে ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে বেয়ারা হইলে ফিরিয়া আসিয়া অবহেলাভরে ঘুমাচ্ছাদিত দেখিতে পাইলেন এবং যে পোর্সিলেন পাত্রে মিশ্রণটী ফুটাইতেছিলেন তাহার তলায় কয়েকটী পোলাপী রেখা দেখিতে পাইলেন। এই পরীক্ষার ফলে উৎসাহিত হইয়া লাইবারম্যানের সহযোগিতায় 'এলিজারীণ' তৈয়ারীর সহজপন্থা আবিষ্কৃত হয়। ঠিক একই সময়ে ইংলণ্ডে পার্কিন সাহেব এই বিষয়ে কাজ করিতেছিলেন এবং তাঁহার পেটেণ্ট মাত্র "কারোর" একদিন পূর্ব্বে সম্পাদিত হয়। মাত্র এক-দিনের জন্য "কারো" প্রথম হওয়ার গৌরব হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু "কারো"র এই দুই আবিষ্কার তৈল রসায়নের ব্যবসায়ের কত গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই তাহা অবগত।

'স্যাকারিণ' আবিষ্কারের কাহিনীও কম অভিনব নহে। এখানে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ভাগ্য দুই প্রবল।

রাসায়নিক গবেষণাগারে বিজ্ঞানী তাঁহার কাজে আত্মভোলা হইয়া যাইতেন। আহারে আসিতে অনেক দেরী হওয়ায় স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে সোজা খাওয়ার ঘরে হাজির হইলেন, আহারে বসিয়া যে আহার্য্যেই হাত দেন তাহাই অত্যন্ত মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ; বৈজ্ঞানিক বিরক্তির সহিত খাবার ফেলিয়া উঠিতে যাইবেন,সহধর্ম্মিণী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার পাত্রে একখণ্ড রুটী স্বামীর মুখে পুরিয়া দিলে সমস্যা পরিষ্কার হইল। সকল খাদ্যই দুষ্টিষ্ট হইয়াছে বৈজ্ঞানিকের হস্তস্পর্শে। বৈজ্ঞানিক পুনরায় নিজ পাত্রের শুষ্ক খাদ্য আস্বাদ করিয়া তীব্র মিষ্টতে খাবার ফেলিয়া গবেষণা গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে ধৌত কাচের পাত্রের জল বিশ্লেষণপূর্ব্বক তীব্র মিষ্টত্ব অনুভব করিয়া সেইদিনকার গবেষণা পুনরায় পূর্ব্বানুবৃত্তি করিলেন। এবারের ফলাফলে তাঁহার মন খুসির হইল। তিনি "স্যাকারিণ" নামক ইক্ষু চিনির ৫০০ গুণ মিষ্ট রসায়ন চিনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

রং প্রস্তুত করিতে এখন 'এনিলিন' তেল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। আলকাতরা পাতন (distillations) করিবার সময় তেলের গাঢ়তর তেলের নামই 'এনিলিন'। রং প্রস্তুতকারকদের প্রথমে ঐ তেল হইতে 'ক্যাপিক আনহাইড্রাইড' নামক এক মধ্যবর্ত্তী উপাদান তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। ১৮৯৬ সালে জার্ম্মানীর 'বাডিশে' কোম্পানী উক্ত মধ্যবর্ত্তী উপাদান তৈয়ার করিতে গিয়া আংশিক সাফল্য লাভ করে। কিন্তু বিস্ময় কাঁচামাল নষ্ট হইয়া উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ছিল বেহাৎ কম, আর এইজন্য খাওয়া ছিল আগুন, 'বাডিশে' কোম্পানীর রাসায়নিক "হেন্স ক্যাপার" এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি গন্ধক দ্রাবকের সহিত 'ক্যাপথলিন' উত্তপ্ত করিতেছিলেন এবং তাপ দেখিবার জন্য কাচের সাধারণ পারদ নির্ম্মিত তাপমান ব্যবহার করিতে-ছিলেন ; হঠাৎ তাঁহার হাত হইতে তাপমান পড়িয়া যায় এবং কাচ ভাঙ্গিয়া উত্তপ্ত দ্রাবকের ভিতরে পারদ পড়িয়া যায়। পরিশ্রান্ত 'হেন্স ক্যাপার' দুঃখিত হইয়াছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু দেখিতে গিয়া দুঃখ তাঁহার কোথা পরিণত হইল। যে তাপমানে তাঁহার কল্পনার বিরাজিত ছিল তাহা এত সহজে বিশ্লেষ হওয়ায় "ইউরেকা, ইউরেকা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সমস্ত 'ক্যাপথলিন' "ক্যাপথলিন অ্যানহাইড্রাইডে" পরিণত হইয়াছে। দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমে যাহা হয় নাই, পারদের "ঘটকালীতে" "ক্যাপথলিনের" সেই রূপান্তর হইয়াছে।

প্রচুর না হইলেও আমাদের দেশেও উদাহরণের অভাব নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পারদঘটিত আবিষ্কারের মধ্যেও এইরূপ ঘটনা ছিল বলিয়া জানা যায়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জীবনকাহিনী আরও অদ্ভুত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁহার জীবনধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে লইয়া যায়। উদ্ভিদাহার "গ্যালেনা" (Galena)র আকর্ষণ ও বিকর্ষণশক্তি দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মানুষ এবং অন্যান্য জীবকুলের ন্যায় জড়পদার্থ এমন কি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। বেতারবার্ত্তার প্রথম উদ্ভাবক হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্রুতিনীপ্রতিভা উদ্ভিদের মর্ম্মবাণী ও তত্ত্ব-নির্ণয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ঔষধ ও ভেষজবিজ্ঞানেও হঠাৎ এইরূপ ঘটনায় মানবের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে এবং প্রতিদিন হইতেছে। 'এস্পিরিন' 'সালফানা' 'আইড,' "সালভার্সন ৬০৬" প্রভৃতি ঔষধের পশ্চাতে কত মনীষীর অনুসন্ধিৎসা ও প্রাণপাত পরিশ্রম রহিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, 'সালভার্সন ৬০৬' এই নামেই ইহার পরিচয়। ৬০৬বার চেষ্টার পরে এই ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিদ্যা ও জ্ঞান, ধৈর্য্য ও লোকসেবা এই চতুর্ব্বর্গের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতিরেকে এই সকল ঔষধ মরণীয় আলো দেখিতে পাইত কিনা সন্দেহ। উদাহরণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সভ্যতার গতিপথে মানুষ যেমন নিত্য উন্নতির পথে, ব্যাধিও তাহার তেমনই বাড়িয়া যাইতেছে, প্রতিষেধক সাথে সাথে আবিষ্কৃত হইতেছে। মানুষের দেহ যেন এক প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র। "অ্যাকসিন," "সিরম" প্রভৃতি তাহার আয়ুধ।

বিজ্ঞানীর কৌশল ও জ্ঞানের উদাহরণ দিতে গিয়া ক্লেমিংএর অবদান না বলিয়া শেষ করা যায় না। মানবশ্রেষ্ঠিক ক্লেমিং সেণ্টমেরী হাসপাতালে মানবদেহে চর্ম্মরোগ ও ফোঁড়া কেন হয় এবং কেমন করিয়া তাহা নিবারণ করা যায় সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, একটী ফোঁড়া হইতে কিছু পূঁজ লইয়া 'ক্লেমিং' একটী কাচের পাত্রের উপর রাখিয়া দিলেন। জীবাণুদের পুষ্টির জন্য "আগারের" জেলীর উপরে উহা বিস্তৃত রহিল। জীবাণুরা সংখ্যায় বাড়িতে লাগিল। ক্লেমিং মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়্‌তি কেমন হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি দেখিলেন—পাত্রের নানাস্থানে জীবাণুদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে কিন্তু একস্থানে সবুজবর্ণের ছত্রকের মতন দেখিতে পাইলেন। কয়েকদিন পরে দেখিলেন সবুজ ছত্রকের চারিধারের জীবাণু নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। 'ক্লেমিং

চিন্তিত পড়িলেন, কোন ঘরলা কিম্বা বায়ুর দূষিত পদার্থ ঢোকে নাই ত? গবেষণা ফেলিয়া না দিয়া তিনি আরও পরীক্ষা চালাইতে থাকিলেন, দেখিলেন ছত্রক বৃদ্ধির সহিত পারিপার্শ্বিক বীজাণু ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। তাঁহার ধারণা হইল—ছত্রক হইতে হয়তো কোন জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে যাহার সংস্পর্শে আসিয়া বীজাণুগুলি ধ্বংস হইয়া চলিতেছে। পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চলিতে থাকিল, 'ফ্লেমিং' নূতন আলোকে দেখিতে পাইলেন। দেখা গেল এই ছত্রক সকল বীজাণু নষ্ট করে না কিন্তু কয়েক প্রকার বিশেষতঃ কফাদেরজাতীয় বীজাণু ধ্বংস করে।

তার পরের কাহিনী, দীর্ঘদিন ধরিয়া এই ছত্রক নির্গত পদার্থকে বিশুদ্ধ আকারে পাওয়ার চেষ্টা। 'ফ্লেমিং' ঐ লব্ধ পদার্থের নামকরণ করিলেন "পেনিসিলিন", ঐ নামকরণের কারণ ছত্রক "পেনিসিলিয়ম্ নটেটম" শ্রেণীর বলিয়া। ১৯২৮ সালে সেপ্টেম্বরী ছাসপাতালে মানুষের অচিন্তনীয় পরমমিত্র এই যুগান্তকারী আবিষ্কার সংসাধিত হইল। অর্থাভাবে বহুদিন আর ইহার খোঁজ পড়ে নাই; তারপরে গত মহাযুদ্ধে আমেরিকার অর্থে পেনিসেলিন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া যুদ্ধের বিভীষিকায় যাহারা চিরদিনের মতন পঙ্গু, খঞ্জ, হইয়া থাকিত, মেনিনজাইটিস ও নিউমোনিয়ার বিষেশে, বিষ্ণুরে প্রাণ হারাইত তাহারা বাঁচিয়া গেল, যুদ্ধের সহিত জড়িত বহুবিধ অকল্যাণ ও সামাজিক ব্যাধিতে যাহাদের অকেজো হইবার সম্ভাবনা ছিল, পেনিসিলিন তাহাদের পক্ষে অব্যর্থ ধন্বন্তরী হইল। 'ফ্লেমিং'এর পথ অনুসরণ করিয়া আমরা যক্ষ্মারোগের মহৌষধ, জীবাণু ধ্বংসকারী ষ্ট্রেপ্টো ম্যাসিডিন, পলিপরিণ প্রভৃতি ঔষধ পাইয়াছি। শেষোক্ত ঔষধ আমাদেরই ডাঃ সহায়রাম বসুর গবেষণার ফল। পচা কাঠও বাঁশের ছত্রক হইতে তিনি 'পলিপরিণ' তৈয়ারী করিয়াছেন। পলিপরিণ পেনিসিলিনের চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ পাকযন্ত্রীয় রসের ক্রিয়া না থাকায় ফোঁড়াফুড়ি দরকার হয় না, খেলেই খাওয়া চলে। গুণেরও নষ্ট হয় না। কিন্তু প্রচুর টাকার অভাবে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন না হওয়ায় এই ঔষধ এখনও সাধারণে প্রচলিত হয় নাই।

পৃথিবী আজ আগাইয়া চলিয়াছে। উত্থান ও পতনের মধ্যেও লীলাময় তাঁহার রথের বল্গা সবল হস্তে ধরিয়া রহিয়াছেন। মানুষ মানুষকে হত্যা করিবার জন্য বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই একদল আপনভোলা পাগল বিজ্ঞানকেই মানুষের চিরদিনের সঙ্গী করিয়া সকল বিপন্ন আপদকে সবলহস্তে দূরীভূত করিতেছে। ধ্বংস ও সৃষ্টি প্রাকৃতিক খেয়ালে একসাথেই পাশাপাশি চলিয়াছে, আক্রমণের তীব্রতার সহিত জ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। এই যুদ্ধে বিরাম নাই, সন্ধি নাই, এক হাতে 'এটম' বোমা, অপর হাতে মানবিক বুদ্ধির বরাভয় মূর্ত্তি। ধীরে অথচ সবল পদক্ষেপে সভ্যতার রাজরথ আপন শক্তিতেই রাজপথে প্রগতির করিয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞান আজ মানুষের জীবন যাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। সেতু যত বিস্তৃত হইবার সাথে সাথে ঘাটে, মাঠে ও পথে বৈজ্ঞানিক লোক যাত্রার সহিত গবেষণাগারের সতীর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হউক।

রাত্রি

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

শিয়রের কাছে লণ্ঠনের উস্কানো আলোটাতে মোটা ডায়েরী-খানা পড়ছে রাত্রি—তার নিজের ডায়েরী।···"আমাদের দেশের লোকগুলো কেন এত মূর্খ? শুধু কয়েকটী টাকার জন্য, নয়তো একখাপ উঁচু আসনের জন্য কেন ওদের মনের মধ্যে এমন অযথা বৃত্তি দানা বাঁধে—যার প্ররোচনায় ভাই ভাইকে ধরিয়ে দেয়, একদেশবাসী হয়ে দেশবাসীর জীবনের সাধনাকে ভেঙে চুরমার করে দেয় কয়েদখানার ভেতর ঠেলে দিয়ে লোহার শিকে আঘাত করাতে কয়াতে!"

রাত্রির মনের মধ্যে শুধু এই চিন্তাই বারে বারে এসে তাকেও তার বিদ্রোহী স্বামীর পদরেখা অনুসরণ করতে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রাত্রির দুঃখ হয়—দেশের বিশেষ কাজে নিযুক্ত লোকগুলোর জন্য। ভগবান কেন ওদের সুমতি ফিরিয়ে দিচ্ছে না!

কালো, নিকষ ঘন-কালো রেশমের মত কোমল চুলগুলো বেণীতে বন্দী হ'য়ে রাত্রির পিঠের উপর সাপের মত খেলে বেড়াত। সে রাত্রি এখন আর নেই, সে রাত্রির হ'য়েছে মৃত্যু—কাঞ্চনের নামে ওয়ারেণ্ট বের হবার সাথে সাথে। স্বামী যার নিরুদ্দেশ—তার আবার কিসের সাজ পোষাক, তার আবার কিসের চুলে চিরুণী দেওয়া?—

চুলগুলো তার হ'য়েছে সন্ন্যাসিনীর মত বড় বড় জটার ঘটনা পাকানো। স্বামী নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে এক একটী বছর যেন ওর শরীরের ওপর দিয়ে যুগের ঝড় বইয়ে চলে গেছে—মৃত্যু যেন ওকে ছোঁয় ছোঁয়!

তথাপি এই শুভ্র মনে,দুঃখের আঘাতে চৌচির-করা মন নিয়ে সে তার লক্ষ্য পথ ছেড়ে একটুও অন্যপথে চলছে না।

কাঞ্চনের সাথে যখন রাত্রির বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়, ওদের আত্মীয়স্বজনের অনেকেই আপত্তি জানিয়েছিল —বিপ্লবী নেতা কাঞ্চনের হাতে রাত্রিকে তুলে দিতে। কিন্তু রাত্রি তখন নিজের লজ্জাকে দূরে রেখে নিজের ইচ্ছে যাকে বিনীতভাবে জানালো—"জীবন যদি একঘেয়ে হয় সে জীবন জীবনই নয়। আমাদের সমাজ যেন হ'য়ে গেছে একটা বদ্ধ পুকুরের দামিল—না আসছে জোয়ার, না যাচ্ছে ভাটা—তাই করা আবিলতা দূর হ'য়ে। সবাই কেরাণীর স্ত্রী : ন'টার সময় রান্না করে স্বামীকে আপিসে পাঠিয়ে দিয়ে আবার পাঁচটার আশায় হাঁ করে ঘড়িকে বিরক্ত করা কিছুতেই আমার ভাল লাগবে না। আমি চাই নূতনের সন্ধান, আমি চাই নূতন! বিগত দিনের বাস্তবাদিক জীবন যাপনের চেয়ে না হয় অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকেই ছুটে চলে দেখি—আমার ভাগ্যে কি আছে, ভবিষ্যতের বুক চিরে দেখি নূতন কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা? ভবিষ্যতের পথে আমাদের চুরার তো রুদ্ধ নয়?···

কাঞ্চনের নামে যেদিন ওয়ারেণ্ট বের হবার সংবাদ দশদিকে ছড়িয়ে পড়ল, এই দুঃসংবাদের নির্মম চাপে রাত্রি পূর্ণটার পূর্ব্বেই তার জঠর অন্ধকারের সন্তান অলককে পৃথিবীতে প্রথম আলোবাতাস দেখালো। ছেলের মুখ দেখে যে সংসারে একটানা আনন্দের ঢেউ খেলে যাবে সেখানে দেখা দিল বিষাদ। আনন্দ করে কে?

অলক বড় হ'য়েছে, সমস্ত কথাই গুছিয়ে বলতে পারে; বোঝে। পাড়ার ছেলেদের সাথে বাড়ীর সংলগ্ন মাঠে খেলতে যায় সে।

খেলতে খেলতে খেলা রেখে একদিন অলক বাড়ীতে ছুটে এসে ডাকে—"মা, মা?"

—কি রে খোকা, কি হ'য়েছে? অমন করে ছুটে এলি যে?

—একজন ভদ্রলোক মাঠে এসে আমায় জিজ্ঞেস করেছে, আমার বাবার নাম কি? আমার বাবা কি করেন? বাবা কোথায় থাকেন—এই সব?

—তুই তাঁকে কি বলি?

—আমি তো কিছুই জানিনে, তা বলবো কি?

—বল গিয়ে···তোর বাবার নাম তো তোকে বলে দিতে হবে না?

—না।

—আচ্ছা। তিনি একজন বিপ্লবী নেতা। আজ এগার বৎসর এগার মাস কয়েকদিন হ'ল তিনি নিরুদ্দেশ। সরকার তার বিরুদ্ধে সমন বের করেছেন—মেয়াদ তার ১২ বৎসর। তিনি কোথায় আছেন আমাদের জানা নেই।

ঠিক এই কথাগুলো—পিতার এতটা পরিচয় রাত্রি কোনদিনই তার নাবালক ছেলে অলকের কানে দেয় নি, অথচ শিক্ষা-দীক্ষায় ছেলেকে পিতার আদর্শে গড়ে তোলবার জন্য যে প্রয়াস তাতে এতটুকু শিথিলতা নেই।

গত কয়েক বছরের মধ্যে কাঞ্চনের সম্বন্ধে কত রকমারী খবর রাত্রির কানে এসেছে—যা' এসেছে নিশ্চয়ই তার চেয়েও অনেক বেশী রাত্রির কাছে গোপন রাখা হ'য়েছে। কোনটা জাহাজ ডুবিতে কাঞ্চনের মৃত্যু, কোনটায় রেলক্রাশ, কোনটায় পুলিশের গুলিতে নিহত ইত্যাদি। এ সমস্তই রাত্রি অবিশ্বাস করেছে। অবশ্য সংবাদটী শোনা মাত্র প্রথম প্রথম তার কেমন একটু লেগেছে একথা রাত্রি তার মহাভারতের মত মোটা ডায়েরীতে স্বীকার করেছে; কিন্তু তার স্বামী শেষ পর্য্যন্ত তার কাছে ফিরে আসবেই—অলককে না দেখে কিছুতেই তাঁর মৃত্যু হ'তে পারে না, এ দৃঢ় মনের বল তার সেই ক্ষণিকের মূর্চ্ছনাকে সজ্ঞেয় করে দিয়েছে—মনকে তার রাঙিয়ে দিয়েছে।

অলক মাঠ থেকে বাড়ী ফিরে এসেছে হাসিমুখে। মাঠের সেই ভদ্রলোক তাকে আদর করে কোলের কাছে নিয়ে বলেছে—"বাঃ উপযুক্ত বাপের ছেলে তুমি। বাপের মতই উপযুক্ত হওয়া চাই। আজ যেমন তুমি এই খেলার মাঠের Captain, ভবিষ্যতে তোমাকে এই সারা দেশের Captain হ'তে হবে মনে থাকে যেন।"

অন্যদিন ঠিক রাত ১০টায় অলককে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি তার বিগত ব্যথাতুর দিনের নীরব সাক্ষী ডায়েরীখানা খুলে

পড়তে থাকে—রোজকার ডায়েরী লেখে। কিন্তু আজ আর অলকের চোখে ঘুম নেবে আসছে না। শুধু এলোমেলো প্রশ্নে অলক রাত্রিকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলে—যে প্রশ্ন কোনদিনই সে করে নি। অলক প্রশ্ন করে, "বিপ্লবী কাকে বলে? সমন কি? সরকার কে?" রাত্রি আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়, হ'য়ে যায় আনন্দে আত্মহারা। যেরূপ বীজ বপন করবার জন্য রাত্রি অলকের দেহমনকে, চিত্তকোরককে একান্তভাবে তৈরারী করছিল, আজ অলকই নিজের থেকে রাত্রিকে সেই প্রশ্ন করায় রাত্রির ব্যথিত বুকখানিতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল, মুখে তার ফুটে উঠলো এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ—কৃতকার্য্যতার আনন্দে! কাঞ্চন ফিরে আসবেই, তাঁর কোলে অলককে তুলে দিতে এতটুকু লজ্জা থাকবে না তার, বরং বলতে পারবে তোমারই ছেলে।

রাত্রি বিনিয়ে বিনিয়ে অলকের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে। রাত তখন প্রায় ১২টা বেজে গেছে। রাত্রির চোখেও তখন তন্দ্রা।

হঠাৎ দরজার কড়া চকল হ'য়ে উঠলো।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই—"কে কে" বলে উঠল রাত্রির বৃদ্ধ শ্বশুর। পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে রাত ১২টার কড়া-নাড়ায় শব্দ বিশেষ ভয়ের লক্ষণ। বৃদ্ধ ভয় পেয়েছেন।

রাত্রির ঘুম ছিল সাংঘাতিক। এমনটা ঠিক যে ওর বরাবরই অভ্যেস ছিল তা' নয়। কাঞ্চনের নামে ওয়ারেণ্ট বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রির চোখে আর তেমন গাঢ় ঘুম ছিল না। কি জানি কখন, কোন রাতে এসে কাঞ্চন ফিরে যায়……।

পাশের ঘরে শায়িতা রাত্রি বলে উঠলো—"ও কিছু নয়, বাতাস নয়তো বেড়াল, আপনি ঘুমোন।"

কিন্তু সন্দিগ্ধ মন রাত্রির, বাতাস বা বিড়াল তার বৃদ্ধ শ্বশুরের মনকে বোঝানোর জন্য—তার নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য নয়। এক যুগ হ'তে চলেছে—রাত্রে যে কোন শব্দে রাত্রির কাণ জেগে ওঠে, কার পদক্ষেপের জন্য তার লোভাতুর শ্রবণ পিপাসার্ত্ত হ'য়ে আছে—ক্ষণিকের অলসতায় সে পথিক এসে দাঁড়িয়ে থেকে বাতাসের চোখেও না পড়ে এই তার ভয়।

রাত্রি চট্ করে উঠে বসল বিছানার উপর—ঘুমানো খোকাকে কোলের কাছ থেকে ঘুরে সরিয়ে রেখে। চুপি চুপি আলো জেলে দরজা খুলেই রাত্রি দেখে বড় বড় জটা মাথায় নিয়ে গেরুয়া-বসন-পরা একজন মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

রাত্রির শুষ্ক শ্বশুর ম'শায় কিছু টের পান। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, "কে আপনি?"

—ভয় নেই রাত্রি, আমি কাঞ্চন।

—তুমি!

পা' থেকে মাথা পর্য্যন্ত তড়িৎগতিতে দেখতে লাগল রাত্রি। আগের চেহারার সঙ্গে কাঞ্চনের এখনকার চেহারার কোথাও সাদৃশ্য আছে কি না?

কাঞ্চন হেসে উঠল। তুমি আমাকে চিন্‌তে পারছো না রাত্রি? যার পেছনে এত দীর্ঘ দিন সরকারের সমন হাওয়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ নাগাল পায়নি, তার চেহারাকে তুমি আগের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাও? এতদিন দেশের অনেক কাজ করেছি সমনের অন্তরালে থেকে, আজও আছি—এখনও আছি, কাল সকালে আর থাকবো না—যদি নাকি সরকার আবার দয়াকরে আমার উপর কৃপা দৃষ্টি না দেন।

অনির্ব্বচনীয় আনন্দে রাত্রির চিত্ত ভরপুর হ'য়ে উঠল। যার অদর্শনে ও অসাহচর্য্যে ২৭ বৎসর বয়সে রাত্রির যৌবন অস্তাচলগামী হ'য়েছিল তারই অপ্রত্যাশিত আগমনে রাত্রির অন্তরে যেন নূতন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল, নূতন করে যেন বসন্ত ফিরে এলো—রাত্রিকে তার হৃত যৌবন ফিরিয়ে দিতে। অদর্শনে ও দর্শনে একি পার্থক্য! রাত্রির ইচ্ছে হ'ল ক্ষণিকের জন্য ছুটে গিয়ে আয়নার নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখে আসে—দেখে আসে, সত্যিই তার বিগত ব্যথাতুর দিনের সাক্ষীরূপে যে কয়েকখানি হার তার বুকের পিঞ্জরের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সত্যি সত্যিই তাদের উপর মাংসপেশী উঠেছে কিনা?

তোমাকে কিছু খেতে দি? কতদূর থেকে না জানি তুমি এসেছ, কত পথচলার ক্লান্তিতে নিশ্চয়ই তোমার ক্ষিধে আছে?

এখন আর খাব কি? রাত আর কতটুকুই বা আছে? তার চেয়ে এসো চুপি চুপি গল্প করি। আমার এই পলাতক জীবনের গল্প নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগবে। জীবনে তুমি বৈচিত্র্য চেয়েছিলে—কত বিচিত্র সে

কাহিনী, আবার তোমাকে সোনার ঘরে মনে মনে মালা গেঁথে রেখেছি।

যাত্রা জীবনই আমার লাগ্‌ছে ভাল। এই তো জীবনের আলো ছায়া। লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী দম্পতির মত নিরিবিলি ভাবে জীবনতরী বেয়ে পরপারের ঘাটে পৌঁছানো—এ সাধারণ জীবন কি ভাল? আমি চাই আমাদের জীবন-তরণীকে মহাসমুদ্রে তার উর্ম্মিমালার ঘাত-প্রতিঘাতে সর্ব্বদাই হোহুল্যমান রাখতে। যাক্‌গে এখন সে কথা—আমি ভাব্‌ছি কালকে সূর্য্য ওঠার সাথে সাথে তোমায় উপর থেকে সমনখানি নেবে যাবে সেই কথা। ক'টা বাজে?—একটা মিনিট যেন কত বড় বলে মনে হয়।

ঘড়ি ঠিকই চল্‌ছে রাত্রি। ওটা একটা যন্ত্র, লোহার তৈয়ারী। মানুষের কোমল মন বুঝবার ওর অবসর নেই, মন নেই।

—আমার এখন কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?

—কি?

—ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে পূব আকাশের কোল হ'তে টেনে তুলি সূর্য্যদেবকে—অনুরোধ জানাই তাঁকে একটু সকাল সকাল পূব আকাশে তাঁর লাল মুখ নিয়ে দেখা দিতে।

রবীন্দ্রনাথের বনানী-প্রীতি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলার যে অসংখ্য মাধুরী কবির চিত্তে আনন্দের লহর তুলতো, তার মধ্যে ছিল ফাগুনে আমের বনের পাগল-করা ঘ্রাণ, অঘ্রাণের ভরা ক্ষেতের মধুর হাসি, নদীর কূলে কূলে বটের মূলের বিছানো আঁচল। সবকালের সকল দেশের কবির প্রাণে তরুলতা, ফুল, পাতা আর তাদের বিচ্ছুরিত বর্ণের লীলা-হিল্লোল আনন্দের লহর তোলে। রবীন্দ্রনাথ পসারিণীকে দেখেছিলেন হাট, ঘাট, ঘর, বাট, মুখর দিনের কলকথা সব ভুলে গাছের ছায়াতলে বস্‌তে। তার গাছের ঝরানো কড়ি, ডালার পড়ে রহিল। তার ভাবনা কোথায়বেয়ে চল্‌লো?

অন্য কবি হ'লে হয়তো পসারিণীর সে বিলাস-বিস্রাসের আনন্দ-পরশে মাত্র তুষ্ট হ'তেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পসারিণীর মনের গভীরে ডুব দিলেন। অকূল-রতন পাবার তরে রূপ-সাগরে ডুব দেওয়া তাঁর অভ্যাস। কবি বুঝলেন পসারিণীর প্রাণে

অনন্তের বাণী আনে
সর্ব্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের শুষ্ক ব্যাকুলতা।

নিরক্ষর গ্রাম্য নারী সকল স্বরিত আহ্বান, কালের অগ্রগতি ও কর্ম্মের আভাস ভুলে, কেন গাছতলায় আনমনে বসেছিল? যখন

শস্যহীনতার স্বরে
খর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে
শূন্যতায় উঠে দীর্ঘশ্বাস।

কবি বুঝেছিলেন, এই অসাধারণ আচরণের ইঙ্গিত। বুঝেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্ব-কবি। তিনি জানতেন, বিশ্বের কোনো ব্যাপার, কোনো পদার্থ, কোনো প্রাণ সারা বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন নয়। সকল রূপ, সকল বর্ণ, সকল গন্ধ, সব ছন্দ, একজোটে মিলে অসীমকে সীমাবদ্ধ করেছে। বিশ্বের সকল অংশ অচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। তাদের চরম চেতনার সাড়া মেলে মানুষের মনে। তার স্মৃতির ভাণ্ডারে লুকানো আছে সে বার্ত্তা। কবি তাকে খুঁজে পায়। সাধারণ নরনারীর চেতনায় অজ্ঞাত, অস্পষ্ট ছন্দে সে আদিম কথা জাগে। বিশ্ব-বীণা বাণীখানি হাতে লয়ে, নিভৃত রাতে গভীর রাগিণী বাজিয়ে যায়। চিত্তের ঘুম ভাঙে না, তাই সে বাজনার স্পষ্ট সঙ্কেত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু তবু অতীতের স্মৃতির স্পন্দন অনুভূত হয় আনমনার প্রাণে। পসারিণীর সংসার ভোলার ইহাই ছিল কারণ। তাই কবি বুঝেছিলেন—

সৃষ্টির প্রথম স্মৃতি মোতে
সহসা আদিম স্পন্দ সঞ্চরিল তোর রক্ত স্রোতে
তাই এ তরুতে তৃণে
প্রাণ আপনারে চিনে
হেমন্তের মধ্যাহ্নের বেলা,—
মৃত্তিকার খেলা ঘরে
কত যুগ-যুগান্তরে
কিরণে হরিতে তোর খেলা।

অন্য দেশের কবির কল্পনা গাছপালায় প্রাণ-সঞ্চার করেছে। সে সঞ্চার রূপক। রবীন্দ্রনাথ তাদের মাঝে প্রাণ দেখেছেন—যে প্রাণ অভিব্যক্ত হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে মানবতায়। জীবনের প্রথম যুগে যাত্রা একত্র আরম্ভ করেছিল জীবজন্তু গাছপালা এমন কি মানুষ। তখন তারা কেহ আজকের রূপ পায়নি।

১৯২৬ সালে ভিয়েনা হ'তে কবি এক পত্রে তাঁর বনবাণী-প্রীতির নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের মুক্তিতত্ত্বের বাণীর সঙ্গে সঙ্গে কবির কল্পনায় বোধিদ্রুমের বাণী যেন মিশে আছে। "আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেকঃ। শুনেছিলেন—'যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং প্রাণ এজতিনিঃসৃতং'। তাঁরা গাছে গাছে চির যুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন—'কেনঃ প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'—প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরণা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা।"

প্রাণ-সৃষ্টির রহস্য, তার আবর্ত্তন, অভিব্যক্তি, স্ফুরণ এবং নব নব রূপে উন্মেষণ সকল চিন্তকে চিন্তার অবকাশ দেয়। "পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-বিদ্ পরীক্ষা এবং অনুশীলনের ফলে সিদ্ধান্ত করেছে যে আদি-প্রাণ এক-কোষ বৃক্ষ-রূপেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হ'য়েছিল। তারপর অভিব্যক্তি এবং অগ্র-গতির কল্যাণে এই আদি-প্রাণেরই একশাখা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বট প্রভৃতি মহীরুহ রূপে আজ বিদ্যমান। এই আদি-তরু হ'তে আদি-জন্তু অভিব্যক্ত। সেই শাখার চরম পরিণতি মানুষ জীব। বৃক্ষ ও জান্তব প্রাণের মোটামুটি পার্থক্য এই যে—বৃক্ষ নিজের প্রাণ-ধারণ ও পরিপুষ্টির জন্য তথা-কথিত জড় প্রকৃতি হ'তে উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। এর দেহে অয়জান, কারজান প্রত্যক্ষ প্রশ্লিষ্ট হয়, জলজান, অঙ্গার মিশে উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। তাতে তার পরিপুষ্টি। অন্তর প্রতিপালন হয় কোনো বৃক্ষ কিম্বা বৃক্ষ-ভোজী জন্তু-ভোজনে। মোট কথা বৃক্ষ এবং জন্তু সৃষ্টির আদিতে একত্র যাত্রা সুরু করেছিল।

কবি বিজ্ঞানের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। আরণ্যক ঋষিকেও সেই প্রথম প্রাণ প্রৈতির নবনবোন্মেষণ-শালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহ অভিভূত করেছিল। তিনি—কেন চিন্তার উপকরণ পেয়েছিলেন সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে এবং সৃষ্টি-রহস্যে—অরণ্যানীর গভীরে ধ্যানে মনের গভীরে চিরন্তন প্রশ্নের-উত্তর পেয়েছিলেন—রসো বৈ সঃ। সেই ভীতি-সঙ্কুল নির্জ্জনতার মাঝেই বুঝেছিলেন—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনঃ। কারণ সর্ব্বমঋষিরম্ ব্রহ্মঃ।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গভীর চিত্ত তাঁর কাছে সদাই আনন্দের বাণী গুঞ্জরিত। তাঁর কাছে "ঐ গাছগুলা বিশ্ব বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একটানা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি, তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে শান্তম শিবম অদ্বৈতম।" এই উক্তিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য বোঝবার দু'টা সূত্র পাওয়া যায়—তাঁর বিশ্ব-প্রেমের অন্তর্ভূক্ত কেন বৃক্ষ-প্রীতি ও বিশ্ব-প্রেম এবং বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি কেন তাঁর নয়। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লভিবার সাধনা তাঁর। ভগবানের আনন্দ বিরাজে বৃক্ষে গন্ধে গানে।

বন্ধু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রিয় কর-কমলে বন-বাণী উৎসর্গ করতে কবি বলেছেন—

"মূক-জীবনের যে-ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃ-বক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত বাহু শাখা,
পত্রে-পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকা-বাঁকা
জন্ম মরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষর-রূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।"

বিলাতী কবিদের মধ্যে টেনিসন তাঁর জীবিতকাল অবধি আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সত্যকে ছন্দে গেঁথে পাঠকদের

উপহার দিয়েছেন। ডাফোডিল নারির নৃত্য ওয়ার্ডস-ও-য়ার্থের প্রাণে নির্জনতায় আনন্দের চমক বিচ্ছুরণ করেছিল। ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞান-গ্রন্থ লিখেছিলেন পদ্যে। সমস্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্র পদ্যে লেখা। বিজ্ঞানের পুস্তক রোগের নিদান ছন্দে বর্ণিত। অস্ত্রোপচারের এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা গদ্যে লিখিত নয়। এ সবের মধ্যে কিছু কবিতা বলে না' বোঝায়—চিত্তের উদাত্ত বাণী—তা' নাই। কেবল ছন্দ আছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে বনের বাণী শুনিয়েছেন, দার্শনিক হিসাবে বিশ্বকে সংশ্লিষ্টভাবে বোঝবার পক্ষে সে বাণীর কী মূল্য, তা' উপলব্ধি করেছেন, অথচ তরু-লতা বা গ্রহ-নক্ষত্রের রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কথা উপেক্ষা ক'রে, মূঢ় ভূমির পরিবর্তে কল্পনার আশ্রয় নেননি। এ শ্রেণীর কোনো কবিতা বিশ্লেষণ করলে সে কথা বোঝা যাবে। অথচ সমস্ত কবিতাটি পাঠ করলে, যে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য অজ্ঞাত তাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার গোলক ধাঁধাঁর পড়ে পথ খুঁজতে হবে না। সত্যকে কল্পনা ভাবলেও তার মনোহারিত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না। সে পাঠককে নিজের উদারতায় উচ্চ ভূমিতে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর শব্দের ঐন্দ্রজালিক রবীন্দ্রনাথ, ভাষায় ও ছন্দে বুঝিয়ে দেবে মাতৃ-ভাষার মাধুরী।

বকুল বৃক্ষ-বন্দনা। কজনের মনে সন্দেহ হবে যে এমন মধুর চিত্র, এত ললিত বর্ণনা, এর মন-ভোলানো ছন্দ বস্তুতন্ত্রতার-ভিত্তিতে রচিত। খণ্ড খণ্ড করে দেখলে মনে হবে—এ কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থে স্থান পেলে অসমীচীন বা অশোভন হবেনা। তার সঙ্গে জড়ানো যে আবেগ, সে সরল ও সহজ। উৎকট অবাস্তব কবি-কল্পনা নয়। কবি দার্শনিক। গাছের জীবনতত্ত্ব আলোচনা ক'রে মনের মধ্যে দেখেছেন আবেগের উৎস। সে উৎস মুখ হতে সু-ললিত শব্দ-ঝরণার উচ্ছ্বসিত মাধুরী বিকীর্ণ করেছেন বাংলার গৌরবময় সাহিত্যে।

জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলে, জ্যোতির আকর সূর্য্যের আবর্ত্তমান অগ্নিময় বাষ্পদেহ একদা অন্য এক বৃহৎ তারকার আকর্ষণের প্রভাবের মধ্যে এসেছিল। রবি দেহের সামান্য অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাযোমে ঘুরেছিল। তাপ-কলেবরের সে বাষ্পময় ছিন্ন অংশ আবর্ত্তন ও আকর্ষণের ফলে আবার খণ্ড খণ্ড হয়। এক এক খণ্ড জমাট বেঁধে এক একটি গ্রানেট সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী তেমনি একটি গ্রানেট।

আমাদের ধরিত্রীর পৃথক জীবনযাত্রা ঐ জ্যোতিঃ-স্বর্গ-সূর্য্যের দেহ ছেড়ে। সে তখন ছিল ম্লান ধূসর বরণে আবর্ত্তিত-ব্যোম-বিহারিণী। ক্রমে আধুনিকরূপ ধারণ করেছে—উপরের আবরণ জল এবং মৃঢ় ভূমি, অন্তরে সূর্য্যের সেই অগ্নিময় জ্যোতি। সে অগ্নি ফুটন্ত ধাতু ও পৃথিবীর দেহোপকরণের বিভিন্ন অণু পরমাণু। প্রাণের প্রথম বিকাশ জলে। তার পর ভূমি-বন্দীশালা হ'তে মুক্ত হ'য়ে বৃক্ষের আবির্ভাব। সূর্য্যের কিরণই তরুর প্রাণ-শক্তির উপাদান। বৃক্ষই রবির সহায়তায় আকাশে জল বিলায়। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার চক্র জগতের ধারা।

পৃথিবীর জন্ম-বৃত্তান্ত কবি, বৃক্ষ-বন্দনায় অতি সংক্ষেপে বলেছেন। ধরিত্রী—

—দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিলো জ্যোতিঃ-স্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে—
পাংশুস্নান গৈরিক-বসন-পরা।

সেই ভূমি-গর্ভে বৃক্ষ, অগ্নি-প্রাণ, প্রাণের প্রথম জাগরণে সূর্য্যের আহ্বান শুনেছিল। জাগরণ—সৃষ্টি নয়। এখানে কবি নিজের প্রাচীন কৃষ্টি সমর্থন করেছেন, কারণ যাকে মেটিরিয়ালিষ্ট জড়বাদী জড় বলে, হিন্দু তাকেও বলে সুপ্ত-চেতন।

প্রাণের উপাধি যেমন সুখ, তেমনি বেদনা। তারা জগতে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে। তাই সেদিন সূর্য্যের আহ্বানে বৃক্ষ—

উর্দ্ধশিরে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

সত্যই তো সেদিন পৃথিবী ছিল ছন্দোহীন, মাত্র মরু। প্রাণই উপলব্ধি করে বেদনা। তাই উদ্ভিদ্-রূপ প্রাণের আবির্ভাবে জগতের হ'ল বেদনার অভিযান।

শব্দের আধার যে ব্যোম, সে ব্যোমে বায়ুর হিল্লোল গাছের পাতার মাঝে খেলেই তো মর্ম্মরিয়া ওঠে, শুঞ্জরিয়া ওঠে। ঋতুর উৎসব তো বনে। নটরাজের ছয় রাগ যে ছয় ঋতু ঘিরে। গ্রীষ্মে প্রকৃতি—

জীর্ণ পর্ণ শয্যাপরে একা রহে জাগি,—
কঠিনের শুষ্ক প্রাণে কোমলের পরশন মাগি।

"নটরাজে" কবি ফুটিয়ে তুলেছেন বহুর খেলা, আর তার হর্ষের তরঙ্গ। আনন্দও সৃষ্টির চির-সাথী। তাই এই বহু-রঙ্গশালে সকল দিনেই কবি আনন্দ উপভোগ করেছেন।

সূর্য্য-রশ্মিপায়ী বৃক্ষ দিনের পর দিন তাপ্ত-কিরণের সাহচর্য্যে প্রাণের পুষ্টি-উপাদান আহরণ করছে। সূর্য্যের আলোকে পাতার সবুজ কোষ জলের পরমাণুদের বিশ্লিষ্ট করে। মুক্ত জলযান অঙ্গারের সঙ্গে মিশে উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। ঐ পদার্থ তরু শরীরের প্রধান উপাদান।

সূর্য্যের বক্ষে জ্বলে যহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধ রূপ।

সেই তেজ মানবের প্রতিপালক।

যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
ক'রেছ জগৎজয়ী ; দিলে তারে পরম সম্মান,
হ'য়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্দ্ধী।

তাই শেষে কবি বলেছেন—

অর্পিলাম তোমায় প্রণাম।

এ ক্ষুদ্র নিবন্ধের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের বহুবিকশিত মৌলিক প্রতিভার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। রবীন্দ্র সাহিত্যের যত গভীরে ডুব দেওয়া যায়, তত বেশী রত্ন আহরণ করা সম্ভব। মাত্র দ্রুত পাঠ করলে রবীন্দ্রের ছন্দ এবং ভাষার ইন্দ্রজাল, চেতনাকে তুষ্ট করে। কিন্তু রচনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করলে প্রজ্ঞা প্রফুল্ল হয়। সকল দিক থেকে সব কথার অবতারণা অসম্ভব। তাই কবির উদ্ভিদ্-প্রীতির মূল হেতুর মাত্র উল্লেখ করছি।

তিনি দেবদারু কবিতায় অতি-সরস উচ্ছ্বাস প্রকট করেছেন। বলেছি পৃথিবীর পাষাণ এবং সাগর তথা রস ও হলাহল সূর্য্যের দান। কারণ তার দেহের এক টুকরা এই ধরণী। এর পালনও রবির নিত্য-কর্ম্ম। গিরি-শৃঙ্গের দেবদারুকে তাই কবি বলেছেন—

তপোঘন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।

তাই হিমালয়,

উর্দ্ধ হ'তে পেয়েছিল রূপ—
উর্দ্ধ পানে অর্ঘ্যরূপে শোষ করি দিল একদিন।

"আম্র-বন" কবির প্রাণে উদাত্ত-স্বর উঠিয়েছিল। আম্রবনের সঙ্গে নিমেষে নিমেষে যখন শিশিরবরাজি সচকিত চিকনিয়া কাঁপে, তখন—

"আমিও তো আপনার কল্পনায় সাজি
অন্তরীন আনন্দ আবেশে
অমনি নূতন।

কবির প্রাণেও, অদৃষ্টের নিঃশ্বসিত ধ্বনি দোলা দেয়। সে পুষ্প শোভা কবির চিত্তে বিকশিত হয় নূতন চেতনে, কেবল বাণীর ভূষায়, সুরের গাঁথনীতে, গীত ঝঙ্কারের আবরণে।

"বন-বাণী"তে কবির তরু-লতার প্রীতি রূপায়িত হয়েছে।

একদা হঠাৎ কবির চক্ষে এক কুরচি গাছ পড়েছিল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত। কিন্তু এমন তরুকে কোনো কবি তো কবিতার আসরে পাংক্তেয় করেনি। তাই তাকে আদর ক'রে কবি লিখেছেন—

তুমি আভিজাত্যহীন,
নামের গৌরব হারা ; শ্বেতভুজা ভারতীর বীণা
তোমারে করেনি অভ্যর্থনা অলঙ্কার-ঝঙ্কারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা স্থান অবারিত।

ভারতীর বর-পুত্রের তাই অবারিত চেতনায় অবজ্ঞাত কুরচি স্থান পেয়েছে। বেদের মেয়ে স্বর্গ হতে চুরি-করে-আনা কুরচীকে কুটীরের কানাচে লুকিয়ে রেখেছে, পণ্যের কর্কশ-ধ্বনি কটুনামের আবরণে। কিন্তু তাতে তার শুচিতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ—

সূর্য্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুরচি প'ড়েছো ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।

এ কবিতার মধুর রস, বাংলার গাছ পালার নাম-করণে অন্তর্নিহিত স্নেহ, আর এর প্রচ্ছন্ন প্রফুল্লতা, উৎফুল্ল করে পাঠকের মন। বাঙলার গাছ-পালা জন্তু ও পাখী এমন কি পুত্র-কন্যার ডাক নাম আমাকে মর্ম্মাহত করে। কুরচির অবহেলা কবির অমনোনীত হবে, সে বেশী কথা নয়।

কবির বন্ধু পিয়ার্সন সাহেব একটি বিলাতী লতা রোপণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে তাঁর বাসার

অঞ্জনে। সে লতা যখন ফুল হয়লে, কবি তার নাম দিলেন নীলমণিলতা। সেই নবীনের সঙ্গ কবির প্রাণে যে একটী ভাবের লহর তুলেছিল—মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান ও দর্শনে তার মূল্য প্রচুর। এ কবিতার মাধুরীও প্রচুর।

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সঙ্কীর্ণ সঙ্কোচে
ঔদাস্যের ধূলা ওড়ে। আঁখির বিস্ময় রস ঘোচে।

সে অবস্থায় নবীনের কথায়, ঔদাস্যের ধূলায় অপসরণ হয়, মন আবার কার্য্যকরী হয়। অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সঙ্কীর্ণতা বিলুপ্ত হয়।

নারিকেলের অন্তরে সে আশ্বাস রাত্রিদিন চলেছে
"প্রাণ-তীর্থে চলো, মৃত্যু করু জয়, ভ্রান্তি ক্লান্তিহীন।"

কবি সে বাণী শুনেছিলেন।

'বন-বাণী'র কবিতাগুলিতে আমরা এমনি সব সুর শুনি।

প্রাচীন কবিরা নায়িকা এবং ফুলের মধ্যে বহু আলাপ আলোচনা শুনেছেন। সে ভাষণে নানা সুকুমার সূক্ষ্ম আবেগ উচ্ছ্বসিত। নারীর অপেক্ষার পল্লবচ্ছায়ায় এক পুষ্প ছিল। নারীর নিশ্বাসে তার অন্তর জেগে উঠেছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই জাগা অন্তরের মুখরতা লিপিবদ্ধ করেছেন "পুষ্প" কবিতায়।

আদিম প্রভাতে, প্রথম আলোকে নারী ও পুষ্প এক ছন্দে বাঁধা দু'টি রাগা পরেছিল হাতে। তার পর তারা দু'জনে দু'পথে যাত্রা করলে। অভিব্যক্তিবাদের সে কথা পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। সৃষ্টির ধারা রক্ষা হয়েছে ফুলের এবং নারীর মনের এক সুরে। কিন্তু নারীত্বের অভিব্যক্তির সঙ্গে চিত্তের বিকাশ হয়েছে। বিকশিত চিত্তে যে সব সুন্দর ও রুদ্রভাব জেগেছে, ফুল মাত্র তাদের একটির উৎকর্ষ দেখেছে। কারণ সেও সৃষ্টির সহায়ক, সে সুন্দর। ফুল নারীকে বলেছে—

বুঝিলাম আমি আজো আছি
প্রথমের সেই কাছাকাছি,
তুমি পেলে চরমের বাণী।

সেই চরমের বাণী কি? ফুল তা' বুঝেছিল।

আজ সখি বুঝিলাম আমি,
সুন্দর আমাতে আছে থামি
তোমাতে সে হোলো ভালবাসা।

বলা বাহুল্য, এর অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানের বাণী, দার্শনিক অনুভূতি এবং কবিতা একত্র মিলে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে, বিশ্ব-সাহিত্যে তা বিরল।

এখানে একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গ্রীক সাহিত্যের এক শ্রেণীর কবিতাকে ডাইডাকটিক বলা হ'ত। কথাটার ইংরাজি সাহিত্যে প্রচার আছে। ডাইডাকটিক কবিতা কোন বিষয় শিক্ষার জন্য রচিত হত। গ্রীক ডিদস্‌কিন মানে শিক্ষা। চরক বা শুশ্রুত সংহিতা অথবা আর্য্য ভট্টের জ্যোতিষ গ্রন্থকে সে শ্রেণীতে ফেলা যায়। অনেকের মতে মিলটনের প্যারাডাইস্ লষ্ট বা গেটের ফাউষ্ট সেই শ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। কারণ গাছ বা ফুলের আদিম বিকাশ বা পরিণতির তিনি আভাষ দিয়েছেন নিজের কবিতার ভিত্তি বস্তুতান্ত্রিক করবার জন্য। সে সত্য তাঁর মনে যে ভাবের লহর তুলেছে, তা গীতি-কবিতা। বৃক্ষ-বন্দনা, পুষ্প বা নীলমণিলতার উদ্দেশ্য নয় উদ্ভিদতত্ত্ব শেখানো। তাদের প্রাণের বিভিন্ন বিকাশ, কবি-প্রাণে বহু উচ্চ-ভাবের লহর তুলেছে, তাঁর বীণার ঝঙ্কারে কবি আমাদের শুনিয়েছেন সে বাণী।

আর এক কথা মনে হয়, যে রবীন্দ্রনাথ যা কিছু রচেছেন তা দেশের মালমসলা নিয়ে। সুর উপরে উঠে নব নব বর্ণ ধারণ করেছে। কিন্তু যত জীব-জন্তু, বটপদ, পক্ষী, গাছ-পালা, নর-নারী, নিয়ে ব্যাসাত করেছেন, তারা নিতান্ত আমাদের আপনার। আপনার জনের বাহিরের রূপ আপাতঃদর্শন সৌন্দর্য্য তাঁকে উদাস্তের পথে উঠতে বাধা দেয়নি। যে সাধারণ সে মরমে প্রবেশ করে সত্য। তাই বিজ্ঞান বা দর্শন সাধারণকে পদ্যে বোঝাতে গেলে ডাই-ডাকটিক হয়, কাব্য-রস তার উবে যায়। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ, পৃথিবীর গাছ-পালা তৃণ ও শস্য লুণ্ঠনের রূপক ভাবলে বুদ্ধি প্রসন্ন হয়, চিত্ত কাঁদে না। কবিতার কাজ মন কাঁদানো, জাগানো, স্পন্দিত করা। পৃথিবীর উদ্ভিদরূপ বস্ত্র আমরা যত টানি, সে বিবসনা হয় না। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের এ ব্যাখ্যা শুনে বলতে হয়—বেশ বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যা! কিন্তু বস্ত্র হরণের কথার সরল অর্থ নিয়ে, তার মধ্যে মহিমার নিগ্রহ এবং লজ্জাশীলতার হানি দেখলে মর্ম্মবেদনা অনিবার্য্য। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে কল্পনা এবং

উচ্ছ্বাসের উদাহরণ দিয়েছি, তা থেকে বোঝা নিশ্চয় সহজ যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের দৃষ্টান্তে সাহিত্যের আদর্শ-গণ্ডীর তিনি বাহিরে যাননি। উৎকট কল্পনা তাঁর অপ্রিয়।

তাঁর আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করব, বাঙলা জাতীয়-সাহিত্য সম্বন্ধে।

"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্ব্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে—তাহা বিশেষরূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জন-সাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তিগম্য, সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্ন-সাহিত্য এবং উচ্চ-সাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুলফল পাছশালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদের কাছে তাদের সাযুজ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রীতির শিকড়ও তাঁর পবিত্র, নির্ম্মলসূর্য্য-করোজ্জ্বল-ধারিণী, সোনার বাংলার সঙ্গে জড়িত। তার অগ্রভাগ আকাশের যে আলোর দিকে ছুটেছে, জ্ঞানের যে শুভ্র দীপ্ত জ্যোতির তিনি নিজেই আবাহন করেছেন, তাঁর জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা ভারতের ঋষিদের মন্ত্রে—আবিরাবীর্ম এধিঃ।

উপহারে অনুপম

অনুরাধা দেবী প্রণীত

কপোত-কপোতী

কপোত-কপোতীর মত যারা বেঁধেছে ভালবাসার বাসা, তাদেরই নিরালাক্ষণের নিভৃত আলাপন এবং দ্বিধাহীন সঙ্কোচহীন নিবিড় প্রেমের অকপট স্বীকারোক্তি। প্রিয়া ও বান্ধবীর হাতে দিবার শ্রেষ্ঠ উপহার। দাম—২৲

সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত

কুল-লক্ষ্মী বালিকাগণ কিরূপে শিক্ষিতা হইলে নিজগুণে হিন্দু-শ্বশুরঘরে সকলকে সুখী করিতে পারিবে, তাহাই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। ত্রিবর্ণ চিত্রশোভিত।

দাম—দুই টাকা

নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত

মেঘদূত

নিখিল-বিরহী-জন চিরার প্রতি অসীম সমবেদনা নিয়ে অমর কবি কালিদাস তাঁর অনুপম কাব্য "মেঘদূত"-এর শ্লোকে শ্লোকে বিরহের যে অভিনব স্বর্গলোক সৃষ্টি ক'রে গেছেন, ইহা সেই অক্ষয় "মেঘদূত"-কাব্যের সুললিত বাংলায় স্বচ্ছন্দ কাব্যানুবাদ। নয়ন-মুগ্ধকর চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত নব-প্রকাশিত মনোরম দশম সংস্করণ। দাম—৬৲

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-সম্পাদিত

মহাকবি কালিদাসের অনুসরণে সিদ্ধ কবির কাব্য-সাহিত্য সাধনার অনবদ্য নিদর্শন। ৪৲ **কুমার-সম্ভব**

রজনীকান্ত সেন প্রণীত

বাণী কাল কবির অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রতীক এই বই দুইখানির প্রতি পৃষ্ঠা দামী রঙীন আর্ট পেপারে দুই রঙের উত্তম কালীতে উন্নত পরিকল্পনায় ছাপা। সমুদ্রিত প্রচ্ছদপট। **কল্যাণী**

প্রতি বইখানির দাম দুই টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

জগতের দুইটি বিবদমান শিবিরে সীমান্ত সংহত করার আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজন সম্প্রতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে এশিয়ার পশ্চিম সীমান্তের বিকটে গ্রীসে এবং পূর্ব সীমান্তের পার্শ্বে মাঞ্চুরিয়ায়। গ্রীস ও চীন—দুইটি দেশেই আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট আধা ফাসিস্তরা প্রতিষ্ঠিত; দুইটি দেশেই তাহারা গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করিবার অভিযান গ্রহণ করিয়াছে। জগতের গণতান্ত্রিক শিবির এখন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া প্রতিক্রিয়া শক্তির সহিত যুদ্ধের সম্মুখে প্রস্তুত হইতে চায়। তাই, গ্রীসে পাল্টা গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা; মাঞ্চুরিয়ার কমুনিষ্ট প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবল প্রচেষ্টা।

গ্রীসে পাল্টা গভর্নমেন্ট

গত বৎসর ডিসেম্বর গ্রীসের জেনারেল মার্কসের নেতৃত্বে উত্তর গ্রীসে পাল্টা গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীসের সম্মিলিত প্রতিরোধ দল "ইয়েমে" সাধারণ সম্পাদক, এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং কমুনিষ্ট দলের নেতা এই গভর্নমেন্টে যোগ দিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গ্রীসে কমুনিষ্ট দলের সভ্য-সংখ্যা ৯ লক্ষ; গ্রীসের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৭০ লক্ষ।

গ্রীসের রাজতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট এখন সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার প্রভাবাধীন। ১৯৪৪ সালের শেষভাগে জার্মানীর কবলমুক্ত হইবার পর গ্রীস কিছু কাল বৃটিশ প্রভুত্বাধীন ছিল। গত মার্চ মাসে গ্রীসে মার্কিন প্রভুত্ব কায়েম হইয়াছে। এখনকার অর্থনৈতিক বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, এমন কি শাসন বিভাগেও কর্তৃত্ব করিবার জন্য "উপদেষ্টা" নাম দিয়া একজন মার্কিন কর্মচারী বসানো হইয়াছে। গ্রীসের প্রধান বন্দর পিরাস, ম্যালোকিয়া এবং ডোলস-মার্কিন নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে; সমগ্র গ্রীসে মার্কিন বিমান ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে। গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী মঃ ভ্যাসিলিয়াস জার্মানীর গুপ্তচর ছিলেন বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি আছে; গ্রীসের দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মঃ ডোরাসোর বিরুদ্ধে অভিযোগ—প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় তিনি নাৎসীদের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিতেন।

আমেরিকার সাহায্যে সালোনিকার গভর্নমেন্ট গ্রীসে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য বর্বরোচিত অত্যাচার চালাইতেছেন; এমন কি আন্দোলনকারীদের ছিন্নমুণ্ড লইয়া রাস্তায় রাস্তায় প্যারেডও করা হইয়াছে। তবুও আন্দোলন দমিত হয় নাই; এই আন্দোলনকারীরা এখন উত্তর গ্রীসে পাল্টা গভর্নমেন্ট স্থাপন করিল। আমেরিকার সোভিয়েট-বিরোধী শিবিরের যে সীমান্ত গ্রীস পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংহত করিবার জন্যই এই আয়োজন। বলা বাহুল্য, অবস্থার আরও অবনতি হইলেই যুগোস্লেভিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি এই পাল্টা গভর্নমেন্টকে স্বীকার করিয়া লইবে। আমেরিকার নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াপন্থী শিবির এবং সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শিবিরে চূড়ান্ত সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে।

চীনে কমুনিষ্ট তৎপরতা

মাঞ্চুরিয়ার কমুনিষ্টদের সামরিক তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার পুরাতন রাজধানী মুকডেন এখন বিপন্ন। মার্শাল চিয়াং কাই-শেক স্বয়ং এই অঞ্চলে সৈন্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও কমুনিষ্টদের প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হইতেছে না। চীনে সামরিক অবস্থা সরকার পক্ষের বিশেষ প্রতিকূল হইলে সে সংবাদ প্রায়ই গোপন করা হয়। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার বর্তমান সামরিক অবস্থা গোপন রাখা হইতেছে না; কমুনিষ্টদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের কথা প্রকাশ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃপা ভিক্ষা করা হইতেছে।

মাঞ্চুরিয়া জাপানের অধিকারভুক্ত থাকিবার সময় এই অঞ্চলে প্রবলভাবে গড়িয়া উঠে। গত মহাযুদ্ধে মাঞ্চুরিয়াই ছিল এশিয়াখণ্ডে জাপানী অস্ত্রাগার। সমগ্র মাঞ্চুরিয়ার কমুনিষ্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে কমুনিষ্ট একেবারে শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসন রাষ্ট্র হইবার উপযুক্ত হইবে। মার্কিন ট্রাবেদার চিয়াং ও তাঁহার সহকর্মীদের হাতে চীনের অবশিষ্টাংশ ছাড়িয়া দিয়া সমগ্র উত্তর চীন ব্যাপিয়া প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারিবে। ভবিষ্যৎ সোভিয়েট-মার্কিন সামরিক দ্বন্দ্বে চীনের দুইটি রাষ্ট্র দুইটি শিবিরে যাইবে। মাঞ্চুরিয়ার কমুনিষ্টদের বর্তমান তৎপরতার গতি এইদিকে।

ব্যর্থ লণ্ডন সম্মিলন

গত ১৮শে নভেম্বর লণ্ডনে প্রথম ৪টি শক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলন আরম্ভ হয়; ১৫ই ডিসেম্বর এই সম্মেলন অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। সম্মেলনে জার্মানী সম্পর্কে প্রবল মতবিরোধ দেখা যায়। গত মার্চ-এপ্রিল মাসে মস্কোয় সুদীর্ঘ তেত্রিশ দিন কাল আলোচনা করিয়াও পররাষ্ট্র সচিবরা জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তখন হইতে এই সঙ্কল্প লণ্ডনে পরবর্তী সম্মেলন হইবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। এবার লণ্ডনে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সম্মেলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ৪টি শক্তির মধ্যে মীমাংসার আশা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

লণ্ডন বৈঠক ফলপ্রসূ না হইবার আর এক স্থান—পশ্চিম জার্মানীর শিল্পজাত উৎপাদন হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে ক্ষতি পূরণ দিতে আপত্তি। এই প্রসঙ্গ লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন প্রচার-যন্ত্রগুলি ঘুরাইতে চেষ্টা করিতেছে

যে, রণ-বিজয়ী জার্মানীর রক্ত শুষিয়া সোভিয়েট রুশিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে চায়। ১৯৪৫ সালে পোট্‌সড্যাম্ সম্মেলনে স্থির হয় যে, জার্মানীর সমরশক্তি চূর্ণ করা হইবে, নাৎসী প্রভাব হইতে জার্মান জাতিকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করা হইবে এবং জার্মানীর সমর-শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বন্ধ করিয়া তাহার শান্তিকালীন অর্থনীতি উন্নত করিবার চেষ্টা হইবে। ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে পোট্‌সড্যামে স্থির হয় যে, নাৎসী নেতাদের আক্রমণাত্মক নীতি সমর্থন করিবার দায়িত্ব জার্মান জাতিকে কতক পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে; ক্ষতিগ্রস্ত জাতিগুলির আংশিক ক্ষতিপূরণের জন্য সে তাহার উৎপাদনের কতকাংশ প্রদান করিবে। এই পোট্‌সড্যামেই স্থির হয় যে, জার্মানীর দ্বারা সোভিয়েট রুশিয়ার যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার এক-দশমাংশ জার্মানী পূরণ করিবে; এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এক হাজার কোটী ডলার।

পূর্ব্ব জার্মানীতে সোভিয়েট রুশিয়া পোট্‌সড্যাম্ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াছে। সেখানে নাৎসীদের সহযোগী জমিদারদের সম্পত্তি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, নাৎসীদের সমর্থক ধনিকদের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, সমরোপকরণের কারখানা ভাঙ্গিয়া দিয়া শান্তিকালীন অর্থনীতি উন্নত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রুশিয়া তাহার অনুসৃত নীতির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, জার্মানীকে রক্তশূন্য না করিয়াও তাহার উৎপাদন হইতে ক্ষতিপূরণ লওয়া সম্ভব। এই অঞ্চলে উৎপাদনের পরিমাণ ইতিমধ্যে যুদ্ধের পূর্ব্বের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী হইয়াছে। পক্ষান্তরে, পশ্চিম জার্মানীতে নাৎসী আমলের জমিদার, একচেটিয়া ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সমর-নায়ক—সকলকে সযত্নে পোষা হইতেছে। এখানে বর্ত্তমানে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৬ সালের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ। ধনিক-দিগকে স্বাধীনভাবে পূর্ব্বের মত উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হইতেছে না; রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ রাখা হইয়াছে। ইহার কারণ জার্মানীর সুলভ পণ্যের প্রতিযোগিতা ইঙ্গ-মার্কিণ ধনিকদের পক্ষে আশঙ্কার বিষয়। আবার পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীলদের উস্কানি ঘটাইয়া জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারের ব্যবস্থাও পশ্চিম জার্মানীতে হয় নাই; কারণ জার্মান প্রতিক্রিয়াশীলদের সহযোগে পশ্চিম জার্মানীকে প্রথমতিরোধী ইঙ্গ-মার্কিণ ঘাঁটীতে পরিণত করাই উদ্দেশ্য। পোট্‌সড্যাম্ সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিয়া পশ্চিম জার্মানীর প্রায় সব অস্ত্রের কারখানা অটুট আছে। গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত পশ্চিম জার্মানীর মাত্র ৭টি অস্ত্রের কারখানা (plant) ভাঙ্গা হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব জার্মানীর ৭০০টি কারখানার মধ্যে ৩৭০টি ভাঙ্গা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন—রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর কারখানা ভাঙ্গিয়া লইবার যে অভিযোগ, সে এই অস্ত্রের কারখানা সম্পর্কেই। পোট্‌সড্যাম্ সিদ্ধান্তের অধিকারবলে ক্ষতিপূরণ বাবদ সে অস্ত্রের কারখানা ভাঙ্গিয়া লইয়াছে; কোনও শান্তিকালীন উৎপাদনযন্ত্রে সে স্পর্শ করে নাই।

ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিনিধিরা লণ্ডন সম্মেলনে জার্মানীর এতদিনের উৎপাদন হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে প্রবল আপত্তি জানান। বলা বাহুল্য, চলতি উৎপাদন বাদ দিলে অন্য কোনভাবে সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষতির এক দশমাংশ পূরণ হইবার আর উপায় নাই। কুটনৈতিক আমেরিকা সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষতিপূরণের সময় জার্মানীর দরদী সাজিয়াছে। অথচ, ইহারা নিজেদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের অনেক বেশী জার্মানীর নিকট হইতে আদায় করিয়াছে। ইহারা জার্মানীর বিরাট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে; বহু যন্ত্রপাতি নিজ নিজ দেশে চালান দিয়াছে; জার্মানীর স্বর্ণ হস্তগত করিয়াছে, জার্মান বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত পেটেন্ট বে-দখল করিয়াছে। কুটনৈতিক আমেরিকা জার্মানীর নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে, তাহার মূল্য এক হাজার কোটী ডলারের বেশী।

ফ্রান্সে শ্রমিক বিক্ষোভ

গত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সমগ্র ফ্রান্সে শ্রমিক-বিক্ষোভের প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শ্রমিক-বিক্ষোভ মিটিবার সংবাদ আসে; কি সর্ত্তে মিটিল এবং তাহার ফলে ফরাসী রাজনীতির কোনও পরিবর্ত্তন হইল কিনা, তাহা জানা যায় না।

ফ্রান্সের শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে এই ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। এই দাবীকে কেহ অসঙ্গত বলিতে পারে নাই; কারণ গত ছয় মাসে ফ্রান্সে পণ্যমূল্য শতকরা ১৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গত অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে ধর্ম্মঘট হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট। এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ফ্রান্সে জাতীয় পরিষদে অন্যান্য দল অপেক্ষা কমুনিষ্টরা সংখ্যায় বেশী। অথচ গত মে মাসে ইহারা মন্ত্রিসভা হইতে বিতাড়িত হয়; কারণ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর-মন্ত্রিসভা এই সর্ত্তে ২০ কোটী ডলার মার্কিণ ঋণ গ্রহণ করেন যে, তাঁহারা কমুনিজম্ দমন করিবেন। ইতিমধ্যে জেনারেল ডি গল্ রাজনৈতিক মঞ্চের অন্তরালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কমুনিষ্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি ফরাসী জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবেন বলিয়া বাহ্যাড়ম্বর করেন; তাঁহার অনুরক্তদের লইয়া তিনি নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করেন "ফরাসী জনসঙ্ঘ"—Rally of the French people. তিনি স্পষ্ট বলেন যে, তাঁহার ডিক্টেটারী ক্ষমতা চাই; ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদের সুপ্রতিষ্ঠা চাই। তখন, ফরাসী মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত নরমপন্থী সোশ্যালিষ্ট নেতারা ও দলের এই চরম দক্ষিণপন্থী দল এবং চরম বামপন্থী কমুনিষ্টদের হাত হইতে ফ্রান্সকে বাঁচাইবার জন্য "তৃতীয় শক্তি" সংগঠন করিবার প্রেরণা দেন। ইহার ফলে রাদাদিয়ের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং এম রামাদিয়ের দলের মঃ স্যুম্যানের নেতৃত্বে নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যুম্যান্ সোশ্যালিষ্ট-বিরোধী—পুঁজিপতি স্বৈরাচারের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁহার মন্ত্রিসভায় স্থান পায় দক্ষিণপন্থী এম্-আর-পি দলের ৯ জন, রেডিক্যাল্ সোশ্যালিষ্ট দলের ৩ জন এবং স্বতন্ত্র রক্ষণশীল ১ জন। এই মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চরম দক্ষিণ ও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে "তৃতীয় শক্তি" সংগঠিত হয় না; ফরাসী রাজনীতির গতি দক্ষিণ দিকে বেঁকিয়া যায়। জাতীয় পরিষদে কমুনিষ্টরা দল হিসাবে অন্যান্য দল অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইলেও তাহাদের পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফরাসী রাজনীতির এই প্রতিক্রিয়াত্মুখী গতি রোধ করা অসম্ভব হয়। সাম্প্রতিক মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কমুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে সোশ্যালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; আইন প্রণয়ন করিয়া নির্ব্বাচন-ব্যবস্থারও সংশোধন করিয়াছিলেন। তবুও, বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির আসনের শতকরা ৩১টি কমুনিষ্টরা অধিকার করিয়াছে। ৬ দলের দল মিউনিসিপ্যাল আসনের শতকরা ২৯টি, সোশ্যালিষ্ট দল ২১টি এবং এম্-আর-পি দল ১৫টি অধিকার করে। মিউনিসিপ্যাল্ নির্ব্বাচনে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ফরাসী জন-সাধারণ কমুনিষ্টদের প্রতি আস্থা হারায় নাই। তবুও, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফরাসী রাজনীতি প্রভাবিত করা কমুনিষ্টদের পক্ষে অসাধ্য; প্রতিক্রিয়াশীলরা সেখানে এক জোট। নিয়মতান্ত্রিক পথ এইভাবে অবরুদ্ধ হওয়ায় কমুনিষ্টরা ব্যাপক ধর্ম্মঘটের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীলদিগকে আঘাত হানিতে চেষ্টা করে। সঙ্গত অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সচেষ্ট হয়।

লোক-বিনিময় সমস্যা ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

কোন বিশেষ কারণে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধভাব যখন তীব্র হইয়া উঠে এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই বিরোধ দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, তখন এক রাষ্ট্রের সন্তানের পক্ষে আইনসঙ্গত নাগরিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও অপর রাষ্ট্রে বসবাস করিতে আতঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ অবস্থায় মুখ বাঁকিলে এই শ্রেণীর লোকের ভারাক্রান্ত হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপজনিত বিপদের কথা বাদ দিলেও দেশের আতীয়তাবাদী জনসাধারণের দ্বারা এই শ্রেণীর লোকের নিগৃহীত হইবার আশঙ্কাও কম নয়। পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতি না ঘটিলে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু দুই রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থগত বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিলে মৌলিক অধিবাসী ও এই শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে সংঘাত সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। কোন কোন সময় ধর্মমতের ঐক্যও শ্রেণী বিশেষের সৃষ্টি করিয়া সেই শ্রেণীকে রাষ্ট্রবিশেষের মৌলিক প্রজারূপে প্রতিষ্ঠা দেয়।

এইরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে বিবদমান রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে লোক বিনিময় হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহারা অবশেষে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়, অনেক সময় এই 'অবশেষ' সম্পর্কে তাহাদের স্পষ্ট কোন ধারণা থাকে না। ধর্মমতের ঐক্যের জন্য শ্রেণীবিশেষের পূর্ণ প্রজাসত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে-তো কথাই নাই, দীর্ঘকাল, এমন কি জন্মাবধি বিদেশ কোন রাষ্ট্রে বসবাস করিয়া যাহারা জন্মভূমিকেই মাতৃভূমি হিসাবে অন্তরে স্থান দিয়াছে, রাষ্ট্রগত শোষণের চাপে তাহারা একান্ত নিরুপায় ও দিশাহারা হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের ধারণা বিসর্জন দিয়া এই হতভাগ্যের মত অপরিচিত বা বিস্মৃতপ্রায় 'অবশেষ' অভিমুখে যাত্রা করে। ইতিহাসে এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে লোকবিনিময় হইয়াছে, তবে প্রায় সকলক্ষেত্রেই আতঙ্কিত জনসাধারণ নিজেদের বাসিন্দে বাসভূমির পরিবর্তন করিয়াছে, তাহাদিগকে অবশেষে প্রত্যাবর্তনের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিলেও তাহা তাহাদের পূর্বসম্মতির পূর্ণ দাবির গ্রহণ করে নাই। এইভাবে লোকবিনিময়ে রাষ্ট্রের পূর্ণদাবির গ্রহণের প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এই সময় অনুষ্ঠিত এক চুক্তির (Lausanne Convention of 1923) ফলে গ্রীসের সমস্ত মুসলমান নাগরিক তুরস্কে চলিয়া যায় এবং গ্রীসের গোঁড়া (orthodox) ধর্মমতের সমর্থক খ্রীষ্টানগণ তুরস্কের নাগরিক অধিকার পরিত্যাগ করিয়া গ্রীসে চলিয়া আসে। এইভাবে যাহারা তুরস্ক হইতে গ্রীসে চলিয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা গ্রীসের স্থায়ী জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কম নয়।

ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে বিভক্ত হওয়ায় এই দুই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সম্প্রীতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে লোকবিনিময় সুরু হইয়াছে। বিভক্ত পাঞ্জাবেই সমস্যা সবচেয়ে জটিল হইয়া উঠিয়াছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত হইয়া পূর্বপাঞ্জাব হইতে মুসলমানেরা এবং পশ্চিমপাঞ্জাব হইতে হিন্দু ও শিখেরা দলে দলে পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পলায়ন করিয়াছে। যাযাবর এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পলায়নপর মনোভাবের ফলে অবস্থা এত বিষ্ফোরণ হইয়া উঠে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনঃসংযোগ না করিয়া পারেন না এবং উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনে পশ্চিমপাঞ্জাব হইতে অমুসলমান অপসারণ এবং পূর্বপাঞ্জাব হইতে মুসলমান অপসারণ উভয় গভর্নমেন্টের নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতির বিষ্ফোরণ হতাশ হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকেও গত অক্টোবর মাসের প্রথমে অনুতপ্তের এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলিতে হয় যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রজাকে ভারতসীমানার মধ্যে সরাইয়া আনার এবং পূর্বপাঞ্জাবের যত বেশী সম্ভব মুসলমানকে পাকিস্তানে প্রেরণ করার মধ্যে ভারতের স্বার্থ নিহিত আছে। আমাদের প্রাপ্ত হিসাব দেখিয়া মনে হয়, যাযাবর আরম্ভ হইবার পর হইতে গত ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমপাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান হইতে প্রায় ৪২ লক্ষ অমুসলমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসিয়াছে, পূর্বপাঞ্জাব, দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রায় ৪০ লক্ষ মুসলমান চলিয়া গিয়াছে পাকিস্তানে। এ ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার যে সব হিন্দু ও মুসলমান আতঙ্কিত হইয়া নিজবাড়িতে বাসভূমির পরিবর্তন করিয়াছে তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। বিহার, কাশ্মীর, হায়দারাবাদ প্রভৃতি হইতেও কিছু কিছু মুসলমান এবং অমুসলমান আতঙ্কিত হইয়া বাস্তুত্যাগ করিয়াছে।

রাষ্ট্র যে ক্ষেত্রে লোকবিনিময়ের দায়িত্বগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে শরণার্থী (Refugee) সমস্যা সমাধানের সব ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করিতে হইবে। যে ক্ষেত্রে লোকেরা নিজদায়িত্বে বাসভূমির পরিবর্তন করে, সেক্ষেত্রেও আশ্রিতদের জীবিকা-সংস্থানের উপায় নির্ধারণে রাষ্ট্রের

নৈতিক দায়িত্ব অপরিসীম। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইসব দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রকে বহু নির্ধারিত কর্তব্যে অবহেলা করিতে হয় এবং আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করিতে হয় অপরিমাণে। পাঞ্জাব-সমস্যা যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথসমূহের সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক হইতে যাহারা আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে গ্রীসে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনর্বসতির জন্য গ্রীস-সরকারকে এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিতে হয়। যাহারা গ্রীস হইতে তুরস্কে চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ও স্থির-সম্পত্তি শরণার্থীদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং উপরিউক্ত ব্যবস্থার হিসাবে এইসব সম্পত্তির মূল্য ধরা হয় নাই। গ্রীসের জনসংখ্যা কম, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উচ্চ, গ্রীসসরকারের অর্থবাহুল্যও কম নয়, এছাড়া সমরমত চুক্তি হওয়ায় অনেকে কিছু কিছু অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিল, তবু শরণার্থী সমস্যা সমগ্র গ্রীসের, বিশেষ করিয়া গ্রামের সমগ্র অর্থনীতিতে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং সরকারী অর্থব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। এই হিসাবে ভারতের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শরণার্থী সমস্যা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদিগকেই নিদারুণ চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। অনেকে দাবী করিতেছেন, সাংঘাতিক সন্ত্রাসের অত্যাচারের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাহার ক্ষতিপূরণ দাবী করা হউক। বলা বাহুল্য, এই ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন করিলে আশ্রয়-প্রার্থী-সমস্যাজর্জর রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমস্যার জটিলতা একক্ষেত্রে কমিলেও অন্যক্ষেত্রে অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং বিবাদ বিসংবাদ ও মতান্তর অনিবার্য হইয়া উঠিবে বলিয়া সমস্যার সমাধান নিঃসন্দেহে কঠিনতর হইয়া উঠিবে।

শরণার্থীগণ গ্রাম ও সহর উভয় অঞ্চল হইতেই আসিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থী যে ৪২ লক্ষ লোকের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ ৩২ লক্ষ আসিয়াছে গ্রামাঞ্চল হইতে। অসহায়ভাবে এই আশ্রয়প্রার্থীরা সহরগুলিতে ও সরকারী আশ্রয়-শিবিরগুলিতে বাস করিতে বাধ্য হইলেও ইহাদের গ্রামাঞ্চলেই পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেখানেই তাহাদিগকে জীবিকাসংস্থানের সুযোগ দিতে হইবে। সহর অঞ্চল হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক অনেক আছে এবং টাকা পয়সাও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে অনেকে। ইহাদের পুনর্বসতির সমস্যা অবশ্যই গুরুতর, কিন্তু ইহাদের তুলনায় গ্রামাঞ্চল হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বপাঞ্জাব সরকার কৃষক আশ্রয়প্রার্থীদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমিতে ও পতিত জমিতে তাহাদের বসবাসের এবং টাকাকড়ি ঋণের সাহায্যে তাহাদের কৃষি সংস্থানসংগ্রহের সুযোগ দিতেছেন। পূর্ব পাঞ্জাবে পরিত্যক্ত মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমির পরিমাণ ৪০ লক্ষ একর (ইহার মধ্যে ৩৩ লক্ষ একর জমি চাষের উপযোগী।)

আশ্রয় শিবিরগুলি পরিচালনা সম্পর্কেও পূর্ব পাঞ্জাব সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি ব্যবস্থা সম্বন্ধ করিবার জন্য প্রচণ্ড তাগিদ সমস্যা সত্ত্বেও পূর্বপাঞ্জাব সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বহু পরিমাণ কৃষি সরঞ্জাম ও শস্যের বীজ আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ১৫ই আগষ্ট হইতে আগামী ৩১শে মার্চ, স্বাধীন ভারতের এই সাড়ে সাত মাসের বাজেটে মোট ১৮৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হইয়াছে, তন্মধ্যে আশ্রয়প্রার্থী (Refugee) খাতে ধরা হইয়াছে ২২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় পরিষদে বাজেট পেশকালে এই প্রসঙ্গে অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত লিয়াকৎ আলী খাঁ সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন যে, অসহায় শরণার্থীদের রক্ষার্থে আর্থিক দায়িত্বগ্রহণে ভারতসরকারের টাকার টানাটানির প্রশ্ন বড় করিয়া দেখা হইবে না।*

উপরি উক্ত ব্যবস্থা সমূহের জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করিয়াও একথা বলা যায় যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থীদের সাহায্য ও পুনর্বসতি সমস্যার জটিলতা বা গুরুত্বের হিসাবে এগুলি মোটেই যথেষ্ট নয়। ইহা দ্বারা হয়তো শরণার্থীদের সাময়িকভাবে বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের রক্ষা করিতে হইলে স্থায়ীভাবে তাহাদের জীবিকাসংস্থানের বা পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য দেশের কৃষি নীতির আমূল সংস্কারের সহিত শিল্পনীতির প্রচুর উন্নতিসাধন দরকার। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত এই প্রস্তাব পাকিস্তান সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ডাক্তার, উকিল, কৃষক, শিল্পশ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্নশ্রেণীর লোক আছে, ইহাদের পৃথক পৃথকভাবে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। ভারতের ন্যায় পশ্চাৎপদ দেশে সার্বজনীন কর্ম সংস্থান এমনিই অত্যন্ত জটিল সমস্যা, ইহার উপর শরণার্থীদের পুনর্বসতির দায়িত্ব আসিয়া পড়ায় সরকারী কর্তৃপক্ষের অসুবিধা সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতে পতিত জমির পরিমাণ এগারো কোটি একরের বেশী, ইহা দেশের মোট কর্ষিত জমির প্রায় অর্ধেক। কর্ষণযোগ্য পতিত জমিগুলিতে চাষের ও অকর্ষণীয় পতিত জমিগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া এবং যথাসম্ভব শিল্প-সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়া গভর্নমেণ্ট অল্পদিনের মধ্যে অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আনিতে পারেন বলিয়া আশা করা যায়। পূর্বপাঞ্জাব সরকার এ পর্যন্ত মাত্র ২ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পরিবারকে পুনঃসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এ ছাড়া যাহারা এখনও স্কুলে ও আশ্রয়শিবিরে দিন কাটাইতেছে সংখ্যায় তাহারা অগণ্য। পূর্ব বাঙ্গলা হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে আইনগত দায়িত্ব গ্রহণ না করিলেও সরকারের ইহাদের সম্পর্কেও নৈতিক দায়িত্ব আছে। কাজেই যথাসম্ভব দেশে কৃষি-শিল্প-পরিজ্ঞার প্রসার এবং অপেক্ষাকৃত জনবিরল দেশের রাজ্য-গুলিতে বহু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর বসবাসের ব্যবস্থা ছাড়া এই বিরাট ও জটিল সমস্যার সমাধান অসম্ভব। ভারতে কাঁচামাল, প্রাকৃতিক প্রভৃতির অভাব নাই, শক্তি সম্পদও (Power resources) এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে, সুতরাং শিল্প প্রসারের চেষ্টা চলিলে সরকারের আশু সাফল্য লাভের যথেষ্ট আশা আছে এবং এইভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত দেশের বেকার জনসাধারণেরও জীবিকা সংস্থানের অনেকটা ব্যবস্থা হইতে পারে। শরণার্থীদের কাজ দেওয়ার মত শিল্প বা কৃষি সংগঠনের মূলধন হিসাবে সরকার ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করিলেও আপত্তির কোন কারণ নাই, কারণ এদেশে এইরূপ অর্থবিনিয়োগের ফলে উপকার ও মুনাফা হিসাবে আশাতীত প্রতিদান পাওয়া যাইবে। কৃষিশিল্প সংস্কারের অনুপূরক হিসাবে ভারতে রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কাজে কিছুদিনের জন্য বহু বেকারের কর্ম সংস্থান হইতে পারে। দামোদর পরিকল্পনা, কোশী পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা প্রভৃতি বড় বড় পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার সহিত অসংখ্য লোকের জীবিকার ও আর্থিক স্বাচ্ছল্যের প্রশ্ন বিজড়িত। স্বাধীনতালাভের পর এদেশে এই ধরণের ছোট বড় নানা নূতন পরিকল্পনা রচনার ও কার্যকরী করিবার প্রয়োজনও কম নয়।

---

* Financial considerations should not stand in the way of affording relief to these unfortunate people (refugees) and in alleviating their sufferings in one of the most poignant human tragedies that could take place outside a war.

বনফুল

১৪

রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায় লোকটি ক্ষীণকায় বর্ণাকৃতি। গায়ের রং ঘোর কালো, এত কালো যে তাঁর পাকা গোঁফ ও ভুরুকে অস্বাভাবিক দেখায়, মনে হয় তুলো দিয়ে তৈরি করে' জুড়ে দেওয়া হয়েছে বুঝি। মাথায় টাক, পালিশ-করা আবলুস কাঠের মতো চকচকে। ঘাড়ের ধারে ধারে এবং কানের পাশে পাশেও অল্প-স্বল্প তুলোর সারি আছে। ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। নিজের রং কালো বলেই সাদা জিনিসের দিকে সম্ভবত বেশী ঝোঁক। পায়ের চটিটা পর্য্যন্ত সাদা চামড়ার এবং সমস্তই নিখুঁত রকম নির্ম্মল। সুরেশ্বরী দেবী যৌবনে সুন্দরী ছিলেন। এখন বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও গাল দুটি টুকটুক করছে। এখনও একটু সাজগোজ করতে ভালবাসেন।

দিগ্বিজয় সিংহরায় বরাবর মফঃস্বলেই বাস করছেন। নিজের ক্ষুদ্র জমিদারির গণ্ডী ছেড়ে কদাচিৎ বাইরে গেছেন তিনি। সেই যে বহুকাল আগে কোলকাতায় একবার ট্যাক্সি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর শহরমুখো হননি। ট্যাক্সি অবশ্য চাপা দেয় নি তাঁকে, তিনি যে পড়ে' গিয়েছিলেন তা-ও নয়। কোন রকম অঙ্গচ্যুতি বা পদচ্যুতি না ঘটলেও আর একটা অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর তেষট্টি বছরের জীবনে আর কখনও ঘটেনি। তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হয়েছিলেন।

দিগ্বিজয় সিংহরায়ের একটা সন্দেহ কিন্তু মাঝে মাঝে জাগে এবং জাগলেই আকুল হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর সন্দেহ পত্নী সুরেশ্বরীকে। সুরেশ্বরী বরাবর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে' আসছেন যে তাঁরও না কি শহরের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা। কিন্তু ওই মোটর দুর্ঘটনা হওয়ার ফলে শহরের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে মুচকুন্দ-কুসুমেশ্বরীতে এসে বসবাস করতে আসার আগে যখন তিনি কোলকাতায় ছিলেন তখনকার সুরেশ্বরীর মুখচ্ছবিটা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে দিগ্বিজয়ের মানসপটে। তখনকার সেই উদ্ভাসিত চোখমুখ, উচ্ছ্বসিত কথাবার্ত্তা থেকে অনুমান করা শক্ত যে সুরেশ্বরী সত্যিসত্যিই উচ্ছৃঙ্খল নাগরিক-জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন। দিগ্বিজয়ের সন্দেহ যে সুরেশ্বরীর বিতৃষ্ণা আসলে বোধহয় আত্মত্যাগমূলক স্বামী-ভক্তির নিদর্শন। তা' যদি হয়, তাহলে বড় ভয়ানক ব্যাপার। ছোটবড় অনেক ব্যাপারেই দিগ্বিজয়ের সন্দেহ হয় যে সুরেশ্বরীর আচরণ সব সময়ে অকৃত্রিম নয়। উদাহরণ-স্বরূপ সিমের ব্যাপারটাই ধরা যেতে পারে। সিম জিনিসটা দিগ্বিজয় দু'চক্ষে দেখতে পারেন না এবং কোনও এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বহুকাল আগে বিবাহের ঠিক অব্যবহিত পরেই কথাটা তিনি সুরেশ্বরীকে বলে' ফেলেছিলেন। ফলে, সুরেশ্বরীও সিম বর্জ্জন করলেন, শুধু তাই নয়—বলে' বেড়াতে লাগলেন কোনও তরকারিতে সামান্য একটু সিম থাকলেও তাঁর গা ঘুলিয়ে ওঠে। দশ বৎসর এইভাবে কাটল। তারপর একদিন কোনও কারণে দিগ্বিজয়কে একবার দু'দিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। ফেরবার সময় খবর দিতে পারেন নি। হঠাৎ দুপুরে বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে গেলেন। সুরেশ্বরী ভাত খেতে বসেছেন—পাতে থরে থরে সাজানো সিম-ভাতে, সিম-ভাজা, সিমের চচ্চড়ি, সিমের সুক্তো। সিম সীমা

অতিক্রম করেছে। সীমন্তিনীর এবম্বিধ ব্যবহারে 'খ' হয়ে গেলেন দিগ্বিজয়। সেইদিন থেকে সুরেশ্বরীকে আর বিশ্বাস করেন না তিনি। যে স্ত্রীলোক সামান্য একটা সিমের ব্যাপারে এতটা করতে পারে তার অসাধ্য কিছু নেই। হয়তো তার মনে কত বাসনা গোপনে মুখিত হয়ে রয়েছে, তিনি কিছুই জানতে পারছেন না, জানবার উপায় নেই মোটে। সহরের থিয়েটার, সিনেমা, পাড়া-বেড়ানো প্রভৃতি সম্বন্ধে সুরেশ্বরীর আসল মনোভাব যে কি তা কে বলতে পারে? ফলে এই হয়েছে—সুরেশ্বরী কোনও বিষয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলেই দিগ্বিজয় তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা দেখতে পান। সুতরাং সুরেশ্বরী যখন একদিন বললেন যে তিনি তাঁদের পুরোনো কম্পাস গাড়ি বাতিল করে' দিয়ে কিছুতে মোটর কিনবেন না, তখন দিগ্বিজয় বুঝলেন সুরেশ্বরী মনে মনে মোটর কেনবার জন্যে লোলুপ। নিজের আন্তরিক মোটর-বিতৃষ্ণাকে দমন করে' তাই তাঁকে প্রকাশ্যে মোটরের জন্য লালায়িত হয়ে উঠতে হল। এ ছাড়া সুরেশ্বরীর মুখ মেটাবার আর অন্য উপায় ছিল না। বহু অর্থব্যয় করে' মোটর কিনলেন একখানা। সুরেশ্বরীর চোখে জল এসে পড়েছিল। দিগ্বিজয়ের মনে হল এ আনন্দাশ্রু। কিন্তু সুরেশ্বরী বাইরে প্রকাশ করলেন রাগ। কেন, কি দরকার ছিল মোটর কেনবার? কম্পাস গাড়িই ভাল লাগে তাঁর। তাঁদের অনাবিল দাম্পত্য-কৌমুদী মেঘাবৃত হয়ে উঠেছিল ক্ষণিকের জন্য। অবশ্য তা ক্ষণিকের জন্যই এবং একবার মাত্র। তখন থেকেই এঁরা পরস্পরের নিঃস্বার্থপরতার প্রকোপ থেকে পরস্পর বাঁচবার চেষ্টা করছেন সুকৌশলে। নেপথ্যে দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব চলছে নিরন্তর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই আটত্রিশ বৎসরব্যাপী দাম্পত্য-জীবনে নিঃস্বার্থ-পরতার এই অনন্যনীয় দ্বন্দ্বে একটি দিনের জন্য মনোমালিন্য হয় নি দু'জনের মধ্যে। একটি রূঢ় কথা কেউ কাউকে বলেন নি। কোনও নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আগু মীমাংসা করা অপরিহার্য হয়ে পড়লে—যেমন কোনও দুঃস্থ প্রতিবেশী বা বন্ধুকে সাহায্য করা সম্পর্কে উপায় নির্ধারণ বা ওই জাতীয় কিছু—তখন জটিলতা না বাড়িয়ে দিগ্বিজয় সটান সুরেশ্বরীর মত সমর্থন করেন। এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু এ-ও খুব সহজে হ'ত না। সুরেশ্বরী চাইতেন দিগ্বিজয়ের কথার সার দিতে। এমন ভাব প্রকাশ করতেন যে দিগ্বিজয় যদি সুরেশ্বরীকে তাঁর মতে (দিগ্বিজয়ের মতে) সায় দিতে যেন, তাহলে সুরেশ্বরী যেন চরিতার্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু দিগ্বিজয় আত্মত্যাগের স্বর্গে অবিচলিত থেকে সুরেশ্বরীর মতটাকেই সমর্থন করতেন, সুরেশ্বরীকে শেষ পর্য্যন্ত আত্মমত-বিসর্জনের সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হত। ব্যাপারটা সহজে মিটে যেত।

বন্ধুবান্ধবদের তাঁরা খুব যে একটা নিমন্ত্রণ করতেন, তা' নয়। সুরেশ্বরী তাঁর দু'চারজন অন্তরঙ্গকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করতে পেলে খুশী হতেন, কিন্তু তাঁর সন্দেহ হত হয়তো তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা দিগ্বিজয়ের বিরক্তির কারণ হবে। তিনি এ-ও জানতেন দিগ্বিজয় কিছুতেই সে কথা স্বীকার করবেন না। নিজের মনের টুঁটি চেপে ধরে' মেরে ফেলবেন তবু স্বীকার করবেন না। দিগ্বিজয়ও শিকার-পার্টি আহ্বান করতে ইতস্তত করতেন, কারণ তাঁর ধারণা সুরেশ্বরী জীবহত্যা-ব্যাপারে কষ্ট পান মনে মনে। বলা বাহুল্য সুরেশ্বরী কখনও বলেন নি একথা। বলেন নি—তার কারণ সুরেশ্বরীর ধারণা দিগ্বিজয় শিকারে আনন্দ পান, যদিও দিগ্বিজয় তাঁকে লক্ষবার বলেছেন, শিকার টিকার মোটেই ভাল লাগে না তাঁর। উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম কণ্ঠে বলেছেন। সুরেশ্বরী বিশ্বাস করেন নি। পতি-পরায়ণা আত্মত্যাগশীলা রমণীর স্বামী হওয়া যে কি দুর্ভোগ তা' দিগ্বিজয়কে হাড়ে হাড়ে বুঝতে হয়েছে। সুখের বিষয়, দিগ্বিজয় সুরেশ্বরীকে বেশী ভালবাসেন, না সুরেশ্বরী দিগ্বিজয়কে বেশী ভালবাসেন এ প্রশ্ন একদিনও ওঠে নি। উঠলে জটিলতম সমস্যার সৃষ্টি হত।

...সেদিনকার শিকার পার্টিতে তিনজন শিকারী যোগদান করেন নি। সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুর যোগ না দেবার কারণ অজ্ঞাত থাকলেও হরুবাবুর যোগ না দেবার কারণটা জেনে ফেলেছিলেন সবাই। হরুবাবু সুরেশ্বরীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। যৌবনকালে তিনি ইন্দ্রকিলাবপুরের স্বনামধন্য বিহারী জমিদার শোখমন সিংহের অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন সেখানকার স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক হিসেবে, কিন্তু হয়ে পড়েছিলেন পারিষদ। তাঁর বক্তৃত, পায়ের গাঁটগুলি এবং ভাষা

এখনও সে অন্তরঙ্গতার পরিচয় বহন করছে। তাহার মধ্যে ঢুকেছে অদ্ভুত ধরণের বিহারী বুকনি, লিভারে প্রায়ই ব্যথা হয়, হাঁটুটা ফুলে ওঠে মাঝে মাঝে। সেদিন সকালেই তিনি সকলকে জানিয়েছিলেন বাতটা আবার 'উথড়েছে'। শিকারে যেতে পারবেন না। আসলে হয়েছিল লিভারে ব্যথা—এ কথাটা সকলকে সব সময়ে জানাতে চাইতেন না তিনি।

তিন তিনজন শিকারী অনুপস্থিত হওয়াতে 'পার্টি' জমল না মোটে। দিগ্বিজয় জমলেন না। গ্রাম থেকে আরও দুজন জোগাড় করলেন। গোবর্দ্ধনবাবু সম্বন্ধে কিন্তু খুব আশা পোষণ করতে পারছিলেন না তিনি। বড্ড বেশী গোবর-গণেশ গোছের লোকটা। ও কি শিকারে সুবিধে করতে পারবে?

সুরেশ্বরী দেবীও খাবার টাবার নিয়ে সঙ্গে যাবেন। সন্ধিশিত্তির রক্ষা করা হবে, তাছাড়া আর একটা গোপন উদ্দেশ্যও ছিল তাঁর। ওঁরা যে জঙ্গলে শিকার করতে যাচ্ছেন সেখানে মাধব গোমস্তার বাড়ি। মাধবের একটি ছেলে হয়েছে ক'দিন হল। সুরেশ্বরী ঠিক করেছিলেন ওঁরা যখন জঙ্গলাকাতে লিপ্ত থাকবেন তখন তিনি গিয়ে মাধবের ছেলেটিকে দেখে আসবেন।

যারা আসেনি তারা যে খবর না দিয়েও এসে পড়তে পারে, এ কথা মনেই হল না সুরেশ্বরীর।...

বাইরে গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দিগ্বিজয় এবং গোবর্দ্ধন গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছেন সুরেশ্বরী দেবীর জন্য। অসুস্থ ছকুবাবুর যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়। আর একবার সব নিজে তদারক করছিলেন।

ছকুবাবু লোকটিকে দেখলেই শুকনো বাসী ছোলা-ভাজা খাবারের কথা মনে পড়ে যায়। দীর্ঘ চেহারা। চোখের সাদা অংশে হলদে রঙের ছোপ। গালের হাড়-গুলি উঁচু। চোখের দৃষ্টি লুব্ধ। সমস্ত মুখে কেমন যেন একটা মার্জ্জার-ভাব। গোঁফগুলি ঈষৎ কটা এবং অনেকটা বিড়ালের গোঁফের মতই। ছকুবাবু লাঠি ধরে' ধরে' সুরেশ্বরীর পিছু পিছু দ্বার পর্য্যন্ত এলেন। শিকার-প্রসঙ্গে দিগ্বিজয়ের মুখে এতক্ষণ খুবড়ি ছুটছিল। আসন্ন শিকারের কাল্পনিক উল্লাসে নিজেকে এবং গোবর্দ্ধনকে এতক্ষণ চাঙ্গা করে' তোলবার চেষ্টা করছিলেন তিনি বক্তৃতার চোটে। হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলে' উঠলেন—"শিকার জিনিসটাই কিন্তু ভালো লাগে না আমার মোটেই।" গোবর্দ্ধন বিস্মিত হয়ে আড়চোখে চাইলেন একবার তাঁর দিকে। সুরেশ্বরী দ্বারপ্রান্তে এসে ঘাড় ফিরিয়ে ছকুবাবুকে বললেন, "বাড়ি গিয়ে আপনি খাবেন তাহলে, আমরা ঘুরে আসি। খাবার খাবেন কিন্তু, রেখে গেলুম সব"

"খাবার! না, ও বাত আর বোলো না, দোহাই মহারাজির! খেতে আর পারব না"

"না, না, চেষ্টা করবেন তবু! আপনার জন্যেই বিশেষ করে' কম মশলার তরকারি করলাম। দেখবেন একটু চেখে। তিনটে নাগাদ নিশ্চয় খিদে পেয়ে যাবে। সকালে তো খাননি তেমন কিছু"

"খিদে এখনই পেয়েছে। ডুকের কিছু অসি নেই, কিন্তু ডর লাগছে। এর পর যদি পেটের বাইও উথড়ে যায় খতম হয়ে যাব"

"না, না, কি যে বলেন—কিচ্ছু হবে না। পায়ের উপর ছট্ ব্যাগটা চাপিয়ে একটু ঘুমুন দেখি। এখানে কেউ বিরক্ত করবে না আপনাকে। লেপ দিয়ে একটু যদি ঘুমুতে পারেন ব্যথাটা কমে যাবে, ভাল লাগবে তখন"

"সেটা মুমকিন্ বটে। দেখি, কিন্তু তোমার যে মেজমানরা আসে নি, তারা হড়মুড় করে এসে অগর পৌঁছে যায়"

"তা সম্ভব নয়। এখন ট্রেণ নেই তো। এলে কালই আসত"

"হল তোমার"—দিগ্বিজয় তাগাদা দিলেন—"শিকারে যদি যেতেই হয় একটু তাড়াতাড়ি করাই ভাল"

"এই যে"

খাবারের ঝুড়ি, টিফিন-কেরিয়র প্রভৃতি সমভিব্যাহারে গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন সুরেশ্বরী।

"চল যাওয়া যাক এইবার। ছকুদা ভয় পাচ্ছেন যে ওরা যদি আবার সব এসে পড়ে কি করবেন উনি। আমার মনে হয় না কেউ আসবে। বড় জোর একটা টেলিগ্রাফ আসতে পারে। যদি আসে রেখে দেবেন, জবাব দেবার থাকে যদি কিছু জবাবও দিয়ে দেবেন যা হয় একটা—"

শিকক ছকুবাবুর ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত হল।

"টেলিগ্রাফ আবার কি? টেলিগ্রাম মীন করছ নিশ্চয়। টেলিগ্রাফ সলৎ স্লায়—"

"তাই যদি বলতে চান বলুন"—সুরেশ্বরী দেবী গাড়িতে উঠে কম্বলের বিচিত্র আংষ্টেনার মধ্যে নিজেকে স্থাপিত করে' বললেন—"আমরা মুখ্যুসুখ্যু লোক, আমরা টেলিগ্রাফই বলি। ওতে খুব বেশী দোষ হয় না বোধহয়"

"কিছু দোষ হয় না"—বলে' উঠলো দিগ্বিজয়। তিনি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছিলেন না। এই নূতন ঝামেলা সৃষ্টি করার জন্যে ছকুবাবুর দিকে একটা রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি বললেন—"আমার তো মনে হয় টেলিগ্রাফটাই বেশী শুদ্ধ। টেলিগ্রামটা হচ্ছে—ওই যে সংস্কৃতে কি বলে যেন—নামধাতু—না না—প্রক্ষিপ্ত? উহুঁ কথাটা ঠিক মনে পড়ছে না, যোগরূঢ়ও নয়—যাক গে—সোজায় এই দেখুন না আমরা খাতায় যা সই করি তার নাম অটোগ্রাফ, অটোগ্রাম নয়"

"রাম কহো, রাম কহো, রাম কহো"—খ্যাঁক খ্যাঁক করে' হেসে ফেললেন ছকুবাবু—"মহাবীরজিকি ভালা হো। আরে মশাই, টেলিগ্রাফ হল যন্ত্রটার নাম। বিশেষণরূপেও ওর ব্যবহার হতে পারে—যেমন টেলিগ্রাফ লাইন"

"মরুক গে"—ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন দিগ্বিজয়—"আমরা অভিধানও লিখছি না, পরীক্ষাও দিচ্ছি না। চিরকাল টেলিগ্রাফ করে' এসেছি, চিরকাল টেলিগ্রাফ করবও, কি বলেন গোবর্দ্ধনবাবু—অ্যাঁ?"

গোবর্দ্ধনবাবু গাড়িতে চড়বার জন্যে কসরৎ করছিলেন। দিগ্বিজয়ের ঘোড়ার গাড়িটি একটু অসাধারণ গোছের। পা-দানিটা বেশ একটু উঁচুতে। দিগ্বিজয়ের কথা শুনে নিরীহ গোবর্দ্ধন বললেন—"তা বই কি। ওসব হল কথার মার প্যাঁচ—ওতে কি আসে যায়—"

"আগে বাঁ পাটা দিন তারপর হাতলটা ধরুন। হ্যাঁ—" ছকুবাবুর পীতাভ চক্ষু দুটি ব্যগ্র তীব্র হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, "অত বাজামা না করে' 'তার' বললেই মিটে যায়। তার যদি আসে তাহলে খুলব সেটা। কিন্তু কি জবাব দিতে হবে তাতো মালুম নেই"

মুখটি ঘুরিয়ে হেসে সুরেশ্বরী বললেন—"যেতে দেন না তাহলে। আমরা এসে যা হয় করব। তোমরা সব বসেছ তো ঠিক করে'? চল আর দেরি করা নয়—উঃ শিকারের কথা ভেবে যা আনন্দ হচ্ছে"

"থাম, থাম, এক লহমা। শোন—"

ছকুবাবু গাড়ি থামালেন আবার।

"আপনার যে মেজমানদের আসবার কথা, তাদের মধ্যে যেটি বলিয়া জেলায় গিয়েছিলেন তাঁর নামটি কি"

"বলেছি তো আপনাকে। ব্রজেশ্বর—সান্ধনার স্বামী"

"ব্রজেশ্বর। আচ্ছা, আর রুকব না তোমাদের। দিগ্বিজয়—দিগ্বিজয় করে' এস তাহলে। রাম রাম"

"শিকার টিকার আসলে ভাল লাগে না আমার"—দিগ্বিজয় আর একবার বললেন সুরেশ্বরীর দিকে চেয়ে।

গাড়ি বেরিয়ে গেল। ছকুবাবুর বাতও সেরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দিগ্বিজয় যে হুইস্কির বোতলটি দিয়েছিলেন তাঁকে এবং যার প্রায় সবটাই শেষ হয়ে এসেছিল সেইটি বার করে' লিভারের চিকিৎসা সুরু করলেন তিনি। একটু পরেই কিন্তু চমকে উঠতে হল তাঁকে। এ কি, গেটের সামনে 'মেশিন গান' দাগছে কে। অস্ফুটকণ্ঠে একটা অশ্লীল বিহারী গাল উচ্চারণ করে' উঠলেন তিনি, জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। দেখেই চেয়ারে এসে বসলেন আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভৃত্য পরেশ এসে দেখলে, ছকুবাবু যুগপৎ ভীত এবং কুপিত হয়ে বসে আছেন। পরেশ বাঙালী চাকর, বেশ কায়দা-দুরস্ত।

"বাইরে একজন বাবু একটা কুকুর নিয়ে এসেছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করবেন কি? নিয়ে আসব এখানে?"

"আমি? ওরাজে?"

'ওরাজে' কথার তাৎপর্য্য পরেশ ঠিক বুঝতে পারলে না। 'ওরাজে' কথার অর্থ 'হেতু'।

"তিনি বললেন খুঁজে পেয়েছেন"

"কি খুঁজে পেয়েছেন?"

"কুকুরটা"

"বুঝলাম। কিন্তু আমি তার সঙ্গে মোলাকাৎ করি, এ তুমি চাইছ কেন"

"উনিই চাইছেন। উনি ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর খোঁজে এসেছেন বললেন, কিন্তু তিনি এখানে—"

"কার স্ত্রীর খোঁজে? ব্রজেশ্বরবাবুর? ও, হ্যাঁ ব্রজেশ্বরবাবু। তাঁর স্ত্রীর খোঁজে এসেছেন? তারপর?"

"ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রী এখানে নেই শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তারপর আমি যখন বললাম মা বাবু দুজনেই বেরিয়ে গেছেন, তখন তিনি জিগ্যেস করলেন যে বাড়িতে আর কেউ আছে কি না। আমি আপনার নাম করাতে উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন"

"যিনি একুণি ঝড়বড়ে মোটরবাইকে চড়ে এলেন তিনি? চেন তুমি ওঁকে?"

ছকুবাবু অসুর দিয়ে দক্ষিণ মালাবারটি চেপে রেখে বাম হস্ত দিয়ে ভীষণ জোরে নাক ঝাড়লেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সদাব্রতবাবু"

"আচ্ছা, ডাক। কুত্তা এনেছে একটা? যে ভগবান"

একটু পরেই দ্বারপ্রান্তে সদাব্রতবিহারীলাল আবির্ভূত হলেন। আপাদমস্তক ধুলোয় ঢাকা, বগলে কুকুর, চোখেমুখে আনন্দ এবং উৎসাহ ঝলমল করছে। চশমাটা ঠিক করে' নিয়ে তিনি ছকুবাবুর দিকে চাইলেন।

"ছকুবাবু?"

"ছকু"

"ও, ছকু, মাপ করবেন, ঠিক ধরতে পারিনি তাহলে। আমার নাম সদাব্রতবিহারীলাল"

"আসুন,বসুন। ওটা আপনার 'চাইনীজ-পুড্‌ল্' দেখছি"

"বাঃ, আপনি তো কুকুর চেনেন! হ্যাঁ, 'চাইনীজ-পুড্‌ল্ই'"

"চিনি বই কি। পোখমনবাবুর ছিল যে একটা—"

"পোখমনবাবু কোথায় থাকেন"

"বিহারে"

"ও, বিহারে। পোখমন? ও বিহারী, ছাচরালি। বিহারী ভদ্রলোকের নাম পোখমন তো হবেই। ঠিক। পোখমন—"

ছকুবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল হঠাৎ।

"মনে হচ্ছে এরপর বলবেন রামায়ণের নায়কের নাম তো রামচন্দ্র হবেই, ছাচরালি"

থমকে গেলেন সদাব্রতবিহারীলাল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। চশমার আলোক-রশ্মি বিকীরণ করে' আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসলেন একটা।

ছকুবাবু বললেন—"মাপ করবেন, মেজাজটা ভাল নেই। লিভার—মানে—যাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি। আপনি বিহারে কখনও যাননি মনে হচ্ছে"

"না, যাইনি। তবে যাবার ইচ্ছে আছে। খুব। শুনেছি চমৎকার জায়গা"

"মোটেই চমৎকার জায়গা নয়, ভয়ানক ধুলো। চমৎকার জায়গায় একবার জীবনে গিয়েছিলাম, ওই পোখমনবাবুর সঙ্গেই"

"দার্জিলিং কিম্বা কাশ্মীর নিশ্চয়"

"না, সিঙ্গাপুর। গেছেন কখনও?"

"না,তবে যাবার ইচ্ছে আছে। ক্লাইমেটটা খারাপ শুনেছি"

"মোটেই খারাপ নয়"

"ও, নয়?"

"চমৎকার ক্লাইমেট। এসব দেশের ক্লাইমেট কি ক্লাইমেট? মাতাহারির কি জানেন আপনি?"

"আজ্ঞে?"

"বলছি, মাতাহারির বিষয় কিছু জানেন?"

"মাতাহারি? একজন বিখ্যাত স্পাই শুনেছি। একটা ফিল্মেরও ওই নাম আছে—ওই স্পাইয়ের গল্প নিয়েই লেখা সম্ভবত। দেখিনি, আন্দাজ করছি"

"মাতাহারি মানে সূর্য্য। মালয় ভাষা"

"ও, তাই না কি। বাঃ!"

"হুবহু অনুবাদ করলে হয় 'দিনের চোখ'। মাতা—চোখ, হারি—দিন। মাতাহারি—দিনের চোখ—সূর্য্য"

"বাঃ! দিনের চোখ! চমৎকার—পোয়েটিক্—"

"তাই বলছি এ হতভাগা দেশে সূর্য্যের কতটুকু পরিচয় পান আপনারা"

"ও, হ্যাঁ—তা বটে। হা—হা—হা। তবে এখানেও গরম খুব"

"একে গরম বলেন? আপনার সিঙ্গাপুরে যাওয়া উচিত"

"যাবার ইচ্ছে আছে"

"যাবেন একবার। এখন আপনার দরকারটা কি বলুন। 'স্টিংগাহ্' চলবে একটা?"

"আজ্ঞে?"

"এক 'পেগ' খেব? সিঙ্গাপুরে ড্রিঙ্ককে স্টিংগাহ্ বলে। এই যে—"

নিজের গ্লাসটা দেখালেন।

"ও! না, ধন্যবাদ—"

"পোখমনবাবুর স্মৃতি এটি"—এই বলে' ছকুবাবু গ্লাসটি তুলে আর এক চোঁক খেলেন।

"এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে এ ছাড়া একটি দিন চলবার উপায় নেই"

"ঠিক। বিহারে যেতে হবে একবার। সিঙ্গাপুরেও। এখন এই কুকুরটাকে এনেছি। রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম এটাকে"

"পুষুন। আমার দরকার নেই। আমি নিজের জ্বালাতেই অস্থির, আমি ও নিয়ে কি করব"

"না—না—ঠিকই তো। তা নয়—মানে এ কুকুরটা আমার চেনা কুকুর—হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পেলাম। অদ্ভুত ঠেকছে, নয়? কি হয়েছে তাহলে শুনুন সব" (ক্রমশঃ)

আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি—

প্রায় ৬ মাস হইতে চলিল, ভারতবর্ষ বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু এই কয়মাসে দেশের অবস্থা উন্নতি লাভ না করিয়া ক্রমে ক্রমে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ভারতবর্ষ পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এই উভয় ভাগে ভাগ হইয়াছে। পাকিস্থানের অর্দ্ধেক পশ্চিম দিকে—সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাব লইয়া গঠিত এবং অপরার্দ্ধ পূর্ব্ব বাঙ্গালায়। এক অংশের সহিত অপর অংশের যোগাযোগের ব্যবস্থা হওয়া প্রায় অসম্ভব। সে জন্য পাকিস্থানগভর্ণমেণ্টকে নানাভাবে বিব্রত হইতে হইতেছে।

—

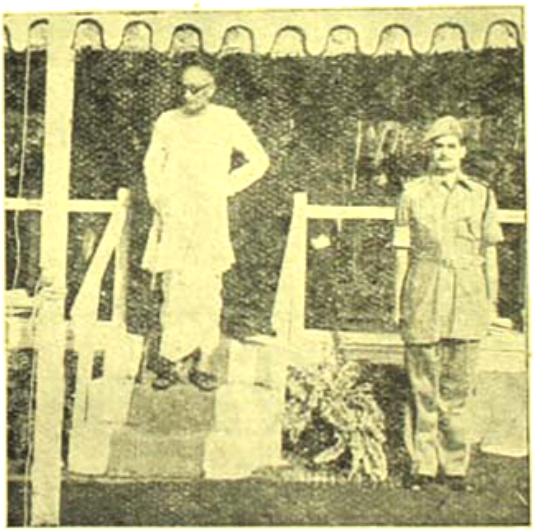

কলিকাতা লাটপ্রাসাদে গভর্ণর রাজাজী

অন্য দিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথম হইতেই এমন সব গণ্ডগোলে বিব্রত হইতে হইতেছে যে, রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে দেশবাসী জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করার সময় নাই—জনগণের কল্যাণজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার মত অর্থেরও ক্রমে অভাব দেখা দিতেছে। জুনাগড়েই প্রথমে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে বহু অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিয়া তাহার সমাধান করিতে হইয়াছে। তাহার পর কাশ্মীরে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ক্রমেই ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে। সে যুদ্ধে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যহ ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট আক্রমণকারীদের সাহায্য করায় ঐ যুদ্ধ সহজে মিটিবে বলিয়া মনে হয় না। সেজন্য ঐ ব্যাপারটি জগতের সর্ব্বজাতিক মিলন প্রতিষ্ঠান—ইউ-এন-ও'কে জানান হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিজামের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এক বৎসরের জন্য স্থিতাবস্থা চুক্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু পাকিস্থান হইতে গোপনে তথায় অস্ত্রাদি প্রেরণ করার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং হায়দ্রাবাদ লইয়াও অচিরে যে আবার বিরোধ উপস্থিত হইবে না, এমন মনে করা যায় না।

—

কলিকাতায় 'কৃত্তিবাস কবিরাজ' স্মৃতি-সম্মেলনে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ

তাহার পর আশ্রয়প্রার্থীর সমস্যা—ভারত বিভাগের পর প্রথমে পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশে ও পরে ক্রমে ক্রমে সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্তপ্রদেশে অমুসলমানদের উপর এরূপ অনাচার আরম্ভ হইয়াছিল যে ঐ সকল অঞ্চলের অমুসলমানগণ

আর তথায় বাস করা নিরাপদ মনে না করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করিতেছেন। ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূর্ব্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বহু স্থানের মুসলমানগণও পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছেন। এই ভাবে ২।৩ কোটি লোক নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আশ্রয়প্রার্থীরূপে অন্য স্থানে গমন করায় তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রকেই বিপন্ন হইতে হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়কে এই কার্য্যের জন্য বিশেষ মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্তপ্রদেশ হইতে আগত হিন্দু আশ্রয়-প্রার্থীদিগকে সকল প্রদেশে ছড়াইয়া দিয়াও এখন পর্য্যন্ত এই সমস্যার কোন সুসমাধান হয় নাই। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের রাজকোষ প্রায় শূন্য করিয়া অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, তাহার ফলে গঠনমূলক কার্য্যসমূহের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-গুলিকে সাহায্য দান করা কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের খাদ্যাবস্থাও ক্রমে জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

দিল্লীতে অস্থায়ী রাজধানী সম্বন্ধে—(বাম হইতে) শ্রীমতী নায়ডিমি (রাজাজীর কন্যা) ডাক্তার সারিয়ার (ইন্দোনেশিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী) ইজ্জতরাব দাস কৌলতরাম, সার টেরেন্স সোন (ফুটেমের হাইকমিসনার) কুমারী রেমিজিয়রামবাস, শ্রীরাজাগোপালাচারী ও লেডী সোন

এই সমস্যা সমাধানে বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বিষয়টি এমনই জটিল যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও সমস্যার সুসমাধান করা যাইতেছে না। পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট প্রথম দিকে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাশ্মীরের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে তাঁহারা এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্তপ্রদেশের পথে ঘাটে বহু লক্ষ মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী আহার ও আশ্রয়ের অভাবে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

যুদ্ধের সময় নানা স্থানে কারখানা প্রস্তুত হওয়ায় সাধারণ কৃষকের দল অধিক অর্থার্জ্জনের আশায় কারখানার কাজ লইয়া সমরোপকরণ প্রস্তুত করিয়াছিল। কারখানাগুলি একে একে সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে—বেকার কৃষকগণের পক্ষে আর দেশে ফিরিয়া গিয়া কৃষিকার্য্যে মন দেওয়া সম্ভব হয় নাই—তাহার ফলে গত ৩।৪ বৎসর দেশে কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ খুবই কমিয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় খাদ্যবিভাগ বাহির হইতে উচ্চ মূল্যে চাউল ও আটা কিনিয়া আনিয়া তাহা দেশে তদপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা

করিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ ভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। সে জন্য দেশে খাদ্যাভাব না কমিয়া দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেশের অবস্থা মহাযুদ্ধের পরও শান্তিপূর্ণ না হওয়ায় কৃষির প্রসার সম্ভব হইতেছে না। বিশেষ করিয়া দেশবাসী কৃষিবিমুখ হওয়ায় অধিক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য সরকারী প্রচার কার্য্যও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এ জন্য দেশে খাদ্যাভাব চিরস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন না দেশবাসী কৃষির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইবে, ততদিন দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের সকল সরকারী চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে। ভারতবর্ষ সত্যই সুজলা, সুফলা দেশ—কিন্তু গত দুই শত বৎসরের ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে দেশবাসী কৃষি-কার্য্যকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতে শিখিয়াছে বলিয়া আজ ভারতের খাদ্যসমস্যা এত ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে।

এ দেশে শ্রমিক-মালিক বিরোধও দিন দিন সঙ্কটজনক পরিস্থিতির দিকে আমাদের টানিয়া লইয়া যাইতেছে। খাদ্যদ্রব্যের ও অন্যান্য সকল জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য সর্ব্বত্র ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইলেও শ্রমিকদের বেতন কোথাও ২ গুণের অধিক করা হয় নাই। ফলে মালিকের প্রতি শ্রমিকের অসন্তোষের ভাব দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে ও তাহার ফলে কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় কেহই পূর্ব্বের ন্যায় পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, প্রয়োজন মত বস্ত্রাদিও পায় না, তাহার ফলে সকলে অল্প বস্ত্রের অভাবের অজুহাতে মন দিয়া কাজও করে না। এ অবস্থার আশু পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। বহু কারণে দেশের মধ্যে যে ধন-অসাম্য আসিয়া পড়িয়াছে, সরকারী ব্যবস্থার দ্বারা তাহা দূরীকরণের ব্যবস্থা না করিলে দেশ বিপন্ন হইবে ও দেশবাসী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

আমাদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এতদিন ধরিয়া আমাদের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য আন্দোলন করিয়া আজ তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেস জনগণের প্রতি কর্ত্তব্য উপযুক্তভাবে পালন করে নাই। সেজন্য বহু বামপন্থী রাজনৈতিক দলের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে ও সে সকল দলের কর্ম্মীরা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন চালাইয়া দেশে অশান্তিজনক পরিস্থিতি আনয়ন করিতেছে। কংগ্রেস কৃষাণ-মজুর-রাজের আদর্শ প্রচার করিলেও আজ কৃষাণ ও মজুর সম্প্রদায়ের বিপদের দিনে উপযুক্তভাবে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর

বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সম্বর্দ্ধনা

করিতে অগ্রসর হয় নাই। এ বিষয়ে কংগ্রেস যদি অবহিত না হয়, তবে জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব কমিয়া যাইবে ও কংগ্রেস ক্রমে তাহার শক্তি হারাইবে।

উপরে যে সকল সমস্যার কথা বলিয়াছি, সেগুলি সর্ব্বভারতীয় সমস্যা। বাঙ্গালার সমস্যা আরও ভীষণ। বাঙ্গালা বিভাগের ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার ভাগে বাঙ্গালার মাত্র এক তৃতীয়াংশ স্থান পড়িয়াছে। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ উত্তর বাঙ্গালার ভাগ করিয়া সীমা নির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত করিয়া দেয় নাই। তাহার ফলে একদিকে যেমন সমগ্র খুলনা এবং ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলার হিন্দু-

প্রধান অংশগুলি পাকিস্থানে পড়িয়াছে, অন্য দিকে মুসলমান-প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্থানে না যাওয়ায় নানাপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে। পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা না থাকায় পূর্ব্ব-পাকিস্থানের লোকগণও কি ভাবে কাজ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। পাকিস্থানের লোক মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি চর বলপূর্ব্বক দখল করিয়া বসিয়াছিল, পশ্চিম বাঙ্গালার কর্ত্তৃপক্ষ তথায় আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করায় তাহারা সেখানে মিটমাটে সম্মত হইয়াছে।

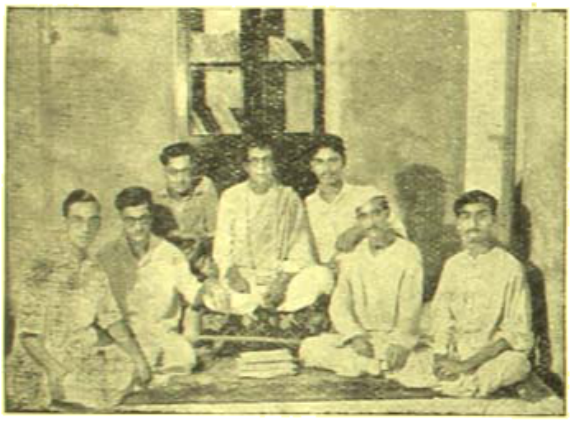

কলিকাতায় কবি শ্রীসুন্দরলাল মল্লিক সম্বর্দ্ধনা

পূর্ব্ব-পাকিস্থান অর্থাৎ পূর্ব্ব বাঙ্গালার হিন্দুদের এমন-ভাবে নির্য্যাতন করা হইতেছে, এমন ভাবে তাহাদের অসুবিধার মধ্যে রাখা হইতেছে যে তাহাদের পক্ষে আর পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বাস করা সম্ভব নহে। অথচ ১ কোটি ২৫ লক্ষ হিন্দুর পক্ষে সহসা সে দেশ ত্যাগ করিয়া আসাও সঙ্গত বা সম্ভব নহে। পাঞ্জাবে লোক-বিনিময় ব্যবস্থার ফলে যে কত লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার হিসাব করা সুকঠিন। একটা বড় যুদ্ধ হইলেও হয়ত এত অধিক লোককে প্রাণ হারাইতে হইত না। পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ডাক চলাচল প্রায় বন্ধ, রেল চলাচল ঠিকমত হইতেছে না—কাজেই সেখানে যে সকল হিন্দু বাস করেন, তাঁহারা ক্রমে পশ্চিম বাঙ্গালার হিন্দুদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইতেছেন। এ অবস্থা অধিক দিন চলিলে পূর্ব্ব-পাকিস্থান-বাসী হিন্দুদের অবস্থা শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সীমান্ত ৭ শত মাইল। পশ্চিম বাঙ্গালাকে এই সুদীর্ঘ সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে; সে কাজ সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদাবাদে পাকিস্থানী সৈন্যরা যে ভাবে দুইটি চর দখল করিয়াছিল, সেই ভাবে তাহারা যদি যে কোন পথে পশ্চিম বাঙ্গালাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পশ্চিম বাঙ্গালা হইতেও প্রতি-আক্রমণ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকিবে না। ইতিমধ্যে পাকিস্থানী সৈন্য কর্ত্তৃক সীমান্তের নানা স্থানে অনাচার অনুষ্ঠানের সংবাদ জানা গিয়াছে। সে জন্য পশ্চিম বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হইয়াছেন। সম্প্রতি দেশরক্ষাসচিব সর্দ্দার বলদেব সিংও কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার ডেপুটী নেতা সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল উভয়েই কলিকাতায় আসিয়া সীমান্তরক্ষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরামর্শাদি দিয়া গিয়াছেন। পাকিস্থানী সৈন্যরা শুধু পশ্চিম বাঙ্গালায় অনাচার করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই—আসামের সীমান্তেও কয়টি স্থান বলপূর্ব্বক দখল করার চেষ্টা করিয়াছিল। সে জন্য সর্দ্দার প্যাটেল আসামে যাইয়া আসাম-সরকারকেও উপযুক্ত নির্দ্দেশ দিয়া আসিয়াছেন।

বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলকে দেশবাসী ধীরভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইবার সুযোগ দিতেছেন না। বর্ত্তমান অবস্থায়, পরিবর্ত্তনের যুগে মন্ত্রিমণ্ডলকেও যেমন সকল দিক সামলাইয়া কাজ করিতে হয় বলিয়া তাহাদের দোষ ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক, জনগণও যদি সহিষ্ণুতার সহিত এ বিষয়ে বিবেচনা করেন, তবে তাহার ফল কখনই মন্দ হইবে না। বঙ্গীয় নিরাপত্তা বিল লইয়া যে ভাবে বিক্ষোভ প্রভৃতি করা হইয়াছে, বুদ্ধিমান ও বিবেচক জনগণ কখনই তাহা সমর্থন করেন নাই। একদল আন্দোলনকারী নিরীহ জনগণকে অযথা উত্তেজিত করিয়া দেশে যে অশান্তির আবহাওয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দূর করিতে না পারিলে বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলের পক্ষে দেশের গঠনমূলক ও উন্নতিজনক কাজ করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। দেশ নানা দিক হইতে বিপন্ন, এ অবস্থায় যদি মন্ত্রিমণ্ডলকে শান্তিতে কাজ করিতে না দেওয়া হয়, তবে দেশে অশান্তিই অধিক বাড়িয়া যাইবে ও তাহার ফলে দেশবাসীকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। মন্ত্রি-

মণ্ডলের শাসন কার্য্যে অভিজ্ঞতা নাই সত্য এবং এ কথাও সত্য যে এতদিন ধরিয়া যে আই-সি-এস সম্প্রদায় দেশ-শাসন করিতেছিলেন, তাঁহাদের উপর এখনও শাসন কার্য্যের জন্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই —তাঁহারা যে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনোভাব একেবারে পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন, এমন: আশা করাও সঙ্গত হইবে না—কাজেই এ অবস্থায় জনগণের পক্ষে শান্ত হইয়া সকলকে কাজ করিতে দিয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা না করিয়া সহসা বড় পরিবর্ত্তনের আশা করা কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

---

২৪ পরগণা রাষ্ট্রীয় সম্মিলন—

গত ২২, ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর গোবরডাঙ্গায় ২৪ পরগণা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্থানীয় জমীদার শ্রীযুত গৌরীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও সমিতির সাধারণ

গোবরডাঙ্গায় ২৪পরগণা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে ব্রহ্মচারী তোলানাথ ও অভ্যর্থনা-সম্পাদক শ্রীপ্রবোধ মিত্র

সম্পাদক খ্যাতিমান কর্ম্মী শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র মিত্রের চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। প্রথম দিনে মন্ত্রী শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচন করিলে নির্ব্বাচিত সভাপতি সৈয়দ নৌসের আলি সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। সেদিন মন্ত্রী চৌধুরী মহাশয় ও মন্ত্রী শ্রীযুত কমল-কৃষ্ণ রায় সম্মিলনে সরকারী কার্য্যপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র ঘোষ ও মন্ত্রী শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায় সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও তৃতীয় দিনে মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তৃতীয়

২৪পরগণা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

দিনে স্থানীয় যমুনা নদীর সংস্কার ও কঙ্কনা হ্রদের দুরবস্থা দূর করার কথাও আলোচিত হইয়াছিল। তিন দিনই সভায় বাঙ্গালার বহু খ্যাতনামা নেতা যোগদান করিয়াছিলেন। জেলায় এই সম্মিলনের ফলে জেলার, বিশেষতঃ গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের অভাব অভিযোগ আলোচিত হইয়াছে ও সেগুলি সম্বন্ধে সকলে অবহিত হইয়াছেন।

বিহারের নূতন গভর্ণর—

আচার্য্য কৃপালানীর পদত্যাগের ফলে ডক্টর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইয়া কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে বিহারের গভর্ণর শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন ও শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে বিহার প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতায় ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে ডক্টর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান

করিতে যাইবার পথে গত ২রা জানুয়ারী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়া এই প্রথম কলিকাতায় আসায় তাঁহাকে দমদম বিমান ঘাঁটিতে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—

'জীবনীকোষ' গ্রন্থের সম্পাদক ও বেঙ্গলী বেদল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী বিদ্যালঙ্কার গত ১৩ই অক্টোবর কলিকাতায় ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোক-

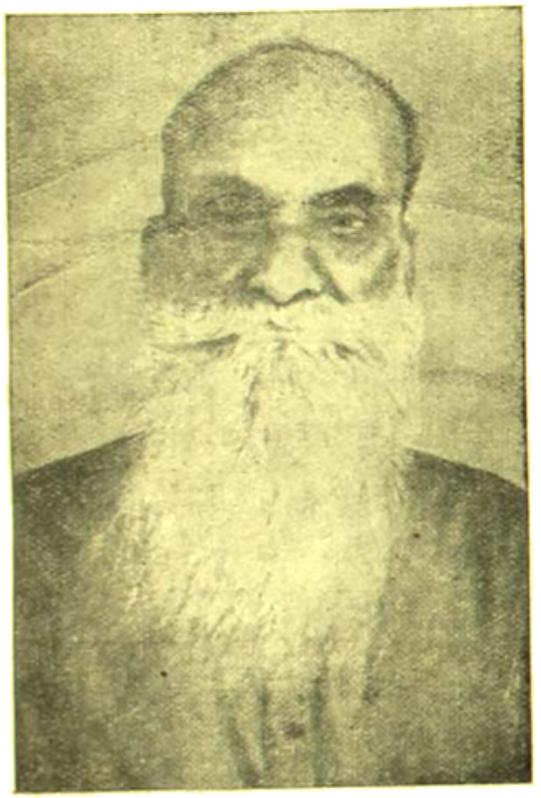

পণ্ডিত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

গমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুত দেবব্রত চক্রবর্ত্তী সিটি কলেজের অধ্যাপক। তিনি সারাজীবন শিক্ষা ও সাহিত্য আলোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কলিকাতায় সর্দ্দার পেটেলের—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রধান-সচিব সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল আসাম পরিদর্শন করিয়া গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ও ময়দানের মাঠে দশ লক্ষ লোকের এক সভায় দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি ৪ দিন কলিকাতায় থাকিয়া পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে অন্যতম মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সর্দ্দার বলদেব সিং কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন বাস করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব-পাকিস্থান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ও আসাম আক্রান্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন ও আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থায় বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র রায় স্মৃতি উৎসব—

গত ৪ঠা জানুয়ারী বিকালে ২৪পরগণা ভাষনগরের অন্তর্গত মূলাজোড় গ্রামে স্থানীয় সংস্কৃত কলেজ ভবনে কবি-গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত সভার পৌরোহিত্য করেন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সভার উদ্বোধন করেন এবং বাহাদুরপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। কলিকাতার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবন মূলাজোড়ে তাঁহার যে গৃহে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই গৃহটি সাধারণের পক্ষ হইতে ক্রয় করিয়া তথায় একটি পাঠাগার ও গ্রন্থশালা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছিল।

২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার সম্মিলন—

৬ঠা জানুয়ারী রবিবার সকালে ২৪পরগণা ভাষনগরে স্থানীয় ভারতচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে ২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তথায় সভাপতিত্ব করেন, চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ সভার উদ্বোধন করেন ও খ্যাতনামা পাঠাগার-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত সভায় পাঠাগার আন্দোলনের ইতিহাস ও কার্য্যকারিতা বিবৃত করেন। আমাদের দেশে পাঠাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও পাঠাগারসমূহের মধ্যে মিলন প্রতিষ্ঠা করিয়া সেগুলিকে প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য ছিল।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে হিন্দুদের অবস্থা—

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ হিন্দু বাস করে, তাহাদের তথায় বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুঠতরাজ লাগিয়া গিয়াছে—জমীদার খাজনা আদায় করিতে পারেন না, ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসা চালান

কষ্টকর—জিনিষ লইয়া লোক যাম দেয় না। স্কুল পাঠশালা ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছে, চিঠিপত্র বা টেলিগ্রাম আদান-প্রদানও প্রায় বন্ধ। ঐ অঞ্চল হইতে জিনিষপত্র লইয়া হিন্দুদের পশ্চিম বাঙ্গালায় আসিতে দেওয়া হয় না। আদালতে যাইলে সুবিচার পাওয়া যায় না—থানায় পুলিশ কোন অভিযোগ শুনে না—অধিকাংশ স্থলে আদালতের কাজও বন্ধ। গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকেরা এই সুযোগে অবাধে অনাচার চালাইতেছে। হাট হইতে জোর করিয়া ফসল কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয়, বাধা দিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় হিন্দুরা কি ভাবে পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়াছেন। খাজা নাজিমুদ্দীন মুখে যাহাই বলুন না কেন, কিন্তু জন-সাধারণ কেহ তাহার কথা শুনে না—এমন কি সরকারী আদেশ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে না। পূর্ব্ববঙ্গবাসী ধনী জমীদার ও ব্যবসায়ী হিন্দুসম্প্রদায়ের সকলেই ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পশ্চিম বাঙ্গালায় চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিম বাঙ্গালা সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে শীঘ্রই বাঙ্গালার এই বিষম বিপদের সম্মুখীন হইয়া ইহা হইতে হিন্দু সাধারণকে রক্ষা করিতে হইবে—নচেৎ পূর্ব্ব-পাকিস্থানবাসী হিন্দুরা ক্রমে সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

হরতাল চেষ্টা বিফল—

পশ্চিম বাঙ্গালার নিরাপত্তা বিলের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কম্যুনিষ্টদল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে সোসালিষ্ট রিপাবলিকান দল প্রভৃতি গত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতায় হরতাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস ঐ ব্যবস্থা সমর্থন না করায় জনগণ সেদিন কেহই হরতালে যোগদান করে নাই। সকল দলই নিরাপত্তা আইন সমর্থন করায় সহরে হরতাল হয় নাই।

দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসব—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও গত ১লা জানুয়ারী দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে ঠাকুর

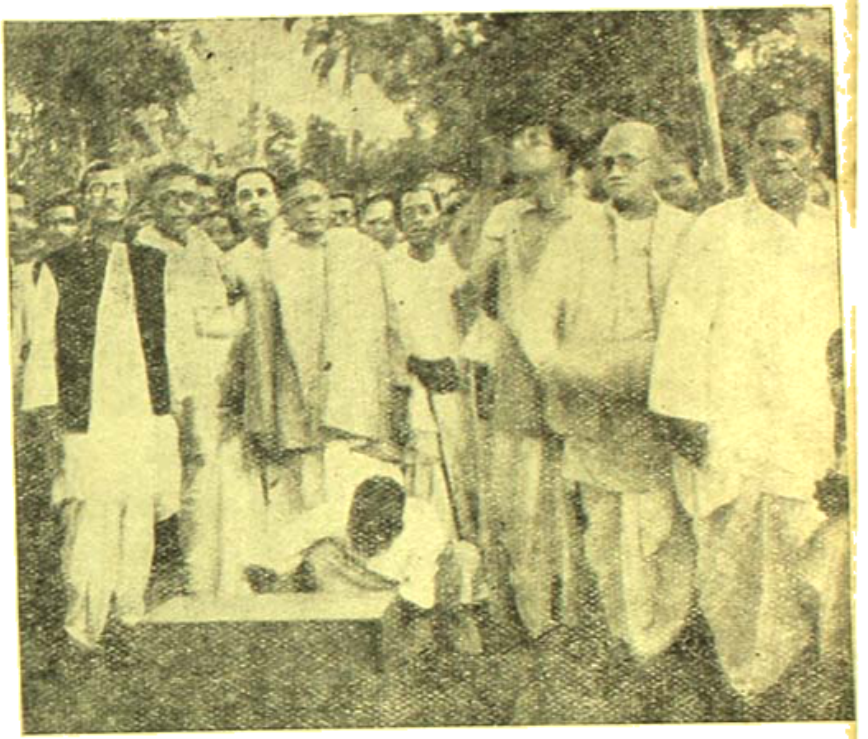

চাংড়ীপোতায় রামলক্ষ্মী প্রভৃতি ও শিশুসদনের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা উৎসবে বাঁয়ে-মন্ত্রী শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, ডাঃ বিমেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বার্ষিক কল্পতরু উৎ 'রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের' উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এ বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী উৎস উপস্থিত হইয়া সমবেত লক্ষাধিক লোকের সভায় বক্তৃ কালে বলিয়াছেন—উক্ত কালীবাড়ীটি পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমে কর্ত্তৃক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া প্রয়োজন। র রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের স্বামী পুণ্যানন্দ স পৌরোহিত্য করেন এবং ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। মহামণ্ড সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা পুলি ডেপুটী কমিশনার) উৎসবের সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বোর্ডের সদস্য শ্রীদত্তে মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজি শ্রীরথীন্দ্রকুমার মিত্র, বারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভার আয়োজন করিয়াছিলে

বোম্বাইয়ের নূতন গভর্ণর—

বোম্বায়ের গভর্ণর সার জন কলভিল বিলাত যাত্রা করায় সার মহারাজ সিং বোম্বায়ের নূতন গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছে। তিনি ইংরাজ শাসনকালেও ভারতে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতা লাভ উৎসব—

গত ৪ঠা জানুয়ারী রেঙ্গুনে ব্রহ্মের স্বাধীনতা লাভ উৎসব হইয়া গিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাস

লিকোবর বীপপুঞ্জ প্রেরিত দ্বিতীয় চিকিৎসকদল (যাত্রার পূর্ব্বে দমদম বিমান ঘাঁটিতে) ফটো—ষ্টারলক দাস

সেই ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ৬১ বৎসর ১মাস ১দিন পরে ব্রহ্মে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়াছে। স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিরূপে ডক্টর ভেত্রপ্রসাদ ঐ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য রেঙ্গুনে গিয়াছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত রক্ষা—

পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একটি নূতন সেনাবাহিনী গঠন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উহাতে প্রথমে ১৫ হাজার সৈন্য গ্রহণ করা হইবে। পরে অনুরূপ আর একটি সীমান্ত সেনাবাহিনীও গঠন করা হইবে।

শ্রীরামপুর মহকুমা সাহিত্য-সম্মিলন—

গত ৩১শে ডিসেম্বর হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের টাউন হলে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকান্ত ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে শ্রীরামপুর মহকুমা সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং শ্রীগণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্মিলনের সহিত অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

দেশীয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ মত গত ১লা জানুয়ারী উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশের ২৫টি ক্ষুদ্র রাজ্যের ও মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট সে প্রদেশের ১৪টি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশের

মোট ১৪টি রাজ্যের আয়তন ৩১ হাজার বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। উড়িষ্যার ২৪টি রাজ্যকে ৬টি জেলায় পরিণত করা হইয়াছে।

গয়ের মাঠের সভায়-পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ফটো—ইব্রাহিম খাঁ

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালানী—

শ্রীযুক্তা বিনয়নম্রী পণ্ডিত যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে আচার্য্য জে-বি-কৃপালানীর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালানী বিনা বাধায় নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। সুচেতা বাঙ্গালী মহিলা—কাজেই তাঁহার নির্ব্বাচনে যুক্তপ্রদেশপ্রবাসী বাঙ্গালীরা উপকৃত হইবে।

ভুবনিয়ায় ত্রিপুরা ছাত্র ও সংস্কৃতি সম্মেলনে সমবেত সুধীবৃন্দ

ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী হত্যার মামলা—

রেঙ্গুনে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী আউঙ্গসান ও মন্ত্রিসভার অপর সদস্যদের হত্যা সম্পর্কে গত ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী উ-স ও অপর ৮জন আসামীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য ৭ দিন সময় দেওয়া হইয়াছে। উ-স ব্রহ্মের দেশ-প্রেমিক দলের ৪৬ বৎসর বয়স্ক নেতা। জাপানীদের সহিত মিতালী করার অভিযোগে তাহাকে ১৯৪২ হইতে ১৯৪৬ পর্য্যন্ত আফ্রিকায় আটক রাখা হইয়াছিল।

সর্ব্ব এশিয়া সন্ত-পেয়েছির আসর—

গত ২৪শে ডিসেম্বর বুধবার পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সর্ব এশিয়া সন্ত পেয়েছির আসরের উদ্বোধন করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন। সপ্তাহব্যাপী এই বিরাট অনুষ্ঠানে বাংলা দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও গায়ক গায়িকার এক বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল। বাংলার ছোট ছোট

ছেলেমেয়েদের দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধন করিবার এই মহৎ প্রচেষ্টাকে আমরা সানন্দে অভিনন্দন জানাইতেছি। এই আসরের 'রাজপথে শোভাযাত্রা' আর 'চলা প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠান দুইটির চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নব-নির্বাচিত সদস্য ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বাঙ্গলার ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের জনকল্যাণকল্পে গঠনমূলক কার্য্যে বিধানবাবুর বিরাট ব্যক্তিত্ব বহু অসাধ্য সাধন করিয়াছে। যাদবপুর ও কাঁসিরডের যক্ষ্মা হাসপাতাল, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কল্পে ডাক্তার রায়ের দান অসামান্য। বিধান বাবুর চিরদিনের কার্য্যকলাপ যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন চিকিৎসা-জগতে তাঁহার সাফল্য তাঁহাকে জনসমাজে বরণীয় করে নাই, গঠনমূলক কার্য্যে তাঁহার দানই তাঁহাকে মহনীয় করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক ও পরে ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার রচিত ভোর কমিটির রিপোর্টও বিধান বাবুর বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার পরিচায়ক।

প্রবর্ত্তক সংঘ

সম্মেলনী—

গত ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা ভারত সভা হলে নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক সংঘ সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হয়। পণ্ডিত বাঙ্গালার গভর্ণর রাজাজী সম্মিলনের উদ্বোধন করেন, শ্রীযতিলাল রায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় সংঘের পতাকা উত্তোলন করেন ও কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত

সুধীরকুমার রায়চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সম্মিলনে উক্ত বঙ্গের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বহু প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ও প্রস্তাবগুলি যাহাতে কার্যে পরিণত করা যায়, সে জন্য প্রবর্তক সংঘ হইতে কার্য ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র দাশ—

সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র দাশ সম্প্রতি বিহারে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে আসাম গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়া শিলংয়ে কার্যভার গ্রহণ

আসামের চিফ সেক্রেটারী—শ্রীদেবেন্দ্র দাশ আই-সি-এস

করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে সুলেখক ও উৎসাহী কর্মী। এত অল্প বয়সে কেহ তাঁহার মত দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন নাই। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

পরলোকে বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—

ঢাকাস্থী কলেজের সহকারী প্রিন্সিপাল অধ্যাপক বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গত ২রা ডিসেম্বর মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে ইংরাজিতে এম-এ পাশ করিয়া তিনি ঢাকাস্থী কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অধ্যাপনার সহিত তিনি রাজনীতি ও সমাজ সেবা করিতেন। তাঁহার মত সহৃদয় হৃদয়বন্ধু ও পরোপকারী ব্যক্তি খুব কম দেখা যায়।

অধ্যাপক বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীমতী বিমলা ভট্টাচার্য্য—

বাঙ্গলার পণ্ডিত স্বর্গত বঙ্কিমলাল ভট্টাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী বিমলা ভট্টাচার্য্য এম-বি, ডি-টি-এস সম্প্রতি ভারত

শ্রীমতী বিমলা ভট্টাচার্য্য

গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিলাভ করিয়া মাতৃমঙ্গল ও শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য বিলাত গিয়াছেন ও লণ্ডনের হোমে রাসপাতালে কাজ করিতেছেন। তিনি শিলং, কানপুর ও আগ্রার নারী হাসপাতালে ইতিপূর্ব্বে কাজ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ—

হুগলী চন্দননগর নিবাসী খ্যাতনামা সাহিত্যিক, বদান্যবর শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় সম্প্রতি স্বাধীন চন্দননগরের শাসন পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা এই সঙ্গে হরিহরবাবুর এবং স্বাধীন চন্দননগরের শাসন পরিষদ ও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্যগণের চিত্র প্রকাশ করিলাম। হরিহরবাবু সহরতলী অঞ্চলে সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি সুপণ্ডিত, কাজেই তাঁহার এই সম্মানলাভে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

স্বাধীন চন্দননগরের শাসন পরিষদের সভাপতি—শ্রীহরিহর শেঠ

স্বাধীন চন্দননগর শাসন পরিষদ ও মিউনিসিপাল পরিষদের সদস্যগণ—
বাম দিক হইতে—১ম শ্রেণী—শ্রীশৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্র পাল, মঃ ব্যাঁজা (এডমিনিষ্ট্রেটার), শ্রীহরিহর শেঠ (সভাপতি), মঃ ব্যাঁর (ফরাসী ভারতের গবর্ণর)
২য় শ্রেণী—শ্রীরাসবিহারী মুখু, শ্রীগৌর মল্লীক, মঃ বার্ণার্ড (ফরাসী কমলাস), শ্রীআশুতোষ পাল, শ্রীঅরুণ বসু, শ্রীযতেন্দ্র পাল ও শ্রীসতীশ পাল

শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র চন্দ্র—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত কমিতুষণ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা কর্পোরেশন সম্পর্কিত তদন্ত কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীকমলচন্দ্র চন্দ্র আই-সি-এস তাঁহার স্থানে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রবাসী উড়িষ্যা সম্মিলন—

গত ২৮শে ডিসেম্বর ২৪ পরগণা কামারহাটীতে সাগর দত্তের স্কুলের মাঠে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাবের সভাপতিত্বে প্রবাসী উড়িষ্যা সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার নানা স্থান হইতে প্রায় ১০ সহস্র উড়িষ্যা তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ দাস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়া উড়িষ্যা ও বাঙ্গালীদের মধ্যে মিলনের বাণী প্রচার করেন।

বারাকপুরের সাংস্কৃতিক সম্মিলন—

গত ১লা হইতে ৩রা জানুয়ারী ৩ দিন ২৪ পরগণা বারাকপুরস্থ হিন্দীস্কুলে সাংস্কৃতিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ঐ উপলক্ষে তথায় যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীতে বারাকপুরের ইতিহাস চিত্রে

প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্মিলনের বিভিন্ন দিনে শিক্ষামূলক বক্তৃতা, ব্যায়ামপ্রদর্শনী, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

পরলোকে অনন্তবালা চৌধুরাণী—

মৈমনসিংহ জেলার গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী অনন্তবালা দেবী চৌধুরাণী গত ৯ই অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। অনন্তবালা দেবী রাজসাহী

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পত্নী অনন্তবালা দেবীচৌধুরাণী

জেলার হরিরামপুরনিবাসী কালীপ্রসাদ সান্যালের কন্যা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধীর স্থির ও অত্যন্ত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন। রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীর গৃহে আসিয়াও তিনি সাধারণের মত ভোগবিলাসে মাতিয়া উঠেন নাই। তাঁহার স্বামীভক্তি, দরিদ্রের প্রতি দয়া, অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা, ভগবদ্‌ভক্তি ও ত্যাগের ভাব প্রত্যেকেরই শিক্ষণীয়। মধ্যবয়সেই তিনি স্বামীর অনুমতি লইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তীর্থবাস করিতে চলিয়া যান, আর সংসারাশ্রমে ফিরিয়া আসেন নাই।

শ্রীমতী কল্যাণী গুহ—

ই, আই রেলের ডেপুটি চীফ্ কমার্সিয়াল ম্যানেজার শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাসের কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী গুহ এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজীতে অনার্স পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ম্যাট্রিকুলেশন এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় গভর্ণমেণ্টের স্কলারশিপ লাভ করিয়া উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী কল্যাণী গুহ

ইনি উপস্থিত ঢাকার ইংরাজী সাপ্তাহিক "ইষ্ট বেঙ্গল টাইমস্" কাগজের সম্পাদনার কার্য্য করিতেছেন।

কলিকাতায় ব্যবস্থা পরিষদের সম্মুখে নিহত আর-ডব্লিউ এ-সি'র ক্যাডেট শিশিরকুমার মণ্ডল ফটো—পাস্না সেন

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচ

ভারতীয়দল : ১৮৮ ও ৬১ (৭ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া : ১০৭

বৃষ্টির জন্য ভারতীয় ক্রিকেটদল বনাম অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচ শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

১২ ডিসেম্বর সিডনীতে মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে ভারতীয় বনাম অষ্ট্রেলিয়াদলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়। ভারতীয় দলের অধিনায়ক লালা অমর নাথ টসে জয়লাভ করে নিজ দলকে প্রথমেই ব্যাট করার সুযোগ দেন। খেলার সূচনা খুব শুভ হল না। দলের ২ রাণে প্রথম এবং ১৬ রাণে ২য় উইকেট পড়ে গেল। মোট ৪৫ মিনিট খেলার পর বৃষ্টি নামে এবং বেল মিনিট খেলা স্থগিত থাকে। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারতীয় দলের ২ উইকেটে ৩৮ রাণ উঠে। বৃষ্টির জন্য মধ্যাহ্নভোজের পর আর খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয় নি। রাত্রে বৃষ্টির জন্য খেলার দ্বিতীয় দিনে (১৩ই ডিসেম্বর) মাঠের অবস্থা মোটেই সুবিধার ছিল না সেই জন্য যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ হয় নি। খেলা ১টায় খেলা আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় চার উইকেটে ভারতীয় দলের মাত্র ৬০ রাণ উঠে। তিন ঘণ্টা খেলার পর শতরাণ পূর্ণ হয়। চা-পানের সময় ৬ উইকেটে ভারতীয় দল ১৩৬ রাণ করে; চার ঘণ্টা ২০ মিনিট খেলার পর ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ১৮৮ রাণে শেষ হয়। কাম্বকার এবং কিথেনচাদ সপ্তম উইকেটের জুটিতে ৭০ রাণ করেন। এই দুজনের কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিংয়ের জন্যই ভারতীয়দল কোনক্রমে শোচনীয় অবস্থা থেকে রক্ষা পায়। উইকেট পান—ম্যাকুল ৩, জনষ্টন ২, জনসন ২ এবং লিণ্ডওয়েল ১।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৩৮ মিনিট সময় হাতে নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক উইকেটে ২৮ রাণ উঠলে পর খেলা স্থগিত থাকে। সরকারী ভাবে জানা যায় মাঠে ২০০২৭ জন দর্শকের সমাগম হয়েছিল। এই বাবদ ১৯৮৮ পাউণ্ডের টিকিট বিক্রী হয়।

১৪ই রবিবার, খেলার চিরাচরিত প্রথা হিসাবে রবিবারে খেলা বন্ধ ছিল। ১৫ই ১৬ই বৃষ্টির জন্য খেলা হয় নি। ১৭ ডিসেম্বর বুধবার খেলার পঞ্চম দিনেও যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে না হয়ে একটু দেরীতেই খেলা আরম্ভ হয়। অষ্ট্রেলিয়াদলের নট আউট খেলোয়াড়দ্বয় ব্র্যাডম্যানও মরিস অসমাপ্ত প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। নরম উইকেটে প্রতিখানেই বিপদের সম্ভাবনা থাকায় উভয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে উইকেট রক্ষা করে খেলতে থাকেন। কিন্তু নরম ও ভিজা মাঠ খেলোয়াড়দের সমস্ত সতর্কতা এবং ক্রীড়ানৈপুণ্য ব্যর্থ ক'রে দিল। ১০৭ রাণে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হল। অমন দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় ব্র্যাডম্যান ১৩ রাণে আউট হন। দলের সর্ব্বোচ্চ ২১ রাণ করলেন রেকেন্স।

অষ্ট্রেলিয়া দলের এই অপ্রত্যাশিত পতনের চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যায় অষ্ট্রেলিয়া দলের থেকে ৮১ রাণে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা অতি সন্তর্পণে এবং বিধা-যুক্ত ভাবে আরম্ভ করলেন। ভিজা মাঠের নরম উই-কেটে সুবিধা পেয়ে বোলারগণ কি ভাবে ব্যাটসম্যানদের প্রতারণা করতে পারেন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা তার সাক্ষ্য দিলেন। ভারতীয় দলের ৭ উইকেটে

৬১ রাণ উঠলো। স্বাভাবিক অবস্থায় খেলা হলে এই রাণের পূর্ব্বে 'মাত্র' কথা জুড়ে দিবে রাণ সংখ্যার মর্য্যাদা দেওয়া হ'ত না। ঐ দিনে সিডনী মাঠে অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতীয় দলের মিলিয়ে ১৬টি উইকেট পড়ে যায়। ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানদের সর্ব্বোচ্চ রাণ সংখ্যা এবং ক্রীড়া চাতুর্য্য যতটা দর্শকদের মুগ্ধ করে ততটা বোলারদের দক্ষতা মুগ্ধ করতে পারে না। এই অবস্থায় তাদের জয় পরাজয় স্বীকার করতেও দর্শকেরা অনুদার। এ বিপর্য্যয়ের কারণ ভিজা মাঠ এবং এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত হিসাবে অভিহিত ক'রে বোলারদের সাফল্যকে খর্ব্ব করা হয়।

১৭ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচের শেষ দিনেও বৃষ্টির জন্য খেলা সম্ভব হয় নি। ঐ দিন খেলা আরম্ভ করার জন্য অনেক চেষ্টা চলে। বৃষ্টি একটু ধরে গেলেই আম্পায়ার এবং উভয় দলের অধিনায়কদ্বয় মাঠে নেমে পিচ পরীক্ষা করতে থাকেন এবং পিচের অবস্থা একটু ভাল হলেই খেলা আরম্ভ হবে স্থির করেন। কিন্তু বার বার বৃষ্টি এবং পিচ পরীক্ষার মধ্যে খেলার সময়ই হাত ছাড়া হতে লাগল। একবার ঠিক হ'ল ৩-৪৫ মিনিটের সময় পিচ পরীক্ষা করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু ৩-৪০ মিনিটে জোর বৃষ্টি নেমে গেল। ৪-২৫ মিনিটে ঘোষণা করা হ'ল—খেলা হবে না। শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত ভাবেই দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচটি পরিত্যক্ত হল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিডনী মাঠে কখনও টেষ্ট ম্যাচের ফলাফল অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়নি, এই প্রথম। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮১ রাণে অগ্রগামী ছিল এবং দ্বিতীয় ইনিংসের রাণ নিয়ে মোট ১৪২ রাণ এবং হাতে উইকেটে অগ্রগামী ছিল।

ভারতীয় দল : অমরনাথ (অধিনায়ক), মানকাদ, সারডাতে, ওদমস্বর, হাজারে, কিবেশটাদ অধিকারী, কাদকার, নাইডু, আমীর ইলাহী ও ইরাণী।

অষ্ট্রেলিয়া দল : ব্র্যাডম্যান (অধিনায়ক), ব্রাউন, মরিস, হ্যাসেট, মিলার, হেমেন্স, জনসন, ম্যাকুল, লিণ্ডওয়াল, ট্যালন ও জনষ্টন।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ

অষ্ট্রেলিয়া : ৩৯৪ ও ২১৫ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ভারতীয়দল : ২৯১ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ও ১২৫।

ভারতীয়দল বনাম অষ্ট্রেলিয়াদলের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলায় অষ্ট্রেলিয়াদল ২৩৩ রাণে বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের ২য় পরাজয়।

১লা জানুয়ারী ইংরাজী তথা নতুন বছরের প্রথমদিনে সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা বিখ্যাত মেলবোর্ণ মাঠে আরম্ভ হ'ল। ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ব্র্যাডম্যানের প্রতি ভারতীয় দল নববর্ষের যে শুভেচ্ছা এবং সৌভাগ্য কামনা করেছিলেন তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, এ কামনা ব্যর্থ হয়নি। ব্র্যাডম্যান টসে জয়লাভ করলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত খেলাতেও জয়ী হলেন। বিশ হাজার দর্শক খেলার মাঠে উপস্থিত হয়ে ব্র্যাডম্যানকে অভিনন্দন জানালো। খেলার উপযুক্ত উইকেট এবং সম্বর্দ্ধনা সূচক বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে অষ্ট্রেলিয়াদল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন বার্ণস এবং মরিস। ২৯ রাণে প্রথম উইকেট পড়লো। স্বয়ং ব্র্যাডম্যান মরিসের স্থলী হলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় দলের ৯১ রাণ উঠলো। মধ্যাহ্ন ভোজের পর মরিস ৪৫ রাণে আউট হলেন তাঁর স্থলে উইকেটে হ্যাসেট এসে ব্র্যাডম্যানের স্থলী হলেন। চা' পানের সময় অষ্ট্রেলিয়া দলের রাণ ২ উইকেটে ২০৪ রাণ উঠলো। চা-পানের পর হ্যাসেট নিজস্ব ৮০ রাণে আউট হলেন। তাঁর ৯টি বাউণ্ডারী ছিল। ব্র্যাডম্যান ১৯৭ মিনিট খেলে ১৩২ রাণ ক'রে কাদকারের বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হন। অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ৩৯৪ রাণ উঠলে পর ঐ দিনের মত খেলা শেষ হয়। উইকেট পান অমর নর্থ ৪ এবং মানকাদ ৩। ভারতীয় দলের উইকেট রক্ষক পি-সেন উইকেট রক্ষক হিসাবে প্রশংসা লাভ করেন; তিনি কোন অতিরিক্ত রাণ দেন নি।

২রা জানুয়ারী খেলার দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের খেলা ৩২৪ রাণ উঠলে পর শেষ হয়। এই প্রথম ইনিংস ৫ ঘণ্টা ৪১ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের সূচনায় খেলতে নামলেন মানকাদ এবং সারডাতে। ভারতীয় দলের প্রথম উইকেট পড়লো ১২৪ রানে। সারডাতে ৩৬ রানে

আউট হলেন। ওল মহম্মদ মানকাদের ঘুটী ধরলেন কিন্তু ১২ রান করে বিদায় নিলেন। চা পানের সময়ে ঘরের রান ১৩৫ উঠলো। তখন মানকাদ ৯১ এবং হাজারে ১৫ রান করে নট আউট আছেন। মানকাদ ১১৬ মিনিট খেলে নিজস্ব শতরান পূর্ণ করলেন। এদিকে হাজারে ঐবং পরে অমরনাথ আউট হয়ে গেলে কাবকার মানকাদের ঘুটী ধরলেন। মানকাদ নিজস্ব ১৩২ রান ক'রে জনষ্টোনের বলে ক্যাচ তুলে টাপ্সনের হাতে ধরা পড়ে আউট হলেন। টাপ্সন ইতিপূর্ব্বে মানকাদের একটি ক্যাচ ধরতে পারেন নি। মানকাদ তিন ঘণ্টা উইকেটে খেলে মোট ১৩২ রান করেন তার মধ্যে ১৩টা বাউণ্ডারী এবং একটি ওভার বাউণ্ডারী ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ২৬২ রান উঠলে পর দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়।

উইকেটের শোচনীয় অবস্থা দেখে অমরনাথ ৩রা জানুয়ারী খেলার তৃতীয় দিনে ৯ উইকেটে ২৯১ রানে প্রথম ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার্ড করেন। ঐদিন কাবকারের নট আউট ৫৫ রান উল্লেখযোগ্য। এদিকে উইকেটের শোচনীয় অবস্থার জন্য যেমন অমরনাথ ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন অন্যদিকে আত্মরক্ষা হিসাবে ব্র্যাডম্যান অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করলেন বোলারদের দিয়ে। দলের ১ রানে ১ম, ১৮ রানে ২য় উইকেট পড়লো। আরভাইন, তুলাচ ও-নীল, বার্ণস আউট হলে পর মরিস ও ব্র্যাডম্যানের পঞ্চম উইকেটের জুটি খেলার এই পতন রোধ করলেন এবং খেলার গতিও ঘুরিয়ে দিলেন। চা পানের সময় অষ্ট্রেলিয়া দলের ৪ উইকেটে ১০২ রান উঠল; ব্র্যাডম্যান ও মরিস যথাক্রমে ৪০ ও ৩১ রান করে নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে নির্দ্ধারিত সময়ে অষ্ট্রেলিয়া দলের ৪ উইকেটে ২০১ রান উঠে। ব্র্যাডম্যান ১২৭ এবং মরিস ১০০ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৪ঠা জানুয়ারী রবিবার খেলা বন্ধ ছিল। রবিবার রাত্রে বেশ বৃষ্টি হয়। তার ফলে সোমবারে উইকেটের অবস্থা ভাল ছিল না। তিন উইকেটে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অসুবিধার কথা সম্যক উপলব্ধি করেই ব্র্যাডম্যান শনিবারের ৪ উইকেটের ২০১ রানের উপর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার্ড করলেন। ফলে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ হ'ল। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের ১২৪ রান উঠে। দ্বিতীয় ইনিংস দুঘণ্টা কাল স্থায়ী ছিল। ভারতীয় দল ২০০ রানে পরাজিত হয়। এই খেলায় ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের অনেকগুলি ত্রুটি দেখা গিয়েছিল। শনিবার অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংসে একাধিক ক্যাচ তারা নষ্ট না করলে এবং শনিবার সকাল দিকেই উইকেটের শোচনীয় অবস্থা দেখে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলে খেলার সমতা রক্ষা করা যেত। এসব ত্রুটি ছাড়া ভারতীয় দলের দুর্ভাগ্য যে তাদের তিনটি টেষ্ট ম্যাচেই নরম উইকেট এবং অনভ্যস্ত আবহাওয়ার মধ্যে খেলতে হয়েছে, ফলে তারা স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্যে প্রদর্শনের সুযোগ পায় নি। অপরদিকে নরম উইকেট এবং অত্যন্ত আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া দল তাদের স্পিন বোলার দিয়ে ভারতীয় দলের বিপর্য্যয় ঘটাতে পেরেছে।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (৩য় খণ্ড)—৮৲
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "আমাও রক্তপাত"—২৲
শ্রীঅপরূপা গুহ প্রণীত গল্প গ্রন্থ "জীবনের ফসল"—১৸৹
শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "পথ নির্দ্দেশ"—১।৹
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত গল্প গ্রন্থ "সামনে চড়াই"—৩৲
শক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপন্যাস "রেখা নদী"—২৷৹
শ্রীকমলাকান্ত ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "উত্তর পুরুষ"—৩৲
বিভিকাস্ত বসু প্রণীত "ত্রিরাত্রিম"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়," শুধাইল নারী,
সন্ন্যাসী কয়—"আজি রজনীতে হ'য়েছে সময় এসেছি, বাসবদত্তা।"

ভারতবর্ষ

CENTRAL LIBRARY

ফাল্গুন—১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

আধুনিক বিশ্ব ও মনুষ্য

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

আধুনিক বিশ্বও অসুস্থ, মনুষ্যও অসুস্থ। সম্প্রতি, পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ ক'রে এবং অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, আজকের এই পৃথিবী ও মনে মনুষ্যজাতি উভয়েই অত্যন্ত অসুস্থ। আমি বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম মন নিয়ে পৃথিবীর অবস্থা বিচার করেছি এবং চিকিৎসকের চক্ষু দিয়ে মানুষকেও পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। কি আমাদের স্বদেশ ভারতবর্ষ, আর কি সেই বিশাল বিশ্ব, উভয়কেই আমি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর সূক্ষ্মতম অনুভূতি দিয়ে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পেয়েছি ব'লেই আমি অকুতোভয়ে ঐ কথা বলতে পেরেছি যে, আধুনিক বিশ্ব ও মনুষ্য উভয়েই অত্যন্ত অসুস্থ। কিছুদিন পূর্বে নিউ-ইয়র্কের এক বিদ্বজ্জন সভায় এই কথা আমি বলেছিলুম।

মানুষের দেহের ভিতরকার কল কব্জা, উপাদান, রস, সাম্য ও অসাম্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমতা রক্ষা করতে পারে অর্থাৎ উপযুক্ত উপাদানগুলির সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের শরীর সুস্থ ও নিরোগ থাকে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সাম্যের অভাব ঘটে, রসের মাত্রাধিক্য অথবা কমা হয়, তখনই মানুষ রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানুষের দেহের সম্বন্ধে যে কথা, পৃথিবীর সম্বন্ধেও সেই কথা। সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের অভাব, অবনতি ও পতনের ফলে পৃথিবীর আজ এই দুরবস্থা। মানুষের সম্মুখে সমাজের উচ্চ আদর্শ আজ নেই, নীতির মহান অনুপ্রেরণাও দেখিনে। তবে মানুষ কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে? কোন্ মহৎ প্রেরণা তাকে উদ্বুদ্ধ করবে?

অসুস্থ মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৈকল্য যেমন

স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে, পৃথিবীর বিপর্যয়ও তেমনই স্বাভাবিক কারণেই হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই চায় সুখী হতে; সন্তুষ্ট থাকতে; মানুষ মনের আনন্দে জীবন উপভোগ করতে চায়। তারই জন্য জ্ঞানের প্রসার ও সেইজন্যই বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি। একথা স্বীকার করতে হয় যে, জ্ঞান যথেষ্ট সঞ্চারিত হয়েছে এবং বিজ্ঞানেরও অপরিসীম উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান, সেই উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হয়েছে? মানুষ কি সুখী হয়েছে? মানুষ কি পরিতোষ লাভ করেছে? আনন্দময় জীবন সম্ভোগ কি তার হয়েছে? এর উত্তরে 'না' বলতে কি কিছুমাত্র অন্যায় হবে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভিযানের সার্থকতার সাথে সাথে মানুষটির—ব্যক্তিটির উন্নতির—তার সামাজিক ও নৈতিক ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা কি করা হয়েছিল? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের স্পৃহাকে প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা কি হয়েছিল? এ সকলের উত্তরেও যদি পুনরায় আমি 'না' বলি, তাহ'লে কি অন্যায় হবে? আমি ত দেখছি সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি ও উৎকর্ষের কথা বিশ্বের মানুষ সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়েছে। সামাজিক ও নৈতিক আদর্শচ্যুতি ঘটেছে বলেই বিশ্বময় আজ হিংসার তাণ্ডব দেখতে হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের গানে আছে "যে নদী মরুপথে হারাল ধারা"। গানের এই কলিটি থেকে কবি-কল্পিত দৃশ্যটি আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারি। কুলু কুলু ধ্বনি করতে করতে, তর তর বেগে ব'য়ে যেতে যেতে নদীটি মরুভূমির বালুরাশির মধ্যে হারিয়ে গেলো; ধারা শুকিয়ে গেলো—নদীটি নিশ্চিহ্ন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধারাপ্রগতিরও আদর্শবিহীন বিশ্বের হিংসার অনলকুণ্ডের মধ্যে পড়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছে; অথবা হারিয়ে ফেলেছে। তারই ফলে যে-মানুষকে সুখী করা, যে-মানুষের পরিতোষ বিধান করা ও যে মানুষকে অনাবিল ও অবিরল আনন্দ দান করা ছিল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য,তা ভুলে গিয়ে,কত সহজে, কত অল্প আয়াসে ও কত অল্প সময়ে সেই মানুষের নিধন সম্ভব হতে পারেপৃথিবীময় তারই গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। এ্যাটম বমের তুলনা দেওয়া অসঙ্গত হবে না। প্রকৃতির অসীম ও দুর্বার শক্তি সূক্ষ্মতম অণুতে নিহিত ছিল, বৈজ্ঞানিকের সাধনায় তার ব্যবহার-বিধি আয়ত্ত হোল বটে, কিন্তু সেই প্রবল মহাশক্তি বিশ্বের কল্যাণে প্রযুক্ত না হয়ে বিরোধিম নাগাসাকিতে নিমেষমধ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিধনে নিয়োজিত হোল সেই আণবিক আভাশক্তি!

নিরোগ দেহ ও সুস্থচিত্ত মানুষ অন্তরে হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে না। মানুষ স্বভাবতঃ শুদ্ধ, ধীর, সংযত ও শান্ত। কিন্তু মানুষের সম্মুখে সামাজিক এবং নৈতিক উচ্চাদর্শের আলেখ্য ও মহৎ প্রেরণার আহ্বান না থাকায় এই অসুস্থ বিশ্বের মাঝে মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মানুষ তার পূর্ণায়তন ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের অবয়ব আছে কিন্তু মানুষ নেই। পৃথিবীতে আজ গোষ্ঠি, দল ও প্রতিষ্ঠানই সব—এরাই বড়, এরাই সক্রিয়, এরাই মুখর—এদেরই প্রাধান্য—ব্যক্তিটি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে; অদৃশ্য হয়ে গেছে। ব্যক্তিটির ইচ্ছা অনিচ্ছা, রুচি অরুচি ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তির কোন মূল্যই আজ নেই; ব্যক্তিটির অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বও যেন কোথাও নেই। অথচ বিশ্বময় কলরব, পৃথিবীময় কোলাহল—মানুষটির মঙ্গল বিধানই কাম্য—মানুষটিকে সুখী করবার জন্যই সকলে ব্যস্ত এবং সর্বত্রই বিপুল আয়োজন। যেখানে গণতন্ত্রের (democracy) প্রচলন সেখানেও এই কথা; যেখানেএকনায়কত্ব (dictatorship) প্রতিষ্ঠিত, সেখানেও এই কথা—মানুষটির কল্যাণ সাধনই লক্ষ্য। পশ্চিম বৎসরের ব্যবধানে যে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেলো, মানুষকে সুখী, সুস্থ, উন্নত ও স্বাধীন করাই ছিল নাকি উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কতখানি সাধিত হয়েছে, তা বোধ করি বলবার আর দরকার নেই।

মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত মানুষের উন্নতির সহজ ব্যাখ্যা করেছেন। গান্ধীজী বলেছেন, মানুষের অন্তর পরিতৃপ্ত হলেই বুঝতে হবে, উন্নতি সাধিত হয়েছে; আপনার মধ্যে যে সম্পূর্ণ, সেই স্বাধীন। যে দেশের মানুষ সেই সাধনায় সিদ্ধ হতে পেরেছে সেই দেশই স্বাধীন। এই কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করলে আমরা কি দেখি? মহাত্মার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, মানুষ তার সন্ধানী আলোটি অন্তরের দিকে ফেলে দেখুক। আত্ম বিশ্লেষণ করুক।

বিস্ময় আজ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখি। মানুষটির সামাজিক উন্নতির কথা কোথাও শুনি না, মানুষটির নৈতিক পূর্ণ

বিকাশের কোন আয়োজনই কোথাও হচ্ছে বলে শুনি না ; কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে, "মানুষটিকে" সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কি সমারোহই না হচ্ছে। মানুষটি নিজে "কি," তা জানবার চেষ্টা কি কোথাও আছে ? না। আমার মনে হয়, মানুষের কি "আছে", সকলে সেই চিন্তায়ই বিভোর। "মহাত্মা গান্ধী কি," সে কথা ক'জন লোক চিন্তা করেন ? গান্ধীর কি প্রতাপ ! এই ভেবেই মানুষ তন্ময়। এ কি সুস্থতার লক্ষণ ?

হিংসাকে প্রবলতর হিংসার দ্বারা পরাভব করবার প্রচেষ্টা আগ্রহই আজ বিশ্বকে গ্রাস করেছে, কিন্তু তার পরিণাম কি এবং কোথায় তার শেষ পরিণতি, পাশ্চাত্যের প্রতিভা ও মনীষা সে চিন্তা আদৌ করছেন কি-না, সার্দ্ধবিশ্ব ভ্রমণ ক'রে, শ্রেষ্ঠ শক্তিধর ও প্রতিভাবান মনীষীদের সঙ্গে আলাপ করেও দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করছি, আমি তা বুঝতে পারি নি। আমেরিকার অনুষ্ঠিত "বিশ্ববিধান-ভবন" ইংরাজীতে যার নাম 'উনো' অথবা 'ইউনাইটেড নেসন্স অর্গ্যানাইজেসন', তার আলোচনার গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন ক'রেও আমি ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। পৃথিবীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করবার জন্যই যার সৃষ্টি, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বিগ্রহের বিলোপ ঘটাতে যার জন্ম, বিশ্বের সকল জাতিকে সৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ করবার জন্যই যার প্রতিষ্ঠা, সেই "শান্তি সদন" থেকেই ঘন ঘন রণ-হুঙ্কার ঝঙ্কৃত হতে শোনা যাচ্ছে। জাতি বিদ্বেষ, বর্ণ বিদ্বেষ, পরস্পরে সন্দেহ ও অবিশ্বাস 'উনো'কে সর্ব্বগ্রাস ক'রে ফেলেছে বললেও বোধ হয় অন্যায় হবে না। এ্যাটমের অধিকার ও ব্যবহার সম্পর্কে যে রেষারেষি পৃথিবীতে চলেছে, তাই থেকেই কি আমার উক্তি সমর্থন পাচ্ছে না ? সুখের কথাও বটে—দুঃখের বিষয়ও বটে, এই পঙ্কিল আবর্ত্তে, হিংসার ঝঞ্ঝাবর্ত্তে মানুষটির—যাকে আমি individual man বলেছি, তার কোন হাত নেই ; বুঝি এ সবে তার চিহ্ন টুকুও নেই। গোষ্ঠি, দল ও প্রতিষ্ঠানেরই প্রাদুর্ভাব ; অসুখের সৃষ্টি তাদের দ্বারাই হয়েছে। মানুষটি উপেক্ষিত ; মানুষটির থাকা ও না থাকা যেন সমান।

প্রাচ্যে এর প্রতিকারের উপায় আছে। মুক্তির পথ প্রাচ্যই দেখাতে পারেন সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষীয় বুদ্ধদেব জন্মমরণশীল জগতে মানুষটির সুখ, সন্তুষ্টি ও আনন্দের পথ নির্দ্দেশ করেছিলেন। মিথ্যার দ্বারা মিথ্যার উচ্ছেদ হয় না ; পাপের দ্বারা পাপের বিনাশ সম্ভব নয়, যুগে যুগে ভারতই সে কথা বলেছে। এই ভারত বলেছে, পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে নয়। এই ভারত শতাব্দীতে শতাব্দীতে এই শিক্ষাই দিয়েছে, সত্যের সন্ধান করবার অধিকার মহাপাপীরও আছে। পাপের ক্ষতে লবণ প্রয়োগ ও পাপীর কঠোর শাস্তি বিধানই শ্রেষ্ঠ অনুশাসন নয়। মানুষের আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ করাকেই মহাত্মা গান্ধী ব্যাধি নিরাময়ের প্রকৃষ্ট পন্থা ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন। মানুষ যে মুহূর্ত্তে আত্মোপলব্ধি করবে, গোষ্ঠি, দল বা প্রতিষ্ঠান যত শক্তিশালীই হোক্ না কেন, হিতাহিত, শুভাশুভ, ন্যায়ান্যায় নির্ব্বিচারে মানুষ আর তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। মহাত্মা গান্ধী তাঁর দেশের সম্মুখে সামাজিক ও নৈতিক উচ্চাদর্শ ও মহৎ প্রেরণা উচু ক'রে ধরেছিলেন। অহিংসা ও সত্যের সাহায্যেই তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বিশ্বজগত বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে সেই অভিনব যুদ্ধ লক্ষ্য করেছিলো। মহাত্মাজী সেই অদ্ভুত সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন ; পৃথিবী তা'ও লক্ষ্য করে নি কি ? তথাপি মহাত্মাজীর কর্ম্মচেষ্টার বৈশিষ্ট্য এই ছিল, তিনি মানুষটিকেই তাঁর অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। মানুষটিকেই সত্য ও অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে শুধু যে অভিনব যুদ্ধই পরিচালিত করেছিলেন তাই নয়, মানুষটির সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের এই পার্থক্য আরও কতকাল পৃথিবীর অজ্ঞাত থাকবে ?

আমাদের মাতৃভূমি, জন্মভূমি ভারতবর্ষ খণ্ডিত ; পাঞ্জাব বিচ্ছিন্ন এবং আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশও দ্বিধা বিভক্ত। এতে সকলেই দুঃখিত ; সকলেই একে ভীষণ দুর্দ্দৈব ব'লে মনে করছেন। কিন্তু এই বিভাগ যত বড় দুঃখজনক ঘটনাই হোক না কেন, আমি অন্ততঃ এর জন্য দুঃখ না করতেই পরামর্শ দোব। আমার নিজ প্রদেশ বাঙ্গলা বিভাগের মূল কারণ বিশ্লেষণ ক'রেই আমি বলবো, দুঃখিত ও হতাশ হবার কোন কারণ নেই। মিথ্যা মোহের ঘোরে যার সৃষ্টি, মিথ্যা মোহের অবসানে তার ধ্বংসও অনিবার্য্য। ঐতিহাসিক কারণেই দেশ ভাগ

হয়েছে ; আবার একদিন ইতিহাসের প্রয়োজনেই বিভাগের প্রাচীর ভেঙে যাবে। আমার তাতে কণামাত্র সংশয়ও নেই।

মুসলমান একদিন রাজা ছিলেন এবং এ দেশের ওপর প্রভুত্ব করতেন, এটা ইতিহাস। ইংরেজের আগমনে সেই প্রভুত্ব লোপ পেয়েছিল, এও ইতিহাস। ইংরেজের প্রথম আমলে হিন্দুরাই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক সুখ সম্ভোগ করায়ত্ত করেছিল ; অনগ্রসর মুসলমান সকল রকমে পিছনে পড়ে গিয়েছিল। হিন্দুর ক্রমোন্নতিতে, রাজদ্বারে মান মর্য্যাদায় ও প্রতিপত্তিতে মুসলমানের চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। কালক্রমে মুসলমানের মনে ক্ষোভ জন্মেছিল যে হিন্দু তার অগ্রগতি ও উন্নতির পথে বিষম বাধা, গুরুতর অন্তরায়। ১৯৩৭ সালের পর আইন সভায় সংখ্যাতত্ত্বের সুবিধা পাওয়ার পর থেকে মুসলমান তার পথের 'কণ্টক' দূর করবার জন্যে সকল উপায় অবলম্বনে প্রাণপণ যত্ন সুরু করে দিয়েছিলো। যে যে প্রদেশে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মুসলমানের হাতে এসেছিল, সেখানে যেন তেন প্রকারেণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় তারা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো। মুসলমান শাসক জাতি, সুতরাং শাসন করবার, প্রাধান্য করবার, প্রভুত্ব করবার একমাত্র অধিকার তারই, এই মিথ্যা মোহ মুসলমানকে দুর্ব্বার ক'রে তুললো।

হিন্দুর পক্ষে এটা মেনে নেওয়া খুব সহজ ছিল না। শিক্ষায় দীক্ষায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল বিষয়েই উন্নত হওয়া সত্ত্বেও শাসক শক্তির চাপে ক্রমশঃই তাকে স্থানচ্যুত হ'তে হয়েছিল। শাসন ক্ষমতা মুস্লিম লীগের করগত। লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্ব্বতোভাবে মুসলমানের প্রভাব বিস্তারের ফলে, হিন্দুর উন্নতির সমস্ত পথ রুদ্ধ হ'তে দেখে হিন্দুও অন্তরে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। মুসলমানের প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপ, হিন্দু সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। বাধা দেবার শক্তি হিন্দুর হাতে নেই, কারণ বঙ্গদেশের রাষ্ট্রশক্তি লীগের হাতে। অসহায় বোধে হিন্দু নিঃশব্দ আর্ত্তনাদ করতে লাগলো। এই নীরব আর্ত্তনাদও মুসলমান প্রীতির চক্ষুতে সুনজরে বা ভাল মনে নিতে পারে নি। তারও সন্দেহ, তার উন্নতিতে হিন্দুর গাত্রদাহ। হিন্দুর প্রতি কার্য্যে মুসলমানের সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। উভয়পক্ষের সন্দেহ ও অবিশ্বাস, হিংসা প্রবল বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত মহামারীর বীভৎস আকার ধারণ করেছিল।

একদিকে শাসক-সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে, অন্যদিকে হিন্দু তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে প্রাণপণ আগ্রহে মুসলিম লীগকে বাধা দিতে চেষ্টা ক'রে হতাশ হচ্ছে—হতাশার পর হতাশা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌ছে—এ রকম অবস্থার মধ্যে দেশ বিভাগ হওয়া ছাড়া অন্য কি উপায়ই বা ছিল ? দেশব্যাপী অশুভের মধ্যে ঐটুকুই বোধ হয় শুভ ব'লে মেনে নিতে পারা যায়। প্রলয় ও ধ্বংসের কবল থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা ব'লে স্বীকার করতে দ্বিধা হয় না।

তবে তা'ও বলি, এই বিভাগকে আমি সাময়িক ও অস্থায়ী বিভাগ বলেই মনে করি। একটি দেশের মধ্যে এই যে অস্বাভাবিক ভাগ, প্রকৃতি যাদের মধ্যে কোন ভেদ রেখা টানেন নি, একটা পাহাড় নেই, একটা বড় নদ-নদীও নেই, যাদের ভাষা এক, খাদ্য এক, অশন-বসন অন্যান্য স্বভাব সমস্তই এক, তাদের মধ্যে এই বিভাগ, দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। মুসলমান তার নিজ স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বেচ্ছামত, নিরঙ্কুশ আত্ম সম্প্রসারণ করুক, আত্মোন্নতি হোক্, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিপূর্ণতা লাভ করুক এবং প্রত্যেকটি মুসলমানের আত্মোপলব্ধি হোক্, পুনর্মিলনের প্রেরণা তার আত্মা—সেই ব্যক্তিগত মানুষটিকেই উদ্বুদ্ধ করবে, এতে আমার একটুও সংশয় নেই। একে আমি অবধারিত ব'লে মনে করি।

এ কথা হিন্দুর সম্বন্ধেও বলতে পারা যায়। হিন্দু তার নিজস্ব রাষ্ট্রে, মুসলমানের প্রভাবমুক্ত হ'য়ে, বাধাহীন বিঘ্ন-বিহীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশের যে সুযোগ পেয়েছে, তাতে তার সীমারেখায় উপস্থিত হ'য়ে হিন্দুও যে পুনর্মিলনে আগ্রহান্বিত হবে, এতেও আমার সন্দেহ নেই। আত্মোপলব্ধি ঘটবামাত্র এই মিলন অনিবার্য্য।

যখন একের প্রতি অন্যের সন্দেহের অবসর থাকবে না, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত বা আক্রান্ত হবারও আর আশঙ্কা থাকবে না, একে অপরের উন্নতির হন্তারক নয় এই বোধ প্রত্যেকটি মানুষের, সেই ব্যক্তিটির অন্তরে যেদিন জাগ্রত হবে, সেদিন, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে, সম্মান করতে পারবে এবং সেদিন মিলনও অবশ্যম্ভাবী হবে। পৃথিবীর সম্বন্ধেও

এই কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারা যায়। আত্মোপলব্ধির ফলে, আজকের এই অবহেলিত অবজ্ঞাত অথবা মুগ্ধ মানুষটি যেদিন জাতিবর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে পারবে, সেইদিনই পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা দূর হ'বে এবং বহুধা বিস্তারিত বিপুল বিশ্বও এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক সংসারের রূপ ধারণ করবে। আধুনিক বিশ্বে মানুষই আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্ব-সংসার রচনা করবে।

মহাত্মা গান্ধী আদর্শহীন আধুনিক ও বিপর্য্যস্ত বিশ্বে বিভ্রান্ত মানুষের একমাত্র পথপ্রদর্শক। ব্যক্তিগত মানুষটির উন্নতি ও বিকাশের পথকেই তিনি বিশ্বের উন্নতি ও চিরস্থায়ী শান্তির পথ ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন। তাই, ভারতের প্রাচীন কবির মত মহাত্মার কণ্ঠেও বিশ্ব অবিরত শুনছে—

"শুনহে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

শুধু একটী শাড়ির আঁচল

শ্রীনরেন্দ্র দে

দুপুরের আগেই সব গোছগাছ হয়ে গেল। কুলিটাকে বিদায় দিয়ে ঘরে ঢোকার সময় সুধীরের চোখে পড়লো একখানি অপসৃয়মান শাড়ি। মেয়েটা এতক্ষণ কৌতূহলে নবাগতদের দিকে লক্ষ্য করছিল, সুধীরকে আসতে দেখে ছুটে পালিয়ে গেল ওপাশে।

ছোট দুখানি ঘর, অল্প বারান্দা, এতটুকু রান্নাঘর—দুটী প্রাণীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত। অন্তত পূর্বের চেয়ে ঢের ভালো। নোতুন ভাড়াটা বাদ দিলে মাইনেটা অল্পই দাঁড়ায়, তবু আগের সেই অন্ধকার ছাদ-নীচু পায়রার খোপের চাইতে এ যেন স্বর্গ। লাবণ্য এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

আগের বাড়ীটায় ছিল অসংখ্য ভাড়াটে এবং অসহ্য কলরব। জলের জায়গাটা নিয়ে প্রত্যহ গোলমাল করা লোকগুলির অত্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। লাবণ্য কোনো দিনই তাদের সঙ্গে পেরে উঠতো না এবং সকালের সেই ছোট তুচ্ছ কলহ সমস্ত দিনের মত তার মনটাকে বিরস করে রাখতো। নোতুন এ বাড়ীটায় ওদের নিয়ে মাত্র দুঘর ভাড়াটে, লাবণ্য এরি মধ্যে দেখে নিয়েছে ওদিককার ভাড়াটেরা সম্ভ্রান্তই, সুতরাং নিরিবিলি বাস করা চলতে পারে।

বাড়ীর সামনেই পার্ক। বিকালে সুধীর পার্কে বেড়ানোর বিলাসিতা দমন করতে পারলো না। দুপুর থেকেই পার্কটা তাকে বিশ্বয়করভাবে আকর্ষণ করছিল, সুধীরের অদ্ভুত বোধ হয়। এর আগে কত সে পার্কে বেড়িয়েছে, চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে সঙ্গীদের সাথে কত গল্প করেছে, কিন্তু আজকের পার্ক তার কাছে একটা রোমান্স, একটা মুক্তির আনন্দ, অসহ্য অন্ধকার থেকে যেন প্রশান্ত সূর্যের আলো। বারে বারে তার মনে পড়ছিল ছুটে পালিয়ে যাওয়া শাড়ির একটুকরো আঁচল।

সন্ধ্যের পর এসে ঘরে ঢুকলো সে। লাবণ্য চা করে বেলেছে ষ্টোভে। ওকে দিয়ে সেও এক পেয়ালা নিল। চা খেতে খেতে লাবণ্য বল্ল, ওদের সাথে আলাপ হোলো।

কথাটা শুনে সুধীর কি বলে জানবার আগ্রহে চুপ করে রইলো সে। সুধীর শুধু বল্ল, সুখবর। তোমার দিন কাটবে ভালো।

লাবণ্য বল্ল, ভালো লোক বলেই মনে হোলো ওদের। কর্তা-গিন্নী, ছেলে-বউ, আর আইবুড়ো মেয়ে অনুরাধা। মেয়েটা নাকি আই-এ পর্য্যন্ত পড়েছে। জানো, আমি বলেছি ওকে তোমার একটী বই দেবো, দিও একটা—

সুধীর অভাব ছিল, বই কিনে পড়ে নিতে বলো। বিলোবার জন্যে বই লেখা হয় না।

—তা হোক্, লাবণ্য ঝংকার দিয়ে উঠলো, কত বই তোমার বন্ধুরা নিয়ে যায়, আমি একটা চেয়েছি বলে খুব গায়ে লাগছে, ভারী স্বার্থপর তুমি।

পরের দিন লাবণ্য একখানি বই অনুরাধাকে উপহার দেয়। সুধীরের সম্মতির অপেক্ষা না করেই। সুধীর জানতে পেরে কিছু বলে না, কিন্তু বোঝা যায় সে অখুশি হয় নি। পরিচয়টা অন্তত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ওদের কাছে।

এই নিয়েই ওবাড়ীর কর্তার সংগে তার আলাপ। অন্নভোক বার্ধক্যে এসে পৌঁচেছেন, বসে বসে পেন্সন ভোগ করছেন। ছেলে চাকরী করে—তার উপার্জনটাই প্রধান ভরসা। সকাল বেলা বাজারটা কর্তাই করে আনেন, যে বাতিকটা অনেক বুড়োরই থাকে। দরজার কাছে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সুধীরের সংগে। দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অসুবিধে কিছু হচ্ছে না তো?

নিছক আলাপ জমাবার প্রচেষ্টা। লোকটীর তরফ থেকে প্রথম জিজ্ঞাসা পেয়ে সুধীর অবাক হোলো একটু, খুশিও হোলো। বল্ল, না, মন্দ কি?

—মন্দ কিছুই নয়, আমরা আছি আজ বিশ বছর এখানে এই বাড়ীতে। কত লোক এলো গ্যালো—আমরাও চাইছিলুম তোমাদের মত নিঝঞ্ঝাট লোক আসুক, তা ভালোই হোলো, কি বলো?

সুধীর বল্ল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আর কি বলবে ভেবে পেলো না সে।

—তুমি বুঝি বই লিখেছো, দেখছিলাম, বেশ বেশ—

সুধীরের অস্বস্তি দেখে তিনি আর আটক রাখলেন না ওকে। এগিয়ে গেলেন ভেতরের দিকে।

খাবার সময় লাবণ্য ওদের কথা ছাড়া আর কোনো আলোচনা খুঁজে পেল না। তোমার বই দেখে ওরা সুখ্যাতি করছিল, জানো? বই পড়ার চর্চাটা ওদের আছে, লাইব্রেরী থেকে কর্তার জন্যে বই আসে। অনুরাধাও নাকি খুব বই পড়ে।

সুধীর জিজ্ঞাসা করলো, অনুরাধার সংগে বুঝি তোমার খুব ভাব হয়েছে?

লাবণ্য বল্ল, হ্যাঁ, বেশ মেয়েটী, খুব মিশুক। ওর বউদিটার একটু গুমোর যেন, রংটা কটা কিনা—

সুধীর বল্লে, বউদির কথা থাক, আমার বই সম্বন্ধে কি বল্লে ওরা?

—এমনি নাড়াচাড়া করতে করতে ভালো বলছিল, কর্তা আজ পড়বে।

কর্তা! সুধীর চুপ করে রইলো, অনুরাধা বইটা দেখে কি বলেছে জানবার উগ্র কামনাকে কিছুতেই সে প্রকাশ করতে পারলো না, লাবণ্য নয় তো অন্যভাবে নেবে।

লাবণ্য নিজেই বল্ল সেকথা। অনুরাধা বলছিলো—গল্পটা নাকি সেই পুরোণো চিরন্তনী।

সুধীরের মুখটা নিমেষে ম্লান হয়ে এলো। সে ভাবছিল অনুরাধা হয়তো তার উপন্যাসের গল্পের প্রশংসা করবে, তার ভাষা ওকে মুগ্ধ করবে, তার বলার ভংগীতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে আই-এ পড়া অনুরাধার মতামতের মূল্য তার কাছে অনেকখানি হয়ে উঠেছে সুধীর তা বুঝতে পারে না। অনুরাধার অভিমত শুনে সুধীর অত্যন্ত আহত বোধ করতে লাগলো, সকালে বুড়ো কর্তা তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা বলেছিলেন, সুধীরের মনে হতে লাগলো সেগুলি মূল্যহীন, শূন্যগর্ভ।

অনুরাধাকে সে চোখে দেখে নি, শুধু সেই শাড়ির চকলা টুকরোর মধ্যে সুধীরের কাছে সে উচ্চারিত হয়ে আছে। লাবণ্যর কথা থেকে অনুরাধাকে সে নিজে রচনা করে নিয়েছে, অনুরাধা যেন প্রথম বসন্ত দিনের উৎফুল্ল হাওয়া, এই বাড়ীটার সবটুকু আয়তনে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই প্রথম পদার্পণের পর থেকে তার চেতনার মর্মমূলে যে দোলা তাকে সমস্তক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আজ সারাদিন অনুরাধার ওই একটী অভিমত তাকে তেমনি আহত করতে লাগলো। সুধীরের মনে হতে লাগলো—তার সবটুকু সাফল্য যেন ওরই ওপর নির্ভর করছে।

বিকালে চুপ করে বসেছিল সুধীর। লাবণ্য অনুরাধাদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে গেছে। একটু পরেই সে এলো, হাতে তার একটী মাসিক পত্রিকা। লাবণ্য বল্ল, অনুরাধার গল্প বেরিয়েছে এখানে, এই ছাখো।

সুধীরের হাতে পত্রিকাটী দিল লাবণ্য। সুধীর দেখলো—অনুরাধার নামে একটী কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সুধীর দেখলো অনুরাধা শুধু শিক্ষিতা নয়, রসিকাও। সুধীরের মনের কোণে অনুরাধার কবিতা সাড়া জাগালো। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্যই। তার কেবলি মনে হতে লাগলো, অনুরাধা তার উপন্যাসের প্রশংসা করে নি।

লাবণ্য বল্লে, তোমাকে পড়তে দিয়েছে, মতামত চায়

সুধীর নিস্পৃহ স্বরে বলে, এখন কি ভালো, আধুনিকদের অনুকরণটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

—তাই হবে, লাবণ্য উৎসাহভরে বলে—তোমার বই সম্বন্ধে কি বলেছে জানো?

সুধীরের উৎসুক দৃষ্টির অভাব দিয়ে লাবণ্য বলতে লাগলো, বইটা সব পড়েছে ও। বলে, প্লটটা খুব উঁচু, আদর্শটা মহান, আরো কি ইংরাজীতে বলে বুঝতে পারলাম না বাপু। হ্যাঁগা, অনুরাধার পদ্য ভালো হয় নি?

সুধীর ঢোঁক গিলে অভাব দিল, মন্দ নয়, কয়েক জায়গায় বেশ চমৎকারই।

সুধীরের হাত থেকে পত্রিকাটী নিয়ে লাবণ্য চলে গেল। সময় অনেকটা এগিয়ে গেছে। পশ্চিম দিকের আকাশ দিয়ে গোধূলির রং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, ওই রং ছড়িয়ে পড়তে লাগলো আকাশের বুকে, মুহূর্তের মনে, আর সুধীরের ছোট্ট ফ্ল্যাটের কোণে কোণে। ওই রং-এর নেশা তাকে পাগল করে তুলো, খাতা-কলম নিয়ে লিখতে বসলো সে। তার দ্বিতীয় উপন্যাসের শেষের অধ্যায়গুলো আজ শেষ করে ফেলতে হবে।

লাবণ্য সুইচ টিপে আলো জ্বালালো। রাঁধতে শুরু করলো, ছায়ার শেষে ডাকলো, খাবে না?

আরো কিছুক্ষণ লেখার পর সুধীর খেয়ে নিল। আহারের পর আর সে লেখে না—তখন তার অধ্যয়নের অবকাশ। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে পড়ে। লাবণ্য পাঠরত সুধীরের মুখের পানে বহুক্ষণ ক্লান্তভাবে চেয়ে থাকার পর ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অনুরাধাদের ওদিক থেকে একটা অস্পষ্ট গোলমাল ভেসে এলো। সুধীর শুনতে পেলো—কে যেন আর্তিত কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে। অল্পক্ষণ পরেই পাওয়া গেল চাপা কান্নার শব্দ। তাড়াতাড়ি সে লাবণ্যকে জাগিয়ে দিল। লাবণ্য বলে, কর্তার ছেলে মদ খেয়ে বৌকে মারছে।

লাবণ্য আজই বিকালে অনুরাধার কাছে শুনেছিল তার দাদা মদ্যপ। অনুরাধা কথাটা ওকে জানিয়ে দিয়েছিল, কারণ সে জানতো ওটা গোপন থাকবে না। একদিন না একদিন—যেদিন দাদা মাতাল হয়ে বাড়ী ঢুকবে সেদিন ওরা জানতে পারবে। কথাটা লাবণ্য সুধীরকে জানায় নি তখন। সুধীরের ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হতে থাকলো, মধুর একটানা কান্নাটা রাত্রির নিঃশব্দ প্রহরে তাকে অত্যন্ত জ্বালা দিতে লাগলো। এক সময় সে অধীর হয়ে বল্ল, যাই ওদের ওখানে।

সদ্যোত্থিত সুধীরকে বাধা দিয়ে বিরক্ত লাবণ্য বলে, তুমি যাবে কি করতে? ওদের ওদের গা-সওয়া—কর্তা গিন্নী এখন মুখুজ্জে নাক ডাকিয়ে।

কিন্তু ব্যাপারটা ওদের অভ্যাসমত ওখানেই শেষ হোলো না, শোনা গেল অনুরাধার দাদার চাকরীটা গেছে। সমস্ত সপ্তাহ ধরে দিনরাত চেঁচামেচি চলতেই থাকলো অনুরাধাদের ফ্ল্যাটে। তার দাদার মাতলামি ও বউ ঠ্যাঙানোর পুনরাবৃত্তি, তার চাকরীহীন জীবনের দুরন্ত অসভ্যতা, ভবিষ্যৎ দিনগুলির সম্পর্কে দুঃসহ নিস্তব্ধতা, কর্তা-গিন্নীর অসহায় ভাব—সব মিলিয়ে অনুরাধাদের পরিবারের জীবনেতিহাসের এক জটিল পরিক্রমা শুরু হয়ে গেল। অনুরাধাদের ফ্ল্যাটে এ কদিন খুব কমই গেল লাবণ্য, কারণ বর্তমানে ওখানে যাওয়ার মানে ওদের দুঃখজনক পালা-অভিনয়ের নির্বাক দর্শকের অংশ গ্রহণ করা, যেটা কিছুদিনের সৌহার্দ্য-সম্পর্কের ফলেই দু পক্ষেরই অসহনীয়।

দুপুরে যে সময়টীতে তারা একদিন এ বাড়ীতে এসেছিল, কোনো একদিন ঠিক সেই সময়ে বিগত-মর্যাদা অল্প-পুঁজি পেলন-সখন ঘোষাল পরিবার দুর্মূল্য ফ্ল্যাট খালি করে দিয়ে চলে গেল। লাবণ্য নীচে নেমে এসেছিল শেষ দেখা করতে, সুধীর একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়েছিল ওদের দিকে। অনেকক্ষণ অবধি, যখন ওদের গাড়ী দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, তার মনের মধ্যে অনুরাধার শাড়ির অপ-সৃয়মান আঁচলটী ঝলমল করতে লাগলো মধ্যগগনের সূর্য-লোকের মত।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৮

প্রাবারে প্রজা ও আমি সংঘারামে উপনীত হইলাম। তখন আহ্নিক অনুষ্ঠান শেষ হইয়া ধর্মকথন আরম্ভ হইয়াছে। অর্হতপাদ আর্য্য মহাসুবির তখন সমবেত শ্রবণ, ভিক্ষু, গৃহপতি(১), উপাসক ও উপাসিকা-গণকে তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধের উচ্চারিত অমিয় সত্য(২) ও উদান(৩) ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা একান্তে বসিয়া অর্হতপাদের মুখনিসৃত ধর্মোপদেশ বা বৌদ্ধধর্মের সারমর্মসমূহ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। দান, শীল, চর্য্যা ও বিনয় সাধন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম; আর পরিশেষে, ধর্মকথনের উপসংহার শুনিলাম, তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধের করুণার কথা। যে করুণা নির্বাণের বিগলিত ধারায় জগৎ প্লাবিত করিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ও তৃষ্ণা(৪)র কঠিনোপল চটভূমি ক্ষয় পূর্বক প্রবাহিত হইয়াছে—সেই করুণার কথা ও তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমার তখন প্রাণের মধ্যে একটা স্থিতিক্ষোভ উপস্থিত হইল।—আমাদের জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য যতই মহৎ বলিয়া আমরা জ্ঞান করিনা কেন, ক্ষমা ও করুণা তাহা হইতে অনেক উচ্চে।—আমাদের কর্মপন্থা হিংসামূলক ও তৃষ্ণা নিষ্ঠিই এবং নিদানের(৫) পথ হইতে বহুদূর বিসর্পিত। একটা অধিক চাঞ্চল্য আমাকে অভিভূত করিল। আমাদের কর্তব্য ও উদ্দেশ্যের হীনতার উপলব্ধি যেন নিমেষের জন্য আমার প্রাণের পার অন্ধকারে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের উপলব্ধিমাত্র। তখন একবার মনে হইল যে, সব পরিত্যাগ পূর্বক পীতবাস ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া পরজ্যা(৬) অবলম্বন পরম শ্রেয়ঃ।—মনে হইল, আমিও এই সকল মিথ্যা ও বৃথা অনুষ্ঠান হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধের অমৃতী নির্দেশের দিকে অগ্রসর হই! জীবনের ক্ষুধা ও হীন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার পাবক নির্বাপিত হউক! সকল বেদনার অবসানের সঙ্গে তন্দ্রায় যাই আলা জুড়াইয়া যাউক! নিমেষের জন্য বর্তমান জগতের অনুভূতি আমার মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইল—সংঘমিশ্রিত আমাদের কর্তব্য কর্মকলাপের জন্য ঘৃণিবোধ। একটা অবসাদের ছায়া নিমেষে গগনে তাপহর বাষ্পবিতাড়িত মেঘের মত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল। আপনাকে ও জগৎকে, স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সেই সমবেত শ্রবণ, ভিক্ষু ও অপর উপাসক ও উপাসিকা মণ্ডলীর সহিত বলিয়া উঠিলাম "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি"।

ধর্মশ্রবণান্তে যখন শ্রোতৃমণ্ডলী একে একে সকলে অর্হতপাদ মহাসুবিরের পাদ বন্দনা পূর্বক মণ্ডপ পরিত্যাগ করিল, আমি তখন ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইলাম। আমাদিগের এই বর্তমান কর্মপন্থা যে একটা অবসান, আপনার নির্বাণ-মুক্তিকে দূর পরিহার করিয়া আর্তের ত্রাণ সাধন যে মহান্ ও অনন্যসাধারণ ত্যাগধর্ম, এবং তাহা যে মানবের ক্ষুদ্রত্বকে লুপ্ত করিয়া দিয়া তাহাকে একটা বিরাট মহত্ত্বের দিকে নীত করে—সেই উপলব্ধি, যাহা ক্ষণিকের জন্য আমার প্রাণের মধ্যে সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা পুনরায় সচেতন হইল।—হৃদয় মেঘমুক্ত হইল,—নিমেষের অবসাদ অপসৃত হইল,—আমার স্বনির্বাচিত কর্মপন্থা যে শ্রেষ্ঠ,—আমার গৃহীত ব্রত পালন যে আমার জীবনের একমাত্র ধর্ম—সে বিষয়ে আর আমার কোনও সন্দেহ রহিল না।

আর্য মহাসুবির আমাদিগকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। আমরা তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম। এমন সময়ে দেখি, কীর্তি-বর্মন্, সুকৃতি বর্মন্ ও পুষ্টপাল আসিল। আমরা মহাসুবিরের সহিত চৈত্য গৃহের গর্ভাগারে গমন করিলাম। আমরা সকলে সেখানে উপবেশন করিলে আমি বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সকল বিষয় বিশদভাবে সঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। মহাসুবির স্থিরচিত্তে আমার সকল কথা শুনিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আমাদের কার্য সাগ্রহে ও তৎপরতার সহিত আরম্ভ হইবার সময় যে আসিয়াছে তাহা আমিও উপলব্ধি করিতেছি। এখন কোন পথে এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসর হইব তাহার একটা

---

(১) গৃহপতি বা বৌদ্ধ গৃহস্থ—গহপতি। সংস্কৃত "গৃহপতি"র পালি প্রতিশব্দ ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বহুল-ব্যবহৃত।

(২) আর্য সত্যাঃ, অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের সার বা মূল সত্য।

(৩) বুদ্ধের কথিত উপদেশ।

(৪) সংস্কৃত তৃষ্ণা অর্থাৎ কামনা।

(৫) বৌদ্ধ ধর্মানুযায়ী নির্বাণ মোক্ষ। নির্বাণের পালি প্রতিশব্দ নিব্বান।

(৬) বৌদ্ধ মতানুযায়ী সন্ন্যাস।

নির্দ্দেশ আবশ্যক। আমাদের কর্ম্মসূচনা কিরূপ হইবে তাহা তোমরা বিবেচনা কর।"

আমি বলিলাম, "এই সুদূর পল্লীতে থাকিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতির সম্যক্ জ্ঞান হওয়া ও সর্ব্ববিষয়ে সংবাদ রাখা এবং তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান একপ্রকার অসম্ভব। এখন আমাদের মধ্যে সমধিক কর্ম্মকুশল কাহারও রাজধানীতে কিম্বা কলিকাতায় অবস্থানপূর্ব্বক আমাদের কার্য্য পদ্ধতির সকল দিক বিচার করিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

মহাপুরুষ বলিলেন, "ত্রাণসংঘের কোনও কর্ম্মকুশল অধিনায়ক এই সময়ে রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদের গৃহীত ব্রত অনুষ্ঠানের পথে অনেকটা অগ্রসারিত করিতে পারিত।"

শেখর বলিল, "আমরা সেইরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ ও উপদেশের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি এবং এই সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছে।"

মহাপুরুষ বলিলেন, "সে ত একপ্রকার স্থিরই হইয়া আছে, তাহার জন্য নূতন করিয়া পরামর্শ করিবার আবশ্যক আছে কি?—আমার ত তাহা মনে হয় না।—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ব্বে তোমাদের কাহারও পুরুষপুর ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না, এইরূপ ত আমার মনে হয়।"

প্রজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিল, "আরও একটু সত্বর হইলে ভাল হয় না কি? ইতিমধ্যে আমাদের সংঘের কার্য্য কি কতকটা অগ্রসর হইতে পারিত না?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "হয়ত পারিত, কিন্তু আমার বিলম্ব করিতে বলার কারণ আছে। পুরুষপুর নগরে ক্ষত্রপপ্রমুখ সকল রাজনিক শাসক কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে সকলেই অযবন পল্লীবাসীদিগকে অত্যন্ত সন্দেহের সহিত ও সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিতেছে। পল্লীবাসীগণের কোনও কার্য্যই যাহাতে তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে না পারে তাহার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহা ত আমরা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি—পূর্ব্বেও তাহারা এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছিল—এখনও সে ব্যবস্থা একটু প্রাবল্যলাভ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু আমাদের সংঘও তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে।"

মহাপুরুষ বলিলেন, "যবনের চারগণ সমগ্র পল্লীতে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের আরও সতর্ক হইতে হইবে। আমাদের অদেশবাসী ও স্বজাতীয় অনেক যবনের চাররূপে আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছে—বিপদ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে।"

সুকৃতি বর্দ্ধন ইহাতে বলিল, "ইহাত নূতন বিপৎপাত নহে, আর তজ্জন্য আমরাও ত যথেষ্ট সতর্কতার সহিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। একটা অনাগত ত্রাসের জন্য একটা ভবিষ্যৎ আতঙ্কের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান সুযোগ উপেক্ষা করা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে।"

তদুত্তরে আর্য্য মহাপুরুষ বলিলেন, "সুযোগ আসিয়াছে, সত্য,—এবং এ সুযোগ ক্ষণিক নহে। ইহা এখনও অনেকদিন থাকিবে। আমাদের বর্ত্তমান সতর্কতা যবনের কার্য্যতৎপরতার অনুপাতে যথেষ্ট কিনা তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর আমার সে সন্দেহের কারণও হয় ত নিতান্ত অমূলক নহে।"

আমি বলিলাম, "হয়ত, এ সুযোগ কিছুদিন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা যে অবস্থান্তরে ও ঘটনার সমাবেশে শীঘ্রই নষ্ট হইতে না পারে, তাহাও ত আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।—আমার মনে হয় যে আমরা কাল্পনিক আতঙ্ক ও সন্দেহের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করিতেছি।"

মহাপুরুষ বলিলেন, "না, ইহা কাল্পনিক আতঙ্ক নহে। অযবন পল্লীবাসীর বিশেষতঃ পুরুষপুরবাসীদিগের—গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য বহুসংখ্যক চারগণ নিযুক্ত হইয়াছে এবং নিযুক্ত চারগণ কেবল যবন নহে, তাহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের স্বদেশবাসীও আছে এবং আমাদের স্বদেশবাসী এই চারগণই সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগকুশল ও কর্ম্মতৎপর। তাহারা যে আমাদের দেশের অবস্থা ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদিগের বর্ত্তমান চিন্তাধারা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে—এবং সে কারণ একেবারে আনুমানিক বলা চলে না। হয় ত আমাদের সংঘের কর্ম্মানুষ্ঠান এই হীন বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদিগের মধ্যে কাহারও চেতনদৃষ্টি ইতিপূর্ব্বেই আকর্ষণ করিয়া থাকিবে—কে জানে?"

পৃষ্ঠপাল বলিল, "এতদিন ত্রাণসংঘ সাবধানে আপনার কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, বিশেষ বিপদে ত এপর্য্যন্ত পড়ে নাই—সেইরূপ সতর্কতার সহিত এখনও তাহার কার্য্যনির্ব্বাহ করা যাইতে পারে না কি?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "কিন্তু, এখন—হয়ত, ইতিমধ্যেই, আমাদের ত্রাণসংঘের ন্যায় একটা কোনও সংঘ সংগঠনের অনুষ্ঠান কেহ কেহ করিয়াছে—এবং সেই অনুষ্ঠানের ফল দুইজন চারের মন মধ্যে আবির্ভাব ও আমাদের বাহিনীর নায়কের অনুসরণ।"

শেখর বলিল, "তাহারাই কেবল আমাদের সংগঠন সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছিল এবং আমাদের দুই-একটা অসতর্ক ও অসংযত কার্য্যে তাহাদের সন্দেহ প্রবুদ্ধ হইয়াছিল;—তাহাদের জীবনের সহিত তাহাদের তৈজসপত্র ও চিন্তাধারার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—অন্ততঃ সে দিক হইতে আমরা আপাততঃ, একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারি না কি?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "কতকটা বটে,—সম্পূর্ণ নহে।—কে বলিতে পারে যে তাহাদের অন্তর্ধানে বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহারা তাহাদের অনুমান ও অনুসন্ধানের বিষয় আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার অবসর পায় নাই?—কে জানে যে কোনও উপযুক্তর চার তাহাদের দ্বারা অভিমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের উত্তরসাধকরূপে বর্ত্তিত চারদ্বয়ের পন্থা অনুসরণ করিতেছে না?—কে জানে যে এখন—যে সময়ে

আমরা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত মনে করিতেছি—ঠিক এই সময়েই যে কেহ আমাদিগের উপর তাহার দুষ্টীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি কোনও অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘ কালের জন্য আমাদের সংঘের কার্য্য স্থগিত রাখা সঙ্গত বলিয়া আপনার মনে হয়?"

মহাস্থবির বলিলেন, "না আমি তাহা মনে করি না। তবে এত সন্দেহ ও বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে এরূপ চিন্তাহীনভাবে উৎপন্ন হইয়া কাজ নাই—আমি এইরূপ মনে করি। ইতি পূর্ব্বেই আমরা স্থির করিয়াছি যে আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় আমাদের অভিযান আরম্ভ হইবে—তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কোনও অভিনব কারণের উদয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই ত।"

আমরা সকলে মহাস্থবিরের কথা প্রণিধানপূর্ব্বক কণকাল মৌন রহিলাম।

মহাস্থবির আরও বলিলেন, "আমাদের অভিযান আরম্ভের সহিত আবশ্যক ও সুযোগ বুঝিয়া বিভিন্ন স্থানে আমাদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপনে লক্ষ্য হইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আমাদিগকে এখন হইতেই আয়োজন করিতে ও তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে না কি? পথের আলেখ্য এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। কোন পথে যাইতে হইবে, কোথায় অবস্থান করিতে হইবে, সেই সকল স্থানীয় কোন কোন লোকের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, আমাদিগকে প্রভাবিত করিয়া আমাদের ব্রত কিরূপে উদ্‌যাপনে পথে অগ্রসারিত করিতে হইবে এবং তথায় আমাদের সাধকগণ কিরূপে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার একটা আনুষ্ঠানিক নির্দ্দেশেরও ত প্রয়োজন? আমার মনে হয় এই সকল ব্যাপার আমরা যত সত্বর সম্পাদনে সক্ষম হইব, ততই আমরা আমাদের সঙ্ঘ ও সাধনার দিগ্বিজয় সম্বন্ধে কতকটা আশান্বিত হইতে পারিব। এই সম্বন্ধে অন্ততঃ কয়েকটা সুনির্দ্দিষ্ট উপদেশের আদান-প্রদানের যে আবশ্যক তাহা আমরা অদ্য অনুভব করিতেছি।"

মহাস্থবির আমার সহিত একমত হইলেন ও এই সকল বিষয়ের একটা দিবস ও বিস্তারিত সূচী প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে, এই কার্য্য ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

মহাস্থবির আপণদের প্রচার ও প্রসারকল্পে যে সকল পথের আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বা করিতেছেন সে সকল তিনি অদ্য সন্ধ্যায় পরামর্শ সভায় উপস্থাপিত করিলেন। আর্য্যমহাস্থবির যে আমাদের সংঘের প্রাণ এবং সংঘের সাফল্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন তাহা আমরা সকলেই সম্যক্ প্রণিধান করিলাম।

তিনি বলিলেন "এখনও পর্ব্বতের তুষাররাশি গলে নাই, স্থানে স্থানে দুর্হিন প্রপাতে গিরিপথ অবরুদ্ধ, গিরিপথ সমূহ এখনও অত্যন্ত দুর্গম ও কোনও কোনও স্থল মানবের অগম্য। সার্থবাহদিগের এখনও অভিযান আরম্ভ হয় নাই—তাহা আরম্ভ হইতে অনেক বিলম্ব আছে। বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহগণ বৈশাখী পূর্ণিমাই পবিত্র ও প্রশস্ত দিবস বলিয়া ঐদিন বাণিজ্যে যাত্রা করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিলে পথের কষ্ট অনেকটা লাঘব হইবে এবং তাহারা সুগম গিরিপথ ও পার্ব্বত্য নানুষের সহিত গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহার পর বৈশাখী পূর্ণিমায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করিলে কেহ বিশেষ সন্দেহ করিবে না। তোমরা বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী—পুরুষানুক্রমে পণ্য সম্ভার লইয়া বিদেশে যাতায়াত করিতেছ।—গতবৎসর আর্য্য অবলোকিত ও আর্যপালক আমার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন—প্রজ্ঞা, তুমিও তোমার পিতার সহিত ছিলে।—বোধ হয় চারণগণ তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আর এখন তত কৌতূহলী হইবার কারণ পাইবে না।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে, অদ্য এই সান্ধ্য সভায় যাত্রার সকল বিষয় স্থির হইয়া যাউক। অন্ততঃ বৈশাখী পূর্ণিমায় যাহারা বাহির হইবে তাহাদের যাত্রার সম্বন্ধে সকল বিষয় অদ্য স্থির হইয়া যাওয়া প্রয়োজন।"

"—তাহার ত অনেক বিলম্ব আছে। এখন অত ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। ইহার মধ্যে অনেক ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে যাহাতে আমাদের নির্দ্ধারিত ও নির্দ্দিষ্ট সাধনার পথে কোনও অভিনব বিঘ্নের উদ্ভবে হয়ত আমাদের বর্ত্তমান নির্দ্দেশের সমগ্র পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইবে। হয়ত সকল বাধাবিপত্তি নিরাকরণের জন্য আমাদিগকে কোনও এক নূতন পথ ধরিয়া চলিতে হইবে।—কে জানে?"

অদ্য সন্ধ্যার পরামর্শ সভায় স্থির হইয়া গেল যে সর্ব্বপ্রথম প্রজ্ঞা ও আমি উত্তরে কপিশা হইয়া বাহ্লিকাভিমুখে অগ্রসর হইব। আমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মূল্যবান্ পণ্যসম্ভারও থাকিবে। পথে, কিংবা বাহ্লিকের পণ্যবীথিতে, ঐসকল পণ্যের বিক্রয় বা বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা আর অগ্রসর না হইয়া বাহ্লিক নগরীতেই অবস্থান করিব এবং তথায় আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমরা বাহ্লিক ভবন নামগ্রহণ করিব ও ভবন নামে পরিচিত থাকিব।

আমি বলিলাম, "আমরা পুরুষপুরবাসী। পুরুষপুরে যদি অনুসন্ধান হয় তাহা হইলে আমরা যে ভবন মধ্যে এবং আমাদের গৃহীত নাম যে সত্য নহে তাহা ত তখনই প্রমাণিত হইবে।"

মহাস্থবির বলিলেন, "অনুসন্ধান যাহাতে না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করিয়া দিব। বাহ্লিক সম্রাট সাম্রাজ্যের মহাধাত্য ট্রাটেগস ঐক্ষ্ বা রাজনিক পক্ষ, ইহার অর্থ সেনাপতি বা রণনায়ক; কিলোট্রাটস্ যবন হইলেও বৌদ্ধ ও আমার অত্যন্ত পরিচিত এবং আমাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত আমার সতত পত্র ব্যবহার হইয়া থাকে; গতকল্য তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার বার্ত্তাবহ একখানি পত্র লইয়া আমার নিকট আসিয়াছে। ঐ পত্রের উত্তর লইয়া আগামীকল্য শ্রেষ্ঠিক ব্যক্তি বাহ্লিক প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে পুরুষপুর ত্যাগ করিবে। সে রাষ্ট্রের কোনও বিশেষ সংবাদ লইয়া ক্ষত্রপের নিকট আসিয়াছে। ক্ষত্রপের সহিত তাহার কার্য্যসম্বন্ধ করিয়া বাহ্লিকের সংবাদাদি আমার সহিত

দেখা করিবে ও মহামাত্যের প্রেরিত পত্রের উত্তর লইয়া যাইবে। আমার পত্রে তোমাদের নূতন রাজনিক পরিচয় প্রদান করিব এবং লিখিব যে তোমরা পুরুষপুরবাসী বৌদ্ধ যবন এবং পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্ব-ভাবে আমার পরিচিত।—তোমাদের সম্বন্ধে এখানে আর কোনও অনুসন্ধান হইবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পথাবিদ্রয় লভ্য অর্থ লইয়া কি করিব? দলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কি পুরুষপুরে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব?"

—না, উহা তোমার নিকট রাখিয়া দিবে এবং আবশ্যক হইলে উহা ব্যয় করিতে পারিবে। সেখানে থাকিয়া অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইবে না বা অযথা কৃপণতা করিবে না। ব্যয় যাহাতে হয় তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু মনে রাখিবে যে রাজিকের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট সম্মান অর্জ্জন এবং প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত নিবিড়ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন তোমাদের প্রধান লক্ষ্য হইবে।

—আমাদের সহিত জনকয়েক অনুচর ও ভৃত্য লইয়াও যাইতে হইবে।

—তাহাত লইয়া যাইবেই।—তবে যাহাদিগকে লইয়া যাইবে তাহারা যেন বিশ্বস্ত হয়। আমি মনে করি যে যাহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার এরূপ একজনকে লইয়া যাওয়া উচিত, অধিক অনুচর বা ভৃত্য সঙ্গে লইও না।

—অভিযানের ও রাজিকে অবস্থানের ব্যয় সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে?

—তোমাদের অভিযানের ও রাজিক অবস্থানের জন্য তোমাদের উভয়কে পঞ্চবিংশতি সহস্র করিয়া সুবর্ণ দিনার এবং ভৃত্য ও অনুচর-গণের ভরণ পোষণ ও অপরাপর আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহনের জন্য আরও পঞ্চসহস্র করিয়া দশসহস্র সুবর্ণ দিনার তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। সঙ্ঘের সঞ্চিত কোষ হইতে এই অর্থ রাজিত হইবে। যাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বাহ্নে তোমাদের হস্তে উহা অর্পিত হইবে।

—আপনার উপদেশ ও সঙ্ঘের নির্দ্দেশ আমরা প্রাণপাত করিয়াও বর্ণে বর্ণে পালন করিব। অপর অভিযানের ব্যবস্থাও কি অদ্য স্থির হইয়া যাইবে?

—না—অদ্য অভিযানের বিষয় বিচারের সময় এখনও আসে নাই, সময় আসিলেই অদ্য অভিপ্রায়ের বিষয় বিবেচিত হইবে। এখনও সকল প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগৃহীত হয় নাই। তোমরাও ত তাহা জান?

—সঙ্ঘের কার্য্যাদি পরিচালিত হইবার জন্য নূতন ব্যবস্থারও আবশ্যক। তাহাও এই পরামর্শ সভায় নির্দ্দিষ্ট ভাবে স্থির হইয়া যাওয়া ভাল নয় কি?

—তোমার রাজিকে অবস্থানকালে এখানে সর্ব্বাধিনায়কের কার্য্য সেবয় পরিচালন করিবে এবং সুকৃতি বর্দ্ধন অধিনায়ক হইবে ও দুই-জন সাধারণ সদস্যকে নায়কের পদে উন্নীত করিতে হইবে। সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন তাহাদের দুইজনকে নায়কের পদে উন্নীত করা হইবে। কেমন, তোমরা সকলেই আমার সহিত একমত ত? যদি কাহারও অন্যমত থাকে ত বল, তাহা অদ্যকার সভায় বিবেচিত হউক।

আমরা সকলেই আর্য্যমহাস্থবিরের এই সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিলাম এবং অদ্য এই সান্ধ্য পরামর্শ সভায় তাঁহার প্রস্তাবসমূহ আমাদের বর্ত্তমান সকল সমস্যার সমীচীন সমাধান বলিয়া গৃহীত হইল।

আমাদের সভাকার্য্য আজকার মত শেষ হইল। আমরা আর্য্য মহাস্থবিরের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সঙ্ঘারাম হইতে নির্গত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

রসিকমোহন

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন

আমরা বাঙ্গালী নানাকারণে বঞ্চাযুঃ। আমরা যখন শুনি যে আমাদের মাঝে এমন লোক রয়েছেন যিনি সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে একশ' বছর কাটিয়ে দিলেন তখন তাঁকে দেখবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু এমন দীর্ঘজীবী পুরুষ যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরও হ'ন, শতাধিক বর্ষ পার হবার পরেও যদি তাঁর স্মৃতি ও মেধা অক্ষুণ্ণ থাকে, অন্য যিনি নির্ব্বাক হয়েছেন আপনার দুর্ব্বহ সাধনবলে এমন যদি শুনি এবং চাক্ষুষ দেখি, তা হ'লে বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না।

এমনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর ২০, বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ তাঁর নিজভবনে বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যা ৭।০টার সময়ে সজ্ঞানে হরিনাম করতে করতে ১০৯ বছর বয়সে তিনি স্বধামপ্রাপ্ত হলেন। মর্ত্ত্যলীলার শেষদিনেও তিনি বেলা দুটো থেকে চারটা পর্য্যন্ত সহরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসুর সঙ্গে দুরূহ বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং জিজ্ঞাসু ভক্তের তৃপ্তি পূর্ণ করেন। ভাগবত শুনতে শুনতে এবং গৌরগোবিন্দ নাম করতে করতে আচার্য্যদেব হাসতে হাসতে চলে গেলেন!

শতাব্দীর সুদুর্লভ অভিজ্ঞতার এই ডাক্তারের জীবনকথাও অসাধারণ। বহুনাতিক্রান্ত লৌহাদুর্গি দ্বিতীয় এই মহামানব ছিলেন

একাধারে পাণ্ডিত্যের খনি, সিদ্ধসাধক ও আদর্শ বৈষ্ণব। তিনি ছিলেন যেন মূর্ত্তিমান্ ভক্তিতত্ত্ব। অসামান্য স্নেহ ও করুণা অজস্রধারায় তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে তারা—যারা তাঁর চরণপ্রান্তে এসেছে এবং বসেছে এবং বৈষ্ণবাচার্য্যের এমন কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের বা ছাত্রের সংখ্যা অগণিত। তবু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দীর্ঘকাল অবস্থান করা সত্ত্বেও অতি-নিকটের কত লোক তাঁকে পেতে ইচ্ছা থাকলেও পেলে না, দেখতে ইচ্ছা থাকলেও দেখলে না। তাই আজ তাঁর বিরহে কত লোককে এই আক্ষেপ করতে শুনা যায়। গুণীর, জ্ঞানীর, ভক্তের এবং অলোক-সামান্য প্রতিভাবান্ মহাত্মাগণের জীবিতকালে আজও ঠিক মত সমাদর হয় না—হয়ত বা তাঁরা জানও না!

ভক্তের সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছেন—"শাস্ত্রে আছে, তীর্থদর্শন অপেক্ষা সাধু দর্শনের পুণ্য অধিক, ইহা যে কত সত্য

পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

তাহা সেইদিন বুঝিলাম।...বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী এই বাঙ্গালী মহাপুরুষ যে এখনও এমন উজ্জ্বল দেহ-কান্তি ধারণ করিয়া, আমাদের এ যুগের সকল আবিলতা ও কোলাহল হইতে দূরে জ্ঞান, ভক্তি ও বিদ্যাদের অটল মূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমি স্বপ্নেও আশঙ্কিত পারি নাই। ...সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের কত নব নব আন্দোলন—কত প্রতিভা ও মনীষার উদয় এবং অস্ত তিনি দেখিয়াছেন!—তাহাদের পরিণাম ও ফলাফলের বিচার তাঁহার মত আর কে করিতে পারিবে!...বাংলা দেশের ইহাই বোধ হয় শেষ, দীর্ঘ আয়ুর ও দীপ্ত প্রতিভার এমন সমাবেশ আর দেখা যাইবে না!" শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বলেছেন "দেবমূর্ত্তি"। সব চেয়ে বড় কথা—"গত অর্দ্ধশতাব্দী, অর্দ্ধশতাব্দীর পরে কিছু হবে, বাংলাদেশে যাঁরা বিশিষ্টরূপ লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই বিদ্যাভূষণের কাছে ঋণী, এ কথা মনে অত্যুক্তি হবে না।...ধনী, দরিদ্র তাঁর কাছে সমান আদৃত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত ও সাহিত্যিক সকলেই তাঁর অযাচিত দানের অধিকারী হয়েছেন।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখেছেন—

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান।

সিদ্ধাচার্য্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের এই উক্তি যে কত সত্য তা বুঝা যায় শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—তাঁর দর্শনে বাস্তবিকই মুখে যেন আপনি কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়। কত অজস্র তাঁর দর্শনমাত্রেই শুরু হয়েছে, কত অবৈষ্ণব তাঁর মধুর কথা শুনে সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে যে বৈষ্ণবতা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা তিনি বাংলার নিরক্ষর ধর্ম্ম জগতকে শিখিয়েছেন। শ্রীনিত্যানন্দের অপার কৃপা তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বর্ত্তমান যুগে এবং সে কৃপা পণ্ডিত, মূর্খ, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র বিচার করে নি। তাই রসিকমোহন ছিলেন সকলকার পরম আত্মীয় এবং তাঁর বিয়োগে মর্ম্মান্তিক বিরহ-ব্যথা পেয়েছে তাঁর অনুগত এবং আশ্রিত সবাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী ও অভেদাত্মা পরম দয়াল শ্রীনিত্যানন্দের অপার কৃপা রসিকমোহন যে লাভ করেছিলেন তা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত থেকে বেশ বুঝা যায়। যে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ও বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামের যে মহাপুণ্যভূমি গর্ভাধানে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব হয় সেই তিথিতে এবং সেই স্থানে রসিকমোহন জন্মগ্রহণ করেন ১২৮৩ সালে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে তিনি এগার মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। রসিকমোহনের পিতা গৌরমোহন চট্টরাজ সার্ব্বভৌম সন্তান জন্মগ্রহণ করবার আগে স্বয়ংসিদ্ধও হয়েছিলেন—ঐ স্থানের উক্তরূপে নবজাতককে যেন আট দণ্ড ফেলে রাখা হয়। রসিকমোহনের মাতার নাম হরসুন্দরী দেবী। ইনি নিত্যানন্দবংশীয়া কন্যা। পিতৃপুরুষের দিক দিয়ে রসিকমোহন মহাপ্রভুর "প্রেমশক্তি-স্বরূপ" শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের সপ্তম পুরুষ। "তাই রসিকমোহনের ধমনীতে বৈষ্ণব শোণিতধারার উচ্ছ্বসিত বিস্তার। কৃষ্টিতে বৈষ্ণবীয় সার্থকতার বিপুল আয়োজন। ফলে সাধক রসিকমোহন বঙ্গদেশের অনন্যসাধারণ মহাপ্রভু। লীলামাধুরী প্রচারক, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়ে পরিপুষ্ট ভাগবত মহিমদর্শক।"

স্কুল কলেজে লেখাপড়া না শিখেও শুধু নিজের চেষ্টাতে সংস্কৃতাদি পাঠে মানুষ যে একাধারে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বশাস্ত্রকুশলতা অর্জ্জন করতে পারে বিদ্যাভূষণ মহাশয় তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সব চেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল পুস্তক এবং সুনির্ব্বাচিত বহু বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাগারের কথা তিনি দীর্ঘ জীবন পাঠে ও গবেষণায় অতিবাহিত করেছেন। ফলে তাঁর মত একাধারে অসামান্য সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, শাস্ত্রবেত্তা দেখা যায় নি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সদপ্রতিষ্ঠ বহু ব্যক্তিকে তাঁদের নিজ নিজ জ্ঞান গবেষণা ব্যাপারে সংশয় নিরসন করবার জন্য

তাঁর নিকট আসতে দেখা যেত এবং তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন যে রসিকমোহন জীবন্ত জ্ঞান-কল্পতরু। তিনি ছিলেন সরস্বতীর বরপুত্র। জীবনের শেষ দিনেও দেখা গিয়েছে যে অতীত শাস্ত্ররাজির মূলাধার অংশগুলি পর্য্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এমন প্রখর স্মৃতিশক্তি, বীণাপাণির কৃপা ব্যতিরেকে সম্ভবে না। মহত্ত্বাবে তিনি দেশের ও সমাজের সেবা করেছেন। পেশা হিসাবে তিনি ছিলেন ডাক্তার এবং এদিক দিয়ে বহু দরিদ্রের উপকার করেছেন। ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন ছিল তাঁর নেশা এবং এদিক দিয়েও তিনি ভক্ত-সমাজকে বহু আনন্দ দিয়েছেন। আবার আর একদিক দিয়ে তাঁকে আমরা দেখি সাংবাদিকরূপে। "আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া" "শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" "পারিজাত" "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক" "প্রেমপুষ্প" "আনন্দ মন্দির" "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" প্রভৃতি বহু পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছেন এবং অমৃত-বাজার, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, কল্যাণ, এডুকেশন গেজেট, পাঞ্চজন্য প্রভৃতি বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িক পত্রাদিতে বহুদিন যাবৎ বহু মূল্যবান্ ঐতিহাসিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখেছেন। সাংবাদিক হিসাবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, মহাত্মা শিশিরকুমার প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের তিনি ছিলেন অন্যতম সহকর্ম্মী।

অন্যদিকে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার কথা ও বহু সাহিত্যে তাঁর অপরিমেয় দানের কথা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। এ স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে তদ্বিষয়ে আলোচনা চলে না। তাঁর রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের মাত্র নামোল্লেখ করি—রূপসনাতন, শিক্ষামৃত, গম্ভীরার গৌরাঙ্গ, সর্ব্বসংবাদিনী (মূল ও টীকা), সাধন সঙ্কেত, শ্রীমদ্ তুলসী, অদ্বৈতবাদ, শ্রীনরোত্তমবিলাস, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, জগন্নাথবল্লভ নাটক (ও তাহার বঙ্গানুবাদ), মিত্যানন্দচরিত, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীমৎ দাস গোস্বামী, শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদর, আনন্দ-মীমাংসা, ব্রহ্ম হরিদাস প্রভৃতি। ইহা ছাড়া বেদপ্রেমের অপূর্ব্বগ্রন্থ আত্মনিবেদন, অমৃতময়ী লীলাচলে ব্রজ-বাসুরী, টীকাসংবলিত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত, শ্রীনরোত্তমদাস কবিরাজ কৃত ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত প্রাচীন টীকাসহ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ তাঁর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচায়ক। তিনি "সেবারাম" এই ছদ্মনামে বহু সমালোচনা ও কবিতা প্রকাশিত করেছেন।

আজ আমাদের দেশ পরাধীনতার পাশপাশ হ'তে মুক্তিলাভ করেছে। যাঁদের নীরব সাধনায় ও অক্লান্ত দানে আমাদের দেশ ও আমাদের ভাষা প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে, আজ তাঁদের বিষয় আমাদের চিন্তা করা ও তাঁদের ঋণ স্বীকার করা ও তাঁদের অবদান চিনে গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

তিস্তার বালুচর

শ্রীআশা দেবী এম-এ

তিস্তার বালুচর
ওপারে হিজ আবের ছায়ায় চাষীদের খোড়ো ঘর।
ঘুরে ঘুরে ফেরে আহারান্বেষী
কত পাখীদের ঝাঁক
কাশা খোঁচা আর ঘুঘল-চক্রবাক।
থির থির জল অস্তের রেখে কাঁচের মতির প্রায়
ঘন্টেতে মন হায়।
হিমালয়-গলা বরফ-ধারায় তবী যেহটি ঘিরে
মৃত্যুর মত শীতলতা তার অণুতে অণুতে ঘিরে।
তিস্তার বালুচর,
বরষা প্লাবনে তারে ঘিরে বাজে মেঘ-মন্দ্রিত ঘর।
বন্যা মাটিতে মধুতরা স্নেহধারা
হিমগিরি-ভাঙা পাগল-কর্ণা বিলম্ব পথহারা।

রাত্রে স্বপ্নে দেখি
নীল স্রোত বেয়ে চৌধুরাণীর ডিঙা চলেছে একি!
দূর গগনার পাগার মতন আকাশেতে পাল ওড়ে—
কালো চক্র ঘোরে
হাজারো মশালে রাঙা হয়ে যায়
নিশীথের কালো জল
তালো তরঙ্গ হেসে ওঠে খল খল।
দুধারে বালুকা বেলা
নীল জলরাশি নাগিনীর মত দুলে দুলে করে খেলা।
বালুকার চরে জাগে স্পন্দন সৃষ্টির আহ্বানে,
বন্যা বালুকা উপহার করে আনে
ফুটো ফুটো কাশফুল
শ্যামলী পাতায় শিশু তামুজ দুলে ওঠে দুল্ দুল্।

তীরে বাসা বাঁধে ঘর ছাড়া পাখী
কাকলী মুখর তানে
মিশে যায় সেই আনন্দ-গীতি
তিস্তার কলগানে।

পথ-নির্দ্দেশ

শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

দরিদ্র স্কুল মাষ্টার। রাজনীতি চর্চ্চার শক্তি নাই—সাহস তো নাই-ই। দক্ষিণপন্থী হইলেও তবু না হয় চলিত। তা নয়, পুরাপুরি বিপ্লবী বামপন্থী দলের ব্যাপার। তবুও টিকিট কিনিতেই হইল—দু টাকার একখানা। ছাত্রের মনকে বিমুখ করা চলে না। দরিদ্র স্কুল মাষ্টারের পক্ষে চরম দুঃসাহস। ভরসা, দেশের হাওয়া বদলাইয়াছে—আর হেড্ মাষ্টার মহাশয়ও টিকেট কিনিয়াছেন।

সহরের 'অগ্রগতি' ক্লাবের উৎসাহে খাস কলিকাতা "জন-নাট্যসংঘ" সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় টাউন হলে তাঁহাদের প্রথম অভিনয়। দলের পরিচালক একজন অধ্যাপক, সঙ্গে আটজন ছাত্র আর পাঁচজন ছাত্রীও আছেন। মনে পড়িল যখন ছোট ছিলাম তখন এই সহরেই কলিকাতা হইতে "ষ্টার থিয়েটার" আসিয়াছিল প্রসিদ্ধ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের নিয়া। সেদিন বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিল এবং "কনসেসন টিকিট" দাবী করিয়াছিল। তাহাদের অনুরোধ রক্ষিত না হওয়াতে তাহারা পিকেটিং করিয়া এবং টিল ছুঁড়িয়া অভিনয় পণ্ড করিয়াছিল। আর আজ, ছাত্রদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই টিকিট কিনিয়াছি এবং যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উৎসাহিত করিব এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। বাস্তবিকই দেশের হাওয়া বদলাইয়াছে।

ইহাদের হ্যাণ্ডবিল ও প্ল্যাকার্ডএ বিশেষত্ব ছিল—

"রঙ্গমঞ্চ—আমাদের এই ধূলির ধরণী।
অভিনেতা—পরিচয়হীন অবজ্ঞাত জন।
ইহাতে পাইবেন—এই দুর্দ্দিনে মুক্তিপথের সন্ধান—
নতুন অনাগত দিনের শ্রেণীহীন সমাজের ইঙ্গিত।"

ইত্যাদি

আকর্ষণ করিবার কৌশল সত্যই ইহাদের জানা আছে।

যথাসময়ে গিয়া দেখি টাউনহল লোকে ভরিয়া গিয়াছে। টিকেটের হার দশ টাকা, পাঁচ টাকা, তিন টাকা, দুই টাকা ও এক টাকা। একটু হতাশ হইলাম। আজ অন্ততঃ শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থাই আশা করিয়াছিলাম—এবং তাহা ঘটিলে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতাম।

যাক্, বৃথা নিন্দা করিব না। আলোকসজ্জা, অভিনয়, সঙ্গীত, প্রয়োগকৌশল সব কিছুর মধ্যেই অভিনবত্ব ছিল। মন খুশি হইল।

"মন্বন্তর মৃত্যে" দেখিলাম বাংলার দুর্ভিক্ষের নিখুঁৎ ছবি। কি করিয়া দুর্ভাগা নরনারী করাল দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রার আঘাতে পথের ধূলায় পড়িল লুটাইয়া—আর এই শ্মশানের স্তূপীকৃত নরকঙ্কালের উপর কৌশলী ও নির্ম্মম স্বদেশী ও বিদেশী বণিক কি করিয়া গড়িয়া তুলিল তাহাদের অতিশপ্ত বিলাস সৌধ—চোখের উপর দেখিলাম সে জীবন্ত চিত্র। এ দৃশ্য ভুলিবার নয়। অভাগার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন মনের মধ্যে যেন প্রতিধ্বনি তুলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কৌতুক নাট্য "মন্ত্রীমিশন মহরা"তে দেখিলাম, বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত তিন বৃটিশ যুদ্ধপক্ষ আকাশে উড়িয়া আসিলেন ভারতে—১লা এপ্রিল (তারিখটা লক্ষ্য করিবেন।) স্বাধীনতারূপ অমৃতপাত্র হাতে বহিয়া। কৌশলী 'কানা' ওয়াভেল বড়শিতে টোপ গাঁথিয়া চার ফেলিয়া বসিলেন। টোপ গিলিতে আসিল দুই নির্ব্বোধ রুই কাৎলা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধূর্ত্ত প্রতিনিধির দল আর ধনিকের দালাল রাজা নবাবের দলের চক্রান্তে সোনার হরিণরূপ Interim Government—ধরা ছোঁয়ার বাহিরে থাকিয়া নাচাইয়া ফিরিতে লাগিল দেশের ক্ষমতালোভী নেতাদের। পিছনে কলকাঠি টিপিতে লাগিলেন 'শয়তান' ওয়াভেল, 'ধড়ি' বারোজ, 'ধূর্ত্ত' জেনকিন্স!

লাগিল ঝগড়া—হিন্দুস্থান, পাকিস্থান, রাজস্থানে। রক্তের বন্যা বহিল, অবিশ্বাসের বিষে দেশের বাতাস হইয়া উঠিল ভারী। ভৃপ্তির হাসি হাসিয়া বিদায় নিলেন ওয়াভেল। নাচিয়া নাচিয়া, মোহন বাঁশী বাজাইয়া আসিলেন আরো চাতুরী বিশারদ নয়নলোভন সাপুড়িয়াবেশী মাউন্ট-ব্যাটেন! মুখে মিঠা বুলি আওড়াইয়া গোপনে বুদ্ধি হইতে বাহির

করিলেন কালদর্প। দিলেন সেই বিষধরকে পাঞ্জাবের বুকে ছুঁড়িয়া। বিষের জ্বালায় পাঞ্জাব হইল জর্জ্জরিত।

দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের কি সত্য ব্যাখ্যান—দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার কী স্বচ্ছ বিশ্লেষণ। মনটা খুশী হইল।

সকলের শেষ দৃশ্য—"পথের সন্ধান"—

সুন্দর আনন্দময় বিরোধহীন পল্লীজীবন। সে সুখস্বর্গে প্রবেশ করিল সুখদেবের অমিদার, ফাষ্টরীর মধুরভাষী ক্যাপিটালিষ্ট—বৃটিশ শাসনতন্ত্রের শয়তানী। হারাইয়া গেল মুখের হাসি, প্রাণের আনন্দ—নামিল মরণঘুমের কালোছায়া। কিন্তু সেই মরণঘুম ভাঙাইতে আসিল—লাল পতাকা হাতে গান গাহিয়া, সমাজতন্ত্রী কর্ম্মী, ছাত্র-ছাত্রীর দল। জাগিল চাষী, জাগিল মজুর, জাগিল দেশের জনসাধারণ—তেভাগা আন্দোলনে—শ্রমিক ধর্ম্মঘটে, নৌ-বিদ্রোহে, ছাত্রবিক্ষোভে। ধনিক হইল বিব্রত—শাসক হইল বিচলিত। আসিল কারাদণ্ড, ফাঁসীর মঞ্চ—আসিল বুলেট ও বেয়নেটের রক্তাক্ত আর্ত্তনাদ। কিন্তু রক্তের সাগর মন্থন করিয়া উঠিল—নতুন দিনের সূর্য্য, আকাশে উড়িল নতুন পতাকা—রক্তে-নাওয়া লাল নিশান। তাহার নীচে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল ছাত্রছাত্রীর দল। মুষ্টিবদ্ধ পতাকার দণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইল কিষাণ, মজুর, অত্যাচারিত অবজ্ঞাত মানবের জনতা। দেখা দিল নূতন স্বর্গ—শ্রেণীহীন সুখী সমাজ।

ঘন ঘন করতালির মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হইল। মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। রাস্তায় বাহির হইয়া শুনিলাম ছাত্রেরা বলাবলি করিতেছে "কংগ্রেসের জড়বুদ্ধি নেতা-গুলোকে দেখান উচিত এই নৃত্যনাট্য—তবে যদি ওদের চোখ খোলে।" বাস্তবিক, ইহাকেই তো বলে চাক্ষুষ প্রমাণ। ইহাকেই তো বলে পথনির্দ্দেশ। কত সহজ আমাদের সমস্যা—কত সহজ ইহার সমাধান।

বুঝিলাম,—আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী ইংরাজ বণিক আর তার শাসন ব্যবস্থা। বুঝিলাম মিথ্যা এই হিন্দু মুসলমান সমস্যা, রাজন্যবর্গের সমস্যা, অস্পৃশ্যতা করণের সমস্যা, জাতিভেদ সমস্যা।

বুঝিলাম—একটি মাত্র সমস্যা শোষক ও শোষিতের বিরোধ। পৃথিবীতে শুধু আছে দুইটি শ্রেণী—হিন্দু নয়—মুসলমান নয়—শোষক ও শোষিত। রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া—সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই একদিন মিটিবে এই বিরোধ—হইবে এই একমাত্র সমস্যার একমাত্র চূড়ান্ত সমাধান।

বুঝিলাম—আপোষের পথ, আলোচনার পথ—মিথ্যার পথ—অন্ধকারের গোলকধাঁধার পথ। বিপ্লবের পথ, রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ, একমাত্র সত্য পথ, একমাত্র সহজ পথ, একমাত্র আলোকের পথ। পৃথিবী সেদিন নীচে নিবে বাম-মার্গে সেদিনই আসিবে মুক্তি। সেদিনই আসিবে শান্তি—সেদিন চাষী লুটিয়া লইবে তাহার ন্যায্য অধিকার, শ্রমিক আগুন জ্বালাইয়া প্রতিশোধ নিবে শতাব্দীর লাঞ্ছনার, ছাত্রছাত্রী যেদিন পথে বাহির হইবে সমস্ত শৃঙ্খল ভাঙিয়া! সেদিন অবসান হইবে সমস্ত দুঃখের, সমস্ত অবিচারের, সমস্ত সমস্যার। মনে হইল, মিথ্যার ঠুলি এক নিমেষে যেন চোখ হইতে খসিয়া পড়িল! সত্য লাভের পরমতৃপ্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। অনেক দিন এমন সুনিদ্রা হয় নাই।

সকালে উঠিতে কিছু দেরী হইল। গত রাত্রের আনন্দের সুরটি প্রাণে বাজিতেছে। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়া সংবাদপত্র দেখিতে বসিলাম। চোখে পড়িল "গতকল্য রাত্রিতে মিটফোর্ড হস্পিটালে 'সোনার বাংলা'র সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে কয়েকজন যুবক দুইদিন পূর্ব্বে ধীরেন্দ্রবাবুকে 'সোনার বাংলা' অফিসের কাছে অতর্কিতে তলোয়ার ছোড়া ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র দিয়া আক্রমণ করিয়া গুরুতর আহত করে। কিছুদিন যাবৎ ঢাকাতে বামপন্থী দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতে ছিল। ধীরেন্দ্রবাবুর উপর আক্রমণ সেই বিরোধেরই ফের বলিয়া সন্দেহ। ধীরেন্দ্রবাবু অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একটি মাতৃহারা বিধবা কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।"

"ওয়র্গাওয়ের অবস্থা অবনতির দিকে গিয়াছে। বিশেষ এক সম্প্রদায়ের সংস্রাবিক জনতা অন্য এক সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত দুইটি গ্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করিয়াছে। ব্যাপক ধর্ম্মান্তরকরণ এবং নারীহরণের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। একজন বৃটিশ সার্জ্জেন্ট দুইটি নারীকে দুর্ব্বৃত্তদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে।"

"মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনাসভা গতকল্য স্থগিত রাখিতে

হয়। কয়েকজন ব্যক্তি প্রার্থনা সভায় কোরাণ পাঠে বিশেষ আপত্তি জানান। ইহাতে কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পুলিশের হস্তক্ষেপে সভায় শান্তি স্থাপিত হয়।"

"পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে বৃটিশ প্রমিক পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন এবং সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মঃ মলোটভের সঙ্গে তুমুল বাদানুবাদ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ জার্মানীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দুই পক্ষে গুরুতর মতভেদ প্রকাশ পায়।"

"গত সপ্তাহে সারণ জিলায় প্লেগের মৃত্যুসংখ্যা ৩২২।"

"ফল অধিকৃত বার্লিন অঞ্চলে কয়লার অভাবে দারুণ শীতে কয়েকটি শিশু ও বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে।"

"পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে, ইহার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ পরীক্ষার হল হইতে একযোগে বাহির হইয়া আসেন। তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য মেডিকেল স্কুলের সমস্ত ছাত্র এবং অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

"কানপুর পিওর অয়েল মিলের শ্রমিক ধর্মঘটের শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে। ধর্মঘটী শ্রমিকেরা উত্তেজিত হইয়া মিলে আগুন ধরাইয়া দেয়। শ্রমিকদের বস্তিতেও আগুন ধরিয়া যায়। মিলটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে। শ্রমিক বস্তিতেও একটি স্ত্রীলোক তাহার সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে নিয়া পুড়িয়া মারা গিয়াছে।"

"মাদুরার প্রসিদ্ধ মন্দিরসংলগ্ন কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতে যাইয়া বর্ণহিন্দু পুরোহিতদের হাতে দুইজন হরিজন লাঞ্ছিত হইয়াছে।"

"প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট চলিতেছে।"

"কলিকাতার গোলযোগ এবং তে-ভাগা আন্দোলন-জনিত যানবাহনের বিশৃঙ্খলার ফলে বগুড়া সহরের মার্চ্চ মাসের রেশন পৌঁছাইতে বহু দেরী হইয়া যায়। কাল রেশন নিয়া যে গাড়িটি আসিতেছিল সহর হইতে তিন মাইল দূরে পাঁচশত কৃষক তাহা থামাইয়া চারিশত বস্তা চাউল লুঠ করিয়া নিয়া যায়। যাত্রীদের গাড়ীতে উঠিয়াও ইহারা অত্যাচার করে। গাড়ী হইতে নামিয়া পলাইতে গিয়া একজন বৃদ্ধ গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। পুলিশ আসিয়া গুলি ছুঁড়িতে বাধ্য হয়, ফলে দুইজন কৃষক নিহত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। রেশন অভাবে সহরে চাল ও চিনির বরাদ্দ দুই সপ্তাহের জন্য অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশুদের কার্ডে কোন রেশন দেওয়া হইবে না।"

কানে ভাসিয়া আসিতেছে কাল রাত্রে শোনা নৃত্য-নাট্যের কথাগুলি—

"বিপ্লবের পথ—রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ—একমাত্র সত্য পথ, একমাত্র সহজ পথ, একমাত্র আলোকের পথ। এই পথেই আসিবে শান্তি, আসিবে সকল সমস্যার সমাধান।"

কিন্তু চোখে আবার ঘোলা দেখিতেছি কেন?

বুড়ো বয়সে চশমাটা আবার পাল্টানো দরকার।

তবে

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মিথ্যা-বেসাতি করে যদি হয় ধরণীর রাজনীতি,
হিংসা ও দ্বেষ যদি তার সম্বল,
স্বার্থ-সাধন-বিধানে না থাকে যদি সংকোচ-ভীতি,
নিত্য বহায় নিরীহ-নয়নে জল,
তবে কি ভাবিব, মরেছে ধর্ম, শান্তির আশা লীন?
তবে কি পৃথিবী গ্রাসিয়াছে শয়তান?
দয়ার হাতে এমনি করিয়া মরিবে অসহায়?
অবিচার তবে হইবে কি বলবান?

যুগ যুগ ধরি আসিল জগতে মহামানবের দল,
দিল আশ্বাস, শুনাল শান্তিবাণী,
দরদী সাধুরা মুছাইল প্রেমে দুখী-নয়নের জল,
বরাভয় দিল সতত মুক্তপাণি।
সত্যের লাগি বীর যাদবরথি বরি নিল বনবাস,
মানবের প্রেমে ঈশা করে প্রাণ দান,
মৈত্রী বাণিয়া কাটে গৌতম সিংহাসনের পাশ,
বিলাই গাহিল মানবজয়ের গান।

তিমির-নিশীথে এদের জীবন জ্বেলে দিল যত আলো
পাপ-কালিকায় হবে কি নির্বাপিত?
বহুধা ব্যাপিয়া আসিবে কি তবে অমার আঁধার কালো?
মৈত্রায়ণ্য যাগে প্রতিষ্ঠিত?
দেবকী কি তবে মুখর পরি কাঁদিবে কারার মাঝে?
অর্দ্ধেক রাতে হবে না চন্দ্রোদয়?
জানকী কি তবে অশোক কাননে হবে ত্রিযামিনী সাজে,
হবে না কি হায়! স্বর্ণলংকা জয়?

পাঞ্চালী কি গো কাঁদিবে না তবে এলায়িত কেশজাল
দুঃশাসনের শোণিতে সিক্ত করি?
যদিবে কি তবে গুরুদক্ষিণা একলব্য চিরকাল?
তবু জেগিয়া দেখা কি দিবে না হরি?

শিল্প-জিজ্ঞাসা—ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ

শ্রীঅঙ্কুর মুখোপাধ্যায়

জীবনে কোলাহল উগ্র হয়ে উঠেছে; বীর্যহীন বহুত্বরাকে ভোগ করবার ছাড়পত্র নিয়ে চতুর্দিকে চলেছে উগ্র লড়াই! তখনও দেখেছি আর্টিষ্টের তুলির টানে সুন্দরের উর্ধ্বশিখ যৌন আরতি। পাটোয়ারী বুদ্ধির অভাবে পুলিসের পাসপোর্ট হয় তো ওঁরা খুইয়ে বসেন; হিসেবী লোকের হাঁসিয়ারীর দিকে কানটা সব সময় রাখতে পারেন না; তাই সামাজিক পুলিশ চালেন করলে পকেট থেকে কেউ বইখানা বার করে সপ্রতিভ প্রতিবাদে বলে ওঠেন—পাসপোর্ট আছে বই কি! এই দেখ, আমার কাছে অমুকলোকের ছাড়পত্র! সুন্দরের আগমনের পথের খবরটা ওঁরা কেমন করে জানতে পেরেছেন। সেই পথে ওঁদেরও চরণ-চারণা। সে চলায় ক্লান্তি নেই, দ্বিধা নেই, অবসাদ নেই। চলার সাথী হবার জন্য ওঁরা আহ্বান করেন সকলকে। সুন্দরের নিমন্ত্রণে কেউ অপাংক্তেয় নয়। ওঁরা ডাক দিয়ে বলেন: তুমি চলো। এই পথে চলার আনন্দে তোমার আত্মা পুলকিত হয়ে উঠবে; তোমার আত্মা হবে ফলপ্রার্থী। চলার বেগে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে সমস্ত অতীত তার কৃত্যাকৃত্য নিয়ে। অতএব তুমি চলো। বুঝতে পারলুম আর্টিষ্ট গন্তব্য পথটের বাসিন্দা নন। Art is the most unselfish of all activities. পাষাণী অহল্যা জেগে ওঠেন একটি দুর্লভ পদরেণুর স্পর্শে। প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় যাকে যেখানে ধূলিমলিন, পৈশুন্যের আঘাতে যা কিছু জর্জর, মূক, বধির, জড় বলে যারা প্রতিভাত হয়েছিল, তাদের ওপর পড়ে আর্টিষ্টের কথা-সুন্দর দৃষ্টি। কোন এক পরম ক্ষণে সৃজনের আকাশে সঞ্চারিত হয় নির্বোধ প্রশান্তি। আর সেই অবকাশের আকাশ ভরে ওঠে অপরূপ আকাশ-কুসুমে।

হয় তো এখন উঠবে নির্বোধ প্রশান্তি কি সৃজনের-অনুকূল? আর্টের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে মোহ-মুক্তি। রূপ-সৃজন ব্যাপারটা অবশ্য মুগ্ধবোধ অথবা মোহ-মুদ্গরের সগোত্র নয়। মনোগতকে আমরা মনোমত সাজে সাজাতে চাই সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মনোগত আমাদের অধিগত হয়ে থাকেন মোহমুক্ত মনঃশীলতায়। তবেই দেখছি মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগের স্নায়ুপিণ্ডটা বিবর্তিত হতে হতে বর্তমান মস্তিষ্কে পরিণত হয়েছে। মেরুদণ্ড-নির্ভর জীবনকে তবু আমরা অতিক্রম করতে পারি নি। আবেগ সংবেগের এই পীঠস্থানকেই যদি একান্ত মনে মেনে থাকি, তবে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ, অনুরাগ, বিরাগই হবে সত্য নির্বাচনের মাপকাঠি। বলা বাহুল্য, সত্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সমীহা এবং অনীহা শুধু অপ্রতুল নয়, একেবারেই অবান্তর। সত্য-জিজ্ঞাসার ন্যায় শিল্প-জিজ্ঞাসা অথবা সত্য-চিত্রের ক্ষেত্রেও কায়দাটা একই রকম বোঝা। আর্টের জন্যে আছে সাধারণ আবেগ-সংবেগ-নির্ভর জীবনের অতিক্রম, আর্ট ব্যক্তিক্রমও বটে।

আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে; নির্বোধ প্রশান্তির আকাশে-আকাশ-কুসুম ফুটলেও ফুটতে পারে; কিন্তু সে তো থাকে বলে নিরুপাখ্য, সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্য-চিত্রের উপলব্ধি কি তা হলে অলীক ও অসার কল্পনা? সাধক কবির গানের একটা কলি আমরা অনেকেই শুনেছি—ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, ফুলমালা কোথায় পেলি? উৎকর্ষের ঔজ্জ্বল্য অস্তিত্ব সার্থক হলেই সুন্দরের অধিষ্ঠান ঘটে থাকে। কিন্তু অস্তিত্বই যার প্রমাণ-সাপেক্ষ, তার উৎকর্ষের ঔজ্জ্বল্য নিছক আকাশকুসুম নয় কি? উৎকর্ষের ঔজ্জ্বল্যকে অন্য ভাষায় বলতে পারি লাবণ্য। চিত্র বস্তুতে লাবণ্যযোজনা শিল্পের ষড়ঙ্গের অন্যতম। এই লাবণ্য আমরা যোজনা করতে পারি বস্তুতে; বাস্তবনিমুখ ভাবে নয়। সত্যই কি তাই? রঙে ও রেখায়, সুরে, কাব্যে অথবা সঙ্গীতে আমরা কি প্রকাশ করতে চাই? একদল শিল্পীকুল কপালাস্থির মধ্যে প্রবিষ্ট পাঠ করে থাকেন একটি যুগের ইতিহাস। আর শিল্পীর তুলির টানে ঐতিহ্যের তাড়ায় অরণ্য পর্বত গান গেয়ে ওঠে; কাশ্মিরী কলকায় "চাল-লেক্" টলমল করতে থাকে; চীনা শিল্পীর তুলির ঝাঁচড়ে আন্দোলিত বেণুবনের মধ্যে জমাট বাঁধিতে থাকে Taoism-এর সমগ্র রহস্য, বাঙ্গালী শিল্পীর একাগ্র সাধনায় ঘট-পরিসর পটের মধ্যে ধরা দেয় "মা-গঙ্গা" স্নানরতা ও পূজারতা রমণীদের চোখের অভিভূত স্তব্ধতায়; সমস্তকে ঘিরে একটি প্রশান্ত নিশ্চিন্ততা, তবু বারবার মনে হতে থাকে আপনার আমার সব বাঙ্গালীর জীবনের পথে ইতিহাস বুঝি গঙ্গা-স্রোতস্বতি! বুঝতে পারছি শিল্পী প্রকৃতির অনুকরণ করতে রাজী নন। শিল্পীর সৃষ্টি অনুকৃতি তো নয়ই, এমন কি প্রতিকৃতিও নয়; অনেক সময়ই অতিকৃতি। অতিকৃতি অর্থে বুঝাতে চাই এমন কিছু কৃতি—যা উপলক্ষকে অতিক্রম করে একটা বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছেছে। সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পের মহৎ লক্ষণই হলো এই অতিক্রান্ততা। আর এই বিশেষ লক্ষ্যকেই বলতে চেয়েছি আকাশকুসুম। তাদের আকাশে ফুল না ফুটলে পটে-লেখা ফুল কাগজটারই মতো হবে প্রাণহীন, শ্রীহীন। লাবণ্যযোজনের আগে তাই প্রয়োজন ভাবযোজনার। পণ্ডিতী ভাষায় দুটো ক্রিয়াকে বলা হয়েছে actus primus এবং actus Secundus. কবির ভাষায়: মাটির জনম হয় নি যখন, তখন করেছি চাষ।

আর্টের বিশেষ লক্ষ্যটি কি? সুন্দরের বোধকে বোধগম্য করাই তো সকল রকম রূপকর্মের উদ্দেশ্য। অন্যতর কোনও লক্ষ্যের প্রয়োজন আছে কি! সুন্দরের বোধকে বোধগম্য করা—এই বাক্যটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত সংরাগ-বিরাগের অনুরঞ্জন থেকে "সুন্দর" সর্বথাই মুক্ত। সত্যের মতই সুন্দরও উপলব্ধ হন বুদ্ধি যোগে, বোধির সহায়ে। শাস্ত্রে নির্দেশ আছে প্রতিমাকারকে ধ্যানরত হতে হবে। তার অর্থ হচ্ছে ধী-সূর্য উদিত না হলে মহাভাবের উপলব্ধি অসম্ভব।

Beauty is to do with cognition. সত্য উপলব্ধ হয় বুদ্ধি-যোগে। সত্য ও সুন্দর সম্পর্কিত নয়। সত্যের আকর্ষণী শক্তিকেই আমরা সুন্দর আখ্যা দিয়ে থাকি। এই শক্তি প্রত্যক্ষীভূত হতে পারে, ভাবগ্রাহ্যও হতে পারে। সত্যের এই আকর্ষণী শক্তিকেই দুঃসহ প্রকাশ-বেদনার গৃহীত-রূপ প্রকাশের প্রতিরূপায়িত করেন প্রতিমায়। প্রতিমা স্মরণ করিয়ে দেয় একটি পথকে। পথ শব্দটি শুধু স্থান-বাচক নয়, বিশেষ করে ভাব-বাচক। প্রতিমার মধ্যে আমরা একটি বিশেষ দেশ ও কালকে দেশ-কাল-অতিক্রান্ত রূপবান করতে সক্ষম হই। বিশেষ বিশেষ ভাবের স্মারক ও সম্বন্ধ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ প্রতিমা। ভাব-প্রতিম হওয়াতেই প্রতিমার সার্থকতা। এই কারণেই বলতে পারি, তাকে প্রকাশ করি, এইটিই হচ্ছে রূপসৃজনের ব্যাপারে মুখ্য। প্রকাশ অথবা পদ্ধতির স্থান গৌণ। অনুভবের দ্বারাই নিরূপিত হয় বস্তুসত্য; নির্বস্তুতার মধ্যে নিহিতার্থেরই পরম প্রকাশ।

কাকে প্রকাশ করছি বলতে বিষয় বস্তুকে বোঝাচ্ছি না। বস্তু-রূপের পিছনে যে ভাবরূপ তাকে যথাযথ এবং যথাযোগ্য প্রকাশ করতে পারাটাই বড় কথা। যথাযথ প্রকাশ মানেই যথার্থ প্রকাশ—plato যাকে বলেছেন True অথবা Iconographically correct. "আইকন্" অর্থে বোঝায় ভাবরূপ। ভাবকে যদি যথাযথ রূপবান করতে পারি, তবেই তাকে বলবো সাধুসিদ্ধি—সুন্দরের দুরূহ সাধনায় যা অপরিহার্য।

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, রূপকারের সৃজন-শালায় প্রকৃতি হয়ে ওঠেন রূপায়িতিরূপ। আর এই রূপান্তরিত প্রকৃতি আমাদের অনুভূতির ক্ষেত্র শুধু নয়, আমাদের বুদ্ধির ক্ষেত্রও প্রসারিত করে। সৌন্দর্যের ত্র্যাম্বিকের সংজ্ঞা যত প্রাচীন হলেও, তার ভিতরের সত্যটি আজও অপরিম্লান।

প্রকরণ-দক্ষতা লাভ করলেই সার্থক শিল্প-সৃজন সম্ভব নয়। সার্থক শিল্প সৃষ্টির লক্ষণ হচ্ছে যথাযথ এবং রূপোপযুক্ত। যথাযথ প্রকাশ আবার নির্ভর করে logic অথবা right reason of composition এর উপর। গঠনরীতির আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করছি না। রূপের logic অথবা right reason বলতে বোঝায় রূপের প্রমাণ। আর এই প্রমাণ শিল্পের বড়রসের অন্যতম অঙ্গ। রূপে রূপে যেমন ভেদ, তেমনি তাদের প্রমাণও ভিন্ন এবং বিভিন্ন। অন্য কথায়, প্রত্যেক রূপই স্বপ্রমাণ।

উপযুক্ত প্রমাণাদির সহিত ভাবসাযুজ্যযুক্ত যথাযথ রূপ যদি মন ও চেতনার বন্ধনে ধরতে পারি, তবেই উৎকর্ষের উজ্জ্বলো রূপ সৃষ্টি হবে অনোত্তীর্ণ। একটি তালগাছ ক্যানেরার দৃষ্টিতে ধরে ফেললুম; একটি তালগাছকে মনে লিখে ফেললুম ক্যানভাসের পটে; আবার সেই তালগাছটিই সার্থক শিল্পীর তুলির কয়েকটি আঁচড়ে ধরা দিলো। ফটোগ্রাফির তালগাছ আর মনলনবিশের তাল গাছ স্বপ্রমাণ নয়। শিল্প সৃষ্টির ইতিহাসে তাদের কোনও স্থান নেই। তুলির দুটো আঁচড়ে যার সৃষ্টি সে বলে কত কথা, কত কাহিনী। ফটোগ্রাফির রেটে সে তো হরবখৎ স্বাধু নয়। জগৎ সংসারের সব কিছুর মতো সেও জঙ্গম। শত সহস্রের গমনাগমনের এক প্রান্তে সেও ইতিহাসের সাক্ষী। কত রাখাল বালক, কত গোচারণের স্মৃতি তার মৌন-মুখর পত্রপল্লবকে ধরা রইলো, ধরা রইলো মেঘ-মেদুর আকাশ আর তেপান্তরের বুক চিরে গাড়ি-চলার পথ। স্বপ্রমাণ বলেই সে ধরা দেয়। যা আছে তাকেই হুবহু প্রতিফলিত করার মধ্যে দুর্নিরীক্ষ্য পুনরুক্তির আছে অবশ্য, কিন্তু তা শিল্পসম্মত নয়। যথার্থ প্রমাণ জ্ঞান থাকলেই যা আছে তাকে অবলম্বন করে নূতনতর সৃষ্টি সম্ভব হয়। আর শিল্প কর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নূতনতর সৃষ্টি।

রোমের capitol এ স্থাপিত মার্কাস্ অরিলিয়সের অশ্বারূঢ় প্রস্তরমূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এক কারিগরী শিল্পী ঘোড়াটির গড়নের অনেক ত্রুটি আবিষ্কার করলেন। তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে বহুরকমের পরিশ্রম করে তিনি গড়লেন একটি পাথরের ঘোড়া। পশুর বিজ্ঞান, অস্থিবিদ্যা, তথা শিল্পের আঙ্গিকের সমস্ত আইনকানুন তাতে নিখুঁৎ ভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। মার্কাস অরিলিয়সের ঘোড়ার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো ঘোড়াটিকে। শিল্পী একবার তাকান সেই দিকে, পরক্ষণে নিজের গড়া ঘোড়াটির দিকে। বিস্মিত ও বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন—আমারটা নিখুঁৎ সন্দেহ নেই; কিন্তু ওইটা জ্যান্ত, আমারটা মরা।

আঙ্গিক অথবা প্রেক্ষিত দুরস্ত হলেই সত্যচিত্র হয় না। প্রকরণ-দক্ষতা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রকরণের চাপে প্রাণ যেন মারা না যায়। "মাস্কেলের" স্ফীতিতেই মাংসের প্রমাণ নয়। মাংসের প্রমাণ দেহ-বনের পরিপূর্ণ প্রকাশতায়। আলোছায়ার যথাযথ সমাবেশ এবং প্রেক্ষিত প্রকরণই রূপ সৃষ্টির প্রমাণ নয়। রূপের প্রমাণ তার অন্তর বাহিরের মননলীল পরিপূর্ণতায়। ঘুমঘুমাতের প্রতীকায় ফুটলো—ঘুমুন। কোটার বেদনাকে সে বড় করে দেখায় না। মনে হয় যেন খুব সহজেই সে সুন্দর। তেমনি আঙ্গিকের সিদ্ধিও বহু আয়াসসাধ্য, কিন্তু তার আর্ট যদি থাকে সেই আয়াসের পরিচয়, সৃষ্টিকে ছাপিয়ে বইতে থাকে ব্যষ্টিগলিত ঘর্ম স্রোত, তবে আর তাকে আর্ট বলা যায় না। সুন্দরের সন্ধানে গলঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করছে এমন শিল্পী কল্পনা করা যায় না। পেয়ালা হাতে রসের সন্ধানে যতদিন ঘুরে বেড়াই, ততদিন শিল্পী হতে পারি নি। রসে পৌঁছলে আপনা থেকেই বলে উঠি—আর ন্যায় জন্মুকে বৈঠ, পরা হুঁ, খুদ রহী হায় মধুশালা। এখন আমি অন্তরে বসেছি, মধুশালা আমার চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। একেই বলে শিল্পীর পুরুষসিদ্ধি।

সম্প্রতি, পরিস্থিতি ইত্যাদি বজায় রেখে প্রতিমাকার গড়লেন দুর্গা-প্রতিমা। বর্ণাদিক ঝলমল করে উঠলো। এই এক রূপ। উষর মাটির বুক ছাপিয়ে সবুজ তৃণ দুলতে লাগলো, দুলতে লাগলো শরকতগুচ্ছ। এ আর এক রূপ। শস্যাশ-যোজিত রথে অরুণ-সারথি সূর্যদেব আকাশ পরিক্রমা করছেন। এই এক রূপ। আর লোকের আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষ যাকে উদ্দেশ করে উমার কণ্ঠে গায়—

যে রসানুভবকারি, আমার তাতে যুগ কর, আমার ললাট জ্যোতির্ময় হোক্—সে সূর্যের রূপ আর এক। কিন্তু জিজ্ঞাসার শিকারীর অর্থাৎ সন্ধানের যার যার যে মার্গ করে, সে বাঘের রূপ এক ; আর উল্লসিত শিল্পী ভীষণে-মধুরে মিশিয়ে যে বাঘের রূপ আঁকলেন—Tiger, Tiger, burning bright !—সে বাঘের রূপ আর এক। এক গাছি মালা ও একটি তরবারী, এ দুয়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু বীরের হাতে আত্মত্রাণের জন্য দেখা পায় যে তরবারী, তার রূপ আর মালাগাছটির রূপ যেন একাকার হয়ে গেছে। হরপিয়ঁপ্রসাদের মতো বারাণসীর উত্তরবাহিনী গঙ্গার এক রূপ। আর অহল্যাবাই ঘাটের উপর সমস্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁনিমগ্না মকরবাহিনী ; তাঁর রূপ আর এক। এইভাবে রূপে রূপে কত ভেদ। রূপকৃৎ এবং রূপবিদের ভেদে আবার একই রূপের কত ভেদ। শিল্পের গড়নের অন্যতম রহস্য এই রূপভেদ। রঙ, রূপ আর রেখার ত্রিবেণী সঙ্গমেই রসের অধিষ্ঠান।

এক রূপের সঙ্গে আর একের ভেদ থাকলেও উৎকর্ষের অনুপাতে রূপসৃষ্টির "তর-তম" বিচার করতে যাওয়া অর্থহীন। একটি সুন্দর খোড়ো চালের ঘর, আর তাজমহল, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর সুন্দর—এ প্রশ্নে শিল্পী নিরুত্তর। রঙ ও রেখার বন্ধনে ধরা পড়লো যে তৃণখণ্ড, রসোত্তীর্ণতায় তা খানী বুদ্ধের সগোত্র হতে পারে। সহজের আকর্ষণী শক্তিকে উপযুক্ত প্রযাপাদির সাহায্যে যদি আকলাবণ্যযুক্ত রূপ দান করতে পারি তবেই তা হয় রসোত্তীর্ণ। রসোত্তীর্ণতাই শিল্প-জিজ্ঞাসার চরম কথা।

রসোত্তীর্ণতা অথোপযোগিতাকে অস্বীকার করে না। খানী বুদ্ধের মূর্তি থেকে আরম্ভ করে একটি কাটারী, এ সবই গড়া হলো বিশেষ দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য। কাটারীটা তৈরী করতে হয় ব্যবহারযোগ্য করেই। নতুবা, বৈষ্ণব কবির সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয়—কনক কাটারী কাযে নাহি আওল, উপরহি ঝকমকি সার।

অথোপযোগিতা আর্ট বিচারে একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। রূপের মধ্যে যদি অভাব থাকে ভাবানুভবের, সৃষ্টি যদি ঘটং রূপ না হয়, অর্থাৎ রূপসৃষ্টি যদি নিহিত ভাবের স্মারক ও সমর্থক না হয়, তবে রূপকার হন শিল্পনীতিভ্রষ্ট। বানরের মূর্তিতে কারুকৃৎ দান করেন বানরত্ব, তবেই হয় সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়া নিশ্চয় অপরাধ। কিন্তু বানর গড়তে শিব গড়াও কম অপরাধ নয়। উচ্চাঙ্গের প্রতিমা এবং প্রতীক শিল্প থেকে সুরু করে নিত্য ব্যবহার্য কারুশিল্প—এ সবগুলোই একই সঙ্গে হলো সুন্দর এবং ব্যবহারযোগ্য। সৌন্দর্য এবং ব্যবহারযোগ্যতা, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো শাস্ত্রের বিচার ; শিল্প বিচারে এ রকম পার্থক্যের অবকাশ নেই।

চেতনার বিভিন্ন স্তরে, জীবনী শক্তির ক্রিয়াশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, একটি অর্থব্যাপক জীবনাদর্শ কখনও প্রতীকে, কখনও প্রতিমায়, কোথাও বা পটে আর কোথাও বা পুতুলে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, আলপনায়, কাঁথা ও চাক শিল্পে, লোক ও গ্রামীণ্ জীবনযাত্রায়, লোক-চিত্তি এবং বাইয়াপনায়, খাদ্যাদি এবং লৌকিক শিল্পে, ধার্মিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ব্যবস্থাপক, কবি, বাউল, ধর্মকার, কর্মকার, কুম্ভকার, সকল প্রকার আর্টিষ্ট এবং আর্টিসানের মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। এই হলো যে কোনও সমাজের সুন্দর, সহজ, সুন্দর রূপ। এই রকম সমাজে কর্মী ও ভাবুকের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে নি। সৌন্দর্য এবং ব্যবহারযোগ্যতার মূল্যবোধ অথবা মূল্যভেদ নিয়ে এখানে তর্কের কোনও অবকাশ নেই। সংস্কৃতির এই প্রকারের সূত্রেই প্রতীকের আবেদন বিশ্বজনীন এবং উচ্চাঙ্গের প্রতীক শিল্প থেকে সুরু করে গ্রাম্য শিল্পীর পট, পুতুল এবং প্রতিমার মূল বক্তব্যটি একই সুরে বাঁধা। Level of referenceএর বিভিন্নতায় তারতম্যটুকু ঘটে থাকে কেবলমাত্র প্রকাশের।

কেন্দ্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত যে সমাজ, নূতন কোনও সার্বজনীন মূল্যকে অঙ্গীকার করার সৌভাগ্য যার হয় নি, এক কথায় যার তারতম্য বিনষ্ট হয়েছে, সে সমাজে আর্টিষ্ট ও আর্টিসানের মধ্যে কর্মী এবং ভাবুকের মধ্যে ব্যবধান হয় দুরতিক্রমণীয়। ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি তখন সুন্দর না হলেও বাজার চলতি মূল্য পায়, আর সৌন্দর্য মূল্যবোধ-যোগ্যতাকে করে অস্বীকার। আর্টিষ্ট হয়ে ওঠেন গজদন্ত গম্বুজের অধিবাসী। প্রতীকের দ্যোতনা সার্বজনীনতা হারিয়ে ফেলে হয়ে ওঠে একজনীন অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীজনীন।

সুন্দর, সুন্দর সমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থার আর্টের উপর পড়ে collective অথবা co-operative ideationএর ছাপ। যুগ যুগ ধরে শত শত শিল্পীর সাধনার ফল নিল করোমণ্ডল এবং প্রাম্বানমের বিরাট ভাস্কর্য, ছাপান্ন শত শিল্পীর সাধনা শতদল গড়ে উঠলো কোনার্কের সৌর মন্দির। কোনও ব্যক্তি প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ছাপ তারা বহন করে না। তবু মনে হয় এগুলো বুঝি কোনও একক অসাধারণ প্রতিভার সৃষ্টি। বহুর মধ্যে একত্বের সেতু রচনা করেছে collective ideation বিশিষ্ট অথচ সার্বজনীন সংস্কৃতির অধিকারী না হলে কোনও সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। অসুস্থ বিশ্ব-কেন্দ্রিক না হয়ে, শিল্প হয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক।

তাই অসুস্থ সমাজে রেখা ও বর্তনা, প্রেক্ষিত ও প্রকরণ, আলো ও ছায়ার নানা রকম পরীক্ষা, নিরীক্ষাই আর্ট-বিচারে পায় চরম মূল্য। প্রত্যেক শিল্পীকে আলোয় জগৎ-সংসারকে দেখেছেন উদ্ভাসিত, তাতে দ্বারা পড়বার কোনও সম্ভাবনা নেই। abstract lightএর আলোয় দেখলে বস্তুর বস্তুর নষ্ট না হলেও তার রং রূপ এবং প্রেক্ষিত যায় বদলে। জীবন-দর্শনের বিশিষ্টতাই প্রাচ্য শিল্পে দান করেছে এই রকমের বৈশিষ্ট্য। আর সেই দর্শনের সার্বজনীনতাই উচ্চাঙ্গের abstract এবং Symbolic art কেও একদিন সার্বজনীন মূল্য দান করেছিল। আর্ট ছিল আত্মসংস্কারের এবং আত্ম-দর্শনের উপায়।

চেনা ও জানা

শ্রীশিশির সেন

যুদ্ধের পরের সময়টার কথা বলছি।

ছাটাই ব্যবস্থায় অজয়েরও সাপ্লাই-অফিস থেকে চাকরী গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ডিগ্রীটা চাকরী রাখতে এতটুকু সাহায্য করল না! সময় সময় এ কথাটাই ওর মনে বেশি করে লাগে।

আবার সেই পরীক্ষা পাশের পরে যেমন অফিসের দুয়োরে দুয়োরে ধর্ণা দিয়েছে, এবারেও ঠিক তেমনি করেই গোটা ডালহৌসী স্কোয়ার ও ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের অফিস অঞ্চলটা চষে ফেললে। তার পি-সি-রায়ের সদ্য-প্রকাশিত 'আচার্য্য বাণী' মুখস্থই নিঃশেষে পড়েছে—কিন্তু তা-ও মনে শান্তি পায় না। বাঙ্গালীর ছেলের চাকরী ছাড়া গতি নেই। তা'ছাড়া মূলধন কোথায়? ব্যবসায় আরও আছে নর্থ-পোল সাউথ-পোলের দূরত্ব সীমার মত 'লাভ' আর 'লোকসান' দুটি কথা—যেন আকাশ পাতাল তফাৎ।

সেদিন অফিসের ভূতপূর্ব সহকর্মী সমীর বলছিল: বাঙ্গালীর ছেলের এবারে ব্যবসা ছাড়া গতি নেই। মূলধন মূলধন করে চীৎকার করে লাভ নেই। বীমার ব্যবসাই একমাত্র ব্যবসা—যা'বিনা মূলধনে করা চলে। আমিও যোগ দিয়েছি, তুমি-ও এসে হাতে হাত মিলাও বন্ধু!

জীবন-বীমা সম্বন্ধে অজয় একেবারে যে না ভেবেছে তা' নয়। কিন্তু সুলেখা কি ভাববে—এজন্য গা' করে না।

সুলেখার সঙ্গে অজয়ের বিয়ে একরকম ঠিক। শুধু একটু অপেক্ষা অজয়ের একটা ভাল চাকরীর জন্য। মেয়েদের আসল পরিচয় ত স্বামীর পদমর্য্যাদাতেই।

সেদিন সমীর এসে একরকম জোর করেই অজয়কে নিয়ে গেল, এক জীবনবীমার অফিসে।

বীমা কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর জিজ্ঞেস্ করলেন: এ-লাইনে পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছু আছে?

অজয় নির্বোধের মত একবার সমীর ও ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বললে: আজ্ঞে না।

সমীর একথা শুনে অজয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে: শিক্ষিত ছেলে, রেস্‌পেকটেব্‌ল্ কানেক্‌শন এবং হাই সার্কেলে মেলামেশা—অভিজ্ঞতা কি বলছেন স্যার—জীবনবীমা করতে যা' যা' গুণ, তার সব কটাই এঁর আছে।

ম্যানেজার হো হো করে একচোট হেসে নিজের সিগারেটটিতে একটি জোর টান দিয়ে বললেন: বেশ শুনে খুব খুশী হলুম। জীবনবীমা প্রফেশন হিসেবে খুবই রেস্‌পেকটেব্‌ল্—বুঝলেন।

এর পর পূর্ব কথার জের ধরে বললেন: কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ করছি কিছু মনে করবেন না—প্রশ্নগুলো জীবন-বীমা ব্যাপারে একেবারে অপরিহার্য্যভাবে জড়িত……

অজয় বললে: বলুন।

ম্যানেজার বললেন: দিনে ক' কাপ চা' খেতে পারেন?

অজয় একথা শুনে দস্তুরমত ঘাবড়ে গেল।

সমীর মুচকে হাসলো।

ম্যানেজার মুখে পর্ব্বত প্রমাণ গাম্ভীর্য্য এনে চুপ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে কোন উত্তর না পেয়ে বললেন: আচ্ছা ক' প্যাকেট সিগারেট দিনে খেতে পারেন? ভয়ের কিছু নেই নিঃসংকোচে বলুন—We are all friends here।

অজয় থতমত খেয়ে যায়। বাপের বয়সী লোক, তার সঙ্গে সিগারেট খাওয়া সম্বন্ধে কি আলোচনা করবে বুঝতে পারে না। কারণ অজয় এ সব বিষয়ে একটু লাজুক ছিল।

অজয়ের চুপচাপ ভাব দেখে ম্যানেজার একটু হেসে বললেন: আপনি এত কি চিন্তা করছেন অজয়বাবু? ইন্‌সিওরেন্স্ লাইনে সাকসেস্‌ফুল হতে গেলে এসব জিনিষ শিখতেই হবে। এতে লজ্জার কিছু নেই।

সমীর বললে: তা' হয়ে যাবে স্যার, সেজন্য কিছু

ভাবনা নেই। এইবার ঠিক করে ফেলুন—তিন লাখ বা পাঁচ লাখ, কোনটাতে কাজ করবে।

ম্যানেজার বললেন : অজয়বাবুই বলুন ওঁর কি ইচ্ছে?

সমীর বললে : পাঁচ লাখই ঠিক করে দিন—Direct organisationএ কাজ করবে···বুঝলে অজয়, পাঁচ লাখে ৩৫০৲ টাকা মাইনে, আর তিন লাখে ২২৫৲ টাকা। আপাততঃ মাসে ৩৫০৲ টাকা হিসেবেই কাজ কর।

ম্যানেজার বললেন : বেশ ত।

অজয় ভাবলে : এরা বলে কি। চাকরীর খোঁজ করতে করতে জুতোর তলায় আবার ধাক্‌সোল লাগাবার উপক্রম হয়েছে—তবু চাকরীর সন্ধান মিললো না, আর এমনি অযাচিতভাবে একটা ৩৫০৲ টাকা মাইনের চাকরী হাতে এসে পড়লো—এরা বলে কি···সে কি স্বপ্ন দেখছে, না কোন যাদুকরের আখড়ায় এসে পড়েছে···

ম্যানেজার আবার বললেন : পাঁচ লাখ টাকার কাজ কিছু নয়। একটা প্রোগ্রাম করে কাজে নেবে পড়ুন আপনি হয়ে যাবে।

সমীর বললে : তা'হলে একটা appointment letter issue করে দিন।

ম্যানেজার বললেন : আমি আজকেই issue করে দিচ্ছি।

সন্ধ্যার সময় নতুন খবর শোনাবার জন্য অজয় সুলেখাদের বাড়ীতে এলো।

দরজার কড়া নাড়তে সুলেখাই এসে দরজা খুলে দিলে।

অজয়ের চোখে মুখে আজ একটা খুসীর আমেজ জড়িয়ে ছিল। অজয়ের দৃষ্টিতে যে প্রাণ-প্রাচুর্য্যের আভাস ছিল, তা' দেখে সুলেখাও বহুদিন পরে আনন্দিত হলো। কারণ ইদানীং অজয়ের বিমর্ষভাব ও দুঃখবাদের কাহিনী শুনতে শুনতে মুষড়ে পড়েছিল সে।

সুলেখার টেবিলের উপর একটি বই খোলা পড়েছিল। অজয় বইটি হাতে নিয়ে বললে : কি বই পড়ছিলে সুলেখা?

সুলেখা অজয়ের হাত থেকে বইটি কেড়ে নিয়ে বললে : থাক্—বইয়ের আলোচনা পরে হবে—এখন বল দেখি তোমার খবর কি?

অজয় হেসে বললে : খবরের মধ্যে আজ বীমা কোম্পানীতে ৩৫০৲ টাকা মাইনের একটা চাকরী পেয়েছি।

সুলেখা উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে বললে : সত্যি?

অজয় সানুনয় ভঙ্গীতে মাথা দুইয়ে বললে : সত্যি ভাই···

সুলেখা এবারে আব্দারের সুরে বললে : তবে আর দেরী নয়, আমার আর এখানে একটুও ভাল লাগছে না···

অজয় বললে : একটু ধৈর্য্য ধর, অন্ততঃ একটা মাস যেতে দাও—তাতে মাইনেটা পেয়ে নি···

সুলেখা বললে : তা'ত বটেই, ওটুকু ধৈর্য্য ধরার ক্ষমতা আমার আছে···

অজয় বললে : আজ যেন কি রকম পৃথিবীটাকে নতুন করে ভাবতে ইচ্ছে করছে···আমি যেন আবার নতুন আলো দেখতে পাচ্ছি···টাকাটা মানুষের কি দরকারেই না লাগে, টাকা না হলে চোখ একেবারে অন্ধকার···

সুলেখা বললে : তোমাকে কি কাজ করতে হবে?

অজয় বললে : লোক বেছে বেছে এজেন্ট তৈরী করে তাদের দিয়ে Life Insurance case জোগাড় করতে হবে···এ কাজ ত কখনও করিনি···সবে হাতে খড়ি···এখন কাজটা রাখতে পারলেই হয়।

সুলেখা তর্জ্জনী তুলে বললে : এই আবার তোমার দুঃখবাদ আরম্ভ হলো—আমার একটুও ভাল লাগে না—আজকের এই আনন্দের দিনে আমাকে কি দেবে বল দেখি?

: কি চাও, তুমি বল? আমার কাছে থাকলে নিশ্চয়ই দেবো।

সুলেখা হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে : মাগো, পুরুষগুলো কি বোকা···

অজয় হাত দুটো একটু ঝেড়ে নিয়ে বুকটা একটু ফুলিয়ে নিজের চেহারার দিকে বার কয়েক তাকিয়ে বললে : আমার বোকামির কি লক্ষণটা দেখলে···

সুলেখা বললে : তা-ও আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে···

অজয় একটু গম্ভীর হয়ে বললে : যারা বোকা তাদের না হয় একটু দেখিয়েই দিলে। সবার ত আর সমান বুদ্ধি হয় না।

সুলেখা অজয়ের একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে বললে থাক্ অভিমান আর করতে হবে না

—কিন্তু তুমি কি-ছু-ছু বোঝ না—এখন মানুষ নিয়ে আমি কি করব?

অজয় হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে একপাশে চুপ করে বসলো।

সুলেখা বললে: হয়েছে মশাই, ঢের হয়েছে···এবারে একটু সাহিত্যের কথা বলি শোন···

অজয় বললে: বল—

সুলেখা বললে: কি পড়ছিলাম জান?

অজয়: কি?

সুলেখা: এই ছোটলোকদের নিয়ে লেখা সাহিত্য আর পড়তে ভাল লাগে না। কতকগুলো চাষা—তার জীবন—তার কামনা-বাসনার বিচিত্র ইতিহাস—হয়ত বা আবার ওই চাষা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে বসলো—তখন চললো সেই চাষার কামনার জয়রথ—ইতরামো চরিতার্থ করবার পথে হয়ত নিজের ছেলে হয়ে দাঁড়াল প্রতিদ্বন্দ্বী···তখন চাষা গেল রেগে—এ-রাগ মনে রাগ নয়, এ-চলো পুরুষের চিরকালের স্বভাব।

অজয়: হুঁ—এতো পার্ল বাকের 'গুড আর্থ'। নোবল পুরস্কার পাওয়া বই·····

সুলেখা: তা'তে হলো কি? তুমিও ত সেই পুরুষমানুষ।

অজয়: পুরুষমানুষ হলেও আমি চীন দেশের পুরুষ-মানুষ নই। আমার নীতি আছে, ধর্ম আছে, আমার সমাজের স্বাস্থ্য আছে।

সুলেখা: তোমাদের সমাজের স্বাস্থ্য আছে, দেহ নেই।

অজয়: কি দেহ নেই? তবে দেখবে, দেখিয়ে দেবো।

সুলেখা: থাক্, অত সুখে আর কাজ নেই·····

অজয়: তবে তোমার কি ভাল লাগে?

সুলেখা: আমাদেরই পরিচিত যে সমাজ, যাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাদেরই পরিবেশে আমি কাহিনী শুনতে চাই·····

অজয়: মানুষের জৈবিক সুধার কাহিনী ত শুনতে চাও·····

সুলেখা: অসভ্য কোথাকার·····

অজয়: অসভ্য বলছ, কিন্তু পুরুষের মুখ আল্‌পনা করতে তোমরাই সাহায্য কর·····

সুলেখা: বাজে বকো না বলছি·····

এরপর একমাস একদিন পার হয়ে গেল।

অজয় যেদিন ৩৪০৲ টাকা মাইনে হাতে পেল, তখন মনে হলো—পৃথিবীটা কি সুন্দর··এখনো এখানে আছে আলো, আছে রং···অথচ এই পৃথিবীটাকেই একমাস আগে কি ভীষণ কুৎসিত মনে হয়েছে···

সুলেখাকে এসে অজয় বললে: তুমি কি চাও বলতো? শাড়ী, ঘড়ি, আংটি, বই—কি চাই তোমার?

সুলেখা বললে: আমি কিছুই চাই নে···তোমার উড়নচণ্ডে স্বভাবটা শুধরেছে দেখলেই আমি সবচাইতে সুখী হবো···ক'দিন আগেও দেখেছ দুটো পয়সার জন্য কি কষ্ট পেতে হয়েছে···এখন একটু রাখতে শেখো···

অজয়: তখন জানতুম না পয়সা রোজগার এত সহজ·····

সুলেখা: এখনই সহজ কোথায় দেখলে? তুমিই ত সেদিন বললে কাজ কিছু এগোয় নি···

অজয় একটু বিমর্ষভাবে বললে: কাজ আমার থাকুক বা না থাকুক, আমার নতুন চাকরীর একটা অংশ প্রথমে তোমায় দিতে চেয়েছিলুম, তা'কে তুমি অপমান করলে·····

সুলেখা: একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে আমি কিছু অন্যায় বলিনি···টেলিফোন গাইড্ দেখে দেখে লোকের বাড়ী ঘুরে বেড়াও—এতে কম কষ্ট আমি দেখি নে·····

অজয়: Insuranceএর কাজই ত এই···নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয়—এতে একটা রোমাঞ্চ আছে, জান?

সুলেখা: যত রোমাঞ্চই থাকুক, আমার একটুও ভাল লাগে না···কত কষ্টের টাকা···

অজয়: ভারি ত আমার কাজ—সিগারেট খাওয়া, চা খাওয়া, আর গল্প করা—তা-ও যদি না পারি, তবে আর কোন্ কাজ পারবো, বলতো?

সুলেখা: তুমি রাগ করো না—একটা বছর যাক্—

হাতে কিছু জমুক—তারপর যত খুশী দিও···দেবার দিন যথেষ্ট পাবে·····

এরপর আলোচনা অকারণেই এক সময় ভেঙে যায়।

তিন মাস পার হয় হয়।

এমন সময় ম্যানেজার অজয়কে ডেকে পাঠালেন একদিন।

অজয় ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে এলো।

ম্যানেজার বললেন : তিন মাস পার হতে চললো কিন্তু আপনার কোটা'র হাফও হয় নি। কি করবেন স্থির করলেন ?

যে অজয় কথা বলতে একদিন হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতো, সে আজ তিন মাস বীমা কোম্পানীতে কাজ করে চোখে-মুখে কথা কয়। এমনি গুণ বীমা কোম্পানীর।

অজয় গম্ভীর হয়েই বলল :Pro-rate basis এ worker recruit করলে worker কাজের scope কি করে পায় বলুন ত ?

ম্যানেজার : কিন্তু তার জন্য ত আপনাকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে···আপনাকে কোটার প্রথম তিন মাসে ৬০% পার্সেন্ট কাজ করলেই চলবে, কিন্তু তার অর্দ্ধেকও হয় নি যে·····

অজয় : আমার Sincere effort এবং honest attempt নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করছেন·····

ম্যানেজার : তা' করছি বলেই ত চুপ করে আছি···

অজয় : তবে চুপ করেই থাকুন—বছর ঘুরে গেলে আমার কাজের বিচার করবেন·····

সত্যি সত্যি একদিন বছরও ঘুরে গেল এবং অজয়ও মাস মাসে ৩৫০৲ টাকা করে মাইনে পেল।

এখন অজয়ের একটা নিজস্ব মেজাজ হয়েছে। সব জিনিষ ঠিকমত কাছে না পেলে মেজাজ বিগড়ে যায়।

সুলেখার বিষয়েও এখন মনে মনে কঠোর সমালোচনা করে। একদিন যখন চাকরী ছিল না তখন সুলেখার চিন্তাতেই মন ভরে ছিল। সুলেখার রূপ ও ব্যবহার এখন যেন কেমন বিশ্রী, অশোভন ঠেকে···

ইচ্ছে করলে সুলেখার চাইতে সুন্দরী মেয়ে সে এখন বিয়ে করতে পারে···বিয়ের আগেই সুলেখা বড্ড বেশি নরম হয়ে গেছে। বিয়ের আগে আইবুড়ো মেয়ের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। হলোই বা অজয় প্রেমিক। যে মেয়ের এমনি স্বভাব, বিয়ের পরেও সে এমনি চলাঢলি করতে পারে···

অজয় সুলেখাদের বাড়ীতে যাতায়াত এখন কমিয়ে দিয়েছে·····

জিজ্ঞেস্ করলে বলে : কাজের চাপ বেশি···

কিন্তু আসলে ওর মন মুখে আনাগোনা করে। সত্যি কথা বলতে সুলেখার চাইতেও অন্য কোন সুন্দরীর উপাসনায় মন ওর উন্মুখ। সময় সময় নিজের উপর ওর রাগ হয়—কেন এত তাড়াতাড়ি সুলেখার কাছে নিজেকে উন্মোচন করলে—ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার অপেক্ষায় একটু ধৈর্য্য ধরলে কি ক্ষতি ছিল·····

এদিকে সুলেখা ভাবে : নারীর সত্যিকার পরিচয় হচ্ছে তার স্বামী। টাকা অঢেল অজয় উপায় করছে। কিন্তু তার পরিচয় কি ? আসলে সে বীমার দালাল। মাগো, কি ঘেন্না···মরে গেলেও স্বামীর এই পরিচয় লোককে সে দিতে পারবে না—এর চাইতে কেরাণীও ভাল —মাইনে কম হলেও সম্মান আছে, সমাজে এ পদবী অচল নয়। দুর্গম পথের যাত্রার মতই হবে তার ভাবী স্বামীর পরিচয়—যার রূপ দুর্গমের মতই ভয়াল···আজকালকার ছেলেগুলোও হয়েছে বেয়াড়া ধরণের—নিজের পরিচয় পাকা হবার আগেই মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতে আসে—একটু দুর্ব্বলতার সুযোগ পেলেই মাথায় উঠে বসে···

সুলেখার মা ওর বাবাকে বলছিল : এবারে অজয়ের সঙ্গে সুলেখার বিয়েটা শেষ করে দাও। অজয়ের চাকরীও ত বছর ঘুরে এলো।

বাবা বললেন : বেশ ত। তুমি মেয়ের মত নিয়েছ।

মা বললেন : এত কাণ্ডের পরেও মত! তুমি কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ ?

বাবা বললেন : তবে দিন ক্ষণ ঠিক করে ফেল···

সুলেখা ওর বিয়ের তারিখ শুনে বললে : মা তুমি অন্য পাত্র দেখ!

মা শুনে অবাক! বললেন: সে কি রে লেখা? এত ব্যাপারের পর অন্য পাত্র···মেয়েদের এত চঞ্চল হতে নেই···

সুলেখা বললে: তুমি পাত্রের মত নিয়েছ। ওই তারিখে ওর সুবিধে হবে কি না?

মা একথা শুনে একটু লজ্জিত হলেন।

এরপর মা দূত পাঠিয়ে খবর পেলেন—অজয় এখন বড় ব্যস্ত। এ-সময়ে বিয়ে সম্ভব নয়।

মা বললেন: লেখা তোদের কি কোন গোলমাল হয়েছে রে···বল্, মা'র কাছে কোন লজ্জা নেই···

লেখা চোখেমুখে সরলতা ঢেলে দিয়ে বললে: কই··· না—ত!

আরও তিন মাস পর।

ম্যানেজার আবার অজয়ের তলব করলেন।

অজয় ধীর স্থির ভাবে ম্যানেজারের বাণী শোনবার জন্য বসেছে।

ম্যানেজার গভীর দুঃখ ও বিষাদের সঙ্গে বললেন: আপনার চাকরী আর কিছুতে রাখতে পারছি নে—হেড্ অফিস আপনার কাজের এ্যানালিসিস্ করেছে—গত বছরের কেস্ নাইন্‌টি পার্সেণ্ট ল্যাপস্ করেছে—কাজেই আর আপনার চাকরী রক্ষা করা চলে না···

এ কথা শোনবার পর অজয়ের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেলো। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। পৃথিবীকে মনে হলো কুৎসিৎ।

ম্যানেজারকে মুখে বললে: ধন্যবাদ।

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হলো এ-সময়ে সুলেখা ছাড়া ওকে সান্ত্বনা দেবার যে পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

বাসায় ফিরে একটা চিঠি লিখে চাকর পাঠিয়ে দিলে সুলেখার মা'র কাছে: ওই তারিখেই বিয়ে হবে··

বিয়ের পর সুলেখা যখন শুনলে অজয়ের চাকরী নেই, তখন বললে: আমাকে বিয়ে করে বেকার ছেলে ফাঁকি দিলে শুধু আমার বাবা আর মা'কে—আমাকে কিন্তু এ-ভ-টু-কু ফাঁকি দিতে পারনি···চাকরী পেয়ে তুমি অজানা ও অচেনা দেশে চলে গিয়েছিলে, আজ তোমায় সত্যি সত্যি চিনলুম জানলুম···

অজয় ভাবলে—মেয়েদের এ-ছাড়া আর কি-ই বা আছে···এটা সুলেখার স্বামীকে সুখী করার একটা কথার কথা—ভা-ল-বা-সা···

এপারে—ওপারে

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, কাব্য-ভারতী

তোমায় আমার জীবনের শেষ বন্ধনে কি হবে দেব?
অজানার পারে—এ ভালোবাসার—যাবে না কি চিনিয়েও?

জগতের মাঝে যত হাসি গান
পেয়েছিনু মোরা দেবতার দান,
দিন শেষে কি গো হবে অবসান—
বিদায়ের সাথে সাথে;
স্বপনসৌধ র'চেছিনু যারা ফাগুন পূর্ণিমাতে।

পৃথিবীর বুকে নদীর-প্রেমের মৃত্যুর হাতে দায়
আলোকের তীরে অসীম-প্রেমের পুলক-পিয়াস রয়।

ধরা হ'তে মোরা যাইব মুছিয়া,
স্মৃতিটুকু শুধু রহিবে বাঁচিয়া,
বাঁধিবে মোদের নিবিড় করিয়া
অসীমের প্রেমডোর—
বিচ্ছেদ যথা আসিবে না দেখা, বিগলিত আঁখি লোর।

বনফুল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে' সব বললেন তিনি। হরুবাবু ব্রজেশ্বর দম্পতীর নৈশ-অভিযানের কাহিনী শুনে পুলকিত তো হলেনই না, উপরন্তু তারা যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"সীতারাম, সীতারাম—তারা তো তাহলে এলো বলে —অ্যাঁ"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো আশা করছি। আসবেন নিশ্চয়ই। তাঁদের এখানে দেখতে পাব আশা করেই তো এসেছিলাম আমি—"

"কিন্তু আমি তো তাহলে মহামুশকিলে পড়ে যাব দেখছি। তাঁদের কোন ঘরে থাকতে দেব কি করব আমার তো কিছুই জানা নেই। সুরো হয়তো চাবি নিয়েই চলে গেছে। হনুমানজি বোম বখেড়ায় ফেলে দিলে দেখছি ঝড়াক্কসে"

হরুবাবু চেয়ার থেকে উঠে অস্থির ভাবে ঘরের চারদিকটা পরিক্রমণ করে নিলেন একবার।

"এতে ভাবনার কি আছে"—সদারঙ্গবাবু বললেন—"চাকরটা নিশ্চয় জানে সব। জানা উচিত অন্তত। নিশ্চয়। ডাকব?"

"ডাকুন, ডাকুন। কিছু করুন একটা। অপরিচিত লোক সব হুড়মুড় করে' এসে পড়লে দিল যাবড়ে যায় আমার। ওই ঘণ্টাটা টিপুন। আচ্ছা, আপনি বাইক করে' গিয়ে সুরেশ্বরীকে ডেকে আনতে পারেন?"

"শুনুন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ওদের জানি, অতি অমায়িক লোক ওরা। এদেই ঘরের লোকের মতো হয়ে যাবে দেখবেন। কিছু বেগ দেবে না। এসেই খুব সম্ভবত শিকারে চলে যাবে"

"তা হতে পারে। যাক্, ব্রজেশ্বরবাবু আসছেন তবু ভাল। উনি বুলিয়া জেলায় ছিলেন কিছুদিন শুনেছি। ধরবার ছোঁবার মতো কিছু পাব আশা করি। খাঁটি কলকাত্তিয়া লোককে বড় ভয় করি। কেমন যেন ফসকে ফসকে যায়—"

"উনি বালিয়া জেলায় গিয়েছিলেন না কি? হিট্লির রিসার্চের জন্যে, না কংগ্রেস ক্যাম্পেন্?"

"মালুম নেই"

পরেশ এসে প্রবেশ করল।

সদারঙ্গবিহারী তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—"ব্রজেশ্বর-বাবুরা যদি এসে পড়েন—আসবেনই—তাহলে তাঁরা কোন ঘরে থাকবেন, তাঁদের জন্যে কি কি ব্যবস্থা করতে হবে—তুমি জান তো সব?"

"জানি"

পরেশ মিতবাক্ ব্যক্তি। বহুকাল থেকে সে সুরেশ্বরী-দেবীর কাছে আছে। তার এই ছোট্ট 'জানি'র মধ্যে সে কতখানি যে প্রকাশ করলে তা বাইরের লোকের বোঝবার উপায় নেই। সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে সে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার প্রায়ন অর্থ—আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে আপনি কোফন কাটছেন কেন মশাই।

"জান? ও, তাহলে তো মিটেই গেল। বাস্—"

গলা খাঁকারি দিয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে একবার হরুবাবুর দিকে চাইলেন। তাঁর মনে হল হরুবাবুর অন্তরে সাহস সঞ্চার করতে হলে ব্যাপারটা আর

একটু বিশদ করা দরকার বোধহয়। পরেশের দিকে চাইলেন তিনি।

"তাদের খাবার বলবার শোবার হাতমুখ ধোবার ইত্যাদি ইত্যাদির সব ব্যবস্থা করতে পারবে তাহলে?"

"পারব ইত্যাদি ইত্যাদিটা কি বুঝলাম না—"

"না, ও কিছু নয়। যানে, তারা আসছে—মানে আই মীন, পথে আছে—একটু ইয়ে তো হবেই নিশ্চয়। তবে লোক খুব ভাল। দু'জনেই। আমি তাদের সঙ্গে কাল হাতটা কাটিয়েছি কি না—ঠিক পুরোরাত নয়, খানিকটা, তবু খাতটা আনা হয়ে গেছে—বিশেষ বেগ পেতে হবে না, —সাদাসিধে একদম। তোমাকে তো বলেইছি গোড়ার সব। কেবল বকুবাবু—ও ছকুবাবু—তোমাকে ডাকতে বললেন কি না তাই—"

"চুপ করুন"—ছকুবাবু বলেন—"আপনি সমস্ত গোলমাল করে' দেবেন দেখছি। শোন পরেশ, ব্রজেশ্বরবাবুরা আসছেন সব ঠিক করে' রাখ। আমাকে কোনও ঝামেলা যেন পোহাতে না হয়। বাস্। অত বক্তৃতা করবার দরকার কি—"

সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে ভ্রূকুটি করে' চেয়ে রইলেন তিনি।

"সব ঠিক আছে"

পরেশও ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করে' চাইলে সদারঙ্গবিহারীর দিকে।

সদারঙ্গবিহারী একবার ছকুবাবুর দিকে একবার পরেশের দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হাসলেন। পরেশের দিকে চশমার লেন্স থেকে এক ঝলক আলো ফেললেন। হাত দুটো ঘষলেন।

"যাক্ সব ঠিক থাকলেই হল। চমৎকার ব্যবস্থা আছে তাহলে। থাকাটাই স্বাভাবিক। বাঃ—খাসা। এইবার আমাকে উঠতে হবে কিন্তু। ওঠা উচিত। যেতে হবে অনেকদূরে কিনা, হনুমানপুর। বৃষ্টিও নামবে মনে হচ্ছে। যাচ্ছে তাই কাণ্ড! কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। একটু দেরী হয়ে গেল—তা হোক—এখানে এসে সব ব্যবস্থা যে করে' দিয়ে যেতে পারলাম তাতে ভারী আনন্দ হচ্ছে। খুব! আচ্ছা, এবার চলি তাহলে—নমস্কার বকুবাবু। এ কুকুরটা—"

ছকুবাবু বললেন—"পরেশকে দিন। পরেশ কুকুরটা নাও"

"ও—হ্যাঁ—পরেশ—তোমার নাম পরেশ বুঝি। এই যে নাও, ধর ভাল করে'। না, কামড়াবে না। হ্যাঁ—। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার নমস্কার ছকুবাবু—"

কম্পমান কুকুরকে পরেশের হাতে সমর্পণ করে চলে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে ছকুবাবুর দিকে চেয়ে আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হাসলেন আর একবার। তিনি চলে যেতেই ছকুবাবু হাত উলটে মন্তব্য করলেন—আজব দুনিয়া।

পরেশ মৃদু হেসে বললে—"উনি বরাবরই একটু কিম্ভূত গোছের"

"কিম্ভূত নয়, বুদ্ধু। দিল খাবড়ে দিয়েছে একদম। আর একটা ষ্টিংগাহ বানাও। সোডাটা একটু সময়ে দিও, —বুঝলে"

"আজ্ঞে"

ষ্টিংগাহ শব্দটা কোন দেশীয় তা ঠিক না জানলেও পরেশ এটুকু বুঝেছিল যে 'ষ্টিংগাহ বানাও' মানে 'মদ ঢাল'।

ঢালতে লাগল।

(১৫)

দু'দিনের মধ্যেই অনীতাকে আবার ট্রেণে চড়তে হল। এবার সঙ্গে মা বাবা। স্বয়ম্প্রভা দেবী একটি কোণে গিয়ে বসেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ-চোয়াল-নিবদ্ধ মাংসপেশীগুলির কুঞ্চন-প্রসারণ দেখে মনে হচ্ছিল অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে যে সব বক্তৃতা করতে হবে তারই মহলা দিচ্ছেন যেন তিনি মনে মনে। অনীতার বাবা শিবুবাবু গাড়ির আর এক প্রান্তে বসেছিলেন। সুখের বিষয় গাড়িতে আর কেউ ছিল না। সঙ্গে জিনিসপত্রও ছিল না বিশেষ। স্বয়ম্প্রভা একটি মাত্র বড় ব্যাগ এনেছিলেন। ব্যাগটি তাঁর এবং অনীতার শাড়ি-ব্লাউস-সায়া-সেমিজেই ভরে' উঠেছিল প্রায়। শিবুবাবুর একটি কাপড় এবং গেঞ্জিও ছিল অবশ্য তার মধ্যে। কোট কামিজ ছিল না। এক-কোটে এবং এক-কামিজেই তিনি চালিয়ে দিতে পারবেন এই সম্ভবত স্বয়ম্প্রভা প্রত্যাশা করেছিলেন। শিবুবাবু কিছুই আনতে চান নি, এমন কি নিজেকেও না। তাঁকে জোর

করে' টেনে এনেছেন স্বপ্নপ্রভা। গাড়ির এক কোণে চুপ করে' বসে ছিলেন তিনি বাইরের দিকে চেয়ে। বর্ষাকালে নির্জ্জন মাঠে গাছতলায় একক গাধাকে ভিজতে দেখেছেন কখনও? জিতুবাবুর অবস্থা অনেকটা সেই রকম।

অনীতাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। কালো চোখের অনন্ত দৃষ্টি মর্ম্মভেদিনী হয়ে উঠেছিল যেন। মেজাজ সপ্তমে চড়ে' ছিল তার। সমস্ত পৃথিবীর উপরই চটেছিল সে। সব চেয়ে বেশী রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। এত কেলেঙ্কারি কেন করতে গেল সে। রাগ হচ্ছিল মাতার মায়ের উপর। মা যেন তার এই দুর্দ্দশাটা উপভোগ করছে মনে মনে। ক্ষেপে বসেছিল সে। সুশোভনের উপর প্রথমে তার যে রাগটা হয়েছিল তা রূপান্তরিত হয়ে অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল এখন। অর্থাৎ তার হৃদয়-নাট্যমঞ্চে যে নিদারুণ নাটক অভিনীত হচ্ছিল সে নাটকে সুশোভনই এখন একমাত্র পাত্র নয়। সুশোভনের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি প্রথমটা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল তার শিখা অনেকটা কমে' এসেছে এখন। প্রবাহও নেই আর তেমন। এখন আর একটা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর মর্ম্মান্তিক জ্বালায় তার সমস্ত বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণ এ বিষয়ে সে তেমন সচেতনও ছিল না। স্বপ্নপ্রভার কুঞ্চিত চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি এবং চোয়াল-চিবুকের নীরব সঞ্চালন দেখে হঠাৎ সে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলে। করবামাত্রই সমস্ত চিত্ত তিক্ত হয়ে উঠল নিমেষে, মুষ্টিযুগল আপনিই উঠে পড়ল কানের দিকে। সুশোভন? হ্যাঁ সুশোভন তো তাকে ধাপ্পা দিয়েইছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যদিও মনে মনে সে এখনও সন্তোপনে আশা করছে যে হয়তো সন্দেহটা অমূলক, হয়তো তার ব্যবহারের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে একটা। কিন্তু মায়ের এ কি ব্যবহার? সুশোভনের দোষ ধরতে পেরে এবং বিনা প্রমাণে সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে বিজয়োল্লাসে তাকে শাস্তি দিতে যাওয়ার আগ্রহে মায়ের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তা ঠিক যেন জাল-বদ্ধ পশুকে দেখে প্রলুব্ধ শিকারীর দৃষ্টির মতো। হিংস্র।.....অনীতা অজ্ঞাতসারে কখন যে তার দোষী স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করেছে মনে মনে তা সে নিজেও টের পায় নি প্রথমে। ছি, ছি, এমন বোকামি সে করতে গেল কেন। রাগের মাথায় কেন সে সব কথা বলতে গেল মাকে? ওই বলিষ্ঠ নাস্তি-বাগীশ নির্ম্মম মহিলাটিকে সে কি চেনে না? না, সুশোভনের উপর আর রাগ ছিল না তার। ঈর্ষ্যার একটা কাঁটা খচখচ করছিল যদিও মনের ভিতর কিন্তু রাগ আর ছিল না তার। বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস করে' ক্ষমা করবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে ভিতরে ভিতরে। মায়ের এই 'কর্ত্তাস্তি' করতে যাওয়ার মানে কি? সুশোভনের বিরুদ্ধে যদি কিছু করতেই হয় সে নিজেই করবে। সুশোভনের নাগাল পেলে মা তাকে খুঁড়বে, খুনবে, নাস্তানাবুদ করে' ফেলবে সকলের সামনে। তার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল—না, যা করবার সে নিজেই করবে। পাঁচজনে মিলে তার স্বামীকে সকলের সামনে অপমান করবে—এ কিছুতেই হতে দেবে না সে। সুশোভনকে সে চায় আবার, তাকে সে ভালবাসে এখনও, তার সব দোষ সত্ত্বেও।

"মা—"

অনীতার কণ্ঠস্বর এত তীক্ষ্ণ শোনাল যে স্বপ্নপ্রভা চমকে উঠলেন। গাড়ির অপর প্রান্ত থেকে জিতুবাবুও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

"কি? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলি-কেন আচমকা! হল কি" স্বপ্নপ্রভা প্রশ্ন করলেন।

অনীতা মায়ের দিকে একটু ঝুঁকে অনন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কেবল রাগ নয় গভীরতর আর একটা কি যেন প্রতিভাত হচ্ছিল। আত্ম-সম্বরণ করবার চেষ্টা করছিল সে প্রাণপণে, কিন্তু পারছিল না। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে' চেষ্টা করছিল তবু।

"মনে হচ্ছে এতে তুমি যেন খুশীই হয়েছ"

"কি বলছিস বুঝতে পারছি না ভাল। কি একটা ভাবছিলাম তোর চীৎকারে গুলিয়ে গেল সব। খুশী? মানে?"

"উনি যে এই কাণ্ড করেছেন তাতে যেন আনন্দই হয়েছে তোমার মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা তুমি যেন উপভোগ করছ বেশ"

স্বপ্নপ্রভা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' বাতায়ন-পথে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল। তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—"তোমার মাথার ঠিক নেই কথা বোলো না বেশী। এত বড় আঘাতের পর মাথা ঠিক রাখা কঠিন। শুধু চেষ্টা কর। নিজের জামাই বাস্তঘুঘু এ আবিষ্কার করে' খুশী হয় না কেউ। আমিও হই নি। তবে আশ্চর্য্যও হই নি। এ আমি গোড়া থেকেই জানতাম—"

"কি—"

জিতুবাবু ওদিক থেকে সরে' এলেন একটু।

"তুমি ওদিকেই থাক না। তোমাকে কিছু বলছি না—"

অনীতা বললে, "গোড়া থেকেই যদি জানতে তাহলে বিয়ের সময় আপত্তি কর নি কেন। তখন তো খুশীই হয়েছিলে—"

স্বয়ম্প্রভার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল একটা। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন তিনি।

"একটি দিনের তরেও খুশী হই নি। গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছি। গোড়া থেকেই আমোদ দিতে চাই নি—"

অনীতা এবার ক্ষেপে পড়ল।

"মিছে কথা। এখন তুমি ওঁর শত দোষ দেখছ কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় প্রথম যখন উনি আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন তুমি কিছু বল নি। বরং যখন জানা গেল যে ওঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, ব্যাঙ্কে বেশ টাকা আছে, কোলকাতায় বাড়ি আছে, মরিস 'কার' আছে, বড় বড় লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে তখন তো তুমি খল খল করে' উঠেছিলে আনন্দে, গলে পড়েছিলে—"

"মুখ সামলে কথা বল্। ভদ্রভাবে কথা বলতেও শিখিস নি? আমি গলে' পড়েছিলাম? খল-খল!"

"কি ব্যাপার কি—"

জিতুবাবু আর একবার এদিকে আসবার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু স্বয়ম্প্রভার উত্তোলিত তর্জ্জনীর নিষেধাত্মক আস্ফোলনে থেমে যেতে হল তাঁকে আবার।

অনীতা বললে—"উনি সত্যি খারাপ এ সন্দেহ থাকলে কিছুতেই বিয়েতে রাজি হতে না তুমি। সে সন্দেহ তোমার ঘুণাক্ষরে ছিল না। আর উনি যে সত্যিই খারাপ তা এখনও প্রমাণিত হয় নি—"

"এই যদি তোমার বুদ্ধি হয় না তাহলে বুঝতে হবে অনেক দুঃখ নাচছে তোমার কপালে। এ দেশের ঘরে ঘরে যে সব সতী সাধ্বীরা অপমানিত হয়েও স্বামীদের অধঃপতনে বাধা দেয় না তোমাকেও তাদের দলে গিয়ে হায় হায় করতে হবে সারাজীবন—"

"না, হবে না। তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওঁর কোনও অধঃপতন হয় নি। বাবা যেমন নিষ্কলঙ্ক আমার বিশ্বাস উনিও তেমনি—"

"দেখ মা পুরুষমাত্রেই উড়তে চায়। সে উড়বে কি না তা নির্ভর করে তার স্ত্রীর উপর। সব ঘোড়ায় চালই বদচাল তাকে ঠিক চালে চালাতে পারে তাদের সওয়ার—" বলিই গর্দ্দান ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চাইলেন একবার।

"বিশ্বাস করি না ওসব কথা আমি। উনি যা করেছেন তার কারণ আছে নিশ্চয়ই একটা। গেলেই বোঝা যাবে"

"যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। একটা মাগীকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে পড়ে' আছে তবু বলে কি না—"

"বিশ্বাস করি না আমি"—চীৎকার করে' উঠল অনীতা —"হয়তো ভুলিয়ে নিয়ে গেছে—কিম্বা—"

"ভুলিয়ে নিয়ে গেছে! আগে থাকতে খবর করে' স্টেশনে এসেছে, বলে কি না ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। কচি খোকা! মোরা দেখে ভুলে গেলেন!"

"সে যাই হোক, তুমি এ নিয়ে মাতামাতি করছ কেন"

"কর্ত্তব্য করছি। মাতামাতিটা কোনখানে দেখলি তুই"

"যখন থেকে ব্যাপারটা শুনেছ তখন থেকে তো উন্মত্ত হয়ে উঠেছ। তোমার জামাই দুশ্চরিত্র এটা আবিষ্কার করে' দিগ্বিজয় করে' ফেলেছ যেন একটা—"

"মুখ সামলে কথা বল অনি। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। চুপ করে' বসে থাক একধারে।"

"এ সব ঘিয়েটারি কাণ্ড ভাল লাগে না আমার"

"ঘিয়েটারি কাণ্ড করছে কে—আমি না তুই"

"বাবাকে নিয়ে এই যে তুমি ছুটছ এর কোনও মানে হয়?"

"এ সব কথা শোনবার পর কি ঘরে' বসে থাকা সম্ভব?"

"আমার একা এলেই যথেষ্ট হত। আমি একাই তার সঙ্গে দেখা করতে চাই"

"ও! একা দেখা করতে চাও?"—স্বপ্রভার বলিষ্ঠ চিবুকের পেশীগুলি কুঞ্চিত হল—"একা দেখা করে' তার বানানো গল্পগুলি বিশ্বাস করতে চাও? এমনি করেই তো আরম্ভ হয়! একবার যদি ওদের বানানো গল্প বিশ্বাস করতে আরম্ভ কর—ব্যস্ তাহলেই হয়ে গেল—অন্তের মতো হয়ে গেল। বেশী দিন লাগবে না, ছ'মাস"—হঠাৎ স্বপ্রভা বামকরপল্লবটি বিস্ফারিত এবং দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি উত্তোলন করে চীৎকার করে' উঠলেন—"ছ'মাসের মধ্যেই ডুব মারবে। টিকিটি দেখতে পাবে না আর"

"আমার স্বামীর সঙ্গে আমি নিজের মতো করে' বোঝাপড়া করব। তাও করতে দেবে না আমাকে? এ কি জবরদস্তি তোমার"

"যারা অসুস্থ তাদের জবরদস্তি করেই ওষুধ গেলাতে হয়। এ জবরদস্তি নয়, বাঁচাবার উপায়। তোমার নিজের মতো করে' করতে গেলেই হয়েছে। তোমার চোখে ধুলো দিতে কতক্ষণ?"

"কিন্তু এরকম কেলেঙ্কারি করার কি দরকার ছিল? শুটিসুদ্ধ মিলে—"

"কেলেঙ্কারি যাতে বেশী দূর না গড়ায় তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। এখন থেকে ব্যবস্থা না করলে—টিটি পড়ে' যাবে। লোকসমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না তখন—"

"কি ব্যাপার কি"—জিতুবাবু আবার বললেন।

"তোমার আর শুনে কাজ নেই। ওইখানেই থাক তুমি"

"তাই তো আছি"

"তাই থাক"

জিতুবাবু মেয়ের দিকে চাইলেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে সহানুভূতি যেন উপচে পড়ছিল। অনীতাও আড়চোখে একবার চাইলে বাবার দিকে। জিতুবাবুর মনে হল সে যেন নীরবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে কিন্তু জিতুবাবু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

"কি নিয়ে এত বকাবকি করছ তোমরা"—একটু ইতস্ততঃ করে' আর একবার বললেন তিনি। একটু সরেও এলেন।

"তুমি আবার আসছ এদিকে! ওই দিকে থাক না যেমন আছ—আরও সরে' যাও বরং কোণের দিকে। আমাদের কথায় কোড়ন দিতে হবে না তোমাকে"

"তোমাদের কাছে বসতেও দেবে না নাকি। সমস্ত পথটা একা একা আমাকে বসে' থাকতে হবে ওই কোণে!"

"সারাটা জীবনই তো আমাদের কাছে বসে আছ। কিছুক্ষণ দূরেই থাক না। সিগারেট খাও না"

"আমাকে সঙ্গে করে' আনবার কি দরকার ছিল"

হঠাৎ দু'হাত তুলে বলে উঠলেন জিতুবাবু।

অনীতা মায়ের দিকে চেয়ে বললে, "কেন, বাবা আমাদের কাছে এসে বসলে ক্ষতি কি"

"মেয়ে হয়ে তুমি মাকে যে সব কথা বলছ তা যাতে ওঁর কানে না যায় তাই ওঁকে দূরে থাকতে বলছি—"

"এমন কিছুই বলা হয় নি তোমাকে। সব কথা শুনলে বাবা আমার দিকেই রায় দেবেন"

"কি কথা—"

আর একটু এগিয়ে এলেন জিতুবাবু।

"বাড়িতে সিগরেট ফুঁকতে পেলে তো আর কিছু চাও না। ইঞ্জিনের মতো ফস ফস করে' ধোঁয়া ছাড় খালি। তখন তো বকেও থামানো যায় না তোমাকে। এখন সুযোগ পেয়েছ তাই করগে যাও না"

অনীতা বাবার দিকে চেয়ে বললে—"আমি মাকে বলছি ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও তোমরা। তোমরা এর মধ্যে মাথা গলাতে যাচ্ছ কেন"

"ঠিকই তো"—জিতুবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন।

স্বপ্রভার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠল। দাঁতের ভিতর দিয়ে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বসে রইলেন তিনি গুম হয়ে। অনীতা বলতে লাগল—"মা বলছে যে একা তার সঙ্গে দেখা করলে আমি নাকি কিছু বলব না। যদি দেখি সত্যিই তেমন কিছু নয় বলব কেন, কি বল"

তার কালো চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক আলো চকমক করে' উঠল।

"সত্যি সত্যি তার কোনও দোষ আছে কিনা সেইটেই তো সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করা দরকার। আমার মনে হয় ও কিছু নয়"

"ও!"

ফোঁস করে' উঠলেন স্বপ্রভা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, ট্রেনের ঝাঁকানি সত্ত্বেও নিজের ভারসাম্য এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে' বললেন—"তাহলে আমিই ওদিকে গিয়ে বসি। তোমরা বাপ বেটিতে ব'সে পরামর্শ কর। কিন্তু আমার একটা কথা লিখে রাখ—দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছবে, চিটিকার পড়ে' যাবে চতুর্দ্দিকে···"

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মভূমি

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম শিক্ষিত সমাজের বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতি সুপরিচিত। চৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ। বৃন্দাবনবাসের চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্টরূপে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। ইহাতে একাধারে যেরূপ হইয়াছে দার্শনিক তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও অতি উচ্চ স্তরের কবি-প্রতিভার সমন্বয় দৃষ্ট হয় বিশ্ব-সাহিত্যে তাহার তুলনা অতি অল্পই মিলে। গীতা যেরূপ উপনিষদসমূহের সার স্বরূপ, চৈতন্যচরিতামৃতও সেরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের গ্রন্থনিচয়ের নির্য্যাস স্বরূপ। বস্তুতঃ এই একখানি মাত্র গ্রন্থ অভিনিবেশ ও অনুধাবন সহকারে পাঠ করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এই মহাগ্রন্থ রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় "গোবিন্দলীলামৃত" নামক রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণন বিষয়ক একখানি সুমধুর কাব্য ও বিদগ্ধমাধব কৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" "রসিক-রঞ্জনী" নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন।(১)

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার অধীন ঝামটপুর পল্লীতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম তারিখ, বংশ-পরিচয় ও সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। তিনি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ঝামটপুরের অধিবাসীগণ পুরুষ-পরম্পরাক্রমে তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়াই জানেন। বর্ত্তমানে ঝামটপুরে কোনো বৈদ্যের বাস নাই। বিগত ৮ই ফাল্গুন, রবিবার কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাবতিথি উপলক্ষে ইপাট ঝামটপুর গিয়া অনেক শিক্ষকের নিকট শুনিলাম যে ঝামটপুরের অনতিদূরবর্ত্তী বৈদ্যপুর নামক গ্রামে বৈদ্যের বাস আছে এবং তাঁহারা নাকি কৃষ্ণদাস কবিরাজের জ্ঞাতিবংশীয়। তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত কুলজীতে কৃষ্ণদাসের পিতার নাম ভগীরথ বলিয়া উল্লিখিত আছে। যথার্থই যদি এরূপ কোনো কুলজী থাকে, তবে তাহা প্রকাশিত হওয়া উচিত। উহা দ্বারা কৃষ্ণদাসের জাতি সম্বন্ধে বাদানুবাদের অবসান হইতে পারে।

কৃষ্ণদাসের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এবং তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনাকাল সম্বন্ধেও মতান্তর আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকল কথা আমাদের আলোচ্য নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে তাঁহার জন্ম হয়, এই কথাটি বলিলেই এস্থানে যথেষ্ট হইবে।

কৃষ্ণদাসের জন্মস্থানী ঝামটপুর যাইতে হইলে পূর্ব্ব রেলপথের ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইনের বহড়ান হল্ট নামক ছোট ষ্টেশনে নামিতে হয়। হাওড়া হইতে বহড়ান ৯৯ মাইল দূর। ঝামটপুর বহড়ানের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত এবং ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দূর। ষ্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বহড়ান গ্রামের মধ্য দিয়া ঝামটপুর এবং তথা হইতে আরও তিন মাইল দূরবর্ত্তী পরাতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এই রাস্তা দিয়া অনেকে সযত্নে যাওয়া যায়। পূর্ব্ব হইতে খবর দিলে মহিষের গাড়ীও পাওয়া যায়।

ঝামটপুর উত্তর রাঢ়ে অবস্থিত। কাটোয়ার কিছু উত্তরে অজয় নদ আঙ্গিয়ার সহিত মিশিয়াছে। এই নদের উত্তর দিকস্থ ভূভাগ উত্তররাঢ় ও দক্ষিণ অঞ্চল দক্ষিণরাঢ় নামে প্রসিদ্ধ। রাঢ়ের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ও ঝামটপুর প্রভৃতি পল্লীর ভূমি স্থানে স্থানে উচ্চাবচ ও মৃত্তিকা কিছু কঠিন ও ঈষৎ কঙ্করময়। সেজন্য কারণে এই অঞ্চলে নিম্ন বঙ্গের মত ঘোর-জঙ্গল বড় একটা জন্মে না। বৃক্ষাদির মধ্যে তালবৃক্ষের সংখ্যাই অধিক, নারিকেল, সুপারি বা খেজুর গাছ বড় একটা চোখে পড়ে না। স্থানে স্থানে তালবৃক্ষবেষ্টিত জলাশয় উন্মুক্ত প্রান্তরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, আবার কোথাও বা পথপ্রান্তে, কোথাও শস্যক্ষেত্রের সীমান্তে অশ্বত্থবৃক্ষরাজি ছায়াশীতল কুঞ্জ রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এদিককার গ্রামগুলি পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গ্রামের গৃহগুলি রাস্তার দুই পার্শ্ব দিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত—পথ চলিতে চলিতে অনেকের যেন কোন বাজারের মধ্য দিয়া যাইতেছি। অধিকাংশ গৃহই মৃত্তিকানির্ম্মিত ও দ্বিতল। গৃহের চালগুলির মধ্যভাগ ধনুকের মত বাঁকানো ও চারিদিকে খুব ঢালু—ঠিক যেন জোড়বাংলার ঘরের মত। দূর হইতে দেখিলে অনেক সময়ে খেপরদিয় বলিয়া ভ্রম হয়। অধিকাংশ গৃহের সম্মুখের দেওয়াল যেন পরিপাটিরূপে মার্জ্জিত ও নানা প্রকার আলিপনায় রাঙ্গা চিত্রিত। কৃষ্ণদাসের জন্মস্থানীয় নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনা :—

"রাঢ়দেশ ভূমি বড় দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে অশ্বত্থমণ্ডলী মনোহর।
স্থানে স্থানে সুন্দর স্থান পোখরে গাভীগণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।"

(চৈতন্যভাগবত, আদ্য, ১ম)

---

(১) কটোয়া হইতে প্রকাশিত "রাগময়ীকণা", "স্বরূপ বর্ণনি" প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্রাকার পত্রগ্রন্থে রচয়িতার নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়া উল্লিখিত আছে। বলা আবশ্যক, যে এই পুস্তিকাগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা নহে। উহা সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। সহজিয়া সম্প্রদায়ের যে গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ এই গ্রন্থগুলির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বা সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

বহড়ান গ্রাম পার হইলে ছোট একটি মাঠ, তার পরই ঝামটপুর। গ্রামের প্রায় পূর্ব্ব প্রান্তে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাস্তভিটা অবস্থিত। এই স্থান পাটবাড়ী নামে পরিচিত। পাটবাড়ীর পিছন দিক দিয়া একটি গলিপথ ধরিয়া মন্দিরের বাম পার্শ্ব দিয়া পাটবাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি সাধারণ গৃহের আকারের একটি ছোট বাংলা। সম্মুখ দিকে ছিনটি খিলানযুক্ত একটি ছোট বারান্দা। এই গৃহটি খুব বেশী দিনের নহে, তথাপি সংস্কারের অভাবে ইহা জীর্ণপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এই দেবালয়ের মধ্যে বাণ-নির্দ্মিত গৌর-নিতাই, একটি শালগ্রাম শিলা, রাধাকৃষ্ণের কুদ্রাকৃতি যুগল বিগ্রহ, একখণ্ড বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিলা ও গিরিধারী গোপালের ধাতুনির্দ্মিত বিগ্রহ বিরাজমান। শেষোক্ত বিগ্রহ অর্থাৎ গিরিধারী গোপালই এই পাটবাড়ীর আদি দেবতা। ইনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৌলিক বিগ্রহ। অন্যান্য বিগ্রহগুলি পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই সকল বিগ্রহ ছাড়া এখানে চৈতন্যচরিতামৃতের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি আছে। উহা কৃষ্ণদাসের শিষ্য মুকুন্দদাসের স্বহস্ত লিখিত বলিয়া কথিত। মুকুন্দদাস বাকি কৃষ্ণদাসের নিজের লেখা মূল পুঁথি হইতে এই অনুলিপি প্রস্তুত করেন। মুদ্রিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বহু পাঠান্তর আছে এবং তদনুসারে তত্তৎ স্থানের বিভিন্ন—এমন কি অনেক সময়ে পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যাও করা হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যানুরাগী স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোকের অনুরোধ অবগত হইলাম যে, কয়েক ছত্রের ব্যাখ্যার জন্য এই পুঁথি দেখিয়া তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এই পুঁথিখানি মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা চৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃত অর্থবোধের সহায়তা হইতে পারে।

মন্দিরের সম্মুখে টিনের ছাদ-দেওয়া একটি ছোট নাটমন্দির। বছর বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরনিবাসী জনৈক ভক্ত ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে পাঠ কীর্ত্তনাদি হয়। নাটমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইষ্টক নির্ম্মিত একটি কুটুরি। উহাকে ভজন-কুটীর বলা হয়। জনসাধারণের বিশ্বাস যে সংসারে থাকার সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ এখানে বসিয়া ভজন করিতেন। কুটুরিটি আধুনিক কালে নির্ম্মিত এবং সংস্কারাভাবে অধুনা জরাজীর্ণ। দেবালয়ের উত্তর-পূর্ব্বকোণে একটি ছোট পুষ্করিণী আছে ইহারও আশু সংস্কার প্রয়োজন। পাটবাড়ীর দক্ষিণদিকে কয়েকটি গাছপালা ও একটি ডোবা, পূর্ব্বদিকে খোলা মাঠ এবং উত্তর ও পশ্চিমদিকে লোকের বাড়ী। একজন পুরী বৈষ্ণব এই পাটবাড়ীর সেবায়েত। স্ত্রী পুত্র লইয়া তিনি পাটবাড়ীর সংলগ্ন একটি বাটীতে বাস করেন। স্থানীয় লোকেদের নিকট তিনি মহান্ত নামে পরিচিত। মাত্র ৭।৮ বিঘা ধানের জমি ছাড়া পাটবাড়ীর অন্য কোন সম্পত্তি নাই, সুতরাং সেবার কোন সৌষ্ঠব নাই। তিনি বর্ত্তমান সেবায়েত, সেবা-পূজার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হইল না। এই পাটবাড়ীতে যাত্রীদের জন্য কিছুমাত্র বন্দোবস্ত নাই, দূরাগত যাত্রী-দলের জন্য বিশ্রামাগার ও তাঁহাদের আহারাদির কোনই ব্যবস্থা নাই। প্রবীণের নীচেই অন্ধকার—কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম সুধী সমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার স্বগ্রামবাসীগণ তাঁহার সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানেন এবং তাঁহার গৌরবস্মৃতিবিজড়িত স্থানের ইতিহাসকে আদৌ মনোযোগী নহেন।

একমাত্র গিরিধারী গোপাল বিগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণদাসের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন নিদর্শন নাই। এইস্থানে কোন প্রাচীন কীর্ত্তি চোখে পড়িল না। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যথাযথি শ্রেণীর গৃহস্থ ছিলেন। এখন যেমন, সম্ভবতঃ তাঁহার সময়েও এই অঞ্চলে বাটীর ঘরের সংখ্যাই বেশী ছিল—অট্টালিকা বা মট্টালিকাদি ছিল না। থাকিলে উহাদের ধ্বংসাবশেষ অবশ্যই থাকিত।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মাত্র একস্থানে ঝামটপুরের উল্লেখ আছে এবং স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ঐ গ্রামেই যে কৃষ্ণদাসের জন্মস্থান, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজে কি ভাবে নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করেন, সেই কথা বলিতে গিয়া কৃষ্ণদাস যাহা লিখিয়াছেন, মাত্র তাহা হইতে তাঁহার সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানিতে পারা যায়। উহা হইতে জানা যায় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাটীতে এক শ্রীমূর্ত্তির (গিরিধারী গোপালের) নিত্য-সেবা হইত এবং পুরাবর্ত্ত মিশ্র নামক জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাজ করিতেন। একদা কৃষ্ণদাসের বাটীতে অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হয় এবং বহু বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হইয়া উহাতে যোগদান করেন। নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে মীনকেতন রামদাস নামে নিত্যানন্দের জনৈক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ইনি নিরন্তর প্রেমে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য যে সকল আচরণ করিতেন তাহা সাধারণের চক্ষে বড়ই অদ্ভুত লাগিত। ইনি কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে সকল বৈষ্ণব উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন কৃষ্ণদাসের নিজের কথায় তাহা শুনুন :—

"নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে, কারারে চাপড়ে।
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার।
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে বাচ্য তার—আর অঙ্গে কম্প।
'নিত্যানন্দ' বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার।"

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

মীনকেতন রামদাস যখন অঙ্গনে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে কোন কার্য্যবশতঃ পুরাবর্ত্ত মিশ্র সেখানে আগমন করেন। মিশ্র ঠাকুর নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং রামদাসকে দেখিয়াও কোনরূপ সম্ভাষণ করিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রামদাস তাঁহাকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিলেন। মিশ্র ঠাকুর কিন্তু তাহাতে রাগ করিলেন না, কারণ মীনকেতন রামদাসের প্রকৃতি তাঁহার ভালভাবেই জানা ছিল। রামদাসের দ্বিতীয় সংবর্ষ উপস্থিত হইল কৃষ্ণদাসের ভ্রাতার সহিত।

(স্থানীয় ব্যক্তিগণের মতে, ইঁহার নাম—শ্যামদাস)। কৃষ্ণদাসের ভ্রাতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া মানিতেন, কিন্তু নিত্যানন্দ—বলরামের অবতার কি না সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। এই ব্যাপার লইয়া নিত্যানন্দের একান্ত ভক্ত মীনকেতন রামদাসের সহিত তাঁহার যেন বচসা হইল : কৃষ্ণদাস যুক্তি তর্কের দ্বারা তাঁর ভ্রাতার মত পরিবর্তনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। রামদাস একই দুঃখ হইলেন যে সেখানে নিজের হাতের বাঁশীটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া (পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দেওয়ার মত নয় কি ?) চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন, "তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ"। এখানে 'সর্ব্বনাশ' বলিতে কি বুঝায় সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, যে মহৎ-অপমানের ফলে কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা হঠাৎ কোন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সেই দিনই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবার কেহ কেহ বলেন যে এখানে 'সর্ব্বনাশ' শব্দের অর্থ পারমার্থিক অনিষ্ট অর্থাৎ মীনকেতন রামদাসের সহিত এরূপ ব্যবহারের ফলে কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা ভক্তির পথে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না ; তিনি "পাষণ্ড"-গণের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলেন। যেটির উপর এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য কৃষ্ণদাসের মন বড়ই বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সেই সময়েই নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বপ্নে দেখা দিলেন।

"নৈহাটী(১) নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দরাম।
স্বপ্নচ্ছলে মোরে আসি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদ-পদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে।
'উঠ উঠ' বলি মোরে বোলে বারবার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার।"

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৫)

যে মনোহরবেশে নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে দেখা দেন, অতি সুললিত ভাষায় কৃষ্ণদাস তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকপাঠিকাগণকে স্বয়ং সেই অংশ পাঠ করিয়া আস্বাদনের জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।—ইহার পর কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন—

"আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী—
'আরে আরে কৃষ্ণদাস ! না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয়।'

এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির পর কৃষ্ণদাস আর কালবিলম্ব না করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে গিয়া রূপ-সনাতনপ্রমুখ গোস্বামীগণের কৃপা লাভ করতঃ কৃতকৃতার্থ হইলেন। বৃন্দাবনবাসী বিখ্যাত ছয় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস (মতান্তরে রঘুনাথ ভট্ট) গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাস তাঁহারই সহিত রাধাকুণ্ডের তীরে অবস্থান করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় বহু তাত্ত্বিক ও "গোবিন্দ-লীলামৃত" মহাকাব্য প্রণয়ন করার ফলে তিনি অল্পদিনের মধ্যে বৃন্দাবন-বাসী বৈষ্ণব সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এবং কবি-প্রতিভার জন্য বৃন্দাবনের বৈষ্ণব বিদ্যাবিতরণ শ্রীজীব-গোস্বামী কর্তৃক 'বিদ্বদ্বৈষ্ণব রাজসভা' নামে চিহ্নিত) হইতে "কবিরাজ" ("কবি-সম্রাট্"-এর অনুরূপ) উপাধি লাভ করেন। ইহার পর সর্ব্বত্র তিনি "কবিরাজ গোস্বামী" নামে সুপরিচিত হন। প্রায় বৃদ্ধবয়সে তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আদেশে তাঁহার অমর গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বহু পরিশ্রমের দ্বারা উহা সমাপ্ত করেন। তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধেও নানা উপাখ্যান ও মতভেদ প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী বা প্রত্নালোচনা আমাদের লক্ষ্য না হওয়ায় এ বিষয়ে কোন কিছু বিবৃত হইল না।

অতি পরিণত বয়সে বৃন্দাবনধামে আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাব ঘটে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার গুরু রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীও এই একই তিথিতে (অবশ্য বিভিন্ন বৎসরে) স্বস্ব সাধনোচিতধামে গমন করেন। এরূপ যোগাযোগ বড় একটা দেখা যায় না।

নিত্যানন্দের আবেশে কৃষ্ণদাস যে দিন তাঁর জন্মভূমি ঝামটপুর ত্যাগ করেন, তাহার পর আর কোন দিন তিনি সেখানে আসেন নাই। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার গৃহ-দেবতা গিরিধারী গোপাল ঝামটপুরেই রহিলেন। এই দেববিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়াই উত্তরকালে ঝামটপুরে পাটবাড়ীর সৃষ্টি হইল। কবিরাজ গোস্বামীর তিরোধানের পর হইতে বাংলার বিভিন্ন স্থানের বৈষ্ণবগণ তাঁহার স্মরণ-উৎসব পালন করিবার জন্য বৎসর বৎসর তাঁহার জন্মভূমিতে সমবেত হইয়া তত্ত্বশ্রেষ্ঠিত-বিগ্রহের সম্মুখে তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। বিগত তিন শত বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া এই মহোৎসব চলিয়া আসিতেছে। একাদশী হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত এই তিন দিন ধরিয়া ঝামটপুর-পল্লী উৎসব-মুখরিত হইয়া উঠে। অন্যূন তিন হাজার বৈষ্ণব-নরনারী ও ভক্তগণ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়াগণ এই উপলক্ষে ঝামটপুরে সমবেত হইয়া কবিরাজ গোস্বামীর নামে কীর্ত্তন করেন :—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত-রাজ
যে লিখিল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিলে গলয়ে শিলা
না ভুলিল তাহে মোর চিত।
তাঁহার চরণে সঙ্গ তাঁর সঙ্গে যাঁর সঙ্গ
তাঁর সঙ্গে নৈল কেন বাদ।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।"

(১) এই নৈহাটি যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নৈহাটি নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। এইস্থান ঝামটপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহার নিকটেই যবন গোপালের অন্যতম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আদি-নিবাস 'উদ্ধারণপুর' গ্রাম। শ্রীচৈতন্যকালে এই নৈহাটি খুব বর্দ্ধিষ্ণু স্থান ছিল। প্রবাদ অনুসারে এখানে নৈ-রাজা নামে এক রাজার বাটী ছিল। আজিও কতকগুলি ভগ্নস্তূপকে রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। রূপ-সনাতনের প্রপিতামহই পরবাস শিখরভূম ত্যাগ করিয়া নৈহাটীতে আসিয়া বসবাস করেন ও পরে তথা হইতে পূর্ব্বঙ্গের বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। শ্রীজীব-গোস্বামীর লঘুতোষণীতে নৈহাটীর সংস্কৃত নাম "নবহট্ট" বলা হইয়াছে।

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পুবপাড়ার তরুণ-সমিতি ভারী সুন্দর জায়গায়।

একটা পুরোণো সেকেলে জমিদার বাড়ি। মোটা মোটা থাম, উঁচু উঁচু খিলান। দোতলা অতিকায় বাড়িটার ওপরতলাটা প্রায় খসে পড়েছে, ভাঙা ছাতের ওপরে ঘাস গজিয়েছে, গজিয়েছে বট পাকুড়ের চারা। সাদা বাড়িটার সর্বাঙ্গ কালচে সবুজ ছাওলায় আচ্ছন্ন, তার ভেতর দিয়ে সরু মোটা অসংখ্য সাপের মতো ছড়িয়ে আছে বাদামী রঙের শিকড়। নীচের তলায় কতগুলো ঘর এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তবে জানলা কবাটের বালাই নেই। বছর সাতেক আগেও এই জমিদার বংশের অবশিষ্ট কজন নাকি এ বাড়িতে বাস করত—বিধবা মা, কুমারী মেয়ে আর এক হিন্দুস্থানী চাকর। একদিন সকালে দেখা গেল মা আর মেয়ে গলাকাটা অবস্থায় খাটের ওপরে পড়ে আছে, ঘরময় রক্ত। আর বাক্স প্যাটরাগুলো সব ভাঙা—হিন্দুস্থানী চাকরটাও অদৃশ্য।

সেই থেকে এই বাড়ি পরিত্যক্ত। কোনো দাবীদার একে অধিকার করতে আসেনি। খুন আর ভাঙাচুরো অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভূতুড়ে বাড়ি বলে এর নাম রটেছে, ছড়িয়েছে নানারকম অদ্ভুত আর অলৌকিক কাহিনী। সামনে একটা ছোট মাঠ, তার ভেতরে কোমর সমান ঘাস আর বিছুটির জঙ্গল মাথা তুলেছে। তা ছাড়া চারপাশে খুপরী আমের বাগান। সেকেলে সমস্ত জংলা গাছ—এককালে হয়তো ভালো আম হত, কিন্তু এখন যা হয় তা দুর্গান্ত টক আর পোকা লাগা। সর্বজুক্ ছেলেরা পর্যন্ত এ বাগানের দিকে পা বাড়ায় না, অবশ্য ভূতের ভয়ও যে এক আধটু না আছে এমন কথাও বলা যায় না।

কিন্তু 'তরুণ-সমিতি'র ছেলেরা একটু গোঁয়ার, তাই বেছে বেছে এই নির্জন অখণ্ডিতরা জায়গাতেই তাদের আখড়া গড়ে তুলেছে। বিছুটি আর ঘাসবনভরা মাঠটাকে কোদাল দিয়ে চেঁছে পরিষ্কার করে ফেলেছে, খসিয়েছে প্যারালাল বার, রিং ঝুলিয়েছে, তুলিয়েছে বক্সিংয়ের বালির বস্তা। তা ছাড়া খেলার ব্যবস্থাও আছে, একপাশে করা হয়েছে দাড়িয়াবান্ধা (গাদী) আর ব্যাড্‌মিন্টনের ঘর। লাইব্রেরীটা তবে এখানে নয়, সেটা পাড়ার মধ্যে ক্লাবের একজন মেম্বারের বাড়িতে।

ওরা দুজনে 'তরুণ-সমিতি'র জিম্‌ন্যাস্টিক্ ক্লাবে গিয়ে যখন পৌঁছুল, তখন চারদিকে শাম-বিকেল। ঝুপসা আমবাগানের আড়ালে বেলা শেষের রাঙা সূর্য হারিয়ে যাচ্ছে। ক্লাবের প্রায় পনেরো বিশটি ছেলে একান্ত অভিনিবেশ সহকারে শরীর চর্চায় ব্যস্ত। কয়েকজন কুমীরের মতো লম্বা হয়ে হস্ হস্ করে বুক-ডন দিচ্ছে, একজন ঝুলছে রিংয়ের সঙ্গে, আর একজন প্যারালাল বারে হাঁটু ভাঁজ করে আটকে দিয়ে মাথা নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে দোল খাচ্ছে—ছবিতে দেখা শিল্পীর মতো। একজন দু হাতে দুটো বক্সিং গ্লাভ্‌স পরে ঘাঁই ঘাঁই করে ঘুষি বসাচ্ছে ঝুলন্ত বালির বস্তায়, পরিমল পরে বলেছিল, অমনি করলে নাকি ঘুষির ওজন বাড়ে। আর আখড়ায় ঢুকতেই সব চাইতে আগে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে একটা আশ্চর্য মানুষ। কুচকুচে কালো রঙ, ছফুট লম্বা একজন মানুষ। চওড়া চিতানো বুক—যেন লোহায় গড়া চেহারা। মাথার ওপর মস্ত একখানা লাঠি নিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে—এত জোরে ঘোরাচ্ছে যে লাঠিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু চোখে পড়ছে যেন একটা বিরাট চাকার সূক্ষ্ম উড়ন্ত রেখা। দৃঢ় বিশাল শরীরের পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ছোট বড় অসংখ্য 'মাস্‌ল' ঢেউয়ের মতো উঠছে পড়ছে, বাইসেপ গুলো ফুলে ফুলে উঠছে এক একটা লোহার পিণ্ডের মতো। তিন চারটি ছেলে লাঠি দিয়ে তার মাথায় ঘা দিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই প্রচণ্ড অশরীরী ঘুর্ণির কাছে গিয়ে চটাস্ চটাস্ করে তাদের হাতের লাঠিগুলো ঠিকরে

ফিরে আসছে, একজনের লাঠি তো ছিটকে বেরিয়েই চলে গেল হাত থেকে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে রঞ্জু চেয়ে রইল। বললে, অদ্ভুত।

পরিমলও সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল। রঞ্জুর কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, অদ্ভুত, তাই না? উনিই বেণুদা, আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারী। বলতে গেলে ক্লাবের সব।

কথাটা পরিমল না বলে দিলেও রঞ্জু বুঝতে পারত। ওই স্বাস্থ্য, লাঠির ওপর অমন অপূর্ব দখল—এ লোক ছাড়া কে আর ক্লাবের সেক্রেটারী হবে!

সম্ভ্রমভাবে পরিমল বলে চলল, এক লাঠির যে কতরকম কসরৎ উনি জানেন তার সংখ্যা নেই। আর শুধুই কি লাঠি? বক্সিংয়ের সময় ওঁর একটা মাঝারি সাইজের ঘুষি খেলে পনেরো মিনিট ধরে আমাদের মাথা ঘুরতে থাকে। রিং আর বারের এমন কিগার নেই যা করতে পারেন না। এক নাগাড়ে ছেচল্লিশ ডন দিতে পারেন—একটু কষ্ট হয় না।

একটু পরেই লাঠি খেলা বন্ধ হল। কালো কুচকুচে একটা মূর্তির ওপরে বার্নিশ ছেলের মতো ঘাম চক চক করছিল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেললেন বেণুদা, এগিয়ে এলেন সেদিকে যেখানে ওরা দুজনে দাঁড়িয়েছিল। পরিমল কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ভরাট গম্ভীর গলায় কথা বলে উঠলেন বেণুদা।

—তুমি, রঞ্জন না?

দুঃখ ভয় এবং গভীর বিস্ময়ের একটা মিশ্রিত অনুভূতি ঘোলা খেয়ে গেল রঞ্জুর মনে। কথার জবাব দিতে গিয়েও দিতে পারল না, কেমন যেন ধরে এল গলাটা।

বেণুদা এবারে হাসলেন: আমাদের জিমনাষ্টিক ক্লাব কেমন দেখছ রঞ্জন?

—খুব ভালো। কিন্তু—এতক্ষণে জড়তাটা কাটিয়ে উঠতে পারল রঞ্জু: আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে?

বেণুদা শুধু হাসলেন, কথাটার উত্তর দিলেন না। তারপর বললেন, আমাদের ক্লাবের মেম্বার হবে তো?

রঞ্জুর হয়ে পরিমল জবাব দিলে। সোৎসাহে বললে, নিশ্চয় হবে। সেই জন্যেই ওকে ধরে নিয়ে এলাম।

—বেশ, বেশ, খুব ভালো কথা।—ভরাট গম্ভীর গলায় বেণুদা বললেন, শরীর ভালো করা চাই সবার আগে। গায়ে যার জোর নেই, সেই পড়ে পড়ে মার খায়, আর যার জোর আছে পৃথিবীতে নিজের অধিকার সেই-ই প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারে। কী বলো রঞ্জন?

রঞ্জু মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয়।

ঘামের ওপরে বললেন বেণুদা, পাশে বসল ওরা দুজন। বেণুদার ঘামে ভেজা শরীর থেকে একটা গন্ধ আসতে লাগল রঞ্জুর নাকে কিন্তু ওই গন্ধটার ভেতরে যেন পাওয়া গেল শক্তির পরিচয়, পৌরুষের ব্যঞ্জনা।

বেণুদা বলে চললেন, তাই বলে অবশ্য আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য এই নয় যে শুধু শরীরকেই তাগড়া করতে হবে। সে শরীর কাবলীরও আছে, পাঞ্জাবীরও আছে। কিন্তু ফিজিক্ উইদাউট্ ব্রেন অ্যাণ্ড্ অ্যাক্টিভিটি—কোনো দামই নেই তার। শরীরকে আমরা ভালো করব শুধু নিজেদের জন্যে নয়, অন্য দশজনের জন্যে, সমাজের জন্যে। আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য সব রঞ্জনকে স্পষ্ট করে বুঝিয়েছ তো পরিমল?

পরিমল অপ্রস্তুত ভাবে মাথা নাড়ল, না।

বেণুদা লঘু ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন পরিমলের দিকে, পরিমল লজ্জা পেল। বেণুদা বলে চললেন, আমরা সব রকম সোশ্যাল সার্ভিস্ করবার দায়িত্বও নিয়েছি। ধরো নার্সিং। কোথাও কারুর অসুখ-বিসুখ করলে আমাদের ক্লাবের মেম্বারদাই নার্স করতে যায়। কেউ যদি অন্যায় করে তার প্রতিবাদ করি আমরা। দুষ্টের দমন করা আমাদের মস্ত একটা কাজ। সহরের গুণ্ডা-বদমায়েসরা যাতে আমাদের নামে ভয়ে কাঁপে, সে ব্যবস্থাও আমরা করব। এতো গেল শরীর চর্চার দিক। তা ছাড়া আমাদের লাইব্রেরী আছে, সেখানে বাছা বাছা বই রেখেছি আমরা। দেশের ছেলেরা যাতে মানুষ হয়, তাদের শরীর আর মস্তিষ্ক একই সঙ্গে গড়ে উঠতে পারে, এই হল আপাতত আমাদের প্রধান লক্ষ্য। পরিমল, ফেরবার পথে তুমি রঞ্জনকে আমাদের লাইব্রেরী দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।

পরিমল মাথা নেড়ে জানালো, আচ্ছা।

বেণুদা উঠে এগিয়ে গেলেন প্যারালাল বারের দিকে। পরিমল চাপা গলায় রঞ্জুকে প্রশ্ন করল, কেমন দেখলি ভাই বেণুদাকে?

এখানে এসে যে একটি কথা ক্রমাগতই রঞ্জুর মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, সেই কথাটাই সে বলতে পারল : চমৎকার।

পরিমল সায় দিয়ে বললে, হাঁ চমৎকার। একটু বেশি করে মিশলেই বুঝতে পারবি কি রকম প্রাণখোলা মানুষ।

ভোলা, কালী কিংবা খাঁদুর একটা মোংরা আবহাওয়া অথবা নিজের ভেতরে আত্মসম্পূর্ণ একটা রূপ-কল্পনার জগৎ-এর বাইরে এসে রঞ্জু যেন আজ দাঁড়িয়েছে একটা দিগন্তপ্রসারিত নতুন পৃথিবীর সম্মুখে। কোথায় ছিল এতদিন এই ছেলেরা, এই ক্লাব? স্বাস্থ্য, সবলতা। ইতরতা নেই, দুর্বুদ্ধি নেই, বিড়ি খাওয়ার উৎসাহ নেই, নষ্টচন্দ্রের সুযোগ নিয়ে পরের বাগানের ফল-পাকড় লুটতরাজ করবার মতো স্পৃহাও নেই কারুর। রঞ্জু যেন বায়োস্কোপের ছবি দেখছে সমস্ত। রিংয়ে, বারবেলে, ব্যাডমিন্টন আর দাড়িয়াবান্ধায়, ছোট বড় লাঠিতে বারো তেরো বছরের ছেলে থেকে শুরু করে কুড়ি বাইশ বছরের যুবক পর্যন্ত চমৎকার একটি দল। নতুন লাগে, অপরিচিত মনে হয়, কিন্তু এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কেমন করে এদের সঙ্গে একটা মানসিক সহযোগিতা ঘটে গেছে, এদের একান্তভাবে বোধ হচ্ছে নিজের সগোত্র বলে।

তবু কোথায় সূক্ষ্ম অতৃপ্তিবোধ মৃদু বেদনার মতো বিস্তীর্ণ হয়ে আছে রঞ্জুর। কিছুতেই ভুলতে পারেনি সেই ফাঁসির ডাক আর শহীদ সত্যেন। রক্তে রক্তে আগুন ধরে গেছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বুকের মধ্যে ফণা নাড়া দিয়েছে বাসুকী নাগ, দেশ ঘুমিয়ে পড়ল বলেই তো সে বশ মানতে চায় না। ওই বইগুলো যেন তার কাছে কোন এক যাদুকর সাপুড়ের তুবড়ী বাঁশির মাতাল করা ডাক পৌঁছে দিয়েছে, কিছু একটা করতে না পারা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই, তৃপ্তিও নেই।

কেমন যেন আশা হয়েছিল, এই ক্লাব তার সন্ধান বলে দেবে। এইখানে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে গুপ্ত দরজা, যার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোনো একটা মন্ত্র উচ্চারণ করলেই মাটির বন্ধন বিদীর্ণ হয়ে পাতালপুরীর দরজা খুলে যায়, দেখা যায় পদ্মে শোনা শাদা মার্বেল পাথরের একটা অতলান্ত সিঁড়ি বিশাল অজগরের মতো পাক খেতে খেতে কোথায় নেমে গেছে—নেমে গেছে কুদিরামের কামানের কারখানায়। কিন্তু শুধু শরীর ভালো করতে হবে, শুধু মস্তিষ্ককে উন্নত করতে হবে। এর বেশি কিছু নয়, এর অতিরিক্ত নেই কিছু। রাত জেগে কতগুলো অসুস্থ মানুষের সেবা করাই কি তরুণ সমিতির শেষ সার্থকতা? বোমার ফুলঝুরি, ছুরির নীলোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ফলকের মতো বিদ্যুতের এক ঝলক আগুন আর ছায়ামূর্তির মতো ফাঁসিকাঠে বিকীর্ণ যে আকাশ গঙ্গা—সে কত দূরে, কেমন করে তাকে স্পর্শ করা যায়?

সমস্ত আখড়াটা আশ্চর্য কতগুলো ধ্বনিতে মুখর। রঞ্জু অন্যমনস্কভাবে শুনতে লাগল।

—শিন্, তামেচা, বাহেরো—

লাঠির ঠকাঠক আওয়াজ।

ব্যাডমিন্টনের কোর্ট থেকে শব্দ : কাইল্ অল।

ধপাধপ্ করে ঘুষি পড়ছে বক্সিংয়ের বালির বস্তায়।

আস্তে আস্তে নেমে আসছে বেলা। আম বাগানের ঘন পত্রচ্ছায়ার আড়ালে লাল সূর্য ডুবে গেল। পরিমল চুপ করে কী ভাবছিল, রঞ্জু জিজ্ঞাসা করলে, তুই একসার-সাইজ্ করবি না?

—নাঃ, আজ আর নয়। কাল কুস্তি করে গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, আজকের দিনটা বিশ্রাম নিচ্ছি।

—ওঃ।

আবার চুপচাপ। পরিমল কেমন গম্ভীর হয়ে আছে, রঞ্জুর মনের ভেতরে আবার ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই আগুন-জ্বলা বইগুলো, কতগুলি অগ্নিপতঙ্গের মতো তাদের চলন্ত আর জ্বলন্ত অক্ষর। পরিমল জানে। ওই সুড়ঙ্গ পথটা তার জানা আছে। কেন সে বলে দেয় না রঞ্জুকে? কেন সে এমন করে ঘুরে ঘুরে সরিয়ে রাখছে ওকে?

—চল রঞ্জু, এবারে ওঠা যাক্—

রঞ্জুর উঠতে ইচ্ছে করল না। ক্লান্তস্বরে বললে, এখনি?

—আর একটু বসবি? কিন্তু লাইব্রেরী যে আবার বন্ধ হয়ে যাবে ওদিকে।

—ওঃ, চল্ তা হলে—

ওরা উঠতে যাবে, এমন সময় কাণ্ড হয়ে গেল একটা।

একটি ছেলে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে এল ছুটতে ছুটতে : বেণুদা, বেণুদা।

মাটিতে ঝুঁকে পড়ে বেণুদা তখন একটা ভারী বারবেল

তুলছিলেন, ধপাৎ করে সেটাকে ফেলে দিলেন মাটিতে। বললেন, ব্যাপার কী, কী হয়েছে?

—ফণীর মার ঘর থেকে সব জিনিসপত্র রাস্তার টান মেরে ফেলে দিচ্ছে। বাক্স-প্যাটরা, বাসন-কোসন সমস্ত।

ছ ফুট উঁচু লোহার মানুষ বেণুদা তীরের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত। লাঠির আওয়াজ, ব্যাড্‌মিন্টন কোর্টের হাঁকাহাঁকি, চারপাশের ছোট বড় কথা আর কোলাহল। পোড়ো জমিদার বাড়ি আর ঘাসে-ছাওয়া মাঠটার ওপর দিয়ে যেন একটা কঠিন স্তব্ধতা নেমে এল।

—কে ফেলে দিচ্ছে? হালদার?—বেণুদার গলা গম্ গম্ করে উঠল, প্রতিধ্বনি কাঁপতে লাগল ভাঙা বাড়িটার ঘরে ঘরে গুম্ গুম্ শব্দে।—হালদার ফেলে দিচ্ছে?

—শুধু হালদার নয়, তার সঙ্গে আরো চার পাঁচটা বণ্ডা লোক। লাঠিও নিয়ে এসেছে।

—পাড়ার লোকে কী করছে?

—দাঁত বের করে দেখছে সব, হাসছে। ফণী বাধা দিতে গিয়েছিল, একটা লোক তাকে এমন মেরেছে যে তার নাক দিয়ে দর দর করে রক্ত—

দুত তার সংবাদটা আর শেষ করতে পারল না। তার আগেই বেণুদা গর্জন করে উঠলেন।

—অ্যাটেন্‌শন!

সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব ব্যাপার ঘটে গেল একটা। ক্লাবের যেখানে যে ছিল, ব্যাড্‌মিন্টন আর দাড়িয়াবান্ধার কোর্ট থেকে স্কিং পর্যন্ত যারা এতক্ষণ নিতান্ত নিস্পৃহভাবে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছিল, নক্ষত্রবেগে ছুটে এল তারা। ড্রিলের ভঙ্গিতে সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল মাঠের মাঝখানে।

—লেফ্‌ট টার্ন—

একসঙ্গে কতগুলো পায়ের শব্দ করে দলটা ঘুরে গেল।

কার যেন উত্তেজিত স্বর শোনা গেল: লাঠি নেব বেণুদা?

—নো। কুইক্ মার্চ।

সঙ্গে সঙ্গে বেণুদাকে অনুসরণ করে দলটা এগিয়ে চলল।

রঞ্জু বসেছিল অভিভূতভাবে। কিছুই বুঝতে পারেনি। এতক্ষণ যে বারোস্কোপের ছবি দেখছিল এখন যেন তার রোমাঞ্চকর একটা অধ্যায়ে এসে সে পৌঁছেছে। এর পরে?

রঞ্জুর কাঁধে আলগাভাবে হাত রেখেছিল পরিমল, ডাকলে, রঞ্জু?

—অ্যাঁ?

—চল্।

উত্তেজিত স্বরে রঞ্জু বললে, কোথায়?

—তরুণ সমিতি কী করতে চায় তার পরিচয় পাবি?

ততক্ষণে একটা কিছু আঁচ করে রঞ্জু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে: মারামারি হবে নাকি ভাই?

—বড্ড বকাস্ তুই রঞ্জু, তাড়াতাড়ি চলে আয় না—পরিমলের কথার উত্তাপ আর বিরক্তি স্পষ্টভাবে ছুটে বেরুল। দলটা তখন অনেক এগিয়ে গেছে, ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল পেছনে পেছনে। তারপর দু তিন মিনিটের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছল পাড়ার ভেতরে, এই রহস্যময় ঘটনার অকুস্থলে।

কেমন একটা গোলমেলে আর বিশৃঙ্খল ব্যাপার। ছোট একখানা মেটে বাড়ি—গরীবের বাড়ি যে তা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। সেই বাড়ির ভেতর থেকে চার পাঁচজন লোক ঘরের খাটবিছানা থেকে আরম্ভ করে তৈজসপত্র যা কিছু বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। টাকমাথা খাটো চেহারার একটা লোক নির্দেশ দিচ্ছে তাদের। একজন বিধবা ভদ্র মহিলা চীৎকার করে কাঁদছেন, একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে মাটিতে বসে আছে নির্জীবের মতো, তার গায়ের ছিটের জামাটায় রক্তের ছোপ। আর একটু দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার ভদ্রলোকেরা, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই—সব যেন চিত্রকরা একদল কেইনগরের পুতুল।

বেণুদার দলটা গিয়ে পৌঁছুতেই টাকমাথা লোকটা তাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। তার ছোট ছোট চোখ দুটো দেখতে পেল রঞ্জু—সেই পড়ন্ত বেলাতেও দেখতে পেল যেন একটা ক্রূর কুটিলতায় তা চক্ চক্ করে উঠছে।

বেণুদা বললেন, হালদার মশাই, কী এসব?

হালদার কটু উগ্র কণ্ঠে বললে, তা দিয়ে দরকার কী আপনার?

বেণুদা হাসলেন। কালো মুখের ভেতর দিয়ে এক ঝলক শাদা শাদা দাঁত বেরিয়ে এল নিষ্ঠুর ভাবে: দরকার আছে বই কি। বিধবার ওপর এসব অত্যাচার চলবে না।

—নাঃ, চলবে না!—বিশ্রী একটা আমুখানের মতো দাঁত খিঁচুনি দিলে হালদার: যেন পুলিশ সায়েব এসেছেন। আমার বাড়ি, আমার ঘর, বিনা ভাড়ায় ছ' মাস থাকতে দিয়েছি—সেই দয়াই হল আমার কাল। এখন নড়তে চাইছে না, ইয়াকী নাকি?

বেণুদা শান্ত স্বরে বললেন, কিন্তু এভাবে ওদের বার করে দিলে ওরা যাবে কোথায়?

—যেখানে খুশি। কিন্তু আপনারাই বা কেন মাতব্বরী করতে এসেছেন? নিজের চরকায় তেল দিন না মশাই?

—আপনি ওদের জোর করে তাড়িয়ে দেবেন?

—হ্যাঁ, দেব দেব।—হালদার সশব্দে মাটিতে পা ঠুকল: আমার বাড়ি থেকে বের করে দেব আমি।

—কিন্তু ওরা যাবে কোথায়? আপনি ভদ্রলোক—উনি ভদ্রঘরের মেয়ে, কোথায় গিয়ে উনি দাঁড়াবেন?

হালদার এবারে চেঁচিয়ে উঠল।

—আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক! গাঁয়ে মানে না অথচ মোড়লী করতে এসেছেন। ভদ্রভাবে উঠে যেতে বলেছি, তখন তো যায়ই নি, আবার মেজাজ কত! ধর্ম্মো আছে, আইন আছে! জোর জুলুম চলবে না! ওঃ, তারী আমার ভদ্রঘরের মেয়ে রে! ওঁর দাঁড়াবার জায়গা আমার বাস্তুতে দিতে হবে। বেশ তো দাঁড়ান না গিয়ে কোনো বস্তিতে কিংবা খোলাপট্টিতে—

—চুপ রও অসভ্য জানোয়ার—

একটা বাজের গর্জ্জন কেটে পড়ল যেন। বেণুদার একটা প্রবল ঘুসিতে তিন হাত দূরে ঠিকরে পড়ল হালদার, নাক মুখ দিয়ে রক্তের ধারা নেমে এল দর দর করে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভেতরে যে লোকগুলো জিনিসপত্র টানাটানি করছিল, তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বাইরে। দুজনের হাতে দুখানা ছোরা ঝকঝক করে উঠল, পেশাদার গুণ্ডা ওরা—এর জন্যে এসেছিল তৈরী হয়ে।

তারপর শুরু হয়ে গেল মারামারি।

ভিড়ের মধ্যে হোরাগুদ্ধ একটা হাত উঠল, আর একখানা হাত পেছন থেকে তাকে টেনে নামিয়ে নিলে। চীৎকার, কোলাহল। কয়েকটা আর্ত্তনাদের শব্দ তীরের মতো চিরে দিলে আকাশকে, সমবেত ভদ্রলোকরা বিকট কলরব তুলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন।

মারামারি কিল চড় ঘুষি চলছে, পরিমল কোথায় ছিটকে চলে গেছে। রঞ্জুর বুক কাঁপছে বাঁশ পাতার মতো, হাঁটুর কাছটা যেন ভেঙে আসতে চাইছে আতঙ্কে, গা দিয়ে দর দর করে ঘাম পড়ছে। কী করতে যাচ্ছিল খেয়াল নেই, মনেও নেই—খুব সম্ভব ছুটে পালাবারই উদ্দেশ্য ছিল তার। কিন্তু তার আগেই কপালের ডানদিকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা যেন আকাশ থেকে শিকরে বাজের মতো ছোঁ দিয়ে পড়ল, যন্ত্রণায় চোখ বুজে এল রঞ্জুর, পরক্ষণেই সব ঝাপসা আর অস্পষ্ট—কোনো বোধই আর জেগে রইল না শরীরের কোনোখানে। (ক্রমশ)

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন

'কৌটিল্য'

অর্থনীতির দিকের সমাজে দুই শ্রেণির লোক আছে—পুঁজিবাদী ধনী, আর সর্ব্বহারা শ্রমিক। এ ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে সমাজের যে সকল অপরের দেখা যায় যেমন মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ইত্যাদি সেগুলি ধনীর আশ্রিত ও অনুগৃহীত। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই সম্পদ ও শাসনক্ষমতা ধনীর হাতে। ধনীর আয়ত্তে অফুরন্ত সুযোগ ও অবসর, ফলে তার খেয়ালের অন্ত নেই। ধনীর খেয়ালের বশে জগত-জোড়া যুদ্ধ হয়, পরে সন্ধি হয়, আবার সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ হয়। শ্রমিক অবসর চায় না; বাধ্যতামূলক অবসর বা বেকার অবস্থাকে সে ঘৃণা করে, কারণ তাতে তার দারিদ্র্য ও দুঃখ বাড়ে। ধনী সমাজে মিলনের অভাব নেই, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব বর্ত্তমান; যা কিছু মিলনের ব্যবস্থা সবই ধনের প্রাচুর্য প্রদর্শনে অপরের বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদনের অথবা অধিক ধনাগমের নিমিত্তস্বরূপ ব্যবহার করা হয়। শ্রমিক সমাজে কর্ম্ম উপলক্ষে একত্রিত হওয়ার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে, আর নানাবিধ অভাব ও দুঃখের মধ্যে প্রতিবেশীর সহানুভূতি ও সাহায্যপ্রাপ্তি হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে মিলনের প্রয়োজন সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। নিম্নশ্রেণির মুষ্টি শ্রমিক যেদিন থেকে বুঝতে পারল—ধনের আরাধনায় নয়, ধনীর

অনুপ্রাণিত নয়, সংঘবদ্ধ আন্দোলনে তার দুঃখ দূর হবে সেদিন থেকেই তাহার আর আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হল।

ধনীর নিজ নিজ ধন সম্পত্তি আছে, বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের পথ ও এলাকা আছে, ফলে ধনীতে ধনীতে প্রভেদ ও বিরোধ অনিবার্য। অপরপক্ষে দুনিয়ার শ্রমিক একই প্রকার অভাব আর দুঃখের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ও আকর্ষণের ভাব অনুভব করে। তাই শ্রমিক সংঘ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই লাভ করে থাকে। আন্তর্জাতিক কোন অনুষ্ঠান যদি স্থায়ভাবে কার্যকরী হবার স্বাভাবিক যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে তা প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধিদ্বারা গঠিত শ্রমিক সংঘ। প্রথম এক, শ্রমিক এক, দুনিয়ার শ্রমিকের দুঃখবোধ এক—এ কেবল কথার কথা নয়, অনুভূতির ঐক্যে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত। শ্রমিকের ঐক্যবোধ ও বিলিত শক্তিকে প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে ধনী শ্রমিকের উৎপন্ন ধন আত্মসাৎ করে, ইহাই পুঁজিবাদী নীতির মূল কথা। দুনিয়ার শ্রমিক আজ বিলিত শক্তিতে পুঁজিবাদের মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত। শত সহস্র বর্ষ ব্যাপী অপমানিত প্রবঞ্চিত হতভাগ্য শ্রমিকের বিরাট হৃদয়ের রক্তে আজ পূর্ব গগন উজ্জ্বল লোহিত বরণ ধারণ করেছে, অচিরেই গৌরবময় প্রভাতের বার্তা বহন করছে দুনিয়ার শ্রমিক।

প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (International working-men's Association) ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। লণ্ডনে সর্বপ্রথম এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণ, ইংলণ্ড তখন পৃথিবীতে সবচাইতে অধিক শিল্পোন্নত দেশ এবং সেই সময়টায় মার্কস্-এর সমাজতন্ত্রবাদের নীতিতে বিশ্বাসী বিশেষ কয়েকজন শ্রমিকনেতা বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ সালে ইয়োরোপের বহুদেশে এক সঙ্গে বিপ্লবের ভাব জেগে উঠে। দেশের শ্রমিক জনসাধারণ এ বিপ্লবে প্রধান অংশ গ্রহণ করে, সুতরাং বিপ্লব দমনের ফলে তারাই মারাত্মক হয়। এই ঘটনার পরে অনুরূপ প্রতিরোধকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ইয়োরোপের শ্রমিকনেতাগণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা প্রচার করতে থাকেন। কার্লমার্কস্-এর অমর গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' তখনও প্রকাশিত না হলেও কমুনিষ্টোর ভরোয়া ১৮৪৭ সাল থেকেই প্রচারিত হচ্ছিল।

পুঞ্জীভূত টাটকা সমাজতন্ত্রবাদের বারুদে আগুনের ফুলকি নিক্ষেপ করে জার-শাসিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রাম। ১৮৬৩ সালে লণ্ডনে শ্রমিকগণ একান্ত সভায় পোল্যাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। ফরাসী শ্রমিকপ্রতিনিধিগণ এসে এই সভায় যোগদান করেন। জগতের ইতিহাসে ইহাই লণ্ডনের প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক বৈঠক, যেখানে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। পর বৎসর First International-এর উদ্বোধন হয়। লণ্ডনে এই উদ্বোধন সভায় বলা হয় যে ১৮৪৮ সালে বিচ্ছিন্নভাবে নানা দেশে শ্রমিক বিদ্রোহের পর থেকে তখন (১৮৬৪ সাল) পর্যন্ত শ্রমিকের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই, পক্ষান্তরে সকল দেশেই শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে ধনীর অর্থভাণ্ডার স্ফীত হয়েছে। তদানীন্তন ব্রিটিশ অর্থসচিব গ্ল্যাডস্টোন সাহেবের ৭।৪।১৮৬৪ তারিখের মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেখান হয়—ব্রিটিশ ব্যবসায় বাণিজ্যের কিরূপ অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, আর সেই সঙ্গে সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখান হয় সে দেশের শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা কিরূপ অসন্তোষজনক। আরও বলা হয় শিল্পবাণিজ্যে জগতে অগ্রগণ্য ইংলণ্ডেই যদি শ্রমিকের এই অবস্থা হয়, তবে অন্যান্য দেশের অবস্থা আরও অধিক অসন্তোষজনক। ধনী মালিক ও মহাজনের ধনবৃদ্ধি ও দরিদ্র শ্রমিকের দারিদ্র্যবৃদ্ধি অবস্থার তীব্র নিন্দা করে এই সভায় ইয়োরোপের সকল দেশের শ্রমিককে এই অবস্থার প্রবল প্রতিরোধ করতে আহ্বান করা হয়—Proletarians of all countries unite! সেই থেকে যুগান্তর দীন দুনী, যুগান্তর ম্লান মুখ, অন্নমুক আর হাত যাহাতে স্বাভাবিক জীবনের জ্যোতি ও শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা চলছে।

প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই কার্ল-মার্কস্ তাদের বুঝিয়ে দিলেন—ভূমি ও ধনের অধিকারিগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং বিদেশের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপার তারা সর্বদাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করবে। সুতরাং রাজনৈতিক শক্তি যতদিন তাঁদের হাতে আছে ততদিন শ্রমিকের দুর্দশা দূর হবার নয়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ প্রচার করতে থাকলেন—রাজনৈতিক শক্তি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আবদ্ধ থাকাই মানুষে মানুষে সকল সংঘাত ও অসন্তোষের মূল কারণ। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদিগণের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা গেল যে First International গঠনের উপযুক্ত সময় তখনও আসে নাই। ইহার প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক সংঘের সভ্য দেশ গুলিতে তখনও উপযুক্ত শ্রমিক বা সমাজতন্ত্রবাদী অনুষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে দাঁড়াল এই, বিভিন্নজাতীয় শাখা সংঘ থেকে উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে আন্তর্জাতিক সংঘ বেশি দিন টিকে থাকতে পারল না। ১৮৭২ সালে 'হেগ' সম্মিলনে প্রথম আন্তর্জাতিক সংঘ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন এখানেই শেষ হল না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছত্রভঙ্গ থাকলেও পৃথক পৃথক ভাবে নানা দেশে শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার ও প্রচার উত্তরোত্তর অধিক হতে থাকে। ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে আন্দোলনকারিগণ দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং ১৮৮৯ সালে প্যারিস্ নগরে আবার আন্তর্জাতিক সভা আহূত হয়। ইহার ফলস্বরূপ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংঘ (Second International) গঠিত হয়। ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংঘ একদিকে যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্ত করে সমাজতন্ত্রবাদী সরকার গঠনে ধাবমান হয়, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করে তদানীন্তন সাম্রাজ্য ও পুঁজিবাদী সরকারের কাছ থেকে শ্রমিকের নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা আদায়ের

বন্ধ (প্রত্যক্ষ) আন্দোলন করতে থাকে। প্যারীস্ বৈঠকে ঠিক করা হল—দিনে ৮ ঘণ্টার অধিক কাজ করা উচিত নয়। এই উদ্দেশ্যে দাবীর আন্দোলন সুরু হয় এবং ১৮৯০ সালে ১লা মে আন্তর্জাতিক সংঘের নির্দ্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রথম May Day Demonstration করা হয়। সেই থেকে প্রতিবৎসর ১লা মে দুনিয়ার শ্রমিক মিলনের ও অন্যায় অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে আসছে। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রমিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। আজ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের আশ্রয় শুন্য একে একে ধ্বসে পড়ছে দুনিয়ার সর্ব্বহারা শ্রমিকের আঘাতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন পূর্ব্ব অস্ত যায়, ফরাসী সাম্রাজ্যগগনে পুনঃ ১৭৮৯ সালের ন্যায় রক্ত-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—সাম্রাজ্যবাদের সমাধি-বক্ষ বুঝি অতি নিকটে।

১৮৮৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের দ্বিতীয় পর্য্যায় শেষ হল। এর পরে ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাহত হয়। যুদ্ধ বিরতির পর Second Internationalকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে বার্ণ ও ১৯২০ সালে জেনেভা নগরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহুত হয়। এদিকে ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে যুগান্তকারী বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা ঘটে—মজুর কৃষকের প্রতিনিধি Communist দলের হাতে রাশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা আসে। Communist দলের অবদানে এই বিজয়কে সুরক্ষিত ও মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে ইঁহাদের আদর্শবাদের আন্তর্জাতিক প্রচারের কথা উঠে। ফলে Second Internationalএর সভ্য ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, অষ্ট্রিয়ান, সুইস প্রমুখ জাতিকে উপেক্ষা করেই ১৯১৯ সালে মস্কোতে Third International (or Comintern) গঠন করা হয়। তারপর ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত একদিকে বিভিন্ন দেশে কমুনিষ্টদল ও অপরদিকে ইংরেজ শ্রমিকদলের আদর্শে গঠিত সমাজ-তন্ত্রীদল নিজ নিজ আদর্শে ভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন চালাতে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে জগতের শ্রমিক আন্দোলনের তৃতীয় পর্য্যায় সমাপ্ত হয়।

এই স্থানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সন্ধির সর্ত অনুসারে গঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি (International Labour Organisation) সম্বন্ধে উল্লেখ করে প্রবন্ধের উপসংহার করা হবে। বিভিন্ন দেশে শ্রমিকনেতাগণ প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধের ফলে বিজেতা ও বিজিত উভয় পক্ষের দেশসমূহ শ্রমিকগণ প্রায় সমান-ভাবেই লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে—বিজয়ের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার ও পরাজয়ের সকল অপমানভার বহন শ্রমিককেই করতে হয়। সুতরাং গোড়া থেকেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন যুদ্ধের বিরোধী ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন দলের মধ্যে স্বার্থসংঘাতের ফলে ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধল, দুনিয়ার শ্রমিক তা রোধ করতে পারল না। কিন্তু যুদ্ধের পর যখন সন্ধি হয় তখন যুদ্ধপূর্ব শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠার ফলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-সমূহ শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে আংশিকভাবে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হয়, তারই ফলে ১৯১৯ সালে International Labour Organi-sation গঠিত হয়। সরকারী, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে এই অনুষ্ঠান গঠিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মারফত এই অনুষ্ঠান কাজ করে। প্রথম দিকে রাশিয়া ও আমেরিকা এতে যোগ দেন নাই, পরে ১৯৩৪ সালে এরা এই অনুষ্ঠানের সভ্য হন। ভারত গোড়া থেকেই এর সভ্য এবং ১৯৪২ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কার্যকরী সমিতির আটটি স্থায়ী সভ্য পদের একটি অধিকার করে আছে। ১৯৪৪ সালে ফিলাডেলফিয়া বৈঠকে এই প্রতিষ্ঠান নতুন করে মহৎ সঙ্কল্প গ্রহণ করে :—(১) শ্রমিক পণ্য নয়। (২) নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির জন্য প্রকাশ ও মিলনের অধিকার অবাধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। (৩) যে কোন স্থানের দারিদ্র্য সকল স্থানের প্রাচুর্যের পরিপন্থী। নানা-বিধ বিরোধী মতের উল্লেখ না করে এক কথায় বলা যেতে পারে—এই প্রতিষ্ঠান প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান না; তবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে শ্রমিককে সাহায্য ও সংহত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠান প্রভূত সাহায্য করতে পারে এবং এই কাজের উপরই এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

কৈফিয়ৎ

শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়

সন্ধ্যার পর ষ্টুডিও থেকে ফিরে এসে স্নান শেষ করে রেডিওটা খুলে বিনু কেবল চুলে চিরুণী দিয়েছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। নিতান্ত বিরক্তিভরা দৃষ্টি মেলে অসহায়ভাবে বিনু 'রিসিভারটা' তুলে ধরলো—অনায়াসলব্ধ বিশ্রামের মুহূর্তেও কি লোকের উৎপাত চলবে? একবার মনে হলো রিসিভারটা নামিয়ে রেখে চুপ করে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে থাকে···

বিনু, অনেকক্ষণ কষ্ট করার পর তোমাকে পেলাম···

হ্যাঁ, বলুন আপনার বক্তব্য···একটু তাড়াতাড়ি···

আমাকে চিনতে পারছো না, আমি···

হুঁ, বলুন দয়া করে, একটু তাড়াতাড়ি।

আমি এডভোকেট অজিত···

কথা শেষ হবার আগেই বিনুর লজ্জিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—অজিতদা আমি তোমাকে চিনতে পারিনি, তিন

বছর তোমার খোঁজ একদম পাইনি, তারপর জানো তো আমাদের কাজ···নাওয়া খাওয়া ঠিক থাকে না, সম্প্রতি বাইরে থেকে ফিরেছি, আবার হয়তো করেক দিনের মধ্যেই যেতে হবে···সব ভাল তো, এখন সেখানেই আছো নাকি।

আজ ভাই একটু দরকারে তোমার খোঁজ করছি। তোমার হ্যাণ্ডিতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তোমার টেলিফোন আর বাড়ীর ঠিকানা পেয়েছি। আমি ভাই বিপদগ্রস্ত···আমার ছোট মেয়ে রাণু—রুণু গো, যাকে তুমি চওড়া নীল ফীতে প্রায়ই দিতে। আজ ত্রিশ দিনের ওপর সে টাইফয়েডে শুশ্রূষার অসুস্থ···মাঝে মাঝে বেশ জ্ঞান ফিরে আসে···এ কদিন অনেক সময়ই তোমার কথা বলছে···তাই তোমার বৌদি বল্লেন তোমাকে খবর দিতে, যদি সময় করে এসে একবার দেখো···তের চোদ্দ বছরের মেয়ে, আর কতদিন কষ্ট সইবে!

সেকি কথা অজিতদা, আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যাচ্ছি···আদিপুরের সেই বাগান বাড়ী তো···হুঁ, আমি যাচ্ছি।

বিমলকৃষ্ণ বা বিনু প্রথম যৌবনে ষোলোপোটিয়ারের দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকের শুশ্রূষার বহন করে কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছিলো—তারপর বীমার দালালি, ঔষধের কারখানা, জিনিষপত্র কেনা-বেচা, আমদানী রপ্তানী বহুবিধ কাজের সঙ্গে বহু বৎসর লিপ্ত থাকে সে। তারপরে কোনও বিশিষ্ট ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারিণী কর্ত্তৃক অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয় বিনু। তার লম্বা, পাতলা সুন্দর চেহারা, সুশ্রী মুখ ও সারল্যপূর্ণ চোখ দুটি সত্বাধিকারিণীকে আকর্ষণ করেছিলো। ছায়াচিত্রে ক্রমাগত একটানা দাক্ষিণ্য দান করে, কর্ম্মচঞ্চল যশস্বিনী যৌবনে বিনুর আর বিয়ে করবার অবসর বা ইচ্ছা হয়নি—বিবিধ অভিনেত্রীর বিচিত্র সাহচর্য্য ও আলাপের মধ্য দিয়েই বিনুর বেশীর ভাগ সময় কেটে যেতো, একজনের কাছে বাঁধা হয়ে তারই সাথে অনুরাগহীন প্রেমের আদান প্রদান দীর্ঘকাল করার কথা মনে হলেই সে শিউরে উঠতো। তার মাতৃপিতৃহীন কৈশোরে কিছুদিন অজিতাধকের কাজ অজিতবাবু করেছিলেন—এই সূত্র ধরে ঐ পরিবারের সঙ্গে তার একটা স্নেহোদ্বিগ্ন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ছায়াচিত্রে প্রবেশ করার পর কিছুদিন এই ধনী উচ্চশিক্ষিত পরিবারের অনেক সান্ধ্য আসরেই এই অনন্দির চিত্রতারকার হাসি গান মুখরিত হয়ে থাকতো—সন্ধ্যাতারার মত এই আসরকে সে দিব্য করে রাখতো সেই কিশোরী বালিকা রাণু। তার গৌরবর্ণ তনু, শুভ্র রূপালী হাসি, লম্বা বেণীর সঙ্গে চওড়া নীল ফিতের ফিতে, আনত স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মধুরতম কণ্ঠ সবই মিলে পরিচিত, অপরিচিত আগন্তুকের চিত্ত-ক্ষেত্রে সরলতার সৃষ্টি করতো। বিনু রাণুকে খুব ছোট থেকেই দেখেছে—তার বাল্য, কৈশোরের পরিবর্ত্তন বিনুর কাছে স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছে—চির আনন্দিত এই বালিকাকে সে অযথা আদর করেছে—খোঁপা ধরে টেনেছে—সময় অসময়ে নাইটক্লেস বলে ডেকেছে···হাত ধরে হারমোনিয়াম সেতারের বাজনা শিখিয়েছে, বায়স্কোপে নিয়ে যাবার কথা উঠলেই কত বকুনি দিয়েছে···শান্ত-স্তিমিত দৃষ্টি বিনুর দিকে মেলে রাণু মনে করতো বিনুদার মত এমন করে মিষ্টি গান কেউ গাইতে পারে না, বেশ বিদেশের এত বিচিত্র খবর কেউ রাখে না, এমন চমৎকার কর্ম্মপটু লোক জগতে আর নেই···

বিছানার পাশে বসে রাণুর জীর্ণ নিষ্প্রভ মুখখানির দিকে চেয়ে বিনু কোমল কণ্ঠে বলে উঠলো, খুব ভুগে উঠলি, এবার সাবধানে থাকবি, ডিফিপানা করলে আবার···

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরখানাতে শুধু নীল আলো রোগ-শয্যাকে আরও কঠিন করে তুলেছিলো—রাণু ঠোঁট নেড়ে ম্লান কণ্ঠে কি বললো বোঝা গেল না—পাংশু দুর্বল মুখখানা অস্বাভাবিক জ্যোতিতে যেন ক্ষণকালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর রোগ শীর্ণ হাতখানা বিনুর দিকে প্রসারিত করে আবার চোখ বুজলো।

মিসেস আরতি মুখার্জ্জি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিলেও সপ্রতিভতার জন্যই বোধ হয় দেহের যৌবনকে ধরে রেখেছেন—বীনুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, তারপর মৃদু কণ্ঠে বল্লেন—ডাক্তার বলছেন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পরিবর্ত্তন আবশ্যক, বিশেষতঃ ওকে প্রফুল্ল রাখা সদা সর্ব্বদা প্রয়োজন, সেজন্যই ওঁকে বলে তোমাকে এটুকু কষ্ট দিলাম। তুমি অবিশ্যি কাজের লোক, সব সময়েই engagement তোমার···

তাঁর শেষের দিকের কথাগুলিতে ঈষৎ বেদনাজড়িত

সঙ্কোচের আভাস লক্ষ্য করে বীথি বাধা দিয়ে বল্লো, এ তিন বছর আমার ওপর দিয়ে কি রকম গেছে তা আপনাদের বোঝাতে পারবো না—এখন অবিশ্যি শেষ হয়েছে, তাছাড়া এত অসুখের খবর পেয়ে আমার তো নিজের থেকেই আসা উচিত···রাণু তো আমার ছোট্ট বোনের মতই···

বাধা দিয়ে মিসেস্ মুখার্জ্জি একটু তৎপরতার সঙ্গে বল্লেন—ও তোমার মেয়ের মতই ছিলো, তোমার বিয়ে হলে এতদিন ওর মত মেয়ে হয়তো তোমার হতো। যন্ত্রচালিতের মত অর্থহীন দৃষ্টি বিনু মিসেস্ মুখার্জ্জির দিকে নিক্ষেপ করে চুপ করে রইলো।

আরও কয়েক দিন পর। রাণু এখন নিজে নিজেই বিছানার ওপর উঠে বসতে পারে—হাত ধরে বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারেও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। বিনু কয়েক দিনই সন্ধ্যার দিকে নিয়মিত এসেছে, গল্পগুজবে হাসি ঠাট্টায় রোগিণীর চিত্তবিনোদন করেছে। অনেক রাতে বাড়ী ফেরবার আগে দু একটি বাছা বাছা পুরাণো গান, যা হাতে ধরে রাণুকে শিখিয়েছে তাই গাইতো। রাণুর শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে অতিথিসৎকারপরায়ণ পরিবারটির কর্ম্মচঞ্চলতা বেড়ে উঠেছিল; তেতালার রাণুর ঘরে যাবার আগে মিসেস মুখার্জ্জির সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের সূত্র বিনু সতর্কতা সহকারেই পরিহার করে চলতো। মিঃ মুখার্জ্জি নিজের ব্যবসা, কাজকর্ম নিয়েই সদা-সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকতেন। তিনি বাড়ীর খুঁটিনাটি কোন ব্যাপারেই থাকতেন না; গৃহিণী গৃহের সাম্রাজ্ঞীরূপে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, সব বিষয়েই তাঁর কর্তৃত্ব ছিল সমান।

বর্ষার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় বিনু রাণুর ঘরে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠছে আর আপনমনে গুণ গুণ স্বরে গাইছে—

ঘরে ঢোকবার একটু আগেই সে থমকে দাঁড়াল, সামনে বিশেষরূপে সজ্জিত হয়ে কোমরে হাত দিয়ে মিসেস মুখার্জ্জি দাঁড়িয়ে, তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগে আছে। অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বল্লেন—বুঝলে বিনু, আমরা কাল পুরী যাচ্ছি, ডাক্তার বল্লেন—এখন change দরকার। মাস দুয়েক change হলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। শোনো—বিনুর শরীর···তখন ঘরে ঢুকে গেছে সে, ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লো—ও তাই না কি। রাণুর তো খুব মজা তাহলে··· রাণু, ও রাণু, কণু···ও। বারান্দায় আছিস বুঝি? বারান্দার রেলিংয়ের সঙ্গে হেলান দিয়ে বিনু একটু জোরে সানন্দে বলে উঠলো—রাণু আসবার সময় আমার জন্য অন্তত ৩১টা রঙ বেরঙের ঝিনুক আনবি, বুঝলি। তারপর সমুদ্রের জলে নেয়ে মোটা কালো হয়ে আসবি। কেউ তোকে সহজে বিয়ে করবে না, বলবি বিনুদা, আমার একটা রাঙা বর দেখে দাও।

রাণু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সরল দুর্বল কণ্ঠে বল্লো, বিনুদা ৩১টা ঝিনুক আনবো কেন? তার কম বেশী না কেন? ৩১ বছর তোমার বয়স বলে নাকি?

দূর তোর একেবারে বুদ্ধি নেই—আজ দিয়ে যে ৩১ দিন আমি এসেছিলাম তোর কাছে···রুগীর কাছে।

ঐ গুলো দিয়ে তুমি ঋণ শোধ করতে বলছো বুঝি, রাণুর কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী ও গম্ভীর···হঠাৎ এই রোগ-কাতর বালিকাটি আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলো!

নির্বাক বিস্মিত দৃষ্টিতে হতবুদ্ধি বিনু কিছুক্ষণের জন্য রাণুর দিকে চেয়ে রইলো···তারপর হঠাৎ কি মনে করে এগিয়ে এসে চিবুক ধরে রাণুর মুখখানা তুলে ধরতেই দেখলো—চোখের জল গালে লম্বা দাগ টেনে দিয়েছে···

বিনু স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বল্লে—৩১ একটা lucky number যে রাণু···আমার বাড়ীর নম্বরও যে ৩১। পুরীর খবর দিয়ে আমাকে ৩১ খানা মজার চিঠি লিখিস্—

নীলাচলে নীল সমুদ্রের বালুকাময় তীরে সূর্য্য কিরণ দেখার জন্য প্রতি সকালেই রাণু বের হতো—দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের ওপরে অবনত নীলাকাশ, গভীর জলরাশি সবই কিশোর বালিকার মনে এক অপরূপ পরিবর্ত্তনের আলোড়ন আরম্ভ করলে। রোগ শয্যার ধীর স্পর্শ, সেবা তাকে প্রতিনিয়ত মাধবিকা সঙ্ঘের মত নিরন্তর শক্তি ও শান্তি দিতো, দূর প্রবাসে আজ তার ব্যবধান যেন শুরুতর আকার ধারণ করেছে—বালিকা জীবনের অভ্যুগ্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা নবরূপ ধারণ করে এক অনাস্বাদিত সৌন্দর্য্য-লোকে তাকে নিয়ে চলেছে। বীথুদাকে সে অনবরত চিঠি লিখেছে, জবাবও ঠিক মত পেয়েছে কিন্তু চিঠিগুলো বড় ছোট। বীথুদা এত গল্প-গুজব করতে পারে, কিন্তু তাকে কি বড় করে ভালো করে একখানা চিঠি দিতে

পারে না? মাকে এ বিষয়ে অনুযোগ করেও কোন ফল হয় নি। দেখতে দেখতে দুমাস হয়ে গেছে, বাবা এসেছেন —কাল তাদের পুরী থেকে বিদায়ের দিন। বিনুদা কিনুকের যে ফরমাস দিয়েছেন তা কবে তোলা হয়েছে, আরও অনেক জিনিষ সংগ্রহ হয়েছে···একবার এখন দেখা হলে হয়—কৌচড় ভরে যাবে যে তার।

বিনুর ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো সন্ধ্যার একটু আগেই। মিঃ মুখার্জি বল্লেন—বিনু আমরা আজই ফিরেছি ···রাণুর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন—একেবারে ৩০ পাউণ্ড বেড়ে গেছে। তোমার কথাই হচ্ছিল, যদি পারো একবার এসো···

হ্যাঁ আমি যাচ্ছি—বলেই বিনু গায়ে পাঞ্জাবী চাপালো।

রাণু কোথায়? ঘরে নেই তো···রাণুর ঘরে ঢুকে নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে বিনু বারান্দায় এসে দাঁড়ালো; সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তার শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো—রাত্রির অনাবৃত নীল তারাখচিত আকাশের দিকে চেয়ে তার অন্তরের শূন্যতা সে সহসা অনুভব করলো। একটা অস্বাভাবিক বিরক্তিতে তার মন পূর্ণ হয়ে উঠলো···

কিগো বিনুবাবু—সুসজ্জিত বেশে মিসেস মুখার্জি দেখা দিলেন।

বিনু জোর করে একটু হাসি টেনে শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—রাণুর নাকি খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা হলে আপনাদের বিদেশবাস সার্থক হলো বলুন?

রাণু দরজার পাশে অনেকক্ষণ থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল—লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে সামনে এলো—কিসের সঙ্কোচে তার মুখ চোখ আড়ষ্ট, বীনুর মুখের দিকে চাইবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন তার নেই।

বীনু সরোষে বলে উঠলো—বাঃ চমৎকার চেহারা হয়েছে, এখন আর ভাবনার কোন দরকার নেই—

সরস সুন্দর মুখখানা বিনুর দিকে ঈষৎ প্রসারিত করে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে রাণু বল্লো—ধ্যেৎ। প্রথম যৌবনের নব উদ্দীপনায় রাণুর সমস্ত দেহখানি যেন অপরূপ সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে—এ রোগ শয্যার ছিন্নলতা নয়, এ যেন নববর্ষা আপনার সজল নিবিড় কেশ নিয়ে আনন্দগর্জ্জনে চির প্রত্যাশী বনভূমির উপর বর্ষণের নিবিড় ছায়া ঘনিয়ে তুলবার উপক্রম করছে। মিসেস মুখার্জি ইঙ্গিতে রাণুকে বাইরে যাবার নির্দ্দেশ দিলেন; তারপর সুর যথা সম্ভব দৃঢ় করে বিনুকে বল্লেন—আমি তোমাকে এতগুলো চিঠি দিলাম, একখানারও জবাব দিলে না, অথচ রাণুর···

অতর্কিত আঘাতে অভিভূত হয়ে অর্থহীন দৃষ্টিতে বিনু চাইলো···

মিসেস মুখার্জি এবার একটু জোরেই আরম্ভ করলেন, কেন উত্তর দিলে না সেটার একটা কৈফিয়ৎ তোমাকে আজ দিতেই হবে—আমি তার মা, অভিভাবিকাও বটে, মান অপমানের কথা ছেড়ে দিলেও জিনিষটা জানবার অধিকার আমার আছে, সেটা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না···

বিনু ভ্রূকুঞ্চিত করে মাথা একটু নীচু করলো, তারপর ধীরে ধীরে অবনত মুখে সিঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলে।

মিসেস মুখার্জি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেদনাহত কঠিন কণ্ঠে বল্লেন—নীতিবোধ বা ধর্ম্মবোধ কি কিছুই তোমার নেই; আজ তোমাকে কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হবে···

বিনু ঘাড় বেঁকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বল্লে—কৈফিয়ৎ।

মিসেস মুখার্জি জোরের সঙ্গে বল্লেন—হাঁ কৈফিয়ৎ, অসাধারণের কৈফিয়ৎ।

বিনু ঈষৎ ঠোঁট চেপে দৃঢ় সংযত কণ্ঠে উত্তর দিলে—আপনার কন্যা যেদিন, আপনাদের আমন্ত্রণেই প্রতিদিন এসে গল্প শুনবার মধ্য দিয়ে প্রফুল্ল করবার চেষ্টা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে করেছে—যার জন্য শারীরিক ও মানসিক ক্লেশকে সে প্রতিদিনকার সংগ্রামে পরাজিত করে রোগ শয্যায় অশেষ কষ্টের সঙ্গে বসে কাটিয়েছে—কন্যা বালিকার অসহায়তা দেখে নিছক অনুকম্পায় বসেই যে এ কাজ করেছে, তার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ আপনার না থাকতে পারে—কিন্তু কৈফিয়ৎ দেবার আগে এ অপ্রিয় সত্যটা বলতে হবে বলেই চলে যাচ্ছিলাম—ছায়া চিত্রে কাজ করলেও সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞান হয়তো আমার আছে···মিসেস মুখার্জির নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে বিনু ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হলো।

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

দুর্গের মধ্যে চারটি রাজ-প্রাসাদ আছে। মহারাজা সুরসিংহের তৈরী 'মতিমহল'। মহারাজা অভয়সিংহের তৈরী 'ফুলমহল', মহারাজা অজিতসিংহের তৈরী 'দৃঙ্গার চৌকী'। যোধপুরের প্রত্যেক নূতন মহারাজার রাজ্যাভিষেক বরাবর এই প্রাসাদেই সুসম্পন্ন হয়। আর চতুর্থ হচ্ছে মহারাজা অজিতসিংহের তৈরী 'ফতেমহল' অর্থাৎ 'বিজয়-প্রাসাদ'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যোধপুর রাজবংশের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হওয়ার

মহারাজা যশোবন্তসিং সমাধি মন্দির

সেই স্মৃতি উজ্জ্বল রাখবার জন্য এই 'ফতেমহল' নির্মিত হয়। 'ফতে' শব্দের অর্থ হ'ল 'জিৎ' বা জয়। উপস্থিত এই প্রাসাদটি যোধপুর রাজবংশের "মহরখানা" বা 'রত্ন-ভাণ্ডার' রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। মহারাজার ব্যক্তিগত অনুমতি পত্র ভিন্ন এর মধ্যে কোনো দর্শকের প্রবেশাধিকার নেই।

দুর্গের মধ্যে দুটি জলাশয় আছে, একটি 'চিড়িয়ানাথজীর ঝর্ণা' আর একটি 'রাণী সাগর'। কথিত আছে যে যোধপুর দুর্গ নির্মাণের পূর্বে এই পাহাড়ের উপর এক সাধু মহাপুরুষ বাস করতেন। তিনি সকলের কাছে 'চিড়িয়ানাথজী' নামে পরিচিত ছিলেন। চিড়িয়ানাথজীর কুটীর সন্নিকটে এই পার্বত্য ঝর্ণাটিও তাঁরই নামে অভিহিত হত। রাও যোধা নাকি এঁকে বিতাড়িত করে পাহাড়টি যখন অধিকার করেছিলেন—দুর্গ নির্মাণের অভিপ্রায়ে। আর 'রাণী সাগর' নির্মাণ করেছিলেন জনসাধারণের

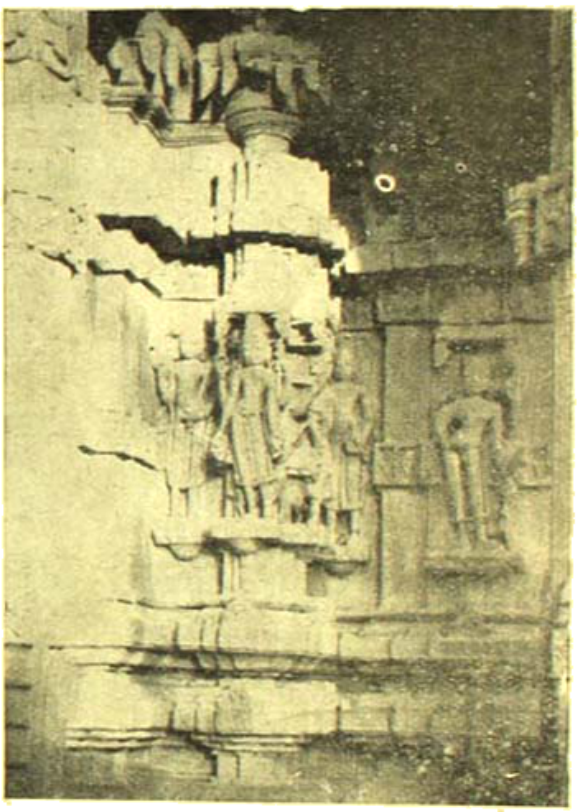

সমাধি মন্দির গাত্রের খারুকার্য

ব্যবহারের জন্য হাদিজীর রাণী, কিন্তু মহারাজা রায় মল্লদেব এটিকে যোধপুর দুর্গের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

এই দুর্গের প্রাকারশীর্ষে কতকগুলি ঐতিহাসিক কামান সুরক্ষিত আছে। প্রত্যেক কামানটিতে নাম খোদাই করা ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আছে। 'কিল-কিলা' নামে একটি কামান আছে যেটি ১৭০৩ থেকে ১৭২৩ খৃঃঅব্দের মধ্যে আমেদাবাদে তৈরী হয়েছিল। এ থেকে

বোঝা যায় যে ইংরেজ এদেশে আসবার পঞ্চাশ বছর আগেও ভারতবর্ষ কামান ও বন্দুক তৈরী হত। একটি কামান আছে তার নাম 'শাহ্‌নী হাঁ' এটি করাচী জেলে তৈরী। ১৬২০-১৬৩৮ খৃঃঅব্দের মধ্যে মহারাজা গজসিংহ জালোর দুর্গে পরাস্ত শত্রুপক্ষের কাছ থেকে কেড়ে ইংরেজ নিয়ন্ত্রণ করে না রাখলে এখানে 'মেশিন গান' প্রভৃতি অতি আধুনিক অস্ত্রও এতদিনে নির্মাণ হতে পারতো।

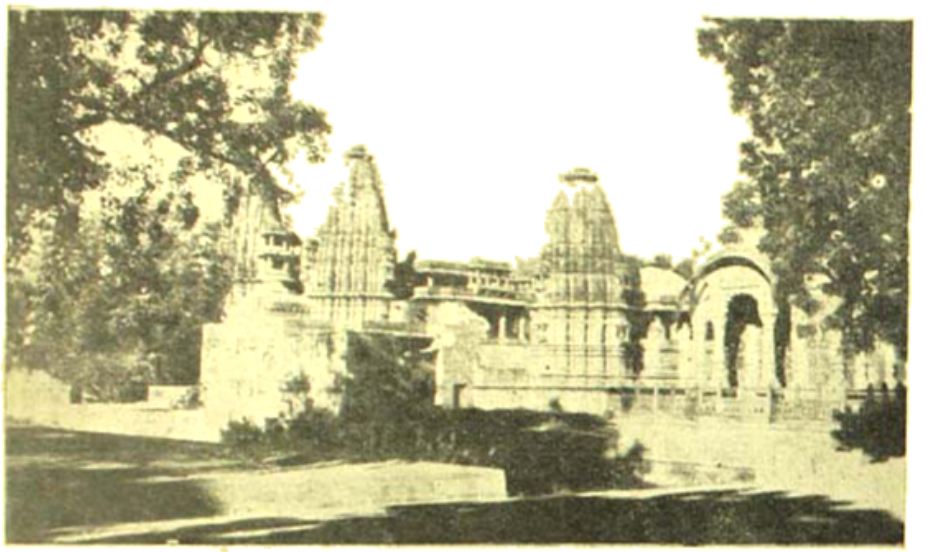

মাণ্ডোরে রাজ সমাধি ক্ষেত্র

দুর্গাভ্যন্তরের রাজপ্রাসাদগুলির মধ্যে মতিমহলের কথাই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ষোড়শশতাব্দী থেকে এই মতিমহলের নির্মাণ কার্য্য সুরু হয়েছিল, কিন্তু শেষ হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে।

এই প্রাসাদের একটি কক্ষের অভ্যন্তরভাগ চন্দ্রাতপ থেকে সুরু করে চতুর্দ্দিকে খাঁটি সোনার কারু-কার্য্যে মণ্ডিত পাতে মোড়া। প্রাচীর গাত্রে নানা রাগ রাগিণীর সীমাহরা সুন্দরীগণ চিত্রিত। প্রত্যেক ছবিখানি রাজপুত চিত্রকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন! এ ছাড়া বহু যুদ্ধ ও যোধপুর রাজ বংশাবলীর চিত্র অঙ্কিত আছে। বেশ দীর্ঘ প্রশস্ত হল। অনেকগুলি দেওয়াল ঝুলুর মণ্ডিত। দেখে বোঝা যায় এটি মহারাজাদের বিলাস কক্ষ। এখানে প্রায়ই ভারতীয় নৃত্য গীতাদির আসর বসে।

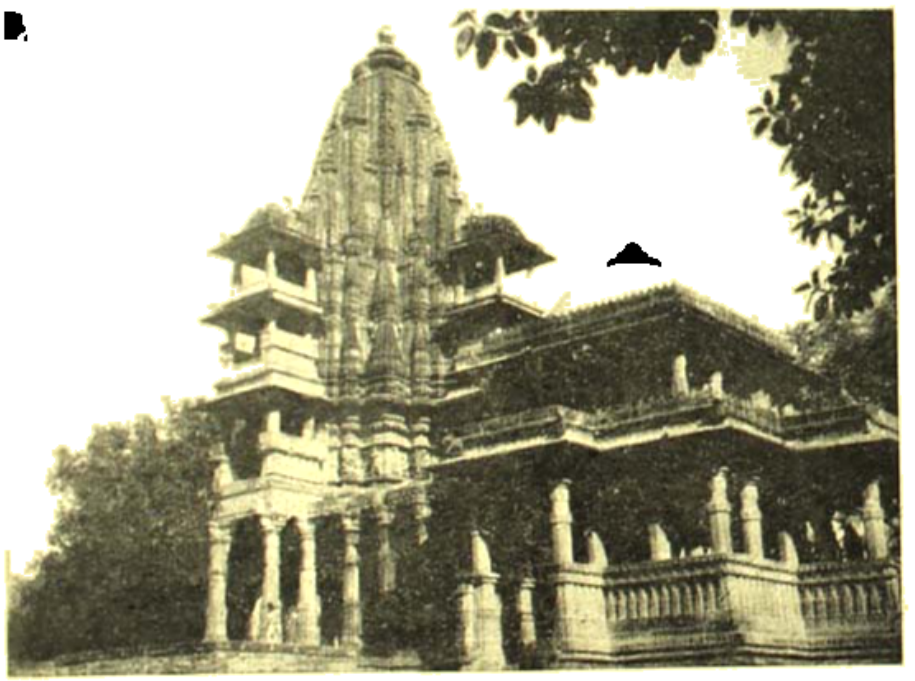

মহারাজ অজিতসিং সমাধি মন্দির

জেনানামহলের স্থাপত্য কলা দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। ঝরোকা ও জাফ্‌রীর বাহার দেখে আগ্রা দুর্গের মোগল স্থাপত্য কলা মনে পড়ে। এখানে কোনো পুরুষ কর্ম্মচারীর প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু আমরা প্যালেস্ ইন্সপেক্টার গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে থাকায় এই নিষিদ্ধ প্রদেশেও প্রবেশ লাভ করেছিলুম। সে সময় কোনও মহারাণীই জেনানামহলের শোভা বর্দ্ধন করছিলেন না। কারণ মহলটির সংস্কার চলছিল। এখানে থাকেন কেবল-মাত্র যোধপুরের মৃত মহা-রাজার বিধবা রাণীরা। যাঁরাজী এই রাজকীয় অন্তঃপুরের স্থাপত্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর 'লাইকা' ক্যামেরাটি বার ক'রে নিঃশব্দে যখন ছবি তুলছিলেন—হৈ হৈ করে বেরিয়ে এল রাণীদের দল থেকে জেনানারিণী ও জামুলবরদার-বাহিনীর দল। সকলে

নিয়েছিলেন। দুর্গের অস্ত্রাগারের মধ্যে (শাইলেখানা) এমন সব প্রাচীন ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত আছে যা দেখলে মনে হবে ভারতবর্ষকে

মেহরাণী গড়াজী

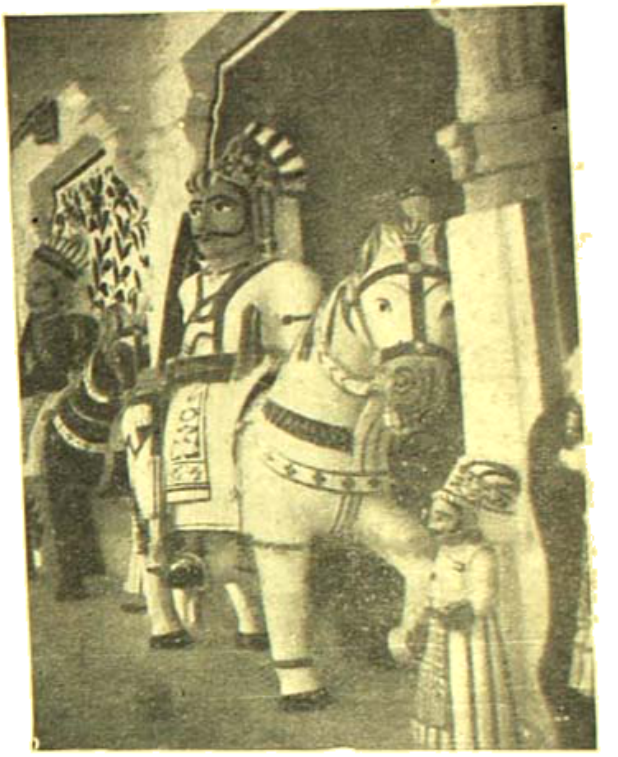

হরভূতী গড়াজী

রাও মল্লদেবের সমাধি মন্দির (১৪৩২ খৃঃ) ও মহারাজা তক্তসিং সমাধি মন্দির (১৮৭৩ খৃঃ)

চিৎকার শোনা গেল—"হুসূরীর মত খিচ না! হুকুম নেই এখন!"

মহারাজার তখন কাজ হয়ে গেছে। "বহুৎ আচ্ছা" বলে তিনি ক্যামেরাটি ফেলে পুব দিকে হাঁকলেন "কয়ুর মাল্ করণা! ৫৫৭

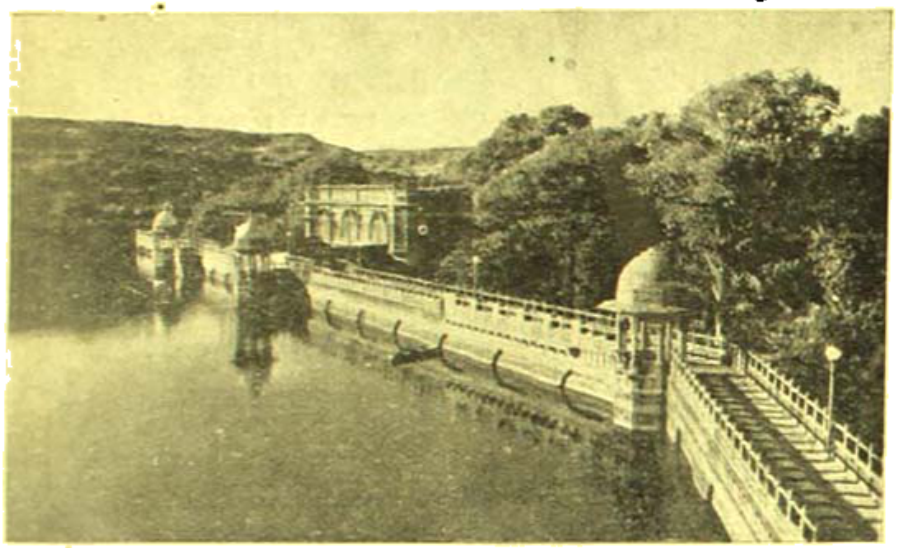

'বাল সামান্দ' হ্রদ ও উ

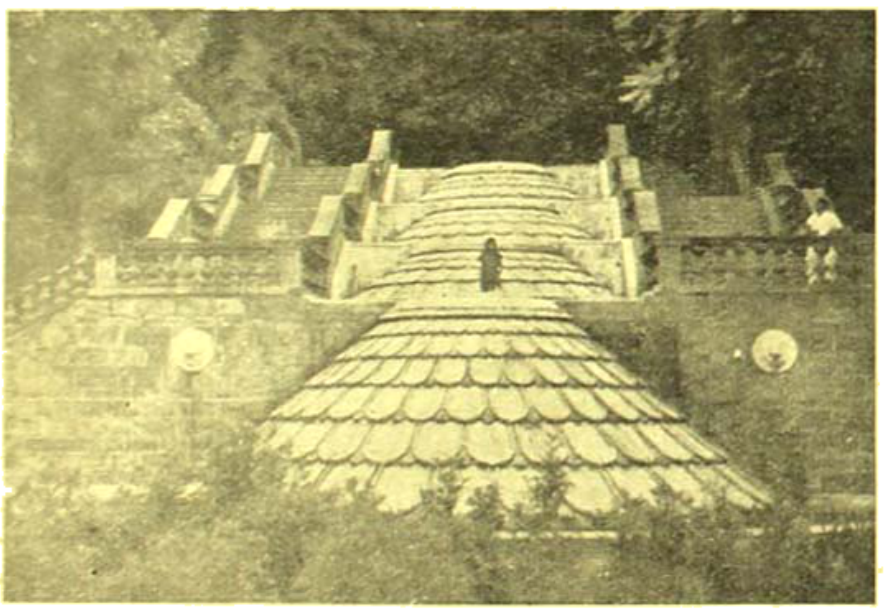

উদ্যানবাটির 'কমল উৎস'—(মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত উৎস মধ্যে মরনীতা। ফোয়ারাটি যখন চলে পদ্ম-পাপড়ির উপর দিয়ে জল ঝরে ঝরে পড়ে)

পিপাসা লাগা, ঘোড়া পিলেকা পানি নেহেরবানী করকে দিজিয়ে!"... শীতল পানীয় জল এল বটে, কিন্তু সে মহারাণীদের মর্ম্মর খোদিত সোরাই থেকে নয়, চেড়ীদের ঘরের পিতলের লোটায়!

তৃষ্ণা নিবারণ হল বটে সকলেরই, কিন্তু কেবল যেন তৃপ্তি হল না। এরা রাণীর সহচরী বা পরিচর্য্যাকারিণী হ'লেও রাজপরিচারিকা ছাড়া রাজকন্যা নয়—একথাটা কোনমতেই ভুলতে পারিনি যে!

যোধপুর ছেড়ে আসবার আগে আমরা এই রাজ্যের কয়েকটি দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে এলুম। 'উমেদ্ সাগর', 'কৈলানা হ্রদ', 'সুর সাগর' ও 'বাল সামন্দ' তার মধ্যে প্রধান। 'বাল সামন্দ' অর্থে 'ছোট সমুদ্র' বোঝায়। এটি একটি প্রাকৃতিক পার্ব্বত্য ঝীল, কিন্তু শিল্পী মানুষের প্রতিভা একে অসামান্য করে তুলেছে। বাল সামন্দের ফোয়ারা, ঝর্ণা, বিচিত্র উদ্যান ও পুষ্প বাটিকা এবং ঝুলন্তপুরীর রাজটিকে এমন একটি শোভা ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেছে যে এর মধ্যে ঢুকলে আর যেতে ইচ্ছা করেনা।

এইবার যোধপুরের প্রাচীন রাজধানী 'মান্দোর' এবং তারই সন্নিকটস্থ রাজা-মহারাজাদের সমাধি মন্দিরের কথা বলে আমি যোধপুর প্রসঙ্গ শেষ করবো, কেননা, রাজপুতের দেশের অনেক অংশের কথা এখনও বলতে বাকী রয়েছে। বিকানীর, জয়সলমীর, উদয়পুর, চিতোরগড়, জয়পুর, ভরতপুর ইত্যাদি আরও অনেক কিছু বাকী!

মান্দোরের বিশেষত্ব হচ্ছে এ নগরটি ইতিহাসে বহুবার হাতবদল করেছে। কথিত আছে, পুরাকালে 'বাড়ু' ঋষি এই নগরের পত্তন করেন। এরপর নাগবংশী রাজপুত, প্রাবার ও পরিহার রাজপুতেরা পর পর এটিকে দখল করে, তারপর ১৩৯৪ খৃঃঅব্দে রাঠোর বীর রাও চন্দ্র মান্দোর অধিকার করেন। কিন্তু ১৪১৩ খৃঃঅব্দে যোধপুরপতি রাও যোধাকে পরাস্ত করে দেবার বীর আহাবা ছিন্দোলা 'মান্দোর' অধিকার করেন। এখানে তাঁর বিরাট এক মৃতি-স্তম্ভ আছে। কিন্তু দশ বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৪২৩ খৃঃঅব্দে আবার রাওযোধা মান্দোর আক্রমণ করেন এবং ছিন্দোলাকে হত্যা করে মান্দোর পুনরধিকার

করেন। মণ্ডোর নগরের আজ ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখতে পেলুম। তবে যেটুকু আছে তা' সযত্নে রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। যোধপুরের 'মাড়ুমর' (মর্যা= মিঠ্ঠিল্লয়) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মৃৎপাত্র ও অন্যান্য বহু প্রাচীন রাজপুত শিল্প-কলার নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন। 'মাণ্ডোর' নগরের প্রাচীন দুর্গ জুনাগড়ের চিহ্ন বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তোরণদ্বার ও স্থাপত্য কলার যে নিদর্শন চোখে পড়লো তার মধ্যে বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রভাবই বেশী।

মাণ্ডোর ও জুনাগড়ের ধ্বংসাবশেষের নিকটে রাজবংশের সমাধি-গুলি এখানে বিস্তীর্ণ 'পড়ুত' অবস্থিত। এই পবিত্র পড়ুত তীরে নৃপতিদের মৃতদেহ সমাহিত করা হ'ত। যোধপুরে যাঁরা আসবেন তাঁরা যদি এই রাজ স্মৃতি মন্দিরগুলি না দেখে যান তাহ'লে যোধপুরের এক বিরাট ঐশ্বর্য সন্দর্শন থেকে বঞ্চিত হবেন। এক একটি স্মৃতি-মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য কলার গৌরবময় অপূর্ব নিদর্শন বহন করছে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পর পর নির্মিত যোধপুর ও মাড়োয়ার নৃপতিগণের এই ছোট বড় সমাধি মন্দিরগুলির মধ্যে মেবারের উত্থান পতনের অলিখিত ইতিহাস পাঠ করতে পারা যায়। স্বর্গীয় রাণীদের স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত ছোট ছোট 'ছত্রী' আছে। তাছাড়া, এখানকার 'সতী-মন্দির' থেকে বোঝা যায় রাণীরাও কেউ কেউ সহমরণে যেতেন।

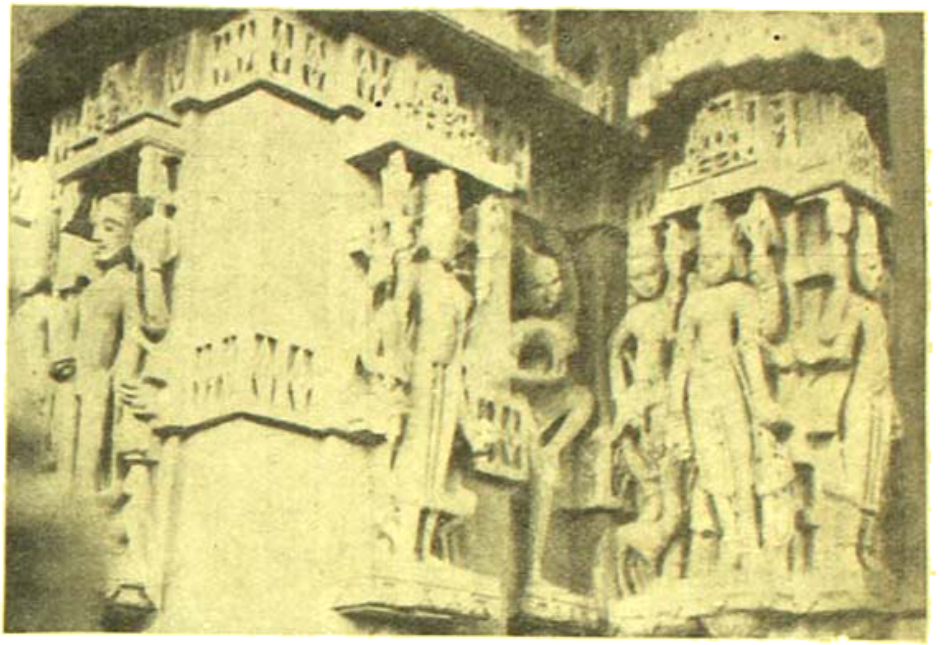

সমাধি মন্দির গাত্রে মূর্তি শিল্প

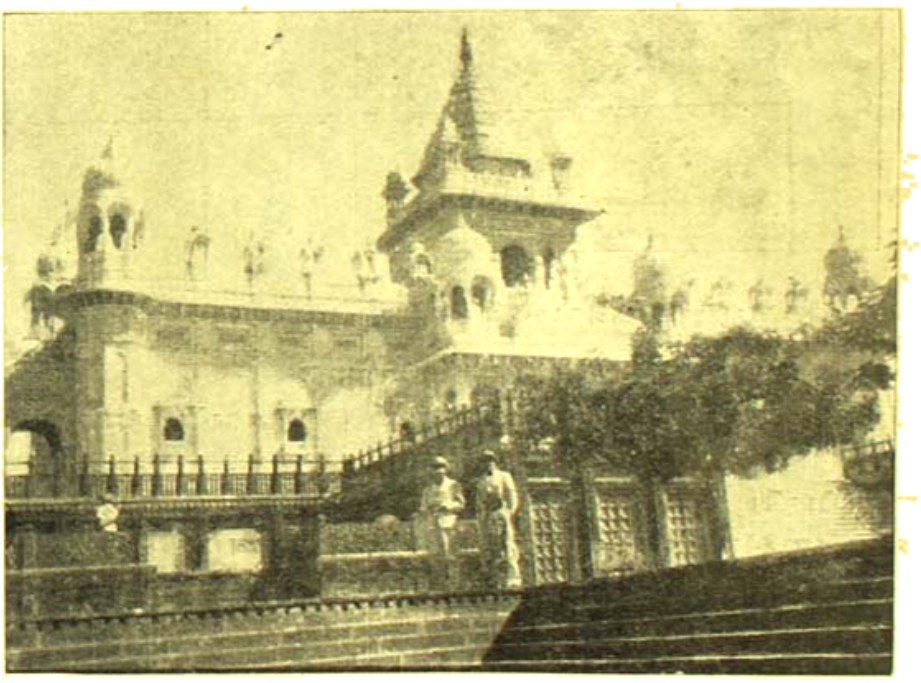

আধুনিক সমাধি মন্দির

রাজপুত স্মৃতি ছাড়া এখানে ইসলাম অধিকারের লজ্জাজনক স্মৃতিও অক্ষয় হয়ে আছে. এখানে প্রবেশের সুগঠিত ও সুদৃশ্য পাষাণ তোরণ পথে। পাঠান গোলাম শের কালাবার খাঁ ও তদ্বংশ খাজীর বিজয় চিহ্ন আজও বিলুপ্ত হয়নি। তাম্রাপীতের বরগাছ কারুকার্যখচিত চন্দন কাঠের প্রবেশদ্বার এখনও মোগল মহিমা প্রচার করছে।

মাণ্ডোর নগরের একাংশে এক বিশাল স্বর্ণপুরী ছিল। সেখানে বাকি তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। একটি পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়ের গা-কেটে কেটে এই মূর্তিগুলি খোদাই করেছিল।

কিন্তু "তেত্রিশ কোটি দেবতা-কা স্থান" আমাটাই আছে। দেবতা কেউ নেই। মহারাজ অজয়সিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সোনার বিচিত্র মূর্ত্তি এখানে নির্ম্মিত হয়েছিল, সেগুলি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। এই মোট মূর্ত্তির মধ্যে চামুণ্ডাদেব, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, পৌলাইজী, (রাজপুতানার প্রধান পুরোহিত) রণীমাতজী (মহারাণা বংশের প্রতিষ্ঠাত্রী), অন্নপূর্ণা (যে রথের উপর ইনি প্রায় বিরাজিতেন), রাজরাজেশ্বরী (মহারাজা অজয় সিংহের বংশের এক বীর), হরভুজ (ইনি রাওযোধাকে বর দান করেছিলেন), অম্বাজী (এই পরিবার রাজপুত দেবতা বিকানীরপতিদের ইষ্টদেবতা), মেয়াজী (একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত বীর, চারণ গানের মধ্যেও এঁর উল্লেখ আছে), গণপতী (যাদবীর বলে এঁর খ্যাতি ছিল), ব্রহ্মা, সূর্য্য, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব ও সাধু জলন্ধরনাথজীর মূর্ত্তি। দুঃখের বিষয় যে এই মূর্ত্তিগুলিকে ভাস্কর্য্য কলার দিক দিয়ে কিছুতেই উচ্চশ্রেণীর বলা চলে না।

রাজমহিষী শ্রীযুক্তা অংশু দেবী

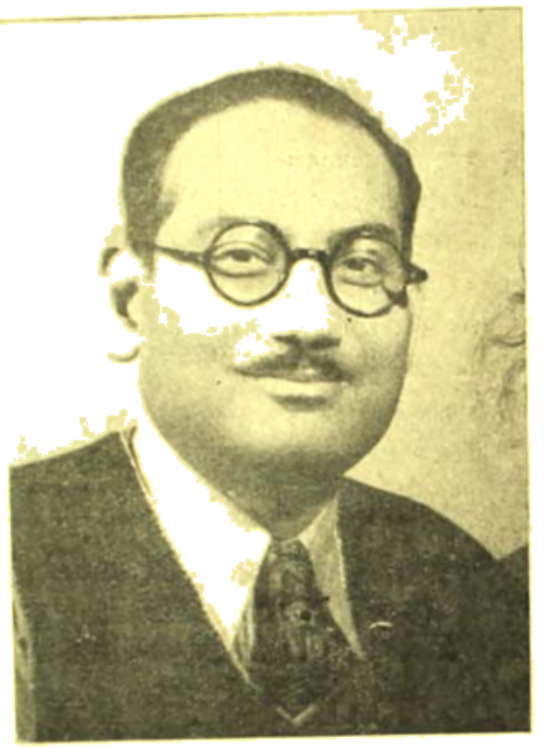

রাজমহিষী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী

বীরেন ভায়ার সবল পরিচালনায় গুণে তিনদিনের মধ্যেই আমরা যোধপুরের যা কিছু দ্রষ্টব্যস্থান সমস্ত দেখা শেষ করে ওখানকার প্রবাসী বাঙালী সমাজের সেরা ও সুখপাত্র ডাক্তার বিজয়লালের বাড়ীতে একটি চা পার্টিতে বিশিষ্ট বাঙালীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে এবং একদিন শ্রীযুক্তা গুপ্তার আতিথ্যলাভের সৌভাগ্যে ধন্য হ'য়ে পরম পরিতৃপ্ত মনে যোধপুর ছেড়ে উদয়পুরের দিকে রওনা হলুম।

বীরেন ভায়ার স্ত্রীভাগ্য ঈর্ষণীয়যোগ্য। শ্রীযুক্তা গুপ্তাকে একজন আদর্শস্থানীয়া সুগৃহিণী বলা চলে। তিনি যে শুধুই 'গৃহী ভাষা শিল্পীমনসা পত্নীবিদ্যাকরোতি' তাই নয়, অন্যের গুণগ্রাহী, বিদুষী, শিল্প কলানুরাগী এবং সবচেয়ে বড় কথা—অতি সরল সুমধুর আলাপচারিণী। অল্পক্ষণ পরিচয়েও তিনি আমাদের যে রকম আদর যত্ন করেছিলেন তা যথার্থই প্রশংসনীয়। তাঁর মধ্যে ওখানকার দাদা জজসাহেব কোন কৃত্রিম রূপ বা ভড়ংএর বালাই নেই। তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমায় সেটা আমাদের অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। তিনি যেন—কবির ভাষায় একখানি সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন ও শাণিত 'খাপখোলা তলোয়ার।'

যেদিন যোধপুর ছাড়লুম, বীরেন ভায়া, ডাক্তার বিজয়লাল, অধ্যাপক সখী প্রভৃতি ওখানকার বান্ধবগণ আমাদের ষ্টেশন পর্য্যন্ত এসে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন। (ক্রমশঃ)

আমরা মর্ধ সিয় সুদীর্ঘ আঁকা বাঁকা তীররেখা পেরিয়ে সুইডেনের উপর এসে পড়লাম। বিমান গোটেনবুর্গে ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়ালো, আমরা নেমে এয়ারড্রোমের ওয়েটিংরুমে গেলাম। পৃথিবীর মাটীতে নেমে কেবল মনে হতে লাগলো—এতক্ষণ যেন কোন মেঘের রাজ্যে ছিলাম। নিজের চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না—চলচ্চিত্রের ছবির মত মুহূর্তে সব বদলে গেল ; মনে ঘাঁ ঘাঁ লেগে গেল।

ষ্টকহল্ম শহর (প্রাচীন অংশ)

আমরা এখানে কিছু পাইওকে সুইডিশ ক্রোণে বদলে নিলাম। এ দেশের লোকেরা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সুইডিশরা দীর্ঘকায়, খুবই হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, তাদের পাশে আমরা ছোটখাট মানুষ। এখানে একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ডাক এল, আবার বিমানে উঠলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টকহল্মে পৌঁছে গেলাম। যথারীতি কাষ্টম ও পাসপোর্টের হাঙ্গামা সেরে বেরিয়ে এলাম। চারিদিক থেকে ছবিওলাদের ভীড় জমলো—নতুন দেশের নতুন মানুষের ছবি চাই। সামনেই দেখি প্রফেসার হে মোন—স্থানীয় স্বনামধন্য গ্রীচিকিৎসক. গাড়ী নিয়ে এসেছেন আমাদের নিতে। আমরা প্রফেসারের সঙ্গে কথা-

ষ্টকহল্ম শহর (আধুনিক অংশ)

বার্ত্তা বললাম. তারপর তাঁর গাড়ীতে করে শহরের দিকে রওনা হলাম। বাইরে তখনকে শীত—তাপ প্রায় ৩৮°, আমাদের মোটর কিন্তু গরম, ঠাণ্ডা বুঝতেই পারছি না। প্রফেসার বললেন, এখন শীতের শেষ, তবির বরফ গলছে, গাছে এখনও কোন পাতা বেরোয়নি।

শুনলাম ঐতকালে—২০—২৫ অবধি টেম্পারেচার নামে Baltic Sea জমে বরফ হয়, তার উপর দিয়ে হেঁটে ওপারের দেশে যাওয়া যায়।

একেসারের সাথে গল্প করতে করতে মোটর একটি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। Hotel Plazaতে তিনি আমাদের জন্য ২ খানি ঘর রিজার্ভ করে রেখেছিলেন।' আমরা বারান্দায় তিন তলায় ২ খানি ঘরে গেলাম, চমৎকার সাজানো ঘর, উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত, ঘরের টেম্পারেচার, তখন ৬০°. আমরা ক্লান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

২রা মে। সকালে খাবারওলারা আমার ছবির জন্য এসে হাজির। আমাদের সাজ পোষাক ও আমাদের চেহারা তাদের মহাবিস্ময়ের কারণ হল—উৎসুক্যের অবধি নেই। আমার জরিপাড় সাড়ী, খুকুর সালুয়ার ফ্রক ও ওঁর গলাবন্ধ কোট্ দেখে Costumeএর প্রশংসা আর করে না। ছবি তোলা হল, ভারতবর্ষের নানা কথা জিজ্ঞেস করল, তারপর ওঁর কার্যকর্মের খবর লিখে নিয়ে চলে গেল। বেশভূষা তারা ভারতের কিছুই জানে না। পৃথিবীর একজোড়া এদের বাদ, দেশ-

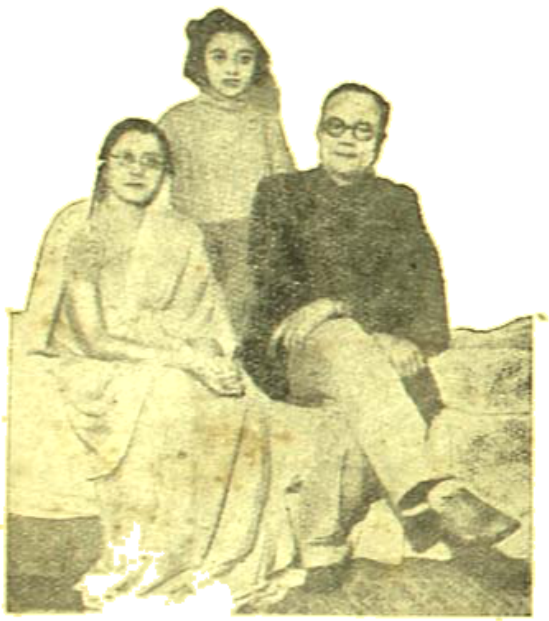

সুইডিশ সংবাদপত্রে আমরা।

দেশান্তরের মানুষদের এরা চোখে দেখে না, পৃথিবীর আরেক প্রান্তে এশিয়া মহাদেশের খবরাখবর জানার সুযোগ এদের ভাগ্যে খুব কমই ঘটে।

আমরা প্রাতরাশ ঘরের ভিতরই খেয়ে নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছি। খুকু কেঁপে মরি, সামান্য একটু দূরেই আমি হোটেলে ফিরে এলাম। উনি গেলেন হাসপাতালে। এ দেশে লাঞ্চ খায় ১১টা হতে ১টার মধ্যে, সান্ধ্যআহার করে ৭টা থেকে ৮টায়। উনি ফিরে এলেন। ১২টার সময় লাঞ্চ খেয়ে আমরা ইলেক্‌ট্রিক ট্রামে করে চললাম স্টকহলম প্রদর্শিত করতে। স্টকহলম ছোট সহর, লোক কম, সারা সুইডেনের লোকসংখ্যা মাত্র দশ লক্ষ। স্টকহলমের শোভা হচ্ছে, অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ এখানে রয়েছে, সব লম্বা দ্বীপগুলির উপর নানা রঙের বাড়ী টানা সারি, মোটর লঞ্চ ও ষ্টীমার ভাসছে। আমরা সহর ঘুরে একটি রেষ্টুরেণ্টের সামনে নামলাম, সেখানে আহারাদি সেরে হোটেলে ফিরে গেলাম। রাত ১১টার সময় গরম কাপড়ের বোঝা পরে কনকনে শীতে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছি। বিজ্ঞাপনের আলোয় রাস্তা আলোকিত—দোকানে জানলায় কাঁচে সাজানো বহু রকমারি জিনিষ দেখতে দেখতে হাঁটছি। ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন ৩রা মে। আমরা সকালে উঠেই কাগজ খুলে দেখি আমাদের তিনজনের ছবি বেরিয়েছে, ছবির নীচে সুইডিশ ভাষায় কত কি লেখা

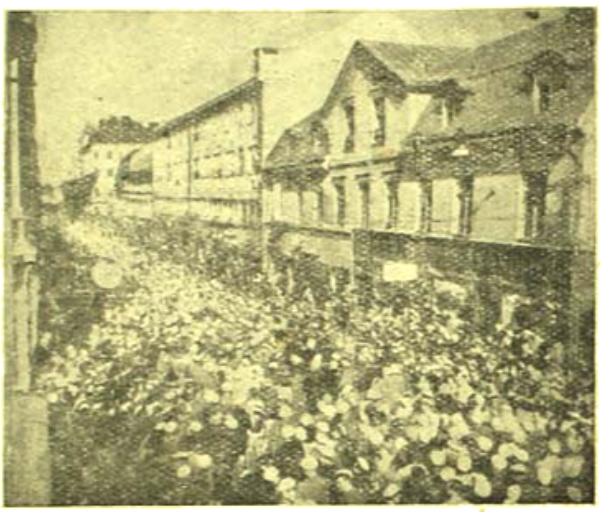

গ্রীষ্ম উৎসব

হয়েছে, একবর্ণও পড়তে পারলাম না। হঠাৎ চোখে পড়লো ওঁর কপালে টীপ, ছবি দেখে আমরা তো বেঁচে বাঁচি না।

মহার বাপার, তাড়াতাড়ি ছবিটা কেটে নিলাম, কোলকাতায় আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠাতে হবে। একজন মহিলা অফিসারের কাছে কাগজ নিয়ে গেলাম, তিনি পড়ে ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিলেন।'

বাইরে রোদ নেই, বন্ধুকের গুঁড়োর মত বৃষ্টি পড়া সুরু হল, বুঝলাম আরো ঠাণ্ডা পড়বে। যত কিছু গরম পরিধান ছেলে, শীতের কষ্ট হাঁটা যায়। খাওয়া সেরে রাস্তায় বেরিয়েছি, কাঁপুনি ধরল, দৌড়ে দৌড়ে চলেছি, পার্কে পাইন গাছের ভিতর দিয়ে ছুটে এসে এয়ার অফিসের গরম ঘরে ঢুকে পড়লাম। উনি কাজ সেরে সেখান থেকে হাসপাতালে চলে গেলেন, আমরা বাইরে এসে দেখি রোদ উঠেছে। পার্কে এসে রোদ পোওয়াতে বসলাম, রোদ আর গায়ে লাগে না—জলহ শীত, দৌড় দিলাম হোটেলের দিকে।

এ দেশের লোকদের রং খুব ফর্সা; মেয়েরা বেশ সুশ্রী, চেহারায় কোমলতা আছে, নীল চোখের উপর টানা কালো ভুরু ও মাথায় কালো চুলে বেশ সুন্দর দেখতে—পোষাকে উপর আরো বেশ সুন্দরী।

এখানকার জীবজন্তুগুলা লোমে ঢাকা। প্রকৃতির সাথে লড়তে হয়

ফলে তারাও নিজেদের প্রয়োজন মত দেহাবরণ তৈরী করে নিয়েছে—নচেৎ বাঁচা অসম্ভব হত।

আজ বিকেলে প্রফেসার যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে আরো ১০।১২ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এসেছিলেন, আলাপ পরিচয় হল, বসবার ঘরে বসে সব গল্প করছি। প্রফেসারের স্ত্রী নেই, একটি বিবাহিতা কন্যা, জামাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ আমাদের ঘিরে নানা রকম প্রশ্ন করছেন। প্রফেসার বেরত্যান (Prof, Derean) বেশ রসিক মানুষ, নানা রকম মজার গল্পে আসর জমিয়েছেন। শুনলাম আমাদের আসার আগের দিন এখানে এক উৎসব হয়ে গেছে,

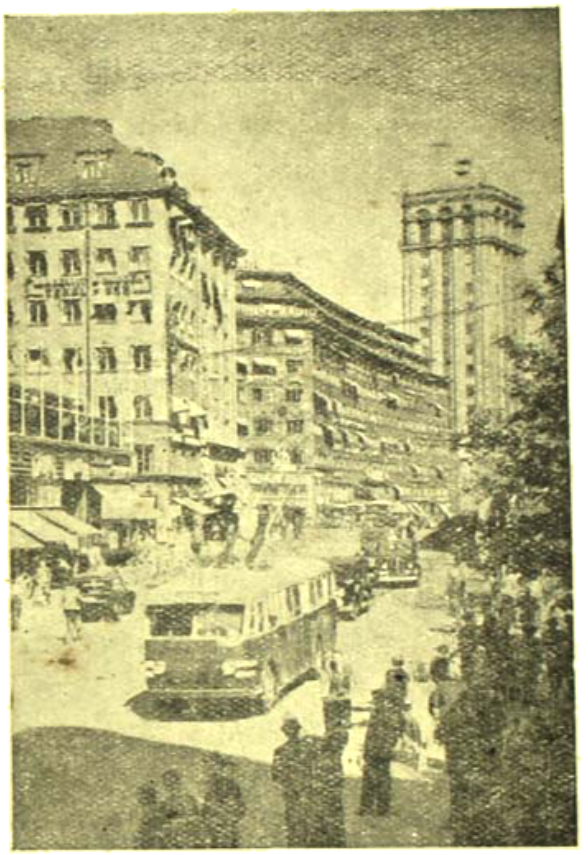

ইকহলমের রাজপথ

স্কুল, কলেজ ও অফিস বন্ধ ছিল, লোকেরা সব রাস্তায় রাস্তায় প্রসেসন করে ব্যাণ্ড বাজিয়েছে—এটা হল বড় উৎসব—গ্রীষ্মের আগমনে সূর্য-দেবের আরাধনা এমনি করে দেশবাসীরা করেছে।

এখানে সূর্যের এত অভাব যে গ্রীষ্মকালে রোদ উঠবে বলে লোকেরা এখন থেকেই আনন্দ করছে। শীতের অবসানে গ্রীষ্ম আগতপ্রায়। এঁরা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বই কিছু পড়েন বি, এ দেশে কোন বইও যোগাড় নেই। তাঁরা শুনেন, সুইডেনের স্কুল কলেজে ও অন্যান্য ইনষ্টিটিউশনে সব কিছু সুইডিশ ভাষায় শেখানো হয়। যাঁরা বিদেশী ভাষা শিখতে ইচ্ছুক তারা অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে সে সকল শিখতে পারেন। সুতরাং ইংরাজি এ দেশে খুব কম লোকই জানেন। অর্ধেক নিমন্ত্রিত মহিলাদের সাথে কথা বলতে পারলাম না, তাঁরা ইংরাজি জানেন না, আর আমিও সুইডিশ ভাষা এক বর্ণও বুঝি না।

আমি অবাক হয়ে শুনলাম—যখন একজন আমায় জিজ্ঞেস করলেন ভারতবর্ষে রাস্তায় রাস্তায় সাপ হাতি বেড়ায় কিনা। আমি হাসি চাপতে না পেরে একটু জোরেই হেসে উঠেছি ; তারপর বললাম সহরের পরিষ্কার পাকা বাঁধানো রাস্তায় আজকের এই সভ্যসমাজে কোথাও কখনও কি সাপ হাতি বেড়িয়ে বেড়াতে শুনেছেন? ভারতবর্ষের জঙ্গলে থাকতে পারে, সহরে তো নয়। সে কেবল ভারতে কেন, সারা পৃথিবীর জঙ্গলই তো বন্য জীবজন্তুর আবাসভূমি।

ডিনারের ঘণ্টা বাজলো, সুইডিশ প্রথা মত গৃহকর্ত্রী ও কর্ত্তা এগিয়ে এসে অতিথিদের হাতে হাত মিলিয়ে এক একজনকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সবাই মিলে টেবিলে বসে একটা গান গাইলেন, তারপর গেলাস তুলে ঘরে Skoll বলে খাওয়া আরম্ভ করলেন। অতি সুন্দর সাজানো টেবিল, কাটগ্লাসের বাসনে ঝকঝক করছে, বাতি দানীতে মোমের বাতি জ্বলছে। খুব সুন্দর রান্না, টাটকা খাদ্যদ্রব্য, আইসক্রীম অতি উৎকৃষ্ট। খাওয়া হলে সুইডিশ প্রথা মত গৃহকর্ত্রীর সাথে হাতমেলক করে ধন্যবাদ জানালাম। বসবার ঘরে সবাই কফি খেলাম। প্রফেসারের স্নেহ-ধৌয়া আমাদের শাড়ীতে জরির কারুকার্য্য দেখে ভারতীয় শিল্পকলার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই সাঁচ্চা জরি ও শিল্প তাঁদের খুবই পছন্দ।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাদেশিক নানা রকম গল্প শুরু হল। শুনলাম এই যুদ্ধের সময়ে এখানে ডাইভোর্সের সংখ্যা নাকি দ্বিগুণ বেড়েছে, তাতে সমাজপতিরা বেশ আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। আমাদের বিবাহের কথা তারপর উঠলো। আমাদের দেশে মেয়েরা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যায় এবং সেখানে সবাইকার সাথে একত্রে একান্নবর্ত্তী বাস করে—এ তারা কেমন করে পারে? এত বড় কঠিন সমস্যার সমাধান না করতে পেরে শেষে সরল সোজাভাষায় আমাদের জিজ্ঞেস করে ফেললেন। বললাম "হাঁ, তারা একটু কষ্ট করে বৈকি। একত্রে বাস করতে গেলে স্বার্থ ত্যাগ কিছু করতেই হয়। জীবনে এইটুকু কষ্ট স্বীকার তারা অনায়াসেই করে—এটা কর্ত্তব্য বলেই মনে করে। বৃদ্ধ শ্বশুরশাশুড়ীকে আমরণ সেবা যত্ন করা কি মনুষ্যত্বের দিকে থেকেও বড় কাজ নয়?

দেখলাম তাঁরা মাথা নেড়ে বলেন 'সত্য'। যাবোক সময় ভালোই কাটলো। আমার তো বকতে বকতে প্রাণ যায়, খুকুর অবস্থাও তাই, মুখে চোখ লাল হয়ে উঠেছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম, টেক্সি ট্রাণ্ডে ফোন করে দিতেই টেক্সি এসে গেল, হোটেলে ফিরে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

ভারতে শিল্পসঙ্কট

যুদ্ধের মধ্যে ভারতে যে শিল্পসম্প্রসারণ দেখা যায়, তাহাতে এদেশের শিল্প-ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা করিবার অনেক কিছু ছিল। প্রায়ত্ত পাঁচাবাদ, সুলভ শিল্পশ্রম বা শক্তিসম্পদের অভাব নাই, এতদিন অভাব ছিল শুধু কলকারখানা পড়িবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতির এবং শিল্পোৎসাহের। যুদ্ধের সময় এদেশের শিল্পসংস্থান সম্পর্কে মূল্যবান বিশ্বয় ভারতসরকারের দৃষ্টিভঙ্গির আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে মহাসুযোগ আসে। আমদানী অভাব জন্য যন্ত্রপাতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না গেলেও এই সময় সারা দেশে প্রচুর শিল্পোৎসাহ দেখা যায় এবং চাহিদার চাপে মূলতঃ পণ্যবাজার সৃষ্টি হওয়ায় শিল্পাদি প্রভূত প্রসারিত হয়। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে কাগজ, ইস্পাত ও বস্ত্র উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৩৯,০০০ টন, ৭,৩০,০০০ টন ও ৩০০ কোটি গজ, ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৩,৪০০ টন, ১১,২৫,০০০ টন ও ৪৭০ কোটি গজে পৌঁছায়। এ ছাড়া এই যুদ্ধের সুযোগে ভারতে নানা নূতন পণ্য উৎপাদনের বহু ছোট বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার আর্দেশির দালালের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর (Planning and Development Department) এদেশে বিভিন্নপ্রকার শিল্প সম্পর্কে সুযোগ ও পরামর্শদানের জন্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া অনেকগুলি প্যানেলও গঠন করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু শাসনভার হাতে পাইয়া ট্যারিফ বোর্ডের সংস্কার করার পরও লোকে জাতীয় সরকারের আমলে অবিলম্বে ভারতীয় শিল্পপ্রগতি সম্পর্কে বিশেষ আশান্বিত হয়। কিন্তু দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আশা ক্রমেই ক্ষীয়মান হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পজগতে অত্যন্ত দুর্দিন দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সময় অত্যধিক কাজের চাপে যে যন্ত্রপাতি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের সংস্কারের জন্য এবং নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশ হইতে যে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী করা দরকার, নানাকারণে সেই আমদানী সম্ভব হইতেছে না। ইহার ফলে অনেক কারখানার কাজ কম হইতেছে এবং অনেকগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এদিকে যুদ্ধ শেষ হইবার আড়াই বৎসর পরে এখনো জিনিষপত্রের দাম কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এ অবস্থায় বাঁচিবার উপযুক্ত মিয়াদ মজুরী ও ছাঁটাই বন্ধের জন্য শ্রমিক-শ্রেণী যে সঙ্গবদ্ধ দাবী জানাইতেছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় বহু শিল্পপতিরা সেই দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল না হওয়ায় দেশে শ্রমিকবিক্ষোভ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। ধর্মঘট ইত্যাদি আজকাল খুবই সাধারণ ঘটনা এবং অসংখ্য কাজের দিন নষ্ট হওয়ায় ভারতের শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন সম্প্রতি বিষাক্ত হ্রাস পাইয়াছে। মুদ্রা-স্ফীতির যুগে এই পণ্য-উৎপাদন হ্রাস কিরূপ সাংঘাতিক ব্যাপার, তাহা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা যুদ্ধের কালকারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটিয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধারণ দেশবাসী বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও অন্নাভাবের সঙ্গে শিল্পসঙ্কটের চাপে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য আজাদ আমিলে ভারতসরকার শিল্পপতি ও শ্রমিকদের একই সঙ্গে সন্তুষ্ট করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু আবেদন নিবেদন ছাড়া সুস্থ কোন নীতির অভাবে তাঁহাদের চেষ্টা বিশেষ সাফল্যলাভ করিতেছে না।

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে ভারত-সরকারের শিল্প ও সরবরাহসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গত ১৫ই ডিসেম্বর দিল্লীতে একটি শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন কালে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে কাগজ, ইস্পাত এবং সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮০ কোটি গজ, ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টন ও ১৪ লক্ষ ২৩ হাজার টন ; ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদন হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৩৮০ কোটি গজ, ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টন ও ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। এই এক বৎসরে চিনি ও কাগজের উৎপাদনও যথাক্রমে ১ হাজার টন ও ৮৪ হাজার টনের হ্রাস পাইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে টাটা কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক স্যার আর্দেশির দালাল মত প্রকাশ করেন যে, দেশব্যাপী শ্রমিক বিক্ষোভ ও প্রমশক্তির মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার ক্রমবর্ধমান অভাবই এই পণ্য-উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ। আগেই বলা হইয়াছে, উৎপাদন হ্রাসের এছাড়া আরও কারণ আছে। সুতরাং অবস্থার সত্যকার উন্নতি করিতে হইলে কর্তৃপক্ষকে এ ধরণের সংকীর্ণ মনোভাব অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। বাস্তবিক বর্তমান দুঃসময়ে সকল দিক হইতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না হইলে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর 'উৎপাদন কর নতুবা ক্ষয় হও' (Produce or Perish) শ্লোগান শুনাইয়া শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকতর উৎপাদনে অনুপ্রাণিত করিবার সমস্ত শুভপ্রয়াস শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

উপরিউক্ত দিল্লী সম্মেলনে ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে একটি ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। শিল্পসঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ মীমাংসার উপর বিশেষ জোর দেওয়া না হইলেও এদেশের শিল্প-ভবিষ্যতের দিক হইতে এই প্রস্তাবটি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবের মূলকথা হইল—(১) বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় রেল ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি আমদানী এবং দেশে ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ

সোডা প্রভৃতি কাঁচামাল ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে হইবে; (২) পণ্য-উৎপাদনের উচ্চহার রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য বিশেষজ্ঞ বোর্ড গঠন করিতে হইবে; (৩) বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত বিশেষজ্ঞ আমদানী করিতে হইবে; (৪) যেসে কয়লা উৎপাদন বাড়াইতে হইবে এবং রেলপথে সিমেন্ট জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা ও কাঁচামাল চলাচলের সর্ব্ববিধ সুবিধা দিতে হইবে; এবং (৫) সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলি কারখানায় আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য পণ্য-উৎপাদনের দ্বার বাঁধিয়া দিতে হইবে।

কথা বাহুল্য, ভারতসরকার নিজদায়িত্বে যদি এই প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যকরী করিতে উৎসাহ দেখান, সে উৎসাহ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নিষ্ফল হইতে পারে না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে অর্থ-নৈতিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি যে আগে দরকার—সেকথা আজ এদেশের ছোটবড় সকলেই বুঝিয়াছে। এ সময় সরকারের দিক হইতে সুনির্দ্দিষ্ট শিল্পনীতি যদি ঘোষিত হয় এবং দেশের শিল্পপ্রগতি সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টা যদি বাস্তবরূপ পায়, সকলেই সানন্দে সহযোগিতা করিয়া সরকারের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু হইতে ছোটবড় সমস্ত দেশনেতা আজ শ্রমিকদের ও সাধারণ দেশবাসীকে কিছুদিনের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে আহ্বান জানাইতেছেন। আশার কথা দেশবাসী এখন ক্রমেই দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্পর্কে সজাগ হইয়া উঠিতেছে এবং বলগত স্বার্থের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রেরণায় তাহারা নেতৃবর্গের আবেদনে এখন কিছু কিছু সাড়াও দিতেছে। অবশ্য এই সময় শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি সম্পর্কে সরকারের সক্রিয় সহানুভূতি বৃদ্ধি পাওয়া বিশেষ দরকার।

উত্তর শিল্পাঞ্চলের সহিত কলিকাতার যোগাযোগ

যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত কলিকাতা উত্তরদিকে টালা-শ্যামবাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল, ইহার যা কিছু অগ্রগতি হইতেছিল সবই দক্ষিণদিকে। এইভাবে বালুর, রিজেন্ট পার্ক, চাকুরিয়া, এমন কি যাদবপুর পর্য্যন্ত বৃহত্তর কলিকাতারূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলে যানবাহন যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বতঃই প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

যুদ্ধের শেষদিকে কলিকাতায় জনসংখ্যা যখন অত্যধিক বাড়িয়া যাইতে থাকে, তখন গৃহসমস্যাপীড়িত হইয়া অনেকে কলিকাতার কাছাকাছি উত্তর মহকুমাতে বাস করা লাভজনক বিবেচনা করিলেন। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে টালা, পাইকপাড়া, বরানগর, সিঁথি প্রভৃতিতে বহু নূতন লোকের বাস আরম্ভ হইল। এছাড়া বলিতে গেলে কলিকাতা হইতে কাঁচড়াপাড়া পর্য্যন্ত শিল্পাঞ্চল এবং যুদ্ধের মধ্যে শিল্পাগ্নি প্রসারিত হওয়ায় এই সব কলকারখানার লোকজন অনেক বাড়িয়া যায়। কাজেই স্বভাবতঃ বারাকপুর মহকুমাই জনবহুল হইয়া উঠে। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য বা যাবে থাল থাকার দরুণ স্বাভাবিক অসুবিধার জন্য, —যে কারণেই হউক উত্তর অঞ্চলে যানবাহন অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও যুদ্ধের আগের তুলনায় মোটেই উন্নত হয় নাই।

বাঙ্গলা বিভাগের পর পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অসংখ্য আশ্রয়প্রার্থী কলিকাতায় আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে এবং ইহাদের অধিকাংশেরই আর্থিক সংস্থান কম বলিয়া পল্লীঅঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্থানে বাস করিবার স্পৃহা ইহাদের নাই। ইহারা পারতপক্ষে কলিকাতা বা দমদমতলীতে (যেখানে কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ বা আশা আছে) মাথা গুঁজিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। কলিকাতায় স্থান নাই, দক্ষিণ কলিকাতা বহু দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে, দূরত্ব, গৃহাদির অপ্রাচুর্য্য, জমির দুর্মূল্যতা এবং উন্নত-ধরণের জীবিকার মান এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পরিপন্থী, কাজেই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সমাগত জনতার অধিকাংশই টালা হইতে কাঁচড়াপাড়া—উত্তর কলিকাতার এই শিল্পাঞ্চলে বসবাস করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহাদের চাহিদার চাপে এই সব এলাকার জমির দর আগের হিসাবে তিন-চারগুণ বা আরও বেশী বাড়িয়া গিয়াছে (অবশ্য এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও ইহা দক্ষিণ অঞ্চলের চাকুরিয়া—যাদবপুরের জমির দরের কাছাকাছিও পৌঁছায় নাই)। তবে অতিরিক্ত চাহিদার জন্য বাড়তি দরে জমি কিনিবার খরিদ্দারেরও অভাব হইতেছে না।

উত্তর অঞ্চলে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ এদিককার যানবাহন ব্যবস্থার মোটেই উন্নতি হইতেছে না। লোকাল ট্রেণের সংখ্যা বাড়িবার পরিবর্ত্তে ইঞ্জিন ও গাড়ীর অভাবে ইদানীং কিছু কমিয়াছে এবং শ্যামবাজার হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত ও বারাকপুর হইতে হালিসহর পর্য্যন্ত যে বাস চলিতেছে তাহাতে অসম্ভব রকম ভীড় লাগিয়াই আছে। লোক বাড়িবার জন্য এখন আপ বা ডাউন যে কোন লোকাল ট্রেনে এবং বাসে লোককে জীবন বিপন্ন করিয়া হাতেল ধরিয়া ঝুলিয়া যাইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে অবস্থা ক্রমেই এমন হইয়া উঠিতেছে যে, গাড়ীর যাত্রাস্থল হইতে গাড়ীতে উঠিতে না পারিলে গাড়ী চড়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকিতেছে না এবং মধ্যপথে যাহাদের বাস করিতে হয়, তাহাদের দুর্দ্দশা ক্রমেই অবর্ণনীয় হইয়া উঠিতেছে। এইভাবে শ্যামনগর, ইছাপুর, খড়দহ, সুখচর, পানিহাটি, আগড়পাড়া বা বেলঘরিয়ার লোকেদের কলিকাতার সহিত যোগাযোগ রক্ষা এখন একটা মহা কষ্টকর ব্যাপার। ইহাদের অধিকাংশই চাকুরীজীবী, কাজেই কলিকাতায় নিত্য আসা যাওয়া না করিলে ইহাদের চলে না। এক্ষেত্রে ইহাদের ক্রমবর্দ্ধমান অসহায়তা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার উপর এই উত্তরাঞ্চলে কল-কারখানা প্রভৃতির জন্য ইতিমধ্যে বহু জমি ও বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। এখন অবশ্য গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী জিনিষপত্রের অভাবে ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইতেছে না, তবে বাড়ীঘর তৈয়ারী হইলে লোকসংখ্যা এখনকার তুলনায় নিঃসন্দেহে অনেক বাড়িয়া যাইবে। যানবাহনের এখন এই অবস্থা, লোক বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে লোকের দুঃখদুর্দ্দশা সত্য সত্যই সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যাইবে।

এই দুইই সময় থাকিতে সমস্যার সমাধানে মনোযোগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এদিক হইতে প্রথম আগ্রহ দেখাইতে হইবে সরকারী কর্তৃপক্ষকে। শুনা যাইতেছে উত্তর অঞ্চলে শীঘ্রই বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলিবে। যত শীঘ্র সম্ভব এই ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। যতদিন তা না হয় ততদিন অন্ততঃ অফিস যাইবার ও অফিস হইতে ফিরিবার সময় অধিক সংখ্যক লোকাল ট্রেণের এবং ট্রেণে অধিকসংখ্যক কামরার ব্যবস্থা করিতে হইবে; সরকার অনেক দিন ধরিয়া ইঞ্জিন ও গাড়ীর অভাব, পাতাবের দোহাই, পাকিস্থানের সমস্যা ইত্যাদি অসুবিধার কথা শুনাইয়া যাত্রিগণ এড়াইতে চাহিয়াছেন, এইবার ইহার শেষ হওয়া উচিত। ট্রেণ বাড়াইবার ব্যবস্থা যতটুকু হয় ততটুকুই ভাল, ইহার সঙ্গে সঙ্গে লাইন বাড়াইবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বারাকপুর হইতে শ্যামবাজার পর্যন্ত যে লাইনটি আছে তাহাকে চাকুরীজীবী কোলার পর্যন্ত অবিলম্বে প্রসারিত করা উচিত। এই ব্যবস্থার অনুপূরক হিসাবে শ্যামবাজার হইতে কাঁকুরগাছি ও খড়দহ পর্যন্ত দুইটি নূতন শাখা লাইন খোলা দরকার। এইভাবে বারাকপুর হইতে চাকুরীজীবী কোলার পর্যন্ত একটি লাইন চলিবে এবং ইহার সহিত শ্যামবাজার-সিঁথি, শ্যামবাজার-কাঁকুরগাছি ও শ্যামবাজার-খড়দহ এই তিনটি শাখা লাইন চালু থাকিবে। ভাটপাড়া বা শ্যামনগর হইতে বারাকপুর পর্যন্ত একটি শাখা বাদ লাইনও এই সঙ্গে খুলিতে হইবে। উত্তর অঞ্চলে লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে এই সব নূতন লাইনে বাস চালাইয়া বাস মালিকদের লোকসান যাইবার কোনই আশঙ্কা নাই।

যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে মাটীর তিন কমাইবার জন্য আর একটি দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। উত্তর অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহু কলিকাতার লোক কাজ করে এবং উত্তর অঞ্চল হইতে কলিকাতায় রোজ যাতায়াত করে অসংখ্য লোক। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। অতঃপর সরকারের বা শিল্পপতিদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোন চাকুরী খালি হইলে রীতি হিসাবে স্থানীয় লোক গ্রহণ করার দিকে নজর দেওয়া উচিত। বর্তমানে স্থানীয় যোগ্য লোক পাওয়া যাইবে না এরূপ কেহই বলিবেন না। প্রতিদিন সকালে কলিকাতা হইতে যে কয়খানি লোকাল ট্রেণ যায়, সবগুলিই উপরিউক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাকুরিয়াতে বোঝাই থাকে। ইহারই বিপরীত দিকে কাঁচড়াপাড়া হইতে উটাড়াঙ্গা পর্যন্ত অসংখ্য কলিকাতার চাকুরিয়াতে বোঝাই হইয়া উঠে ডাউন লোকাল ট্রেণগুলি। সুবিধামত কর্মস্থলের পরিবর্তন হইলে অন্ততঃ দুখানি আপ ও দুখানি ডাউন ট্রেণের লোক যে কমিয়া যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষজ্ঞের স্থানীয় লোক হইতে হইবে এমন কথা বলা হইতেছে না, তবে অধিকাংশই কেরাণী-শ্রেণীর চাকুরীজীবী এবং ইহারা যদি কলিকাতার লোক হইত বা সহরতলীর লোক হইত, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। অধিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় স্থানীয় লোক, না হয় কারখানার ভাতাকাড়িই তাহাদের বাসা। এখন ইহাদিগকে লইয়া নয়, এখন অল্প বয়সী কেরাণীবাবুদের লইয়া। চাকুরী বিলির যদি সম্ভব নাও হয়, অতঃপর নূতন চাকরী প্রবর্তনের সময় বিজ্ঞাপনগুলির কর্তৃপক্ষ যাহাতে এদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখেন, তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকারকে আমরা আগ্রহসহকারে অনুরোধ জানাইতেছি। কাঁচড়াপাড়া রেল কারখানা ও ইছাপুর রাইফেল কারখানা, এই দুটি সরকারের বিরাট প্রতিষ্ঠান, এখানে কলিকাতার লোকের স্থলে স্থানীয় লোকেদের অধিকতর সুযোগ দেওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন নয়। এই সঙ্গে তাঁহারা শ্যামনগর পাওয়ার হাউস, টিটাগড় পেপার মিল, বেঙ্গল কেমিক্যাল, এবং চটকল, কাপড়ের কল ও অন্যান্য কলকারখানাগুলির মালিকদের অনুরূপ নির্দ্দেশ প্রদানের অনুরোধ জানাইতে পারেন। সাধারণতঃ উত্তর অঞ্চলের কলকারখানাগুলি যে সব শিল্পপতির সম্পত্তি, তাঁহাদের কলিকাতায়ও নানা কাজকারবার চলিতেছে, কাজেই কলিকাতা হইতে যাহারা এই সব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতে যায় তাহাদিগের স্থানগুলি যথাসম্ভব স্থানীয় লোক আনিয়া কলিকাতার লোকদের সুবিধামত কলিকাতায় কাজকর্ম করিতে দিলে উত্তর অঞ্চলের যানবাহন ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্দ্ধমান চাপ ধীরে ধীরে অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে। এই ধরণের কোন ব্যবস্থা সম্ভব হইলে কর্ম্মোৎসাহ সংরক্ষিত হইবে, তাহার পরিমাণও কম নয়।

২৮।১।৫৮

ছন্দোময়ী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

চরণের কিঙ্কিণী রিনি রিনি বাজে
যৌবন চঞ্চল অন্তর মাঝে!
কুসুমের মালা দোলে বুকের ছন্দে,
সৌরভ হিল্লোল অলক নিকষে;
আবেশে বিহ্বল আঁখি দুটি ঢল ঢল,
উজ্জ্বল তনুখানি মোহনীয়া সাজে!

অঞ্চল হতে ঝরে তারকার বর্ণা;
পুলকিত আঁখিতারে বিদ্যুৎবর্ণা।
মুঞ্জরিত ধরণী যে আজি মুকুলন্তা,
ফাল্গুন নিশীথিনী প্রেম-বধূ-ভূষা;
নিবিড় রাগে আজি মধুর মরীচিকা,
ঘনায়ে লাগে মোলা কম্পিত লাজে!

সোমনাথ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী, কয়েক সহস্র পদাতিক, বিশ সহস্র মাহিষাহী উষ্ট্র ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, কোন দেশ জয় নহে, কোন ধনসম্পদ অধিকার করিতে নহে, কোন রাজ্য বিজয়ের উদ্দেশ্যেও নহে, হিন্দুর দেবমন্দির চূর্ণ করিতে আসিয়াছিল গজনীর মামুদ। এই বর্ব্বর অভিযান ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় লিখি যে, এই ধর্ম্মযুদ্ধের অভিযাত্রীদিগকে বোধ হয় অভিহিত করিতে তাহার বাধে নাই। ইহা যদি ধর্ম্ম, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলিব? এ হেন ধর্ম্মযুদ্ধও নাকি 'প্রফেটের' স্বপ্নাদেশে পরিচালিত হইয়াছিল। স্বপ্নে দৈব ঔষধির নির্দ্দেশ পাইতে শুনিয়াছি; স্বপ্নে বিগ্রহ প্রাপ্তির সংবাদও জানা আছে; ভাগ্যবানগণ স্বপ্নাদেশে ভূগর্ভ হইতে ধনরত্ন পায় বলিয়াও কিম্বদন্তী আছে; কিন্তু স্বপ্নাদেশে চিরবন্দনীয় পূজার স্থান অপবিত্র ও চূর্ণীকৃত করিবার কলঙ্কিত কাহিনী হিন্দুস্থানের হিন্দুর মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু সন্ততির শোণিতাক্ষরে কেবলমাত্র সোমনাথেই লিখিত হইয়াছিল। অনেকদিনের কথা সে, হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অধঃপতিত হিন্দুজাতি তাহার বহু অতীত গৌরব ও মহান ঐতিহ্যের মত, সুমহান সোমনাথকেও ভুলিয়াছিল। অকস্মাৎ একদিন, ভারতবর্ষের লুপ্ত স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, বোধ করি বা দৈবাৎ, হিন্দুস্থানের কালিমাচ্ছন্ন আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ বিকাশে প্রতিফলিত হইলেন, সোমনাথ। আকাশে আলোকের তরঙ্গ; আর বলিব কি, অভাগা হিন্দুর অন্তরেও পুলক প্রবাহ বহিয়া গেল। আরও বলিব কি, হারানো সুরে অজানা গানের ঝঙ্কারে ভারতবর্ষ মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে সোমনাথ ভঙ্গের ইতিবৃত্ত লিখিত ছিল, বাল্যকালে তাহা পাঠ করিয়া দুঃখ বোধ করেন নাই, ঘৃণায় শরীর কম্পিত হয় নাই, এমন হিন্দু ছিলেন অথবা আছেন বলিয়া মনে হয় না। তবু কতটুকু আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম? পৈশাচিকতার পশুও পরাজিত হয়, সে কাহিনী কি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলাম? আজ নাকি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সোমনাথ সংস্কারের বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাই আজ বিস্মৃতির অতল তল হইতে বর্ব্বরতার ভগ্নাংশমাত্র হিন্দুস্থানের হিন্দুকে জানাইবার সাধ হইতেছে।

বিরাটত্বে, বিশালত্বে, প্রভাবে, দেবত্বে ও মহত্বে সোমনাথের তুলনা ছিল না বলিলেও চলে। পুণ্যার্থী, তীর্থযাত্রী হিন্দুর তীর্থ পরিক্রমা পূর্ণ করিতে হইলে প্রয়াগ-মহাতীর্থে সোমনাথ দর্শন ছিল অপরিহার্য্য। মহাভারতখ্যাত প্রভাস, যদুমানব শ্রীকৃষ্ণের বাসভূমি দ্বারকাস্থিত প্রভাস, আবার শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসানক্ষেত্র প্রভাস—এমনই ঘার সম্পূর্ণ মহাতীর্থ, তদুপরি সোমনাথ। হিন্দুর ইহলোক, তাহার ইহলোক পরলোক ত্রিলোক বিজড়িত সোমনাথে নরদেহবিনির্গত অস্থিনিচয় আত্মার সদ্গতি। বিশ্বস্রষ্টা হইতে বহুযুগের বালুকাসমুদ্রের মাঝে কোথা হইতে, কোন্ মহামন্থনে ত্রিবেণীর ধারা বহিল, কেহ জানে না; কিন্তু পুণ্যাতুর স্বর্গকামী হিন্দু ত্রিধারা সঙ্গমে স্নান করিয়া পুণ্য নিতে আসিয়া দেখিল, দুর্গম মহাসমুদ্র শান্তসুধাময়ীর কোলে নিরবচ্ছিন্নের মাঝে পুজার্ঘ্য হস্তে সমুপস্থিত। সোমনাথ দেবার্চ্চনা কালে সাগরে জোয়ার আসে, পূজান্তে জোয়ারের অবসান, তাঁহার জল মন্দির চত্বর হইতে দূরে চলিয়া যায়।

সোমনাথ মন্দির কবে ও কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না; তবে কোন এক জন নৃপতির অর্থানুকূল্যে ও একই কালে যে তাহার নির্ম্মাণ কার্য অনুষ্ঠিত হয় নাই তাহার অনেক প্রমাণ ইতিহাসে ও কিম্বদন্তীতে জানিতে পারা যায়। মূল মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়া শত শত মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাকারপরিবেষ্টনীকে সর্ব্বাধিক উচ্চমান করিবার জন্য যেমন ছোট বড় ও বর্ণ বহুল রত্নরাজি সন্নিবেশিত করা হয়, সোমনাথকে সুসমৃদ্ধ করিবার জন্য তেমনই বহু বিচিত্র মন্দিরাবলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। হিন্দু শুধু ভক্তিই নিবেদন করিত না, দেবতার দ্বারে তাহার ধনরত্ন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া রিক্ত করিয়া ঢালিয়া দিত। সোমনাথের দেবার্থ রক্ষিতাগারে ধনরত্নসমৃদ্ধ স্রাব উৎসৃষ্ট হইয়াছিল; দুই হাজার ব্রাহ্মণ সোমনাথের পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত ছিল, তিন শত পরিচারক, তিন শত বাদ্যকর ও পাঁচ শত দেবদাসী নর্ত্তকী মন্দিরে আরতি নৃত্য করিত। সৌরাষ্ট্র হইতে কনৌজের দূরত্ব নিতান্ত অল্প নহে, কনৌজ হইতে অহরহ নিত্য গঙ্গাজল বহন করিত, সোমনাথের স্নান হইত। মন্দির দ্বারে একটি ঘণ্টা ছিল—প্রায় সকল দেবমন্দিরেই থাকে, ঘণ্টাধ্বনির সাথে সাথে ভক্তের হৃদয়তন্ত্রীর ধ্বনি কি মহৎ পরিকল্পনা তাই! সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করা সংযুক্ত, উদ্ধত শির অবনত। সোমনাথ মন্দিরলগ্ন ঘণ্টাংলগ্ন সুবর্ণশৃঙ্খলটি স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং তাহারও ওজন ছিল দুই শত মণ।

এ হেন রাজরাজেশ্বর ভূতলে স্বপ্নাদেশ না হওয়াই আশ্চর্য্য। আধুনিক কালে যতগুলি ধর্ম্মযুদ্ধ আমাদের পাত্রিকা ঠাকুরাণী এবং পাঠক মহাশয়গণ দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাদের উপক্রমিকা স্বরূপ নরহত্যা, নারীহত্যা, শিশু হত্যা, নারী নিগ্রহ ও লুটন মহোৎসব দ্বারাই লিখিত হইয়াছে সোমনাথেও যে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই ইহা বোধ করি না বলিলেও চলিতে পারে।

সোমনাথ সংহারকালে হিন্দুস্থানের হিন্দু মোগলাধিপতির হিন্দুর মত প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা যতক্ষণ সম্ভব বাধা দিয়াছিল। হিন্দুর দেব দেবীগণের সহিত শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমের কাহিনী ওতঃপ্রোত জড়িত। ভক্তের তাহাতে অবিচলিত আস্থা, বীর্য্যে তাহার অবশ্য নির্ভর।

যাই, এখনও গুজরাটের সোমনাথের উপর আক্রোশের আর বিরাম বিশ্রাম থাকিতে চাহিয়াছিল, তারপর শত কোটী মুদ্রা উৎকোচ দিয়াছিল এবং এক দল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বলি দিয়াছিল, আর একদল সত্যাগ্রহ করিয়া দরজায় দুয়ারে বিধৃতিত হইয়াছিল। যে পয়ঃপ্রণালী দিয়া দুগন্ধ নির্গত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণপ্রবাহিণী ত্রিবেণীর বারিধারা পবিত্র করিত, সেই পয়ঃপ্রণালী পথে হিন্দুর শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

দুর্বৃত্তগণ সারাদিন সারারাত্রি দুয়ার ভাঙ্গিয়া মন্দিরের যে অংশ ভগ্ন করে, সেখানেই আল্লা-হো-আকবর্ অবিরল আনন্দোল্লাস অহর্নিশি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। রাজার রাজকোষে যাহা নাই, সম্রাটের সাম্রাজ্য ভাণ্ডারও যাহার কল্পনা করিতে পারে না, হিন্দুর মন্দিরে তাহাই একত্রিত দেখিলে উল্লাস-উচ্ছ্বাস না হইবে কেন? অতঃপর তাহাদের এই সন্দেহও জন্মিল, মন্দিরেই যখন এত ধন-রত্ন, বিগ্রহে না জানি কি আছে! দুর্বৃত্ত ঠিকই অনুমান করিয়াছিল; দশ সহস্র টাকা যোগাই দিয়াও ইহ তাহারা সে শেষ করিতে পারে নাই। কথিত আছে, সেই দিনের সত্যাগ্রহীর শর সমস্ত পরিত্যক্ত উচ্চ বিগ্রহের উচ্চতাকেও অতিক্রম করিয়াছিল। দশ ক্রোশ দূর হইতেও সেদিন ও সেরাত্রি দুয়ার ভাঙ্গার ধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল। আজও, সহস্রাধিক বর্ষ পরেও, সকীয় বক্ষে কর্ণ প্রসারিত করিলে সে বর্বরত্ব আর্তনাদ শুনিতে পাইবেন, এখন হিন্দু কি হিন্দুস্থানে নাই?

ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত্রি ত্রিশ সহস্র বন্ধু মানবের প্রাণপণ যত্ন সত্ত্বেও সোমনাথের মন্দির তোরণদ্বার ভগ্ন করিতে না পারিয়া যাদুর সে দুইকে কব্জায় লইয়া গিয়াছিল; বলিয়া গিয়াছিল, মজবুতের পা-পোষ করিবে। মিথ্যা কথা! মানুষ মানব হইলেও বানর ছিল না; মণি-মুক্তার ব্যবহার তাহার ভালই জানা ছিল। তাই আফগান যুদ্ধের পরে বৃটিশ গভর্ণর জেনেরাল বহু চেষ্টা করিয়া অন্বেষণ করিয়া দুইখানি লাল পাথর ভিন্ন আর কিছুই পান্ নাই। বৃটিশের অশেষ অনুকম্পা, সেই নকলখানাও ভারতবর্ষে আনিয়াছিল। সে দু'টী আজও নাকি আগ্রার দুর্গে রক্ষিত আছে।

চিরাচরিত রীতি ও রুচি অনুসারে সোমনাথকে মজবুতে রূপান্তরিত করিয়া, সৌরাষ্ট্রাধিপতি সোমনাথ রাজা পরিচালিত করিবার জন্য একজন গভর্ণর নিয়োগ করিয়া মামুদ মনোরথে গজনী প্রত্যাবর্তন করিলে হিন্দুস্থানগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মজবুতকে মন্দিরে রূপান্তরিত করেন; মামুদের গভর্ণর নিহত হয়। ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা ভীমদেব আনুষ্ঠানিক ভাবে সোমনাথ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু, করিলে কি হইবে? বন্ধু মন্দিরে মামুদ ত একলাই ছিল না। মামুদের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রভুত হইয়া ১২৯৭ সালে খিলিজী রাজার প্রতিষ্ঠাতা আলফ খান আর একবার মন্দিরটিকে ধূলিকণায় পরিণতিত করিয়া বর্ব-প্রাণতার পরিচয় দিল। এখনও তাহারা মৃত্তিকা খনন করিয়া এত ধন-রত্ন প্রাপ্ত হয় যে, যে ধনবলে খিলিজী বংশ ভারতবর্ষে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়ে। ইতিহাস পড়িতেছি, হিন্দু তখনও জীবিত ও জাগ্রত জাতি; তাই, আবার হিন্দু-অভ্যুত্থান হয় এবং ৫০ বৎসর মধ্যে পুনরায় সোমনাথ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ হইয়া উঠে। তখনকার হিন্দু সমাজ যে এখনকার মত জীবন্মৃত ও হয় নাই, তাহার পরিচয় শিলাপাত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই বা কি। রক্ত বীজের বংশের শেষ কোথায়? সে যে দুর্জ্জয়ের নাগর তরঙ্গ! উচ্ছ্বাসে সহস্র বার উদ্বেলন করিয়া যাইয়া আসে, বেলাভূমি ভাসাইয়া যেন আবার মুহূর্ত্তমধ্যে স্থানে ফিরিয়া যায়, হিন্দু তখনই আবার সংগঠনে প্রবৃত্ত হয়। সোমনাথের বিচিত্র ইতিহাসে ইহাও লিখিত আছে যে, অষ্ট শতাব্দী পরে মুজফর খান নামক এক বন্ধু পুনরায় মন্দির চূর্ণ করিয়া মজবুতে রূপান্তরিত করে। ইহার পরেও দুইবার সোমনাথ আক্রান্ত হয় এবং শেষবারে ইশ্বোরের রাণী অহল্যা বাই সমুদ্রোপকূল হইতে ঈষৎ দূরে সোমনাথ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু মজবুতের ধ্বংস ও নির্বাণ হয় নাই; আহমদ শা ও দ্বিতীয় মুজফর খান পুনরায় আশা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। ঔরংজীব তাহার সাম্রাজ্যকালে উত্তর ও মধ্য ভারত কলুষিত করিয়া সোমনাথের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, গল্পচ্ছলে এইটুকুই শুধু শুনা যায়। একদিকে মারাঠা শিবাজী ও অন্যদিকে রাজসিংহের উদ্ভব হইয়া ঔরংজীবের জীবন বিষময় না করিলে সোমনাথ আজ তাহার হাতের কারুকার্য্যও হিন্দু দেখিতে পাইত। জীবনের সন্ধ্যাকালে বাকিপাত্যে বসবাস করিয়াও সে যে পরম পুণ্যকার্য্যে বিরত হইয়াছিল, বোধ করি গলিত নখ দন্ত বল ও শক্তি সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই ইহকাল হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হয় বলিয়াই তাহার পক্ষাঘাত হায় হায় ধ্বনি ধরিত্রীর বিস্তৃত বক্ষে শুন্য হইয়াছিল।

ইহার পরের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। অজ্ঞাত হওয়াই কথা। সবের সংস্কার হয়, ইতিহাসের হয় না। হিন্দুর ইতিহাসও ছিল না। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল। আমিরা ভারত আশা বিধাতার কি ইচ্ছা, অষ্টাদশ মাসে জুনাগড়ের নবাবের পাকিস্তানী দুর্মতি হইল এবং গণ বিদ্রোহে বিপথীত নবাব পলায়ন পরায়ণ লাঞ্ছুল সম্বল করিয়া পলায়ন করিতেই সোমনাথ স্বপ্রকাশ হইলেন। ধ্বংসস্তূপ, শিলাসমষ্টি, তথাপি সোমনাথ। হিন্দুর গৌরবের সোমনাথ, আবার, হিন্দুর লজ্জার সোমনাথ। পরাধীনতার গ্লানি মলিন সোমনাথ, আবার, স্বাধীনতার তরুণ অরুণালোকের উচ্ছ্বাস সোমনাথ।

সর্দ্দার প্যাটেলের এই বোধ; তিনি সোমনাথ সংস্কারে অবোধিকেল করিয়াছেন। সর্দ্দারজীকে যাঁহারা জানেন (আমাদের আমি জানি) তাঁহারা জানেন, একমাত্র তাঁহাকেই কর্ণধার ও পুরুষসিংহ আখ্যায় আখ্যাত করা যায়; যে কাজে তিনি হাত দিয়াছেন, সে কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে না। মাসখানেক পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া একদিনে নিঃশেষে অর্দ্ধ কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন তাহাও আমি জানি; তিনি হাত দিলে সোমনাথ, তাহার পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে না, তাহাও মানি; তবু দুঃখ হয়, তবু সন্দেহ জাগে—যেন মনে হয়, সেই ভূবিশাল, সেই ভূমহান, সেই মহামহিমান্বিত সোমনাথকে তাঁহার সমাজন মহিমায় পাথর গরিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হিন্দুস্থানের হিন্দুসমাজকেই আহ্বান না দেওয়ায় সংগঠনের বিপুল আনন্দ হইতে হিন্দুকে, বঞ্চিত

করা হইয়াছে। সর্বাধিনায়ক যা জানিবার কথা নহে, নানা কারণে ভারতবাসী স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদ করিতে পারে নাই, এখনও পারিতেছে না। আজ হরিষে বিষাদ। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধুর আর্তনাদ আনন্দ বিরানন্দ করিয়া দিয়াছে; পূর্ব পাকিস্তান জীবন-দুঃস্বপ্নের মত হিন্দুকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয়ে কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদ ভারতাকাশ ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্বাধীনতার আনন্দ সম্ভোগ কিরূপে করিবে?

এই বিগত বেলা দ্বিপ্রহরে মাথে-সোমনাথ স্বর্ণ-বীপের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অতীতের বৈভব, অতীতের আভা, অতীতের গ্লানি নিঃশেষে দূর হইয়া হিন্দু সেই আলোক-ছটার পানে চাহিয়া নব জীবনের, নবাকাঙ্ক্ষারঞ্জিত নবীন দিবসের, নূতন প্রাণের এবং নূতন গানের, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। এক সোমনাথের নামে একদিনে, এক মুহূর্তে কাশীর হইতে কন্যাকুমারিকা, আসাম পর্বত হইতে আরব সাগর হিন্দুর নৈতিক বিজয় অভিযান সুরু হইত। হিন্দু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিত, পথে প্রান্তরে গান গাহিত, রঙ্গমঞ্চে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয় করিত, বায়স্কোপে বায়স্কোপে সোমনাথের চিত্র প্রতিবিম্বিত হইত, সোমনাথের জয়ধ্বনিতে নিখিল ভারত প্রতিধ্বনিত হইত। শিবাজীর শৌর্য, রাণা প্রতাপের প্রতাপ, বপ্পারাওয়ের প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব, নেতাজী সুভাষের উন্মাদনা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে এক প্রাণ এক মন করিয়া স্বাধীনতার সার্থক অভিযানে উদ্বুদ্ধ করিত। যে তাপপুণ্যে পুরাকালে হিন্দু সোমনাথের বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল, স্বাধীন হিন্দু যেন্দ্রায় আবার সেই তাপ বরণ করিত। জয় সোমনাথ।

আততায়ীর হস্তে মহাত্মার জীবনান্ত বার্ত্তা শ্রবণে—

ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায় এল-এম-এস

—কি বলিব? আর গান্ধীজী নাই? কে নিল তাঁহারে কাড়ি?
স্নেহেন চলিয়া দিব্যলোকেতে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ি?
অপেক্ষের ভয়ে থাল-বায়ু যেন সহসা ফুরায়ে গিয়া
স্তব্ধ হইল সবার বক্ষ, বেদনা-কাতর হিয়া।
আঁধারে ডুবেছে ভারত-সূর্য সন্ধ্যারবির সাথে?
তাই নিভে গিয়ে নিখিলের আলো আনিল আঁধার রাতে?
সবে জনে জনে মুখ মুখে চাহে, প্রকাশিতে নারে ব্যথা।
নাই মহাত্মা? একি সম্ভব? স্বপন-অতীত কথা।
সত্য? বলিব মানিয়া লইতে নিদারুণ শেলাঘাত?
লক্ষ-মেঘমুক্ত ভারতে অশনির সম্পাত!!
দিবসে হইল চন্দ্র তারকা দীপ্তিবিহীন, ম্লান,
জ্বলে না বৃষ্টি আর কে শুধাবে দুঃখের সন্ধান?
ক্ষমার প্রতীক বিশ্বপ্রেমিক জীব-কল্যাণরত
হিংসা-বিজয়-মন্ত্রের শুধু হিংসার ঘাতে হত!!!
ছিল নির্জীব শৃঙ্খলগত সর্বহারা যে দেশ
কোন্ সন্ধানে এসে ছিল তারে মুক্তির পরিবেশ?
আধার রহিয়া দুঃখ-নিশি শতেক পীড়নস্থিতি
কিসের বোধা যে নিল? যেমন কৃষ্ণ অথবা খ্রীষ্ট!!
রক্তপিপাসু সাম্প্রদায়িক বিরোধ করিয়া নাশ
দুই মহাবলে এক করিবারে যার নোয়াখালিবাস
চিরকাল ধ'রে সোনার আখরে ইতিহাসে র'বে লেখা।
কখনো কাহারো কাছে যার তালে ফোটেনি অন্যের রেখা।
শত্রু মিত্র ছোট বড় আর সাম্প্রদায়িক ভেদ
বিনাশিতে যেই জীবন কাটালো—শুধু এই বড় খেদ—
তাহারে মৃত্যু হাসিল যে জন, জানালো যে মহাশোকে,
ফাঁসিয়া মাথানো ভারতের মুখে জগজ্জনের চোখে।
হে মহামানব! প্রেমের সাধক! বাণী ও সাধনে
স্বাধীনতা দিয়ে ধন্য করেছ; আজ তারি দু-নয়নে
দেশনেতাগণ চাহে কা'র পানে? ছুটে যাবে কার কাছে?
প্রাণবিনিময়ে যা' তুমি দিয়ে তাহাই হারায় পাছে!
বিশ্ব বন্ধু! বিশ্বয় তুমি জগতের বরেণ্যে।
রহিবে অমর হইয়া অর্ঘ্য বাণী ও আদর্শেতে।

মৃত্যুঞ্জয় মহামানব

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

জানি, মৃত্যু জীবনের সাথী
দিনের দীপ্তির মাঝে জেগে রয় রাতি;
জানি, ধ্বংস সৃষ্টির উল্লাস
সৃষ্টি শুধু ধ্বংসের বিলাস,
কিন্তু, বৃথা আজ পায় কলরব।

কে মহামানব,
ভারত মহাবর্ষে হলাহল-মৃত্যু পান করি,
বিশ্বের উদ্বে পাত্রে প্রেমের অমৃতে দিল ভরি,
বিশুষ্ক পৃথ্বীর মাঝে স্নিগ্ধছায়া ক্লান্তির আশ্রয়,
উদ্বেলি সিন্ধুর তটে অচঞ্চল আর্দ্র হিমালয়,
তার মৃত্যু সেও কিগো জীবন-কল্লোল?
নিরুদ্ধ এ পৃথিবীর অশ্রু-কলরোল?

একদিন ক্লান্তিঘন-স্নেহমুক্ত অন্তরের বাণী
শ্রান্তিহরা মন্ত্র দিয়ে প্রেমমুগ্ধ করেছিল জানি,
দেশের প্রান্তীয় অগ্নি তেমনি কি তোমার ক্ষরণ,
উদ্বেলিয়া সিন্ধুজল পরিম্লানি দূর দিগন্তর,
প্রেমের বন্যার স্রোতে ধোয়াইয়া রক্তাক্ত ধরণী,
দানবীয় মানবের শুষ্ক বুকে উঠাইবে ধ্বনি,
শাশ্বত সত্যের,
অখণ্ড প্রেমের?
এক সূর্য নিভিয়া কি পুনে পুনে জ্বালাইবে আলো?
অমানুষ মানুষেরা বাসিবে কি ভালো?

যমুনার বালুতটে আজিকার এই হাহাকার,
ক্ষুব্ধাসের লক্ষ্যাসুর পৃথিবীর মুক্ত অন্ধকার;
মৃত্যু মাঝে দিল বুঝি জীবনের জয়।
সেবাব্রতী জীবনের এই কি সঞ্চয়?
মহামানবের সৃষ্টি বুঝি ধ্বংসের বিলাস—
উল্কাবহ্নি উদ্ভাসিত আঁধার আকাশ।

নব জয়ধ্বনি *

(জাতীয় সঙ্গীত—সমুখের ছন্দ)

কথা ও সুর :—শ্রীদিলীপকুমার রায়

স্বরলিপি :—শ্রীমতী সাহানা দেবী

ভারত-রাত্রি প্রভাতিল, যাত্রী ! অরুণশঙ্খ ঐ বাজিল রে !
প্রতি গৃহে স্বপন হ'ল আলা···
হ'ল গাঁথা গৌরব-মালা···
নব আশা-সৌরভ-ঢালা···
ভরি পুলকে নাচিল রে !
ঐ গগনে যৌবন-সূর্য
জয় সঘনে মন্ত্রিল তূর্য···
নব নারী সাজিল রে !
(একতানে)
প্রতি প্রাণে করুণ আলো···
শিব গানে অশিব মিলালো···

চল' আগে···চল' আগে···
নব জাতির জীবন জাগে
নব প্রেমে মাতিল রে !
মিথ্যা শঙ্কা অনর্থ দলি'—বহ্নি' সত্য শুভতর ধ্যানমণি
প্রতি অন্তর ফলিবে নিত্য···
চিরসুন্দর-বন্দন-স্নিগ্ধ···
নব-যুগধ্বনি-মাভৈঃ-দীপ্ত···
মৃত্যুঞ্জয় ঘন ধ্বনি' !
নব কাল অনাগত জানি—
জপি' বরদা বিজয়া বাণী
রচিবে নব জয়ধ্বনি !
(একতানে)
প্রতি প্রাণে·····ইত্যাদি

II II
সা -া সা সা | মা -া মা মা | পা -া পা পা | র্সা ধা ধা মা |
ভা - র ত রা - ত্রি প্র ভা - তি ল যা - ত্রী -
দি - ব্যা শ - ঙ্খ অ ব - র্ণ ঐ লি ব ধি

মা ধা পা মা | রা রা ঋণা -া | ধা ণধা পা মগা | মা -া (-া -া) | মা পা |
অ রু ণ শ - ঙ্খ ঐ - বা - জি ল রে - - - | প্র তি
স - ত্য শু ভ - ক র্ম ধ্যা - ন ম ণি - - - | প্র তি

ধা ধা -া ধা | ধা ধা ণা ধা | ধা পা পা -া | -া -া পা ধা |
গৃ হে - স্ব প ন হ' ল আ - লা - - - হ' ল
অ - ন্ত র ফ লি বে - নি - ত্য - - চি র

পা -া পা -া | পা -া র্সা র্সা | ধা -া ধা -া | -া -া র্সা র্সা |
গা - থা - গৌ - র ব মা - লা - - - ন ব
সু - ন্দ র ব - ন্দ ন স্নি - গ্ধ - - - ন ব

---

* ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৮ স্বাধীনতা দিবসে শ্রীদিলীপকুমার রায় কর্তৃক সমবেতভাবে গীত।

র্সা ধা ধা মা | র্সা -া ধা মা | সা -া সা -া | -া -া সা সা |
আ - শা - লো - য় ভ রা - ণা - - - ছ দি
যু গ ছ বি মা - ভৈঃ - ধী - প্র - - - মৃ -

গা গা পা -া | পণা ধণা পা মগা | মা -া -া -া | -া -া জ্ঞা রা |
পু ল কে - না - চি ল রে - - - - - ঐ -
ছ্যা - ল য় ম ন ত্র ম নি - - - - - ন ব

মা মা মা -া | মা -া গা মা | পপা -া পা -া | -া -া পা পা |
গ গ নে - যৌ - ব ন হ - র্ষ - - - জ য়
কা - ল অ না ন ন্ত আ - নি - - - জ পি

ণদা দা দা -া | দা -া ণা র্সা | র্সপা -া পা -া | -া -া দা পা |
স ব নে - ম ন্ ত্রি ণ তু - র্ - - - ন য়
ব য় ধা - বি জ য়া - বা - ণী - - - য় চি

মা -া গা মা | ণদা -া দপা মা | গা -া -া -া | -া -া র্সা র্সা |
বা - ণী - সা - জি ল রে - - - - - প্র তি
বে - ন ব জ য় - ধ্ব নি - - - - প্র তি

র্সা -া র্সা -া | র্সা -া মা মা | পপা পা পা -া | -া -া র্সা র্সা |
প্রা - ণে - ম - ক্ল ণ আ - লো - - - শি ব
প্রা - ণে - ম - ক্ল ণ আ - লো - - - শি ব

র্সা -া র্সা -া | র্সা মা মা মা | পপা পা পা -া | -া -া সা সা |
গা - নে - অ শি ব মি লা - লো - - - চ ল
গা - নে - অ শি ব মি লা - লো - - - চ ল

সা মা মা -া | -া -া পা পা | পা ধা ধা -া | -া -া ধা ধপা |
আ - গে - - - চ ল আ - গে - - - ন ব
আ - গে - - চ ল আ - গে - - - ন ব

ণধা -া ধা ধা | পা -া র্সা র্রা | র্সপা -া পা -া | -া -া র্রা র্রা |
জা - তি য় জী - ব ন আ - গে - - - ন ব
জা - তি য় জী - ব ন আ - গে - - ন ব

র্সা -া ধা -া | পা ধপা পা মগা | মা -া -া -া | -া -া -া -া | II II
প্রে - মে - রা - ভি ল রে - - - - - - - -
প্রে - মে - রা - ভি ল রে - - - - - - - -

রাজধানীর বুকে মহামানবের সাধনা

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

এক গভীর বেদনাময় ও হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া, আমাদের এই নব মহা-ভারতের যিনি স্রষ্টা, আমাদের এই জাতির যিনি জনক, যিনি আমাদের পথপ্রদর্শক মহাগুরু, বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সেই মহাত্মা গান্ধীকে মাত্র অল্প কয়েকদিন হইল, আমরা হারাইয়াছি। পিতৃ-বিয়োগজনিত জাতির ত্রয়োদশ দিবসব্যাপী জাতীয় অশৌচ এখনও কাটে নাই। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের বুকে তাই শোকের এক গভীর কালো ছায়া আজ ঘনাইয়া রহিয়াছে। ভগবান তাঁহার সৃষ্টি রহস্যের অন্যতম রহস্য শোকে মানুষকে সহনশক্তি দিয়াছেন, ভারত তাহার এই শোক কবে গিয়া যে সহ্য করিতে পারিবে তাহা জানি না।

চিত্ত আজ ব্যথাতুর, কণ্ঠ শোকরুদ্ধ, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। বাপু তাঁহারই সৃষ্ট এই স্বাধীন ভারতের রাজধানীর বুকে মানবতার আবেদন লইয়া যে শেষ শান্তি-অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন এবং আমাদেরই পাপের জন্য তিনি তাঁহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গেলেন, অত্যন্ত বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে এখানে তাঁহারই দুএকটী কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

আমরা শুনিয়া আসিতেছি, কবে এক অনাদি কালে, কোন সে পৌরাণিক যুগে, দেব ও অসুরের সমুদ্র মন্থনের ফলে যে হলাহল উত্থিত হইয়াছিল, দেবাধিদেব মহাদেব তাহা পান করিয়া পৃথিবীকে নাকি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতীতের সেই সমুদ্র মন্থনের হলাহলের ন্যায় আমাদের দিনে এই ভারতের একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম ঘোষণা করিবার ফলে, ভারত মথিত করিয়া দিকে দিকে যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির হলাহল উথলিয়া উঠিল, এ যুগের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তাহা পান করিয়া ভারতকে বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন এবং ভারতের সাম্প্রদায়িক হানাহানির সেই গরল তিনি আকণ্ঠ পান করিলেন। দেবাধিদেব মহাদেব ছিলেন—মৃত্যুঞ্জয়ী দেবতা—তিনি অমর। তাই সমুদ্র মন্থনের হলাহল কণ্ঠে ধারণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। এ যুগের যিনি মহামানব, তিনি ছিলেন কিন্তু এই নশ্বরজগতেরই একজন। তাই তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিষ পান করিয়া মৃত্যুকে এড়াইতে পারিলেন না, শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দান করিলেন।

দ্বিধা-বিভক্ত ভারতের দিকে দিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানির যে ধ্বংসাত্মক হলাহল উথলিয়া উঠিল, নীলকণ্ঠের ন্যায় সেই হলাহল পান করিবার জন্য মানবতার সাধক আশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ মহাত্মা গান্ধী দেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সকল দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের জীবনকে সমূহ বিপদের সম্মুখীন করিয়া, সকল নিন্দা ও তিরস্কারের ঊর্ধ্বে থাকিয়া শান্তি ও মৈত্রীর বাণী লইয়া তিনি অবিরাম পথে চলিলেন। নোয়াখালি, বিহার ও কলিকাতায় উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক-পাগলরা যে বিষ পরিবেশন করিল, তিনি তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া সেই ক্ষুব্ধ উন্মত্তদিগের বিষদন্ত বিনষ্ট করিলেন এবং তাহাদের জন্য মিলন-অমৃতের সন্ধান আনিয়া দিলেন প্রেমের মন্ত্র দীক্ষা দিয়া। নোয়াখালি, বিহার ও কলিকাতায় যে প্রলয়ঙ্করী ঝড় উঠিয়াছিল, সেই সকল স্থানে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিযানের ফলে, তাহা সম্পূর্ণরূপে শান্ত আকার ধারণ করিল। কিন্তু ঐ সকল স্থানের প্রলয় উন্মাদনা শান্ত হইলেও ভারতের পশ্চিম গগনে পাঞ্জাবের উপর দিয়া সাম্প্রদায়িকতার আবার এক অতি রুদ্র কালবৈশাখী বহিয়া গেল।

১৪ই আগষ্ট মধ্য রাত্রিতে যখন এক পরম শুভ মুহূর্তে বিভক্ত ভারত বিপুল উৎসব আয়োজনসহকারে নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লইতেছিল, যখন রাত্রির গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হইয়া আলোকচ্ছটায় সমগ্র ভারত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল এবং সহর ও পল্লীর ঘরে ঘরে লোকের আনন্দ উল্লাসের সহিত শুভ শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি মিলিত হইয়া ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেছিল, সেই সময়ে একটিমাত্র প্রদেশ শুধু এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে পারিল না। তাই বলিয়া সেদিন ঐ গভীর রজনীতে সেখানে অন্ধকারও ছিল না বা ঘর লোকে নীরবও হইয়াও ছিল না। সেখানে আলোও জ্বলিয়াছিল এবং লোকের কণ্ঠধ্বনিও উঠিয়াছিল। তবে সে আলো দুর্বৃত্তদলের হাতে থাকিয়া প্রলয়ঙ্করী অগ্নিরূপে এক গৃহ হইতে অপর গৃহে ছুটিয়া লোকের কত শত পুরুষের প্রিয় বাসভূমিকে পোড়াইয়া শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। আর মানুষের যে আকুল কণ্ঠধ্বনি শোনা গিয়াছিল, প্রাণভিক্ষায় সে আর্তকণ্ঠ পাষাণকে গলাইতে সক্ষম হইলেও সেদিনের সে দুর্বৃত্তদিগের মনকে আদৌ দ্রবীভূত করিতে পারে নাই।

১৪ই আগষ্ট তারিখের মধ্য রাত্রি পর্যন্ত পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসনের যে ১৩ ধারার বাঁধন ছিল, যে মুহূর্তে তাহা টুটিয়া গেল, অমনি বিভক্ত পাঞ্জাবের উভয় অংশেই বাধামুক্ত, রুদ্ধ প্রতিশোধপরায়ণ উন্মত্ত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জনগণ উদ্বেলিত মহাসমুদ্রের প্রলয়োচ্ছ্বাসের মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে নির্বিচারে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যে আক্রমণের পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই, কোন সমর্থন নাই, কোন দায়-বিবেচনা নাই—শুধু এক সম্প্রদায়ের লোকে অপর সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত হইয়াছে এইমাত্র ক্ষীণ অজুহাতেই এই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সুরু হইয়া গেল। একদিকে প্রতিশোধপরায়ণ ক্ষিপ্ত জনগণ, অপরদিকে বিভক্ত পাঞ্জাবের উভয় অংশেই সদ্যজাত সরকারদ্বয়। এই নবজাত সরকারদ্বয় নিজ নিজ

অবস্থা বুঝিয়া লইতে না লইতেই একপ্রকার স্বাধীনভাবেই উভয় অংশেই দুইদিন ধরিয়া হত্যাকাণ্ড চলিল।

এই বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া, অবশেষে ভারত ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আগাইয়া আসিলেন। ১৭ই আগষ্ট প্রাতে পাকিস্থানের অন্তর্গত আম্বালা সহরে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন বসিল। ইহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ভারতের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং ও সেনাবিভাগের সহকারী সর্বাধিনায়ক; কয়েকজন সহকর্মীসহ পাকিস্থানের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্ণরদ্বয় ও তাঁহাদের মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চতম অফিসারগণ সম্মেলনে উপস্থিত থাকিলেন। সম্মেলনে স্থির হইল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের উভয় অংশেই হানাহানি, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য অপরাধ দমন করিবার জন্য উভয় গবর্ণমেণ্টই অপক্ষপাত হইয়া কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং পাঞ্জাবের উভয় গবর্ণমেণ্ট ও উভয় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট পরস্পরের ও বাস্তুত্যাগীদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

ইহার পর হইতেই আরম্ভ হইল পরস্পরের ও বাস্তুত্যাগীদের এক বিরাট অভিযান। সে যে কি, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। পাঞ্জাবের উভয় অংশ হইতেই লক্ষ লক্ষ লোক সর্বস্বত্যাগ করিয়া শুধু প্রাণ লইয়া পদব্রজে, ট্রেণে, বিমানে, মোটরে প্রভৃতিতে করিয়া বিরুদ্ধদেশের পথে যাত্রা করিল।

ঠিক এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় সর্বব্যাপী হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামার এক চূড়ান্ত সমাধান করিবার জন্য ধ্যানে আত্মমগ্ন ছিলেন। দুর্গত পাঞ্জাব হইতে আবার তাঁহার ডাক আসিল। তিনি পাঞ্জাবের এই নিদারুণ সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়িলেন এবং কলিকাতার কাজ সমাধা করিয়াই পাঞ্জাব যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে যে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী বিনিময় হইয়া গেল, সেই সকল বাস্তুত্যাগী সর্বহারার দল নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া আবার প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া উঠিল। ভারত হইতে যে সকল মুসলমান পাকিস্থানে চলিয়া গেল, তাহারা সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অমুসলমানদের উপর হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি অত্যাচার সুরু করিল। আর পশ্চিম পাঞ্জাবের বাস্তুত্যাগী, দিল্লীতে আশ্রয়প্রার্থী হিন্দু ও শিখগণ মিলিত হইয়া দিল্লীর মুসলমান নিধনে উদ্যত হইয়া উঠিল। দিল্লীর অধিবাসীরাও অনেকেই এই নিধনযজ্ঞে যোগদান করিল। ফলে কয়দিনেই সহস্রাধিক মুসলমান নিহত হইল।

মহাত্মা গান্ধী ঠিক এই সময়টিতে কলিকাতায় হিন্দু মুসলমান মিলনের এক অদ্ভুতপূর্ব যাদু দেখাইয়া পাঞ্জাবের পথে পাড়ি দিয়াছেন। পথে দিল্লীতে অবতরণ করিয়াই তিনি যাহা শুনিলেন ও দেখিলেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। পরদিন ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী সহরের প্রায় ৪০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করিলেন এবং এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে তিনি জানাইলেন—দিল্লীবাসীরা তাহাদের উন্মত্ততা ত্যাগ করিয়া শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনক্রমেই পাঞ্জাব যাইতেছি না। প্রতিশোধ কখনই প্রতিকার নহে। ইহাতে আসল ব্যাধিই আরও দুরারোগ্য হইয়া উঠিবে। যাহারা নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যাপৃত আমি তাহাদিগকে বিরত হইতে একান্ত অনুরোধ করিতেছি। কলিকাতা ত্যাগ করিবার কালে এই শোচনীয় কাণ্ডের কিছুই আমি জানিতাম না। এখানে আসা অবধি আমি কেবলই এখানকার করুণ কাহিনী শুনিতেছি। কয়েকজন মুসলমান বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের মর্মান্তিক কাহিনীর কথা বলিয়াছেন। দিল্লীর অবস্থা শান্ত করিবার জন্য আমি "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" নীতির প্রয়োগ করিব।

এই সময়ে রাজধানী দিল্লী নগরী যেন শ্মশানভূমে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। সহরের সর্বত্রই লাশ্য আইব। পথে যানবাহন ও লোকের নামগন্ধ নাই। লাশ্য আইনের কারণে মহাত্মার প্রার্থনা সভায় অতি অল্পসংখ্যক লোকই ত্রিদিন যোগদান করিল। তিনি তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলিলেন—ভাঙ্গীকলোনীস্থিত আমি যে বাড়ীতে বাস করিতাম সেই গৃহটিতে আশ্রয়প্রার্থীরা বাস করিতেছে। সেই জন্য আমি বিরলা ভবনে আসিয়া উঠিয়াছি। আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা বলিয়া কিছু থাকা, ইহা জাতি হিসাবে আমাদের পক্ষে একটা লজ্জার কথা।

ইহার পর মহাত্মা তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী শিবিরসমূহ পরিদর্শনের কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি আশ্রয়প্রার্থীগণকে সততার সহিত ও নির্ভীকভাবে জীবনযাপন করিতে বলিলেন এবং কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ না করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

ইহার পর হইতেই মহাত্মা গান্ধী প্রায় প্রতিদিনই মুসলিম আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন এবং শিবিরের সহস্র সহস্র দুর্গত মুসলমান নরনারী ও শিশুদের সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন—আমি আপনাদের সাহায্যের জন্যই দিল্লীতে রহিয়াছি এবং এ জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, আপনাদের দুঃখে আমি বেদনা অনুভব করিতেছি। দিল্লীতে যাহাতে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় পুনরায় সম্পূর্ণ শান্তিতে বাস করিতে পারে, আমি তাহার জন্য চেষ্টা করিব। হয় আমি এই কাজে সফলকাম হইব, নতুবা এই কাজ করিতে করিতেই আমি মৃত্যু বরণ করিব।

মহাত্মা গান্ধী যখন শিবিরগুলি পরিদর্শন করিতে থাকেন তখন সেখানের মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীরা সাশ্রু নয়নে করজোড়ে মহাত্মাকেই তাহাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা বলিয়া জানাইতে লাগিল। তাহারা তাঁহার নিকটে তাহাদের দুঃখের কাহিনী ও অভাব অভিযোগের কথা বলিল। তাহারা মহাত্মাকে অন্যত্র দিবার জন্য এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিল। তাহারা আরও বলিল, তাহাদিগকে পাকিস্থানে যাইবার কথা বলা হইতেছে, কিন্তু সেখানে তাহারা ভিক্ষার দ্বারায় জীবিকা অর্জন করিবার জন্য যাইতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। তাহারা হিন্দুদের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া বসবাস করিতে চায়, মহাত্মা যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মহাত্মা গান্ধী মুসলিম আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন কালে দিল্লীর অনুকরণে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলিও পরিদর্শন করিলেন. এই সব শিবিরে পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত হিন্দু ও শিখরা অবস্থান করিতেছিল। তিনি তাহাদিগকেও সান্ত্বনা দিয়া তাহাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার কথা বলেন এবং তাহাদিগকে প্রতিশোধপরায়ণ না হইতে উপদেশ প্রদান করেন।

মহাত্মা গান্ধী একদিকে যেমন প্রায় প্রতিদিনই আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করিয়া দুর্গতদের সান্ত্বনা দিতে থাকিলেন. অপর দিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই তিনি তাঁহার প্রার্থনা সভায় হিন্দু, শিখ ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দু ও শিখদিগকে বিশেষ ভুলিয়া মুসলমানদের আপন ভাবিবার কথা শুনাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, এ কথা সত্য যে পাকিস্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানরাও অনুরূপভাবে অত্যাচারিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রেরই অকপটে দোষ স্বীকার করাই বিপত্তির উপায়। উভয় রাষ্ট্রেরই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কর্তব্য সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা। এতদিন যাহারা ভ্রাতৃভাবে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিল এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে যাহাদের রক্ত একত্র প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারা কিরূপে যে পরস্পর শত্রুতে পরিণত হইতে পারে তাহা ভাবিতেও কষ্ট বোধ হয়। হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীরা পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে যে ভাবে দলে দলে পূর্ব পাঞ্জাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিহ্বল হইতে হয়। জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

অধিবাসী বিনিময়ের কথা উত্থাপন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—লক্ষ-লক্ষ হিন্দু, মুসলমান ও শিখ স্থানান্তরিত করা—ইহা চিন্তা করাও যায় না। এরূপ স্থানান্তরিত করা এক অন্যায় নির্দেশ।

মহাত্মা গান্ধী হিন্দু ও শিখদের উদ্দেশ করিয়া বলিতে থাকিলেন—পাকিস্থান হইতে অমুসলমানদের বিতাড়িত করা হইতেছে বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানদের বিতাড়ন করা ঠিক হইবে না। পাকিস্থান ভুল পথ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, ভারতবর্ষ কেন সে ভুল কাজ করিবে। তবে পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের উপর যে অন্যায় কাজ চলিতেছে তাহা উপেক্ষা করিবার কথা আমি ভারতগবর্ণমেণ্টকে বলি নাই। সেখানকার হিন্দু ও শিখদের যথাসাধ্য রক্ষা করিতে ভারতসরকার বাধ্য। কিন্তু পাকিস্থানের পথ অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান বিতাড়ন ঠিক নহে। তবে যে সকল মুসলমান এখানে থাকিতে চাহে না, তাহাদিগকে নিরাপদে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া কর্তব্য।

আজ শুনিতেছি ভারতে মুসলমানদের রাখা হইবে না, আজ যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই ধ্বনি উঠিয়াছে, কাল পার্শী, খৃষ্টান ও ইউরোপীয়দের অবস্থা কি হইবে? অনেক বন্ধু আমায় ১২৫ বৎসর বাঁচিবার আশা রাখেন, কিন্তু ভারতের এই দ্বেষ ও হানাহানি দেখিয়া আমার আর একমুহূর্তও বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।

তিনি হিন্দু ও শিখদিগকে ন্যায়পথে থাকিবার উপদেশ দিয়া বলিতে থাকিলেন—হিন্দু ও শিখরা যদি ন্যায়সুযোদিত পথে দুষ্কৃতকারী মুসলমানদের পুনরায় স্বগৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান জানায়, তাহা হইলে তাহারা শুধু পাকিস্থানের নয়, সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করিবে। তিনি আরও বলিলেন—ন্যায়পথে থাকিয়া সমগ্র হিন্দুও যদি ধ্বংস হইয়া যায় তাহাতেও কিছু মনে করিবার নাই। প্রতিশোধ না লইয়া মানুষের কর্তব্য ভগবানের হাতে দুষ্কৃতকে ছাড়িয়া দেওয়া, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় আমার জানা নাই।

মহাত্মা তাঁহার প্রার্থনা সভায় মুসলমান শ্রোতাদের ভয় ত্যাগ করিয়া ভগবানের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

একদিকে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনা সভায় দিনের পর দিন হিন্দু, মুসলমান ও শিখ এই তিন সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য যেমন আবেদন জানাইতে লাগিলেন, অপর দিকে তেমনি শীত আসিয়া পড়ায় পাকিস্থান হইতে আগত অমুসলমান এবং দিল্লীর দুর্গত মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কম্বল চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই আবেদনে দেশের চারিদিক হইতেই দিল্লীতে কম্বল আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই কম্বল পাঠাইলেন এবং কেহ কেহ কম্বল কিনিবার জন্য মহাত্মার নিকটে টাকাও প্রেরণ করিলেন।

১৫ই অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনা সভায় কম্বলের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন—আমি কম্বল এবং কম্বল কিনিবার জন্য টাকা খুবই পাইতেছি। এক ভগিনী কম্বল কিনিবার জন্য দুই হাজার টাকার একটি চেক পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুইজন মুসলমান বন্ধুও কিছু কম্বল এবং আরও কম্বল কিনিবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাঁহারা নিজেরাই যেন দুর্গতদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দেন। উত্তরে তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করিয়া জানাইয়াছেন, আমি যেন ঐগুলি হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করি। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন এক সময়ে তাঁহারা আমার মধ্যে অন্যায় দেখিতে পাইতেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমি সকলেরই মিত্র, কাহারও শত্রু নই।

ইহার পর মহাত্মাজী বলিলেন—একথা ঠিক যে, হাজারে অনেক মুসলমান বুদ্ধি বিবেচনা হারাইয়া ফেলে, তেমনি বহু হিন্দু-শিখও বুদ্ধি বিবেচনা হারাইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কতক লোকের দোষে, তাহারা সংখ্যায় যত অধিকই হউক না কেন, সকলকে দোষী বলা যায় না। বহু হিন্দু ও শিখ বলিয়াছেন যে, বহুসংখ্যক মুসলমান বন্ধুদের সাহায্যে তাঁহাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। ঠিক এমনি অনেক মুসলমানও বলিয়াছেন, হিন্দু ও শিখ বন্ধুদের সাহায্যে তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছেন। সকল স্থানেই এরূপ সৎপ্রকৃতির হিন্দু, মুসলমান ও শিখ যথেষ্ট রহিয়াছেন।

এই সময়ে ভারতগবর্ণমেণ্টও দিল্লীর শান্তি পুনঃ স্থাপনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রায় প্রতিদিনই মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদ্রব দমনের জন্য উপদেশ লইতে লাগিলেন।

এই ভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তায় ও মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের ফলে দিল্লীর অবস্থা কয়েক দিনেই সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া আসিল এবং কোথাও আর কোনরূপ উপদ্রব দেখা দিল না। কিন্তু এই শান্ত অবস্থার মধ্যেই ১৯শে অক্টোবর একজন মুসলমান হেল্‌থ অফিসার কর্তব্য-কর্মে রত থাকাকালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত গিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। স্বাস্থ্য-সচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর ঐ দিন রাত্রেই মহাত্মাকে এই সংবাদ দিলেন এবং তিনি আরও জানাইলেন যে, উক্ত মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা এমনি কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারাও বলিতেছে তাহাদিগকেও হত্যা করা হউক। পরদিন মহাত্মার সাপ্তাহিক মৌন দিবস থাকায় তিনি এক লিখিত অভিভাষণে প্রার্থনা সভায় এই হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—বাহ্যতঃ দিল্লীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে দেখা যাইলেও প্রকৃতপক্ষে অবস্থার উন্নতি হয় নাই। যতদিন না এইরূপ লোমহর্ষণ ঘটনা বন্ধ হইবে, ততদিন পর্যন্ত দিল্লীতে প্রকৃত শান্তি আসিয়াছে বলা যাইবে না। কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির দেহকর্তা সম্পাদন করিবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান পাওয়া যাইতেছে না শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিতেছি। সংখ্যালঘুরা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, তাহাদের ভীতিপ্রবণ সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে ঔদ্ধত্যেরই লক্ষণ।

এই ভাবে মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের ফলে দিল্লীর অবস্থা ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল। দিল্লীর দুর্গত মুসলমানরা—যাহারা হিন্দু ও শিখদের অত্যাচারের ভয়ে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদেরও কেহ কেহ ক্রমে তাহাদের পূর্ব বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

দিল্লীর উপরে এই শান্ত ভাব দেখা দিলেও সত্যদর্শী মহাত্মা কিন্তু দেখিতে পাইলেন, ভিতরে ভিতরে গোলমাল ঠিক রহিয়াই গিয়াছে। যে কোনও দিন উহা আবার আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। লোকের ঠিক নৈতিক পরিবর্তন ঘটে নাই।

তাই তিনি অনন্যোপায় হইয়া হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত মিলন আনিবার জন্য ১৩ই জানুয়ারী বেলা ১১টার অল্প পরে সত্যাগ্রহীর শেষ অস্ত্র অনশন আরম্ভ করিলেন এবং এ সম্পর্কে জানাইলেন—যখন বুঝিব যে বাহিরের চাপ ব্যতীতই কর্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত হইয়া দিল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তরের মিলন হইয়াছে, তখনই আমি অনশন ত্যাগ করিব।

মহাত্মা দিল্লীর সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিবার জন্য অনশন করিলেন, দিল্লী সরকার সহিত সমগ্র ভারত সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হইয়া উঠিল। দেশের নেতৃবৃন্দও জনসাধারণ হিন্দু, শিখ ও মুসলমানের প্রকৃত মিলনের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত নেহরু দিল্লীর মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহাদের পূর্ব বাসস্থানে নিরাপদে রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ সহজতর করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট, অন্যায়ভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করার জন্য পাকিস্থানের প্রাপ্য যে ৫৫ কোটি টাকা আটকাইয়া রাখিয়াছিল তাহাও পাকিস্থানকে দিয়া দিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে মহাত্মার ব্রত যাহাতে সাফল্য লাভ করে এবং তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবার পূর্বেই যাহাতে তিনি অনশন ভঙ্গ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ভারতের সর্বত্রই মন্দিরে, গীর্জায়, গুরুদ্বারে—প্রভৃতি সর্বস্থানে প্রার্থনার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীবর্গ যেরূপ মহাত্মা গান্ধীকে শান্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন, দিল্লীর শান্তি কমিটিও মহাত্মার নিকটে এক লিখিত প্রতিশ্রুতিতে জানাইল যে—আমরা মুসলমানের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্ম-বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলিব এবং দিল্লীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আর কখনও ঘটিতে দিব না।

দিল্লীর ২ লক্ষ নাগরিকও একটি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া জানাইল যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে তাঁহারা দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ়বদ্ধ থাকিবে।

এই সকল প্রতিশ্রুতি পাইয়া মহাত্মা ১৮ই জানুয়ারী বেলা ১২-৪০ মিনিটের সময় অনশন ত্যাগ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী অনশনমুক্ত করিলেন। ভারত তথা সমগ্র বিশ্ব শান্তি ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

মহাত্মা গান্ধী যে সময়ে দিল্লীর মুসলমানদের রক্ষা করিবার জন্য এবং অমুসলমানদের হৃদয়ের পরিবর্তন আনিবার জন্য আমরণ অনশন গ্রহণ করিয়া নিজে দ্রুতপদে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে পাঞ্জাবের শুদ্ধরাটে একটি মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীবাহী ট্রেণকে আক্রমণ করিয়া মুসলমানরা একসঙ্গে দুই সহস্র লোককে হত্যা করিল! ইহাতে স্বভাবতই ভারতের একশ্রেণীর অমুসলমান জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীর উপরে বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারা পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখদের নির্যাতনের কথা উল্লেখ করিয়া এবং এ সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তার কথা বলিয়া মহাত্মার এই অনশনকে পক্ষপাত-মূলক ও অহেতুক মুসলিমপ্রীতি বা তোষামোদ বলিয়া অভিহিত করিল। শুধু এই খানেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিল না। মহাত্মার অনশন ভঙ্গের ২ দিন পরে পশ্চিম পাঞ্জাবের একজন সর্দারজী দিল্লীতে মহাত্মার শান্তি অভিযানে কাওজ্ঞান হারাইয়া, মহাত্মার প্রার্থনা সভায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি দেশী শুতবোমা ছুড়িতেও ছাড়িল না। সৌভাগ্যবশতঃ এই ব্যাপারে মহাত্মা অক্ষতই থাকিয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রার্থনা সভায় তাঁহার স্বভাব মত তিনি অবিচলিতই ছিলেন ও বোমা নিক্ষেপকারী দুর্বৃত্তকে পরে ক্ষমা করেন।

মহাত্মার প্রতি এই বোমা নিক্ষেপ ছিল ২০শে জানুয়ারী তারিখের ঘটনা। ইহার পর আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। মহাত্মা প্রতিদিনই হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের মিলন-বন্ধন সুদৃঢ়তর করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। ফলে রাজধানী দিল্লী সহরে তথা ভারতের অন্যান্য স্থানেও সাম্প্রদায়িক মিলনের সুফল দেখা দিল। মহাত্মার দিল্লীর কাজ সমাধা হইয়া গেল, বাকি রহিল পাঞ্জাবের দুর্গত অঞ্চল পরিভ্রমণ। ২০শে জানুয়ারী তারিখে মহাত্মা তাঁহার

প্রার্থনা সভায় বলিলেন—পাকিস্থান একটি ভিন্ন রাষ্ট্র, সুতরাং পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইলেই আমি পাকিস্থানের দুর্গত অঞ্চলে যাইব। যতদিন না এই অনুমতি পাইতেছি, ততদিনের জন্য দিল্লীবাসীদের সম্মতি থাকিলে আমি ওয়ার্ধায় যাইতে ইচ্ছা করি।

দিল্লীর কাজ শেষ হওয়ায় মহাত্মা ওয়ার্ধায় যাইবেন প্রায় ঠিক; কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। ৩০শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে এক দুরপনেয় কলঙ্কময় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। অপরাহ্ণ ৫-৩ মিনিটের সময় মহাত্মা বিরলা ভবন হইতে তাঁহার প্রার্থনা সভায় যাইবার কালে, এক নর-কলঙ্ক দুর্বৃত্তের হাতে গুলিবিদ্ধ হইলেন এবং এই গুলিবিদ্ধ হইবার ৩৪ মিনিট পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে মুসলমানদের রক্ষা করিবার জন্য যে আমরণ অনশন করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কয়জন তথাকথিত হিন্দু, হিন্দুদের হয়ে দেখাইয়া মহাত্মার উপরে যোগাযোগ করিয়াছিল, মহাত্মার হত্যাকারী লোকটিও ছিল তাহাদেরই মধ্যেকার একজন চরম পন্থী। প্রতিশোধপরায়ণ দিল্লীবাসী অমুসলমানদের মুসলমান নিধনে বাধা দেওয়ার জন্য, তাহাদের প্রতিশোধ গিয়া পৌঁছিল শেষে মহাত্মার উপরে। মানবতার সাধক মহামানব মহাত্মা গান্ধী সহাস্যে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য নিজের বুক পাতিয়া দিলেন।

এই শ্রেণীর প্রতিশোধপরায়ণ জনগণের কর্ণকুহরে মহাত্মা গান্ধী বারবারই এই কথা শুনাইয়া আসিয়াছেন যে—প্রতিশোধ গ্রহণ কখনই আসল প্রতিকার নহে। তাহাতে ঘরে আসল ব্যাধি আরও জটিল হইয়া পড়িবে। ক্ষমা ও প্রেমের দ্বারাই মূল রোগটিকে দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী যে ক্ষমা ও প্রেমের মর্মকথাকে জীবন দান করিয়া গেলেন, আমাদের এই মহাতাপের আধ্যাত্ম বাণীই হইল তাহাই। ক্ষমা ও প্রেমের দ্বারায় যে আটুট বল, ভারতের ইতিহাস এরূপ বহুতর সাক্ষ্য ভরপুর। তাই আমরা দেখিতে পাই—একদিন শতপুত্রঘাতক মাৎসর্যোজ্জ্বল মহাপরাক্রান্ত রাজা বিশ্বামিত্র, দীন ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের ক্ষমাগুণে গলিয়া পড়িয়াছিল। প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু কলসীর কানা খাইয়াও প্রেম-বিতরণে বিরত হন নাই বলিয়াই সে যুগের দুইটি অতি বড় পাষণ্ডেরও পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল।

বুদ্ধের অহিংসা, যীশুর ক্ষমা ও মহাপ্রভুর প্রেম একটি যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়া যেন মহাত্মারূপে আমাদের এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি নিজের দীর্ঘজীবনের বহুবিধ ঘটনার মধ্য দিয়া সত্য, অহিংসা, ক্ষমা ও প্রেমের প্রয়োগ দেখাইয়া গেলেন। আঘাতের বদলে আঘাত না হানিয়া ক্ষমাও প্রেমের দ্বারাই তাহাকে জয় করিতে হইবে, তবেই এই বাণীর পৃথিবীর বুকে "রামরাজ্য" বা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই হইল মহাত্মার অনুসৃত সত্য ও অহিংসা নীতির মর্মবাণী। হিংসা, দ্বেষ ও রণজর্জরিত পৃথিবীর বুকে মহাত্মার এই বাণী আজই শান্তির এক আশ্চর্য প্রলেপ দিতেছে না, অনাগতকালের বুকেও তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে এবং আফ্রিকার ন্যায় ভাবীযুগের মানুষও এই মহামানবের আত্মিক প্রভাব বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিয়া ধন্য হইবে।

কিন্তু একথা আজিকেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে যে, বাপু আর আমাদের মধ্যে নাই এবং এক অতি শোচনীয় ও কলঙ্কময় দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে আর একটিবার মাত্র এইরূপ এক মহামৃত্যু ঘটিয়াছিল। সেদিন ভগবানের শ্রেষ্ঠপুত্র যীশুও এমনি করিয়াই ক্ষমা ও প্রেমের জন্যই জীবনদান করিয়াছিলেন। তারপর বহু শত বৎসর পরে মহাত্মার এই মৃত্যুর মধ্য দিয়া সেই মহামরণের আর একবার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। যেদিন যাহারা যীশুকে নির্মমভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, জগৎ আজও সেই সম্প্রদায়ের লোককে ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারে নাই। এযুগের বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহাত্মা গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডেও ভারতের হিন্দুসমাজের ললাটে যে কলঙ্কপঙ্কের ছাপ পড়িল, তাহাও কোনদিন মুছিবে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুর মৌরবোজ্জ্বল শুভ্র ললাটের একপার্শ্বে এই কলঙ্কের কাল ছাপ চিরকালের জন্য থাকিয়া গেল।

বাপু, আপনি আমাদের পাপের জন্যই আপনার পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই মহাপাপের জন্য আজ আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করিবারও অযোগ্য। কিন্তু তবুও জানি, আপনি ক্ষমা ও প্রেমের অবতার রূপেই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের বহুবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা-সুন্দর হাসিতে মার্জনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সাহসেই আমরা, আমাদের এই মহাপাপের জন্য আপনার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি—আমাদের ছাড়িয়া আপনি আজ যে দিব্যধামে অবস্থান করিতেছেন, সেখান হইতে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আপনার কল্যাণ আশীষ দিয়া আমাদের অন্তরের সকল গ্লানি মুছিয়া দিন।

গান্ধীজি ও নোয়াখালি—

মহাত্মা গান্ধী নিহত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহকর্ম্মীরা যেন নোয়াখালিতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামসমূহে অহিংসা-নীতির ভিত্তিতে গঠনমূলক কার্য্য পরিচালনা করেন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত পিয়ারীলালের নেতৃত্বে গান্ধীজির একদল সহকর্ম্মী শীঘ্রই নোয়াখালি যাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বহরমপুর গার্লস-কলেজের বার্ষোদ্‌ঘাটন সভায় শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী
ফটো—শ্রীরাধাপ্রসাদ সাহা

পূর্ব্ববঙ্গে আনসার বাহিনী—

পূর্ব্ব-বাঙ্গালা তথা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের চিফ সেক্রেটারী মিঃ আজিজ আহমেদ গত ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা পাকিস্থান ডোমিনিয়ন গার্ড ছাড়াও দেড় লক্ষ লোক লইয়া নূতন এক আনসার (স্বেচ্ছাসেবক) বাহিনী গঠন করিবেন ও তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দিবেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাহাদের কাজে লাগান হইবে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ১৮ হইতে ৪২ বৎসর বয়সের সকল লোক নূতন বাহিনীতে যোগদান করিতে পারিবে।

গুরুতর খাদ্যপরিস্থিতি—

৭ই ফেব্রুয়ারী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করিয়াছেন যে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি গুরুতর হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার ও খাদ্যদ্রব্যের চোরাই কারবার বন্ধ করিবার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বঙ্গের জন্য খাদ্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ভারত গভর্ণমেণ্ট করেন নাই। কি করিয়া খাদ্য সংগৃহীত ও বণ্টিত হইবে, ডাক্তার রায় সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই।

দমদম বিমান ঘাটিতে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ
ফটো—তারক দাস

হিন্দুমহাসভা ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ—

মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী গডসে হিন্দুমহাসভার কর্ম্মী বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর গত ৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন—মহাসভার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে এই অপরাধের নিন্দা করিয়াছেন। হিন্দুমহাসভা কোন দিনই এই ধরণের সন্ত্রাসবাদী পন্থায় বিশ্বাস করে নাই। এখন

হিন্দুমহাসভার সম্মুখে দুইটি পথ আছে—(১) ইহাকে রাজনীতিক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া দিয়া সংস্কৃতিগত কার্য্যকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করা (২) ইহার সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্জ্জন করিয়া নূতন নীতি নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত করা। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বর্ত্তমানে ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য—তিনি পূর্ব্বে কয়েক বৎসর হিন্দু-মহাসভার নিখিল ভারত কমিটীর সভাপতিও ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি নিজের দিক হইতে ও হিন্দুমহাসভার দিক হইতে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করায় দেশবাসী সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সহজ হইবে।

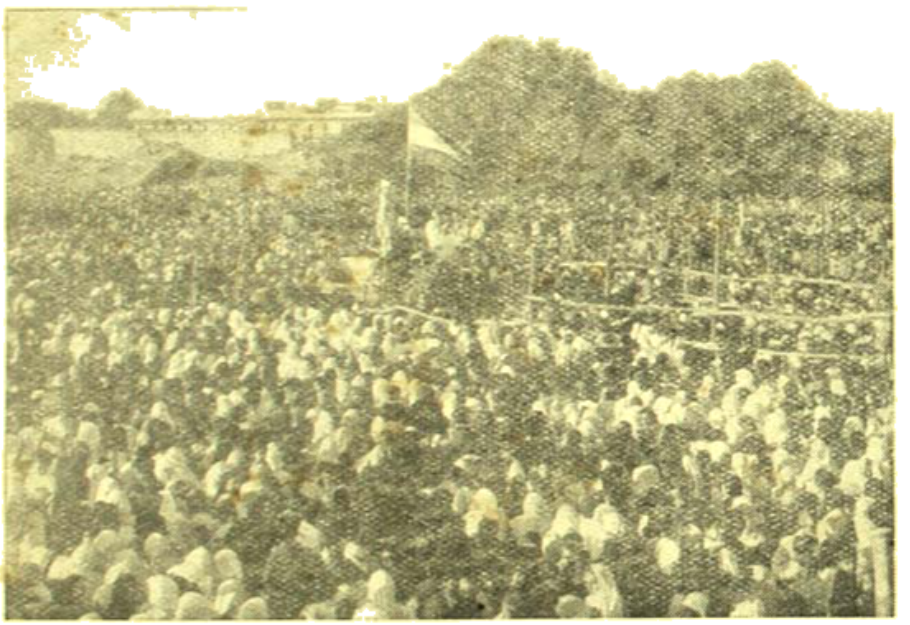

দিল্লীর রামলীলা ময়দানে এক বিরাট জন সভায় বক্তৃতারত পণ্ডিত নেহরু—
শান্তির জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন

পশ্চিম বঙ্গে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বন্ধ—

৭ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করিয়াছেন যে—এই প্রদেশে বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করা হইবে ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের প্রথা বাতিল করা হইবে। পশ্চিম বঙ্গে মজুত ৪৫ হাজার গাঁট কাপড় ব্যবসায়ের সাধারণ গতিপথেই বণ্টন করা হইবে। ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মিলসমূহে যে কাপড় ছিল বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি তাহার মূল্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। সে কাপড়গুলি এখন বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হইবে।

নেতাজী সুভাষ দিবস—

গত ২৩শে জানুয়ারী শুক্রবার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৫২তম জন্মদিবস উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র সাড়ম্বরে সেদিন সুভাষ দিবস পালিত হইয়াছে—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সেদিন ছুটির দিন ঘোষণা করায় বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, এমন কি ঘরে ঘরে লোক নেতাজীর উৎসব পালন করিয়াছে। শুধু সভা-সমিতি করিয়া তাঁহার কথা আলোচিত হয় নাই—সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানে, কারখানায় ও বাড়ীতে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া উপযুক্তভাবে তাঁহাকে সম্মানিত করা হইয়াছে। কলিকাতায়ও সেদিন উৎসবের ধুম-ধামের অভাব ছিল না। নেতাজী আজও জীবিত আছেন কি না জানি না—তবে আজ দেশের লোক তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে। তিনি দেশকে যে নূতন আদর্শের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশবাসী তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে নিজেদের পরিচালিত করিলে দেশকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিতে পারিবে। এই শুভদিন উপলক্ষে আমরা ও নেতাজীকে আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি এবং প্রার্থনা করি, তিনি সত্বর আমাদের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার অসমাপ্ত কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া দেশকে কৃতার্থ করুন।

পরলোকে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী—

বাঙ্গালা দেশের স্বনামখ্যাত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার বিকাল ৫টার সময় তাঁহার কলিকাতার বালীগঞ্জ ৫২এ হিন্দুস্থান পার্কের বাসভবনে ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা

ব্যথিত হইয়াছি। নদীয়া জেলার জামসেরপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ডাফ কলেজ হইতে বি-এ পাস করিয়া কবি বিশ্বপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন—তাহার পর কিছুদিন তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইন্সপেক্টরের কাজও করিয়াছিলেন। তিনি পরে নাটোরের মহারাজা স্বর্গত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও পরে জমীদারীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হন এবং কিছুকাল কয় কোম্পানী ও এক-এন-ওপ্ত কোম্পানীতে কাজ করেন। ৬০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। লেখা, রেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, বন্ধুর দান, জাগরণী,

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে কল্পতরু উৎসবে প্রধান অতিথি পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ফটো—তারক দাস

পথের সাথী, নীহারিকা, কাব্যমালঞ্চ, মহাভারতী, পাঞ্চজন্য প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন মানসী ও অল্পকাল যমুনা পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম ও জনসেবার আগ্রহ তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে।

বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রীসভা—

বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৪ই জানুয়ারী পদত্যাগ করায় ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ২৩শে জানুয়ারী হইতে ১২জন সদস্য লইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে—

(১) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ (২) শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার—অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প (৩) স্যার হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা (৪) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—অসামরিক সরবরাহ বিভাগ (৫) শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা—কৃষি ও পশু চিকিৎসা (৬) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি—সমবায়, দুর্গতত্রাণ ও পুনর্বসতি (৭) শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—পূর্ত্ত ও যানবাহন (৮) শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মণ—কৃষি ও ভূমি রাজস্ব (৯) শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার—বিচার ও আইন (১০) শ্রীভূপতি মজুমদার—সেচ ও জলপথ (১১) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—শ্রম (১২) শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—বন ও মৎস্য।

ইহাদের মধ্যে শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি ও শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার ঘোষের মন্ত্রীসভার সদস্য হইয়াছিলেন—কিন্তু পরে শ্রীযুক্ত রাধানাথ

বহরমপুরে পশ্চিম বাঙ্গলার গভর্ণর ফটো—রাধাপ্রসাদ দাস

দাসের সহিত তাঁহারা ৩জনও পদত্যাগ করেন। শ্রীমোহিনী বর্ম্মণ, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর প্রথম হইতেই মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীভূপতি মজুমদারকে প্রথম ৪ জনের পদত্যাগের পর গ্রহণ করা হইয়াছিল—তিনি তাঁহার কার্য্যের দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ব্যারিষ্টার ও নির্য্যাতীত দেশকর্ম্মী—কাজেই তাঁহার নিয়োগ সকলের সমর্থন লাভ করিবে। প্রধান মন্ত্রী ডক্টর রায় সম্প্রতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র হইতে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ও কংগ্রেস দল তখনই তাঁহাকে ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের স্থানে দলের নেতা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা দেশের মধ্যে

সর্ব্বত্রই বুদ্ধিমান ও কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, কাজেই তিনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করায় দেশবাসী সকলেই আশান্বিত হইয়াছেন। তিনি মনে করিলে ও চেষ্টা করিলে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালা দেশকে সত্বরই আবার সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে পারিবেন। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নহেন, এমন ৩ জনকে তিনি স্বীয় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন—তাঁহারা (১) শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার (২) রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও (৩) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। তন্মধ্যে "প্রফুল্লবাবু" আজীবন কংগ্রেস-সেবক, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে তিনি সারাজীবন গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। তিনি জনপ্রিয় নেতা, কাজেই তাঁহার পক্ষে পরে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হওয়া আদৌ কঠিন হইবে না। শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারও

নেতাজী সুভাষ দিবসে কলিকাতায় রাজপথে নেতাজীর প্রতিমূর্ত্তি বহু বিরাট শোভাযাত্রা ফটো—শঙ্কর সেনগুপ্ত

হয়ত চেষ্টা করিলেই ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন; তাঁহার কর্ম্মশক্তিও অসাধারণ—কিন্তু নানা কারণে তিনি জনপ্রিয় নেতা হইতে পারেন নাই। তৃতীয় রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় শিক্ষিত জমীদার—তিনি বিদ্বান ব্যক্তি হইলেও কখনই জনগণের সহিত মেলামেশার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়াও সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইতিপূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরূপে তিনি ভাল বক্তৃতা করিয়াছেন বটে, কিন্তু জনসাধারণ—যাঁহারা তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত চৌধুরী মহাশয়ের ব্যবহার ভাল ছিল না। তথাপি আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা দেশের উন্নতি বিধানে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করি। প্রধান মন্ত্রীর অসাধারণ ধীশক্তি ও কর্ম্মশক্তি অপর সকলের দোষ ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীকে অবশ্যই জনপ্রিয় করিয়া তুলিবে।

ভারতে মানসিক চিকিৎসার উন্নতি—

গত জানুয়ারী মাসে পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের সঙ্গে ভারতীয় মানসিক চিকিৎসক সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে উক্ত সমিতির সভাপতি ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে ভারতে মানসিক চিকিৎসার উন্নতির জন্য এক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন মানসিক রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই দেশে এই রোগের বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রধান কারণ। তাঁহার মতে মানসিক রোগকে দুরারোগ্য মনে করিবার কোনও বিশেষ কারণ নাই। এই সকল রোগের যে ভাল চিকিৎসা আছে সেই

নেতাজী দিবসে শোভাযাত্রার সঙ্গে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ

ফটো—শঙ্কর সেনগুপ্ত

জ্ঞানের অভাবই মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের হাতে পড়িলে মানসিক ব্যাধিও অন্য যে কোনও ব্যাধির মত আরোগ্য হইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসালয় ও চিকিৎসকের একান্ত অভাব। ভারত সরকার নিয়োজিত "ভোর কমিটির" হিসাব অনুসারে ভারতে মানসিক চিকিৎসার জন্য অন্ততঃ ৮ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা স্থান থাকা প্রয়োজন, কিন্তু আছে মাত্র ১০ হাজার। মানসিক চিকিৎসকদের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। এই অবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য—আরও বেশী করিয়া সরকারী মানসিক চিকিৎসালয় স্থাপন ও বেসরকারী চিকিৎসালয়গুলিকে সাহায্য করা। মানসিক চিকিৎসকের

সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য কলিকাতা ও বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মানসিক চিকিৎসার বিশেষ উপাধি পরীক্ষার পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে। আশা করা যায় তাহা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে। মানসিক রোগীর শুশ্রূষা-কারীদের শিক্ষার ব্যবস্থাও হইতেছে। তিনি বলেন বর্ত্তমানে সরকারী মানসিক হাসপাতালে রোগী ভর্ত্তি করিবার যে প্রথা আছে তাহা জেলে কয়েদী ভর্ত্তি করার মত। পুলিশের বিবরণীসহ আদালতের বা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম-নামা লইয়া ভর্ত্তি হইতে হয়। এই প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। অন্যান্য রোগী ভর্ত্তি করার ব্যবস্থার মত প্রত্যেক বড় হাসপাতালের সঙ্গে অভিজ্ঞ মানসিক চিকিৎসকের হাতে একটি বাহিরের মানসিক রোগী দেখিবার চিকিৎসা কেন্দ্র থাকিবে এবং সেই চিকিৎসক যখনই কোনও রোগীকে মানসিক হাসপাতালে ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত মনে করিবেন তখনই সে ভর্ত্তি হইতে পারিবে—কোন আইন আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমনামার প্রয়োজন হইবে না। এইজন্য আইনের যতটুকু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন তাহার খসড়া তৈয়ার হইতেছে। তিনি এই পরিকল্পনাকে ৫ ভাগে ভাগ করিয়াছেন :— ১। চিকিৎসা ব্যবস্থা—হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্র। ২। মানসিক রোগ নিবারণী ব্যবস্থা—বালক বালিকা, শিশু, পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান্য লোকদিগকে তৎসম্পর্কীয় উপদেশ দান। ৩। শিক্ষা—(ক) চিকিৎসকদের (খ) শুশ্রূষাকারী ও আনুষঙ্গিক কর্ম্মীদের এবং (গ) সাধারণের মধ্যে মানসিক রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার। ৪। পরিচালনা—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগ স্থাপন। ৫। মানসিক চিকিৎসা সম্পর্কে নূতন আইন প্রণয়ন ও পুরাতন আইনের সংস্কার। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের একটি স্থায়ী অভাব দূর হইবে।

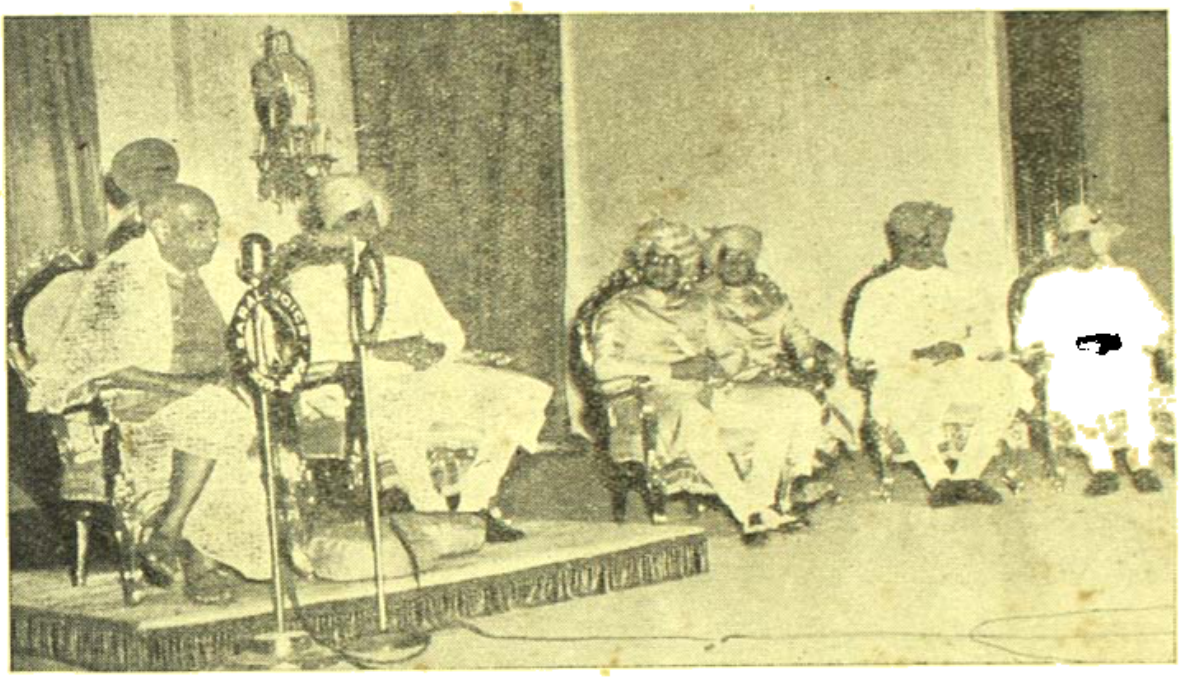

ভবনগরে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেল

বিদেশে বাঙ্গালী সম্মানিত—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার তারাচাঁদ কাবুলে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ায় তাহার স্থানে এক বৎসরের জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরববোধ করিবেন।

শ্রীযুক্ত কে-এম মুন্সী—

বোম্বায়ের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত কে-এম-মুন্সীকে ভারত গভর্ণমেণ্ট হায়দ্রাবাদে ভারতের এজেণ্ট-জেনারেল নিযুক্ত করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় নূতন সেচ ব্যবস্থা—

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে সম্প্রতি দুইটি বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া কয়েকটি জেলায় সেচের ব্যবস্থা হইবে। তাহাতে ৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ও ৬ লক্ষ একর জমীতে জল সরবরাহ হইবে; পশ্চিম বাঙ্গলার গভর্ণর রাজাজী ও প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ গত ২৪শে ডিসেম্বর ঐ ব্যবস্থার আয়োজন দেখিতে গিয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণার মেসান জোড়ে ১২৪ ফিট উচ্চ এক বাঁধ হইবে ও সিউড়ীর নিকট ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, ব্রহ্মানী ও কোপাই নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া ও ৬০০ মাইল খাল কাটিয়া বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলায় জল সরবরাহ করা হইবে।

সোমনাথে—

কাঠিয়াবারের অন্তর্গত জুনাগড় পরিদর্শনে গিয়া ভারত

দমদম বিমান ঘাঁটিতে ভারতের সহকারী প্রধান সেনাপতিকে পশ্চিম বঙ্গের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর সম্মান জ্ঞাপন ফটো—ভারত যাদ

পরলোকে রসিকমোহন—

পরম ভাগবত, পণ্ডিতপ্রবর রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত ৯ই অগ্রহায়ণ ১০৯ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তাঁহার অসাধারণ স্বাস্থ্য, অটুট সৌন্দর্য্য, অদাম্য স্মৃতিশক্তি ও পাণ্ডিত্য—দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করিত। এখনও তিনি একাসনে ৪।৬ ঘণ্টা বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন—এক ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা করিতেন। এ যুগে এই ধরণের লোকের শেষ হইল। তিনি দীর্ঘকাল ২৫নং বাগবাজার

ষ্ট্রীটস্থ গৃহে বাস করিয়াছিলেন। ঐ গৃহটি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ভারতের তথা পৃথিবীর জ্ঞানী ও সজ্জনদিগের তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল। তথায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সুবৃহৎ পাঠাগার বর্ত্তমান। গৃহটি তাঁহার স্মৃতিচিহ্নরূপে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া রক্ষা করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমরা এ বিষয়ে তাঁহার প্রিয় সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর কর্ত্তাদিগকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশ্বাস, স্বাধীন বাঙ্গলার জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন।

সোমনাথে—

কাঠিয়াবারের অন্তর্গত জুনাগড় পরিদর্শনে গিয়া ভারত রাষ্ট্রের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল যেদিন সোমনাথ মন্দিরের সংস্কার বাসনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেদিন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের হিন্দু নরনারীর অন্তরে যে উল্লাস ও যে উদ্দীপনা জাগিয়াছিল, বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতবাসী তেমন উদ্দীপনার আস্বাদ পায় নাই। সোমনাথের ইতিহাস অতীব বিচিত্র। পুরাণে, মহাভারতে আমরা সোমনাথের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইতিহাসেও সোমনাথের উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই ইতিহাস পাঠ করিবার সময়ে প্রত্যেক হিন্দু ভাবিয়াছে—সে কলঙ্কিত

কাহিনী না থাকিলেই ভাল হইত। গজনীর মামুদ কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার পর দুই বার অতর্কিত হইলেও সোমনাথ মন্দির অপবিত্র, সোমনাথের রত্নরাজিও ধন আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই। সোমনাথকে সম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। একবার নহে, বারবার সোমনাথ লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। হিন্দুর অধঃপতন তখনই সুরু হইয়া গিয়াছে; ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। তাই সোমনাথের কথা হিন্দুর অন্তর হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই তারিখে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরেই জুনাগড় বিদ্রোট উপস্থিত হয়। জুনাগড়ের নবাব সাহেবের পলায়ন, ভারত রাষ্ট্র কর্ত্তৃক জুনাগড়ের শাসন

শ্রীযুক্তা প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডি-এস সেনানায়ক, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও পণ্ডিতজীর ভাগিনেয়ী

আরিয়াবঙ্গৈনাথ তাঁহার মন্ত্রী সহকর্মীদের সহিত

পূর্ণগৌরবে ও সনাতন মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কোটী কোটী টাকার প্রয়োজন হইবে; শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যবিদ্যাবিশারদগণের সংযোগিতারও প্রয়োজন হইবে। ভারত রাষ্ট্র হইতে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না। গান্ধীজী এ কথাও বলিয়াছেন। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দেশের লোকের সদাশয়তা চাহিলে অত্যল্পকাল মধ্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দ্দারজীর নিকট এই আবেদন করি যে তিনি ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিয়া দিন। ভারতবর্ষের হিন্দু ভারতের পরাধীনতার শেষ কলঙ্কচিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া দিবে।

কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে গিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ংই সোমনাথ মন্দির দর্শন করিয়া ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের আশ্বস্ত করিয়াছিলেন; সোমনাথের মন্দির সংস্কারের আশ্বাস দিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী শুভাগমন স্মৃতি উৎসব—

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-আন্দোলনে মেদিনীপুর একদিকে যেমন ভারতবাসীর নিকটে এক গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, অপরদিকে তাহাকে ঠিক তেমনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে অকথ্য লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। কারা-মুক্তির পর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিলে, তিনি বৃটিশ নির্য্যাতীত এই মেদিনীপুর পরিভ্রমণের সঙ্কল্প করেন। তাঁহার এই মেদিনীপুর সফরের সময়ে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে তিনি কৃষ্ণনগর গ্রামে উপস্থিত হন। কৃষ্ণনগরে গ্রামপ্রান্তে প্রকাণ্ড এক দীঘির তীরে যে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর তাঁহার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই স্থানের সত্বাধিকারী রাণী শরৎকুমারী দেবী কোন সৎ প্রতিষ্ঠানে লাগাইবার জন্য সেই স্থানটি জনসাধারণকে দান করেন। কৃষ্ণনগর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী অরায়নগর প্রভৃতি গ্রামসমূহের গ্রাম-সেবক কর্ম্মীরা তথায় একটি "গান্ধী ভবন" স্থাপন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশিত পথ অনুযায়ী গ্রাম সংগঠন কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর ৩রা জানুয়ারী তারিখে সভা ও গান্ধী-মেলা করিয়া মহাত্মা গান্ধীর শুভাগমন স্মৃতি উৎসব পালন করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসরের ৩রা জানুয়ারী তারিখেও মহাসমারোহের সহিত তথায় এই শুভাগমন স্মৃতি উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব-সভায় পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি সভাপতিত্ব করেন এবং সাহিত্যিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কুমারী আভা মাইতি বি এ, নিখিল ভারত স্ত্রীয় সমিতির সদস্য শ্রীবনবিহারী পাল, সাংবাদিক শ্রীপূর্ণেন্দু ভৌমিক, হাসচরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুবোধ চন্দ্র মাইতি, দশগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঈশ্বর চন্দ্র প্রামাণিক, শ্রীশ্যামাচরণ পাত্র প্রভৃতি মহাত্মা গান্ধীর জীবনী, বাণী ও নির্দ্দেশিত কর্ম্মপন্থা লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করেন। মহাত্মা গান্ধী যিনি প্রাচীন ভারতের আত্মার মূর্ত্ত প্রতীক এবং আমাদের এই জাতির জনক বলিয়া অভিহিত, তিনি যে স্থানে বাস করিতেন বা পদার্পণ করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহেই প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকটে তীর্থ বিশেষ। কৃষ্ণনগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহের কর্ম্মীবৃন্দ কৃষ্ণনগরে যে মনোরম "গান্ধী ভবন" স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেশবাসীর কাছে একটি তীর্থস্থান হইয়াছে। এ জন্য উক্ত কর্ম্মীবৃন্দ সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

পরলোকে ধরিত্রী দেবী—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও এডভোকেট শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, রায় বাহাদুর চারুচন্দ্র মজুমদারের কন্যা ধরিত্রী দেবী পরিণত বয়সে স্বামী, পুত্র ও কন্যাদি

ধরিত্রী দেবী

রাখিয়া সম্প্রতি সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অর্চ্চনা-সম্পাদনার সময় হইতে কেশববাবুর সকল উদ্দীপনার মূলে ছিলেন এবং আতিথ্য ও অমায়িকতার দ্বারা সকলকে প্রীত করিতেন। তিনি স্বামীর সহিত বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতার সারদেশ্বরী আশ্রম প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী

আবির্ভাব—২রা অক্টোবর, ১৮৬৯ ·

তিরোভাব—৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

ফটো—ষ্টুডিয়ো দাস

মহামানবের মহাপ্রয়াণ

মহামানব মহাত্মা গান্ধী গত ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা ৫টা ৪০ মিনিটের সময় নয়া দিল্লীতে বিড়লা ভবনে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। যে ভারতবর্ষের প্রতি নরনারীর সর্ব্ববিধ মুক্তি কামনায় তিনি গত ৩০ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার তিরোধানে সেই ভারতের অধিবাসীদের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজও নহে, তাহার সময়ও এখন পর্য্যন্ত আসে নাই।

তিনি বীরের মত কাজ করিতে করিতে আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শত্রুর দল বার বার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও তাহাতে ভীত হন নাই। তিনি জানিতেন ও প্রায়ই বলিতেন—"যতদিন এই দেহের ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্যের জন্য প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন এই দেহ তিনি রক্ষা করিবেন।" এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া তিনি কখনও কোন দেহরক্ষী সঙ্গে লন নাই।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল তাঁহার সহিত কথা বলিতে আসিয়াছিলেন। ৫টার সময় প্রত্যহ তিনি প্রার্থনা সভায় যোগদান করিতেন। কথা বলিতে বলিতে ৫টা বাজিয়া গেল—তিনি সর্দ্দারজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা সভার দিকে অগ্রসর হইলেন। এবার দিল্লীতে যাইয়া তিনি বিড়লা ভবনে বাস করিতেছিলেন—বিড়লা ভবনের পাশেই মাঠে প্রার্থনা সভা হইত। তিনি তাঁহার সঙ্গী শ্রীমতী আভা গান্ধী ও কুমারী মনু গান্ধীকে দুই পার্শ্বে লইয়া তাহাদের কাঁধের উপর ভর দিয়া প্রার্থনা সভার মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সভায় শত শত লোক সমবেত হইয়াছিল। সমবেত জনতা উভয় পার্শ্বে সরিয়া গিয়া তাঁহার গমনের পথ করিয়া দিতেছিল। মঞ্চ হইতে আন্দাজ ১৫ গজ দূরে পৌঁছিলে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল—আজ আপনার সভায় আসিতে ৫ মিনিট বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। গান্ধীজি শুধু তাহার দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার বাহির করিয়া গান্ধীজিকে লক্ষ্য করিয়া ২ গজ দূর হইতে তাঁহাকে ৩ বার গুলী করিল—পেটে ও বুকে গুলী লাগিল—গান্ধীজি তখনই 'হরে রাম, হরে রাম' বলিতে বলিতে সেই স্থানে পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে তখনই ধরাধরি করিয়া বিড়লা ভবনে লইয়া যাওয়া হয়। ঘটনার ৩৫ মিনিট পরে ৫টা ৪০ মিনিটে তাঁহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিল।

আততায়ীর নাম নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে। সে পুনা

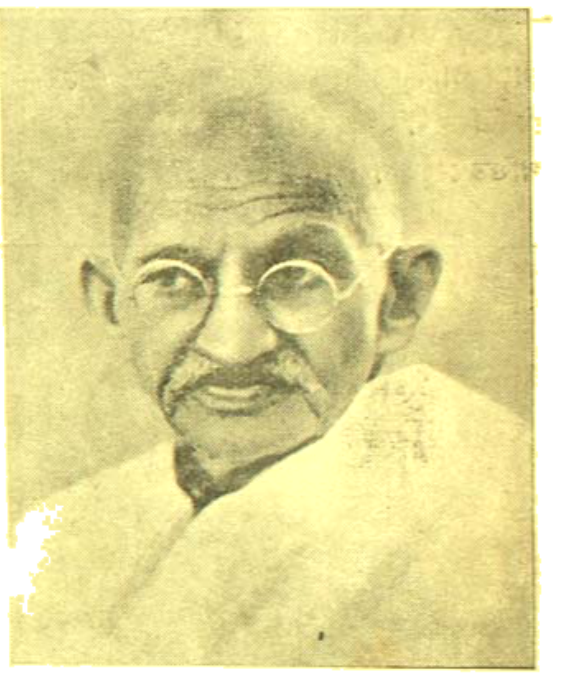

বাপুজী ফটো—ফুনিভার্সেল আর্ট গ্যালারী

হইতে প্রকাশিত 'হিন্দু রাষ্ট্র' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। তাহার বয়স আন্দাজ ৩৬ বৎসর। সে ২৯শে জানুয়ারী অর্থাৎ পূর্ব্ব দিনে দিল্লীতে আসিয়াছিল। ঘটনার পর তাহাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। সে ঐ কার্য্যের জন্য আদৌ দুঃখিত হয় নাই। সে ঐ কার্য্যের জন্যই দিল্লীতে আসিয়াছিল। সে জাতিতে মারাঠী। পরদিন

তাহাকে আদালতে হাজির করিয়া বিচারের জন্য তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির নিহত হওয়ার সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সর্দ্দারজী তখনও গান্ধীজির নিকট হইতে স্বগৃহে যাইয়া পৌঁছেন নাই—পথে খবর পাইয়া তিনি বিরলা ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সকল সদস্য এবং দিল্লীবাসী অগণিত নরনারী তখনই সকলে বিরলা ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫টা ৪০ মিনিটে গান্ধীজির মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রচার করার পর ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চিকিৎসার জন্য যখন চিকিৎসক আসিলেন, তখন গান্ধীজির আর চিকিৎসা বা ঔষধ-প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না। তিনি শান্তভাবে, মুদ্রিত নয়নে চির-নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। সারা রাত্রি ধরিয়া সেই ঘরে প্রার্থনা চলিতে লাগিল। গীতা পাঠ চলিল—তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল।

পণ্ডিত নেহরু পরদিনের কার্য্য সূচি ঘোষণা করিলেন।

মহামানবের অন্তিম ফটো—ইউনিভার্সেল আর্ট গ্যালারী

ভারতের সূর্য্য ডুবি যায় অস্তাচলে,
বিদ্বেষবেদনা-ঘন তমিস্রার তলে
রহিবে ভারত! আজি অন্ধ চরাচর—
নিষ্প্রভ আকাশে নাহি নিশির ভাস্কর।

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী সপরিবারে দিল্লীতে ছিলেন, তখনই তাঁহারা বাপুজীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৃতীয় পুত্র রামদাস গান্ধীও পরদিন দিল্লীতে আগমন করিলেন।

সংবাদ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সকলে শোকে অভিভূত হইয়া নিজ নিজ কাজ বন্ধ করিল। পথে যান চলাচল, লোক সমাগম সব বন্ধ হইয়া গেল। যেখানে রেডিও যোগে সংবাদ প্রচারিত হইতেছিল, দলে দলে লোক সেখানে গিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

পণ্ডিত নেহরুর নির্দ্দেশ মত পর দিন বেলা সাড়ে ১১টার সময় গান্ধীজির শবের শোভাযাত্রা বিরলা ভবন হইতে বাহির হইয়া ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া লাল-কিল্লার দক্ষিণ দিকে যমুনা তীরে রাজঘাটে লইয়া যাওয়া হইবে স্থির হইল। পণ্ডিতজী ঐ স্থানটি গান্ধীজির স্মৃতির সহিত সংযুক্ত করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। পর দিন ভারতের নেতৃবৃন্দ একে একে সব দিল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের গভর্ণর সার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী, যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বোম্বায়ের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত বি-জি-খের দিল্লীতে আসিলেন। যুক্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত গোবিন্দবল্লভ পন্থ দিল্লীতেই ছিলেন। বড়লাট লর্ড মাউণ্টবেটেন দিল্লীতেই ছিলেন—তিনি শুক্রবার সন্ধ্যার এক ঘণ্টা কাল গান্ধীজির শবের নিকট উপস্থিত ছিলেন। লেডী মাউণ্টবেটেন মাদ্রাজে ছিলেন, তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহলে স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করিতে যাইতেছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতা হইতে বাঙ্গলার গভর্ণর—গান্ধীজির বৈবাহিক শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী রাজা-গোপালাচারী শনিবার বিকালে দিল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বিভাবতীকে সঙ্গে লইয়া শনিবার দিল্লী যাইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইয়া গান্ধীজির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

শনিবার বেলা ঠিক সাড়ে ১১টার সময় পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে বাপুজির শবের শোভাযাত্রা দিল্লীর বিরলা ভবন হইতে যাত্রা করিল। সকল বিভাগের সৈন্যদল সহ রাজকীয় শোভাযাত্রা ৫ মাইল পথ ঘুরিয়া ঠিক ৪টা

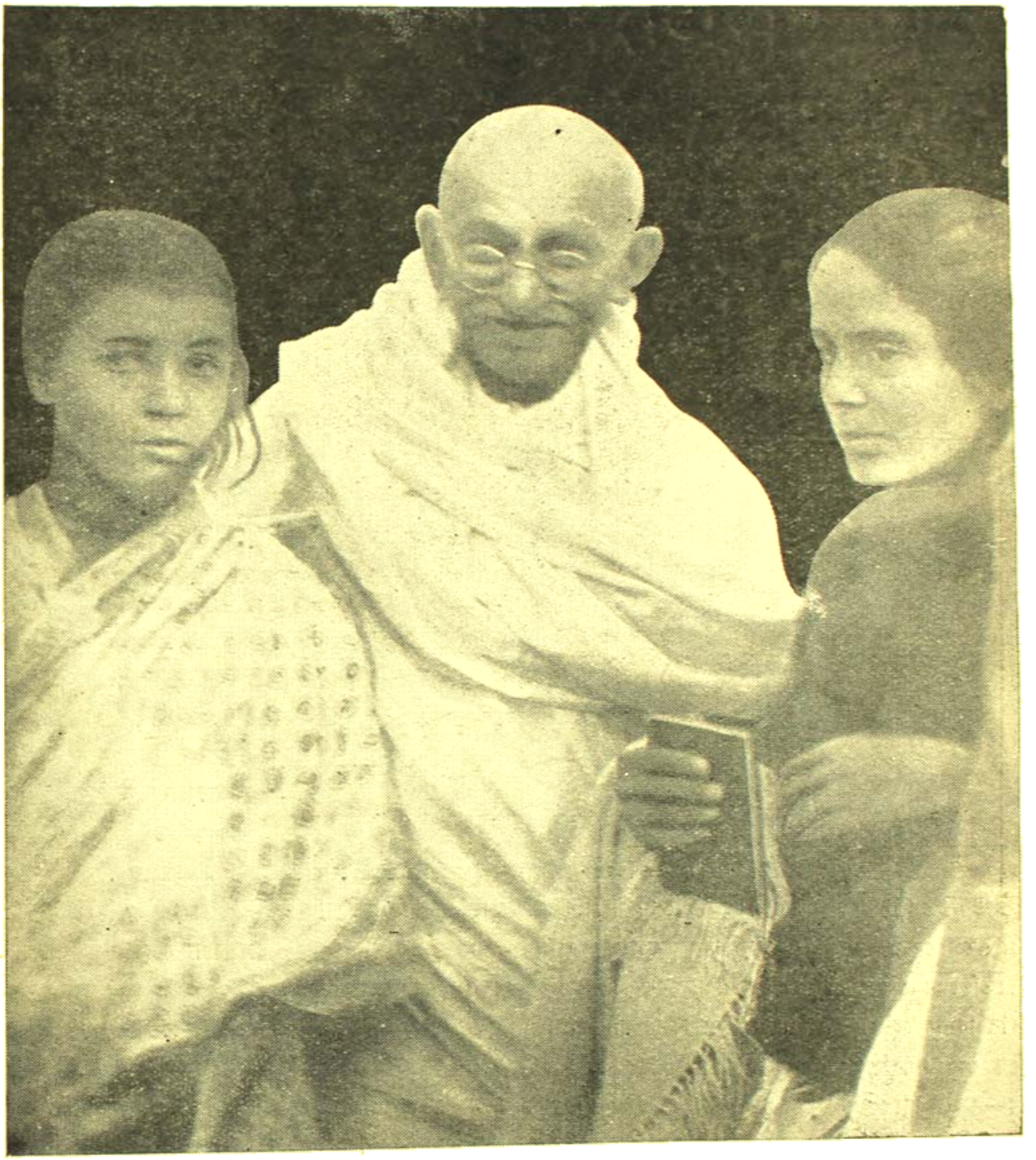

প্রার্থনা সভা অভিমুখে বাপুজী ফটো—ডি-রতন

হে মহামানব,
রেখে গেলে যে জীবন
আমাদের মাঝে
জীবনের সর্ব কাজে
যেন তা বিরাজে।

শ্রীলীলাময় দে

২০ মিনিটে রাজঘাটে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতে সরকারী কর্তৃপক্ষ চিতা সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন—১৫ মণ চন্দন কাঠ, ৪ মণ ঘৃত, ২ মণ গন্ধদ্রব্য, ১ মণ নারিকেল ও ১৫ সের কর্পূর দিয়া চিতা সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। স্নান করাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সাড়ে ৪টার সময় চিতার উপর তোলা হইল। ৪টা ৫৫ মিনিটে রামদাস গান্ধী চিতায় অগ্নিদান করিলেন। সেখানে বড়লাট লর্ড মাউণ্টবেটেন হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর সকল সম্ভ্রান্ত

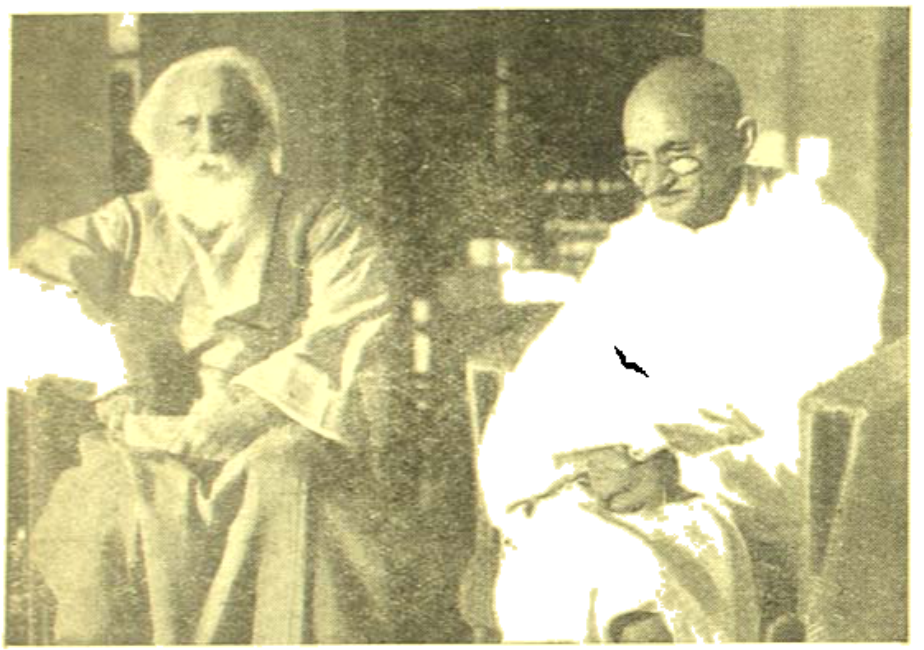

বিশ্বকবি ও বিশ্বগুরু ফটো—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তের সৌজন্যে

ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সর্দ্দারজী এক পাশে বসিয়াছিলেন—পণ্ডিত নেহরু চারিদিকে ঘুরিয়া জনতাকে শান্ত করিতেছিলেন। কত লক্ষ লোক যে শবানুগমন করিয়াছিল, তাহার হিসাব নাই। ১ ঘণ্টার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া গেল। ৬টার সময় সব শেষ—সকলে ধীরে ধীরে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পণ্ডিতজীর নির্দ্দেশ মত সেদিন শনিবার সারা ভারতে হরতাল পালিত হইল। সকল লোক সারাদিন উপবাস ও প্রার্থনায় অতিবাহিত করিলেন। সকল দেশবাসী বিকাল ৪টায় নদী বা সমুদ্রতীরে বা মাঠে সমবেত হইয়া গীতা-পাঠ, কোরাণ পাঠ, বাইবেল পাঠ প্রভৃতি দ্বারা সমবেত-ভাবে প্রার্থনা করিলেন।

গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব কিরূপ বিরাট ছিল, তাহা একদিকে আমরা যেমন তাঁহার জীবিতকালে লক্ষ্য করিয়াছি, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর দেখিতে পাইতেছি। ২রা ফেব্রুয়ারী সোমবার ভারত গভর্ণমেণ্ট মহাত্মার মুখাতে দুইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করেন। একটিতে তাঁহারা বলেন—কোনও প্রতিষ্ঠানকে হিংসা বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিতে দিবেন না। অপরটিতে বলা হয়—বেসরকারী সৈন্যদল কোথাও রাখিতে দেওয়া হইবে না। ঐ দিন ভারতীয় পার্লামেণ্ট বা গণপরিষদের অধিবেশনেও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু গান্ধীজির মহাপ্রয়াণে শোকসূচক প্রস্তাব উপস্থিত করেন—তাঁহার বক্তৃতার পর ৯জন সদস্য ঐ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই দিনই স্থির হইল—১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার গান্ধীজির অস্থি এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে নিমজ্জিত করা হইবে এবং চিতা হইতে সংগৃহীত ভস্ম ভারতের সর্ব্বত্র সকল তীর্থে—নদী, সমুদ্র, হ্রদ প্রভৃতিতে প্রদান করা হইবে।

যেই প্রচারিত হইল—হত্যাকারী গডসে মহারাষ্ট্রীয় ও সে হিন্দুসভার নেতা—অমনই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে হিন্দুসভাকর্ম্মীরা জনগণের হাতে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহু হিন্দুসভা কর্ম্মীর গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হইল এবং কত লোক যে প্রহৃত ও নির্য্যাতীত হইল তাহার সংখ্যা নাই।

৪ঠা জানুয়ারী ভারত সরকার ঘোষণা করিলেন—রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক-সংঘ যে হিংসার আদর্শ প্রচার করিয়াছে, তাহার ফলে বহু লোককে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। সংঘের সদস্যরা ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ চালাইয়াছে, বেআইনিভাবে অস্ত্র ও

সোনাবাকদ সংগ্রহ করিয়াছে, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি এবং পুলিস ও সৈন্যদলকে অপকার্য্যে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসমূলক কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে, অতএব সংঘকে ভারতের সর্ব্বত্র বেআইনি প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে কংগ্রেস দলের নেতাদের যে সভা হয়, তাহাতে ঘোষণা করা হয়—প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন।

৫ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় গান্ধীজির মৃত্যুতে শোকসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিটীর সদস্যগণ ছাড়াও সভায় আচার্য্য কৃপালানী, খাদসচিব শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম, শ্রমসচিব জগজীবনরাম এবং বাঙ্গালা, বিহার ও পাঞ্জাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভাপতিগণ বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। স্থির হয়, ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা কানপুরে না হইয়া দিল্লীতে হইবে।

গান্ধীজির মৃত্যুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পুলিস সর্ব্বত্র ব্যাপক খানাতল্লাস করিয়াছে—বহু কাগজপত্র উদ্ধার করিয়াছেও বিভিন্ন প্রদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক-সংঘের ও হিন্দু মহাসভার বহু সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর গৃহীত প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কার্য্যে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে—বলা হইয়াছে যে, গান্ধীজির জীবনকালে যাহা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর আমাদিগকে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। বেসরকারী ফৌজ বা অনুরূপ অন্য কোন বাহিনী গঠন নিষিদ্ধ হয় ও রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান গঠন নিষিদ্ধ হয়।

গান্ধীজির স্মৃতিরক্ষাকল্পে—সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে গঠনমূলক কার্য্য চালাইবার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় স্মৃতি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। বিভিন্ন ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর যে সকল রচনা ও উপদেশাবলী রহিয়াছে, সেগুলি সংগ্রহ ও প্রচার কার্য্যের জন্য এই ধনভাণ্ডারের অর্থ ব্যয়িত হইবে—একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় গান্ধীজির স্মৃতিপূত দ্রব্যাদি রাখা হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তত ১০ দিনের আয় এই ধনভাণ্ডারে দান করিতে বলা হইয়াছে। মহাত্মাজীর প্রাণনাশের ফলে যাহাতে কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হয়, তজ্জন্য জনগণের নিকট আবেদন করা হয়। মহাত্মা গান্ধী চিরদিনই প্রতিশোধ

আমার ধ্যানের ভারত

মহাত্মা গান্ধী

আমি সেই ভারতবর্ষকে গঠন করিবার জন্য কাজ করিয়া যাইব, যে ভারতবর্ষে দীনতম ব্যক্তিও মনে করিবে যে দেশ তাহারই দেশ। এই দেশ গড়িয়া তুলিতে তাহাদেরও অভিমত কার্য্যকরী হইবে। সেই ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণী বা নীচশ্রেণীরূপে মানুষের কোন সমাজ থাকিবে না। সেই ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত শ্রেষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক রাখিয়া বাস করিবে। সেই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপের কোন স্থান থাকিতে পারে না, উত্তেজক পানীয় অথবা অন্য কোন মাদক সেবারও কোন প্রশ্রয় থাকিবে না। নারী-সমাজ পুরুষ-সমাজেরই মত সমান অধিকার ভোগ করিবে। ইহাই আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ।

গ্রহণের নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন—গভর্ণমেণ্টই সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। এমতাবস্থায় জনগণ প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিলে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য ব্যাহত হইবে।

গান্ধীজির হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট আলোয়ারের মহারাজা ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ এন-বি-খারেকে সাময়িকভাবে আলোয়ার রাজ্যের বাহিরে থাকিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রকাশ—আলোয়ার রাজ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কার্য্যকলাপ, মহাত্মা গান্ধীজির প্রাণনাশের ব্যাপারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য যোগাযোগ

ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধমূলক কার্য্যকলাপে রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা বা মৌন-সম্মতি সম্পর্কে যে সকল তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য ঐ ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসক সাময়িকভাবে রাজ্য চালাইবেন।

এক সপ্তাহকাল অনুসন্ধানের পর ভারত গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও ভারত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদিগকে হত্যার দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন ও সেজন্য বিভিন্ন প্রদেশের বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত একটি খসড়া রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ জনসাধারণের উদ্দেশে লিখিত উহাই তাঁহার সর্ব্ব শেষ লিখন। ৭ই ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য যুগলকিশোর উহা প্রচার করিয়াছেন। গান্ধীজি উহাতে বলিয়াছেন—"ভারত দ্বিধা বিভক্ত হইলেও কংগ্রেস কর্তৃক উদ্ভাবিত উপায়ে দেশের রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে। প্রচার-যন্ত্র ও পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের সামাজিক, নৈতিক ও বৈষয়িক স্বাধীনতা এখনও লাভ হয় নাই। ভারতবর্ষ বীয় অতীত গণতান্ত্রিক লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার সময় সামরিক-শক্তির উপর শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের প্রাধান্য লাভের সংগ্রাম চলিতে বাধ্য। সেরূপ অবস্থায় রাজনীতিক দল ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের অশুভ প্রতিযোগিতা হইতে উহাকে মুক্ত রাখিতে হইবে। এই হেতু ও অন্যবিধ কারণে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়া দিয়া উহাকে লোক-সেবক-সংঘে রূপান্তরিত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে।"

৮ই ফেব্রুয়ারী ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতের সর্ব্বত্র মুসলেম লীগ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও খাকসার প্রতিষ্ঠান বেআইনি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেন তাহা করা হইল সরকারী বিবৃতিতে তাহা পরিষ্কার ভাবে জানান হইয়াছে। সর্ব্বশেষে বলা হইয়াছে—এই ব্যবস্থা দলের সমাজের বিরুদ্ধে অবলম্বন করা হইতেছে না। * * বেআইনি কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া যাহাতে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়, গভর্ণমেণ্ট সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে সাতারা, কোলাপুর, কলগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে বাছিয়া বাছিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের উপর জনগণ কর্তৃক আক্রমণ হইতেছে জানিয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী সর্দ্দার পেটেল এক সতর্কবাণী প্রচার করেন। পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া একদল সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সাধনের যে চেষ্টা করিতেছেন, সর্দ্দারজী তাহার তীব্র নিন্দা করেন।

দেশ বিদেশে শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ

মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে শুধু তাঁহার দেশবাসী শোকাকুল হন নাই—সারা জগতের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়া শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন—আমরা স্থির তাহার কয়েকটি মাত্র প্রকাশ করিলাম।

(১) "বন্ধুগণ, আমাদের জীবনে এতদিন যে দীপশিখা জ্বলিতেছিল, আজ তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। একটা গভীর তমিস্রা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আপনাদিগকে আমি কি বলিব এবং কি ভাবেই বা তাহা বলিব, আমি তাহা জানি না। আমাদের নেতা, আমাদের বাপু, আমাদের রাষ্ট্রের পিতা আর নাই। একথা বলিলে হয়ত কিছুটা অন্যায় হইবে। তথাপি তাঁহাকে আমরা এতদিন আমাদের মধ্যে যে ভাবে দেখিতে পাইয়াছি, আর হইতে আর সেইভাবে দেখিতে পাইব না। বিপদে পড়িলে আমরা তাঁহার উপদেশলাভের জন্য গিয়াছি, দুঃখে পড়িলে তাঁহার কাছে সান্ত্বনার জন্য গিয়াছি। আর আমরা সেইভাবে যাইতে পারিব না। এই যে প্রচণ্ড আঘাত, সে শুধু আমারই নয়, এই দেশের কোটি কোটি অধিবাসীর। আমি বা অপর কেহ যদি তোমাদের উপদেশ আপনাদিগকে দেই, তবে তাহার দ্বারা এ আঘাতের কিছু উপশম হইবে না।

আমি বলিয়াছি, দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে। আমি জানি এ কথা বলা অন্যায়। কারণ, এই দীপ শিখা এক সাধারণ আলোকবর্ত্তিকা। দীর্ঘ দিন যে আলো এই দেশকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, সেই আলো আরও অনেক দিন এমন কি সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের দেশকে পথের সন্ধান দিবে। সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে ইহা চাহিয়া দেখিবে। আর্ত্ত-

হৃদয়ে ইহা সান্ত্বনা যোগাইবে। এই যে আলো ইহা শুধু বর্তমানের প্রতীক নহে, ইহা জীবন্ত সত্যের প্রতীক, ইহা চিরন্তন সত্যের প্রতীক। এই আলো আমাদিগকে ভাবের সঙ্কট পথ দেখাইয়া চলে, ভুল করিলে সংশোধনের পথ নির্দেশ করে। এই আলোই আমাদের এই অতি প্রাচীন দেশকে স্বাধীনতায় ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার আরও অনেক কিছু করিবার ছিল। আমরা মুহূর্তের তরেও একথা ভাবিতে পারি না যে তিনি আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন অথবা তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ যখন আমরা এক জটিলতার সম্মুখীন, তখন তিনি আমাদের মধ্যে নাই, ইহা এক ভয়াবহ ও প্রচণ্ড আঘাত।

একজন বিকৃতমস্তিষ্ক লোক তাঁহার জীবনের অবসান ঘটাইয়াছে। কারণ, যে এই কাজ করিয়াছে, তাহাকে আমি বিকৃতমস্তিষ্ক ছাড়া আর কি বলিতে পারি। বিগত কিছুকাল ধরিয়া চারিদিকে একটা বিষবাষ্প ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, মানুষের মনেও তাহার ক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। এই যে বিষবিষুক্ত হলাহল, ইহার সম্মুখীন আমাদিগকে হইতে হইবে, সমূলে ইহাকে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং আমাদের চতুর্দিকে যে বিষজ্বাল ঘিরিয়া রহিয়াছে তাহা প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ইহার জন্য আমরা যেন এই উন্মত্ততার অনুসরণ না করি, আমাদের প্রিয় শিক্ষক আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন সেই পথেই আমরা যেন চলি। প্রথমে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াছি বলিয়া যেন উন্মত্তবৎ আচরণ না করি। একটা শক্তিশালী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি যে ভাবে চতুর্দিকের ঘোর বিপদকে তুচ্ছ করিয়া দণ্ডায়মান হয় আমরাও যেন অনুরূপ শক্তির অধিকারী হইতে পারি। আমাদের মহান্ নেতা ও আমাদের মহান্ শিক্ষক যে নির্দেশ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যেন আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া পালন করিতে পারি। আমরা যেন একথা স্মরণ রাখি যে, আমরা যদি অন্যায় এবং হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করি তাহা হইলে তাঁহার বিদেহী আত্মা বিক্ষুব্ধ হইবে। পরলোক হইতে তাঁহার আত্মা আমাদের প্রতিটি কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে।

কাজেই আমরা কোন অন্যায় যেন না করি। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, আমরা দুর্বল হইব। বরং শক্তি এবং সংহতির সাহায্যে আমরা আমাদের সম্মুখের সকল প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইব। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে, সমস্ত বাধ বিপদবাধ এবং সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠিয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মুখে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে। এই ঘটনা যতই মর্মবিদারী হোক না কেন, এক হিসাবে ইহা একটি প্রতীকও বটে। সেই প্রতীক হইতেছে সমস্ত ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যাইয়া আদর্শ জীবনের মহান বৈশিষ্ট্যগুলি সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করার প্রতীক। মৃত্যুর মধ্য দিয়া তিনি জীবনের বিরাট আদর্শের কথা এবং চিরন্তন সত্যের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহা যদি আমরা মনে রাখি তবে ভারতের কল্যাণই হইবে।

—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

(২) "আমাদের পাপের জন্য পৃথিবীর মহামানবকে জীবন দিতে হইয়াছে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। গান্ধীজী যখন জীবিত ছিলেন তখন আমরা তাঁহার কথা শুনি নাই, আজ তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করি। শান্তির জন্য গান্ধীজী আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে তাঁহার আদর্শ অবশ্যই সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। জনসাধারণ যদি পারস্পরিক ভেদাভেদ ও বিদ্বেষ ভুলিয়া যায় তবেই গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

(৩) "একটা গভীর মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের সকলের মস্তকে আঘাত করিয়াছে। গান্ধীজীর মৃত্যুর ফলে সারা বিশ্বে যে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে আমাদের অন্তরেও তাহা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। গান্ধীজী বিশ্বের শিক্ষা গুরু। আদর্শের জন্য তিনি যে আত্মবিসর্জন দিয়াছেন তাহা বিশ্বের অল্পসংখ্যক মানবের জীবনেই দেখা যায়।

স্বরাজ তিনি তাঁহার আদর্শকে বিজয়ের মূর্তরূপ দিবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছেন। বহুদূর হইতেও আমরা উপলব্ধি করিয়াছি তিনি এই বিশ্বের ঊর্ধ্বে ছিলেন—তাঁহার জীবন ছিল আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার প্রেমবাণীর স্বাধীনতার কামনা তাঁহার মধ্য দিয়া এক অপূর্ব রূপ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য তাঁহার আরও দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁহার মধ্যে স্বাধীনতার কামনা অপেক্ষা আরও একটা বড় জিনিষ ছিল। সেটা হইতেছে অহিংসা ধর্ম। গান্ধীজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্রত লাভ হইবে না। এই বিশ্বের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু যে আদর্শ তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়াছিল তাহা চিরভাস্বর থাকিবে। আজ যাহারা সারা বিশ্বে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছে তাহারা তাঁহার মহান অহিংসা ও ঐক্যের আদর্শ চিরদিন অনুসরণ করিয়া চলিবে। এই আদর্শের জন্যই তিনি জীবনধারণ করিতেন, এই আদর্শের জন্যই তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন।"

—রাষ্ট্রসংঘের সভাপতি মিঃ লাংগেন হোপ

(৪) "বিশ্বের ইতিহাসে দেখা যায় মহামানবরা অনেকে আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিয়াছেন। গান্ধী জানিতেন যে তাঁহার জীবন যে কোন সময়ে বিপন্ন হইতে পারে। বিপদকে যে মানুষ এইরূপভাবে তুচ্ছ করিয়া চলিতে পারে ইহাই তাহার প্রথম নিদর্শন।"

—ব্রিটিশ প্রতিনিধি মিঃ মোরেল বেকা।

(৫) "গান্ধীজী ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। ভারতের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে গান্ধীজীর স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। মুক্তির জন্য দীর্ঘদিনের সংগ্রামে তিনি ভারতবাসীকে পরিচালিত করিয়াছেন; তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় গান্ধীজীর নাম উল্লিখিত থাকিবে।"

—রুশ প্রতিনিধি মঃ আন্দ্রে গ্রমিকো

(৬) "পাকিস্তান সরকার ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে—আমার পক্ষ হইতেও বটে, আমি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম হিন্দুধর্মের মহৎ আদর্শের প্রতীক এই মহামানবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাইতেছি। তাঁহার মর্মান্তিক মৃত্যুতে ভারতের যতটা ক্ষতি হইয়াছে পাকিস্তানেরও অন্যূনাধিক তত ক্ষতি হয় নাই। উপরন্তু ইহা বিশ্বের এক অপূরণীয় ক্ষতি। কোটি কোটি মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিত। যাহারাই তাঁহার নাম শুনিয়াছে শ্রদ্ধায় তাহাদের মস্তক অবনত হইয়াছে। তাঁহার জীবিতকালে যখনই কোন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তখনই তিনি সমস্ত বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়াছেন। মানুষের হৃদয়ে ইহা তাঁহাকে শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে।"

—পাকিস্তানের প্রতিনিধি স্যার আবদুল্লা খাঁ

(৭) "তাঁহার মতিন্ত কেহ চাহিতে পারে ইহা কল্পনাতীত। একজন ভারতবাসীর হস্তে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। অদৃষ্টের পরিহাস ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এই ঘটনা আরও মর্মান্তিক কারণ :- বর্তমানের যে সকল সমস্যা, তাহার অনেকগুলির সমাধানের পথ তিনিই দেখাইয়া দিয়াছেন। একটি দুর্ভাগ্য লোকের হাতে তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। ইহার পরিণতি যে কি হইবে তাহা বলা শক্ত। তথাপি আমরা এই প্রার্থনাই করিব যে, তিনি যে আদর্শের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর মধ্য দিয়া যেন সেই আদর্শের পরিপূর্তি হয়। গান্ধীজী তাঁহার অনুবর্তীদের শিখাইয়াছেন যে, অহিংসাই বিশ্বের জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। যাহারা ভারতের উপর আধিপত্য করিতে চায় ইহা শুধু তাহাদিগকেই সাহায্য করিবে।"

—ইউক্রেনের প্রতিনিধি মঃ তাসিলি তারাসেঙ্কো

(৮) "আজ যখন বিশ্বশান্তি মহাসঙ্কট চলিতেছে তখন এই মৃত্যু বড়ই মর্মান্তিক। আমরা বিশ্বাস করি এই আত্মবিসর্জন বিশ্ববাসীকে বিশ্বসভার আদর্শ পরিপূরণের জন্য সংগ্রামে প্রেরণা দিবে।"

—মার্কিন প্রতিনিধি সিনেটর অষ্টিন

(৯) "মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান এশিয়ার মহামানব যবনিকার জীবনাবসান ঘটিয়াছে।"

— চীনের প্রতিনিধি ডাঃ টি এফ সিয়াং

(১০) "গান্ধীজী যে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আত্মার শক্তিকে তিনি তাঁহার কথা এবং কাজের দ্বারা দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বিশ্ববাসীর সম্মুখে তিনি মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।"

—আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি ডাঃ হোসে আর্ক

(১১) "আমরা প্রার্থনা করি, যে বীজ তিনি বপন করিয়া গেলেন তাহা মানুষের মনে অনুরিত হউক এবং বিশ্বসভার কাজে সহায়তা করুক।"

—সিরিয়ার প্রতিনিধি ফরিস এল খুরী

(১২) "গান্ধীজীর মৃত্যু শুধু ভারতের দুর্ঘটনা নয়—সমগ্র বিশ্বের শুভকামী মানুষের দুর্ঘটনা।"

—কানাডার প্রতিনিধি জেনারেল এণ্ডু ম্যাকনটন

(১৩) "গান্ধীজী ভারতের একজন বিরাট জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বেরও নেতা ছিলেন। ভারতবাসী তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করে। তাঁহার প্রভাব শুধু রাজনীতি-ক্ষেত্রেই নয়, আত্মিক জগতেও। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে আদর্শের জন্য তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন তাহার পরিপূর্তি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার জীবন-সাধনা যুগযুগান্ত ভারতবাসীকে পথ দেখাইবে। তাঁহার দেশবাসীর কল্যাণের জন্য তিনি সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া যে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, ভারতের নেতারা তাহা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি তাঁহার আত্ম-বিসর্জনের ফলে শুধু ভারতবাসীই নয় সমস্ত বিশ্ববাসীই শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য আরও উৎসাহ লইয়া কাজ করিবে।"

—প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান

(১৪) "এই শোকাবহ ঘটনার পর ভারত ও পাকিস্তানের অধিবাসীরা গান্ধীজীর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে বলিয়া আমি আশা করি।"

—মহাবিপ্লবীয় মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ গ্রেডি

(১৫) "এই পূজনীয় ব্যক্তির হত্যা বর্তমান ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ঘটনা। মনুষ্যসভ্যতাকে বাঁচাইতে হইলে গান্ধীজীর ভাবধারা গ্রহণ না করিয়া বিশ্বশান্তির অন্যান্য নাই। সংস্কারক হিসাবে পৃথিবীতে তিনি অমরত্ব আসিয়া পড়িয়াছিলেন।"

—জেনারেল ম্যাক আর্থার

(১৬) "অহিংসার পূজারীকে হিংসার বলি পাঠাতে বলি হইতে হইল, ইহা সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়।"

—ক্যানেডার প্রধান মন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি কিং

(১৭) "প্রাচ্য একজন বেদপ্রেমিক মানুষ, আজি একজন মহান সাধক হারাইল।"

—রাজা কারুখ

(১৮) মহাত্মা গান্ধীর হত্যায় আমেরিকাবাসী শোকাভিভূত হইয়াছে। আমরা এই দুঃসময়ে আপনাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

—মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল

(১৯) "আমাদের ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাদৃশ্য আছে। ভারত আজ সর্বস্বান্ত হইয়াছে। আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি। মহাত্মার আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সৌভ্রাতৃবোধে ভারত পূর্ণ হইয়া উঠুক, ইহাই আমার কামনা।"

—মিঃ ডি ভ্যালেরা

(২০) "আমার ও ফরাসী সরকারের পক্ষ হইতে আমি জানাইতেছি যে, গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছি। আমরা

তাঁহার নিকট মস্তক নত করি। আশা করি তাঁহার ভারতের অবস্থা পরিদর্শনের দিকে যাইবে না।"

—ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী রবার্ট শুমান

(২১) "এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ আমি পাই নাই। আমি অভিভূত হইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর ভারত শান্ত থাকিবে বলিয়া আমি আশা করি।"

—সমাজতন্ত্রী নেতা ও ব্রহ্মদেশ প্রধানমন্ত্রী মঃ উ নু

(২২) "তিনি মানুষের মনের হিংসাপ্রবৃত্তি দূর করিয়া শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অন্ধ উত্তেজনা ও বিদ্বেষের বহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া তিনি শহীদ হইয়াছেন।"

—ক্যান্টারবেরির আর্চ্চ বিশপ ডাঃ ফিসার

(২৩) "আমি ও আমি মহাত্মাজীর মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হইয়াছি। এই দুর্ঘটনায় ভারতবাসীদের তথা মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা ভারতবাসীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

—রাজা ষষ্ঠজর্জ

(২৪) "এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনিয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি।"

—মিঃ চার্চিল

(২৫) "এই অসাধারণ ব্যক্তির তিরোধানে কেবল বৃটেন নয়, সমগ্র পৃথিবী শোকে বিহ্বল হইবে। মনুষ্যজাতির এই মহান সেবকের অন্তর্ধানে আমরা সকলেই শোকাভিভূত। অহিংসাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে বিশ্বাসী ছিলেন। যাহারা হিংসা দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে চাহিত, তিনি তাহাদের বাধা দিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও সততা সকল সন্দেহের ঊর্দ্ধে ছিল। সাম্প্রদায়িক অশান্তির ফলে যখন সমস্ত স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া উঠিতেছিল, তখন তিনি অনশন করিয়া বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সম্প্রতি দিল্লীতেও তিনি একবার অনশন করেন। তাহাতে আবহাওয়ার কিছু পরিবর্তন হয়। আততায়ীর আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি ও মৈত্রীর কর্তব্য শুরু হইয়াছে, কিন্তু আশা করি, তাঁহার সেনাপতি তাঁহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের তিরোধানে আমি সমগ্র বৃটিশ জাতির পক্ষ হইতেই ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে আমাদের গভীর শোক জ্ঞাপন করিতেছি। গান্ধীজী বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্দেহ নাই, তবু মনে হয় তিনি বর্তমান যুগের নন। তিনি যে যুগের মানব, সে যুগ পৃথিবীতে এখনও আসে নাই—আসিবে কিনা কে জানে। যে বৃদ্ধ কঠিন সমস্ত জীবন শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন মরদেহের নির্মম হস্ত তাহা চিরতরে রুদ্ধ করিয়াছে, তবু তাঁহার আত্মা সমস্ত বিশ্ববাসীকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে, শান্তি ও সদ্ভীতির পথে পরিচালিত করিবে ইহাই আমার দৃঢ় অভিমত।"

—প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী

(২৬) "গভীর দুঃখের সহিত আমি আততায়ীর হস্তে গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছি। বিশ্বের সর্বত্র এই দুঃখ অনুভূত হইবে এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। একজন বিরাট পুরুষের তিরোধান হইল। ভারতের এই অপূরণীয় ক্ষতিতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।"

—দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী মেনারেল স্মাটস্

(২৭) "ভারত ও পৃথিবীর যে ক্ষতি হইল, তাহা প্রকাশের ভাষা নাই।"

—পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্নেষ্ট বেভিন

(২৮) "গান্ধীজীর হত্যা ভারত তথা পৃথিবীর একটি মর্মন্তুদ ঘটনা। পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক পুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

—স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস

(২৯) "পৃথিবীতে নয়না আর এইরূপ পুরুষের আবির্ভাব হইবে না।"

—যোগাযোগ সচিব মিঃ এ, ডি. আলেকজেণ্ডার

(৩০) "অতি ভয়ঙ্কর সংবাদ। একজন মহাপুরুষের এই পরিণতি অত্যন্ত দুঃখের।"

—সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ হার্বার্ট মরিসন

(৩১) "মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদে শ্রমিকদল অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।"

—বৃটিশ শ্রমিক দলের সেক্রেটারী মিঃ মর্গান ফিলিপস

(৩২) "খুব বেশী ভাল হওয়ায় যে কি বিপদ হয়, ইহাতে তাহা বুঝা যাইতেছে।"

—জর্জ বার্নাড শ

(৩৩) "আমি মনে করি মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু কেবল ভারতের পক্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বের একটা ক্ষতি। কারণ বর্তমান যুগের শান্তি সংগ্রামের তিনি ছিলেন নায়ক। ইহা এত বড় একটা বিপর্যয় যে আমি ঠিকভাবে চিন্তাও করিতে পারি না।"

—লর্ড লিণ্ডোয়েল

(৩৪) "আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের নিরস্ত্র গান্ধীজীর নিষ্ঠুর হত্যার সংবাদ শুনিয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। আমি আমি তাঁহার সব চেয়ে বড় ইচ্ছা এই যে, তাঁহার মৃত্যুর যেন প্রতিশোধ না লওয়া হয়, অথবা তাঁহার মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া যেন আরও হত্যাকাণ্ড না হয়। তাঁহার মৃত্যুর ফলে যেন এশিয়ার এই উপমহাদেশে সকল লোকের বিরোধ মিটিয়া যায়।"

—লর্ড পেথিক লরেন্স

(৩৫) "পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায়ের অবসানের সাথে সাথে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

—মিঃ এস্. এস্ আমেরী

(৩৬) "তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর নিন্দা লইয়া আর কেহই ভারতের সেবা করেন নাই। ভারতে ও ভারতের বাহিরে তাঁহার যে সকল বন্ধু

আছেন তাঁহারা এই আশা করেন যে, তাঁহার মৃত্যুতে দেশের লোক তাঁহার আদর্শকে অনুসরণ করিবে।"

—লর্ড ছালিফাক্স

(৩৭) "মিঃ গান্ধীর উপর ঘৃণ্যতম আক্রমণ ও তাহার ফলে তাঁহার মৃত্যুর সংবাদে আমি মর্মাহত হইয়াছি। এই সময় আর আমাদের মধ্যে কোন বিরোধের প্রশ্ন নাই। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ যতই থাকুক না কেন, একথা সত্য যে, তিনি হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন এবং তিনি হিন্দুদের নিকট গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ও আত্মভাজন ছিলেন। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতে আমি আমার গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং হিন্দুসমাজ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে এই গভীর শোকের দিনে সহানুভূতি জানাইতেছি। ভারতের ও পাকিস্থানের স্বাধীনতা লাভের পর এই সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁহার তিরোধান সত্যই দুঃখের। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের প্রভূত ক্ষতি হইল এবং এই সঙ্কটকালে তাঁহার স্থান পূরণ করিবার উপযুক্ত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতে নাই।"

—কায়েদে আজম জিন্না

(৩৮) "এই হত্যাকাণ্ড এর ঘৃণ্য ও প্রকৃত যে প্রত্যেক ব্যক্তিই ভবিষ্যতে ইহার নিন্দা করিবেন। গান্ধীজী আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। জনগণের মানসিক সুস্থতা ফিরাইয়া আনিবার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজীকে হারানোর বেদনা সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেই অন্তর দিয়া অনুভব করিবেন। বহু বৎসর যাবত গান্ধীজী ছিলেন কংগ্রেসের আত্মা এবং একথা বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, তিনি ছিলেন কংগ্রেসের পিতা। অহিংসা-মন্ত্রের মধ্যেই হিংসানীতির শিকার হইলেন তিনি—ইহাকেই বলে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস! সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনকল্পে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাকিস্তানী প্রতিটি নরনারী চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। ভারতীয় রাজনীতির এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার জীবনাবসানে যে ক্ষতি হইল তাহা কোন দিনই পূরণ হইবে না।"

—লিয়াকৎ আলি খাঁ

(৩৯) "ভারতে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তির যখন সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন ছিল সেই সময়েই তিনি বিদায় হইলেন। এই অপরাধের তুলনা নাই।"

—খাজা নাজিমুদ্দীন

(৪০) "মনে হইতেছে সমস্ত পৃথিবীর ভিত্তি যেন কাঁপিয়া পড়িল। নির্যাতিতের বেদনায় আর কে দিবে সান্ত্বনা, কে মুছাইবে তাহাদের চোখের অশ্রু? পথের নির্দেশের জন্য আমরা তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকিতাম। বিপদের দিনে অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম তাঁহার উপদেশের জন্য। তিনি কোনদিন আমাদের বিমুখ করেন নাই।

হে ভারতের নরনারী, কাঁদো কাঁদো—যতক্ষণ না সমস্ত হৃদয় খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে জীবনদীপ হইতে সত্য আর জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত হইত, মানবতার প্রতি গভীর প্রেম, আর নির্যাতিত নির্বান্ধবের প্রতি অলৌকিক সহানুভূতি, সেই দীপ আজ চিরতরে নিভিয়া গেল! তবু, এই চরম দুঃখের মুহূর্তে তাঁহার বাণী আমাদের অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—শান্তির যে পরমবাণী তিনি আজীবন প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যে মানব-প্রেমের জন্য তিনি প্রাণ উৎসর্গ করিয়া গেলেন তাহাকেই আমাদের কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। জাতির পিতা আমাদের প্রতিটি কাজ অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিবেন। তাঁহার হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে, মানবতার সেবায় আমাদের মনেপ্রাণে এক হইতে হইবে।"

—অমর সুরাবর্দী

(৪১) "আমার আন্তরিক প্রার্থনা ও আশা এই যে, যদিও শান্তির দূত আমাদের মধ্যে নাই, তথাপি তাঁহার আদর্শ দেশকে সঞ্জীবিত করিবে ও হিন্দুদের মধ্যে যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত তাহারা এই দিকে দৃষ্টি রাখিবে যে, তিনি ভারতের জন্য যে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছিলেন তাহা যেন অন্ধ ন্যাশিবাদের নিকট পরাভূত হইয়া না যায়।"

—ফিরোজ খাঁ নুন

(৪২) "বহু শতাব্দীর মধ্যে তিনিই ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সকল শান্তিকামীর হৃদয়ে তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন এবং তিনি আমাদের মাঝে না থাকিলেও তাঁহার আত্মা শান্তিকামীদিগকে পরিচালিত করিবে।"

—ইকতিদার হোসেন

(৪৩) "সমগ্র দেশের এবং আকস্মিক দুর্ঘটনায় শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ মানবের অন্তর্ধান হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মনুষ্যসমাজ এক বিরাট ও মহান চরিত্রের পুরুষকে হারাইল। তিনি চিরকাল আমাদের মনে বাঁচিয়া থাকিবেন।"

—আবদুল কাদের খান

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৬৭৪

ভারতবর্ষ ঃ ৩৮১ ও ২৭৭

ভারতবর্ষ বনাম অষ্ট্রেলিয়া দলের সরকারী চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া দল এক ইনিংস ও ১৬ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া দল বনাম ভারতবর্ষের মধ্যে যে ৩টি টেষ্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে—অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ও তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলায় জয়ী হয়েছে এবং দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া দলের তিনটি খেলায় জয়লাভ হল। পঞ্চম বা শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেলাতে ভারতীয় দল জয়লাভ করলেও 'রবার' পাওয়ার সম্মান এবার অষ্ট্রেলিয়া দলই পাবে।

২৩শে জানুয়ারী এডিলেডে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হয়। নির্ম্মল আকাশ, ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত আবহাওয়া। ব্র্যাডম্যান টসে জয়লাভ করলেন। অষ্ট্রেলিয়া দলের বার্থেস ও মরিস প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা করলেন। মরিস নিজস্ব ৭ রান ক'রে দলের ২০ রানে আউট হলে স্বয়ং ক্যাপটেন ডন্ ব্র্যাডম্যান বার্থেসের জুটী হয়ে খেলতে থাকেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে দলের তিন উইকেটে ৩১০ রান উঠে। বার্থেস ১১২ এবং ব্র্যাডম্যান ২০১ রান করে আউট হ'ন। হ্যাসেট এবং মিলার যথাক্রমে ৩৯ এবং ৪ রান ক'রে ঐ দিনের মত নট আউট থাকেন। বার্থেস তিন ঘণ্টার কিছু বেশী সময় ব্যাট ক'রেছিলেন। তাঁর রানে ১৬টা বাউণ্ডারী ছিল।

এই দিনের খেলায় ব্র্যাডম্যান শত রান ক'রে এ বৎসরের ক্রিকেট খেলায় সাতটা সেঞ্চুরী করলেন, তার মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে সেঞ্চুরী করলেন তিনটে। এই খেলায় তাঁর ২০১ রান ধরে সর্ব্বসমেত ৩৭টি দ্বিশত রান (ডবল সেঞ্চুরী) হ'ল—এই সংখ্যা ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড় ডব্লউ আর হ্যামণ্ডের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ৩৬টি দ্বিশত রান সংখ্যা অতিক্রম করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করলো। এই দিনের খেলায় ব্র্যাডম্যান যখন ৭৭ রান করলেন তখন এই বৎসরের খেলায় তাঁর ১০০০ রান পূর্ণ হয়। তার পূর্ব্বেই ভারতীয় দলের ক্যাপটেন লালা অমরনাথ ল্যানসেষ্টারে তাঁর সহস্র রান পূর্ণ করেন।

দ্বিতীয় দিনে হ্যাসেট ও মিলারের জুটী খেলতে থাকে। হ্যাসেট তাঁর নিজস্ব ৫৯ রানের মাথায় ভারতীয় দলের খারাপ ফিল্ডিংয়ের দরুণ সৌভাগ্যক্রমে রান আউট থেকে রক্ষা পান। লাঞ্চের পূর্ব্বের শেষ ওভারে হ্যাসেট তাঁর শত রান পূর্ণ করেন, মোট ১৬১ মিনিট ব্যাট ক'রে। তখন তাঁর বাউণ্ডারী হয়েছিল ৮টা। লাঞ্চের সময় অষ্ট্রেলিয়া দলের ৪৯৪ রান উঠে। মিলার ৬৩ রানে এবং হ্যাসেট শতাধিক রান করে নট আউট থাকেন। লাঞ্চের পর মিলার নিজস্ব ৬৭ রানের মাথায় দলের ৫০৩ রানে আউট হ'লেন। হ্যাসেট ও মিলারের ৪র্থ উইকেটের জুটী ১১৩ মিনিট উইকেটে থেকে মোট ১১৩ রান তুলেছিলো। অষ্ট্রেলিয়া দল ৫৪০ মিনিট খেলায় ৬৫০ রান তুললো। দলের ৬৬০ রান উঠলে পর ১৯৪৬ সালে অষ্ট্রেলিয়ার লিডনিতে ইংলণ্ড দলের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচের ৬৫৯ রানের রেকর্ড ভঙ্গ হয়। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৬৭৪ রানে শেষ হয়। এত অধিক সংখ্যক রান ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার অনুষ্ঠিত কোন টেষ্ট ম্যাচে কোন দলই তুলতে পারেনি। সেই হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ার এই ৬৭৪ রান টেষ্ট ম্যাচের ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপন করেছে। এই

রান তুলতে ৯½ ঘণ্টা সময় নিয়েছিল। হ্যাসেট ১৯৮ রান করে নট আউট থাকেন। মাত্র ২ রানের জন্য ডবল সেঞ্চুরী করার গৌরব পেলেন না, শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কোন ত্রুটীই অপরদিকের উইকেটে টিকে থাকতে না পারায়।

হ্যাসেটের খেলা খুবই ধৈর্য্যপূর্ণ এবং উপভোগ্য হয়েছিল। প্রায় ৫ ঘণ্টা সময় খেলেছিলেন, বাউণ্ডারী ছিল ১৬টা। অষ্ট্রেলিয়া দলের এই বিপুল রান সংখ্যাকে পুষ্ট করেছিল ব্র্যাডম্যানের ২০১, বার্ণেসের ১১২, হ্যাসেটের নট আউট ১৯৮ এবং মিলারের ৬৭ রান। ভারতীয় দলের হয়ে বেশী উইকেট পেলেন রঙ্গচারী, ১৪১ রানে ৪টা। কাদকার, মানকাদ এবং হাজারে প্রত্যেকে ২টো ক'রে পান।

প্রথম দিনের খেলায় হাতে আর ঘণ্টা সময় নিয়ে ভারতীয় দল অষ্ট্রেলিয়া দলের এই রেকর্ড রানের প্রত্যুত্তর দিতে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। সূচনা শুভ হ'ল না। মাত্র দলের ৬ রানে সাম্রতাতে এবং পি সেন আউট হলেন। মানকাদ ৩ ক'রে নট আউট রইলেন।

খেলার তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী সোমবার, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের স্মরণীয় স্বাধীনতা দিবসে শনিবারের পরিত্যক্ত প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন মানকাদ ও অমরনাথ। এই তৃতীয় উইকেটের জুটী বেশ হাত জমিয়ে খেলছিলেন কিন্তু দলের ভাঙ্গন আকস্মিকভাবেই দেখা দিল। তাঁদের জুটী ভেঙ্গে পড়ায় ক্রিকেট ক্রীড়ামোদিরা বিস্মিত হলেন। ভারতবর্ষের মুখ রক্ষা করলেন হাজারে ও কাদকারের ৬৪ উইকেটের জুটী। তৃতীয় দিনের খেলায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা ভাঙ্গলে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল পাঁচ উইকেটে ভারতীয় দলের ২৯৯ রান উঠেছে। হাজারে ১০৮ এবং কাদকার ৭৭ রান ক'রে ঐ দিনের মত নট আউট রইলেন। হাজারের খেলাই তৃতীয় দিনের খেলাকে সৌষ্ঠব এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছিল। তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং আউট না হবার মত খেলা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। তাঁর শত রান পূর্ণ হ'লে দর্শকরা করতালি এবং আনন্দ ধ্বনিতে মাঠ মুখরিত করে এবং ব্র্যাডম্যান এগিয়ে গিয়ে তাঁর করমর্দ্দন করেন।

হাজারে অষ্ট্রেলিয়ার খেলার মাঠে 'mercury' এই নামে আখ্যা লাভ করেছেন। হাজারে ও কাদকারের ৬৪ উইকেটের জুটীতে ১৪০ মিনিটে ১৪০ রান উঠেছিল। লালা অমরনাথ এবং মানকাদ যথাক্রমে ৪৬ ও ৪৯ রান করেন। 'ফলো অন' থেকে রক্ষা পেতে হলে ভারতীয় দলের তখন আরও ১৭৫ রাণের প্রয়োজন ছিল। হাতে ৫টা উইকেট।

২৭শে জানুয়ারী ভারতীয় দলের পূর্ণ ৭ ঘণ্টা ব্যাট করার পর প্রথম ইনিংসের খেলা ৩৮১ রাণে শেষ হয়। হাজারে ১১৬ রাণ করেন। কাদকার করেন ১২৩ রাণ। এবারের খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। তাহলেও তিনি যে যে টেষ্ট ম্যাচে নেমেছিলেন প্রত্যেকটিতে গড়পড়তা ৫০ রাণ করেছেন। কাদকার ৪ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ব্যাট করেন। বাউণ্ডারী করেন ১৪টা। অষ্ট্রেলিয়ার বোলার জনসন ৬৪ রাণে ৪টে উইকেট পান। 'ফলো অন' থেকে রক্ষা পাবার প্রয়োজনীয় ১৭৫ রাণ তুলতে না পেরে ভারতীয় দল খেলার চতুর্থ দিনে ৮২ রাণ তুলে। ফলে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের ৬১৪ রাণসংখ্যা থেকে ২৯৩ রাণ পিছনে পড়ে ভারতীয় দল খেলার চতুর্থ দিনেই 'ফলো অন' ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে বাধ্য হ'ল। এবারও সূচনা শুভ হ'ল না। মানকাদ ও অমরনাথ কোন রাণ না ক'রে আউট হলেন। দারুণ ভাঙ্গন সুরু হ'ল। দলের এই ভাঙ্গনের মুখে পুনরায় হাজারে গতিরোধ ক'রে নিজ ক্রীড়ানৈপুণ্যে দলের সম্মান রক্ষা করলেন। চতুর্থ দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৮৮ রাণ উঠলে পর সেদিনের মত খেলা বন্ধ হ'ল। হাজারে নট আউট ১০২ রাণ এবং তাঁর জুটী অধিকারী নট আউট ১৮ রাণ করলেন।

২৮শে জানুয়ারী খেলার পঞ্চম দিনেই চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলায় জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয়ে গেল। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭৭ রাণে শেষ হয়ে গেল। বিজয় হাজারে ১৪৫ রাণ করলেন। তাঁর জুটী অধিকারী ৫১। বরোদার এই দুই খেলোয়াড় দলকে ইনিংসের পরাজয় থেকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে খেলেছিলেন। লিণ্ডওয়েল ৬৮ রাণে ৭টি উইকেট পেলেন।

ভারতীয় দল চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলায় পরাজিত হলেও এই খেলায় বিজয় হাজারে যে ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন তা পরাজয়ের গ্লানি অনেকখানি মুছে ফেলেছে। তিনি উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করে যে কৃতিত্ব

লাভ করেন তা টেষ্ট ম্যাচ খেলার ইতিহাসে মাত্র ১২জন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জীবনে এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়েছে। হাজারের ক্রিকেট খেলার পদ্ধতি এবং বিশেষত্ব দেখে Mr. Huge Pruggy তাঁকে 'True Test temperament' অর্থাৎ টেষ্ট ম্যাচ খেলার উপযুক্ত হিসাবে সম্মানিত করেছেন। ক্রিকেট খেলায় দেখে বিদেশী ক্রিকেট সমঝদারের মুখ থেকে ভারতীয় খেলোয়াড় সম্পর্কে এরূপ প্রশংসা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের যে সব দুর্ব্বলতা এবং অক্ষমতার অভিজ্ঞতা আমরা ওদেশে লাভ করেছি তা স্মরণ করে ভবিষ্যতে নিজেদের সেই মত খেলার উপযোগী করে তৈরী করতে হবে নতুবা কেবলমাত্র এইরূপ ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের আত্মগৌরবে নিশ্চেষ্ট থাকলে মস্ত ভুল করা হবে।

অষ্ট্রেলিয়া দল : ডন্ ব্র্যাডম্যান (অধিনায়ক), বার্ণেস, মরিস, হ্যাসেট, মিলার, নেলহার্ডে, ম্যাককুল, ডনসন, সিডওয়াল, টালন ও টোসাক।

ভারতীয় দল : লালা অমরনাথ (অধিনায়ক), সামন্তাতে, হাজারে, গুলমহম্মদ, ফাদকার, কিষেণচাঁদ, অধিকারী, রঘনেকার, পি সেন ও রঘচারী।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধূলা :

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এ বছরের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক খেলাধূলায় মোট সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় যোগদান করেছিল। খেলাধূলায় কোন দল কিরূপ স্থান অধিকার করেছে তার ফলাফল : ১ম বোম্বাই ৪১½ পয়েন্ট ; ২য় কলিকাতা ৩২, মাদ্রাজ ১৭, আলীগড় ১৩, এলাহাবাদ ৮, পাটনা ৫ এবং বেনারস ৩½ পয়েন্ট।

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ :

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা বৃষ্টির জন্য বন্ধ হয়ে গেছে এবং খেলাটি ড্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইংলণ্ড বৃষ্টির জন্যই পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল।

ফলাফল :

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ২৯৬ (জে ইলমেয়ার ৭৮, জি গোমেস ৮৬ ; ১০৩ রাণে জে লাকার ৭ উইকেট) ও ৩৫১ (ডিক্রেয়ার্ড ; ক্রিস্টানি ৯৯, উইলিয়মস ৭২)

ইংলণ্ড : ২৫৩ (হবার্টসন ৮০, জে হার্ডষ্টাফ ৯৮ ; জোন্স ৫৪ রাণে ৪ উই) ও ৮৬ (৪ উইকেট)

ন্যাশনাল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ :

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশন্যাল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় মালয়ের খেলোয়াড়রা বিশেষ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। মালয় তিনটি ফাইনাল খেলায় বিজয়ী হয়েছে।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে : এস এ দুরাবী (মালয়) ১৫-৭ ও ১৫-১১ পয়েন্টে এ সামুয়েলকে (মালয়) পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে : এ সামুয়েল ও সি লিয়ং (মালয়) ১৫-৬ ও ১৫-৪ পয়েন্টে টি মাডসেন ও পি হোমকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে : মিসেস সি আহম (ডেনমার্ক) ৫-১১, ১১-৮ ও ১১-৫ পয়েন্টে মিস চিনোয়কে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসের ফাইনালে : টি মাডসনও মিস সুমান যৌথভাবে ১৫-১১ ও ১৫-৬ পয়েন্টে সি লিয়ং ও মিসেস পিণ্টোকে পরাজিত করেন।

খেলা-ধূলা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলার ক্রীকেট

বাংলাদেশের ক্রীকেট মরশুম প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। জাতীয় জনক মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের জন্য ক্রীকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল তাঁদের এসোসিয়েশনভুক্ত ক্লাব-গুলিকে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সমস্ত খেলা বাতিল করতে সময়োচিত নির্দ্দেশ দিয়ে খুবই প্রশংসার কাজ করেছেন।

এবার একটিমাত্র প্রথম শ্রেণীর খেলা, বাংলা বনাম হোলকার, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার হোলকার দল পূর্ব্বের ন্যায় শক্তিশালী ছিল না সি, এস, নাইডু ও সারভাতে ভারতীয় দলের হয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় খেলতে যাওয়ায়। কিন্তু তবুও বাংলা শোচনীয়ভাবে ১২৮ রাণে পরাজিত হল নিজ প্রদেশে খেলে। বাংলার এই পরাজয়ের জন্য প্রধানত দায়ী হোলকার অধিনায়ক প্রবীণ খেলোয়াড় কর্ণেল নাইডুর অভিজ্ঞতা ও বাংলা দলের দৃঢ়তা ও নার্ভের অভাব। অবশ্য বাংলা দলের স্বপক্ষেও বলবার আছে যে তাদের পি, সেন অষ্ট্রেলিয়ার খেলতে যাওয়ায় এবং নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জী তাঁর ফুটবল খেলায় আহত পা না সারায় খেলায় যোগ দিতে পারেন নি। নির্ব্বাচিত অধিনায়ক কার্ত্তিক বসু ও কমল ভট্টাচার্য্যও অসুস্থতার অজুহাতে না খেলায় বাংলা দলের শক্তি অনেকাংশে হ্রাস পায়। এই চারজন খেলোয়াড়, যাঁদের প্রত্যেকেই ভাল ব্যাটসম্যান, তাঁদের অভাব বাংলা বিশেষ ভাবে বোধ করেছে তার প্রথম ইনিংসে। বাংলার প্রথম ইনিংস্ শেষ হয় মাত্র ৯৫ রাণে। এই ইনিংসে একমাত্র এস, মুস্তাকী ছাড়া কেউ খেলতে পারেন নি। মুস্তাকী ধৈর্য্য-সহকারে মুখে দৃঢ়তাপূর্ণভাবে খেলে দলের সর্ব্বোচ্চ ২৮ রাণ করেন। বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের তরুণ খেলোয়াড় পঙ্কোজ রায় কৃতিত্বপূর্ণ শতাধিক রাণ করেন। গত বৎসরে পঙ্কোজ রায় এই প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম খেলেন এবং যুক্তপ্রদেশের বিপক্ষে শতাধিক রাণ করেন। হোলকারের বিপক্ষে পঙ্কোজের এই খেলা একেবারে ত্রুটি মুক্ত হয় নি। আউট হবার সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন; তা ছাড়া তাঁর 'ব্রানিং বিটুইন্ দি উইকেট'এর উন্নতির প্রয়োজন। প্রথম ইনিংসে ভাণ্ডার গাচ্ তাঁর দোষে রাণ আউট হন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করবার পর তিনি নিজেই রাণ আউট হ'য়ে যান। পঙ্কোজের উপর আশা করবারও অনেক কিছুই আছে। দলের পতনের মুখে দৃঢ়তাপূর্ণভাবে খেলবার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং ভাল ব্যাটসম্যানের উপযোগী নার্ভ ও পিটিয়ে খেলবার ক্ষমতা থেকেও তিনি বঞ্চিত নন। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যেই তিনি এই মরশুমে

পঙ্কোজ রায় ফটো—শৈলেন চট্টোপাধ্যায়

তাঁর ১০০০ রাণ পূর্ণ করেছেন। পঙ্কোজকে আমাদের অনুরোধ যেন তিনি নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জীর মতন ফুটবল খেলায় বেশী ঝোঁক দিয়ে তাঁর সম্ভাবনাপূর্ণ ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নষ্ট না করেন। তিনি যদি তাঁর ব্যাটিংএর ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য রেখে খেলার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন তবে আশা হয় ভবিষ্যতে হয়ত তিনি পি, সেনের ন্যায় বাংলার গৌরব বাড়িয়ে ভারতীয় টেষ্ট দলে স্থান পাবেন। পঙ্কোজের সঙ্গে ডালহৌসি ক্লাবের ব্যাটসম্যান আলেক গারবিসের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। ব্যাটসম্যান হিসাবে তাঁরও ভবিষ্যত সমুজ্জ্বল বলে মনে হয়।

এদিকে পঙ্কোজ রায় যেমন ধীরে ধীরে বাংলার ক্রীকেট

জগতে নিজের স্থান করছেন অপর দিকে বাংলার খ্যাতনামা বোলার এন, চৌধুরীর খেলা তেমনি ক্রমশই নীচে আসছে। তিনি তাঁর ষ্টাবম্যাচগুলিতে সফলতার পরিচয় দিলেও রঞ্জি প্রতিযোগিতায় মত প্রথম শ্রেণীর খেলায় আমাদের একেবারে হতাশ করেছেন। অবশ্য বাংলার অধিনায়ক ভ্যাণ্ডার গাচ্ অভিজ্ঞতার অভাবেই হোক বা অন্য কোন কারণে তাঁকে ঠিক মত খেলাতে পারেন নি বলেই মনে হয়। তবে চৌধুরীর ফর্ম আগের চেয়ে যে অনেক পড়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয় প্র্যাক্‌টিসের দিকে বিশেষ ঝোঁক না দেওয়াই তাঁর এই পড়তির কারণ। কিছুদিন আগেও তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলারের সম্মান পেয়েছেন। আমরা আশা করি কেবলমাত্র গাফিলতির জন্য তিনি এই সম্মান এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় দলে স্থান পাবার সম্ভাবনা নষ্ট করবেন না।

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দল

অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় ক্রীকেট দলের খেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এখন পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ সমেত আর অল্প খেলাই বাকী আছে। অষ্ট্রেলিয়া দলের শক্তির তুলনায় ভারতীয় দল যে কত পিছিয়ে আছে তার প্রমাণ টেষ্ট ম্যাচগুলিতেই পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় দল ব্যাটিংএ কিছুটা কৃতিত্ব দেখাতে পারলেও বোলিংএর দিক থেকে একেবারে হতাশ করেছেন। ভারতীয় দলের ভাইস ক্যাপটেন বিজয় হাজারী ব্যাটিংএর দিক দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চতুর্থ টেষ্টে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করে (১১৬ ও ১৪৫)। এ পর্য্যন্ত আর কোন ভারতীয় খেলোয়াড় এই কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এমন কি ব্র্যাডম্যান পর্য্যন্ত এই কৃতিত্ব এই মরশুমের আগে দেখাতে পারেন নি। এই মরশুমে মেলবোর্ণ টেষ্টে ব্র্যাডম্যান ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করে (১৩২ ও ১২৭ নট আউট) তাঁর বহু ব্যাটিং রেকর্ড মধ্যেকার এই ফাঁকটুকু ভর্ত্তি করেন। ১৯০৯ সালে অষ্ট্রেলিয়ার ডব্লু, ব্রাডস্‌লি প্রথম এই কৃতিত্ব দেখান ওভাল মাঠে ইংলণ্ডের বিপক্ষে খেলে। ইংলণ্ডের হার্ব্বার্ট সাটক্লিফ ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জর্জ্জ হেড্‌লি দু' দু'বার এই কৃতিত্বপূর্ণ একই টেষ্টম্যাচের উভয় ইনিংসে শতাধিক রাণ করবার গৌরব অর্জ্জন করেন।

বিজয় হাজারীর এই স্মরণীয় খেলাতে ভারতের ব্যাটিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে কত উন্নত তা পৃথিবীর ক্রীকেট জগতে প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু খালি বিজয় হাজারীর মতন একটিমাত্র ব্যাট্‌সম্যানকে নিয়ে একটি দেশের চলতে পারে না। আরও বিজয় হাজারীর প্রয়োজন আমরা এখন বোধ করছি বিশেষ করে বিজয় মার্চেণ্টের খেলার ভবিষ্যত যখন সন্দেহমুক্ত নয়।

অমরনাথও অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতের উচ্চ ব্যাটিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডের পরিচয় দিয়েছেন ব্র্যাডম্যানের আগেই এই মরশুমে তাঁর ১০০০ রাণ পূর্ণ করে। মানকাদ ও ফাদ্‌কারও ব্যাটিং কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। কিন্তু সবচেয়ে হতাশ করেছেন রঙ্গনেকার, যাঁর সম্বন্ধে অনেক আশাই আমাদের মনে ছিল। কিষেণচাঁদ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। রণবীর সিংজী, যাঁর খেলা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, তাঁকে না নিয়ে বোম্বাইএর কে, সি, ইব্রাহিমকে নিয়ে গেলে দলের শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেত বলে মনে হয়।

বোলিং শক্তিতে ভারতীয়দল যে কিরূপ দুর্ব্বল তার প্রমাণ এই অষ্ট্রেলিয়া সফরে বেশ পাওয়া যাচ্ছে। মানকাদ এবং কিছু পরিমাণে অমরনাথ ছাড়া আর কাহাকেও প্রথম শ্রেণীর টেষ্ট বোলারের পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। বাংলার বোলার এন চৌধুরীকে নিয়ে গেলে তাঁর 'কাটিং অফ্ ব্রেক্' সকলের গোড়ার দিকের বৃষ্টিসিক্ত অষ্ট্রেলিয়ান উইকেটে বিশেষ কার্য্যকরী হ'ত বলে মনে হয়। উইকেট রক্ষক হিসাবে পি, সেন বাংলার তথা ভারতের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন। ফিল্ডিংএ গুলমহম্মদ, অধিকারী ও রঙ্গনেকার তাঁদের ক্রীড়া-চাতুর্য্য দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ফাষ্ট বোলারের অভাবই এখন ভারতীয়দল বিশেষ করে বোধ করছেন। ভাল ফাষ্ট বোলার ছাড়া প্রথম শ্রেণীর টেষ্ট ম্যাচে জয়লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য যে, হেরল্ড লারউড, মহম্মদ নিশার বা য়ে, লিণ্ডওয়ালের মত সত্যকারের ফাষ্ট বোলার এ দেশে বর্ত্তমানে নেই। এখন ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলির প্রকৃত ফাষ্ট বোলার তৈরীর দিকে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ দরকার; তা' না হলে ভবিষ্যতে প্রথম শ্রেণীর টেষ্ট ম্যাচে জয়লাভ করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ভারতীয় ক্রীকেটের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাড়াতে হলে খেলার সর্ব্ববিভাগের উন্নতি করার আশু প্রয়োজন—বিশেষ করে বোলিংএর। আশা করি ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রীকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

কবি নোগুচীর গান্ধী প্রশস্তি

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হে বীর, হে যোদ্ধা,
অপূর্ব্ব অচিন্ত্য তোমার রণ কৌশল
যন্ত্রের মরীচিকা নিয়ে তোমার সংগ্রাম নয়
বহ্ন উর্দ্ধে তার স্থান
স্বর্গ তোরণে স্বর্ণ কেতনের কনক কান্তিতে সমুজ্জ্বল।

তোমার জয় অবধারিত,
হয়ত তা এখনও পূর্ণ প্রকট নয়
তবু সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই
হবে জয়, জয় সুনিশ্চিত।
তোমার নব পাঞ্চজন্যের দুর্বানাদে
নরকোষ্ঠির দ্বারেও পাশ্চিত্যাভিমের আঘাত দেহ—
একবার নিদ্রা হে অতী!
তুমি অনাগতদিগকে আহ্বান করেছো বৈরবে
উত্তরের প্রতীক্ষায়
তব ধাত্রিকে আছো
শান্ত সমাহিত অবিচল।
ক্ষীণ দীর্ঘ তনু তোমার
কিন্তু কী বিপুল প্রাণের আধার,
কী বিপুল বিরাট্ বিস্ময়
হে মহান্ আত্মা—
তোমার বীর্য্যে পৃথিবী প্রকম্পিত।

যে শ্রেষ্ঠের দাবী আজও অস্বীকৃত, অপমানিত
জীবনের যে স্বাধিকার আজও ধূলায় লুণ্ঠিত লজ্জিত
প্রেমের যে অর্চ্চিত মর্য্যাদা আজও মূল্যহীন্ মান-বঞ্চিত
তারাই আজ বিদ্রোহে মূর্ত্ত হয়েছে তোমার মধ্যে।
শত অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকের বিরুদ্ধে
তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত রণিত হয়েছে
তাদেরই উজ্জীবন্ মন্ত্র!

জয় হোক্ তোমার
জয় হোক্ সাধু বিচারের
ন্যায়নিষ্ঠ ভগবানের।
ধাত্রী ধরিত্রীর শ্যামল ক্রোড়ে তুমি
দুঃখ-রাঙা জীবন-বেদের গাথা গেয়েছো।
তোমার চেয়ে অমল বেদজ্ঞ আর কে আছে?
হে সত্যসন্ধানী, তুমি চলেছো একাকী
দুর্যোগ রাত্রির বক্ষ তোমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করেনি।
আত্মরতি তুমি চাওনি
তোমার চেয়ে স্রষ্টা ও স্রষ্টা আর কে আছে?
হে পথিক্ যাযাবর
চিরযাত্রী তুমি, অন্তরের সুখে
দুঃখহীন অফুরান্ নিঃসীম পথে—
তোমার প্রণতি।

(শ্রীরাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত "মহাত্মা গান্ধী" প্রবন্ধাবলীতে প্রকাশিত কবিতার সারাংশ অবলম্বনে)

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত চিত্রনাট্য "যুগে যুগে"—২৷৹
কমল রায়চৌধুরী সঙ্কলিত "ভারতের স্বদেশী গান"—৸৹
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "মানস চাক"—১৲
শ্রীশিউলি মজুমদার অনূদিত "গোল্ডেন্"—২৲
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য"—১৷৹
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিহঙ্গিনী"—২৲
শ্রীহাসিরাশি দেবী প্রণীত উপন্যাস "ভোরের বৈরবী"—২৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস
"পায়ে চলার পথে"—২৲
শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "তিন বৌদ্ধযান"—১৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

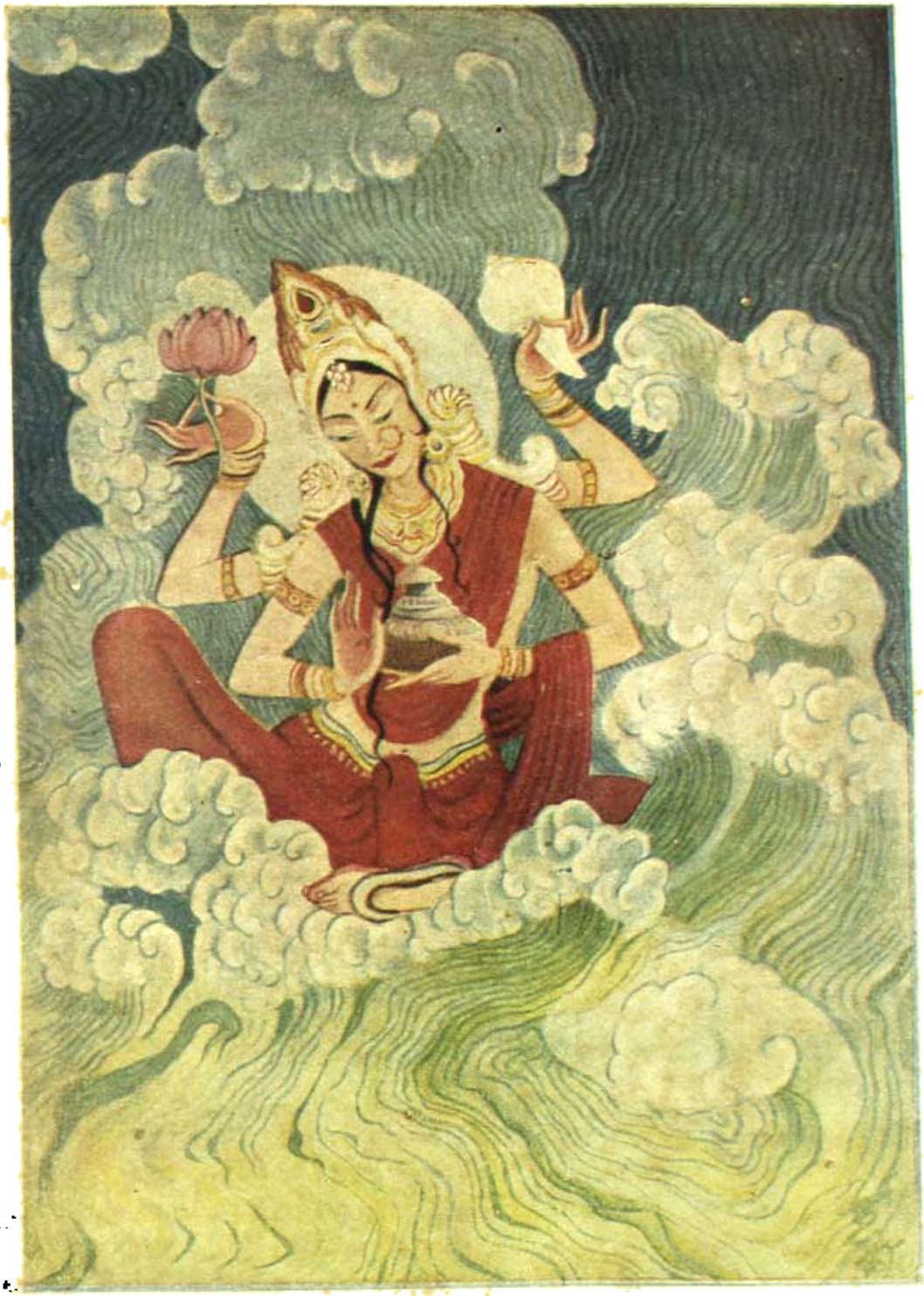

শিল্পী—শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় মহালক্ষ্মী ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

চৈত্র—১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চত্রিংশ বর্ষ	চতুর্থ সংখ্যা

বাপুজী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সৃষ্টির তিমিররাত্রে কে আনিল মুক্তির মশাল
শ্মশানের প্রেতভূমে কে করিল জীবন-সাধনা,
শবের শীতল-বক্ষে সঞ্চারিল প্রাণ-উন্মাদনা
মৃত্যুময় মাতৃভূমি অকস্মাৎ উৎকণ্ঠ উত্তাল। •
আরণ্যক আফ্রিকায়, নীলোর্মির পরপার হতে
যে-সন্ন্যাসী অগ্নিমন্ত্রে বিঘোষিলে লাঞ্ছিতের জয়
দুঃখের তামস ভেদী দেখা দিলে তুমি জ্যোতির্ময়
ঊর্ধ্বাচি-প্রত্যাচি-প্রাচী ভেসে গেল এক মহাস্রোতে। •
'দিনগত পাপক্ষয়'—ছায়া মূর্তি আমরা মানুষ,
দুরন্ত আশার চেউ জীর্ণ বুকে ব্যর্থ ভেঙে পড়ে,
সহসা শিহরি' উঠি ব্রহ্মমেধ-সংকেতিত ঝড়ে—
মুহূর্তে কাটিয়া যায় কল্পনার বিলাসী কাহুর। •
চম্পারণে দেখিলাম 'অভীঃ' মন্ত্রী তুমি পুরোহিত
ডাণ্ডীর সমুদ্র পথে অর্ঘনয় তুমি সত্যাগ্রহী,
আমাদের যত পাপ নীলকণ্ঠ একা নিলে বহি'
আমরা দাঁড়াই উঠি—মুক্ত বক্ষে জাগিল সম্বিৎ। •
মন হয় অবিশ্বাস, ক্ষমতার দ্যূতক্রীড়া চলে,
বিষাক্ত কুটিল হিংসা শান দেয় নগ্ন ছুরিকায়
বিহার-পাঞ্জাব-বাংলা ভেসে যায় হত্যার বন্যায়
ধর্মধ্বজী স্বার্থ হাসে চক্রান্তের সুড়ঙ্গের তলে। •
তার মাঝে একা তুমি হে মৈত্রেয় অহিংস-তাপস,
প্রেম-মন্ত্রে নিবারিলে সমুদ্যত হিংস্রতার ক্ষুধা—
মিলনের ব্রহ্ম-ছন্দ দিকে দিকে করিলে ঘোষণা
পূর্ণ হল মুক্তিব্রত—স্বাধীনতা হল আত্মবল। •
তোমারে হেনেছি তবু, করিয়াছি পিতৃরক্তপাত—
চিরন্তন ইতিহাসে কলঙ্কেরে করিয়াছি ক্ষমা—
পৃথিবী করুক ঘৃণা, তবু তুমি করে যাও ক্ষমা
তোমার মৃত্যুতে পিতা, শেষ হোক যত আত্মঘাত।

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

৩০শে জানুয়ারী বিকেলে ঘরে বসে আমি ও অরুণবাবু কংগ্রেস কন্‌স্টিটিউশনের খসড়া নিয়ে আলোচনা করছিলাম। খসড়াটি সেই দিনই প্রাতে পেয়েছি—মহাত্মা গান্ধীর তৈরী খসড়া। দুইদিন পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রায় দুঘণ্টা আলোচনা হয় কংগ্রেস গঠনতন্ত্র নিয়ে—তারই ফলে তিনি খসড়া তৈরী করে পাঠিয়েছেন আমাদের বিচার-বিবেচনার জন্যে। আমি অরুণবাবুর সঙ্গে আলোচনা করছি এই জন্যে যে, সেদিনই রাত্রে ৯টায় আমাদের গঠনতন্ত্র কমিটির মিটিং রয়েছে। সেই মিটিংএ মহাত্মার তৈরী খসড়া বিচার-বিবেচনা করে আবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হ'লে তা সেরে রাখতে হবে তিনি ২।৩ দিনের মধ্যে। তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন ৩ তারিখে ওয়ার্দ্ধা চলে যাচ্ছেন। ফিরে আসা ১৪।১৫ তারিখের আগে হবে না।

বসে আলোচনা করছি এই সময় আমাদের কংগ্রেস জাতীয় বাহিনীর জীবন এসেছে দেখা করতে—সে কলকাতায় চলে যাচ্ছে পরদিন প্রাতে। তাকে একটু বসতে বলাম। হাতের কাজটা শেষ করে নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইব। তখন বোধ করি সাড়ে পাঁচটা কি পৌনে ছ'টা হবে, এক বন্ধুর কাছ থেকে টেলিফোন এল,—মহাত্মা গান্ধীকে একজন শিক্ষিত হিন্দু গুলি করে মেরে ফেলেছে—পর পর তিনটি গুলি করেছে। ঘরের সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল 'কি সর্ব্বনাশ হ'লো!'

মুহূর্ত্তের মধ্যে চোখের সব জ্যোতি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। রাস্তায় জনতার স্রোত চলেছে বিরলার বাড়ীর দিকে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত ও অরুণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মত আমরা সেই রাত্রে বিরলার বাড়ী গেলাম, ফিরে এলাম এবং পরদিন জন মহাসমুদ্রের মধ্যে যমুনার তীরে সারাদিন কাটিয়ে মহাত্মার দেহ ভস্মীভূত হবার পর রাত্রে বাড়ী ফিরে এলাম। দাঁড়িয়ে দেখেছি চোখের সামনে—তাঁর নশ্বর দেহ ক্রমে ক্রমে ভস্মীভূত হ'লো। কিন্তু অনুভূতিতে উপলব্ধি হচ্ছে তিনি রয়েছেন। তিনি নাই বায়ুবায় বুদ্ধি তাই নিয়ে আপশোষ করছে, ম্রিয়মান হচ্ছে, অথচ অন্তরের অনুভূতিতে তিনি তেমনি সত্য হয়ে আছেন যেমন পূর্ব্বে ছিলেন। মনে হ'লো গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন "নমে ভক্ত প্রণশ্যতি" আমার ভক্তের বিনাশ হয় না। শ্রীভগবানের বাণীর মর্ম্ম অনুভব করতে থাকলাম। 'নমে ভক্ত প্রণশ্যতি' মহাত্মা মরেন নাই—তিনি বেঁচে আছেন ভারতের সকল নরনারীর চিত্তে।

এক বৎসরের কিছু অধিককাল যাবৎ নোয়াখালী আসবার কিছু আগে থাকতে মহাত্মাকে বাঙ্গালার কথা বলতে শুনেছি—আরও অনেকে শুনেছেন—বাংলার উপর তাঁর ভরসার কথা। তাঁর নিজের ভাষা নিয়ে তিনি বলেছেন "বাংলা জাগলেই ভারত জাগবে।" বাঙ্গালী 'ভারত আত্মাকে জাগাতে পারলেই ভারত তার আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পাবে—আর সেই ভারতবর্ষই হবে জগতের পথপ্রদর্শক। আজকের এই হিংসা ও ক্রূরতার মধ্যে নিমজ্জমান বিশ্ব-মানব-সমাজকে অমৃতময় মানবজীবনের সন্ধান ফিরিয়ে দেবার মহান দায়িত্ব বিধাতা ভারতবর্ষের স্কন্ধে অর্পণ করে রেখেছেন। হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে সেই অমৃতের অধিকারী করে তোলবার জন্য অলক্ষ্য থেকে বিধাতাপুরুষ কাজ করে চলেছেন। ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন—একবার অসামান্য বিমাচল—সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনি সেই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করে একসূত্রে বেঁধে রামরাজ্যের গোড়া পত্তন ক'রে গিয়েছিলেন। ক্ষুদ্রস্বার্থের মানুষ একটানা সেই আদর্শ নিয়ে বেশী দূর এগোতে পারল না। বিধাতাপুরুষ কিন্তু ভারতবাসীকে ত্যাগ করলেন না। আবার এলেন শ্রীকৃষ্ণ, আবার ভারতবর্ষ তার সাধনা ফিরে পেল—শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে আত্মসম্বিৎ তার ফিরে এলো। আবার পড়ে গেল ভারতবর্ষ তার আদর্শ থেকে—আবার এলেন বুদ্ধ—আবার ভারতবর্ষ এগিয়ে চললো বিশ্বমানবের জন্য তার বার্ত্তা নিয়ে। আবার পড়ে গেল—এলেন শঙ্করাচার্য্য—এবার ভারত কিন্তু তার নিজের আত্মচেতনা আর

ফিরে গেলো না। যে শঙ্কর ৩২ বৎসর বয়সে পায়ে হেঁটে সমস্ত ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করলেন—সমস্ত শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করে তার ভাষ্য, টিকা, টিপ্পনী লিখলেন ভারতবর্ষের আত্ম-চেতনা ফিরিয়ে আনবার জন্য, ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য—সেই ভারতবাসী ঠাউরিয়ে নিলে শঙ্কর বলেছেন সংসার মিথ্যা—একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। কেউ ভাবলে না একবার যে এই মহামানব সংসারটাকে যদি একটা মায়া, মিথ্যা দুঃস্বপ্ন বলেই জেনেছেন, তাহ'লে সেই দুঃস্বপ্নের জন্য এত মাথা ব্যথা কেন? কেন সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করা—কেনই বা মঠস্থাপনা, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তৈরী করা, কেনই বা শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করা। একটা দুঃস্বপ্নের জন্য এত সব কাণ্ড অতি বড় পাগলেও করে না। ভারতবর্ষের পতনের জের তখনও ব্যাহত হয় নাই। এলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। তিনিও কেঁদে কেঁদে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করলেন—কেউ চিনতে পারল না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলে গেছেন—মহাপ্রভুর সমজদার মাত্র ছিলেন সাড়ে তিনজন।

ভারতবর্ষ দুর্দ্দশার চরমের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। সর্ব্ব পাপের মধ্যে প্রধান পাপ পরাধীনতা এসে গ্রাস করল আমাদের।

পরাধীনতার মহাপঙ্কের মধ্যেও বিধাতা পাঠালেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে, পাঠালেন বিবেকানন্দকে—এলেন আমাদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাপ্রাণ দেশবন্ধু, শেলাম আমরা ভারত-আত্মার বাণী মূর্ত্ত শ্রীঅরবিন্দকে—আর ভারতের জনতার চিত্তে চিরন্তন অমর ভারত-আত্মাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলবার জন্য আমরা পেলাম আমাদের মধ্যে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীকে।

মহাপুরুষ যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন সে জাতি ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। যে ভূমিতে বারবার মহাপুরুষ আসেন সেই ভূখণ্ড পবিত্রের চাইতেও পবিত্রতম সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতি যদি আপন নিয়ন্তাকে না চেনে, তা হ'লে সে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তও নিদারুণ হয়।

ইহুদীরা খ্রীষ্টকে মানবের পথপ্রদর্শক বলে চিনতে পারল না। তাঁকে ক্রুসবিদ্ধ করে মারল, আর সেই যুগের ইউরোপীয় বর্ব্বরেরা হায় হায় করে কেঁদে উঠল সেই নিদারুণ সংবাদে যে মহামানব ভগবানের পুত্রকে ক্রুসবিদ্ধ করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইহুদীরা আজও সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চলেছে, আর ইউরোপের সেই বর্ব্বরেরাই পৃথিবীর নেতৃত্ব পেয়েছিল।

ভারতবর্ষ শঙ্করকে না চিনে, মহাপ্রভুকে না চিনে, মহাপাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত করেছে। ভগবানের অপার অনুগ্রহ পিতৃপুরুষের অজস্র তপস্যার ফলে সেই সব পাপের বোঝা আমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন—ভারতবর্ষকে পরাধীনতার পাপ থেকে মুক্ত করে—স্বাধীন করে দিয়ে গেলেন শ্রীভগবানের বরপুত্র নিষ্ঠার অবতার, কর্ম্মের প্রতীক, অহিংসার মূর্ত্ত বিগ্রহ মহাত্মা গান্ধী। জীবনে যা দিয়ে গেছেন তিনি, আততায়ীর হস্তে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দিয়ে গেছেন তার লক্ষ গুণ। মহাত্মার জয় হোক্, ভারতের জয় হোক্, বিশ্বমানবের জয় হোক্!

উপসংহারে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি উপন্যাস গ্রন্থের ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতের সংস্কৃতি'তে তুলে দিয়েছেন, সেইটি আলোচনা ক'রে কথা শেষ করছি।

রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল চ'লে চ'লে ক্লান্ত হয়ে যখন বিশ্রামের জন্য ঘরে ফিরে চলেছেন, তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র পর-পর পাঁচবার তাঁকে বললেন—

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।"

চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীর অন্ত নেই, যে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠজন হলেও ক্রমে নীচ (পাপ) হতে থাকে, অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

"পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে চলে, দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তার আত্মা দিনে-দিনে বিকশিত হতে থাকে, এই তো মস্ত ফল। তারপর তার চলার শ্রমে চলবার পথে তার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হয়ে পড়ে ঝরে। পাপের সমস্যার জন্য আর তার বৃথা মাথা ঘামাতে হয় না। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

"আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে বসে থাকে তার ভাগ্যও থাকে বসে, যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও চলে এগিয়ে। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

"কলি শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

ঘুমিয়ে থাকাটাই হ'ল কলিকাল, জাগলেই হল দ্বাপর, উঠে দাঁড়ালেই হল ত্রেতা, এগিয়ে চলাই হল সত্য যুগ। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলাটাই হ'ল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, চেয়ে দেখো ঐ সূর্য্যের আলোক সম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

রাষ্ট্র পিতা! জেগে ওঠ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

যুগে যুগে বাণবিদ্ধ ক্রুশবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ হয়ে
মানব কল্যাণে তুমি আপনারে করে গেলে দান।
হে ক্ষমা সুন্দর শিব! দুস্সিহ অত্যাচার সয়ে
দ্বন্দ্ব-দ্বেষ হলাহল হাসিমুখে করিয়াছ পান।
মানবের প্রতি তব এত কৃপা! এত ভালোবাসা!
জীবের বেদনা লয়ে শিশুসম করেছ ক্রন্দন।
তোমার রচিত পূণ্য তোমাতেই পেলো ভাব-ভাষা,
হে অসীম! লীলাচ্ছলে নিয়েছ যে সীমার বন্ধন।
অশ্রু লেখা রচিতেছে নিখিলের দুঃখ ইতিহাস
স্বার্থোদ্ধত দানবীয় অত্যাচারে হিংসা-রাত্রিতলে:
তুমি দেখা আলো দিয়ে আপনারে করেছ প্রকাশ
শান্তি প্রেম সাম্য মৈত্রী শুনাইতে নর-পশুদলে
মৃদুহাসে করিয়া ভৃত্য দেখাইয়া অনন্ত বিভূতি:
লীলার মাহাত্ম্য বটে। দানবেরে করিয়াছ স্তুতি।

এবার এসেছ তুমি দ্বাপরের লীলাক্ষেত্রে তব
স্বর্জ্জরের মৃত্তিকায় মর্ত্ত্যকায়া রচিয়া আবার;
সত্যতা সঙ্কট পথে অবতার রূপে অভিনব,
প্রতীকারহীন রাত্রি দিন যেথা চিত্ত হাহাকার
মর্ম্মান্তিক বেদনারে করিছে বিস্তার—সে ভারতে
সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চীর বাস পরি' শীর্ণ দেহে
করিয়াছ ত্রাণ মৃত্যুলিপ্তা জননারে কারা হতে।
ঐশ্বর্য্যের তুলসম ঠেলে দিয়ে রহি পর্ণ গেহে
সমাজে পতিত যারা রাজপথ-কুক্কুরের সম
তাদের টেনেছ বুকে করুণায় হে পুরুষোত্তম!
তুমি কি দিবে না সাড়া? চিতাবহ্নি জ্বলে যমুনায়,
প্রার্থনা-প্রাঙ্গণে আসি হৃদয়ের কাঁদে কিন্নর!
কীর্ত্তির হিমাদ্রি তব বৈজয়ন্তী-সঙ্গীত শুনায়
কথা কও! কথা কও! হে প্রেমিক! নির্ভীক দুর্জ্জয়!
দিনে দিনে নব নব রূপে তুমি পরিক্রমা করি'
নিখিলের চিত্ত তটে বেণু তব বাজায়েছ বনে;
বর্ষে বর্ষে ঋতুগণে লাবণ্য দিয়েছ তব ভরি'
শত শত শতাব্দীর অশ্রুসিক্ত বিস্মৃত প্রদোষে।
নহেক সম্ভব কভু বহ্নি দিয়া বহ্নি নির্ব্বাপন,
এই সত্য প্রচারিয়া অহিংসায় করেছ সাধন।
ভারতের হে ভাগ্য বিধাতা! জাতির জনক তুমি,
অশোক কানন হ'তে জানকীরে করেছ উদ্ধার।
তোমার প্রয়াণে আজি ভাগ্যহীনা মোর জন্মভূমি,
জন্ম যবনিকা প্রান্তে নেমে এলো ঘন অন্ধকার।
নিঃশব্দে চরণ ফেলে চলে গেলে অভিমান করে,
করাল নিশীথ ছায়ে বিভীষিকা বিথারেছে বায়ু:
বিষন্ন হোলো যে বিশ্ব, ধরণীর পূর্ব্ব দ্বারে ঝরে
অশ্রুধারা অবিরল—আজ তুমি কোথা অমিতায়ু?
এখনো যাতক বৃন্দ এ রাষ্ট্রের রক্তলোভাতুর,
রাষ্ট্র পিতা! জেগে ওঠ, কাণ পেতে শোনো আর্ত্তস্বর।

শ্রেষ্ঠ মানব

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী—এ বিশ্ববাণীমুখর আজ নর-জগত। প্রিয়জন-বিরহে আবেগের উৎস-মুখ হ'তে যশোগান উৎসৃষ্ট হয়—আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব স্বর্গতের গুণকীর্তন করে, গুণাবলী একটু অতিরঞ্জন করে। সে অত্যুক্তি অশোভন বা মিথ্যা নয়। কারণ সে কথা শোকাচ্ছন্ন ভাবপ্রবণ চিত্তের উচ্ছ্বাস। চিতার আগুন মিত্রের বহু দোষ ভস্মীভূত করে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে শত্রুর গুণরাশির বিলোপ করে।

আত্মীয় বিয়োগ চোখে যে জল আনে, তা পবিত্র। সে শোক নিবিড় ও গভীর। নিজের লোকের তিরোভাব-জনিত মর্মব্যথা একান্ত নিজস্ব। মানুষের জীবনের কর্মধারা হয়তো পরিবর্তিত হয়, ব্যাহত হয় পরমাত্মীয়ের বিয়োগে। শোকার্তের পূর্ণ সত্তাকে অভিভূত করে সে বিরহ-বেদনা।

শ্রেষ্ঠ মানবের মহাপ্রয়াণ বিশ্বের শোক। তেমন শোক মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রণায়িত করে। মানুষের মনকে নিজের স্বার্থের কূপ হ'তে উদ্ধার করে। তার সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে বিস্তার করে। সে শোকাবেগের অন্তরালে থাকে বিচারবুদ্ধি—একের নয় বহুর সিদ্ধান্ত। কলাকাষ্ঠাদিরূপে পরিণামপ্রদ কালেরও সীমার রেখা প্রলম্বিত হয়। প্রায় কুড়িশতক পূর্বের দুরন্ত দুর্ঘটনা, প্রভু যীশুর নির্যাতন আজিও বিশ্ববাসীর পূতচক্ষু অশ্রুপ্লুত করে।

বিশ্বজনের নিবিড় শ্রদ্ধা মাত্র তো আবেগ নয়। মহাত্মার মহাপ্রয়াণের শোক বিচারমূলক উচ্ছ্বাস। এর ব্যাপ্তির অন্তরে অবশ্য হারাণোর স্বার্থ-বোধ আছে। কিন্তু যে স্বার্থের গণ্ডী বহুকে বেষ্টন করে, সে স্বার্থের পটভূমি পরার্থবোধ। দেশের কি হবে, দশের কি হবে, জগতের কি হবে, এ যুগের ও অনাগত যুগের মানব জাতির কি দুর্দশা হবে—এ সব ভাবনা আছে মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব-জনিত মনোবেদনার অন্তরালে। তাই এই বিশাল শোকোচ্ছ্বাস মানুষের আত্মাকে প্রণায় করেছে, বসুধার সকলকে কুটুম্ব ভাবতে শিখিয়েছে, মানবপ্রকৃতিকে ঊর্দ্ধ জগতে উঠিয়েছে। মহাপুরুষ জীবনে যে আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে চান, তাঁর মরণে সে আদর্শ আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। সজ্ঞানের ক্ষণেক সম্বিতও তাই ভবার্ণব তরণের নৌকা। সে সঙ্ঘ দেবের সঙ্ঘ নয়, ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য নয়; সে ভাবের ছোঁয়াচ, মহান্ উদ্দেশ্যের অনুভূতি। একের ভাবনা অন্যের মনকে বিঁধতে পারে। মহাজনের মহচ্চিন্তা বহুর অন্তর ভেদ ক'রে আপনাকে বিকশিত করে, দেশ, কাল, পাত্রের যোজনীর বিলোপ সাধন করে। মহাত্মা গান্ধী বহুর চিত্তাসনে ভাবরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠতার এ এক লক্ষণ।

মহাত্মা গান্ধী মানব ছিলেন। অন্তরে মহাপুরুষ ছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু মানুষের মত সুখ দুঃখ, ভুলভ্রান্তি, সাফল্য নৈরাশ্যের অনুভূতি নিয়ে জন্মেছিলেন। সকল লোকের মত তিনি আবেগ, বিচার, শুদ্ধতা এবং কর্মক্ষমতা নিয়ে জীবন-পথে বিচরণ করেছিলেন। প্রত্যেক জীবনধারা যেমন ভাবে বহে, মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের স্রোতও তেমনি ভাবে বয়েছিল। তাই বিশ্ব মানুষ তাঁকে নিজেদের একজন জেনে, তাঁর সাথে কুটুম্বতার গৌরব স্পর্দ্ধায় আপনাকে উন্নত ভাবছে। যার জন্মে বংশ সমুন্নত হয় সে অভিজাত। তাই আজ চিন্তাশীল ও ভাবপ্রবণ, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ, সকল মানুষ তাঁকে বিশাল মানব-কুলের মানুষ ভেবে নিজেকে কুলীন ভাবছে। জ্ঞানদীপ্ত পণ্ডিত, আর যুগ-যুগান্তর নির্যাতীত ভাষী উভয়েই গান্ধীজির পরমাত্মীয়। সেদিন তারা উভয়ে একই শ্মশান-তীর্থে মহাত্মার দেহাবশেষের উপর পবিত্র অশ্রুধারা বর্ষণ করেছে। ইহাই গান্ধীজির মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের বিরাট প্রমাণ।

গান্ধীজি আদর্শবাদী ছিলেন। বলেছিলেন জগতকে ভালোবাসো, অন্তর হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশো। বরণীয়, স্মরণীয় বহু সাধু, সন্ত, অবতার, পয়গম্বর তেমন কথা বলে গেছেন। আমার মাত্র স্বকর্ণে আজ সে ধ্বনি শুনিনি। অন্তরে অন্তরে, মজ্জায় মজ্জায় বুঝেছি, বিচার করে দেখেছি, প্রমাণ পেয়ে উপলব্ধি করেছি যে ক্ষমা করো, বিদ্বেষ-বিষ নাশো, মাত্র আদর্শবাদীর নীতি কথা নয়।

এগুলি বাস্তব-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার নিয়ম। অসাধ্য সাধনার জন্য মন্ত্র নয়, অহিংসা সত্যটি। এমন মানুষ আমাদেরই মাঝে ছিলেন যিনি এই মন্ত্র সাধনায় অমোঘ ফল লাভ ক'রে মাহাত্ম্য অর্জন করেছেন। ভাব ও কর্মের সমন্বয় সম্ভবপর, ভাব যতই কেন সুউচ্চ হ'ক না। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ মানব।

গান্ধী-নীতির বিপরীত কর্মপদ্ধতি সত্যানুসন্ধী মানব সমাজে নিজের পরাজয় সপ্রমাণ করেছে। হিংসাবাদের ধ্বংসের উপর অহিংসা নীতি ধীরে ধীরে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট।

কায়মনোবাক্যে মানুষকে অহিংসা মন্ত্রের সাধনা করতে হবে—নীতি বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-হিসাবে এ বিচার উৎকৃষ্ট। এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল। চিরদিন এ তত্ত্বকে মানুষ ব্যক্তি-ধর্মের মূল হিসাবে স্বীকার করেছে। এ মন্ত্র সাধবার জন্য সাধুরা সঙ্ঘ রচনা ক'রে, আসুরী ভাবপূর্ণ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেছেন সব দেশে, সকল যুগে। বৌদ্ধ খৃষ্টীয় বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মের সার এই অহিংসা নীতি। নিজ নিজ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সজ্জনেরা মঠ, মোনাষ্টারী, নানারী প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতেন। অহিংসা মন্ত্রের গৃহী সাধকও সাধ্যমত সংসারের কুৎসিৎ কলহ-মুখর দিক্ হতে আপনাকে দূরে রাখবার চেষ্টা করত। বৈষ্ণব গৃহীর আদর্শ ছিল—মেরেছ কলসীর কানা—তা বলে কি প্রেম দিব না।

সনাতন নীতি, সাম্যবাদ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্র স্বাধীনতা উচ্চ আদর্শ। যার দেহ মন সামাজিক বিরুদ্ধধর্মী শোষকের ইচ্ছাধীন, তার পক্ষে কোনো সাধনা সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যে এ আন্দোলন কয়েক শতকে যতটুকু লাভ করেছে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার—এ নীতিতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে অষ্টাদশ শতকে ফরাসী, মার্কিন, ইতালী প্রভৃতি দেশে নর-শোণিতের স্রোত বয়েছে। এ দেশের কবিরাও নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে বুঝিয়েছেন—স্বাধীনতাহীন জীবন মৃত্যুর নামান্তর। বহু শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামে—রক্তের বদলে রক্ত দিয়েছেন ও নিয়েছেন।

সমষ্টিরূপ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অহিংসাবাদের সাধনায় লাভ করা যায়, এ সত্যের জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। এই তাঁর বিশেষত্ব, এইটি তাঁর সত্যপথের পরীক্ষা। যা' ব্যষ্টির পক্ষে সম্ভবপর, সে নীতি সমষ্টির হিতকর এবং আয়াসসাধ্য—এই গান্ধী নীতি ধীরে ধীরে দেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠার নিরত হ'ল। গান্ধী মহাত্মা। মহাজন যে পথে চলে, সেই পথ—তাঁর দেশের প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বের বর্ণিত এ নীতি তিনি মানতেন। কিন্তু এ পথের মহাপুরুষ কোথায়? তিনি তাঁর গুরুজী রবীন্দ্রনাথের উদাত্তস্বর শুনলেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে। তিনি বুকের পাঁজর আলিয়ে নিয়ে একেলা চললেন। তিনি পথ আবিষ্কার করলেন—তাঁর প্রদর্শিত পথ হ'লো মহাজনের পদরজঃপূত পথ। তিনি মন্ত্র দিয়ে ক্ষান্ত হ'লেন না। নশ্বর শরীর পতনের আশঙ্কা তাঁকে মন্ত্রের সাধনার ক্লেশ হ'তে বিরত করলে না। তিনি আদর্শ নেতার মত জনতাকে বল্লেন—এসো, পিছনে এসো। পিছনে থেকে তিনি অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা দিলেন না কাকেও।

অহিংসা এবং সশস্ত্র বিদেশীর কবল হ'তে নিরুপদ্রবে দেশোদ্ধার অসম্ভব—এ দুটি পরস্পর বিরোধী নীতির সমাধান করলে গান্ধী নীতি। যুদ্ধ শেষ করবার যুদ্ধ নতুন ক'রে সমর শিখা জ্বালাবার ইন্ধন সংগ্রহ করেছে। গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনী সবাই যুদ্ধ ক'রে, রক্তের পথে জয়যাত্রা ক'রে স্বাধীনতা অর্জন ক'রেছিলেন। যাঁরা সে সময়ে জীবন দান করলেন, বিজয়ের দিন এ মর-ভূমিতে তাঁরা স্বাধীনতার সুফল উপভোগ করতে পারলেন না। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ শক্তিতে স্বাধীনতা লাভ করলে ভারতভূমির। বহু শহীদ প্রাণ বিসর্জন করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে রক্ত-লোলুপতা পরাস্ত করেছে বিপক্ষ শোণিত-পিপাসুকে। গান্ধী-অনুসৃত প্রতিহিংসা বিষ ছড়ায়নি জগতে। অথচ অহিংসা-নীতি সাফল্য লাভ করেছে স্বাধীনতা অর্জনের সকল সংগ্রামে।

গান্ধীর যে শ্রেষ্ঠ নীতি সে কথা সকল মানুষ বুঝবে গত মহাসমরের ইতিহাস পর্য্যালোচনায়। অসংখ্য লোকক্ষয় হয়েছে, অজস্র অর্থনাশ হ'য়েছে, অথচ বিদ্বেষের বীজ বিনষ্ট হয়নি, কোনো যোদ্ধার কামনা সিদ্ধ হয়নি। আজ জগদ্ব্যাপী বুভুক্ষা অনাহার এবং অনির্দ্দেশের

ভূমেলিকার ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন। তাই বিচারবুদ্ধি যাচাই-করছে অহিংসার আদর্শ। চির-লাঞ্ছিত, প্রবলের অবহেলা-জর্জরিত নিঃসহায়, গান্ধীজির মহান্ অন্তঃকরণের অকৃত্রিম সৌহার্দের গৌরবে গৌরবান্বিত। চিন্তাশীল বুদ্ধিমানের জগত তাঁর নীতির প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে স্তম্ভিত। আর এই উভয় শ্রেণীই লক্ষ্য করেছে যে গান্ধীজির নীতি সুধা মাত্র বচন সুধা বা শাস্ত্রের সূত্র নয়। এ আদর্শ বাস্তবে পরিণত করবার জন্য মহাত্মা নিজের শক্তিকে আপ্রাণ নিয়োজিত করেছিলেন। কথা ও কাজের এমন সমন্বয়, দেহের সঙ্কুচিতার কঠোর নির্বাসন মানুষের চিত্তকে বহুযুগ এমন বশী করেনি। তাই আজ সারা বিশ্বের অন্তরের জ্যোতি কেন্দ্রাভূত সে তপঃক্লিষ্ট, ক্ষীণতনু-ধীর মুখ, প্রহৃষ্ট-চেতা, পরার্থপর, জ্ঞান যোগী, কর্ম যোগী, ভক্তি যোগীর মহাপ্রয়াণের অরুণ পথে।

আর তাঁর দেহের নিধন? নিষ্করুণ মর্মভেদী, পৈশাচিক লীলা। জগত তাই সমকণ্ঠে বিস্ময়ে, বিষাদে, ক্ষোভে ও বেদনায় তাঁর বর-মুখের শেষ কথার প্রতিধ্বনি করে বলছে—হায় রাম।

মহাবলি

নরেন্দ্র দেব

তোমারে যে হত্যা করিয়াছে
তার'পরে করিব না ক্রোধ
অপরাধ কত গুরুতর
জেনেও লব না প্রতিশোধ।
তুমি বলিয়াছো বারে বারে
দোষীরে করিতে হেলে ক্ষমা,
অন্তরেতে বিরাগ বিক্ষোভ
তিলমাত্র না রাখিতে জমা।
তোমার শ্রীমুখে প্রতিদিন
শুনেছি এ অমোঘ নির্দেশ—
'ভালবেসে শত্রু করো জয়,
দাও তারে প্রেমের আশ্লেষ।'

জানি জানি তোমার সে বাণী
কেহ মোরা করিনি পালন,
লজ্জা মানি মনে পড়ে যেই
আমাদের মূঢ় আস্ফালন :—
অহিংসা তাহার ক্লৈব্য নীতি,
বীর-ধর্ম—শত্রুর বিনাশ ;
ক্ষমায় যে যোগ্য নহে তারে
ক্ষমা করা মহা সর্বনাশ।

প্রতিহিংসা জীবের স্বভাব,
আঘাতের প্রত্যাঘাত চায়,
রুদ্ধ রোষে তারা ফোঁসে যারা
একান্ত দুর্বল নিরুপায়।

তুমি শুনে স্মিত হাস্যে শুধু
বলেছিলে—ভ্রান্ত মোর ভাই,
অহিংস সৈনিক হ'তে হলে
অগ্রণের বীর্য থাকা চাই।
উদ্যত নিধনে আততায়ী,
অস্ত্রমুখে অগ্রসর হ'য়ে,
বুক পেতে দিতে হবে তাকে
অকম্পিত নির্ভীক হৃদয়ে।
তুমি ছিলে যেন শ্রেষ্ঠ বীর,
আপন আদর্শে অবিচল,
প্রাণ দিলে প্রেমের প্রচারে,
মৃত্যু তব হবে কি নিষ্ফল?

সৃষ্টির অনাদি কাল হ'তে
জগতে চলেছে হানাহানি,

সেই হিংসা বর্ব্বরতা 'পরে
মহামানবেরা দেছে টানি
যুগে যুগে প্রেম ধ্বনিকা,
বলেছে বাসিতে সবে ভালো,
ছড়ায়েছে জ্ঞানদীপ আলি
শান্তির নির্ম্মল শুভ্র আলো।
নতুবা প্রভের রথে কোথা
অরণ্যের পশু সাথে তার,
সভ্যতার সেই ত সাধনা—
পশুত্বের উর্দ্ধে উঠিবার।

তোমার এ হত্যা নহে কভু
অভাবিত দৈবাপদ কিছু,
ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কোনো
আক্রোশ নাহিকো এর পিছু।
অত্যাচল পথযাত্রা তুমি
জীবন সায়াহ্নে অকস্মাৎ—
তব হত্যা ইতিহাসে পুনঃ
রচি দিল আদর্শ সংঘাত।

হিংসা আর অহিংসার মাঝে
ধরণী দুলেছে বার বার,
বুদ্ধ খৃষ্ট জৈন মহাবীর
শ্রীচৈতন্য সাক্ষ্য বহে তার।

জীবন ধারণ করি মোরা
লক্ষ প্রাণী হরি' নিশিদিন,
যুদ্ধ আর হত্যা পাপ কিনা—
প্রশ্ন ইহা শাশ্বত প্রাচীন।
সহস্র সভ্যতা গেছে ধীরে
অনন্ত কালের গর্ভে ডুবে,
দেবতা অসুরে যুগে যুগে
যুঝিয়াছে পশ্চিমে ও পূবে,
সমস্যা ঘোচেনি তবু আজো,
মেলেনি সংশয়ে সমাধান,
সে দম্ভ মেটাতে কিগো আজ
দিলে নিজ প্রাণ বলিদান?

আমি সুখী হয়েছি

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজীর মৃত্যুতে আমি সুখী হয়েছি।

আমার এই লাইনটা অনেকের শ্রবণে সূচীবিদ্ধ করবে—প্রাণে বেদনার ঘা দেবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে এর চেয়ে নির্লজ্জ উক্তি করা বুঝি বাতুলের পক্ষেই সম্ভব।

আমার বলবার কথা: নোয়াখালীর ঘটনা থেকে সুরু করে অমৃতসর কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনার কথা স্মরণ করুন। হাজার হাজার ধর্ষিতা নারীর চাপা দীর্ঘশ্বাস, লক্ষ লক্ষ পতিপুত্র হারার আকুল ক্রন্দন, কোটি কোটি গৃহহারার করুণ আর্ত্তনাদ প্রতি পলে পলে "ইথারে" ভেসে এসে বিঁধছিল ঐ দীর্ঘ কৃষ্ণের অন্তরের অন্তস্তলে। হৃদয়ের রক্তক্ষরণের তাই বিরাম ছিল না। বন্ধুর মত মৃত্যু এসে আজ বন্ধ করেছে সে রক্তক্ষরণ, নির্ত্তর দিয়েছে সেই বিরতিহীন আলাকে। গান্ধীজীর জীবাত্মা আজ আর দুঃখ ভোগ করছে না—এ জন্যে আজ আমি সুখী হয়েছি।

গান্ধীজীর মৃত্যু মৃত্যুটা জগতে অতি দুর্লভ।

যেখানে যাদের পাপকে বিদ্ধ করে অবতার শ্রীকৃষ্ণ করলেন দেহ রক্ষা, যেখানে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে অবতার যীশুখৃষ্টের হল মহাপ্রয়াণ, সেখানে অবতার গান্ধী যদি রোগে ভুগে যেতেন তাহলে এই মৃত্যুটাই হ'ত তাঁর সারা জীবনের একটা ব্যর্থ পতন।

মৃত্যু বাদের শ্রীকৃষ্ণের দেহ হতে রক্ত ঝরেছে, রক্ত ঝরেছে যীশু খৃষ্টের দেহ হতে। অবতার গান্ধীর বেলাও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

লক্ষ লক্ষ সন্তানের রক্ত দিয়ে জাতির জনক তাহলের ঋণমুক্ত আদেন নি—তাই স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ নিজের রক্ত দান করে গেলেন।

যুগে যুগে যাঁর আসা সম্ভব তিনি এসেছিলেন। কাজ শেষ করে তিনি আবার চলে গেলেন। যে দেবলোক থেকে মহাত্মা এসেছিলেন তিনি আবার ফিরে গিয়েছেন সেই দেবলোকে। এই শোক দুঃখ জ্বালা ধূলিলুব্ধ পৃথিবীর বন্ধনে তাঁর জীবাত্মা আজ আর কষ্ট পাচ্ছে না—এই জন্যে এই মহামানবের মহাপ্রয়াণে আমি সুখী হয়েছি।

গান্ধীজীর সাধনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

"যারা আমার প্রতি দোষারোপ করে তাদের প্রতি আমি ক্রুদ্ধ না হই যেন। তাদের হাতে আমার মৃত্যু হ'লেও আমি যেন তাদের অমঙ্গল কামনা না করি। ঈশ্বর যেন আমাকে সেই মানসিক শক্তি দেন।"

এ উক্তি মহাত্মা গান্ধীর উক্তি। এই তাঁর অন্তরের বাণী, এই তাঁর জীবন সাধনার মূলমন্ত্র। কায়-মন এবং বাক্য দ্বারা তিনি এই বাণীকে পৃথিবীর ইতিহাসে জ্যোতির্ময় রূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেলেন। বুদ্ধিবাদসম্মত সকল হিসাব নিকাশ এবং সকল সংশয়ও প্রশ্নের ঊর্দ্ধে স্থান লাভ ক'রে এই বাণী এবং এই সাধনা অশান্তি ও মৃত্যুশঙ্কাজর্জ্জরিত মানুষের সমাজে শান্তি ও অমৃতের স্পর্শ দিয়ে গেল; কায়ার বিলুপ্তি সত্ত্বেও অমরত্ব লাভ করলেন মহাত্মা। মানুষের মনে সত্যবান রূপে নবজীবন লাভ করলেন, অমিতাভ বুদ্ধের জাতকোপাখ্যানে তিনি যোজনা করলেন নূতন আখ্যান, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মত তিনি আবির্ভূত হয়েছেন সকল অন্তরে। রক্তাক্ত বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তিনি শুভ্রতার মহিমা, দুঃখের পৃথিবীতে তিনি অনন্ত সান্ত্বনার সন্ধান দিয়ে গেলেন তাঁর ওই শুভ্রতার মহিমায়। হিংসা ও অহিংসার চিরন্তন সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। হিংসা চিরদিনই তার স্বভাব ধর্ম্ম অনুযায়ী হত্যার মধ্যে মৃত্যু দিয়ে অহিংসাকে বিলুপ্ত করতে চায়, কিন্তু মৃত্যুর মধ্যেই অহিংসা অমৃতকে লাভ করে মানুষের সমাজে প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠিত করে আপনার মহিমায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহী গান্ধীজী এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যাগ্রহী মহাত্মাজীর অহিংসা সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও বহুজনের মনে প্রশ্ন এবং সন্দেহ ছিল। মহাত্মাজীর পূর্ব্বে অহিংসার সাধক যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জীবন সাধনাকে প্রযুক্ত করেন নি। কোন একটি জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন সংগ্রামে এবং আত্মিক কলুষ মুক্তির তপস্যায় এক সঙ্গে নেতৃত্ব করতে হয় নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্র মিথ্যাবাদের ঊর্ব্বরতায় সুফল দিয়ে থাকে। সেখানে মিথ্যার আশ্রয় ভিন্ন সাফল্য অর্জ্জন অসম্ভব; মারণাস্ত্র এবং সৈন্যবলই একমাত্র শক্তি। সেই কারণেই গান্ধীজীর এই সাধনা সত্যই অকপট জীবন সাধনা অথবা কৌশলময় রাজনৈতিক ছলনা—এ নিয়ে প্রশ্নের এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টির তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সীমা ও অবধি ছিল না। গান্ধীজী গুলীর আঘাতে হত হয়ে সকল প্রশ্ন ও সন্দেহের নিরসন ক'রে গেলেন। আততায়ী পর পর তিন বার তাঁকে গুলীর আঘাত হেনেছে। গান্ধীজী তিন তিনবার মৃত্যুযন্ত্রণাদায়ক আঘাতের সকল প্রতিক্রিয়াকে অতিক্রম ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন। ক্ষত স্থান চেপে ধরেন নি, চীৎকার করেন নি; আততায়ীর প্রতি ক্ষণিক ক্রোধেও তিনি আচ্ছন্ন হন নি, কৃতাঞ্জলি হয়ে আততায়ীকেই তিনি সপ্রেম নিবেদন ক'রে গেলেন—'হিংসাকে সম্বরণ কর'। নিবেদন করেছিলেন —'হে রাম আততায়ীকে তুমি ক্ষমা কর।'

গান্ধীজী নাই। তাঁর অভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ দুর্ব্বলতা অনুভব করছে, অপরিমেয় দুর্ব্বলতা। যুদ্ধক্ষেত্রে হত-নায়ক সৈন্যবাহিনীর মত চকলতায় ভারতবর্ষ আজ চঞ্চল। আকস্মিকভাবে পিতৃহীন সংসার অনভিজ্ঞের মত অসহায়তা অনুভব করছে। অন্ধকার রাত্রে দুর্গমপথের যাত্রীদলের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার মুহূর্ত্তটিতেই পুরোভাগবর্ত্তী উজ্জ্বলতম দীপশিখাটি নির্ব্বাপিত হয়ে গেলে যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়—সমগ্র ভারতবর্ষের মনের অবস্থা ঠিক সেই রূপ। আদমুদ্রহিমাচল আজ বিভ্রান্ত বিমূঢ়। আজ ভারতবর্ষ নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করছে যে, গান্ধীজীর সাধনার সঙ্গেই জড়িত ছিল তার ভাগ্য এবং সাধনা। গান্ধীজীর মধ্যেই ভারতবর্ষের আত্মার পুনরুত্থান মহিমা এবং নবজাগরণ শক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল মহামহিমায়। গান্ধীজীর জাগরণেই জাগ্রত হয়েছে সমগ্র দেশ। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা আমরাই সে মূর্ত্তিকে সহ্য করতে পারলাম না; আমাদের সহ্য শক্তি অপেক্ষাও বহুগুণ প্রখর সে মূর্ত্তির মহিমা, আমাদের ধারণ ক্ষমতা অপেক্ষাও বহুগুণ গুরুভার তাঁর অবস্থান—তাই আমরাই তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলাম।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত হ'ল—এ ফেলে দেওয়া। একটি মানুষের তিরোধানে সমগ্র ভারতবর্ষ থর থর ক'রে কেঁপে উঠল।

শুধু ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের জীবনে একটি সংঘাত দিয়ে গেল—গান্ধীজীর তিরোধান। বহুকাল ধরে তারা বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাঁকে উপেক্ষা করেছে। তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব ও মহিমাকে অপমানিত করতে চেয়েছে। ভোগবিলাসিতাসমৃদ্ধ শোষণপরিপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী তাঁর ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে ঘৃণা করতে চেয়েছে, ব্যঙ্গ ক'রে বলেছে—অর্দ্ধনগ্ন ফকীর। অনেকে তাঁকে বলেছে ভ্রান্ত। ভণ্ড বলে সন্দেহ পোষণ করেছে। আধ্যাত্মিকতায় অবিশ্বাসী কঠোর বস্তুতন্ত্রবাদীদের বিশ্লেষণে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল। দরিদ্রের কল্যাণ কামনা করলেও ধনীর অকল্যাণ করেন না ব'লে তাঁকে ভণ্ড ছদ্মবেশী ধনীর অনুচর অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হ'ন নি। আজ কিন্তু তাঁর এই জীবনদানে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁদের চিন্তা করতে হবে এবং তাঁর হৃদয়ের কল্যাণ কামনাকে স্বীকার করতে হবে। গান্ধীজীর অহিংসা সাধনার পরীক্ষা এতকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল বলে পৃথিবী তাকে স্বীকার করে নাই। এই সাধনায়—ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায়ই তাঁর স্বাধীনতা কামনায় সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে মুসলমান তাঁকে মিত্র বলে গ্রহণ করতে পারে নাই। বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তির প্রাক্কালে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যে রক্তাক্ত হিংসার আগুন জ্বলে উঠল তাতে হিন্দুর পাশে তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন নোয়াখালিতে, মুসলমানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন বিহারে, দিল্লীতে। সাম্প্রদায়িকতার সকল গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি সকল অত্যাচারিত মানবাত্মার ত্রাতা ও বন্ধুরূপে প্রতিভাত হ'লেন। কলকাতায় এবং দিল্লীতে অনশন ক'রে এই কৃশতনু মহামানব তাঁর স্বরূপকে উদ্ভাসিত করলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনীতিকে অতিক্রম ক'রে ভারতীয় রাষ্ট্রকে পাকিস্থানের প্রাপ্য অর্থ দিতে অস্বীকার করিয়ে তিনি সত্য ও ন্যায়ের উপাসক ব'লে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। অহিংসার সাধনায় ভারতের মুক্তি ও মুক্ত ভারতবর্ষের দুই যুদ্ধোদ্যত অংশের যুদ্ধোদ্যম থেকে নিবৃত্তির সার্থকতা দেখে বিশ্বের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হ'ল। তার অব্যবহিত পরেই তাঁর এই তিরোধান ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর জীবনের গভীরতম রূপটিকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিলে।

পৃথিবীর বুকে জীব-জীবনের স্তরে স্তরে উদ্গীত যে সাধনা মানুষের অন্তর লোকে চলেছে, ভোগ ও ত্যাগ, ক্রোধ ও ক্ষমা, বিদ্বেষ ও প্রেম, ক্ষুদ্রতা ও উদারতা, হিংসা ও অহিংসার মধ্যে দ্বন্দ্বের যে চিরন্তন প্রবাহ প্রবহমান মানুষের জীবন ধারার মধ্যে—তারই এক মহাপ্রকাশ ঘটল বিংশশতাব্দীতে দু-দুটি মহাযুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে মহাত্মাজীর জীবন প্রকাশের মধ্যে। বুদ্ধিগত বস্তুতন্ত্রবাদের প্রভাবের সুযোগে হিংসা, ভোগলালসা, বিদ্বেষ, ক্ষুদ্রতা যখন পৃথিবীকে করলে উন্মত্ত, অশান্তি জর্জ্জরিত, রক্তাক্ত, তখনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে মহাত্মাজীর অহিংসা, প্রেম, ত্যাগ ও উদারতার সাধনা সার্থকতা লাভ করলে মহামহিমায়। পৃথিবী বিস্মিত হ'ল উন্মুখ হল। যুদ্ধক্লান্ত, বস্তুতন্ত্রবাদী, আত্মার অবিশ্বাসী পাশ্চাত্য মানবসমাজকে অবশ্যম্ভাবীরূপে স্পর্শ করেছে, ক্ষণিকের আশ্বাসেও আশ্বস্ত করেছে এই মহিমা।

মহাত্মাজী আজ সমগ্র মানব সমাজের অন্তর দ্বন্দ্বের অহিংসা প্রেম ত্যাগ উদারতায় জীবন্ত প্রকাশ। কোন দেশ কোন ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন তিনি, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ভাবজগতের অধ্যাত্মের প্রতিনিধি। মানব ভাবনার আদিকাল থেকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ তিনি শুধু বর্ত্তমানের সমস্যাকেই সমাধান করতে চান নি, সকল কালের অর্থাৎ চিরন্তন কালের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের পূজা নিবেদিত হয়েছে মহাকালের উদ্দেশে, সে পূজা তিনি গ্রহণ করেছেন। মহাকাল বহন করে চলবেন তাঁর পূজা ও তাঁর মন্ত্র। পৃথিবী যখনই পীড়িত হবে তখনই তাঁর বাণীকে স্মরণ করবে, তাঁর পূজার পদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হবে। হয় তো আবির্ভূত হবেন নূতন সাধক; যিনি অভিহিত হবেন মহাত্মাজীর অবতার রূপে। মনীষী রোমা রোঁলা বলেছিলেন—"গান্ধীর আত্মা খৃষ্ট এবং বুদ্ধের মত নব-নব অবতারের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করবে।"

এই অবতারের জন্ম বস্তুতন্ত্রবাদের প্রবল প্রভাবের মধ্যে মানুষের গভীর অন্তরে একটি নিরন্তর তপস্যা চলছে এবং চলবে। জাগতিক সৃষ্টি এই মহাসাধনার সৃষ্টির আদি থেকে নিমগ্ন রয়েছে। ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব, বহির্লোক এবং অন্তর্লোকের দ্বন্দ্ব, শুভবুদ্ধি এবং হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, বস্তু এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নিঃসংশয়ে মানুষ আজ ঘোষণা করেছে সে চায় শান্তি, সে চায় সুখ। বস্তুতন্ত্রবাদ তাকে ভোগ সুখের সার্থকতা দিতে পেরেছে, কিন্তু তৃপ্তি দিতে পারে নাই, শান্তির সন্ধান তো বহুদূরে। শান্তির প্রতিষ্ঠার কল্পনা করে সে মারণাস্ত্রের সাহায্যে, আণবিক বিভূতির ধ্বংসাত্মক শক্তির সাহায্যে—এ কল্পনায় তারা নিজেই শিউরে উঠছে। প্রতিটি দেশ যদি আজ আণবিক শক্তির অধিকারী হয় তবে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ কারও নাই। ঠিক এই কালেই মহাত্মাজীর আবির্ভাবে বুদ্ধ যীশুর সাধনায় অভিনব মহিমায় এই প্রকাশ ইতিহাস অর্থপূর্ণ।

মানুষের অন্তর লোকের সাধনা বিলুপ্ত হয় নাই, ও ধারা বিলুপ্ত হবার নয়। যুগে-যুগে এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানুষ চলেছে তার সার্থকতার পথে চরম লক্ষ্যের দিকে, ব্যষ্টির মধ্যে অহিংসা পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই কিন্তু হিংসাকে সেখানে সকল শাস্ত্র সকল ন্যায় অস্বীকার করেছে। দল, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র শুধু তাকে গ্রহণ করতে পারছে না। মহাত্মাজী তাঁর সাধনাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সেই যুদ্ধে তাকে জয় যুক্ত করে, মানুষের এই সাধনাকে বিপুল বলে বলীয়ান ক'রে গেলেন; সেই তাঁর সর্বোত্তম জয় এবং সর্বোত্তম দান। ভাবী কালে নব অবতারের সাধনায় এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাবে শুধু ব্যষ্টির মধ্যে নয়—সমষ্টির মধ্যে; সমাজকে অতিক্রম ক'রে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হবে তার মহাপরীক্ষা।

অহিংসার ঋত্বিক্ মহাত্মাজী

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

১৯১৯-২০ সাল। তখন আমরা ষ্টেটপ্রিজনার হিসাবে রাজসাহী জেলে। রোজ রোদ্দুরে অমৃতবাজার পত্রিকা লংএর ক'রে পড়ি। দিনের পর দিন তখন দেখছিলাম নবজীবনের কি জোয়ার এল দেশে—রাওলাট আইন, খিলাফৎ আন্দোলন, পাঞ্জাবের অত্যাচার আর মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে! সবের পেছনে অবশ্য ছিল সমরোত্তর চাঞ্চল্য। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসে এলেন এবং আবেদন নিবেদনের কর্মসূচীর জায়গায় হাজির দিলেন একটা বিপ্লবী কর্মপন্থা, জাতের আত্মসম্মানবোধ জাগাবার মতো একটা কর্মপদ্ধতি। বিপুল উদ্দীপনায় সমস্ত জাত জেগে উঠ্‌লো।

খিলাফৎ-দাবীর সমর্থন উপলক্ষে ১৯১৯-২১ সালে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে বন্দী করবার বেলায় আমাদের অনেককে বলা হয়েছিল, সারাজীবনই কারাবাস ভোগ করতে হবে। ১৯১৮-১৯ সাল থেকে কিন্তু অনেকের মুক্তি শুরু হ'ল। আমরা যারা রইলাম, আমাদের তখন নিজেদের বন্ধুবান্ধবের ভিতর দিনের পর দিন আলোচনা চলেছে, জেল থেকে বেরিয়ে কি কর্মপদ্ধতি আমরা অনুসরণ করব। সিদ্ধান্ত হ'ল—শুধু মাত্র একটা গুপ্তসমিতির ষড়যন্ত্র দিয়ে এখনকার দিনে ভারতবর্ষের মতো একটা দেশের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। একান্ত গণ-আন্দোলনে আমাদের যোগ দিতে হবে। কংগ্রেস গণ-আন্দোলনের পথ ধরেছে। অতএব আমাদের কর্তব্য হবে, কংগ্রেসকে আর উপেক্ষা না ক'রে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া।

খালাস পেলাম নাগপুর কংগ্রেসের কয়েকদিন আগে। আমার আগে আমাদের ভূতপূর্ব সহকর্মীরা অনেকে খালাস পেয়েছিলেন, ময়মনসিংএর সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, চব্বিশপরগণার হরিকুমার চক্রবর্তী, বরিশালের অরুণ গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, উত্তরবঙ্গের যতীন রায়, খুলনার বিজয় রায়, হুগলির ভূপতি মজুমদার, কলকাতার গিরীন ব্যানার্জি, ফরিদপুরের পূর্ণ দাস, ঢাকার জীবন চাটার্জি, আরও অনেকে। বাঘাযতীন মুখার্জি, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র চাটার্জি, এবং এঁদের আরও কয়েকজন সঙ্গী তখনও পলাতক। নতুন কর্মীও তখন অনেকে জুটেছেন। এঁদের সবার তরফ থেকে আমার উপর ভার দেওয়া হ'ল নাগপুর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর আন্দোলনের মর্মকথা কি, তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য কি, বুঝে আসবার, অথবা বুঝে খবর পাঠাবার। প্রতি জেলার কর্মীরা তখন আবেগ-চঞ্চল হয়ে রয়েছেন; বেতাবের প্রতি আহ্বান এসেছে, তাঁরা জেলায় গেলে কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

নাগপুর মহাত্মাজীর শিবিরের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। কে একজন

হঠাৎ ছুটে এসে আত্মপ্রকাশ ক'রে ছাড়লো, ভূপেনদা! চেহারার একটা ডিসুতে পারি নাই, গলার স্বরে চিন্লাম—গোবিন্দ মিত্র। ১৯১৪ সালে উড়িষ্যার বন্দোবস্ত রাজ্যে স্বদেশীর একটা বিদ্রোহ হয়। তার নেতা হিসাবে বালক গোবিন্দ কোথায় যেন কলকাতায় আসে। যে বন্ধুদের কাছে এসে ওঠে, তাঁরা আমায় জিজ্ঞেস করেন, কোনো স্কুলে ওকে ভর্তি ক'রে দিতে পারি কিনা। ৺মধুসূদন বিদ্যাভূষণ মশায়ের সাহায্যে এ কাজ আমি আগেও করেছি—বিনা সার্টিফিকেটে রাজনৈতিক কর্মীদের স্কুলে ভর্তি করা। গোবিন্দও ভর্তি হ'ল।

১৯১৬-১৭ সালে আমি যখন পলাতক, গোবিন্দও দুএকটা কাজে আমাদের সাহায্য করতে কতকটা গা-ঢাকা দেয়। নাগপুরে সে তার কাহিনী বল্লে—আমি ধরা পড়ার পর আর সে তারও সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেনি। তারপর থেকে সে সারা ভারতবর্ষের বৈপ্লবীদলের দোরে দোরে ঘুরেছে, কোথাও শান্তি পায় নাই। তারপর ছুটেছে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে। একটা মনীর তৃপ্তি পেয়েছে। ও সেই আশ্রমেই থাকতে চায়, আমাকেও মহাত্মাজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চায়।

আমিও তাই চাই। প্রথম দিন অনেকে সঙ্গে রইলেন। পরে স্থির হ'ল, আর কেউ যাবেন না, আমি একাই মহাত্মাজীর সঙ্গে আলোচনা করব। আমি কিন্তু সঙ্গে নিলাম কুন্তল চক্রবর্তীকে। মহাত্মাজীর কাছে ব'সে ছিলেন কাকাসাহেব কালেলকর, অধ্যাপক বেনারসীদাস চতুর্বেদী, আচার্য কৃপালানি, অধ্যক্ষ রামদেব, চন্পারণ সত্যাগ্রহের সময়কার কর্মচারী, আরও কয়েকজন।

সেই ভীড়ের প্রথম দেখলাম মহাত্মাজীকে—চেহারায় সৌন্দর্য নেই, মাধুর্য আছে অফুরান। কথায় মন কেড়ে নেয়। প্রথম আহ্বানেই ব্যক্তিত্বের সব অন্তরাল যেন ভেঙ্গে যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার মনের কথা কি? আপনার কি ইচ্ছা, আপনি অসহযোগের যে কার্যসূচী দিয়েছেন, দেশ যদি তা অনুসরণ করে, আপনি কংগ্রেসকে স্বাধীন ভারতীয় রিপাবলিকের পার্লিয়ামেন্ট ব'লে ঘোষণা করবেন?"

"ঠিক এইটিই আমার মনের কথা" (Exactly that's my idea), তার পর সবিস্তারে তাঁর মত বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। একটা রাষ্ট্র কি ক'রে সে দেশে শান্তিরক্ষা করে, শিক্ষার ব্যবস্থা করে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করে। এসব যদি আমাদের কাজ আমরা নিজেরাই করার আয়োজন করতে পারি, তখন ইংরেজের রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে এদেশে থাকবার আর কোনো নৈতিক অধিকার থাকবে না। তাকে স'রে যেতেই হবে।

কথা বলতে বলতে বিশদভাবে তাঁর মতামতের অনেক কথাই বিশ্লেষণ ক'রে বললেন। কথার কি আকর্ষণী শক্তি! গুরুগম্ভীর আলোচনার মাঝে মাঝে তাঁর সহজ হাসি-আনন্দের উৎসের সে কি চপলতা।

কথাপ্রসঙ্গে এক সময়ে বললেন, অনেক কাজ-তাঁকে করতে হয়, কিন্তু সময়ের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হয়ে কাজ করেন ব'লে দুশ্চিন্তার কণামাত্র তাঁকে অস্থির ক'রে তুলতে পারে না—রাত্রে যখন শোবেন, এক মিনিটের ভিতর ঘুম এসে যায়, আর ছয় ঘণ্টা তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত কখনও হয় না।

অহিংসা সম্বন্ধে, সত্যের সম্বন্ধে, আমাদের আত্মনির্ভরশীলতার কথা, অনেক কথাই হ'লো। সত্যের কথা বলতে বলতে বললেন, আমাদের গায়ে দেশের স্বাভাবিক পোষাক সাদা পোষাক। হাসতে হাসতে হঠাৎ আমার গায়ের কোটটা ধ'রে বললেন, "আমি যখন প্রথম বিলেতে গিয়ে নামি, আমার সাদা পোষাক নিয়ে আমি বোকা ব'নে গেলাম, যেমন তুমি তোমার কালো কোট গায়ে এখন বসে।" (When I first landed in England I looked a fool with my white clothes just as you do here with your black coat on). বেশ একটু হাসাহাসি হ'ল।

তাঁর সব কথা শুনবার পর আমি বললাম, "আপনার নীতি কতকটা বুঝলাম। কংগ্রেস যদি নিজেকে স্বাধীন ভারতের পার্লিয়ামেন্ট ব'লে ঘোষণা করতে পারে, তা'তেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে ব'লে মনে করিনে। ওদের এখানে থাকবার নৈতিক অধিকার চ'লে গেলেই ওরা চ'লে যাবে, এ বিশ্বাস আমার নেই। কিন্তু আপনার এ প্রস্তাবের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন বৈপ্লবিক স্তরে উঠবে নিশ্চয়ই এবং সেই হিসাবে আমাদের বিপ্লবী দলের তরফ থেকে কথা দিচ্ছি, যে একবছরে আপনি স্বরাজ দিতে পারবেন বলেছেন, সেই এক বছর আর আমাদের সুরেন্দ্রনাথ আন্দোলনের আয়োজন করব না। আমরা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের কাজই করব।"

মহাত্মাজী খুশি হ'লেন।

এর পর বললাম, কিন্তু মহাত্মাজী, এই এক বছরে স্বরাজ হবে ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। এর পর আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনই করতে হবে; ইংরেজের অস্ত্রবলকে আমাদের অস্ত্রবল দিয়েই হটাতে হবে।

তখন উঠে পড়লো হিংসা-অহিংসার আলোচনা। মহাত্মাজীও গীতার উল্লেখ করেন। প্রতিদিন গীতা পড়ে গীতার অনেক শ্লোক আমারও তখন কণ্ঠস্থ। তিনি গীতার ব্যাখ্যা করেন তাঁর মতো ক'রে, আমি গীতার প্রচলিত ব্যাখ্যাই করি। রাত হয়ে গেল। মহাত্মাজী বললেন, "এইবারে আমি শোব। তুমি শেষ রাত্রে আবার এসো।"

তিন মাইল ঘুরে থাকি। নাগপুরের ডিসেম্বরের শীত। যার আগে না—কর্তব্যও আছে, আকর্ষণও আছে। ভুলে আর আমি ঠিক সময় মতোই আসি।

মহাত্মাজী প্রাতঃকৃত্য সেরে বসেছেন, কথা উঠেছে—এমন সময় শিবিরের দরজায় দেখা দিলেন মৌলানা শওকত আলি। হাতে মস্ত বড় একটা খিলাফতের ঝাণ্ডা, পোষাকে একদল খিলাফৎ ভলান্টিয়ার—সমস্বরে একটা উর্দু গান গাইতে গাইতে এসে দাঁড়ালেন।

গান্ধীজি অমনি চোখ বুজে বসলেন। আমি সন্ত্রস্ত হ'য়ে কথা ব'লে চ'লেছি। ইঙ্গিত করলেন, "আমি ঐ গান শুনব।"

গান আমরা বুঝতে পারছিনে। তা ছাড়া, মনে হ'ল, এখন গান্ধীজি মৌলানা সাহেবের সঙ্গে কথায় বসবেন। তুজন আর আমি উঠে পড়লাম।

গান শেষ হ'তেই গান্ধীজি গোবিন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গেল? গোবিন্দ বললে, জানি না তো। গান্ধীজি তাকে আদেশ দিলেন, যাও, যেখানে পাও ডেকে নিয়ে এস।

ছুটে বাঙালী প্রতিনিধিদের শিবিরের কাছে গিয়ে গোবিন্দ আমাদের বললো।

কস্তুরবা এসে গান্ধীজির খাবার দিয়ে গেলেন—একবাটি দুধ, দুটুকরো পাঁউরুটি, কিন্তু খেয়াল আর হলো না। চামচেতে ক'রে তুলে যাচ্ছেন, আর আলোচনা চলছে। জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালাল একবার শিবিরের ভিতরের দিকে যাচ্ছেন, আবার বাইরে আসছেন।

সেই হিংসা আর অহিংসারই আলোচনা। এর আর শেষ নেই। মাঝখানে একবার বললেন, তোমরা যদি পলিসি হিসাবেও অহিংসা মেনে নাও, আমার আপত্তি নেই।

আর এক সময়ে গভীর ব্যথায় একবার ব'লে উঠ্‌লেন, "তোমরা যদি আমার অহিংসার প্রেরণা না পাও, মুসলমানদের সঙ্গে মিলে তোমরা হিংসার যুদ্ধের আয়োজন কোরো। যারা আমার সঙ্গে যেতে চাইবে, আমি তাদের নিয়ে হিমালয়ে চ'লে যাব, সেখানে গিয়ে পৃথিবীর একমাত্র ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করব।"

রাওলাট রিপোর্টে উল্লিখিত "রেশমী চিঠির ষড়যন্ত্রের" রেশ তখনও চলছিল, তখনও বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা চলছিল। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ মুসলমান নেতারা এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমিও খালাসের পর যেদিন কলকাতায় আসি সেই দিনই এর সম্পর্কে আসি। এর কিছুদিন পরে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উপদেশে এই ষড়যন্ত্রে যবনিকা পড়ে। মহাত্মাজীর কথায় বুঝলাম, তিনিও এই আয়োজনের খবর রাখেন।

সেদিন সন্ধ্যায়, পরদিন সকালেও অনেক বেলা পর্যন্ত কথা হ'ল। তার পর বললাম, মহাত্মাজী, আপনিও আমায় মানাতে পারলেন না, আমিও আপনাকে মানাতে পারছি না (Nither I convince you, nor you convince me)।

সেই সুমধুর স্নেহের হাসি হেসে তিনি কাকা সাহেবকে ফেরিয়ে দিয়ে বললেন, "এঁর সাথে আলাপ কর, ইনিও তোমারই মতো একজন এনার্কিষ্ট ছিলেন, এখন সম্পূর্ণভাবে আমার মত মানেন।"

আমি হেসে বললাম, "না, মহাত্মাজী, আমি কিন্তু এনার্কিষ্ট নই। ও দুর্নাম বরং আপনারই আছে।" গান্ধীজি, আবার তেমনি হেসে বললেন, জানি, জানি।

কাকা সাহেবের সাথে ভাব হ'ল, চক্রবর্তীজির সাথে, রামরক্ষণ ব্রহ্মচারীর সাথে এবং উপস্থিত আরও কয়েকজনের সাথে। তাঁরাও কিন্তু আমায় অহিংসা মানাতে চেষ্টা করেন নাই, আমিও তাঁদের সাথে তর্ক করিনি।

এর পর পণ্ডিচেরী যাবার আগে বাংলার বন্ধুদের খবর পাঠাই, মহাত্মাজীর আন্দোলনের অর্থ এবং তাহার যা বুঝেছি, তাতে এখন আমাদের বিনা দ্বিধায় কংগ্রেসে যোগ দান করা উচিত। বন্ধুরা অনেকে তাঁর তাঁর জেলায় চ'লে গেলেন।

সেদিন মহাত্মাজির সাথে আলাপে তাঁর অহিংসা নিয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারিনি। তার পর থেকে অনেক বছর গেছে, অনেক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে, মহাত্মাজীর অনেক কর্ম শুনেছি, অনেক কাজ দেখেছি, তাঁর অসহযোগ আন্দোলন দেখেছি, আইন অমান্য আন্দোলন দেখেছি, একক সত্যাগ্রহ এবং তার পর তাঁর আপস্থ বিনয় দেখেছি; পূর্ণ স্বাধীনতার পথে ভারতবর্ষকে উপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন নেতে দেখেছি, তাকে খণ্ডিত হ'তে দেখেছি, আর দেখেছি নির্মম আত্মকলহ। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে—যার অবসান হয়েছে আণবিক বোমার আবিষ্কার ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে।

আজ মনে পড়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে হিংসা আর অহিংসার সেই বিচার আলোচনা, গীতার ব্যাখ্যা আর প্রমাণের উপর সেই তর্ক। মনে হয়, ইতিহাস তো এক জায়গায় ব'সে নেই। তাকে দুর্বার স্রোতে নিরন্তর এগিয়ে চলতে হয়েছে, হচ্ছে। চিরদিন সে যদি অতীতের নজীরের উপর চলে, তা হ'লে তো তাকে অগ্রগতির দিকে না গিয়ে পেছন দিকে চলতে হয়, সত্য চিরন্তন কিনা, কিন্তু সত্য নিত্যসূত্র।

মানুষের ইতিহাসে মানুষ অস্ত্রের আবিষ্কার আর ব্যবহার যে উদ্দেশ্যেই শুরু ক'রে থাকু, অস্ত্রের ব্যবহার প্রধানত হয়েছে, আজও হচ্ছে, ধনঐশ্বর্য, রাজ্যসাম্রাজ্য, ক্ষমতাপ্রতিপত্তি—অপরের যা' প্রাপ্য, তাকে আত্মসাৎ করবার উদ্দেশ্যে। এম্‌নি ক'রে আজকের দুনিয়ায় কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব, দাস, তাদের মানবত্বের পরিচয় বিলুপ্ত। আর ক্রমে মুষ্টিমেয় লোক হয়ে উঠ্‌ছে সুখসুবিধা, ধন ঐশ্বর্য, ক্ষমতা-প্রতিপত্তির মালিক।

আশ্চর্য এই যে, যতো আমরা বলছি, আমরা গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যতো আমরা শুনছি, গণতন্ত্র প্রসার লাভ করছে, অস্ত্র ততো অল্পসংখ্যকের হাতে প্রবলতর হয়ে উঠ্‌ছে। দুএকটা আণবিক বোমা আজ দু-একটা রাষ্ট্রের কে-দুজনের মালিকের হাতে, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জীবনমরণ তাদের মুঠোর ভিতর। অস্ত্র যত ক্ষমতাশালী ক্ষমতাপ্রভূত্ব, ধন ঐশ্বর্য ততো মুষ্টিমেয়ের হাতে।

এর শেষ কোথায়?—মনে হয়, এই প্রশ্নের চরম ক'রে জবাব দেবার দিন এসেছে আজকের দুনিয়ায়।

পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে, পরাধীন জাতগুলোর পক্ষে অস্ত্রের ব্যবহারের নৈতিক অধিকার আছে—এই তর্ক আটাশ বছর আগে মহাত্মাজীর সঙ্গে করেছিলাম। সে তর্কের জবাবে মহাত্মাজী এম্‌ন করেছিলেন, ইংরেজের অস্ত্রবলের সঙ্গে অস্ত্রের যুদ্ধে সফল হবার আমাদের সম্ভাবনা কতখানি?

সুযোগের পর সুযোগ নিয়ে যুদ্ধের পর আমরা যুদ্ধ ক'রে যাব—ততোদিন না ইংরেজের সমস্ত ভারতীয় সৈন্য আমাদের দিকে যোগ দেয়,

আর একটা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের আমরা চরম সুযোগ পাই। এর চেয়ে স্পষ্ট জবাব সেদিন দিতে পারিনি এবং বৈজ্ঞানিক অস্ত্র সম্ভারের আবিষ্কার ও আয়োজনও সেদিন আজকের স্তরে এসে পৌঁছায় নাই।

মহাত্মাজীর পন্থা যে ভাষায় তিনি সেদিন প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই পন্থার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, সেদিন তাঁর কথার আমার কাছে অন্ততঃ তা স্পষ্ট হয় নাই. এত বৎসরের তাঁর আন্দোলনে এবং দুনিয়ার ইতিহাসের বর্তমান পরিণতিতে হয়ত তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মানুষের পরে মানুষের বোঝার ভার বহু যুগের ইতিহাসে আমাদের জাতের মানুষ তার মানুষের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের বোঝা আজ সে স্বেচ্ছায় অবাধে মাথা পেতে নেয়। মানুষ তাই তার এমন চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে।

একেলা যে জানে না, শুকেলা কোথা থেকে কি দিয়ে তার উদরপূর্তি হবে, তার ভাববারও অবসর নেই সে ঘাস কি মানুষ। দারিদ্র্যের কষাঘাতে আত্মবিস্মৃত না ক'রে, দাস না ক'রে সে যাতে নিজের দুটি অন্ন ক'রে খেতে পারে, সেই উৎপত্তে তাকে গান্ধীজি দিতে বললেন চরকা। চরকায় চেয়ে পুঁজি যাতে বেশীর প্রয়োজন হয়, তেমন উপায় তাকে বেঁধিয়ে কোন লাভ নেই। লাভ নেই ব'লে ব্যবসায়ী হবার এই হীন আয়োজনের কথাই তাকে শুনালেন। ব্যবসায়ী মানুষ নিজের স্বাধীন জীবিকায় বেঁচে থেকে দুনিয়ার সামনে তার মানুষ পরিচয় দিতে পিছুক, তার মনের দাসত্ব ঘুচে যাক্, সে স্বাধীনতার সৈনিক হয়ে গ'ড়ে উঠুক।

কোটি কোটি মানুষ সহস্র বৎসর ধ'রে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত, পতিত, অস্পৃশ্য হয়ে থেকে নিজের কাছেও সংকুচিত হয়ে গেছে। নিজেই সে নিজেকে মানুষ ব'লে জানে না—জানে ক্ষুদ্র ব'লে, জানে অস্পৃশ্য ব'লে, জানে করুণা ব'লে। সমাজে তার কোথা বিশিষ্ট স্থান আছে, দাম আছে, তা সে ভাবতেও পারে না। সে কি ভাববে স্বাধীনতার কথা?

মহাত্মাজী তাঁর কার্য-তালিকায় বিভিন্ন অংশে যে-ইঙ্গিত জাতের বিভিন্ন অংশের কাছে তুলে ধরেছিলেন তাতে জাতের প্রতিটি অংশের ভিতর—নারী, হরিজন, মুসলমান, শ্রীহীন, এমন কি কুষ্ঠ রোগীর পর্যন্ত তাদের নিজের নিজের মানুষ-পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাদের নিজের কাছে। নিজের কাছে নিজের মানুষের দাবী ফুটলে তবেই সে জাতের দাবীর মর্ম বুঝবে, জাতের স্বাধীন অঙ্গে মহিমা হয়ে উঠ্‌তে পারবে।

এই মানবত্বের বোধ জাগাতেও তিনি সংস্কারকের মতো একথা ক্ষণের কোথাও স্থান যেন নাই যে, আগে জাতের মানুষ মানুষ হোক্, তারপর হবে স্বাধীনতার সংগ্রাম। তাঁর বিরুদ্ধে বেরুবে যারা মানুষের মানবত্বের গৌরববোধ জাগাবার আয়োগ প্রচেষ্টার সঙ্গে চলেছে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম। দুই সংগ্রাম পাশাপাশি চলিয়াছে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি জয়ের পর জয় জাতকে লাভ ক'রে ধ'রে তুলেছেন। প্রথম একটা নীতিগত আন্দোলনের ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে, তারপর একটা সাধারণ আইন ভাঙবার উপলক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রকে মৃদু আঘাত হেনে এবং সর্বশেষ সাম্রাজ্যবাদীকে 'ভারত ছাড়' ব'লে জাতকে 'কর বা মর'র মন্ত্র দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন। যুগযুগের আত্মবিস্মৃত অগণিত সাধারণ মানুষের ভিতর মানবত্বের গৌরববোধও তিনি জাগিয়েছেন এক অভিনব পন্থায়। একদিকে ক্ষমতার মালিক সমাজপতিদের উপদেশ দিয়েছেন—যা তোমাদের সত্যিকারের প্রাপ্য নয় তা ছাড়, বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা, সুযোগ, সুবিধা, ধন-ঐশ্বর্য ত্যাগ কর। অপরদিকে বঞ্চিতদের বলেছেন, তোমাদের অধিকার যা, তা বুঝে নিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠায় শক্ত হয়ে দাঁড়াও। কিন্তু আঘাত হেনো না।

এই আঘাত হানার অস্ত্রে ক্ষমতার মালিকরা যুগ যুগ ধ'রে অনেক বেশী শক্তিমান হয়ে উঠেছে বঞ্চিতদের চেয়ে। আঘাতের বদলে আঘাত হানতে পারলেই ক্ষমতার মালিকরা খুসি। আঘাত হানার বিদ্যায় বঞ্চিতেরা মালিকদের সাথে এঁটে উঠ্‌তে পারবে না, বরং নিজের প্রতিষ্ঠায় দাঁড়াতে গেলে তাদের শক্তি অপব্যয়ের হয়ে উঠ্‌বে।

চিরদিনের ইতিহাসে এই হয়ে এসেছে—বঞ্চিতেরই এক অংশকে অর্থের দাস ক'রে তার হাতে অস্ত্র দিয়েই অধিকাংশ মানুষকে দাস ক'রে রেখেছে ক্ষমতার মালিকরা। অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, কৃষ্টি, রাষ্ট্র—অনেক বিষুর ভাঁওতা জোড়া হয়েছে আত্মবিস্মৃত মানুষকে বিভ্রান্ত করতে।

যুগযুগের অগণিত বঞ্চিত, আত্ম-বিস্মৃত মানবের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যদি আঘাত হানায়, অস্ত্র ব্যবহারের প্রতিযোগিতা চলে, তা'হলে বঞ্চিত মানুষই মার খাবে, শুধু যে ক্ষমতার মালিকের হাতে তা-ই নয়, নিজের হাতেও—আত্মবিস্মৃতের জাগরণ সম্পূর্ণতা লাভের আগে ক্ষমতা-লোভীর ছল তাকে বিভ্রান্ত করবে, তার হাতেই অস্ত্র দিয়ে তাকে আত্ম-হত্যার পথে নিয়ে যাবে, ব্যাসিই যেসব্যক্তিতে ধরা হয়েছে।

ইতিহাসের গতি সহজ, সরল নয়—তার ভবিষ্যৎ তার অতীতের সাথে জড়িয়ে ওঠে। অতীতে মানুষ অস্ত্র ব্যবহার ক'রে এসেছে—অস্ত্র ব্যবহারের মোহ তার মজ্জাগত হয়ে রয়েছে। অপরদিকে, নিত্র আত্ম-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাগছে তার মানবত্বের গৌরববোধ। এই মানবত্বের গৌরববোধে প্রতিষ্ঠা, আর মানবত্বকে হত্যা করবার লক্ষ্যে অস্ত্রের ব্যবহার—এ দুটি পরস্পরে বিপরীত বস্তু।

এই দুই বিপরীত বস্তুর সংমিশ্রণে আমাদের দেশে যে-বিপ্লবাত্মক সৃষ্টি হ'ল, তা'তে ভারতবর্ষ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। অর্ধজাগ্রত মানবত্বের দুই বিভিন্ন অংশ ক্ষমতালোভীর দুর্বার টানে ছুটলো দুই বিভিন্ন দিকে। এদের হাতের অস্ত্রের হানা হানিতে মানুষের আদিম বর্বর প্রকৃতি তার পরিপূর্ণ রূপে ফুটে উঠ্‌লো।

মানুষের আশা করবার আর স্থান রইলো না। কিন্তু মানবত্বের উদ্বোধন যিনি করছিলেন, সেই পুরোহিত আশা ছাড়েন নাই। তিনি দুই দিকেই ক্ষমতালোভীর মোহ থেকে জাগরণশীল মানবত্বকে মুক্ত ক'রে পূর্বের পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছিলেন। অপরিণীম ধৈর্যে

নিজের রক্ত-কণা বিন্দু বিন্দু করে দিয়ে দুই দিকেরই বর্বর প্রকৃতিকে প্রশমিত করেছিলেন। অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ উপবাসের পর উপবাস বরণ ক'রে দুই দিকেরই বর্বরপ্রকৃতিদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তারা পশু নয়, মানুষ।

ক্ষমতালোভীর এক গোষ্ঠী ব্যবহার করতে পারলে না, মানবত্বের অর্ঘ্যস্বরূপ ক্ষমতালোভী অপর গোষ্ঠীর যে-সুযোগ জুটেছিল সেই সুযোগে অস্ত্রের ব্যবহার চলতে থাকলো।

সেই অস্ত্রেই একদিকে প্রাণ হারালেন সেই পিতা, সেই 'বাপু' যিনি পশুর ভিতর মানবত্বের সঞ্চার করেছিলেন নিজের জীবনের প্রতিটি-মুহূর্তের প্রেম, প্রতিটি মুহূর্তের ধ্যান, প্রতিটি মুহূর্তের কর্ম দিয়ে।

জাতির বাপু, মানবত্বের জনক চলে গেলেন। আজ আমরা হাহাকার করছি। অথচ জীবিত থাকতে আমরা তাঁকে চিনি নাই। বিশের অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষ—কিন্তু কোন্ নাড়ীর টানে তাঁকেই আপনার মানুষ ব'লে জেনেছিল, জেনে তাঁকে 'মহাত্মা' নাম দিয়েছিল, 'বাপু' ব'লে ডেকেছিল। এই মহাত্মার মাহাত্ম্য কোথায়, সবাই কেন এমন ক'রে নিজেদের এই বাপুর সন্তান ব'লে ভাবে ক'রে, একবার বুঝতেও চাই নাই—নিজেরা বুঝতে চাই নাই, অথচ নির্বোধ ক'রে দিয়েছি তাঁকে, তাঁকে যারা ভালবাসে, তাদের।

কতো শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে যে শুনেছি, এই মহাত্মাই দেশটার সর্বনাশ করলো! তিনি যখন অহিংসার কথা বলেছেন, বুদ্ধির আর বীর্যের অভিমান নিয়ে আমরা বেশ জাঁক ক'রে বলেছি, দেশটাকে ক্লীব ক'রে ফেললে! তিনি যখন যুগযুগের লাঞ্ছিত, নিষ্পিষ্ট মুসলমান জন-সাধারণের মধ্যে মানুষ হিসাবে, ভারতীয়হিসাবে তার সত্যিকারের অধিকারবোধ জাগাতে চেয়েছেন, আমরা তাঁকে বলেছি তাঁর "তোষণ-নীতি"। এমনি ক'রে মানুষের পেটের যে আদিমতার পিতৃহত্যা করলে, সেই আদিমতাকে সৃষ্টি করেছি আমরা সবাই মিলেই। আমাদের ভারতীয় জাতের এ-কলঙ্ক মুছবে ইতিহাসের কোন্ পাতায়?

আত্ম-বিস্মৃত, মানবত্ব-বিস্মৃত, মানুষ ক্ষমতাশালীর দাসত্ব ক'রে, ক্ষমতাশালীর অস্ত্র ধ'রে চিরদিন নিজের গায়ে কুঠারাঘাত ক'রে এসেছে। নিজের ভবিষ্যতের পথে নিজের হাতেই বোমা এঁটে দিয়েছে, নিজের অর্ধশিক্ষিত আত্মীয়-স্বজন দুনিয়ার সাধারণ মানবকে দাস ক'রে রাখতে, চিরবঞ্চিত ক'রে রাখতে, সমাজে পতিত ক'রে রাখতে সাহায্য করেছে—সমাজকে এযের সবার মাঝে সমৃদ্ধ হ'তে দেয়নি।

এই বিকৃতি আজ চরমে পৌঁছাতে চলেছে আণবিক বোমার শ্রেষ্ঠীর অস্ত্রের আবিষ্কারে। 'যা হোক্ একটা কিছু হবে' ব'লে যখন অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষ অন্ধের মতো এক চরম ধ্বংসের দিকে স্রোতের বেগে চলেছিল তখনই যেন "সত্যমপি ভবতি যুগে"র পরিচয় হিসাবে এসেছিলেন আমাদের মাঝে মহাত্মা গান্ধী।

তিনি বললেন 'যা হোক্ একটা কিছু হবে' নয় স্মরণ কর, তুমি মানুষ। মানুষ-হিসাবে তোমার একটা ভবিষ্যৎ আছে। সেই ভবিষ্যৎকে চিনে নাও। অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎকে দেখে নাও। অন্ধের মতো অপরের দেওয়া অস্ত্র হাতে তুলে নিও না। তাতে তোমার নিজেরই সর্বনাশ, সমস্ত মানব জাতের সর্বনাশ।

এই শিক্ষার আজ যদি মানুষ-আত্মহ, আত্ম-নির্ভর হয়ে না দাঁড়ায়, তবে তার ভবিষ্যৎ কোথায়?

সেদিন বারাণসীর আরও একটা আলোচনার বস্তু ছিল আমার মহাত্মাজীর সঙ্গে। আমরা তখন কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু যাদুগোপাল মুখার্জি, সতীশ চক্রবর্তী, অতুল ঘোষ, অমরেন্দ্র চাটার্জি, বলিবীর-কর প্রভৃতি ভারত-জোড়া ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তখনও পলাতক। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ চাইলাম, এঁদের সম্পর্কে কি করব?

তিনি বললেন, নিজেদের অস্ত্রপাতি নিয়ে এঁরা বল, 'আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। এঁরা তো বেরিয়েছিলেন স্বাধীনতার চরম মূল্য দেবার সংকল্প নিয়েই। না-হয়, সেই পর্যন্ত তা-ই দিতে হবে।

আমরা দুর্বল মানুষ। এ উপদেশ আমাদের বন্ধুদের দিতে পারিনি। এর পর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, এঁদের ধরানো আমাদের চলবে না। বরং সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর চন্দননগরের মতিলাল রায় যে-চেষ্টা করেছেন—গবর্নমেণ্টের আর এই সব পলাতক বিপ্লবীদের ভিতর একটা সন্ধি স্থাপনের, তা যদি সফল হয়, সেই পথেই এঁদের বের ক'রে আনবার চেষ্টা কোরো। সেই উপদেশই আমরা পালন করেছিলাম।

কিন্তু গান্ধীজির ঐ কথাটি এক দিন আমাদের বিপ্লবীদেরও প্রতি মুহূর্তের সাধনার কথা ছিল। স্বাধীনতা পেতে হ'লে চরম মূল্যই দিতে হবে। চরম মূল্য সেদিন আমাদের কাছে ছিল ফাঁসিতে বা গুলিতে প্রাণ বলিদান। কিন্তু আজ বুঝছি, ব্যক্তিগত, পরিবারগত, শ্রেণীগত, জাতিগত স্বার্থ, ক্ষমতা প্রতিপত্তি বলিদান প্রাণবলিদানের চেয়ে মানুষের কাছে বেশী বই কম নয়।

অথচ এই বলিদান ছাড়া মানুষের মানবত্ব প্রতিষ্ঠার, সাধারণ মানবের দাসত্ব ঘুচাবার আশা কোথায়? আজকের দিনে বিপ্লবী যে হবে, ক্ষমতা-ঐশ্বর্যের মালিককে এই কথাটিই তাকে বলতে হবে—তোমার বুদ্ধিতে চলব না, তোমার দেওয়া অস্ত্র ধরব না, তোমার কৌলীন্যের ভাঁওতা মানব না—তোমার দেওয়া দুমুঠো দাসত্বের অন্নে বা শুশ্রূষার মূল্যে আমার প্রয়োজন নেই! আমি অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষের সাথে এক হয়ে নতুন সমাজ গ'ড়ে তুলব। এতে তুমি আমার কাছ থেকে যে-মূল্য হয় নেবে, আমি সব মূল্যই দিতে প্রস্তুত।

এই বলিদানের জীবনে যিনি নিত্য আমাদের প্রেরণা যুগিয়ে চলেছিলেন, নিয়ত আমাদের অভ্যস্ত ক'রে তুলছিলেন আজ তাঁকে আমরা হারিয়েছি।

নীরবে যখন বসি, আজকের ব্যথা পাঁজরায় বাঁধ মানতে চায় না। ও-কথায় কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাইনে যে, ঘরেও তিনি আমাদের সাথেই আছেন। প্রতি পদক্ষেপে হাত ধ'রে নিয়ে চলেছিলেন, তবু প্রতিপদে পথ ভুলেছি, প্রতিপদে পা পিছলে গেছে। আর, আজ তাঁর মৃতি, তাঁর আদর্শ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে? আদর্শকে অত বড় প্রতিষ্ঠা দেবার শক্তি ও বুদ্ধি অর্জিত হয়েছে?

আবার এ-প্রশ্নও মনে জাগে—প্রেমের ঐ সম্পূর্ণতা, মানবের ইচ্ছা-শক্তির ঐ পরিপূর্ণতা—মানবসমাজ এর কি কোনো মূল্যই দেবে না? ও কি ব্যর্থ যাবে? পশুত্ব আর দাসত্বের গ্লানি থেকে মানবত্ব কি কোনো কালে মুক্তি পাবে না?

মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

অশীতি বৎসর আগে যে জগতে হে মহাপুরুষ,
জন্ম নিলে সে জগতে মানুষ হয়নি অমানুষ,
পশুত্ব তাহারো ছিল পশুত্বের গূঢ় অন্তস্তলে
মনুষ্যত্ব ছিল সুপ্ত, তাহাই জাগাতে প্রেমবলে
এসেছিলে, হয়ে নাই মানবের সকল সম্বল
তখনো বিজ্ঞান, তাই সে সাধনা হয়নি নিষ্ফল।
নিলে আজ যে জগৎ হইতে বিদায়
সে জগৎ যুগচক্রে নির্দ্দানব, সে জগৎ হায়
দানবে ভরিয়া গেছে। সেথা ব্যর্থ সাধনা নিষ্কাম,
সুপ্ত নয়, লুপ্ত সেথা মনুষ্যত্ব, মর্ত্ত্য দৈত্যধাম।
শুধু আশা ত্যজ নাই, আশা তব প্রাণাধিক প্রিয়
দৈত্যেরে মানাতে দেব স্বর্গ হ'তে আনিয়া অমিয়।
পাষাণে রোপিয়া বীজ অঙ্কুরের ছিলে প্রতীক্ষায়
অকপট শিশুসম নিষ্কলুষ মৌন মমতায়।
হত্যা তব উপলক্ষ, এ বিশ্বের সর্বদানবতা
কেন্দ্রীভূত তার মাঝে, তার ধ্বংস করিবারই কথা
যাহা কিছু সত্য শুচি শুভতর সুন্দর মহান্।
যুগে যুগে দেশে দেশে এই লীলা করে শয়তান।
শুনাইলে হরিনাম যে হিরণ্যকশিপুর কানে
ফিরিয়া চাহিল সে কি অসহায় প্রহ্লাদের পানে?
দলিতে বাসনা ভক্তি তুমি দেশে দেশে,
তোমারে চিনিল তারা প্রেমশুদ্ধ তব ছদ্মবেশে?
তোমারে চিনিত যদি ধরিত যে তব ব্রত শিরে
নিষ্ক্রিয় দর্শক হ'য়ে রক্তস্নান প্রবাহের তীরে
দাঁড়াইয়া দেখিত না তব ব্রতে ডুবিতে অতলে,
শুধু জয়ধ্বনি নয়, সর্বস্বই দিত পলে পলে।
যুগেরে ভুলেছে যারা ক্রুশকাষ্ঠে গড়েছে ক্রুশার
সত্যই কি তারা তোমা করিল স্বীকার?
অহিংসা সাধনাসত্য, আজীবন করিয়াছ তপ,
তার লাগি করিয়াছ চিরদিন মহাযজ্ঞ জপ।
না করিয়া তপো মূল্য দান,
যাহারা করিল শুধু অভিনয়ে সাধিবতা ভাণ,
তারাও চিনেনি তোমা। লোকোত্তর তব বাণীব্রত,
রইয়াছ রুদ্ধিপথে তাহাদের পাথেয়ের মত।
যে অস্ত্রে নিহত তুমি সে অস্ত্র যাদের আবিষ্কার,
তারাও সমান দায়ী অপরাধী তোমার হত্যার
প্রার্থনার মহাপথে সবারে করিয়া যাও ক্ষমা—
তাই তব শেষ দান, শেষ বাণী তাই অনুত্তমা।
যেই মহাযজ্ঞে তুমি আত্মাহুতি করিলে অর্পণ
তার ধূমজালে আজ নিষ্পীড়িত মোদের নয়ন,
বাষ্পাচ্ছন্ন রক্তনেত্রে সত্যাসত্য চেনাই কঠিন
সে নেত্রে বুঝিতে নারি রাত্রি কিংবা দিন।
বুদ্ধিরে স্তম্ভিত আজি করিয়াছে মর্মভেদী শোক।
এই শুধু জানি মোরা যজ্ঞফল পাবে জীবলোক,
নির্ব্বাসিত মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসিবে তার সাথে,
দৈত্যধাম স্বর্গ হবে যে ঘৃণীচি তব রক্তপাতে।
মানবের ইতিহাসে এত বড় উৎসর্গ মহান্
হয় নাই কোন দিন। ব্যর্থ যদি এই অবদান,
সবই মিথ্যা, নাই তবে সত্য, ধর্ম, নাই ধর্মরাজ,
সত্য শুধু এ কলঙ্ক লাজ।
পঞ্জর হইল চূর্ণ ব্রত তার রহিল ধরায়
মন্দির হইল ভগ্ন দেবতা দলিল মুক্তি তায়,
যাহা ছিল ভারতের তাহা হ'লো সারা বসুধার,
ত্রিকালের ধন হ'ল যাহা ছিল শুধু আর্যিকার।
প্রবর্তিলে নবধর্ম নিজ প্রাণে করি প্রাণবান্,
জগতের সর্ব্ব ধর্ম তার মাঝে হবে মজ্জমান।
তব রক্তোরক্তধারা মেঘমন্দ্রী নবারুণসম
বিদূরিয়া হিংস্রতার তমঃ,
অভিনব সত্যতার প্রভাতেরই করিল সূচনা;
শোচনায় ইহাই সান্ত্বনা।

কর্ম্মযোগী-গান্ধী

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

বাপুজী নাই, গান্ধীজী নাই, ভারত আজ গান্ধীহীন! ভারতের অন্তরে বাহিরে সকল চিন্তা আজ স্তম্ভিত হ'য়ে শুধু—গান্ধী নাই, গান্ধী নাই—বলে কেঁদে মরছে। আসমুদ্র-হিমাচলে আজ দুর্বিষহ বেদনার বিপুল আলোড়ন, জনসমুদ্রে আজ চোখের জলের জোয়ার লেগেছে, অগণিত নরনারীর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসে ভারতময় আজ ঝড় বইছে। গান্ধী নাই, ভারতবর্ষে আজ গান্ধী নাই। ভারতের মর্ম্মে অনুভূতির কোন্ সুগভীর তল আজ কি ভূমিকম্পে এমন মুহুর্মুহুঃ কেঁপে উঠছে? কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, দ্বারকা থেকে পুরী—কান্নাধারার রোল-রে আর থামছে না। বাপুজী নাই, গান্ধীজী নাই! আজ বাপুজীর সেই দেবদুর্লভ হাসিকে ভারতবাসী তার বিরহের রোদন দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে।

তবু কান্নার কলরোলের মাঝে ভারতের আকাশে বাতাসে আজ প্রার্থনার এ উত্তরোল কেন? যে সুর কান্নায় ভেঙে পড়ছে, সে কি প্রার্থনায় আবার আপনাকে বেঁধে নেবার প্রয়াস করছে?

অপরাহ্ণ বেলায় একদিন বাপুজীর প্রার্থনার পর গান হ'য়েছিল:

"আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেবো গো
এই বিষম ঝড়ের বারে,
তোমার ভয়-ভাঙা এই নামে"

তারপরে সেই বিশ্বাসের-মন্ত্রে-প্রার্থনার পাল তুলে দিয়ে বাপুজী আমাদের দুঃখের সাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন। বাপুজীর বিরহের পারাবার কি এই হতভাগ্য দেশ তেমনি করে প্রার্থনা সহায়ে পার হতে পারবে? দেশ কি এমনি করে তাঁর মহামরণের মধ্য দিয়ে মহাজীবনের সন্ধান করছে, তাঁর অন্তরের সাধনা ও সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে সঙ্কল্প গ্রহণ করছে? প্রিয়তম গান্ধীকে হারিয়ে ভারত কি আজ একান্ত দুঃখের পরিণামে শূন্য অসহায়তায় দ্বিতীয় গান্ধীর আশ্রয় খুঁজছে? তাই যেন

মহামানবের মহানিদ্রা ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত (বিশ্বশ্রী)

হয়, বাপুজীর আশীর্ব্বাদে তাই যেন হয়। বাপুজীর সাধনাকে ভারতবর্ষ যেন তেমনি ক'রেই ধারণ করতে পারে, তেমনি ক'রেই বহন করতে পারে, তেমনি ক'রেই কর্ম্মে প্রকাশ ক'রে ধরতে পারে। সে সাধনা যে ভারতেরই অন্তরের চিরন্তন সাধনা—গীতার কর্ম্মযোগীর সাধনা।

আজ এর বড় প্রার্থনা আর নেই। জওহরলালজী এই

প্রার্থনাই করেছেন। দীপ নির্ব্বাণ হ'য়েছে না বলতেই তিনি সেই অনির্ব্বাণ দীপশিখার চিরস্থায়িত্বের কথা বলেছেন। সুদূর ভবিষ্যতের মানুষও এই অমর আলোক-ধারার দান করে সত্য প্রেম ও অহিংসার পথে ভগবানের মন্দিরে পূজার নৈবেদ্য বহন ক'রে নিয়ে যাবে। এ শিখা ভারতের, এ শিখা জগতের, এ শিখা মহামানবের। যাত্রী আমরা, এই দীপশিখায় আমাদের পথের সন্ধান ক'রে নিতে হবে।

গত ১৩ই জানুয়ারী গান্ধীজী অনশন গ্রহণ করেন। তার আগের দিন অপরাহ্ণ-প্রার্থনার পর ভাষণে তিনি বলেন, "অনশন-গ্রহণের সিদ্ধান্ত আলোর চমকের মত আমার অন্তরে দীপ্ত হয়ে ভেসে উঠেছে।" তাঁর অপূর্ব্ব কর্ম্মময় জীবনের বড় বড় সিদ্ধান্তগুলি এই আলোর চমক। এক একটা সিদ্ধান্ত ভারতের ভাগ্যকে বহন করে অগ্রসর হ'য়েছে নিবিড় পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে। এই আলো ভিতরের আলো—গীতার সেই অন্তর্জ্যোতিঃ

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।

অন্তরে যাঁহার আনন্দ, অন্তরে যাঁহার শান্তি, অন্তরে যাঁহার জ্ঞানের জ্যোতি, এ আলোর চমক সেই রাজ্যের। রাগ-দ্বেষ সংশয়-অশ্রদ্ধার যে বুদ্ধি আচ্ছন্ন, এ রাজ্যের সন্ধান সে পায় না।

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিতা।

ইন্দ্রিয় যাঁহার বশ, তাই প্রজ্ঞা যাঁহার প্রতিষ্ঠিতা, 'মর্য্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ' মনবুদ্ধি যাঁহার ভগবানে অর্পিত সেই কর্ম্মযোগীর সম শান্ত চিত্ততলে ঐ আলো ভেসে ওঠে।

আলোর চমকের মত সেই সিদ্ধান্ত এল শান্তিবারি নিয়ে। ভারতবর্ষ গুরু দুঃখে বিচলিত হ'য়ে আছে। স্থিতধী গান্ধী অবিচলিত চিত্তে, অবিকম্পেন যোগেন' অনশনের সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়ালেন।

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকম্ ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

যাঁকে লাভ করলে অন্য কোন লাভ তদপেক্ষা অধিক বলে মনে হয় না, যেখানে স্থিতিলাভ করলে গুরু দুঃখেও মন বিচলিত হয় না, তার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন—তাঁর 'অপূর্ব্ব লোকোত্তর জীবন তার সাক্ষী। সেইখানেই ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠা—তাঁর মহাভারতীয় জীবনের চাবিকাটি সেইখানে—নহিলে তাহা বুঝা যায় না।

মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "হে মরণ, আমার সখা অনুপম।" আর বললেন, "আমার এই বিশুদ্ধ অনশন ধর্ম্মপালনের মত ফলনিরপেক্ষ—এর সুফল এরই মধ্যে নিহিত। সুফল ফলবে এই আশা ক'রে আমি অনশন গ্রহণ করছি না। আমি অনশন গ্রহণ করছি, কারণ, না ক'রে পারছি না।" 'না ক'রে পারছি না'—অনিবার্য্য মানবপ্রেম কতবারই না তাঁকে এমনি করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু প্রেমে তিনি মৃত্যুঞ্জয় হ'য়েছেন। তাই বলতে পেরেছেন, "মরণ, আমার সখা অনুপম।" তাই বলতে পেরেছেন "ধর্ম্মের অনিবার্য্য আহ্বানে আমি এই অনশন গ্রহণ করছি।...আত্মিক অনশন গ্রহণ ক'রে আমি যত সুখী হই, এমন আর কখন হই না। এই অনশন আমাকে যে-সুখ দিয়েছে সে-সুখ পূর্ব্বে আমি অনুভব করি নি।" আর বলেছেন, "এরূপ অনশন গ্রহণ করতে হ'লে দু'টি চরম যোগ্যতার অধিকারী হওয়া চাই—ভগবানে অমল বিশ্বাস, আর তাঁর অনিবার্য্য আহ্বানের উপলব্ধি।"

অনশনকে তিনি বলেছেন ধর্ম্মপালনের মতই তা ফলনিরপেক্ষ, তার সুফল তারই মধ্যে নিহিত। সর্ব্বভূত-হিতেরত কর্ম্মযোগীর কর্ম্মধারা এমনই অনুপম, নিষ্কাম কর্ম্মের এমনই গহন গতি। তাই তাঁর কর্ম্মসাধন-মার্গের নাম দিয়েছেন অনাসক্তি যোগ।

কর্ম্মযোগী গান্ধী আমাদের জীবন্ত গীতা। সত্য, প্রেম ও অহিংসা সহায়ে ভারতে তিনি যে কর্ম্মধারার সন্ধান দিয়েছেন, তারই তরঙ্গে তরঙ্গে গীতার শ্লোকগুলি তাদের জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিপূত মূর্ত্তি নিয়ে জেগে উঠেছে—'হিংসার উন্মত্ত পৃথ্বী'-কে বাঁচবার নূতন প নর্দ্দেশ করছে।

সারা পৃথিবীতে মানুষের শক্তি আজ সংযমে অপ্রতিষ্ঠ, শক্তির মত্ততায় মানুষ ধর্ম্ম ভুলেছে—যে-ধর্ম্মকে রক্ষা করতে পারলে তবে মানুষ রক্ষা পায়। মানবতার চরম অপমান আজ মানুষের বুদ্ধিকে আশ্রয় করে দিন দিন স্ফীতকায় হয়ে উঠছে। পৃথিবীময় বুদ্ধিমানরা জোট বেঁধেছে সোনার নেশায় মেতে ওঠে। ভূখা রাক্ষসী আজ শক্তিমানদের চাবুক খাবার জন্যে দুনিয়ার হাটে হাটে

ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অমিত বলশক্তির অধিকারী হয়েও মানুষ আজ ভগ্ন, ক্লান্ত, রিক্ত—হিংসায় উন্মত্ত। কর্ম্মযোগী গান্ধী সেই হিংসানলে শান্তিবারি সেচন করছেন।

দিনের প্রথম কাজ তাঁর ছিল প্রার্থনা, আর প্রার্থনার প্রথম কথা :

ঈশাবাস্যমিদম্ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

ভগবানকে সর্ব্বত্রাবস্থিত জেনে লোকব্যবহারে ত্যাগের দ্বারা, অনাসক্তির দ্বারা বিষয় ভোগ কর—কাহারও ধনে লোভ ক'রো না। ত্যাগের দ্বারা এই যে ভোগ, দেওয়া-নেওয়ার এই যে মিলন, পাওয়ার সঙ্গে ছাড়ার এই যে নিগূঢ় সংযোগ, কর্ত্তব্যসাধনের পথে এই যে অধিকারের আবির্ভাব—এই মূল সত্য এবং এই মূল সূত্র ধ'রেই গান্ধীজী সাধু-শ্রম ও শোষণহীন-কর্ম্ম ব্যবস্থার উপর নতুন মানব-সমাজ গড়তে চেয়েছেন।

বাপুজীর প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় আছে :

ন ত্বহং কামযে রাজ্যং ন স্বর্গং
নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাম্
প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্॥

রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, মুক্তি চাই না, দুঃখতপ্ত প্রাণীগণের দুঃখ নাশ হউক এই আমার প্রার্থনা। তাঁর সমস্ত জীবনের সকল কর্ম্ম এই একটি মাত্র প্রার্থনায় রূপ ধ'রে তাঁকে লোকোত্তর করেছিল। অপর্য্যাপ্ত প্রাণে অপর্য্যাপ্ত প্রেম নিয়ে বাপুজী দুনিয়ার সদর রাস্তায় মানুষের কান্নার ভিতর দিয়ে চলে গেছেন। সহস্র কর্ম্মে লক্ষ লক্ষ লোককে আকর্ষণ করে ভারতময় পরিভ্রমণ করছেন—যেন ভ্রাম্যমান্ হিমালয়। তাঁর পথযাত্রায় সারা ভারত উথলে উঠেছে—দিকে দিকে নব নব প্রেরণা, নব নব চিন্তা, নব নব কর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়েছে, নতুন আশা, নতুন সাহস জেগেছে। কিন্তু বাপুজীর মন্ত্র ছিল বৈরাগীর মন্ত্র,

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

এই ও কর্ম্মে নিষ্কামতার মন্ত্র, অনাসক্তির মন্ত্র, কর্ম্মযোগীর মন্ত্র। মানুষের শক্তি, চেষ্টা ও কর্ম্মকে সত্যের পথে ফিরিয়ে নিয়ে তিনি সংযমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, আর কর্ম্মযোগের মধ্যে তার পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। গান্ধীজীর অনুপম জীবনে পৃথিবীতে কর্ম্মযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যে যোগ, গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।

যে যোগ দীর্ঘকালবশে ইহলোকে নষ্ট হয়েছে। আমাদের

বাপুজীর চিতার চারিপার্শ্ব ঘিরিয়া বেতুরুষের লোকাঞ্জলি ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত (দিল্লী)

মহাভাগ্য, এই মহামানব আমাদের, কর্ম্মভূমি ভারতে আমাদের নিয়েই তিনি সমস্ত জগতের।

গান্ধীজীর প্রার্থনায় প্রতিদিন গীতাপাঠ হত এবং বিশেষ ক'রে পাঠ করা হ'ত যে শ্লোকগুলিতে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণিত আছে সেই গুলি। গত কয় বৎসর ধ'রে গান্ধীজী অপরাহ্ণ প্রার্থনায় পরই ভাষণ দিতেন। প্রার্থনা-সভায় সময়ে সময়ে দশলক্ষ লোকেরও সমাবেশ হয়েছে। প্রার্থনায় রামধুন গানের সুরে ও তালে সকলকে নিয়ে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, আর ভাষণে নব্য ভারতের সকল সমস্যার মীমাংসায় এবং সকলের সকল কর্ম্মসাধনে সত্য ও নিষ্কামতার প্রয়োগ করা। এইরূপে প্রার্থনা ও

ভাষণ—একদিকে ভগবান্ একদিকে মানুষ, একদিকে ধর্ম্ম আর একদিকে কর্ম্ম, একদিকে স্বর্গ একদিকে মর্ত্ত্য, একদিকে সত্য একদিকে প্রেম—আর অনাসক্তির সূত্রে তাদের মধ্যে অপূর্ব্ব সংযোগ। এই ছিল বাপুজীর জীবন, অহিংসা, সত্য ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিধানের সর্ব্বগুহ্যতম সত্যের সঙ্গে সে জীবন যুক্ত হতে পেরেছিল ব'লে সে ছিল মুক্ত, তার গতি ছিল সরল, তার ছন্দ ছিল অমৃতময়, তার অক্লান্ত কর্ম্মসাধনার ভিতরের সুরটি ছিল বৈরাগীর একতারার সুরের মত সংযত, মধুর, মঙ্গলময়, আনন্দময়—অবিচ্ছিন্ন তার প্রবাহ।

মাধ্যাকর্ষণের বিধান যেমন বাহিরের জগতে, ধর্ম্মের বিধান তেমনি অন্তর্জ্জগতে—পালনে ব্যতিক্রম ঘটলেই তার শাস্তি অনিবার্য্য। ধর্ম্মরাজবিধি আজ পৃথিবীর রাজবিধি থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে। লালসা, মিথ্যা, প্রতারণা, শোষণ, বিদ্বেষ, হিংসা আজ বসেছে মানুষের পূজার বেদীতে। আসুরী শক্তির নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দিকে দিকে আজ আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। মানব সমাজ মহাভয়ে উদ্বেজিত। এই মহাভয়ে অভয় প্রচারিত হয়েছে বাপুজীর কণ্ঠে।

গান্ধীজী নিজ জীবনের সাধনায় কর্ম্মকে আবার ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, আর রাজবিধিকে যুক্ত করেছেন ধর্ম্মরাজবিধির সঙ্গে। কর্ম্মযোগীর এই ছিল তপস্যা। সে তপস্যা স্বাধীন ভারত গ্রহণ করবে কি? তাঁর প্রেমের ঋণ ভারতবাসী বহন করবে কি? দেশজোড়া জনতার মধ্যে দেশজোড়া প্রার্থনা রেখে বড় আশায় এই প্রশ্নই আজ মনে জাগছে।

প্রার্থনার পর বাপুজী যখন দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর সেই অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে সর্ব্বজনকে নমস্কার করতেন, তখন চোখে তাঁর কি সে চাহনি—সে চাহনিতে অমৃত ঝরে পড়ছে। মনে পড়ে যায় গীতায় শ্রীভগবানের সেই কথা—

সর্ব্বভূতস্থিতম্ যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ ক'রে সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে যিনি ভজনা করেন, তিনি যে কোন অবস্থায়ই থাকুন—সংসারের সহস্র কর্ম্মের কলকোলাহলে অথবা বিবিক্তদেশে ধ্যানাবস্থিতস্তিমিতনয়নে—তিনি আমাতেই আছেন।

আর বাপুর মুখের সেই হাসি। যে হাসি দেখে দেখে চোখ ফিরত না, আশা মিটত না, যে হাসি ঝরণার মত অমৃত ধারায় ঝরে ঝরে পড়ত—আপন সজ্জতায় আপনি সুন্দর, আপন চাঞ্চল্যে আপনি মুখর, আপন পূর্ণতায় আপনি ভাস্বর। মানুষকে ঘিরেই আনন্দকৌতুকের সেই হাসি, কিন্তু তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে শেষে তা স্থির হয়ে যেত শান্তির স্থিরভূমিতে—যেখানে সকলই অমৃতময়।

স্থিতধী হবার সাধনা তিনি করেছিলেন। স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা অর্থাৎ লক্ষণ তাঁর মধ্যে প্রস্ফুট হয়েছিল। তাই সে মহাজীবন মহাকাব্যে পরিণত হয়েছিল—তাই সে জীবন যুগের পর যুগে, শতদলে সহস্রদলে এমন করে এত মাধুরী নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র ফুটে উঠেছিল। সে মাধুরীর স্পর্শে তাঁর অর্জ্জিত বীর্য্য ও তেজও মধুময় হয়েছিল। পৃথিবীর মনীষীরা তাঁর সেই মাধুর্য্য, সেই অপূর্ব্বতা, সেই অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছে উপলব্ধি করেছিল।

ভাবীকালে যে-পথে মানুষের জয়যাত্রা হবে সেই পথ বাপুজী কেটে তৈয়ারি করে দিয়ে গেছেন। তাই হঠাৎ তিনি চলে গেছেন ব'লে পৃথিবীর লোক আপন জন হারিয়ে বেদনার্ত্ত হয়েছে। ভারতে তিনি ছিলেন বাপুজী, গান্ধী-মহারাজ। ধর্ম্মনিগল লক্ষ লোক নিয়ত তাঁর সন্ধানে ফিরত, যেমন ভ্রমরদল সন্ধান করে প্রস্ফুট কমলের। কি নিবিড় আত্মীয়তাবোধ! স্বার্থের যোগ নেই, রক্তের যোগ নেই, পরিচয়ের সূত্র নেই—তবু সে মানুষ আপনার হতে আপনার। শুদ্ধ প্রেমের গতি এমনই অমোঘ, এমনই ঘুর্ণিরীক্ষ্য। দেবমানব সেই রাজ্য রচনা করে মানুষকে কি নতুন মর্য্যাদাই না দিয়ে গেছেন।

এত সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও তিনি থাকতেন অচঞ্চল। সেই

অপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

হিমদেশের নদীর জল সমুদ্রে প্রবেশ করে। কিন্তু সমুদ্র আপনাতে আপনি পূর্ণ, প্রশান্ত, স্থির—নদীবেগে সমুদ্র-হৃদয়ে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। তেমনি স্থিতপ্রজ্ঞের অন্তর আপনাতে আপনি পূর্ণ—প্রশান্ত ও স্থির। অসংখ্য

কর্ম্মের স্রোত তার তটপ্রান্তে আঘাত করলেও তার গভীর জল অচঞ্চল থাকে। সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও মহাত্মাজীর ভিতরের মানুষটি থাকতেন অচঞ্চল—তাই সত্যের বিষান যেখানে যে রেখাপাত করত তা হ'ত উজ্জ্বল ও অবিকৃত। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত অনেক সময় আলোয় চমক বলেই মনে হত। লালসাবিক্ষুব্ধ মন, তৃষ্ণাদগ্ধ হৃদয় তার মোহাচ্ছন্ন তামসী বুদ্ধি সহায়ে ত সে পথের সন্ধান পায় না।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

অনুরাগ ও বিদ্বেষ হ'তে যিনি মুক্ত, যিনি সংযতমনা, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় উপভোগ ক'রে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই ত কর্ম্মে নিষ্কামতা, অনাসক্তিযোগের মর্ম্মকথা। গান্ধীজী সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সকল বিষয়ের মধ্যে, পার্থিব সকল ব্যাপারের মধ্যে অবাধে বিচরণ ক'রে গেছেন। কিন্তু কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর প্রবল কর্ম্মশক্তি তাঁকে সুগভীর আত্মপ্রসাদ দিতে পেরেছিল। সকল ব্যাপারেই তিনি ভগবানের সেই নির্দ্দেশ পালন করে গিয়েছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

যাহা কিছু কর, ভোজন কর, হোম কর, দান কর, তপস্যা কর সে সকলই আমাতে অর্পণ কর। তাই তাঁর কর্ম্মের বোঝা—আর সে বোঝা ত সামান্য নয়—হাল্কা হয়েছিল, সে কর্ম্মে ভাগবত ছন্দ ফুটে উঠে তা অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়েছিল, তা পুণ্যময়, প্রেমময়, আনন্দময় হয়েছিল।

গীতায় শ্রীভগবান তাঁর প্রিয় ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন :

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

গান্ধীজী ত ভগবানের এই অতীব প্রিয় ভক্তই ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্ব্বভূতের প্রতি দ্বেষরহিত, সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণাসম্পন্ন, স্বার্থশূন্য ব'লে মমত্ববুদ্ধিহীন, সকল লোকব্যবহারে নিরহঙ্কার, সুখে দুঃখে সমান এবং ক্ষমাশীল। জীবনে তাঁর কর্ম্মচেষ্টার তুলনা হয় না—কিন্তু সকল কর্ম্মের মধ্যে তিনি ছিলেন সদানন্দ, সমাহিতচিত্ত ও সংযত। সত্য ও অহিংসায় তাঁর বিশ্বাস ছিল হিমালয়ের মত অটল, আর মনবুদ্ধি তাঁর ছিল ভগবানে অর্পিত। মহাভারত-রচনায় তাঁর দেশব্যাপী বিরাট কর্ম্মচেষ্টায় কেহ উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় নি, তিনিও লোকের কারণে উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হ'য়ে কখন পথভ্রষ্ট হন নি। তিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত ছিলেন। কর্ম্মে তাঁর মত দক্ষ কে, শুচিই বা কে, ফলাফলে এমন উদাসীন আর কোথাও মেলে? তিনি ছিলেন বাসনারহিত, শত বেদনার মধ্যেও আনন্দময়। ফল কামনা ক'রে তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন নি। ইষ্টলাভে তিনি চাঞ্চল্যে আত্মহারা হন নি, শোক দ্বেষ এবং আকাঙ্ক্ষামুক্ত হয়ে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ত তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। শত্রুমিত্রে, মানে অপমানে, শীত উষ্ণে, সুখে দুঃখে তিনি চিত্তের সমতা রক্ষা ক'রেছেন, নিন্দাস্তুতিতে তিনি তুল্য ছিলেন, সহস্র কর্ম্মের মাঝেও মৌন পালন করতেন, সন্তোষ তার সহজসিদ্ধ ছিল। তাঁর নিকেতন ছিল না, কর্ম্মযোগ অবলম্বন ক'রে তিনি মুদাফিরের মত, পক্ষীর মত দেশময় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মত স্থিরমতি ভক্তিমান জগতে আর কোথায়?

একলা চল, একলা চল, একলা চল রে—এই একটা মানুষের চলার পথ ধ'রে, তারই ভরসায় ভারতবর্ষ সত্যাগ্রহের নতুন পথে যাত্রা ক'রেছে। একটা মানুষের ভরসায় চল্লিশ কোটির জড়-বিষাদ দূর হয়ে গেছে, তারই পরাধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হয়েছে, এ কথা ত আজ একান্ত অবিসংবাদী সত্য।

বাপুজীর মহাপ্রয়াণ তাঁর মহাজীবনকে চরম মহিমায় মণ্ডিত ক'রে দিয়ে গেল। শেষ আহুতির সেই মুহূর্তটি কি করুণাঘন—সত্য, প্রেম, অহিংসা যেন নিবিড় আলিঙ্গনে সেই পরম ক্ষণটির মধ্যে স্থির ও পরিযুক্ত হ'য়ে আছে। সেই চরম মুহূর্তটি স্বর্গে মর্ত্যে বাপুজীর জয় ঘোষণা করেছে। আর কালপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে যেন মানুষের সত্যসাধনার চিরসাথীরূপে বিরাজ করছে।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাপুজী শেষ কথা ব'লে গেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতার প্রাথমিক ব্যাপার যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কংগ্রেস তা অর্জন ক'রেছে। এইবার সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা তাকে অর্জন করতে হবে—তবেই ভারতে কৃষক-প্রজা-মজুররাজ বা পঞ্চায়েতরাজ গঠিত হবে। সেই পথেই আজ আমাদের কর্মচেষ্টা চলবে। সাত লক্ষ গ্রামে গাঁথা ভারতবর্ষে বাপুজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীর দলকে আজ লোকসেবার কারণে কর্মযোগ গ্রহণ করতে হবে। বাপুজীর এই শেষ আহ্বান। নিষ্কাম কর্মীর নিরলস, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সঙ্ঘবদ্ধ লোকসেবা ভারতময় বাপুজীর সাধনাকে বহন করুক। সেই পথেই ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে, সাধু শ্রমের উপর নতুন সমাজ গঠন করে পৃথিবীতে বিপ্লব ঘটাবে। গান্ধীজীর আহ্বান সেই পথে—আমাদের গান্ধীজী—সেই ধর্মস্য মূর্তিঃ শাশ্বতী!

দুর্বিষহ দুঃখের দিনে আজ ভারতের আর এক যোগী বলছেন—যে আলো পথ দেখিয়ে স্বাধীনতা এনেছে সেই আলোই পথ দেখাবে, যতদিন না ভারতবর্ষের জয় সম্পূর্ণ হয়।

জয়তু গান্ধীজী, জয়তু গান্ধীজী, জয়তু গান্ধীজী।

জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস

যাঁর অনির্বাণ তপস্যার ফলে স্বাধীনতার স্বাদ পেলুম তাঁরই জীবনশিখা নির্বাপণ করে ও করতে দিয়ে মহাপাতকের ভাগী হলুম আমরা চল্লিশ কোটি নরনারী। সময় থাকতে যদি মহাপ্রায়শ্চিত্ত না করি তবে স্বাধীনতা আমাদের ছাড়বেই, লক্ষ্মী তো অনেকদিন ছেড়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ মহাপাপের তুলনা নেই, কারণ এ অকৃতজ্ঞতার তুলনা নেই। বার্তা যখন কানে এলো প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস যখন হলো বার বার প্রার্থনা করলুম, হে ভগবান, আমাদের মার্জনা করো। আমাদের ক্ষমা করো।

ইহুদীরা এখনো ক্ষমা পায়নি, দু' হাজার বছর ধরে সাজা পেয়ে আসছে। মান নেই, ইজ্জৎ নেই, বাসভূমি নেই, এক স্থান থেকে অপর স্থানে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, নিহত। কেন তাদের এই শাস্তি? কারণ তারা তাদের প্রেমিককে বধ করেছিল। আমরাও তাই করেছি। আমাদের পাপের পরিমাণ বেশী, কারণ আমাদের প্রেমিক আমাদের মুক্তির স্বাদ দিয়ে গেছেন।

জগতের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে মাথা আমাদের আবার হেঁট হলো। এই অর্ধ অবনমিত জাতীয় পতাকা কি আবার সগর্বে উড়বে? কে জানে সে কত কাল পরে! তেরো দিন, না তেরো বছর, না তেরো শো বছর!

জনগণের শাশ্বত ক্ষুধা তিনটি। স্বাধীনতার ক্ষুধা, শান্তির ক্ষুধা, অন্নের ক্ষুধা। স্বাধীনতার ক্ষুধা তাঁরই সাধনায় মিটেছে। শান্তির ক্ষুধা তাঁরই প্রভাবে মিটতে যাচ্ছিল। অন্নের ক্ষুধা তাঁরই গঠনপ্রতিভায় মিটত। তাঁকে যারা অকালে অপসারণ করল তারা কোটি কোটি নিরন্নের মুখের গ্রাস কেড়ে নিল। আর কেড়ে নিল জীবনের শান্তি।

জানিনে প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতি কী, মেয়াদ কতকাল। যে অধর্মবুদ্ধি, যে বিবেকহীনতা সমাজের উচ্চতম স্তর থেকে এ অপকর্মের প্রেরণা ও প্ররোচনা দিয়েছে, হয় তার সংশোধন ঘটবে, নয় তার আশ্রয় ভাঙবে। সমাজের উচ্চতম স্তর ধূলোয় লুটোবে, রাশিয়ার মতো।

হয় চিত্তবিপ্লব, নয় সমাজবিপ্লব। আর নয়তো স্বাধীনতা বিলোপ। সেই সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ, মন্বন্তর। নৈতিক অধঃপতনের শাস্তি এমনি নিষ্ঠুর।

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

১৮৬৯—২রা অক্টোবর গুজরাটের অন্তর্গত পোরবন্দরে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম করমচাঁদ বা কাবা গান্ধী, মাতার নাম পুতলিবাঈ।

১৮৭৬—তাঁহার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তাঁহার পিতা দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী হইয়া রাজকোটে যান। এই বৎসরই রাজকোটে তিনি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।

বাল্যাবস্থায় গান্ধীজী

ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্যে

১৮৮৩—তের বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম কস্তুরাবাঈ।

১৮৮৬—গান্ধীজীর বয়স যখন ১৬ বৎসর তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

১৮৮৭—ম্যাট্রিক পাশ করেন।

১৮৮৮—ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশের পর গান্ধীজী ভাবনগর কলেজে অধ্যয়ন করেন। তৎপর ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁহার মাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, বিলাতে গিয়া তিনি মদ্যপান করিবেন না, মাংস খাইবেন না এবং স্ত্রীসংসর্গ করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা বিলাতে তাঁহাকে বহু প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

১৮৯০—একটি প্রবর্ণমেন্ট মেডিক্যাল জন্য তিনি প্যারিসে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ৭ দিন ছিলেন।

১৮৯১—১০ই জুন তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া ১২ই জুন ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। দেশে পৌঁছিয়াই গান্ধীজী শুনিতে পাইলেন, কিছু দিন পূর্বেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। দেশে ফিরিয়া প্রথমে তিনি কয়েক মাস বোম্বাইতে ব্যারিষ্টারী করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বোম্বাই হইতে তিনি রাজকোটে যাইয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। তাঁহার মাসিক আয় ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

১৮৯৩—দাদা আবদুল্লা নামক এক ধনী ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বড় ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩.৭ লক্ষ টাকার একটা মামলা চলিতেছিল। ঐ মামলা সম্পর্কে তাঁহারা গান্ধীজীকে এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিতে চাহেন। তিনি তাঁহাদের এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন।...ট্রান্সভালে তাঁহাদিগকে ফুটপাথে চলিতে

লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়ার সময় গান্ধীজী (১৮৯০)

ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্যে

দেওয়া হয় না। গান্ধীজী প্রাতঃভ্রমণের জন্য একটা রাস্তার ফুটপাথ দিয়া রোজই যাইতেন। সেই রাস্তায় প্রেসিডেন্ট ট্রুগারের বাড়ি ছিল। একদিন একজন বুয়ার পাহারাওয়ালা তাঁহাকে ঐ বাড়ির ফটকের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় এবং লাথি মারিয়া ফুটপাত হইতে নামাইয়া দেয়।

১৮৯৪—তিনি নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস গঠন করেন এবং জীবিকা অর্জনের জন্য ডারবানে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন।

১৮৯৬—পরিবার লইয়া যাইতে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষে আসেন। বোম্বাইতে ফিরোজ শা মেটা ও দিন শা ওয়াচার সাহায্য ও সহানুভূতিতে এক সভা করেন। শ্রীযুক্ত গোখলে এবং লোকমান্য তিলকের সহিত এই সময়েই তাঁহার পরিচয় হয়। ১৮ই ডিসেম্বর তিনি ডারবানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফিরিয়া যান।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগত সপত্নী গান্ধীজী

ফটো—বৈদিক ভারতের সৌজন্যে

১৮৯৯—ভারতীয় এম্বুলেন্স বাহিনী গড়িয়া বুয়র যুদ্ধে সাহায্য করেন।

১৯০১—গান্ধীজী আবার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। এই বৎসর বীমতী এছলজী ওয়াচার সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই প্রথম তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। কয়েক মাস বোম্বাইতে ব্যারিষ্টারী করিবার পরই আবার তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার ডাক পড়ে। তখনই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া যান।

১৯০৩—"ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান" পত্রিকা প্রকাশ করেন। ডারবানে ফিনিক্স আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৬—১১শে আগষ্ট ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের ফেরেটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম "এশিয়াটিক অর্ডিনেন্স বিলের" খসড়া প্রকাশিত হয়। এই

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহী গান্ধীজি

ফটো—বৈদিক ভারতের সৌজন্যে

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু বিদ্রোহের সময় ভারতীয় এম্বুলেন্স বাহিনীর ক্যাপ্টেন (১৯০৬)

ফটো—বৈদিক ভারতের সৌজন্যে

আইনের উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং যাহারা ঐখানে থাকিবে তাহাদিগকে দাসী আসামীর মত করিয়া রাখা। সংবাদ পাইয়া গান্ধীজী ট্রান্সভালে চলিয়া যান। ১১ই সেপ্টেম্বর এই আইনের প্রতিবাদে এক জনসভায় গান্ধীজী প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ নীতি ঘোষণা করেন।

১৯০৭—এই অর্ডিনান্সের প্রতিবাদে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করেন এবং জনসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করেন।

১৯০৮—ট্রান্সভাল ছাড়িয়া যাইবার আদেশ অমান্য করিবার জন্য ১০ই জানুয়ারী তিনি ২ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু ৩০শে জানুয়ারী জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত আপোষ হওয়ায় তিনি মুক্তি পাইলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী এক ভারতীয় ভুল বুঝিয়া তাঁহার জীবন-নাশের চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন। জেনারেল স্মাট্‌স চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় ১৬ই আগষ্ট পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ১৫ই অক্টোবর মহাত্মাজী ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯০৯—"হিন্দ্ স্বরাজ" নামক পুস্তক রচনা করেন।

১৯১০—জোহেনসবার্গের সন্নিকটে 'টলষ্টয় ফার্ম' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১১—সহকর্মীর পতনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মহাত্মাজী প্রথম ১ সপ্তাহ ও পরে ১৪ দিন অনশন করেন।

১৯১৩—ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় তিনি পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন এবং ১১ই নভেম্বর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু ১৮ই ডিসেম্বর বিনা সর্তে মুক্তিলাভ করেন।

১৯১৪—এশিয়াটিক অর্ডিনেন্স উঠিয়া যাওয়ায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সাফল্যমণ্ডিত হয়। তিনি ইংলণ্ডের পথে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৯১৫—২৫শে মে আহমেদাবাদে সত্যাগ্রহ আশ্রম (পরে সবরমতী আশ্রম) স্থাপন করেন।

১৯১৬—নীলকর চাষীদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। আন্দোলন সফল হয়।

১৯১৯—ইয়ং ইণ্ডিয়া (ইংরাজী) ও নবজীবন (হিন্দী) পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। ১৩ই এপ্রিল অনশন করিয়াছিলেন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আইন অমান্যের জন্য তিনি সত্যাগ্রহ সভা গঠন করেন। ৬ই এপ্রিল হরতাল ঘোষণার দ্বারা ভারতব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং সেই হরতাল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কেই অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনায় সারা দেশ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহার পরেই জালিয়ানওয়ালাবাগের শিহরণ জাগ্রত অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই কংগ্রেসেই দেখা যায়, জনসাধারণ আপনা হইতেই গান্ধীজীকে নেতৃরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে।

১৯২০—সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজী অসহযোগের প্রস্তাব করেন। এই কলিকাতা কংগ্রেসই কংগ্রেসের ইতিহাসে নূতন গান্ধীযুগের সূচনা করে। কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবানুসারী সারা বৎসরব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের আলোড়ন উপস্থিত হয়। আইন-সভা বর্জন, স্কুল কলেজ বর্জন, আইন-আদালত বর্জন, বিলাতী দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি সাফল্যমণ্ডিত হয়। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ কর্মপন্থা গৃহীত হয়।

১৯২১—আমেদাবাদ কংগ্রেসে নিরপস্ত্র আইন অমান্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে বহু লক্ষ নরনারী কারাগারে প্রেরিত হন। বহুলোক পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হন। ১৭ই নভেম্বর যোবাই যাত্রার জন্য তিনি অনশন করেন এবং ১৩ই নভেম্বর অনশন ভঙ্গ করেন।

কস্তুরাবাঈ গান্ধী ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্যে

১৯২২—ফেব্রুয়ারী মাসে নিরপস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ১০ই মার্চ রাজদ্রোহের অভিযোগে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮ই মার্চ আমেদাবাদের দায়রা জজ কর্তৃক গান্ধীজী ৬ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯২৪—ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী কারামুক্ত হন। বেলগাঁওতে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেসের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বেলগাঁও কংগ্রেসের পর গান্ধীজী রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং চরকা প্রচারে ব্রতী হন। কংগ্রেসের অসহযোগ নীতি স্থগিত রাখা হয়। ঐ বৎসর গান্ধীজী নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ গঠন করেন।

১৯২৫-২৯—গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর উত্থাপিত এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এক বৎসরের মধ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি

নেয়র কমিটির শাসনতন্ত্র গ্রহণ না করেন, তবে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার নামে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবে। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে সমস্ত ভারতে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধী মার্চ মাসে সবর্মতীকে চব্বিশজন সঙ্গীর পর আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করিয়া দেন।

১৯৩০—১২ই মার্চ ৭৯জন সত্যাগ্রহী সহ লবণ আইন অমান্যের জন্য ডাণ্ডী যাত্রা করেন। ৫ই মে বিনা বিচারে বন্দী হইলেন। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স পুনরুজ্জীবিত হইল। এই আন্দোলনে সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় বাঙ্গলার বাহিরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও দেখা দিল।

১৯৩১—২৬শে জানুয়ারী বড়লাট ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সভ্যগণের সহিত মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেন। ৫ই মার্চ, 'গান্ধী-আরউইন' চুক্তি হয় ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। ২৯শে মে গান্ধীজী 'রাজপুতানা' জাহাজে করিয়া রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাত যাত্রা করেন।

১৯৩২—বোম্বাইয়ে মণি ভবনে ৪ঠা জানুয়ারী গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর আমৃত্যু অনশন করেন। পুনা চুক্তির ফলে তিনি ২৬শে সেপ্টেম্বর উপবাস ভঙ্গ করেন।

১৯৩৩—৮ই মে আত্মশুদ্ধি ও কর্মীদের শুদ্ধির জন্য ২১ দিনের উপবাস আরম্ভ করেন এবং ঐ দিনই তাঁহাকে জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। গান্ধীজী আইন অমান্য এক মাসের জন্য স্থগিত রাখিয়া ঘোষণা করেন। পুনরায় ১লা আগষ্ট মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্তা কস্তুরবা গান্ধী, মহাদেব দেশাই ও সবরমতী আশ্রমের আরও ৩০জনকে সেঠ রণছোড়-লালের বাংলো হইতে গ্রেপ্তার করিয়া সবরমতী জেলে লইয়া যাওয়া হয়। ৪ঠা আগষ্ট পুনার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ৭ই অক্টোবর হইতে তিনি হরিজনদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশে সফর করেন। এই সফরকালে একশ্রেণী সঙ্কীর্ণচেতা হিন্দু তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল।

১৯৩৪—১লা অক্টোবর হইতে রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া পল্লীশিল্প, হরিজনসেবা ও বুনিয়াদী শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৯—৩রা মার্চ রাজকোটে অনশন আরম্ভ করেন, কিন্তু বড়লাটের মধ্যস্থতায় প্রতিনিবৃত্ত হন।

১৯৪০—৪ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব পুনরায় গ্রহণ করেন। ১৩ই অক্টোবর ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্থির হয় যে, ব্যাপকভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন না করিয়া মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ বিরোধী বক্তৃতা করিয়া সত্যাগ্রহ সুরু করা হইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ, বহু কংগ্রেস নেতা ও বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীরা এই সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়া কারাবরণ ভোগ করেন।

১৯৪২—২৭শে মার্চ স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সঙ্গে দেখা করেন। ৮ই আগষ্ট মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব বোম্বাইতে এ-আই-সি-সিতে গৃহীত হয়। ৯ই আগষ্ট মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহাত্মা জাতিকে "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যান। গান্ধীজীকে আগা খাঁ প্রাসাদে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৭ই আগষ্ট মহাদেব দেশাইএর মৃত্যু হয়।

১৯৪৩—১০ ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী পুনায় খণ্ডিবিবাদে (আগা খাঁ প্রাসাদে) অনশন আরম্ভ করেন। ৩রা মার্চ তিনি ২১ দিন ব্যাপী অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৪৪—২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্তা কস্তুরবাই গান্ধী পুনায় প্রাসাদকারায় পরলোকগমন করেন। ৬ই মে তারিখে মহাত্মা গান্ধী বিনা সর্তে মুক্তিলাভ করেন।

১৯৪৫—জুন মাসে সিমলায় নেতৃসম্মেলনে বৃটিশ প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনায় মহাত্মা গান্ধীকে বৈঠকের সময় সিমলায় উপস্থিত থাকিবার জন্য লর্ড ওয়াভেল অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৬—এপ্রিল মাসে সন্মিলনীতে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স এবং স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাত্মাজীর সহিত আলোচনা করেন। অতঃপর মে মাসে সিমলায় মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত বড়লাট ও বৃটিশ মন্ত্রীসভার সদস্যদের বৈঠক হয়। অতঃপর জুন মাসে হরিজনে এক প্রবন্ধে গান্ধীজী অবিলম্বে ভারত হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের দাবী জানান। ১০ই অক্টোবর নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়। ৭ই নভেম্বর গান্ধীজী দাঙ্গাবিধ্বস্ত পূর্ব্ব বঙ্গ পরিদর্শন করিবার জন্য নয়নজুলে চৌমুহনী পৌঁছেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া নোয়াখালি দাঙ্গার ভাঙ্গনলীলা দেখেন।

১৯৪৭—২রা জানুয়ারী প্রাতে গান্ধীজী চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা

শান্তি অভিযানে মহাত্মাজী ফটো—বৈদেশিক ভারতের সৌজন্যে

করেন এবং এখান হইতে তাঁহার ঐতিহাসিক পল্লী পরিক্রমা সুরু হয়। নোয়াখালি পরিক্রমায় গান্ধীজীর বিরাট জীবনের আর একটি বিরাট আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। পল্লীর প্রতি গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অত্যাচারিত মানবের সেবা করিতে আর কোন মহাপুরুষকেই ইহার পূর্বে দেখা যায় নাই। ৩রা মার্চ গান্ধীজী নোয়াখালী পরিক্রমা শেষ করিয়া শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখান হইতে বাঙ্গা-বিহার বিহার অভিমুখে যাত্রা করেন। ১২ই মার্চ বিহার পরিক্রমা সুরু হয়—২৪ দিন পর লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে মহাত্মাজী দিল্লী অভিমুখে রওনা হন। ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারত স্বাধীন হইবে। তাঁরা জুন পুনরায় ভারতবর্ষ বিভক্ত করিয়া ভারত ও পাকিস্থান নামক দুইটি ডোমিনিয়ন গঠন করার কথা ঘোষিত হয়।

গান্ধীজী ভারত বিভাগের প্রস্তাবে অত্যন্ত দুঃখিত হন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য তিনি এই প্রস্তাব স্বীকার করেন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১লা এপ্রিল দিল্লীতে এশিয়া মহাসম্মেলনে গান্ধীজী অখণ্ড বিশ্ব গঠনের ইচ্ছা ঘোষণা করেন। ৭ই এপ্রিল হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য তিনি ২৪ ঘণ্টার জন্য অনশন করেন। ১৪ই তাঁহার জাতির প্রতি ঐক্যের আবেদন প্রচারিত হয়। ইহাতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করিয়া দেশের লোককে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইতে অনুরোধ করা হয়। ৮ই মে পুনরায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার হয় এবং গান্ধীজী ভারত বিভাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

অজন্তায় ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত (দিল্লী)

আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে গান্ধীজী কাশ্মীরে যান এবং কাশ্মীরবাসীদের ইচ্ছানুযায়ী কাশ্মীরের ভবিষ্যত নির্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই সময়ে কলিকাতা দাঙ্গার খবরে গান্ধীজী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন এবং কলিকাতা আগমন করেন। তিনি বেলিয়াঘাটার দাঙ্গা-

বিহারে শান্তি অভিযানে মহাত্মা

ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্যে

বিধ্বস্ত অঞ্চলের এক পরিত্যক্ত মুসলমানের বাড়িতে জনাব সুরাবর্দিসহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের এক অভূতপূর্ব স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পুনরায় দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ায় গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর দাঙ্গা থামিয়া যায় এবং কলিকাতায় পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। নেতৃবৃন্দও শান্তি রক্ষার রাখিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করেন।

১৯৪৮—১৩ই জানুয়ারী হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজী অনির্দিষ্ট কালের জন্য দিল্লীতে অনশন আরম্ভ করেন। ১৮ই জানুয়ারী অনশন ভঙ্গ হয়। ২০শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় মহাত্মার ১৫ গজ দূরে একটি বোমা পড়ে কিন্তু তিনি কোনরূপ বিচলিত না হইয়া বক্তৃতা করিতে থাকেন। ৩০শে জানুয়ারী ৫টা ৫ মিনিটে এক ঈশ্বরের গুলিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবনাবসান হয়। ৩১শে জানুয়ারী রাজঘাট সমাধির সন্নিকট যমুনা তীরে এই সর্বত্যাগী ফকিরের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়।

গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী। তখন আমরা দিল্লীতে।

বিকালে বন্ধুবর শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষের গৃহে বসে আলোচনা করছিলাম—কংগ্রেসের পুনর্গঠন সম্বন্ধে গান্ধীজীর নূতন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় আমার গৃহ হ'তে কোন (phone) করল—আততায়ীর গুলির আঘাতে মহাত্মাজী নিহত। বিশ্বাস হ'ল না কথাটা। সত্যই এত বড় উন্মাদ কেউ হ'তে পারে—এ যেন কল্পনায়ও আসতে চায় না। ফোনে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা হ'ল—খবর সত্য।

এক মুহূর্তে যেন সব অন্ধকার মনে হ'ল। সুরেনবাবুর আগ্রহ হ'ল—তখনই একবার বিরলার গৃহে যাওয়া। আমার ইচ্ছা পক্ষকোণে

দিল্লীর রাজপথে মহাত্মার শব সহ বিরাট শোভাযাত্রা ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত, দিল্লী)

নিজের মনকে নিয়ে কিছু সময় একলা থাকা। সুরেনবাবুকে প্রায় ক'াকি দিয়েই নিজের গৃহে চলে এলাম। বাসায় ঢুকে দেখি বসবার ঘরে ৩।৪টি লোক ব'সে আছে। তাদের এড়িয়ে নিজের কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কিছু সময় পরেই সুরেনবাবুর আহ্বান এল—বিরলা গৃহে যেতে হবে। যেটুকু সময় বিরলা ভিলায়, তার জন্য যেন নিজেকে গুছিয়ে নেবার কিছু অবসর পেলাম।

আমাদের জীবনে গান্ধীজী কখনও তেমন ভাবে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশের বহুপূর্বে আমরা রাজনীতি সুরু করেছি। ছোট বয়স হ'তে রাজনীতির যে শিক্ষা-দীক্ষা আমরা পেয়েছি এবং রাজনীতির যে রূপ আমাদের জীবনের একটা বিশেষ অংশকে আকর্ষণ ও মুগ্ধ করেছিল, তার সঙ্গে গান্ধীজীর রাজনীতির একটা বেশ পার্থক্য ছিল। ১৯২০ সালে জেলে থাকতেই আমরা গান্ধীজীকে গ্রহণ করেছি;—কিন্তু তাঁর সব কিছু গ্রহণ করি নি। অন্ধভক্ত হিসাবে তাঁর কাছে আমরা যাই নি;—গিয়েছি তীব্র সমালোচক হিসাবে—কিন্তু তাঁর গুণগ্রাহী হ'য়ে। গান্ধীজীর ভক্তদের যে একটা বিশেষ গণ্ডী ছিল, আমরা কোন দিনই তার ভিতর ছিলাম না। আমাদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক জীবন মূলত গান্ধী-নিরপেক্ষই ছিল।

তবুও গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদ এমন বিমোহারা হয়েছি কেন? কলিকাতা থেকে বন্ধুবর শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখছেন—"আজ মনে হচ্ছে যেন হাতের আর কোন আশা করবারই নেই। তার পায়ের তলা থেকে পৃথিবীর মাটি যেন সরে গেছে; তার চোখের সামনে থেকে যেন সব আদর্শ মুছে গেছে। কি সম্বল নিয়ে যে আজ জাত চলবে ভেবে পাই না…।"

সুরেনবাবু ত' অসুস্থ ও দুর্বল শরীর নিয়ে সেই রাত্রি এবং তার পরদিন সকাল থেকে রাত ৯টা পর্য্যন্ত ছুটাছুটি ক'রেই বেড়িয়েছেন—গান্ধীজীর মৃতদেহের একটু মুখ দেখবার জন্য।

আমাদের মনের অবস্থা থেকে বুঝতে পারি—কংগ্রেস নেতৃবর্গের মনের অবস্থা কি হতে পারে। সেদিন রাত্রে বিরলা-ভবনের সামনে সমবেত জনতাকে শান্ত-ভাবে চলে যাবার জন্য জওহরলাল ভগ্নপ্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে থেমে থেমে বলছিলেন। জওহরলালের সঙ্গে সমবেত জনতা হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে সুরু করেছিল।

জওহরলালের প্রথম কথা হ'ল—আলো নিভে গেছে। তাঁর চোখের সামনের আলো, জাতির চোখের সামনের আলো সব নিভে গেছে।

ঠিক এর ৭ দিন পূর্বে আমি দিল্লী এসেছি। ১৮ই গান্ধীজী উপবাস সুরু করেন, তার ২।৩ দিন পর ২০শে তাঁর উপর বোমা নিক্ষেপের চেষ্টা

যায়। তার ২।৩ দিন পরই আমরা দিল্লী এসেছি। ঐ উপবাস ও বোমা নিক্ষেপে হত্যার চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এসে দেখলাম—গান্ধীজীর প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার চেয়ে বিরাগ ও বিরক্তিই প্রবল। গান্ধীজী হিন্দুদের উপর জুলুম করছেন—এই মনোভাব প্রায় সর্বব্যাপী। মুসলমান ও পাকিস্থানের তোষণের জন্য তিনি ব্যগ্র—এই অভিযোগ প্রায় সর্বত্র। রোজ রোজ প্রার্থনাদিক সভায় তিনি যে ভাষণ দিচ্ছিলেন—তা কারুর কান দিয়েও ঢুকছিল না, মনকেও স্পর্শ করছিল না। দিল্লী শহরে অযাচিতভাবে এসে অনেকে আমাদের জানিয়ে গেছে—তারা সবাই কংগ্রেসেরই লোক, কিন্তু তার জন্য এখনি মুসলমান তোষণের সমর্থক তারা নয়। এর পর যে সব বাকী থাকল তা সাধারণত জনসমাজে বলার নয়।

এই আবহাওয়ার গত কয়মাসের মধ্যে রাষ্ট্রের বহু লেখক লেখার অসম্ভব প্রসার ও প্রতিপত্তি হয়। আজ যারা গান্ধীজীর মৃত্যুতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে না ঘরের না ঘাটের মতো দলের ও হিন্দুমহাসভার ঘাড়ে লাফি মারতে ছুটছে, ৩০শে জানুয়ারী বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তাদের অনেকেই ঐ দল ও ঐ মহাসভার অনুকূল মনোভাব ছড়িয়ে বেড়িয়েছে।

আজ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করলে অনেকে দেখবে—যারা গান্ধীর মৃত্যুর জন্য কেবল মদনলাল ও গোড়সেই দায়ী নয়—সাধারণ জনতাও অনেকটা দায়ী। গান্ধীজীর মৃত্যুর খবরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন মহলে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। এই ভাবে মিষ্টি বিতরণ আপনা থেকে হয় নি; একটা ষড়যন্ত্রের নির্দেশেই এটা সম্ভব। ষড়যন্ত্রকারীরা জানত বা মনে করত—দেশে যে আবহাওয়া চলছে—যে মনোভাব বাড়ছে, তাতে গান্ধীজীর হত্যাকে মিষ্টি বিতরণের মতো উপযুক্ত ঘটনা ব'লে লোকে মনে করবে। এই মনোভাব প্রচার করেছে কে? এই আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে কে? কংগ্রেস অনুরাগী সাধারণ হিন্দু জনতাই এই মনোভাব ও এই আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। নিজেদের কৃতকর্মের এই লোচনীয় পরিণতি দেখে আজ তারা স্তম্ভিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাসে" পুত্রশোকাতুরা মা দেবতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

"শুধু কি দুখের বাক্য শুনেছ দেবতা
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা!"

আজ দেশবাসীর মনের অবস্থা ঐ পাগলিনী মোক্ষদার মনের মতো। ক্ষুব্ধ আর্তের তাড়নায় তারা কংগ্রেসকে ও গান্ধীকে গাল দিয়েছে—গান্ধীকে দেশের ও হিন্দু ধর্মের শত্রু বলে অভিশাপ দিয়েছে। কিন্তু এটা ছিল তাদের ক্ষুব্ধবুদ্ধির বিরক্তির কথা—অন্তরের কথা নয়। তারা অন্তরের অন্তরে জানত—কংগ্রেস ও গান্ধী ছিন্ন তাদের সত্যিকার ভিন্ন কেউ নেই। কলিকাতায় দাঙ্গায়, নোয়াখালীর হাঙ্গামায় গান্ধী ও কংগ্রেসই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—সুখে-দুঃখে কংগ্রেস ও গান্ধীই তাদের বল ও ভরসা দিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা এনেছে গান্ধী ও কংগ্রেস; এই স্বাধীনতাকে সমাজে ও জীবনে রূপ দিয়ে ফুটিয়েও তুলবে—গান্ধী ও কংগ্রেস। অন্ধকার ও দুর্যোগের মধ্যে এই আশা নিয়েই তারা ছিল।

দুঃখ ও দৈন্য চারিদিক থেকে মানুষকে ছেয়ে ফেলেছে। যেখানে কোন পথের সন্ধান নেই—সেখানে তারা তাকিয়েছে কংগ্রেস ও গান্ধীর দিকে, পথের সন্ধানের জন্য। চারিদিক থেকে হিংসা ও বিদ্বেষের পাগলা ঢেউ আসছে। দেশের জনতা ভরসা করছে—গান্ধী ও কংগ্রেসের তরণী চড়ে তারা ঢেউ উত্তীর্ণ হবে। খাবার নেই, পরবার নেই; দেশবাসী আশা করেছে যাদুমন্ত্র বলে কংগ্রেস ও গান্ধী এই সব

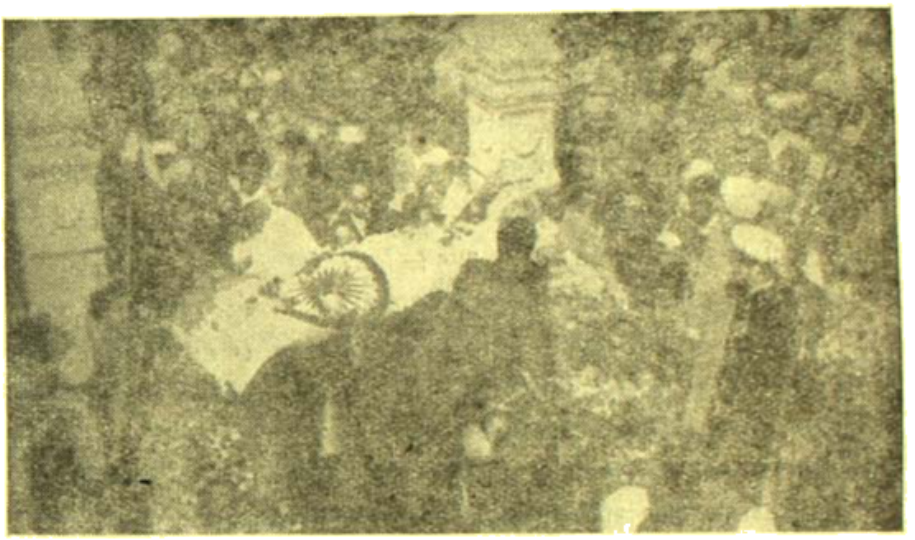

দিল্লীর রাজপথে শোভাযাত্রার একাংশ ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঘুচিয়ে দিবে। আশে-পাশে সর্বত্র আমরা চোরাবাজার ও অসততার দোকান খুলে রেখেছি—আমরা আশা করেছি গান্ধী ও কংগ্রেস সব বন্ধ করে দিবে। আশা আমাদের সর্বমুখী; কিন্তু সেই আশা পূরণ করার মতো উৎসাহ ও উদ্যম আমাদের নেই। গান্ধীর মুক্ত মন্ত্র যেন সব আলমারে ফুটে পড়বে। এই রাষ্ট্র তরী যখন ঘোর অনিশ্চয়তা ভিতর ধারণ করে প্রায় ডুবু ডুবু ঠিক তখন ইংরাজ তা বেদখলীর হাতে দিয়ে সরে পড়ল। বেদখলীর আশা ও বাসনা রইল অফুরন্ত; কিন্তু তা খাটাবার পুরুষের সুযোগ রইল না কিছুই। সবই নবীন সাপেক্ষ;—দীর্ঘ দিনের চেষ্টার প্রয়োজন আছে এর সবটাতেই।

কিন্তু অভাবগ্রস্ত ক্ষুব্ধ মানব বিচারের দিক দিয়ে ত ভাবে না;—তারা ভাবে ও নিজেদের নিজেদের দাবীর দিক দিয়ে। তাতে করেছে নিরাশ। ১৯শে আগষ্ট থেকে ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে তাদের কোন অভাবই মিটেনি। তার উপর এসেছে—মূল-উৎপাটিত লক্ষ লক্ষ নূতন

নারী। বাড়ি ঘর ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়ে, আদরের কন্যা, ভগিনী স্ত্রীকে অপরের বিলাস সামগ্রী হ'তে দেখে—আত্মহারা, সম্বলহীন লক্ষ লক্ষ নরনারী এক একটি অস্ত্রাঘাতের অর্পিত হ'য়ে দেশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে এর জন্য দায়ী? চারিদিক থেকে ঘুর উঠছে—কংগ্রেস ও গান্ধী। দেশের নেতা কংগ্রেস, দেশের নেতা গান্ধী। তাই অবনত মস্তকে সবাই সব দায়িত্বের বোঝা তারা স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। দেশ বিভাগের সময় যারা ছিল সুখের স্বপনে শত মুগ্ধ,—দেশ বিভাগের ঠিক প্রাক্কালে যারা এর জন্য ব্যবস্থাদি নিয়েছে বেশ আনা—এই মূল উৎসারিত মানবের দুঃখ দহনের সামনে তারা গিয়ে দাঁড়াল মুখবিকৃতে। তখন তারা কংগ্রেসের দিকে অঙ্গুলি হেলিয়ে সরে পড়ল। কিন্তু কংগ্রেস ও গান্ধী জানত—দেশের সমগ্র সুখ-দুঃখের দায়িত্ব তাদের। তারা যে কারুর দিকে অঙ্গুলি হেলিয়ে নিরাপদ কোনো স্থানে দাঁড়াতে পারে না। সমুদ্র মন্থন করেছে অনেক রাঘবদ্বয় মিলে; কিন্তু যখন তা থেকে বিষ উঠল, তখন ডাক পড়ল নীলকণ্ঠের। বিভাগের সমুদ্র-মন্থন থেকে যে বিষ উৎসারিত হ'য়েছে—কংগ্রেস ও গান্ধী নীলকণ্ঠের মতো তা ধারণ করল। যার যত দোষ-ত্রুটি, যার যত অপরাধ সবাই সব এনে ফেলেছে—কংগ্রেস ও গান্ধীর স্কন্ধে। তারাও তা মেনে নিয়েছে;—কারণ বিভাগের ভিতর দিয়ে দেশকে চালাবার দায়িত্ব যে নিয়েছিল কংগ্রেস ও গান্ধী।

কাজেই শুরু হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে গ্লানি;—বিরাট স্তরে হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপ। আর সেই সুযোগে বাম ও দক্ষিণে যে যার মত গুছাবার প্রয়াস পেয়েছে। আজ গোড়সের বিরুদ্ধে সবার রাগ—রামপন্থীরা আজ সর্দার পেটেলের মুণ্ড দাবী করেছে—কেন গোড়সেকে হত্যা থেকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। অথচ করবার পূর্বে যখন গোড়সের কুৎসাপূর্ণ কাগজের বিরুদ্ধে বোম্বাই সরকার ৯০০০৲ টাকা জামীন দাবী করেছিল, তখন সব রামপন্থী কংগ্রেসকে পেটাবার এক ভাল যষ্টি হিসাবে তা প্রয়োগ করেছিল। সবাই মিলে চাঁদা তুলে ৯০০০৲ টাকার পরিবর্তে ১০০০০৲ হাজার টাকা গোড়সের হাতে তুলে দিয়েছিল।

যে মহামানব পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর গায় হাত তুলতে সাহস পেল এই গোড়সে। মানবতায় যিনি অতুলনীয়, মহত্বে যিনি বিরাট, সাধিকোণ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, কর্মে যিনি অমিত, ধর্মে যিনি মহীয়ান, মর্মে যিনি সকলের অন্তরঙ্গ—সেই গান্ধী—ক্ষীণকায় কটিবাস গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। দেশের অন্তরে যে অন্ধ বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়েছিল—এই গুলি তারই স্ফুরণ। নতুবা গোড়সে বা এমনি কোন লোকের পক্ষে এই দুঃসাহস হ'তে পারে না।

গান্ধী বিপ্লবী, গান্ধী যুগপ্রবর্তক। যে যুগে তাঁর জন্ম, সেটা তাঁর পক্ষে অতীত। তাঁর সমকালীনদের পক্ষে সে যুগ এখনও অনাগত, সত্যিকার ভাবে দেখতে গেলে, গান্ধী ছিলেন সেই যুগের। যে মতবাদ তিনি প্রচার করতেন, যে আদর্শের প্রেরণা তিনি দিতেন, যে পথে তিনি চলতেন—তা সবই আজকার মানবের অনধিগম্য। কাজেই এই বেখাপ্পা মানুষটিকে তারা বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তাই যুগপ্রবর্তক বিপ্লবীর মৃত্যু আর এমনি অবস্থাই হয়।

খ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন যাদবের ঔরসে; বুদ্ধ জন্মেছিলেন মায়াদেবীর উদরে প্রসব শূল-যাতনা ভোগ করে; সক্রেটিস জন্মেছিলেন বিষ পান করে—আর যিশু জন্মেছিলেন ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হ'য়ে—সাধারণ চোর ডাকাতের সঙ্গে। এর মধ্যে সক্রেটিস ও যিশুকে তাঁদের নিজ নিজ সমাজ গ্রহণ করে নি। সমাজের তরফ থেকে তাদের দণ্ড দেওয়া হ'ল—মৃত্যুদণ্ড। সক্রেটিসের সময়ে গ্রীসে মৃত্যুদণ্ড পালিত হত বিষপ্রয়োগে; আর যিশুর সময় পেলেষ্টাইনে তা পালিত হ'ত ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ ক'রে। কিন্তু খ্রীকৃষ্ণকে ও বুদ্ধকে তাঁদের সমাজ থেকে দণ্ড দেয় নি—বরং বলা যায় সমাজ তাঁদের গ্রহণ করেছিল। আজ গান্ধীর মৃত্যু এল আততায়ীর গুলিতে। এটা সমাজের প্রদত্ত দণ্ড নয়। কিন্তু এ'কথা ভুললে চলবে না যে আততায়ী হলে মুক্ত সাধুবাদ বিনায়ক গোড়সে কেবল একটা আলেয়া নয়; সমাজের বক্ষ থেকেই সে উঠেছে। পূর্বে বলেছি সমাজের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষের যে বাষ্প জমছিল, ঐ আততায়ীর গুলি তারই স্ফুরণ, সমাজের একদিকে গান্ধী ও অপর দিকে গোড়সে; এই দুইটি মানুষ।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে—প্রত্যেক জাতি তার যোগ্যতা মতো নেতা পায়। গান্ধী—মৃত্যুঞ্জয়ী গান্ধী ভারতের অবিসংবাদিত নেতা। এই যুগে আমরা যারা জন্মেছি—এটা আমাদের যোগ্যতারই পরিচায়ক এবং আমাদের গৌরবেরই বিষয়। গান্ধী আমাদের স্বাধীনতার দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। জগতের ইতিহাসে কোন জাতির স্বাধীনতা লাভের ঘটনা পরম্পরায় যদি কোন নেতার কিছুমাত্র কৃতিত্ব থাকে, তবে ভারতের স্বাধীনতা লাভে গান্ধীর তা আছে। সত্যিকারভাবে তিনি "Father of the nation"—জাতির জন্মদাতা—স্রষ্টা। তা সত্ত্বেও, স্বাধীনতার দ্বারদেশে এসেই আমরা তাঁর প্রতি নির্মমভাবে চললাম। তবুও তিনি বলে চললেন—তাঁর যা বলার ছিল। যত তিনি বলে যাচ্ছেন—যত তিনি আমাদের কর্মের ও চিন্তার ত্রুটি দেখাচ্ছেন—ততই তাঁকে আমরা অস্বীকার ক'রে চলেছি। তারপর এল আততায়ীর গুলি। বিদ্বেষান্ধ জাতি—আত্ম-সম্বিত ফিরে পেল। আজ জাতি শোকে বিহ্বল। কি সে হারিয়েছে—তা হয় ত এখন বুঝছে।

সক্রেটিসের মৃত্যুর পর গ্রীস শোকে বিহ্বল হয় নি;—যিশুর মৃত্যুর পর ইহুদি জাতি শোকে বিহ্বল হয় নি। কিন্তু কৃষ্ণ ও বুদ্ধের মৃত্যুর পর ভারত শোকে বিহ্বল হয়েছিল;—আর আজ গান্ধীর মৃত্যুর পর ভারত শোকে বিহ্বল হয়েছে। জাতি আজ গান্ধীকে সত্যিকারভাবে গ্রহণ করেছে। জীবিত গান্ধীকে জাতি যতটা গ্রহণ করেছিল—মৃত গান্ধীকে জাতি তার চেয়ে বেশী ক'রে গ্রহণ করবে। নতুবা তাঁর এই আত্মাহুতির সার্থকতা কোথায় ও কিসে মিলবে?

জীবনের ও সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে গান্ধী তাঁর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা তিনি এনে দিয়েছেন, এখন এই স্বাধীনতাকে সমাজে ও অর্থনীতিতে ফুটিয়ে তুলবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভারতে এতকাল

হিন্দু-মুসলমানের মিলিতির জাতি তিনি চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন—বিদেশী শাসন থাকতে এই মিলন সম্ভব নয়; তিনি এও জানতেন—বিদেশী শাসনের অবসানের পর হয়ত আমরা আত্ম-কলহে বিনষ্টিত হব। কিন্তু একথাও ব'লে গেছেন—এখানেই এর শেষ নয়;—আত্ম-কলহের ভিতর দিয়ে আমরা পরস্পরকে একদিন যাতে চিনতে পারি—তার জন্য আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে স্থির ও ধীর রাখতে হবে।

যখন যেন স্বাধীনতা লাভের উল্লাসে উন্মত্ত, যখন কৃতজ্ঞ জাতি তার প্রষ্টার মূর্তির-দ্বারে গিয়ে তাঁর প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবার যোড়জোড়ও করছে, তিনি বললেন—তাঁর স্বাধীনতা এখনও আসে নি; বিশ্রামের বা উল্লাসের সময় তাঁর এখনও আসে নি। তিনি ছুটে চললেন—নোয়াখালীর দিকে। মানুষের মর্যাদা যেখানে অপমানিত হয়েছে;—তাকে পুন-প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমেদাবাদের নবরচিত আশ্রম ১৯৩০ সালে ত্যাগ ক'রে এসেছিলেন,—স্বাধীনতা না এলে আর সেই আশ্রমে যাবেন না। ভারত স্বাধীন হয়েছে;—যাঁরা এতকাল ভারতের মতো সেখানে তাঁর চরণ পূজা করছিলেন—তাঁরা আহ্বান দিলেন—স্বাধীন ভারতে তুমি ফিরে এসো নবরচিতে। তিনি বললেন—না, আমার স্বাধীনতা ও এখনও আসে নি; নবরচিত এখনও বহু দূর, নোয়াখালি যাবার পথে—তিনি আটকে গেলেন কলিকাতায়। কারণ তাঁর নিকট নোয়াখালি ও কলিকাতা দুটো বিভিন্ন সমস্যা বা স্থান নয়।

নোয়াখালী ও কলিকাতা তাঁর জীবনের পরম সাধ ও চরম সার্থকতা। নোয়াখালীতে যে বীজ বপন করেছিলেন, কলিকাতার সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বেরুল। এই অঙ্কুর থেকে গাছ হ'বে; তাতে ফুল হবে ও ফল হবে। তিনি জেনেছিলেন—ফিরীতে অঙ্কুর গাছটা দেখতে পাবেন;—কিন্তু পেলেন না। নিজের রক্ত দিয়ে সেই অঙ্কুরের গোড়ার মাটিকে তিনি সরস ক'রে দিয়ে গেলেন।

এই গাছ একদিন বড় হবে;—তাতে ফুল হবে—ফল হবে।. এই সাধনায় দীক্ষাই ত' তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। যখন অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন—যখন কোথাও এতটুকু আলোর রেশ নেই—তখন নিজের অন্তরের আলো জ্বালিয়ে অন্ধকারের বক্ষ চিরে পথ করতে চেয়েছিলেন। অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে আলোর পথ তিনি তৈরি করেছেন। এই পথ ধরে আমাদের যেতে হবে নূতন উষার দেশে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে, একদিন বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন ভারতের ধর্মবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে, একদিন আচার্য শঙ্কর চেয়েছিলেন কুমারিকা হ'তে হরিদ্বার এবং দ্বারকা হ'তে পুরী পর্যন্ত সমস্ত ভারতকে নূতন ধর্মে দীক্ষা দিতে; একদিন শ্রীচৈতন্য চেয়েছিলেন—পুরী, কুমারিকা, মালিক, দ্বারকা, বৃন্দাবন, সমন্বিত ভারতে মানবতার ধর্ম উদ্ভূত করতে। ইতিহাস বলে—এদের সবাইর নাকি অপমৃত্যু হয়েছিল। আজ গান্ধী চাহিলেন—অহিংসা ও প্রেমের ভিত্তিতে ভারতে নূতন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। মহৎ প্রয়াসের স্বভাবগত—বিয়োগীর মৃত্যু তাঁর হ'ল। আমরা ক্ষুদ্র-বুদ্ধির লোক, তাই কেন করি। কিন্তু মহতের মৃত্যু এই রকমই হয়। একেই বলে জীবনকে আহুতি দেওয়া; নিজের জীবন দিয়ে জীবন-যজ্ঞ সমাপন করা।

কিসের জন্য তিনি এমনি ক'রে জীবনকে আহুতি দিলেন? ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের ঐক্য স্থাপন, হিন্দু মুসলমানের সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা—এই কি তাঁর জীবনের শেষ কথা? না, তা নয়। তাঁর যা বাণী তা দেশ ও কালের অতীত—সমস্ত বিশ্বের, সমস্ত জীব-জগতের জন্য সেই বাণী। যাঁর সম্পদ মানুষ পেয়েছে প্রচুর; তা কুড়াতে গিয়ে সে তার অন্তরের সম্পদকে হারিয়েছে। তার ঐশ্বর্য ও বিলাস সম্ভারের মধ্যে মানুষ তার নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সোলজর্বিথার অন্ধকারে—সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে বের করাই হ'ল গান্ধীর পরম শিক্ষা। কেবল পরিমাণের হিসাব নিয়েই আমরা এতদিন ব্যস্ত ছিলাম;—গান্ধী এসে বললেন পরিমাণের বাইরে পরিণামের হিসাবও করতে হবে। quality যে কেবল quantityর পরিণতি নয়—তার যে নিজস্ব একটা সত্তা আছে গান্ধী সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ইতিহাস যে পথে চলছিল, তার মোড় ফিরালেন গান্ধী। এত বড় একটা বিপ্লবের ধারা মানুষের ইতিহাসে তিনি এনে দিয়ে গেলেন। নূতন ক'রে লিখবার পূর্বে ইতিহাসের পুরাণো পাতার পুরাণো লেখা মুছবার জন্য যে মানুষের অন্তরে দরকার। তাই যুগে যুগে বিপ্লবের সঙ্গে আসে নবচেতনা। সেই নবচেতনা গান্ধী সম্পন্ন করলেন—নিজের রক্ত দিয়ে লিখলেন ইতিহাসের পুরাণো লেখাকে।

৩০শে জানুয়ারী বেলা পাঁচটা পর্যন্ত যে জনতা গান্ধীর প্রতি বিরূপতায় ক্রমেই স্ফীত হচ্ছিল, সেই জনতাই ছটার সময় মৃত গান্ধীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। ইতিহাসের পুরাণো লেখা ঘুরে ঘুরে গেল;—হয়ত রাইস কেবল একটি লোকের জন্য। বার্থপরবুদ্ধির অন্ধকারে মহত্তকে অনুভব করার ক্ষমতা যার নেই আজকার দিনে করুণার স্পর্শ দিয়ে তাকে ক্ষমা করাই উচিত। অথচ ভারতের হিন্দু ও মুসলমান আজ গান্ধীর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। যে গান্ধী ছিল এক, সে আজ কোটি কোটি রূপে ফুটে উঠেছে নর-নারীর বুকে।

ধন্য আমরা—গান্ধীর দেশে এবং গান্ধীর যুগে আমরা জন্মেছি। জীবনের অক্লান্ত সেবা দিয়ে তিনি যা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, মৃত্যু দিয়ে তিনি তা প্রতিষ্ঠা ক'রে গেলেন। গান্ধী জীন্দাবাদ—অমর মহাত্মা—জয় মহাত্মা গান্ধীর জয়।

মহা অভিযান

রাধারাণী দেবী

মানব-আকারে দৈববাণী তুমি।

হিংসা-উন্মত্ত বিংশ শতকের অহিংস মানব।
তুমি মহান্ আশ্চর্য।
আশ্চর্য তোমার জীবন-বাণী
আরও আশ্চর্য তোমার জীবনের পথ-চলা।

আবার শুরু হোলো তোমার নতুন যাত্রা,—
আর এক নতুন ভাগ্তি-অভিযান ;
নবীনতম সত্যাগ্রহ—
অভিনব নির্মম অসহযোগ।

এবার শুধু আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষই নয়,
কেঁপে উঠেচে সমগ্র ধরিত্রীভূমি ;
দুলে উঠেচে সপ্ত সাগরের সকল পারের মানুষ
তোমার এই মহা অভিযানে।

জীবন-দীপ হাতে নিয়ে দুর্গম মৃত্যুলোকে
বারংবার যাত্রা করেছো তুমি।
অপরাজিত আত্মার বীর্যে ফিরে এসেছো আবার।

এবার বাক্য দিয়ে হোলোনা—
কর্ম দিয়ে হোলোনা—
কায়-মন উৎসর্গ করেও হোলোনা—
তাই, প্রাণ দিয়ে পৌঁছে দিতে হোলো বাণী
বিভ্রান্ত মানুষের প্রাণে।
জানি, এ ছাড়া তোমার উপায় রাখিনি আমরা।

একে হত্যা বলবোনা কখনই,—
একে মৃত্যু ভাবলে হবে মহাভ্রম ;
এ যে তোমার নতুন যাত্রা
মানুষের মনুষ্যত্বের দ্বারে দ্বারে।
এবার আর নোয়াখালি—বিহার শুধু নয়,
সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার অকুণ্ঠদ অসূয়াবুদ্ধির বিরুদ্ধে
তোমার চরম অভিযাত্রা।

স্ব-সমুখ আদর্শের মহান্ শক্তি বলে
শেষবার ঘা' দিতে চেয়েচ
স্বার্থান্ধ মানুষের বিবেকের রুদ্ধ দুর্গে।
তাই—
সারা পৃথিবীর হিংসাবিশ্বাসী মানব
মিলিতকণ্ঠে আর্ত বেদনায় বলছে
তুমিই চিরদিনের শ্রেয়োপথ-যাত্রী।
তুমি শ্রেষ্ঠ,
তুমিই শুভঙ্কর।

হে মহাতপস্বি! তোমার দিব্যপ্রাণের স্পর্শে
মৃত্যু হোলো আজ চির-অমরত্বে উন্নীত।

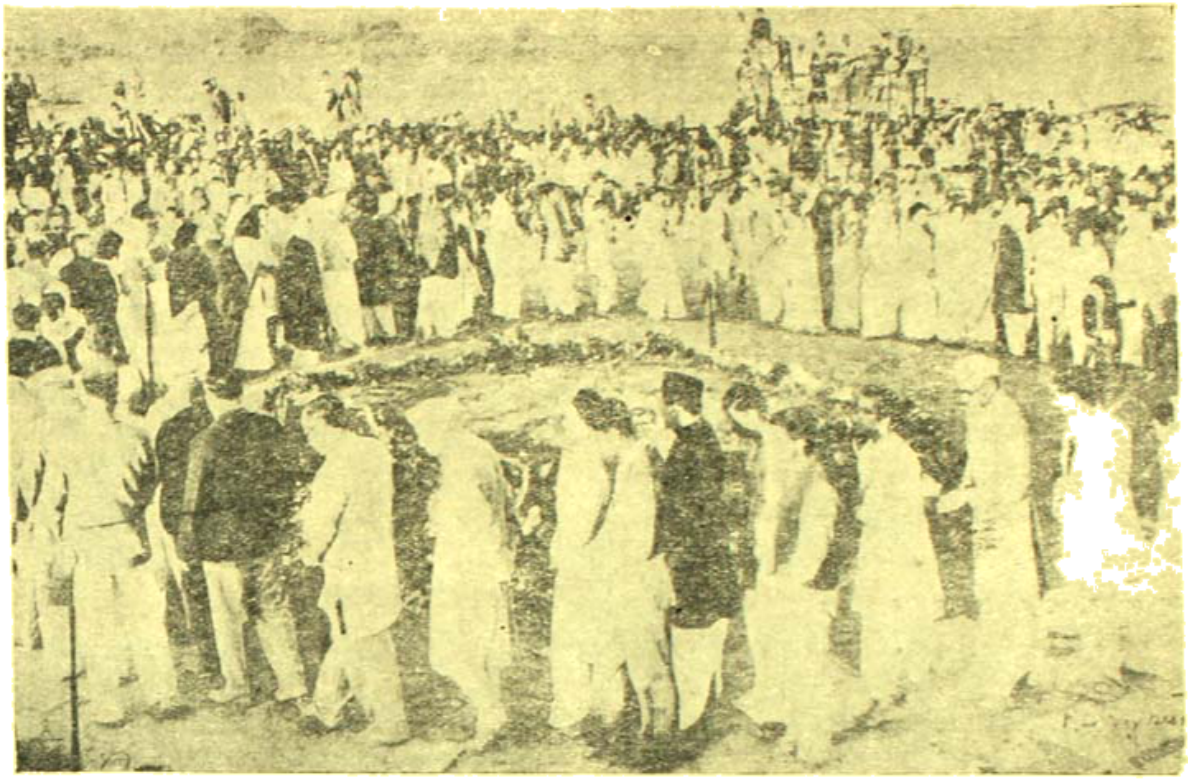

ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুহ (দিল্লী)

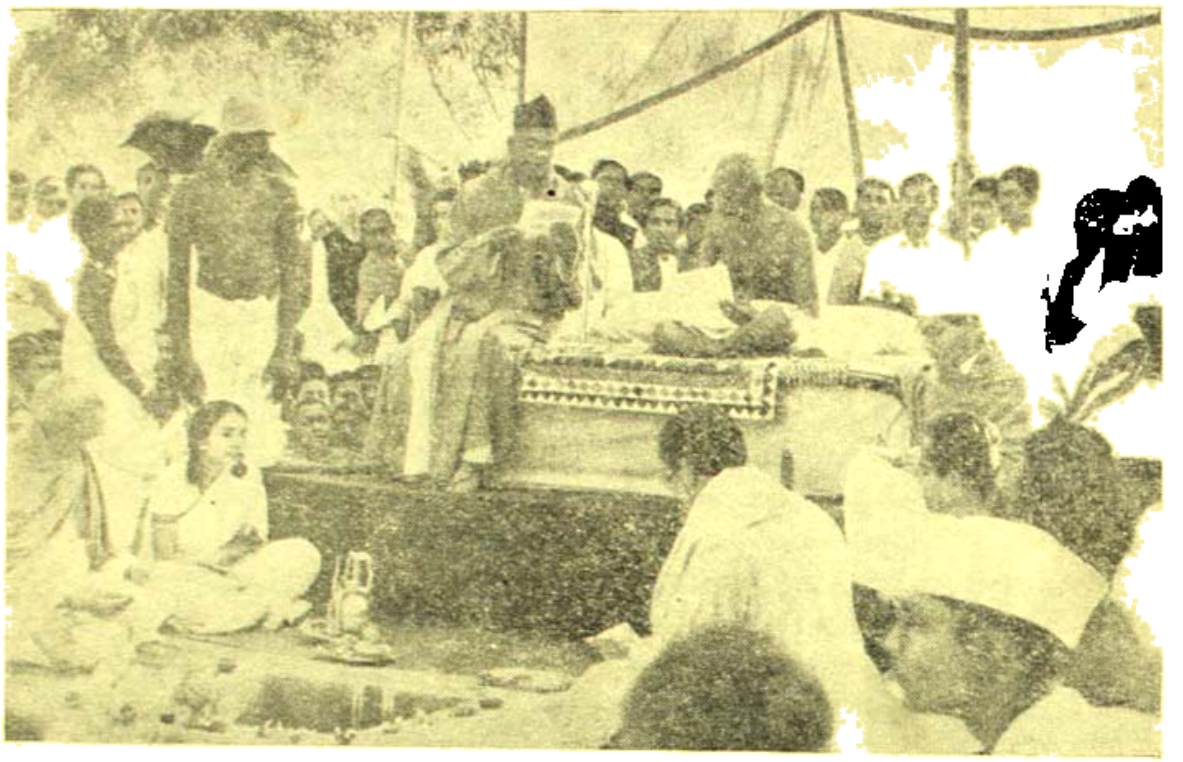

শান্তিনিকেতনে মহারাজীর সম্বর্ধনা ফটো—ডি-রতন

বাপুজী গো ! ক্ষম ক্ষম

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

শতদুঃখীর ছেঁড়োরাশি লয়ে সব যাতনার বেশে ;
এসেছিলে তুমি হে মহামানব ! চিরভিখারীর বেশে।
হলাহল যত পান করেছিলে, নীলকণ্ঠের সম।
ভিক্ষাপাত্রে প্রেম যেচে তুমি ফিরেছিলে অনুপম !
বৈরাগী ! তুমি উদাত্ত-সুরে গেয়েছিলে বারবার—
মানুষের বড় জাত নেই ভাই, একই সন্তান মার।

বাণী এ মানুষ খাঁটী হয়ে যাক্—এসারা ভারত জুড়ে—
তব সাধনার এ অমর বাণী শুনেছি—বাবাজী সুরে !

প্রেম দিয়ে প্রেম লাভ করেছিলে ; জয় করেছিলে যারা—
নিঃস্ব জাতির জাতীয়-জীবনে সম্পদ হ'ল তারা।
স্বাধীন ভারত ! সোনার ভারত ! মুক্ত ভারত তব।
তোমারই ত্যাগে রচনা করেছে—তীর্থ সে অভিনব !

সেই তীর্থের উদ্দেশে চলে—যাত্রীরা দলে দলে ;
যমুনার কূলে আসিছে মানুষ ; দুখের অশ্রুজলে !
ধরা যমুনার ঢেউ খেলে যায়—প্রেমের জোয়ার আসে—
বাংলার কবি প্রণাম জানায়—পুণ্য-স্মৃতির পাশে !

বলে : বাপুজী গো ! ক্ষম ক্ষম ;
বুদ্ধ, যীশু ও চৈতন্যের প্রতিনিধি অনুপম।

মহাত্মাজী স্মরণে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত ৩০শে জানুয়ারী দিল্লী নগরীতে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীজীর নশ্বর দেহের শেষ নিঃশ্বাস পাত হইয়াছে। জাতির পরিচালকের এই আকস্মিক তিরোধানের জন্য একমাত্র সর্ব্ববিদ্রষ্টা ভগবান ভিন্ন কেহই প্রস্তুত ছিল না। যাহা অনিবার্য্য, তা নিয়া দীর্ঘবিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু কোন শক্তি দ্বারাই ইহাকে আটকাইয়া রাখা যায় না। মহাত্মার এই আকস্মিক তিরোধানে সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান। এতদিন আমরা মহাত্মাজীকে জাতির নায়ক রূপে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিতেছিলাম, আজ তাঁকে হারাইয়া মনে উদয় হইতেছে তাঁর আবির্ভাবের দিন হইতে তিরোধানের দিন পর্য্যন্তের বিভিন্ন ঘটনা। দেশ বিদেশের বহু নরনারী বিভিন্ন কর্ম্মস্থলে এই মহামানবের সংস্পর্শে আসিয়া আপন আপন জীবন সার্থক করিয়াছেন। আজ এ দেশের সকলের মনেই উদয় হইতেছে সেই দিনটির কথা, যেদিন এই মহামানবের দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অথবা সংবাদপত্র যোগে তাঁহার অনুসরণী বাণী পাঠ করিয়া যে যে জীবন ধন্য করিয়াছেন। এই স্বাভাবিক আলো ভুনের ফলে মনে পড়ে ১৯১৫ সালের একটি দিনের কথা। বাংলার যুবকগণ বিপ্লব আন্দোলনে মত্ত, বিষমুগ্ধ আপন। বহুদিনের চেষ্টার ফলে বিদেশে ইংরেজ শত্রুদিগের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় করিয়া এ দেশে সশস্ত্র বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করা যখন আর স্বপ্ন কিম্বা বিলাস-চিন্তার বিষয় বলিয়া উপেক্ষিত নয়, তখন বাংলার যুবশক্তির বিপ্লবপূর্ণ মনোভাবের আবহাওয়ার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা ব্যারিষ্টার মিঃ এম, কে, গান্ধী বাঙ্গালীর অতিথিরূপে আসিলেন কলিকাতায়। হাওড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া নেতারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া নিরাশ হইলেন, মিঃ গান্ধীর দেখা পাওয়া গেল না। হঠাৎ দেখা গেল যে তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরা হইতে বাহির হইলেন গান্ধীজি সস্ত্রীক, নিজেদের বাক্স বিছানা নিয়া। দেশীয় পোষাকের পরিবর্ত্তে মাথায় সুবৃহৎ গুজরাটী পাগড়ী। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া একটী ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল বাগবাজারে ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ী। আমরা রাস্তার উপরের একটী বাড়ীর দোতালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, অল্প কয়জন পথিক যে ভাবে দেখিয়াছিল। বিশেষত্ব কিছু ছিল না। সাধারণ সভা হইল, অপার সারকুলার রোডে কালীনারায়ণ রায়বাড়ীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে। দক্ষিণ আফ্রিকার কথা আলোচিত হইল বাদুনি ভাবে। আমার যতটুকু মনে হয়, আন্দোলনের ইতিহাস, কর্ম্ম ও পরিচালন পদ্ধতি জানার চেয়ে আন্দোলনকারীকে দেখবার জন্যই সভা শোভনকারীদের আগ্রহ বেশী ছিল। এর পর কয়েক বছর বাংলা

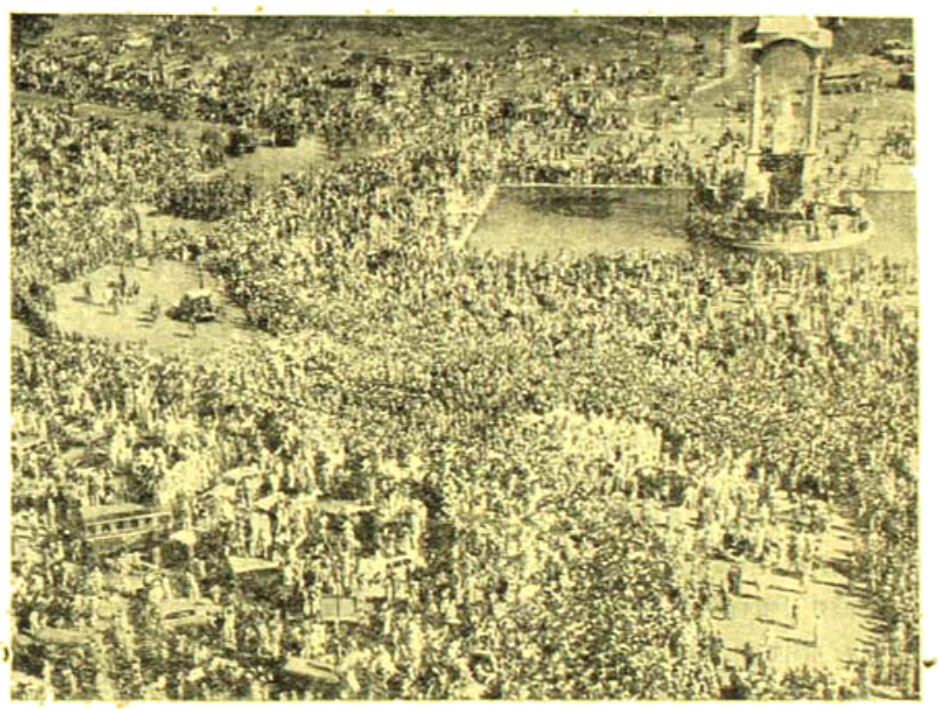

শবানুগমন

যেদে বিপ্লববাদের চেয়ারলীলা চলিতে লাগিল। নির্য্যাতন আহ্বানে অগ্নি পরীক্ষায় জয়ী হইয়া বাংলার হাজার হাজার যুবক স্থান পাইল কারাগারের নির্জ্জন কক্ষে। ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয় গান গাহিয়া মরণ-দোলায় দুল জাতিকে অমর করিয়া, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া মহাপ্রয়াণ করিল অনন্তের পথে। বিপ্লববাদের প্রথম অঙ্কের যবনিকা পাত হইল, দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভের কীণ মনোভাব লইয়া নিরাশার মধ্যে।

কারাগারের বিকৃত সূত্রে খবর বাহির বাতাসের সঙ্গে গান্ধীজীর চম্পারণ সত্যাগ্রহের কথা, 'বাঙ্গলার বিপ্লব' (যে বিপ্ল উপলক্ষ করিয়া

এজাসন্ত্রে ভিন্ন মতাবলম্বী দেশবাসীর কাছে 'রাইলাট্ বিল' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন) প্রতিবাদে আন্দোলন, যেমন, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে গণআন্দোলন এবং এই আন্দোলনের নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে এই মহাসমরে ইংরাজের সহায়তা করিয়া ভারতবাসী যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছে, ইংরেজ সরকার এবং ইংরেজজাতি মানবতার দিক হইতে ইহা কৃতজ্ঞতার সূত্রে গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর হস্তে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ভার প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু এই আশা সফল হইল না। ইংরেজ কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থানে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া ও জালিয়ানওয়ালাবাগের মত শত শত নিরস্ত্র, বৃদ্ধ ও শিশুর জীবন নাশ করিয়া। গান্ধীজি বিচলিত হইলেন, কিন্তু জাতিকে দৃঢ় হস্তে পরিচালন করিবার ভার গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না ; তাই ১৯২০ সালে লালালাজপত্ রায়ের সভা-পতিত্বে কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ এবং দেশবাসীকে প্রযুদ্ধ করিবার জন্য কংগ্রেসকে দায়িত্বশীল করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা। কংগ্রেসের জন্ম হইতে এ পর্যন্ত কংগ্রেস কতিপয় সহরবাসী শিক্ষিত লোকের ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীকর্তৃক প্রবর্তিত নীতির ফলে কংগ্রেসের দ্বার ভারতের প্রত্যেকটি পল্লীতে যাইবার সুযোগ পাইল। বিপ্লবান্দোলনে আমরা যাহারা কারাগারে বন্দী ছিলাম, বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ায় যে কতকটা নিরাশ হইয়াছিলাম, সে কথা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। জেলের বাহিরে গিয়া কিভাবে পুনরায় কাজ আরম্ভ করা যাইবে, এই ভাবনায় অনেকের মন চঞ্চল হইতেছিল। ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেসের এই সত্যাগ্রহ ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কাজে লাগাইবার সুযোগ ত্যাগ করা সমীচীন নহে বিবেচনা করিয়া বাংলার বিপ্লববাদীরা অনেকেই কংগ্রেসের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। যাহাদিগকে এতদিন আত্মগোপন করিয়া কাজ করিতে হইতেছিল এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া প্রকাশ্যভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়া বিপ্লববাদীরা নিজেদের কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়া দেশবাসীদের সাহায্য লাভে সক্ষম হইল।

বরিশালে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইল বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যে। এই আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধীর দর্শন লাভ করিবার আশায় বরিশালের ক্ষুদ্র সহরে যে জনসমাগম হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। মহাত্মাজী বিশেষ কার্যে অন্যত্র ব্যাপৃত থাকায় এই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অগত্যা মহাত্মাজীর দর্শনলাভে নিরাশ হইয়া তাঁহারই প্রবর্তিত "অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের" বাণী লইয়া আপন আপন পল্লীতে ফিরিয়া গেল। ১৯২১ সালের বর্ষাকালে বরিশালবাসীর আকুল আবেদনে মহাত্মাজী তাহাদিগকে দর্শন দিবার জন্য বরিশাল সহরে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে মৌলানা সৌকত আলী ও মৌলানা মহম্মদ আলী। বরিশালবাসীর নয়ন পবিত্র হইল মহাত্মাজীকে দর্শন করিয়া, কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল তাঁহার মহান্ বাণী শ্রবণ করিয়া। আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল দেশের স্বাধীনতালাভ, একজাতি, একনীতি এবং একমাত্র পন্থা।

বাংলাদেশে মহাত্মাজী প্রথম সফরকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে। দেশবন্ধুর বিরাট আত্মত্যাগ ও প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া বাংলাদেশের প্রত্যেক স্থান হইতে শত শত কর্মী আসিয়া তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নির্যাতন ও লাঞ্ছনা, কারাগারের লৌহ ফটক বিপুল কায়া-রাক্ষসীর মত মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে লাগিল দেশসেবা ও দেশসেবকদিগকে !

রাজনীতি ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে সভা কংগ্রেসে দেখা দিল মত ভেদ। মহাত্মার অনুপস্থিতিতে পরিবর্তন-বিরোধী দল পরিচালনা করিলেন রাজাগোপালাচারী। জয়ী হইয়াও বেশীদিন জয় ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য পার্টী আইন সভায় প্রবেশের পক্ষে মতবাদ সৃষ্টি করিয়া মহাত্মার আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হইল। দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আইন সভায় প্রবেশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সময় হইতে ১৯২৪ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যু পর্যন্ত মহাত্মাজী, একাগ্র চিত্তে গঠন কার্যে মনোনিবেশ করেন। ১৯২৫ সালে বরিশাল-বাসীর পক্ষে পুনরায় গান্ধীজীর দর্শন লাভ করিবার সুযোগ ঘটে। গান্ধীজি বরিশাল হইতে কলিকাতার পথে খুলনা আসিয়া দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন এবং সোজা কলিকাতায় আসেন। ১৯২৩ সালের কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পর হইতে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবো-মালিন্যের লক্ষণ যে দেখা দিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে বাঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে গোপীনাথ সাহার দেশ-ভক্তির প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করার ফলে স্বরাজ্য পার্টির উপর পরিবর্তন-বিরোধীদের মনোভাব আরও তিক্ত হইয়া উঠে। ঐ বৎসর জুন মাসে আমেদাবাদ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে ইহা আরও প্রকট হয়। মহাত্মাজী নিজে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস কর্মীদিগের প্রকৃত অহিংস মনোভাবের অভাব দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সভায় ভোটাভোটির ফলে যে তিক্ততা আসিয়া ছিল তিনি ইহাতে মর্মাহত হইলেও ধীরভাবে সহাস্য বদনে পরস্পরের মতের উপর সহিষ্ণুতা বর্দ্ধন করিয়া কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য উপদেশ দেন। এই অধিবেশন উপলক্ষে সভামণ্ডপে ও সবরমতি আশ্রমে তাঁহার কাছে বসিয়া যেরূপ দেখিয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়, উহা জীবনের পরম সম্পদ। ১৯২৩-২৪ সালে বাংলার বহু কর্মী বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হইল। আমরা জেলে স্থান লাভ করিয়াছিলাম। ১৯২৫ সালের একটী দিনে প্রাতে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সহরে জয়-কোলাহলে ধ্বনিলাম—মহাত্মা গান্ধী বহরমপুরে আসিয়াছেন। মহাত্মা এত নিকটে আসিয়াছেন অথচ আমাদের ভাগ্যে তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ হইবে না ভাবিয়া দুঃখ হইল। কিন্তু ব্যাপার ঘটিল অভিনব। বৈকালে সভা ভঙ্গের পর, মহাত্মা আসিয়া দাঁড়াইলেন জেলের পশ্চিম পাশের দেয়ালের পার্শ্বে জাতীয়তার বাঁধের উপর পূর্বদিকে মুখ করিয়া। আমরা হাসপাতালের ছাদের উপর সারিবদ্ধভাবে

হত্যাকারীর হাতে তাঁহাকে অভিশাপ করিলাম—সে বৃদ্ধ, সে সুযোগ জীবনে দুর্লভ। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তাই সংক্ষেপে বলা দরকার যে কংগ্রেস ১৯২০ সাল হইতে যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে বিপ্লবীরা সর্বতোভাবে তাহাতে যোগদান করিয়া আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু গান্ধীজীর সকল নীতি যে বিপ্লবীরা মানিয়া লইতে ছিল এতথা বলা ঠিক হইবে না। বাংলা কংগ্রেসে বিপ্লবীদের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। কংগ্রেসের ভিতর থাকিয়া বিভিন্ন গণআন্দোলনে যোগদান করিয়া কংগ্রেসকে একটা বিপ্লব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা ছিল বিপ্লবনেতাদের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন সময় মহাত্মাজী ইংরেজ সরকারের অনুমতি লইয়া কারাপ্রাচীরের ভিতরে বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে দেখা করিয়া বহু আলাপ আলোচনা করিয়াছেন ইহা দেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত নয়। বিপ্লবনেতারা কংগ্রেসের ভিতর থাকিয়া কার্য করার ফলে কংগ্রেসের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও পবিত্র গান্ধীবাদ যে ব্যাহত হইতেছিল সে কথা অস্বীকার্য নহে। হরিপুরা ও ত্রিপুরাতে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাময়িক উত্তেজনায় অনেকে গান্ধীবাদের এই পরাজয়ে উৎফুল্ল হইলেও এইরূপ দেশবাসীকে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে আজ পর্যন্তের ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

জীবন ভোর যে উচ্চ আদর্শ মহাত্মা গান্ধী জাতির চিত্তে প্রচার করিয়া জাতিকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে পরিচালনা করিতে চাহিয়াছিলেন, আজও সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকারকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়নের প্রচেষ্টায় আকুল আগ্রহে, মহাত্মাজী প্রবর্তিত পথ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিয়া অনেক সময় লোভী পশু বধিবার প্রয়াস করিয়া, স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু মনুষ্যত্বলাভ করিতে পারি নাই। তাই আজ মহাত্মাজীর অমরাত্মার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমরা প্রার্থনা করি—

"তোমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগিয়া উঠুক দেশ।"

জ্যোতিঃ যদি নিভে যায়

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

জ্যোতিঃ যদি নিভে যায়, দেহে শেষ রশ্মি,
সজ্ঞানে জপিও নাম গোপনে,
ঘোর অন্ধকার আপনার মুরারী
আনিও জ্যোতির্ময়ে স্মরণে।

জীবন যাহার লীলা, মৃত্যু তাঁহারি বশে,
ঘুরিয়া চলেছে কালচক্র,
আবার উদিবে ভানু উজলি' পূর্বাচল,
চন্দ্র উদিবে নভে বক্র।
ফুল যে ফোটালো গাছে রক্তকরবী আর
রজনীগন্ধা বনে বনে,
তাহারি সুবাসটুকু সঞ্চিত হ'য়ে থাক—
চিত্তে গোপনে মনে মনে।
নদী কি হারায় ধারা, ডুবে যায় বিন্দু,
সিন্ধু সলিলধারা বয়?
খেলা ও ভাঙার পালা, তাঁরি হাতে খেলনা
অন্তরে মানিও তা নয়।

মৃত্যু পথেতে দেখে মুখে তাঁর রাম নাম
জোড়হাতে মাগে মার্জনা,
এ জীবনে জয় নাই, এ মরণে ভয় নাই—
যাঁরা অন্তর আলিপনা।
অন্তরে আনো তাঁরে বেদনায় বরণ করি',
স্মরণে আনিও তাঁর নাম,
প্রেমে ও মৈত্রী দানে, হে কবি অমিত হোক্
ধর্ম নামক ধরাধাম!

রিক্তা পৃথিবী

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

তুলাবিশ্বাস্তহিমৌঘা রাত্রিনাশে স্থিরমতিমান
সম মান-অপমানে শত্রুমিত্রে সর্বত্র সমান
হিংসা শূন্য সত্য-সখ দীনবন্ধু নিত্যশান্তিময়
চিরমুক্ত মঙ্গল কল্প-পূর্ণ নিত্যত নির্ভয়
তুমি গীতা বাণী মূর্তি, হে পাঞ্চজন্য যুগ-অবতার
তব অন্তর্ধানে ধরা নিরাশ্রয়া করে হাহাকার!
ঈর্ষা-দ্বেষ-ক্ষুব্ধ-হিংসা ধরা বিষে করিছে দহন;
সংকীর্ণ হইয়া আসে মানুষের প্রসারিত মন;
দুর্দিনের ঘন ঘোর বিশ্বপ্রাণে বহুধা বিস্তারী
বাহু বাড়াইছে তার; দুর্বলের ত্রাস-বিদারী
আর্তধ্বনি, নির্যাতন নিরস্ত্রের নিষ্ফল ক্রন্দন,
শক্তিমান বন্ধকের বন্ধময় উচ্চ আস্ফালন,
স্বার্থপর রক্তের বন্ধুত্বহীন ছদ্ম-ব্যবহার,
পুণ্যময় ধর্মনামে পাশবিক হীন অত্যাচার
দেখিতেছি দিকে দিকে বিষাইছে জীবনের বায়ু,
তিলে তিলে ধ্বংস করে মানুষের কল্যাণের আয়ু।
তুমি ছাড়া কে রোধিবে অন্যায়ের এই অভিযান,
বিষম মানব হস্তে মানবের এই অবসান?
জাতি-ধর্ম-বিবিচারে কে করিবে আর্ত-পরিত্রাণ?
হিংসা গ্লানি রক্ত অঙ্কে কে আনিবে শান্তি পারাবার?
লাঞ্ছিতের বঞ্চিতের কে ঘুচাবে পুঞ্জীভূত ক্ষত?
আপনার পক্ষপুটে পতিতেরে কে দিবে আশ্রয়?
মানবীয়া এ ধরণী সৃষ্টি মাঝে আজি রিক্ততম,
মনুষ্য সভ্যতা আজি অস্থিহীন ভগ্নরাশি-সমা।
পৃথিবীরে ঘিরি মাঝে প্রাবণের অমানিশীথিনী।
ঘোর অন্ধকার মাঝে বসুন্ধরা কাঁদে অনাথিনী।

আজ

বনফুল

বিরাট দেশ এই ভারতবর্ষ, বিরাট এর বৈচিত্র্য, বিরাটতর এর বাণী। কতো ভাল-মন্দ, সত্য মিথ্যা, স্বাধীনতা-পরাধীনতা ধর্ম-অধর্মের জটিলতার ভিতর দিয়ে এর ইতিহাস রচিত হয়েছে যুগে যুগে। এখনও হচ্ছে।

এর বৈচিত্র্যের মধ্যেই ফুটে আছে এর বৈশিষ্ট্য। বহু সংগ্রামের সমাধান হয়েছে এখানে, বহু ধর্মের সমন্বয়, বহু বিরোধের ঐক্য। এই হিমালয়-শীর্ষ সমুদ্র-বেষ্টিত পুণ্যভূমিতে সম্মিলন ঘটেছে বহু সভ্যতার।

এই দেশের মাটির গুণেই নরঘাতক রত্নাকর হয়েছেন কবি বাল্মীকি, পরস্বাপহারী দস্যু হয়েছেন আদর্শ সম্রাট, ছদ্মবেশী তস্কর পেয়েছেন অতিথির মর্যাদা।

সেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত বহুবিধ উত্থান-পতন সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত সনাতন রূপ অম্লান আছে।

ভারতের কবি, ভারতের ঋষি—আজও—এই লেফাপা-সর্বস্ব সীমানা-বিলুপ্ত বিংশ শতাব্দীতেও অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন—"আমার ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়, আমার ধর্মে ভণ্ডামি নেই, নীচতা নেই, হিংসা নেই। আমার ধর্মের সঙ্গে যদি কোন-কিছুর সাদৃশ্য থাকে তা হচ্ছে আকাশের, যে আকাশ অনন্ত, যে আকাশে সকলেরই স্থান, যে আকাশে সূর্য চন্দ্র এবং ধূলিকণা সগৌরবে নির্বিরোধে বর্তমান। আমি বিরাটের উপাসক, আমি অল্পে তুষ্ট হই না। তৃষ্ণা আমার কাম্য, মুক্তি আমার লক্ষ্য, প্রেম আমার পাথেয়, ত্যাগ আমার আনন্দ। আমার গার্হস্থ্যের ভিত্তি পরার্থপরতায়, আমার সন্ন্যাসের আদর্শ পরহিত-ব্রতে। আমার বাণী সাম্যের বাণী, উদারতার বাণী, সৌন্দর্যের বাণী, সঙ্গীতের বাণী। সরস্বতী নদীর মতোই আমার বাণী—সরস্বতী হিমালয়-সম্ভবা, অন্তঃসলিলা, সমুদ্র-মুখিনী। তার শুভ্র কান্তিতে সকল বর্ণের সম-সম্মিলন, তার বীণার ঝঙ্কারে সর্বস্তরের শোভন সমন্বয়। কোনও একটি বিশেষ জ্ঞানের নয়, সর্বজ্ঞানের প্রতীক যে পুস্তক তাই আছে ধারণ করে' সে বাণী পুস্তক-শ্রী। যে পদ্মাসনের উপর সে বাণী অধিষ্ঠিতা তা একদল নয়, শতদল। যে হংস তার বাহন, তা মানসসরোবরবাসী আকাশচারী।"

এই বাণী, এই আদর্শ ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসে চিরকাল ধ্বনিত হয়েছে। আজও হচ্ছে।

এই ভারতবর্ষে বহু মুখোশ খসেছে, বহু শিকল টুটেছে। বহু রূপ হয়েছে রূপান্তরিত, বহু বাধা হয়েছে অবাধ, বহু শত্রু হয়েছে মিত্র।

বহু রাবণ-দুঃশাসন-কংস-জরাসন্ধ, বহু অনার্য-আর্য-গ্রীক-শক-কুষাণ-হূন-মুসলমান-ইংরেজ, বহু পুষ্যমিত্র-তোরমানা-মিহিরগুলা, বহু নাদির-চেঙ্গিস-তৈমুর, বহু ক্লাইভ-হেষ্টিংস-ডায়ার-ওডায়ার এসেছে—অবলুপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীর কিন্তু সুর বদলায়নি আজও।

রামায়ণ-মহাভারত-বেদ-উপনিষদ-গীতা-ত্রিপিটকের মহাবাণী এই ভারতবর্ষের আকাশেই তার প্রতিধ্বনি শুনেছে কোরাণে বাইবেলে জেন্দাবেস্তায়। তাকে আপনার করে' নিতে চেয়েছে, নিতে পেরেছে। খৃষ্টিয়ের শিক্ষাভিমানী কলহবিবাদী ভ্রষ্টচরিত্র স্বয়ংসর্বস্ব অভারতীয় মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের দিকে নয়—বিরাট ভারতবর্ষের বিশাল জনতার দিকে চেয়ে দেখুন—এ বাণী আজও স্পন্দিত হচ্ছে সেখানে।

মহাত্মা গান্ধিও এই বাণী শুনিয়ে গেলেন আমাদের। আজও শোনাচ্ছেন। চিরকাল শোনাবেন।

আমরা ধন্য, আমরা কৃতার্থ যে সে বাণী স্বকর্ণে শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সে মহাবাণীর বাহককে স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁর যুগে জন্মলাভ করেছি।

ঝঞ্ঝার অন্ধকারে রক্তকর্দম-পিচ্ছিল-পথে চলতে চলতে হতাশায় অবসাদে যখন আমরা ক্ষীণবীর্য হয়ে ভাবছিলাম যে, রাত্রির বোধ হয় আর অবসান নেই, তখন বুকের রক্ত দিয়ে অরুণাচলের উদয় শিখরে তিনি লিখে গেলেন—মাভৈঃ, এই পথ।

তমসা ভেদ করে' জ্যোতি নির্গত হচ্ছে।

স্মৃতি-সৌধ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

গান্ধীজীর স্মৃতি রক্ষা করিতে হইবে। যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইবার নহে, তাহা সকলেই জানে; স্মৃতিরক্ষা করিয়া মানুষ শোকে ঈষৎ সান্ত্বনা পাইতে চাহে। স্মৃতি-সৌধ সেই সান্ত্বনার অভিব্যক্তি ও বহির্বিকাশ। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সর্বপ্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা মহৎ ও সর্বোত্তম। তাই মানুষ মাত্রেই ভাবিতেছে কিরূপে স্মৃতি রক্ষিত হইলে একাধারে বিরাট বিশালত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব শোভিত ও প্রতিত এবং প্রকাশিত হইবে। মাদ্রাজের নাম পরিবর্তিত করিয়া গান্ধীপত্তম অবশ্যই করা যায়; কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট হইবে? ইহাদ্বারা কি গান্ধীজীর মহাযানবর অবন্তকাল সমীপে প্রেরণ করা যাইবে? এমন কোন্ স্তম্ভ রচিত হইতে পারে যাহা অনাগত অনন্তকাল পর্যন্ত গান্ধীজীর বিশালত্ব বিজ্ঞাপিত করিতে পারিবে? এমন কোন্ মন্দির নির্মাণ করা যায় যাহা সৃষ্টিমাত্রে মানুষ মনুষ্য-প্রেমিক মহাত্মার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিবে?

আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, গান্ধীজীর পুণ্যস্মৃতির মাতব মূর্তির পরিকল্পনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। যাহাই করি না কেন, মনে হইবে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। পটে হিমালয় আঁকিয়া কে কবে হিমালয়কে দেখাইতে পারিয়াছে? বর্ণ বিন্যাসে নীলাম্বু অঙ্কিত হইতে পারে, কিন্তু চিত্র পরিচিতি লিখিয়া দিতে হয়। 'চার্চিল মার্চ্চ—লবণ সত্যাগ্রহের বিরাট অভিযানের মর্মর মূর্তি গঠিত হইলে অর্দ্ধশতাব্দী পরিব্যাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে কি গান্ধীজীর পরিচয়ের সমগ্রাংশের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশাংশই নহে? গান্ধীজী বৃটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ কামনার দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ পরিচালিত করিয়াছিলেন ইহা যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশের জীবন-মরণ সংগ্রামে, যুদ্ধাহত সৈনিক বহন শিবিকা বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিয়া বৃটিশকে অকুণ্ঠিত সহায়তা দান, তেমনই বাস্তব সত্য। এই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারা ব্যক্ত হইবে কিরূপে? মহাত্মা গান্ধীর জীবন দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার সমষ্টিমাত্র। সৃষ্টির বহু দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মাঝে গান্ধীজী আর এক নিবিড় রহস্য।

গান্ধীজীর যে মূর্ত্তির সহিত পৃথিবী পরিচিত, সে মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কি কল্পনা করিতেও পারিত যে, এই কৌপীনধারী নগ্নদেহ নগ্নপদ ব্যক্তিটি বিলাতী পাশ ব্যারিষ্টার? এই কটীবাস-পরিহিত 'কৃষক' আখ্যাধারী ব্যক্তির লিখিত ও কথিত ইংরাজী ভাষা ইংরাজের ইংরাজীকেও পরাস্ত করিত, কয়জন লোকের পক্ষে ইহা ধারণা করা সহজ ছিল? গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত অপূর্ব্ব ও অভিনব অহিংস যুদ্ধকৌশল দেখিয়া বিশ্ব বিস্ময়-বিমূঢ়, ভূলোকের তিন চতুর্থাংশের অধিকারী, বিশ্বজিৎ বৃটিশ যাঁহার নিকট পরাভূত, সেই গান্ধীজী যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মত 'নাম' বিলাইয়া বেড়াইবেন, এই দুইই বা মানুষে বিশ্বাস করিতে কয়জনে পারিবে? সত্য সহস্র যুদ্ধের সর্ব্বাধিনায়ক, রাজনীতিবিশারদ গান্ধী, ভারতের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও কূটনীতিজ্ঞ গান্ধী মৃত্যুকালে 'রাম' নাম উচ্চারণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ইহাই কি অল্প বিস্ময়?

১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) স্বাধীনতা মহামহোৎসবের দৃশ্য স্মরণ করুন। ভারতবর্ষ (ও পাকিস্তান) প্রমোদতরঙ্গে ভাসমান। পত্রপুষ্পপতাকায় ধরিত্রী নব যৌবন সাজে সজ্জিত হইয়াছিল; স্থলে জলে, গগনে পবনে পুলকের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল। বুঝি, এত আলো আর কখনও জ্বলে নাই; বুঝি, এত গান কেহ কোনদিন গাহে নাই; বুঝি এত বাদ্য আর কোথায়ও বাদিত হয় নাই; বুঝি, আনন্দহিল্লোলে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল একাকার হইয়া গিয়াছিল কিন্তু, তাহার মাঝে গান্ধী কুত্রাপি নাই। গলে মালা পরিতেও নাই, শিরে মুকুট ধারণ করিতে নাই। বিশ্বময় গান্ধী গান্ধী রব; পৃথিবী ভরিয়া গান্ধীর জয়ধ্বনি। কিন্তু রঙ্গস্থলে নায়কের অনুপস্থিতি; গান্ধীজীকে দেখা গেল না। মানুষের অধিকার কর্ম্মে; কর্ম্ম-ফলে তাহার অধিকার নাই। ইহা কি তাহাই? নিশ্বাও জগদীশ্বরের, প্রশ্বাসও তাঁহার। ইহা কি তাহাই? তাহাই হৌক, আর নাই হৌক, এমনটি আর কে পারিয়াছে? এ শুধু ভারতেই সম্ভব; এ কেবল গান্ধীই পারেন। ঐ ১৫ই আগষ্ট, পৃথিবীর এক অজ্ঞাত প্রান্তে, বেলেঘাটার শ্মশানে গান্ধীজী মানুষের অন্তর্লুপ্ত মনুষ্যত্বের সাধনায় তপশ্চারত অবস্থায় বলিয়াছিলেন "আমার স্তুতি কেন? তাঁহার কাজ তিনি আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন। আমি সেই যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রমাত্র।" এই কথা একালে কে বলে? বলিতেন, গান্ধী। গান্ধী বিশ্বের বিস্ময়!

গান্ধীজী দুর্জ্ঞেয় রহস্য বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত, ভারতের আত্মার সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তাঁহার নিকট গান্ধীজী অতীব স্বচ্ছ, অত্যন্ত সরল। আমাদের সে পরিচয় নাই বলিয়াই গান্ধীর সহিত তুলনা করিতে আমাদিগকে নানা বেশ ও নানা ভাষ হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইতেছে। আমরা আমাদের দেশের ইতিহাস পড়ি নাই; আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তের সহিত আমাদের পরিচয় নাই; আমাদের অতীত মহত্ত্বে আমাদের শ্রদ্ধার অত্যন্তাভাব তাই আমরা গান্ধীজীর সহিত যীশুখৃষ্টের সাদৃশ্য খুঁজি; তাহারই তুলনা করি। এক অপঘাত মৃত্যু ব্যতিরেকে এতদুভয়ের তুলনার সাদৃশ্য কি আছে তাহা ত আমি ভাবিয়াই পাই না। অপিচ গান্ধীজীর মৃত্যু অপঘাতে মৃত্যু কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু মনে করি। স্বীয় বাসনাই তাঁহার দেহাবসানের কারণ; নিমিত্ত মাত্র। অনাগত ভবিষ্যৎ আমার উক্তিই সমর্থন করিবে। আমার দেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসে তাহার

প্রমাণ আছে। অমর অমিত ইচ্ছামৃত্যু বর যে ইচ্ছামাত্রে দেহত্যাগ করিতে পারে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সে হয়ত 'রূপক', সে হয়ত উপন্যাস। উপন্যাস মানুষ বিশ্বাস করে না। সে কথা থাক্। যীশুর সহিত তুলনা কি সঙ্গত? যীশু নিরক্ষর, গান্ধী মহাবিদ্যোপাধ্যায়; যীশু রাষ্ট্রজ্ঞান রহিত, গান্ধী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা; যীশু ধর্মব্যবসায়ী। অন্যরা করি, গান্ধীজীকে কেহই সে আখ্যা দিবেন না। যীশু বিনীত, গান্ধী বিনিময়ী; যীশু অক্ষম ও শান্তিবাদী, আর গান্ধী শান্তিবাদী হইলেও কর্মবীর গান্ধীর কর্মকুশলতা তুলনারহিত। বিশাল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা গান্ধীর কর্মফল—কর্মের ফল। অতুলনীয়কে তুলনা করিতে যাওয়া মানসিক বিকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। অত্যন্ত দুঃখের সহিত এ কথাটা না বলিয়া পারিলাম না। ইহার মধ্যে খৃষ্ট-বিদ্বেষের কোন কথা নাই।

গান্ধীজীর তুলনা গান্ধীজী, এই কথা যদি কেহ বলেন, আমি রাজী আছি। আর যদি তুলনা মিলাইতেই হয়, পুরাণকালে ফিরিয়া যাইতে হইবে; মহাভারত খুলিতে হইবে। তুলনা মিলিবে। দেখা যাইবে, গান্ধীর মতই আর একজন ধর্মত্রাণ, ধর্মত্রাতা, ধর্মপ্রবক্তা এই ভারতবর্ষে, এই ভারতের মৃত্তিকায় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার তরে নরদেহ ধারণ করিয়া, নরের জীবন যাপন করিয়া, কর্মান্তে গান্ধীর মতই ব্যাধ নিক্ষিপ্ত শরবিদ্ধ হইয়া ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে তাঁহার কীর্তি স্তম্ভ নাই, স্মৃতি-সৌধও কেহ গড়ে নাই, তথাপি মানুষের অন্তরে তিনি চিরঅমর্ত্য, চিরবিরাজমান, চিরজীবন্ত ও চিরভাস্বর। দেখিয়াছি, অসত্য নহে, অপূর্ণ বা অভাবনীয়ও নহে, যুগে যুগে কল্পে কল্পে তিনি আসিয়াছেন, নরদেহে নরলীলা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও তাহাই করিবেন, ইহাও বলিয়া গিয়াছেন।

আজ ভবিষ্যতের অন্ধকারে বিষাদ করিতে বসিতেছে; সেকালে কংসেরও বাধিয়াছিল, শিশুপালেরও বাধিয়াছিল; দুর্যোধনেরও বাধিয়াছিল। কলে শ্রীকৃষ্ণের বধ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল; শিশুপাল জীবন পণে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিয়াছিল; দুর্যোধন পার্থিবুতরূপী শ্রীকৃষ্ণকে নিগ্রহের চেষ্টা পাইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর জীবনে কি অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব আছে? জীবদ্দশার কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিই, মৃত্যুর পরের স্নেহ ও মমত্ব স্বীকারে অনুদারের পরিচয় কি পাওয়া যায় নাই? শিশুপাল সেকালেও ছিল, একালেও আছে, বোধ হয়, চিরকাল থাকিবে।

দেষের আরোপ আমি করিতেছি না; আমাদের নিকট গান্ধীজী মাটীর অপরের মাটীর মানুষ ছিলেন, তাহাই থাকুন। যে ছুপে তিনি মাটীর দেহ ধারণ করিয়া মর্তে বাস করিয়া গিয়াছেন, আমরাও যে সেই ছুপে, সেই কালে বাস করিয়াছি ইহাতেই আমাদের মনুষ্যজন্ম ধন্য হইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি; আমরা কেহ কেহ তাঁহার সান্নিধ্য সংলাপের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি, কখনও বা তাঁহার সহিত কথা কহিবার মহাভাগ্য আমাদের হইয়াছে, কত বা কেহ চরণরেণু শিরে ধারণ করিয়া অনুই কৃতার্থন্য মানিয়াছি। আমাদের কাছে তিনি মানুষ—মানুষের মত মানুষ, মানুষের মধ্যে মানুষ, মানুষের সেরা মানুষ হইয়াই থাকুন। ভারতের বহুভাগ্যে ভারত আবার একটি আলোকের স্তম্ভ দেখিয়াছিল, উজ্জ্বলের হিমালয় দর্শন করিয়াছিল, বর্তমান ধন্য হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু একদিন আসিবে যেদিন বর্তমান অতীত হইবে; আজিকার বাস্তব ভূতে বিলীন হইবে। সেদিনের মানুষ কি করিবে? সেদিন কি তাহারা পুরাণ অন্বেষণ করিবে না? নূতন করিয়া মহাভারতের সন্ধানে ব্যাপৃত হইবে না? আজই, এই গান্ধী-যুগে, গান্ধী বৎসরে বাস করিয়াও যাহার উচ্চতার পরিমাণ করিতে না পারিয়া বিপুল বিস্ময় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতেছে, যাহার মহত্ত্বের তুলনা করিতে গিয়া জ্ঞান হারাইয়া বসিতেছে, বিশ্বব্যাপ্ত বিস্তারিত হিংসার অন্ধকারের মধ্যে অপরিম্লানজ্যোতিঃ স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল স্নেহধারা বর্ষিত হইতে দেখিয়া প্রত্যক্ষকেও অপ্রত্যয় করিতে উদ্যত হইতেছে, আর, যে-অনাগত ভবিষ্যৎকাল গান্ধীজীর মানবদেহ দেখে নাই, তাঁহার সেই কোমলমৃদুকণ্ঠস্বর শুনে নাই, শুধু ইতিহাসে পড়িবে, লোকমুখে কাহিনী শুনিবে, জনশ্রুতিতে পরিবর্তিত গল্প গাথা প্রাপ্ত হইবে, তাহারা যদি পুরাকালের মত আমাদের চোখে দেখা মহাত্মা গান্ধীর মুখেও

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

বাক্যপরম্পরা সংযোজিত করে, তাহা হইলে কে তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিবে? আর প্রতিনিবৃত্ত করিবেই বা কেন? গান্ধীজীর সহিত তাঁহার পার্থক্যই বা কোথায়? পার্থক্য যদি বা থাকে, কতটুকু?

আমরা যাঁহার কথা লিখিতে বসিয়া জীবন ধন্য, লেখনীকে পুণ্য-পবিত্র করিতেছি তাঁহার জীবনের প্রতিক্ষণই কি আমরা দেখি নাই? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কে করিয়াছিল? আমাদের স্বাধীন ভারত (ও পাকিস্তান) রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কে? কুরু পাণ্ডব, বিবদমান এই দুই পক্ষের দ্বিধার্থ শান্তিদৌত্য কে করিয়াছিল? যোদ্ধাদের পরিক্রমা কি কোন অংশে ন্যূন? যুদ্ধমান অথচ অযুদ্ধমানঃ ও কুরুক্ষেত্র রণসঙ্কুল মধ্যে নিরস্ত্র থাকিয়া সেই একজনই পারিয়াছিলেন; বিংশ শতাব্দীর দ্বিধা ভারতে হিন্দু মুসলমান মিলনে সাধনে একজনই মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' সার করিয়াছিলেন। ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, রণক্ষেত্রে সেদিনও গীতা কথিত হইয়াছিল, আজও হইয়াছে। পাঞ্জাব জ্বলিয়া গিয়াছে, সিন্ধু বিক্ষুব্ধ, সীমান্ত তমসাবৃত, দিল্লী বিষণ্ণপ্রায়, তারই মাঝে কি ঐ একজন মানুষই—একটি অস্ত্রাঘাতই ক্রোধ, ঘৃণা, দ্বেষ, রোষবিবর্জিত অনুদ্বিগ্নচিত্তে গীতাই পুনরুক্ত করিলেন না?

আমি আগেই বলিয়াছি, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা মহাভারত অধ্যয়ন করি নাই; আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে আমরা চিনি না, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পঠন-পাঠনে আমাদের রুচি ছিল না, এখনও নাই। তবে একথা সত্য যে, থাকিলে ভাল হইত। নৈতিক ও ধর্মশিক্ষার অভাবে আমাদের নৈতিক জীবনের অপমৃত্যু না ঘটিলেই মঙ্গল হইত। পতিত উষর ভূমিতে বীজ বপন ও বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলভোগের পূর্বেই

গান্ধীজীকে জীবন বলি দিতে হইত না। যাঁহারা ক্রম-বিবর্তন ও ক্রম-বিকাশে বিশ্বাসী, আশা করি তাঁহারা আমার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। একটি সর্বলোকপরিজ্ঞাত দৃষ্টান্ত দিলে আমার কথা আরও পরিষ্কৃট হইবে। আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের ক্রমবিকাশ আশা করি সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, সুরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধ আন্দোলন, অগ্নি যুগ ও সন্ত্রাসবাদ উহার ও পরিণত ক্ষেত্র কর্ষণ ও মোক্ষণ করিয়া পূর্বেই অগ্নিতে বীজ বপিত হইয়াছিল, তাই গান্ধীজীকে বৃক্ষরোপণে সুযোগ পাইতে বিলম্ব হয় নাই। শতাব্দীর এক পাদ মধ্যেই পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে। গান্ধীজীর সাধনা সার্থক হইয়াছে; দীর্ঘকালব্যাপী জাতির জীবন-মরণের যুদ্ধে জয়লাভও ঘটিয়াছে। একদিকে এই বিরাট সাফল্য, অন্যদিকে নৈতিক অধঃপতন! একদিকে পর্বত অধিরোহণ, অন্যদিকে শোচনীয় অবতরণ। ভারতের অপার দুর্ভাগ্য নৈতিক অধঃপতন রোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাহার ফল ভারতবাসী ভোগ করিবে না ত কে করিবে? মহাত্মাজী বালী ছিলেন তাহাই; সাধক রামপ্রসাদের ভাষায় তিনি তাল কৃষিকাজ জানিতেন, তাই কসল করিয়া স্বর্ণ ফলাইয়া গিয়াছেন। মহাভারতের কালে মহামানব শ্রীকৃষ্ণ এই মহাভারতে ধর্ম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের সাধনা করিয়াছিলেন। তাহার জন্য তপঃ জপ, যজ্ঞ, কৃচ্ছ্রসাধন সমস্তই করিয়াছিলেন; হীনতা দীনতা স্বীকারেও কুণ্ঠা করেন নাই; অবিশ্বাসী বিপক্ষ সভাস্থলে মহাত্মা যোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও ভারতবর্ষে ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ, সাধন, তপস্যারই বা তুলনা কোথায়? তাঁহার মত দীনতা ও হীনতা স্বীকার করিতেই বা কয়জন মনুষ্য পারিয়াছে? শ্রীকৃষ্ণ পারিয়াছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ, প্রেষ্ঠ মনুষ্য হইয়াও অতিহীন দৌত্যকার্যেও তাঁহার রুচির অভাব হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর জীবনেও এমন কি দৃষ্টান্তের অভাব আছে?

বিদুরের ক্ষুদ কুঁড়ার গল্পটি বোধ হয় সকলেরই জানা আছে; মোগলাই 'ডাট'টিকে তাহার পার্শ্বে রাখিলে কিছুমাত্র বেমানান্ হইবে কি?

দ্রুপদের রাজধানীতে দ্রুপদ রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার কৃষ্ণ স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। একদিকে ছদ্মবেশী পঞ্চ 'ব্রাহ্মণ', অপরদিকে সাবর্তীয় রাজন্যবর্গ—সুরক্ষিত, সুশোভিত, সুরভিত সভা শোণিত স্নাত হইতে চলিয়াছে, ধর্মাধর্মের কথাটা কে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল? কে বলিয়াছিল, রাজন্যবৃন্দ, ঐ পক্ষ ব্রাহ্মণ কর্তৃকে পাঞ্চালীকে লাভ করিয়াছেন,তাঁহাদের বিরুদ্ধতা করিয়া আপনারা অধর্ম করিতেছেন! কাশ্মীর-যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটী মুদ্রা আটক করায় ভারতবর্ষ উল্লসিত হইয়াছিল। 'যেমন কর্ম তেমনি ফল!' ভাবিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইয়াছিল? বাধা দিবারও কেহ ছিল না। কিন্তু ধর্মের কথাটা কে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। জীবন পণ করিয়া কে ভারতসরকারের ধর্ম মতি ফিরাইয়া আনিয়াছিল? দুর্যোধনের মত পাপিষ্ঠ ও দুরাচারীর প্রতি সৎ ও ন্যায়াচরণ না করিলেও সাধারণ মানুষের ন্যায়জ্ঞান দূর হইতে না; কিন্তু অসাধারণ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়বোধ অত সহজ হইতে বড়ও ও উচ্চ। মহাভারত পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, দ্বৈপায়ন হ্রদ তটে দুর্যোধনের সহিত শেষ গদাযুদ্ধেও কৃষ্ণের জীবকে অন্যায় যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে অনুরোধ শ্রীকৃষ্ণই করিয়াছিলেন। ঈমান জীব আমাদেরই মত বুদ্ধিবৃত্তি মনুষ্য, 'যারি অরি পারি যে কৌশলে' নীতির বশবর্তী হইয়া দুর্যোধনকে 'এলোপাথাড়ি' গদাঘাতে ঘায়েল করিতে উদ্যত। গদা যুদ্ধে যে নীতির অধ্যাদেশ আমরা করিতে নাই, করিলে অধর্ম হয়, সে কাণ্ডজ্ঞান ভীমের থাকিবার কথা নহে (রাগের মাথায় কাহারই বা থাকে?)। শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে চিরন্তন সহকারে ন্যায় ও নীতি স্মরণ করাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্য ভাল বলিতে হইবে—স্নেহের জীব মহাপাপ সমাধানি ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মাথাটি ভাঙ্গেন নাই। গান্ধীজীর দুর্ভাগ্য (?) অনুরূপ অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

গান্ধীজীর তুলনা গান্ধীজী; অন্য তুলনা নাই। থাকিবে না কেন, আছে; কিন্তু আমি ত এখনই বেলাইনারি আত্মবিস্মৃত জাতির তাহা জানা নাই। মহামানব শ্রীকৃষ্ণের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। যেটুকু মনে আছে সেটুকু না থাকিলে বোধ করি উপকার হইত। গোঁসাই ঠাকুর মহাপ্রয়াণ কোণা হইতে একটি ঈমতী আরবানী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের মানস আলোকিত এবং চিত্ত পুলকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নির্ঘোষ আমরা শুনিতে পাই না, তাহা নামের সাথ ধ্বনিই আমাদিগকে উচকিত করিয়া রাখিয়াছে। অন্তরাত্মার কোপানল হইতে বলির জন্য উৎসর্গীকৃত রাজন্য-বর্গকে তিনিই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই; আমরা জানি, পরকীয়া প্রেমোন্মাদ শ্রীকৃষ্ণের হয়ে ব্রজবালাদের "কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জে গুঞ্জে চললো রঙ্গিনী, চললো সঙ্গিনী, চললো তাঙ্গিনী" রাধিনী। দ্বিপ্রহরে দ্বিধেবধিবিজর্জরিত মনুষ্যলোকে সম্প্রীতি ও শান্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে তিনি যে সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, আধিকার কালে সে কথা কে বা জানে? কিন্তু, কালীয় হ্রদে ঝোড়শী নারীর বস্ত্র হরণের সংবাদ সবাই জানে। বেড়া দান বাবাজীগণের কবির ইহজগতে হয় ত তুলনা-রহিত—হয় ত কেন, সত্যই তুলনা রহিত; পৃথিবীর আদ্য সাহিত্য মন্থন করিলেও এমন অমৃতের উৎস কোথাও দেখিতে পাইব না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিব; কিন্তু তাঁহারা উত্তর জগতের যে বিরল অনিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বা অস্বীকার করিব কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণের সৌম্য সৌম্য, পরাক্রম, মনুষ্যত্ব ও লোকহিতব্রতের কোন নিদর্শনই তাঁহারা প্রচারিত হইতে দেন নাই; এক ষোড়োসনা সৌখী নবীনা কিশোরীর নীল শাড়ী দিয়া (নীলাকাশের মত) সমস্তই আবৃত ও আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীটাকে রাধাকৃষ্ণ মূর্তিতে মুড়িয়া দিয়াছেন।

জানি না গান্ধীজীর অদৃষ্টে কি লেখা আছে? মন্দির যে হইবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ দেখি না; তবে মন্দিরে অপর কোন উপদেবতা আবির্ভূত হইবেন কি-না তাহাই চিন্তার বিষয়। উপদেবতার উপদ্রবে মহামানব শ্রীকৃষ্ণের মহৎ জীবন ও মহান শিক্ষা হইতে পৃথিবী বঞ্চিত হইয়াছিল; আমাদের বরাত দোষে গান্ধীজীর জীবনের আদর্শও যা

বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হয়! গান্ধীজী-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাষ্ট্র পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত তাঁহারা যদি মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্মময় জীবনের অমূল্য আদর্শ প্রচারে যত্নবান হইতে পারেন তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলা পক্ষের ভগবৎসঙ্কল্পোদ্ধার সমুদ্ভাসিত হইতে পারে।

কাজ কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে 'যত্নে কৃতে' অসাধ্য নহে। গান্ধীজী এমন একটি জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, যাহার কোন অংশ গোপন, বর্জ্জন, পরিবর্ত্তন বা পরিমার্জ্জনের প্রয়োজন নাই। সুকুমার-মতি বালকবালিকা হইতে পরলোকযাত্রী বৃদ্ধ বৃদ্ধাও তাহা অধ্যয়ন, মনন, অনুশীলন করিতে পারিবেন, তাহাতে অন্তর বাহির নাই, প্রাইভেট পাবলিক ভেদ নাই; যাহাকে খোলা বহি (open book) বলে, মহাত্মার জীবনীও তাহাই। গান্ধী সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে সর্ব্বজনের আপন। গান্ধী অপরাজেয় এবং অপরাজিত; তিনি বরাবর, লোক-হিতৈষী, জ্ঞানিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, কর্ম্মশীল, বিবেচনার ও ধর্ম্মাত্মা। গান্ধীজী মানুষী শক্তির দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন তথাপি তাঁহার চরিত্র অমানুষ। মানুষে অতিমানুষ পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই মানুষ তাহাকে দেবত্ব আরোপিত করিয়া থাকে। আমরাও তাহাতে দ্বিরুক্তি বোধ করিতেছি না। মানুষ যীশু কর্ম্মফলে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই ঈশ্বরত্বপূর্ণ মানুষকে আমরা দেখিয়াছি, ইহা ত আমাদেরই জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল!

মহাত্মা গান্ধী বলিতেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'! এই মহৎ ও বরেণ্যের জীবনী তাঁহার স্মৃতিসৌধ হোক; অন্য স্মৃতিসৌধের প্রয়োজন নাই। এই অতি-মানুষী কাহিনী সুপ্তমনুষ্যত্ব দিবে মনুষ্যত্বের প্রেরণা দান করুক, গান্ধী-মন্দিরে কাজ নাই। আমরা অনেক কিছু বিস্মৃত হইয়াছি কিন্তু সত্যব্রতী ধর্ম্মরাজ নাম করিতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা আজও আমাদের মনে পড়ে। যুধিষ্ঠিরের স্মৃতিমন্দির কোথায়ও আছে কি? কোনও রাজা প্রজানুরঞ্জন করিয়াছেন শুনিবামাত্র প্রজানুরঞ্জনে প্রাণাধিকা পত্নীত্যাগী শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী আজও আমাদের অন্তরদেশ আর্দ্র করে। পাণ্ডারাজারা কিন্তু কেহই রামের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইয়াছেন কি? কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নামও যে শুনে নাই, রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানশীলতার কাহিনী তাহারও জানা আছে। বশিষ্ঠাশ্রম কোথায়, তাহাও যে জানে না, বশিষ্ঠের ক্ষমাধর্ম্মের মধুর স্মৃতিতে তাহার অন্তর ভরিয়া আছে। যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ পঙ্‌ক্তিগুলি মনুষ্যেষ্ট পড়িয়া লিখিয়া রাখিতে হয় নাই, অথচ কেন মনুষ্য নাই যে মর্ম্মার্থ জানে না। সেকালের ক'টা খবরই বা আমরা জানি, ক'টা কথাই বা শুনিয়াছি? নীতি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা কি কেহ করিয়াছিল? তবু মনে হয়, সেকালে যদি খবরের কাগজ না থাকিয়া থাকে, রেডিয়ো যদি না থাকিয়া থাকে, সিনেমাও যদি অবিদ্যমান থাকিয়া থাকে, তাহা সত্ত্বেও যদিও মনুষ্যত্বরক্ষক উচ্চাদর্শ দীর্ঘকাল যাবত সুপ্রচারিত ছিল বলিয়াই ভগ্নাংশ আজও আমরা শুনিতে পাই, তাহা হইলে, মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র ও মহান জীবনের আলেখ্য ভারতীয় জাতির অন্তরে সুপ্রথিত করা কেনই বা সম্ভব হইবে না? মহাত্মা গান্ধী ফেলেঘাটার মশানে দাঁড়াইয়া বীরদর্পে অবিচলিত কণ্ঠে ক্ষুব্ধ জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাকে হত্যা করিবে? কর, আমি বাধা দিব না, কেহই বাধা দিবে না। কিন্তু জানিও, আমার যে কাজ, তাহার বিনাশ নাই।" গান্ধীর জীবনের এই ত শেষ কথা, এই ত ধর্ম্মবাণী। আমরা আধুনিক যুগে, বিজ্ঞানের যুগে বাস করিতেছি। আমাদের তার আছে, বেতার হইয়াছে, আমাদের সংবাদপত্র সাময়িকপত্র সাহিত্যপত্র রহিয়াছে, আমাদের পাঠশালা বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে, থিয়েটার বায়োস্কোপ রহিয়াছে, সর্ব্বোপরি স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হইয়াছে, অহিংসা ও সত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াই কি গান্ধীজীর স্মৃতিতর্পণ করিতে আমরা পারি না? সত্যের বিনাশ নাই—কালের করাল আঘাতেও সত্য লুপ্ত হয় না, দ্রুতগামী সময়ের স্রোতেও সত্য ভাসিয়া যায় না, নশ্বর জগতে সত্যই অবিনশ্বর! সত্যে সুগঠিত ও সত্যনিষ্ঠ ভারতীয় মনুষ্যই অবিনশ্বর গান্ধীজীর স্মৃতি নশ্বর পৃথিবীতে অক্ষয় ও অব্যয় করিতে পারিবে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে, গান্ধীজীর আত্মা সেই স্মৃতিসৌধ দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।—ওঁ শান্তিঃ।

তিরোভাব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হলো ব্যাধ শরাঘাতে,
মহামানবের মৃত্যু হীন ঘৃণ্য ঘাতকের হাতে।
জগতের হিতব্রতী ভারতের নর-নারায়ণ
ঘাতকের করে দিল পুণ্যময় অনন্ত জীবন।
রাহু কেতু গ্রাস করে চন্দ্র সূর্য্যে মরি মনঃক্ষোভে
কিন্তু নিত্য নবোদয়—মহাজ্যোতি ডুবিয়া না ডোবে?
কেমনে অমৃত উৎস আঘাতে করিবে কলঙ্কিত?
সুধাধারা শতধারে যুগে যুগে হবে উচ্ছ্বসিত।
যাঁহাদের মৃত্যু নাই চিরোজ্জ্বল অমৃত প্রদীপ
কে করে নির্ব্বাণ তাহা? আসি মৃত্যু ফিরে অপ্রতিভ।
অমর মহাত্মা গান্ধী। চিরজীবী চিরমৃত্যুহীন—
মহত্ত্ব হইল তাঁর আজ হতে দেবত্বে বিলীন।

শিল্পীর শিল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অরিপাড় শাড়ীর একটুখানি আঁচল, খানিকটা টিংচার আয়োডীনের গন্ধ, একখানা সরু সুগোল হাতে কয়েক গাছা চুড়ির ঝিলিক আর মাথার পাথার মিষ্টি বাতাস, রঞ্জুর প্রথম চেতনায় এগুলোই আভাসিত হয়ে উঠল ছায়া-ছবির মতো। তারও পরে টের পাওয়া গেল কপালের ডান দিকে একটা টনটনে যন্ত্রণা, অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

—একটুও কি কমেনি ?

স্নেহকোমল মৃদু কণ্ঠ কানে এল।

এবারে চোখ দুটো সম্পূর্ণ করে মেলল রঞ্জু।

—মা ?

কিন্তু মা তো নয়। অচেনা ঘর, অচেনা পরিবেশ। মাথার কাছে টিপয়ের ওপরে লণ্ঠনের আলো। শ্যামল সুন্দর একখানি মুখ, কপালে সিঁদুরের টীপ। বয়েসে ছোটদির মতোই হবে, কিন্তু চোখে মুখে মার মতোই স্নেহগভীর আকুলতা।

—বাড়ি যাবে ? একটু সুস্থ হও, বাড়ি পাঠিয়ে দেব বই কি।

তখন মনে পড়ল। মনে পড়ল পূবপাড়ার জিমন্যাষ্টিক ক্লাব, কুইক্ মার্চ, হালদারের দলের সঙ্গে সেই মারামারি। ছুটে পালাবার কথা ভেবেছিল, আচমকা একটা চোট লাগল মাথায়, তারপরই চারদিকের পৃথিবীটা দুলে উঠল, হঠাৎ চলতে সুরু করা একটা গাড়ির চাকার মতো ঘুরে উঠল সমস্ত, তারও পরে—

সব মায়া—সব অন্ধকার। একেবারে ছেলেবেলায় অশরীরী অবিনাশবাবুর হাতছানিতে সেই ভাঙা আশ্রমের পাশে সেই অতিজ্ঞতা। অন্ধকার সরে গিয়ে যখন আলো পড়ল, তখন দেখা গেল শাড়ীর আঁচল, একটি মিষ্টি স্নেহকরুণ মুখ, আর উৎকণ্ঠাভরা প্রশ্ন : একটুও কমেনি ?

এর পরে চিন্তাধারাটা বয়ে গেল খরগতিতে। রঞ্জু উঠে বসল বিছানায়। এবারে সমস্ত ঘরটা সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিল চোখের সামনে। ঘরে শুধু সেই মেয়েটিই নয়। ওদিকে একখানা চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন বেণুদা। বিছানায় তার পায়ের কাছে পরিমলও বসে আছে, বিষণ্ণ আর বিপন্ন তার মুখ।

সাগ্রহে পরিমল বললে, কি রে, ভালো লাগছে একটু ? তোকে ওখানে নিয়ে যাওয়াই ভুল হয়েছিল আমার। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত কাপুরুষ আর দুর্বল বলে বোধ হল, মনের ভেতরে বিঁধল অপমানবোধের একটা সূক্ষ্ম কাঁটা। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে পা-টা টলে গেল একবার, কিন্তু রঞ্জু সামলে নিলে নিজেকে। বেশ সহজ সতেজ গলায় বললে, না, আমার কিচ্ছু হয়নি।

—না হওয়াই তো উচিত।—গম্ভীর গমগমে গলায় কথাটা বললেন বেণুদা, হাসলেন সস্নেহ ভঙ্গিতে।—এত সহজেই কি দমে গেলে চলে ? আজকাল ছেলেরা তো আর ননীর পুতুল নয়, তাদের হতে হবে আয়রণম্যান।

—তুমি থামো তো দাদা। মহিলাটি ভ্রূভঙ্গি করলেন : ও-সব বক্তৃতা রেখে দাও। ছেলেটাকে তো প্রায় মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিলে তোমরা। সকলেই তো তোমাদের মতো আয়রণম্যান নয়, গোঁয়ারও নয়। ও সব সকলের সয়না বাপু।

পরিমল হেসে উঠল, করুণাদি, আপনি কিন্তু রঞ্জুকে অপমান করলেন।

—অপমান ! অপমান কেন ?—করুণাদি একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন রঞ্জুর ওপরে, তারপরে তাকালেন পরিমলের মুখের দিকে : এতে অপমানটা হল কোন্‌খানে ?

—বাঃ, অপমান নয় ? ওকে আপনি দুর্বল বললেন, কিন্তু দুর্বলতার অভিযোগটা রঞ্জু নিশ্চয় মেনে নিতে রাজী নয়।

—উঃ দাদা—বেণুদার দিকে ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টি প্রসারিত করলেন করুণাদি: তোমার শিষ্যদের কী বক্তৃতা দিতেই যে তুমি শিখিয়েছ! আর কিছু না হোক কথার চোটেই এরা তারত উদ্ধার করে ফেলবে দেখছি। বক্তৃতা দিয়েই ইংরেজকে একেবারে ধুলোর মতো উড়িয়ে দেবে ভারতবর্ষ থেকে।

ঘরশুদ্ধ সবাই হাসল, রঞ্জুও হাসল। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে এই যে প্রসঙ্গটা উঠেছে তার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছে না সে, কেমন অপ্রতিভ, কেমন সংকুচিত মনে হচ্ছে যেন। সত্যিই তো, সে যে দুর্বল, তার যে শক্তি নেই এটা পরিষ্কার ধরা পড়ে গেছে সকলের কাছে। না হয় খেয়েছে একটা লাঠি কিংবা ইঁটের চোট, তাই বলে অমন ভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়াটা তার উচিত হয়নি, উচিত হয়নি একটা সভীর করুণা আর সমবেদনার প্রার্থীরূপে নিজেকে সকলের সামনে ধরে দিতে। দেখেছে ফাঁসির দড়ির স্বপ্ন, বুক পেতে নিতে রয়েছে এগিয়ে চলার পথের কঠিনতম যা কিছু আঘাত, গুরু-গোবিন্দের মতো 'তুরজসম অস্ত-নিয়তি'র রশ্মি ধাঁকড়ে তাকে ছোটাতে চেয়েছে মৃত্যু আর দুর্দমের অভিসারে। কিন্তু একি হল। এই মুহূর্তে সকলের কাছে ধরা পড়ে গেল তার দুর্বলতা আর অশক্ত পঙ্গুতা।

এ ঘরে আর থাকা চলে না—অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ির কথাও মনে পড়েছে। বেরিয়েছে সেই বিকেল চারটেয়, অথচ ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে এখন দেখা যাচ্ছে পৌনে আটটা। বাড়িতে কৈফিয়তের কথাটা ভাবতেই আশংকায় আর সংশয়ে তালু অবধি শুকিয়ে উঠল তার।

—বাড়ি চল পরিমল।

করুণাদি বললেন, বোসো, একটু চা খেয়ে তাজা হয়ে যাও।

—নাঃ, চা আমি খাব না।

বেণুদা বললেন, তা হলে একটা গাড়ি ডেকে আনো পরিমল। ও হেঁটে যেতে পারবে না।

—কিছু দরকার নেই। আমি বেশ হাঁটতে পারব, আমার কিছু হয়নি।

করুণাদি এগিয়ে এলেন, সস্নেহ নরম আঙুলে একবার কপালের ব্যাণ্ডেজটা পরীক্ষা করলেন রঞ্জুর। আশ্চর্য ভালো লাগল স্পর্শের এই অনুভূতিটুকু। ভারী নরম, ভারী কোমল করুণাদির হাতের ছোঁয়া। কেমন যেন ঘুম জড়িয়ে আসে, ব্যথা জুড়িয়ে যায়, মনে হয় মা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ছেলেবেলায় ঘুম পাড়ানোর আগে।

—আচ্ছা এসো ভাই।—করুণাদি হাসলেন: তাই বলে আমাদেরও ভুলে যেয়ো না। পরিচয়টা তো হল, পরিমলের সঙ্গে এসো মাঝে মাঝে এখানে, কেমন?—করুণাদি একটু থামলেন, প্রসন্ন কৌতুকে শান্ত চোখ দুটি ঝিকমিক করে উঠল: তাই বলে অজ্ঞান অবস্থায় নয়, বেশ ভালো ছেলের মতো এবং সস্থ হয়ে।

এত সুন্দর লাগল কথাগুলি। বুকের ভেতরে কেমন ছলছলিয়ে উঠল, কেন যেন ইচ্ছে করল হেঁট হয়ে সে করুণাদির পায়ের ধুলো নেয়। কিন্তু কেমন বাড়াবাড়ি ঠেকবে, করুণাদি কী ভাববেন কে জানে। তবু আচমকা একটা খেয়ালের মতো বোধ হল অজ্ঞান হয়ে এলেও নেহাৎ মন্দ হয় না, অন্তত করুণাদির এই হাতের ছোঁয়াটা পাওয়া যাবে এবং সেও নেহাৎ মন্দ একটা জিনিস নয়।

—আচ্ছা, আসব।

দরজা ধরলেন করুণাদি, আগে আগে চললেন বেণুদা, মাঝখানে রঞ্জু। আর এতক্ষণে জায়গাটাকে চিনতে পারল। ওই তো বড়াদের মন্দিরটা, বরদাবাবুর বাগান, মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় কেরোসিনের আলো টিপ টিপ করে জ্বলছে।

ঘোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বেণুদা বললেন, রঞ্জন?

—উঁ?

—ব্যথা পেয়েছ সত্যি, কিন্তু তাই বলে ভয় পেয়ো না। জানোই তো,

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে?

রঞ্জু চুপ করে রইল, কী জবাব দেবার আছে ভেবে পেল না।

বেণুদা বললেন, আচ্ছা, তবে যাও। রাত হয়ে গেছে, আর দেরী কোরো না। পরিমল, ওকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে কৈফিয়তের হাত থেকে ওকে বাঁচিয়ে তবে তোমার ছুটি, বুঝেছ?

পরিমল মাথা নাড়ল।

ছ পা এগিয়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে ডাক এল, রঙ্কু?

করুণাদি। ঘোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন লণ্ঠন হাতে। শাড়ীর অরিপাড়টা চিক চিক করছে আলোয়, কানের একটা গয়না উঠছে ঝিলমিল করে। সুকুমার শ্যামল মুখের ওপরে প্রতিটি ভাঁজে আর রেখায় আরো গভীর, আরো নিবিড় কোমলতা যেন বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

করুণাদি বললেন, ভুলো না রঙ্কু, আবার এসো, কেমন?

—আসব, নিশ্চয় আসব। রঙ্কুর গলা আবেগে কেঁপে উঠল এবারে।

বেণুদার পাশে, লণ্ঠন হাতে তখনো ঘোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন করুণাদি। কিন্তু আর পেছন ফিরে তাকানো চলে না, এবার এগোতেই হবে বাড়ির দিকে।

ল্যাম্পপোষ্টের মিটমিটে আলোয়, খোয়া-ওঠা প্রায় নির্জন পথ দিয়ে চলল দুজনে। পরিমল যেমন মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে চুপ করে থাকে, তেমনি নিঃশব্দেই চলেছে রঙ্কুর পাশাপাশি। ল্যাম্পপোষ্ট যত পেছনে সরছে, তত দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে নিজেদের ছায়া, অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘতর হয়ে, আবার আর একটা লাইট পোষ্টের কাছাকাছি আসতেই পায়ের নীচে গোল হয়ে জড়ো হচ্ছে সেটা—ছড়িয়ে পড়ছে পাশে।

কিন্তু কতক্ষণ আর ভালো লাগে নিজের ছায়া দেখতে দেখতে চলা? রঙ্কু অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করল, ওটা বেণুদার বাড়ি, না?

—হুঁ।

—করুণাদি কে ভাই?

পরিমল সংক্ষেপে বললে, বেণুদার বোন—আমাদের সকলের দিদি।

—বেশ করুণাদি, না?—রঙ্কু সাগ্রহে পরিমলের দিকে তাকালো, করুণাদি সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চায় বিস্তীর্ণ ভাবে।

—হুঁ।—একটু থামল পরিমল: কিন্তু ভারী কষ্টের জীবন করুণাদির—ভারী ব্যথার জীবন।

—কষ্ট, ব্যথা!—রঙ্কুর বুকে যেন একটা ঘা লাগল: কেন?

—আর একদিন বলব—প্রান্ত স্বরে জবাব দিলে পরিমল।

ক্ষুণ্ণভাবে রঙ্কু চুপ করে রইল। ওই এক দোষ পরিমলের। পরে বলব, আর একদিন বলব। আভাস দেয়, অথচ স্পষ্ট করে না, ঠেলে দিতে থাকে জিজ্ঞাসায় আকুল আর কালো অন্ধকারের মধ্যে।

আট

এক একটি দিন। খণ্ড, বিচ্ছিন্ন। একটি সূর্যোদয় থেকে আর একটি উদয়রাগ পর্যন্ত সৌরগোলকের পরিক্রমা। চব্বিশটি ঘণ্টা দিয়ে ছকে কাটা দিন—নানা রঙের দিন। আলাদা আলাদা রূপ, নতুন ভাবনা, নতুন সংঘাত, পরিচিত পৃথিবীতে অজস্র অগণিত অপরিচয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো। তিলে তিলে পলে পলে নিজেকে জানা, নিজের শক্তিকে, দুর্বলতাকেও।

নানা রঙের খণ্ড ছিন্ন দিন, অগণ্য বৈচিত্র্যে পরিকীর্ণ যাওয়া সীমাঙ্কিত। তারপর দূরে সরে এলে অন্ধকার রাত্রিতে চলন্ত ট্রেনের যাত্রীর মতো তমসাস্তীর্ণ বন-বনান্ত গ্রাম-গ্রামান্তের একটা নির্বিশেষ অবিচ্ছিন্নতা যেন ধরা দেয় চোখের সামনে। সেই অভেদ চলিষ্ণুতার ভেতরে দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া ছোট ষ্টেশনের এলোমেলো আলোর মতো নির্বিশেষের মধ্যেও কোনো বিশেষের মোহময়তা। সুদূর অতীতে বিস্মৃতপ্রায় রূপদক্ষের হাতে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল শিলা-ছেদনী ঝকমক করে ওঠে শিলালিপির পাষাণ পট্টে। রঙ্কুর সমস্ত মানসিকতার সঙ্গে যাদের যোগ ছিল—হয়তো অলক্ষ্য, হয়তো কিছুক অর্থহীনভাবে—আজ তাদের সম্পূর্ণ তাৎপর্য ধরা পড়ে গেছে; পাওয়া গেছে মানসিক সংযোগের সেই সূক্ষ্ম সূত্রটি—সেদিন অজানিতে যার অঙ্কুর পড়েছিল, আজ তা পল্লবিত হয়ে জীবনে এনেছে অপরূপ ছায়াচ্ছন্নতা। আর সেই ছায়া বিস্তারের নীচে শুকিয়ে মরে গেছে অনেক শুষ্ক, অনেক নতুন চারায় নতুন পাতা—যেগুলিকে হয়তো সেদিন ভুল হয়েছিল আগামী কালের বনস্পতি ভেবে।

সেদিনকার সেই মারামারি ব্যাপারটা অনেকখানি গড়িয়েছিল অবশ্য। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসেছিল। হালদারকে ধমকে দিয়ে গেছে, একটা নাম মাত্র তাড়ার ব্যবস্থাও করীর মার কাছ থেকে করে দিয়েছেন

কোতোয়ালী থানার অফিসার ইন্ চার্জ স্বয়ং। হালদার গজর গজর করে বলেছে, এভাবে অন্যায় জুলুম যদি গরীবের ওপর হয় তার—

দারোগা ধমকে দিয়েছেন: বেশি কথা বাড়াবেন না মশাই। ওরা এসে হাঙ্গামা করেছিলেন, মারামারির ব্যবস্থা করেছিলেন। বেশি বকবক করেন তো ফ্রেন্সাস্, ওরা আইন আর রায়টিঙের চার্জে চালান করে দেব। শহরের মানী ব্যবসায়ী বলে এ যাত্রা আপনাকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি হাঁসিয়ার হবেন।

তারপরেই মুখ গোঁজ করে ঘরে পড়েছে হালদার। তবে যাবার সময় বলে গেছে, যদি দিন পাই তবে ওই তরুণ সমিতির ছোকরাদেরও একবার আমি দেখে নেব। এ অপমান সহজে আমি ভুলব না।

তবে দারোগার নিরপেক্ষতা আছে। বেণুদাকেও তিনি থানায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন এসব অনধিকারচর্চা করতে। যদি কোথাও কোনো অন্যায় ঘটে, তার জন্যে পুলিশ আছে এবং এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট পুলিশ ডিপার্টমেণ্টকে পোষণ করে থাকেন। কিছু করণীয় থাকলে থানাতেই একটা খবর দেওয়া উচিত, নিজেদের হাতে আইনের ভার তুলে নেওয়াটা বে-আইনি।

বেণুদা হাসি মুখে বলেছেন, আচ্ছা, মনে থাকবে।

দারোগা আরো দু চারটে কথা বলেছেন বেণুদাকে, কিন্তু গলা নামিয়ে এবং অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে। হিতৈষী বন্ধুর মতো তিনি বেণুদাকে জানিয়েছেন যে তরুণ সমিতির কার্যবিধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট নানা কারণে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং এই ক্লাবটির পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও শুভার্থী হিসেবে তিনি বেণুদাকে সাবধান এবং সাবধান থাকবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

বেণুদা বলেছেন, অনুরোধ তিনি ভুলবেন না।

মোটামুটি ভাবে ঘটনার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে ওখানেই। আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় রঙ্কু বাড়িতে এসে পৌঁছোতে যে একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠাকুরমা গলা ছেড়ে আর্তনাদ ছুড়ে দিয়েছিলেন। তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে পরিমল। বেশ চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং কথাটা সত্যিও বটে, যে নিতান্ত ভালোমানুষ রঙ্কুর কোনো দোষই ছিল না। পথে দুজনের মধ্যে মারামারি চলছিল, তারই একটা ঢিল ছুটকে এসে রঙ্কুর কপালে হঠাৎ লেগে যায়, তাই—

তাই দুরন্ত ছেলের ওপর একপ্রস্থ যত্নটুকু বর্ষণ করেই বড়রা ক্ষান্ত হয়েছেন। কপাল ভালো, বাবা এক সপ্তাহ থেকে মফঃস্বলে, তাই বেরার সামনে পড়তে হয়নি। নইলে হয়তো পরিমলের সঙ্গে মেশা কিংবা তরুণ সমিতিতে যাতায়াত করাটাও বন্ধ করে দিতেন তিনি।

পরিমল পরের দিন সকালেই খবর নিতে এল। মাথাটায় অল্প অল্প যন্ত্রণা, রঙ্কু তখনো নির্জীবভাবে বিছানায় পড়েছিল। পরিমল চলে এল একেবারে শোওয়ার ঘরেই —ছোট বোন্ আদুরী ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

পরিমলকে দেখে খুশিতে চক চক করে উঠল রঙ্কুর চোখ: আয়, আয়।

বিছানার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল পরিমল: আছিস কেমন?

রঙ্কু ততক্ষণে গায়ের চাদরটা সরিয়ে উঠে বসেছে। অপ্রতিভভাবে বললে, ভালোই আছি।

—যন্ত্রণা-টন্ত্রণা বিশেষ কিছু নেই তো?

—না।

—যাক্, বাঁচালি—একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পরিমল: ডক্টর মতো আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলি তুই। ঘা করে পড়ে গেলি আর যে ভাবে রক্ত ছুটল—দেখে তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া।

লজ্জিত রঙ্কু নীরবে কড়ে আঙুলের নোখটাকে কামড়াতে লাগল।

পরিমল বললে, ওই জন্যেই তো তোকে বলি চলে আয় আমাদের জিমনাষ্টিক ক্লাবে। শরীর শক্ত হবে, বুকে বল আসবে। একটা ঘা খেয়েই অমন অজ্ঞান হয়ে পড়বি নী।

—হ্যাঁ, আমি ক্লাবের মেম্বার হবো—আস্তে আস্তে, যেন ঘোরের মধ্যে পরিমলের কথার জবাব দিলে রঙ্কু। শুধু শরীরটা শক্ত করবার জন্যে নয়, শুধু একটা ঘা খেয়ে অতি সহজেই অজ্ঞান হয়ে পড়বার অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যেও নয়। একটা প্রকাণ্ড দুর্বাসাই জোয়ান—ভীম ভবানী কিংবা রামমূর্তি হওয়ার বাসনাও

তার নেই। সত্যি বলতে কি, হাত পায়ের ডুমো ডুমো মাস্‌ল ফুলিয়ে, বুকের ওপর একটা পাঁচটনী রোলার চালিয়ে কিংবা দুহাতে দুখানা চল্‌তি মোটর টেনে ধরে যারা কসরৎ দেখায়, সেই সব অতিকায় জোয়ানেরা রঙ্কুর মনে কোনো মোহ জাগায় না। কেমন ভুল মনে হয়, নিজের শরীরকে অত করে দেখানোর মধ্যে কোথায় যেন একটা অশালীনতা বোধ করে রঙ্কুর মন। আসলে তরুণ সমিতি তার মনে কেমন একটা বিচিত্র প্রলোভন জাগিয়েছে—সৃষ্টি করেছে একটা নেশার মাদকতা। ওখানকার ছেলেরা, ওখানকার জীবন, ভূতুড়ে জমিদার বাড়ির পরিবেশে ওদের ওই আখড়াটা, বেণুদা, বেণুদার একটি কথায় সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছেলের লাইন বেঁধে এসে দাঁড়ানো—আর তারপরে মার্চ করে চলা—এদের সবগুলি এক সঙ্গে মিলে কিসের একটা রোমাঞ্চিত চাঞ্চল্য জাগিয়েছে তার চেতনায়। তা কী সে জানেনা, অথচ এটা জানে যে তরুণ সমিতির ছেলেদের সঙ্গে তার মনের চমৎকার সংযোগিতা ঘটে গেছে।

রঙ্কু আস্তে আস্তে বললে, লাইব্রেরীতে যাওয়া হল না যে।

—তুইই তো ঝগড়া দিলি। নইলে চমৎকার যাওয়া যেত আজকে।

—বেশ তো, চলোনা আজকে।

—ধ্যেৎ, আজ কী করে হয়। তুই তো উঠতেই পারবি না।

রঙ্কু জোর গলায় বললে—আমার কিছু হয়নি, আমি ঠিক আছি।

—তুই ঠিক থাকলে কী হবে, বাড়ি থেকে যেতে দেবেনা তোকে।

—ঠিক দেবে—সে ব্যবস্থা আমি করব।

—আচ্ছা দেখি—চুপ করে খানিকক্ষণ কী ভাবল পরিমল। তারপর মৃদু হেসে বললে, আর সকালেই বেণুদা এসেছিলেন তোর খোঁজ নিতে—করুণাদি পাঠিয়েছিলেন তাঁকে।

—করুণাদি। রঙ্কুর মনটা হঠাৎ যেন ছলছল করে উঠল। মনে পড়ল অচেনা ঘর, লণ্ঠনের আলো, শাড়ীর পাড়, কয়েকগাছা চুড়ি আর মায়ের মতো স্নেহভরা মিষ্টি কণ্ঠ।

—বেণুদাকে নিয়ে এলেনা কেন?

—আর একদিন আসবেন বললেন।

রঙ্কুর আর একটা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সামলে নিলে। করুণাদি কি আসতে পারেন না তাকে দেখতে। এলে কিন্তু বড় ভালো হত। করুণাদি সম্পর্কে একটা রোমান্টিক কৌতূহল কাল সমস্ত রাত্রি মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরেছে তার। করুণাদির জীবন নাকি বড় কষ্টের, ভারী দুঃখের। কিন্তু কিসের কষ্ট, কিসের দুঃখ তাঁর? বেণুদার বোন—করুণাদির মতো মানুষ—সংসারে এমন কী আছে যা তাঁকে ব্যথা দিতে পারে?

করুণাদির যোগাযোগে আর একটি নামও চমকে উঠল চেতনায়—সে মিতা, সংঘমিত্রা। বড় ভালো লেগেছে, ভারী মিষ্টি লেগেছে মুখখানি। আচ্ছা, মিতা কি জানে তার এই আঘাতের ইতিহাস? একটু কি দুঃখিত হয়নি, একটুখানিও কি চিন্তিত হয়নি তার জন্যে?

কিন্তু মিতার কথাটা জিজ্ঞাসা করা তো আরো অসম্ভব। কেন কে জানে, একবার বিদ্যুচ্চমকের মতো দেখা ওই মেয়েটির কথা মনে পড়লে পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর গন্ধ এসে চেতনাকে আবিষ্ট করে দেয়। ফুলের গন্ধ আসে, ধূপের গন্ধ আসে—ছবিতে দেখা, স্বপ্নের মধ্যে দেখা একটা বাগান, হেনার কুঞ্জ, শ্বেত পাথরের ফোয়ারা, আর তার সঙ্গে—

মিতার প্রসঙ্গটা মনের ভেতর উঁকি মারতেই রঙ্কুর মুখে পড়ল লজ্জার আভা, কেন সে জানে না। জোর করেই সে চিন্তার মোড়টা ঘুরিয়ে নিলে, জিজ্ঞাসা করল, মারামারির কী হল তাই?

পরিমল বললে। হালদারের কথা, দারোগার কথা, বেণুদার কথা। আর পরিমলের সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর ভেতর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে উঠল: তরুণ সমিতি সম্পর্কে কী সন্দেহ করেন দারোগা? আর এর উদ্দেশ্যকেই বা এমন বিপজ্জনক বলে মনে করেন কেন গবর্ণমেণ্ট?

কিন্তু এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক। রঙ্কু জানে কী বলবে পরিমল। তেমনি ঘুরিয়ে জবাব দেবে, আজ থাক, আর একদিন বলব সে কথা। আর একদিন।

রহু ক্লান্ত হয়ে উঠেছে এই আর একদিনের উৎপীড়নে। মাটির তলায় পাতালপুরীর সুড়ঙ্গ পথ খুলবার মন্ত্রটা নিশ্চয় জানা আছে পরিমলের। কিন্তু সে বলবে না, খালি প্রতীক্ষায় আকুল করে রাখবে, অস্বস্তিতে বিমূঢ় করে রাখবে মন। তার চাইতে কৌতূহলকে সংযত করে রাখাই ভালো।

রহু বললে, নতুন বই দিবিনা আমাকে?

পরিমল চোখ তুলে সতর্কভাবে তাকিয়ে নিলে ঘরের চারদিকে। আস্তে আস্তে বললে, চুপ। সে হবে পরে, কিন্তু সত্যিই আজ বিকেলে যাবি তুই লাইব্রেরীতে?

—হুঁ, যাব।

—ডাকতে আসব?

—না। কেউ টের পেলে বেরুতে দেবেনা। তার চাইতে আমিই এক ফাঁকে যাবো তোদের বাড়িতে—তোকে ডেকে নেব।

—কিন্তু না ধরে গেলে বাড়িতে তো বকাবকি করবে।

রহু হাসল। সদ্যপড়া রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন আউড়ে বললে,

পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিয়োনা ভালো ছেলে করে—

পরিমল হাসল প্রসন্নভাবে। ওর মুখের ওপর কেমন একটা নরম অকারণ মেঘাচ্ছন্নতা ঘনিয়ে ছিল, সেটা যেন উড়ে গেল একটা হালকা বাতাসে। বললে কবি, জীবনে সবটাই কাব্য নয়। আঘাত যখন আসে তখন ওই কাব্যের ওপর দিয়েই তাকে কাটিয়ে দেওয়া যায়না।

—তা জানি।—আবেগভরে রহু বললে, তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতেও পারব।

পরিমলের চোখে কৌতুক চকচক করে উঠল, কানাই-লালের ওপর কবিতা লিখেই?

—না। দরকার হলে কানাইলালের মতো পিস্তলও ধরতে পারব।

—বটে বটে!—একটা আঙুল ঠোঁটের ওপর দিয়ে পরিমল বললে, সুসংবাদ। অত জোরে নয়। পিস্তল ধরবার অত উৎসাহই যদি থাকে, তা হলে সময় মতো তার পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

রহুর শরীরের মধ্যে যেন কড়াৎ করে খানিকটা ছিঁড়ে গেল—তীব্রভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার চুলগুলো পর্যন্ত। প্রায় সাপের গর্জনের মতো একটা তীব্র উত্তেজিত শব্দ করে উঠল রহু:

পরিমল!

কিন্তু ততক্ষণে পরিমল উঠে দাঁড়িয়েছে। অনেকটা বেশি বলে ফেলেছে, অসংযত হয়ে অনধিকার চর্চা করে ফেলেছে অনেকখানি। বললে, থাক ওসব। আমি চললাম।

নিরুত্তাপ, কঠিন গলা। রহু টের পেল কয়েক মুহূর্ত আগেকার অসংযত শিথিলতার ওপরে পাথরের মতো নিষ্ঠুর কঠিনতা ঘনিয়ে এসেছে। একে ঠেলে দেওয়া যাবেনা, কোনো অনুরোধ উপরোধেই স্থানভ্রষ্ট করা যাবেনা একে।

রহু দাঁতে দাঁত চাপল, যেন অত্যন্ত দ্রুত ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সামনে বাধা পেয়ে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হল তাকে। পরিমল আবার বললে, আমি চলি।

—আচ্ছা।

—বিকেলে যাবি তো?

—যাব।

—আচ্ছা—

পরিমল বেরিয়ে যাচ্ছিল, পেছন থেকে রহু ডাকল: শোন?

—কিছু বলবি?

একটা ঢোক গিলে নিয়ে রহু বললে, বেণুদা আর কল্পাদিকে বলিস আমি ভালোই আছি।

—বলব।

বেরিয়ে গেল পরিমল, একটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজাটা।

কিন্তু তখন মনের মধ্যে যেন ঝড়ের তাণ্ডব আরম্ভ হয়ে গেছে রহুর। সমস্ত শরীরে রক্ত উছলে উছলে উঠছে, তার ঝাঁঝ যেন ছড়িয়ে পড়ছে তার নাক মুখ থেকে, একটা জ্বরের মতো উত্তাপ যেন অকস্মাৎ দেখা দিয়েছে তার বুকের ওপর। পেয়েছে—যা চেয়েছিল তার সন্ধান পেয়েছে, মিলেছে বহু প্রত্যাশিত আর সুদূর প্রতীক্ষিত গোপন মণিকোঠার সন্ধান। পাথরের বাধা চকিতের মধ্যে এসে আড়াল করে দিয়েছে দুনিয়াকে, কিন্তু ওই মুহূর্তের অবকাশেই রহু দেখে নিয়েছে সেই আশ্চর্য জগতের একটুখানি আভাস। কোথায় দুনিরীক্ষ্য আকাশগঙ্গার মতো—সংস্র কোটি মাইলেরও ওপারের প্রসারিত আকাশগঙ্গার মতো ধরা ছোঁয়ার বাইরে সেই বিচিত্র পথ। সেখানে রোমাঞ্চ ফুলঝুরি ফুলের মতো ফুটে পড়ল, পিস্তলের আগুন ছুটে গেল নীলিমোজ্জ্বল একটা সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলকের মতো:—ফাঁসি কাঠে দুলে উঠল জ্যোতির্ময় শহীদদের ছায়া মূর্তি।

এবার সে পথ তারও পথ। শুধু আর একটু অপেক্ষা করতে হবে—আরো একটু তৈরী করে নিতে হবে নিজেকে।

(ক্রমশঃ)

বোম্বায়ে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী বাঙ্গালীরাই বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের রক্ষিকাধারক। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন প্রবাসের বাঙ্গালী নর-নারীর অভাব-অভিযোগ সুখ-দুঃখের আলোচনা ও পরস্পর মিলনের প্রধান ক্ষেত্র। ভারতের নানা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সম্মেলনের চব্বিশটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৩৪৪ সালে বোম্বাই মহানগরীতে মহাসমারোহে সম্মেলনের রজতী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীন ভারতের ইহাই প্রথম অধিবেশন। সেই নিমিত্ত এই অধিবেশনে বাঙ্গলার বহু কৃতী সাহিত্যিক ও প্রবাসের অনেক সুধীজন সম্মিলিত হইয়া সম্মেলনকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গত অতুলপ্রসাদ সেন, স্বর্গত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গত নলিনমোহন সেন রায়, স্বর্গত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতির উদ্যোগে বারাণসীধামে পুণ্যশ্লোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌরোহিত্যে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। তার বৎসর অন্তর জন্মভূমি বর্ধমান করা বাঙ্গালীর এক প্রাচীন সংস্কার,- ঐই সম্মেলনের দ্বাদশ ও ত্রিশ বার্ষিক অধিবেশন ১৯০৪ ও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন বোম্বাই সহরে এই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়।

বোম্বাই নগর কলিকাতারই প্রায় বৃটিশ সাম্রাজ্য পত্তনেরই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের নানা জাতির কর্মস্থল ও বাসস্থান এই বোম্বাই সহর। পার্শী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয় প্রধান এই বোম্বাই নগরে মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালী অনেক আছে। বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ৩৪০০, ইহার মধ্যে আড়াই হাজার বাঙ্গালী—ব্যবসায় ও চাকরিজীবী—বোম্বাইতে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছে। জহুরী বাজারে তাহাদের বেশ প্রতিপত্তি, কেহ কেহ লক্ষাধিপতিও আছেন, অনেকেরই নিজ নিজ বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করেন। এই সম্প্রদায়ের একখানি দুর্গোৎসব হয়। পায়েল ও বাজারে কর্মজীবী বাঙ্গালীরা বসবাস করে। এখানে বেঙ্গলী এডুকেশন্যাল সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে একটি বাংলা-ইংরাজি হাইস্কুল আছে। তাহার নিজস্ব সুদৃশ্য দ্বিতল বাটী আছে এবং স্কুলটিতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলার মাধ্যমে পাঠ ও পরীক্ষা-গ্রহণ হইয়া থাকে। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গেই কিণ্ডার গার্টেন ক্লাস হইতে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পাঠ করে। বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আছেন। শ্রীযুক্তা শিশিরকণা সেন, মিসেস্ কি-এম সেন, শ্রীযুক্তা মায়া ভাদুড়ী কি-এ, কি-টী তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

প্যায়েলে বাঙ্গালী ক্লাব বাঙ্গালীদের একটী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এখানে একটী পুস্তক ও পত্রিকার পাঠাগার আছে। সভ্যগণ দুর্গোৎসব, বাংলা নাটক অভিনয় এবং গানের মজলিস অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই প্রতিষ্ঠান সম্মেলনের প্রাঙ্গণে ভিক্টোরিয়া-জুবিলী ইনষ্টীটিউট হলে কলিকাতা হইতে আগত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, সজনী মিত্র, সুমথ ঘোষ, অতুল গুপ্ত প্রভৃতিকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই পুরাতন। ছাত্রসংখ্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অনেক অল্প। কয়েক বৎসর হইল বাংলা ভাষা পঠন ও পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার সংশ্লিষ্ট পুস্তকালয় "রাজাবাই টাওয়ার" নামে সুউচ্চ অট্টালিকায় সংযুক্ত, সুবৃহৎ, সুন্দর পাথরের অট্টালিকায় অবস্থিত। প্রায় ২০,০০০খানা ভাষার পুস্তক সংগৃহীত আছে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে কোন বাংলা পুস্তক ছিল না। নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা প্রচার সমিতির সম্পাদকরূপে লেখক বাংলা পুস্তক দান করিয়া এই গ্রন্থাগারে বাংলা পুস্তকের সংগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন। বর্ত্তমানে প্রায় দুই শত বাংলা বই আছে।

বোম্বাই সহরে বাঙ্গালীদের চারখানি দুর্গোৎসব হয়। খারে রামকৃষ্ণ মিশন বাঙ্গালার সংস্কৃতি পরিবেশন করে।

২৬শে ডিসেম্বর হইতে ত্রিবসব্যাপী সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রায় ১৮০জন প্রতিনিধি বোম্বাইএর বাহির হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কলিকাতা হইতে ৪৫ ও এলাহাবাদ হইতে ৪২জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশই ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যালে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ও পারেলে বাংলা স্কুল গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন।

সুসজ্জিত মণ্ডপে বিপুল আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে অধিবেশন ৩টার সময় আরম্ভ হয়। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র সেন বিভিন্ন শাখা সভাপতিসহ সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। দ্বারে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকারা লাঠি হস্তে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানান। অতঃপরি সভাপতিগণ আসন গ্রহণ করিলে বোম্বাইএর প্রথম মন্ত্রী মাননীয় খের মহাশয় আগমন করেন। শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

তিনি বলেন—অ-বাঙ্গালীরা অপবাদ দেয় যে বাঙ্গালীরা স্থানীয় লোকের সহিত মেলা-মেশা করে না, তাহা সত্য নহে। এ কথাও বিশ্বাস-যোগ্য নয় যে বাঙ্গালীরা প্রবাসে কেবল ডাক্তারী, মাষ্টারী ও কেরাণীরই উপযুক্ত, ব্যবসায়ে অপটু। বোম্বাইয়ের জহুরীরা কৃতী ব্যবসায়ী, তাহারা অপবাদ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বোম্বাইএর সহিত বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা আজ ৬০ বৎসরের অধিক কাল হইতে সংযুক্ত। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত, মনেন্দ্র গুপ্ত, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন বসু, বিপিন পাল,

ডাঃ ডি-এন বসুর সভাপতির বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি সভাপতিদের "বোম্বাই প্রবাস", রবীন্দ্রনাথের "মুক্তির পাষাণ," শ্রীঅরবিন্দের "ইন্দুপ্রকাশের প্রবন্ধ" বোম্বাই প্রদেশেই লিখিত হইয়াছিল বলেন। পাম্বন রঙ্গনাথের ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের অনেক বাণী শুদ্ধমারাঠী ভক্ত ও শিষ্য আছেন। এখানকার রবীন্দ্র সোসাইটি প্রধানত অ-বাঙ্গালী শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারাই পরিচালিত। চলচ্চিত্র-জগতে অনেক বাঙ্গালী ডিরেক্টর, লেখক, শিল্পী, সঙ্গীত-বাদ্য পরিচালক বোম্বাইতে থাকেন। যদিও বাঙ্গালী আজ স্বাধীন ভারতে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, তথাপি আশা করা যায়, বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার মধ্যে সুপথ আবিষ্কার করিবে। সেইজন্য মনে হয় এই সাহিত্য সম্মেলন স্বাধীন ভারতের পথপ্রদর্শক হইবে।

তৎপরে প্রধান মন্ত্রী খারে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাংলা ভাষায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বাংলা ভাষাতে বলেন "আমি বাংলা বুঝি, পড়িতে পারি, তবে ভাল বলিতে পারি না। বাংলা ও মরাঠী ভাষা একই সংস্কৃত ভাষার মূল হইতে আসিয়াছে, প্রতি ১০টী কথার মধ্যে ৯টী কথা বাংলার সহিত এক সোদরের।" তিনি বিচারপতি সেনের মুদ্রিত বক্তৃতা হইতে পড়িয়া তাহা শোনাইয়া দেন।

অতঃপর মূল সভাপতি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় কিতীশচন্দ্র সেন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—"ভারত দ্বিখণ্ডিত বা ত্রিখণ্ডিত হউক না কেন—মাতৃ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। ইউ-নোর অধিবেশনে নানা জাতির স্বার্থসংঘাত ও পরস্পর দোষারোপ আস্ফালনের মধ্যে একাকী ভারত ত্যাগ ও সংযমের মানদণ্ডহস্তে প্রবেশ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আর শান্তিনিকেতন বাণীর ভীমকান্তির সৌন্দর্য্য সমগ্র জগতে ধীরে ধীরে প্রতিভাত হইয়াছে। ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় কি যে ভারতের নিজস্ব ও বৈশিষ্ট্য কিছু আছে?"

তিনি সাহিত্যিকদের নিকট নিবেদন করিয়াছেন—"দেশের প্রতি, জনসাধারণের প্রতি, ভবিষ্যত জাতিগঠনের প্রতি আপনাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিবেন। তাহা হইলে বঙ্গ-সরস্বতীর বাণী আপনাদের লেখনীমুখে প্রকাশিত হইবে; তাহা হইলেই আপনাদের পাঠকরা দেখিবে তাহাদের অন্তর যাহা চাহিতেছিল তাহাকেই আপনারা মূর্ত্তি ও কণ্ঠস্বর দিয়াছেন।"

তিনি 'শুদ্ধ' সাহিত্য ছাড়া অন্য অন্য বৈষয়িক ও ব্যবহারিক সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"এই কর্ম্মজগতের সহিত সাহিত্যের সহকারিতা চাই। দেশের কল্যাণার্থে আপনারা বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্য লিখুন, এ বিষয়ে আমাদের ভাষা এখন দরিদ্র, আমাদের ভাণ্ডার দ্রুত বাড়াইতে হইবে, পূর্ণ করিতে হইবে, কারণ সকল বিষয়ে বাংলা ভাষার জ্ঞান ও ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং হইবেও, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। * * * এই কর্ম্মজগতের সহিত সাহিত্যের সহকারিতা চাই। ইতিহাসকে নিজ দৃষ্টিতে প্রতিফলিত করিলেই চলিবে না, ইতিহাস গঠনের কার্য্যেও সাহিত্যকে হাত লাগাইতে হইবে। এজন্য দেশের শাসনতন্ত্রের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় ও লেখক-সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ-সাহচর্য্য ও সহযোগিতা থাকা আবশ্যক।"

সভাপতি মহাশয় বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"মহাকাল ভাগ্যবিধাতা তাহার রক্ত মুখই আমাদিগকে দেখাইয়া আসিয়াছেন। অন্য প্রদেশের প্রতিযোগিতার মুখে বহুক্ষেত্রেই বাংলার উদ্যম ও শক্তি হটিয়া গিয়াছে। শুধু আজ বাংলার লেখকের সংখ্যা, পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা এত বেশী যে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। আজও বাংলার উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক অন্য প্রদেশের লেখকেরা অকাতরে অনুবাদ করিয়া চলিয়াছেন। আজও ভারত শাসনতন্ত্রের কাজে বাঙ্গালীর বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মকুশলতার আবশ্যকতা রহিয়াছে।" উপসংহারে তিনি বলেন—"বাংলা দেশের সাহিত্যসৃষ্টির পথ কখনও রিক্ত হইবে না—সে দেশের উর্ব্বর ভূমি কখনও উষর মরুভূমিতে বা জনবর্জিত অরণ্যে পরিণত হইবে না—একথা অসঙ্কুচিতচিত্তে বলা যাইতে পারে।" প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে গুরুদায়িত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন—"যাঁহারা লিখিতে পারেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রবাসলব্ধ অভিজ্ঞতা লইয়া গল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ, স্থানীয় আচার-ব্যবহারের বর্ণনা, বৃত্তান্ত, ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে পারেন। তাঁহারা অন্য প্রদেশীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সহিত পরিচয় দ্বারা নিজের অভিজ্ঞতার ও সম্ভবতঃ বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে পারেন।" তিনি প্রবাসী বাঙ্গালীদের তৎপ্রদেশের বাসিন্দাদের সহিত মেলা-মেশা ও তাহাদের মধ্যে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বিতরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন—"যাঁহাদের প্রদেশে আমরা বাস করিতেছি, তাঁহাদের প্রীতি অর্জ্জন করিতে আমাদের বিশেষ প্রয়াস করা দরকার, নহিলে তাঁহাদের বিশ্বাস ও সাহায্য কি করিয়া অর্জ্জন করিব?"

তৎপরে এলাহাবাদনিবাসী সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ কর সমস্ত বৎসরের কার্য্য বিবরণ প্রদান করেন এবং সম্মেলন কর্ত্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের বিবরণ অধ্যাপক কিরণচন্দ্র সিংহ প্রদান করেন। উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদের নাম ঘোষণা ও সাফল্য পত্র দান করা হয়।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে দীর্ঘ ও সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন এবং পরদিন সাহিত্য-শাখায় কয়েকটি প্রবন্ধও আলোচনা হয়। ইহাতে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অতুল গুপ্ত, বিমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত বাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় "গণ-সাহিত্য" শাখার সভাপতিরূপে গণ-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ও রূপ প্রদান করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ (মৌমাছি) শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন।

এই দিবস সন্ধ্যায় বোম্বাই "রূপিমেলা" সঙ্ঘ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে লইয়া "অরুণ-বরুণ-কিরণমালা" রূপকথার সুন্দর রূপায়িত করিয়া ভবিষ্যৎ বাংলায় শিশুদের কৃতিত্বের আভাস দেন। শ্রীমতী মাধব বাই বীণাবাদ্য ও সঙ্গীত সহিত মধুর মরাঠীতে ভজন গান করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেকনিক্যাল

মূল গৃহে একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বোম্বাই প্রবাসী বাঙ্গালী শিল্পীদের চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রগুলি দর্শনীয় ছিল।

তৃতীয় দিন প্রাতে নয়টার সময় লেখকের সভাপতিত্বে মণ্ডপে বিষয় নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশন হয়। পুনার সীতা মুখোপাধ্যায় ব্যতীত অন্য কোন মহিলা প্রতিনিধি ছিল না। কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বেলা দশটা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে সভার অধিবেশন চলে। প্রথমে ১০টায় মূল অধিবেশন ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে হয়। সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কেশবলাল অম্বোপাধ্যায় মহাশয়ের ৮৬ বৎসর বয়প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করা হয়। এই সভায় অতুল গুপ্ত মহাশয় তাঁহার স্মৃতি করিয়া বলেন, শীঘ্রই পুনিয়ায় বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণ তাঁহার সকাশে গিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন। সেই অনুষ্ঠানে এই সম্মেলনের প্রতিনিধি যেন পাঠান হয়।

এই দিবস পর পর বা এক সঙ্গে ,তর ভিন্ন স্থানে—ডাঃ সত্যেন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বিজ্ঞান শাখা, ডাঃ ধীরেন্দ্রলাল ধর সভাপতিত্বে "অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও পরিকল্পনা" শাখায়, শ্রীযুতী লীলা রায়ের সভানেত্রীত্বে মহিলা শাখা, ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র সাহিত্য শাখা ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়।

মণ্ডপে প্রায় ৫০০ মহিলার সমাগম হইয়াছিল। এলাহাবাদের শ্রীযুতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। কল্যাণী ভট্টাচার্য্য এম-এর প্রস্তাবে ও মৃণালিনী মজুমদারের সমর্থনে শ্রীযুতী লীলা রায় (কলিকাতা) সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুতী কুলসুম মৈয়ানী স্বাগত অভিভাষণ পাঠ করেন।

মৈত্রেয়ী গুপ্তা—"প্রাচীন সাহিত্যে নারীর স্থান", মায়া ঘোষ বি-এ, বি-টি "স্বাধীন ভারতে নারীর দায়িত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় শহীদদের তর্পণ, বিবাহের বেশ পরিবর্ত্তন, বিধবাবিবাহ অধিক প্রচলন, পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার আইন প্রচলন, বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় সব বিবাহ রোধ প্রবর্ত্তন, বরপণপ্রথা উচ্ছেদ, যৌতুক প্রদান সব বিবাহে কন্যাপক্ষের অমত এবং প্রয়োজন ও কারণ থাকিলে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রবর্ত্তন প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুতী প্রীতি সেন নারীর স্বাবলম্বন দ্বারা আর্থিক উন্নতি করণ, শ্রীযুতী আভা বসু বাঙ্গালা নারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার, নীলিমা সিংহ কিশোরকিশোরীদের উপযুক্ত চলচ্চিত্র গঠনের জন্য সরকারের চেষ্টা দাবী, শ্রীযুতী নলিনী দত্ত বাধ্যতামূলক নারীর শিশু-পালন শিক্ষা প্রবর্ত্তন আইনের দাবী, শ্রীযুতী লীলা রাজরা ও মৃণালিনী মজুমদার শিশু মনবিকাশে নাচার দায়িত্ব, শ্রীযুতী অলকা উকীল (কলিকাতা) রাষ্ট্র ও সমাজে শিশুর দায়িত্ব, শ্রীযুতী রমা ম্যাসাজি নিগৃহীত ও ধর্ম্মান্তরিত নারীদের স্বধর্ম্মে ও সমাজে গ্রহণের দাবী, শ্রীযুতী নূরজাহান বসু শিশুপালন সম্বন্ধে প্রস্তাব, আলোচনা ও বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যেকের ভাষণ ও আলোচনা প্রাণস্পর্শী, মর্ম্মী ও সময়োপযোগী হইয়াছিল। শ্রীযুতী রাণী সেন সকলকে ধন্যবাদ দেন।

রবীন্দ্র সাহিত্য-শাখা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা শাখা অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র নাথের সাহিত্যের এক দিক' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ক্ষিতিমোহন বাবু বোম্বাইএর সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ বর্ণনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—তাঁহার সহিত আমেদাবাদ ও বোম্বাই প্রদেশকালে—বোম্বাই ও আমেদাবাদ তাঁহার সাহিত্য সাধনার এক মোড় ফেরার স্থান (Turning point)। আমেদাবাদে তাঁহার গানের প্রথম সুর যোজনা হয়। মহাত্মা তিলক তাঁহাকে প্রথম সাধারণভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন ও ৫০০০৲ দিবার প্রস্তাব করেন। রবীন্দ্রনাথ এইখানে বলেন—মনের ব্যথা কীর্ত্তন সুর ছাড়া ব্যক্ত হয় না। তাহার জন্য বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের মনের কথা এত গভীরভাবে পূর্ণ। তাঁহার "তোমার গোপনে কথা" ও "জীববল্লভ হে" বোম্বাইতে রচিত। শান্তিদেব ঐ গান এবং আরো কয়েকখানি গান ক্ষিতিমোহন বাবুর বক্তৃতার সঙ্গে গাহেন। এই স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেন "বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হবে না ও অন্য কি ভাষা হতে পারে।" সন্ধ্যায় বোম্বাইএর বাঙ্গালীদের স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীগণ জাতীয় সঙ্গীত, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক, নৃত্য গীতের দ্বারা সকলের চিত্ত বিনোদন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দিনের অধিবেশন

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে শিক্ষা ও সাংবাদিক সাহিত্য শাখায়, শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের সভাপতিত্বে সঙ্গীত শাখা, দিল্লীর ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে ইতিহাস শাখায়, ডাঃ সুরাজকুমার বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে দর্শন শাখা, শান্তিনিকেতনের শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শিল্প শাখার অধিবেশন হয়।

মধ্যাহ্নে মূল অধিবেশনে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐক্য বিষয়ের আলোচনা সভা হয়। কলিকাতার প্রবীণ সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সভাপতিত্বে উহা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে অতুলবাবু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া বলেন—বাংলা রাষ্ট্র ভাষা না হইলেও ইহার কোন ক্ষতি হবে না। তারাশঙ্করবাবু অনুরূপ মত পোষণ করিয়া বলেন যে তথাপি বাংলা ভাষার প্রসার ও বাংলা ভাষাভাষীদের এক-বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত না করিলে বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি ব্যাঘাত হইবে।

এই সভায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও যেখুন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুতী তরঙ্গিনী রায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে ও প্রতিনিধিগণের পক্ষে পরস্পর ধন্যবাদ প্রদান করেন মূল সভাপতি বিচারপতি দেন, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র সিংহ। ক্ষিতিমোহন সেন ও লক্ষ্ণৌ প্রবাসী দ্বিজেন্দ্রনাথ সাক্সেনা মহাশয়দ্বয় বিদায়ের পালায় দুইটী রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করিয়া মধুরেণ সমাপন করেন।

বর্ত্তমান বর্ষের সম্মেলন স্বাধীন ভারতের বাঙ্গালীদের একটি মহাসম্মেলন। সুদূর বোম্বাই নগরে অনুষ্ঠিত হওয়াতে ইহার প্রথম বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় ইহার রজতী উৎসব বর্ষ। অনেক বড় ছোট সাহিত্যিক সমাবেশ হইয়াছিল। স্থানীয় লোকের আগ্রহ উৎসাহ যথেষ্ট ছিল। প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ও হইয়া গেল। কিন্তু লাভ হইল কি? দূর হইতে আগত সাহিত্যিক ও সুধীগণও কয়েক হাজার টাকা ব্যয় ও ক্লেশ ভোগ করিয়া পাইলেন কি? পাঁচটাকায় পাঁচদিন বোম্বাই বাস, জুহুতে সমুদ্র স্নান, এলিফেন্টা গুহা দর্শন ব্যতীত আর কি লাভ হইল। কোন গঠনমূলক কার্য্যের আভাসও নাই, নেতৃত্বেরও সুযোগ পাওয়া যাইল না। স্বাধীন ভারতের বাঙ্গালীর এ দীনতা অপনোদন করা বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদেরই কর্ত্তব্য। পাশেই হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের প্রচার ও প্রভাবের নিকট প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ম্লান হইয়া গেল।

গান্ধীপ্রস্থ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

নিশান্তে পথের প্রান্তে যাত্রী বহু রাত্রির তিমিরে,
নিবিড় নিদ্রায়
দিল্লীর পল্লীর শান্তি ভাঙ্গ ক্লান্তি জানাইল ধীরে
তন্দ্রিত বিদায়,
শুধু একা স্মৃতিমাখা রাজপথ শুধাল হাসিয়া—
চলে যাও কোথা ?
কহিনু—তোমারে যাহি' মৃদু গাহি অতীতে চাহিয়া
পুরাতনী ব্যথা।

২

কহিনু—নগরী তুমি গড়ি' তুমি সমর দৈকতে
রচি' ইতিহাস
আজ ধারে পুষ্পহারে রাও ছত্রে বসাও মরতে
তারি সর্বনাশ
করে যাও, ভুলে যাও ক্ষণিকের পুলকে একেলা,
চাহ না কাহারে ;
চরণে নূপুর তব চিরণ চুম্বিকা সম খেলা
ওরে ক্ষুণ্ণিবারে।

৩

তুমি ত বাসনি ভাল মহাকাল ভগিনী বন্দিতা
রূপসী নগরী,
অন্ধকার সন্ধ্যাকালে ভালে লয়ে টীকা অনিন্দিতা
স্মৃতির গাগরী
ভরিয়া যমুনাতীরে ফিরে তব অনাবৃত দেহ
সুপ্ত ইতিহাসে
শুধু লক্ষ্য কর দূরে রাজপুরে নবাগত কেহ
পুন বুঝি আসে।

৪

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজপাটে অর্ধচন্দ্র শোভিল নিঠুর,
ভ্রূক্ষেপ ও নাহি ;
তারে পুন অর্ধচন্দ্রে মেঘ মন্দ্রে করিলে আতুর ;
জলে অবগাহি'
পাশ্চাত্য বণিক দল ধ্বনি' ব্যাঘ্র-রণ-ভেরী নাদ
উড়াল পতাকা,
বিশ্বরণে জিনি' তবু নিঃস্ব প্রাণে পূরিল বিষাদ—
পড়ে গেল ঢাকা।

৫

বিশ্বের বিস্ময় মাঝে নগ্ন সাজে উদিল সন্ন্যাসী,
হিংসাহীন রণ,
অগ্নিবাণ ব্যোমযান আণবিকা শক্তি সর্বনাশী
সবি অকারণ ;
সংহার লীলার পরে শুভ্র ভস্মে প্রণমে সংসার
প্রেমের ঠাকুরে,
হ'ল আশা ভালবাসা রচি' দিবে দীপ্তিরে ধরার
নব শান্তিপুরে।

৬

নাই ক্ষমা নিরুপমা তোমার নিঠুর কটাক্ষবাণে,
রক্তশক্তি জানো
প্রতিটি বৃগান্তে শান্তি ক্লান্তি তব বক্ষতলে আনে
তাই অস্ত্র হানো।
বিশ্বের হিংসার দাবী ভাবীকালে তুলিবে যাহারে
পূজিয়া মানবে
অমোঘ তোমার বিধি সে নিধিও সহসা সংহারে ;
তব ধিক্ তবে।

৭

তাই আমি যাই চলে পিছে ফেলে শতেক স্মৃতিরে,
যে মহাপথের
একপ্রান্তে দিকভ্রান্তে নব নব রাজ্যের গতিরে
কর্ণের রথের
মত মগ্ন তপ্ত করি ফেলে যাও, হাস উপেক্ষিয়া
উদাসে হেলায়,
সে পথ তোমারি থাক্, ঘুরে থাক্ ; শুধু শুভ্র হিয়া
পাস্থ চলে যায়। *

---

* গান্ধীজীর মৃত্যুর পর দিল্লী পরিত্যাগের সময় বিমানপথে রচিত।

বনফুল

পূর্বানুবৃত্তি

পরের বড় জংসনটাতে নাবলেন তাঁরা। আগে থাকতেই এই প্ল্যান ছিল। অবশ্য স্বরপ্রভা দেবীর প্ল্যান। তাঁর আর তর সইছিল না যেন। চলন্ত ট্রেন থেকেই লাফিয়ে নাবলেন তিনি। তাঁর পাশের চিবুকের এবং শরীরের অন্যান্য চর্বিবহুল অংশের স্পন্দন দেখে মনে হল লাফিয়ে নাবতে গিয়ে সমস্ত দেহে বেশ একটু নাড়া খেয়েছেন অভ্রংলিহা। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। নেবেই একটা কুলিকে এক ধমক দিলেন তিনি। সে বেচারা ছুটে এসে তাঁর পতনোন্মুখ দেহকে আপটে ধরতে গিয়েছিল।

অনীতা চুপ করেছিল। তার কেমন যেন অবসন্ন মনে হচ্ছিল। জিতুবাবুর কানের ডগাটা লাল হয়ে' উঠেছিল। ঠাকি ধরা পড়ে যাবার পর যদুবাবুর কাছে বকুনি খেয়ে ঠাকিবাজ কেরানীর যেমন মুখভাব হয়, জিতুবাবুর মুখভাব সেই রকম দেখাচ্ছিল অনেকটা।

"আমরা এইখান থেকেই মোটর নেব, বুঝলে"—স্বরপ্রভা বললেন—"তুমি আগেই ট্যাক্সি ঠিক করে' রেখ একটা। পরে হয় তো না-ও পাওয়া যেতে পারে। আমরা ট্রেনের যাত্রীর ওই হোটেলটায় খেয়ে নি, তুমি ততক্ষণ একটা মোটর দেখ। কাছাটা ঠিক করে' দাও"

"কি"—ট্রেন থেকে নাবতে নাবতে জিগ্যেস করলেন জিতুবাবু। ভীড়ে গোলমালে ভাল করে' সব কথা শুনতেই পান নি তিনি।

স্বরপ্রভা আবার সব বললেন।

"আঃ, চেঁচিও না অত। লোকে চেয়ে চেয়ে দেখছে"

"দেখছে তোমাকে। কাছাটা ঠিক করে' দাও"

"দোহাই তোমার, থাম। ইস্—কি বিশ্রী ষ্টেশনটা। এখানে হোটেল কোথা? ষ্টেশনে তো মোটর দেখছি না একটাও, সব চ্যাকড়া গাড়ি—"

"একটু দূরে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড আছে, আমি খবর নিয়েছি"

"কোথায় সে স্ট্যাণ্ড, জানব কি করে'। তাছাড়া কোথায় আমরা যাচ্ছি তাই তো জানি না। ট্যাক্সিওলাকে বলতে হবে তো জায়গাটার নাম। কি বলব তাকে"

"কাকে"

"তাকে। ট্যাক্সিওলাকে"

"ডেকে আন না। কোথায় যেতে হবে আমি তাকে বুঝিয়ে বলে' দেব"

"কিন্তু ট্যাক্সি ডাকলে ওস্থনি জানতে চাইবে কোথা যেতে হবে"

"সে আমি বলব তাকে"

"কিন্তু তুমি তো থাকবে হোটেলে। আমি তাকে হোটেলে ডেকে নিয়ে আসব? সে হয় তো আসতেই চাইবে না, ড্রাইভারগুলো প্রায়ই তেরিয়া মেজাজের লোক হয়"

"সামান্য একটা ড্রাইভারের ভয়ে তুমি যদি অস্থির হও পুরুষমানুষ হয়ে, তাহলে আমার আর—"

"মোটেই না। কিন্তু একটা কথা আমি জানতে চাই —আগে থাকতেই ট্যাক্সি ডাকবার দরকার কি। চল না আমিও হোটেলে গিয়ে খেয়ে নি, তারপর ট্যাক্সি ডাকলেই হবে। আমারও খিদে পেয়েছে।"

"সমস্ত লুচিগুলি তো ডাক্তার একা তুমিই খেলে। এর মধ্যেই খিদে পেয়ে গেল?"

"দেহটা বাজে, খিদে পাবে না? খেয়ে নিয়ে ট্যাক্সি খুঁজলেই হবে। এতে আপত্তি কি তোমার?"

"খাবার পর ট্যাক্সি খুঁজতে গেলে ট্যাক্সি পাবে না। এ তো আর কোলকাতা নয়। দুটো চারটে ট্যাক্সি হয় তো আছে, ভাড়া হয়ে যাবে"

"তার মানে ট্যাক্সি খুঁজে না আনা পর্য্যন্ত খেতে পাব না আমি—"

"তুচ্ছ খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি করতে লজ্জা করে না তোমার বুড়ো বয়সে! সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে যে। আমরা হোটেলে যতক্ষণ যাব, ততক্ষণে তুমি যদি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে পার এক-চিলে দুই পাখী মারা হবে"

"তুমি দেখছি আমাকেই মারতে চাও। আমি তা হলে যাব না!"

"ট্যাক্সিটা ডেকে এনেই খেও। খুব যদি খিদে পেয়ে থাকে ডাক্তার কেক বা সন্দেশ বা পাও কিনে নিয়ে খেতে খেতে যাও"

"সেটা কি—"

"এই কুসি হোটেলে চল। আমরা হোটেলে চললুম, বুঝলে। তুমি ট্যাক্সি দেখ একটা"

ঈষৎ চিন্তার পর জিতুবাবু উপলব্ধি করলেন গত্যন্তর নেই। হোটেলের দিকেই অগ্রসর হলেন তাঁরা। অনীতা একটু পিছিয়ে রইল। এসব কোন-কিছুর মধ্যে থাকবে না সে। থাকতে ভাল লাগছিল না।

জিতুবাবু বেরিয়েই গোটা চারেক কেক কিনে নিলেন এবং স্বয়ম্প্রভার অগোচরে অনীতাকে দুটো দিতে এলেন।

"আমি খাব না বাবা"

"খেয় না চেখে"

অগত্যা অনীতাকে নিতে হল।

"ট্যাক্সিওলা যদি জানতে চায় কোথায় যেতে হবে, কি বলব। জানতে চাইবেই"

"বোলো কতিমারং যাব"

"কতিমারং? কতিমারং কোনও জায়গার নাম হতে পারে না"

"রংপুর যদি হতে পারে কতিমারং হতে বাধা কি"

"রংপুর আর কতিমারং আকাশ-পাতাল তফাত।"

"যাক সে আমি তাকে বুঝিয়ে বলব এখন। ওই দিকে গেলেই নামটা জানা যাবে। কতিমারং কিম্বা ফাৎনারং—ওই ধরণেরই নাম সে গ্রামের। ওদিকে গেলেই জানা যাবে"

"কোন দিকে যেতে হবে তাও হয় তো সে জানতে চাইবে"

"কেন"

"কি কেন"

"কেন তাই তো আমি জানতে চাইছি। আমি তাকে নিয়ে যাব, তার আগে থাকতে জানবার দরকার কি"

"না জেনে সে যদি না আসতে চায়"

"দেখ কুঁড়ে লোকেরাই 'যদি' 'হয় তো'—এই সবের আশ্রয় নেয়। তুমি গিয়েই দেখ না।"

"জায়গাটা কত দূর হবে এখান থেকে"

"ঠিক জানি না। তবে কাছেই। বেশী দূর হতে পারে না"

"হবার বাধা কি"

"হলে কোলকাতা থেকে ওরা মোটরে করে' গিয়ে সেখানে রাত্রিবাস করছে কি করে'? ঘটে কি একেবারে কিছু নেই!"

"কি বললে"

"কিছু নয়। যাও তুমি। এমন শক্ত কাজ কখনও হয়েছে"—

জিতুবাবু গেলেন। ফিরে আসতে বেশ একটু সময় লাগল। ফিরে দেখলেন স্বয়ম্প্রভা মারমুখী হয়ে বসে আছেন। হোটেলওলা, হোটেলের চাকর-চাকরাণী, হোটেলের ঠাকুর সকলের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছেন। প্রায় ফৌজদারি কাণ্ড। অনীতা চুপ করে' বসে আছে একধারে। চারিদিকে নোংরা, মাছি ভনভন করছে, সমস্ত গা ঘিনঘিন করছিল তার। জিতুবাবু কিন্তু বেশ উল্লসিত এবং উদ্দীপ্ত হয়ে ফিরেছেন মনে হল।

"চলে এস! ট্যাক্সি পেয়েছি—"

"উঃ একটা গাড়ি ডাকতে যে কারও এতক্ষণ লাগতে পারে তা ধারণার অতীত ছিল"

"কেউ আসতে চায় না। জিগ্যেস করে' করে' বার করলাম গ্রামটার নাম। ফাৎনা ঝিরিঝিপুর। কেউ যেতে চায় না। অনেক কষ্টে এই লোকটাকে রাজি করেছি। জায়গাটা বেশ দূর, তাড়াতে ফতুর করে' দেবে। যাক্ চল—যেতেই যখন হবে"

"ডিভোর্স করতে হলে উকীলের ফী যা লাগবে ট্যাক্সি-ভাড়া তার চেয়ে বেশী হবে না আশা করি"

"মা"—ফোঁস করে' উঠল অনীতা।

"থাক। তুমি আবার মুখ কোরো না। কোথায় মোটর"

"বাইরে। তুমি কি আশা করেছিলে মোটর এনে একেবারে রান্না ঘরে ঢুকে পড়বে?"

জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন। অনীতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ম্প্রভাও বেরিয়ে এলেন। জিতুবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে দু'একবার নাক কুঁচকে নিশ্বাস নিয়ে স্বয়ম্প্রভা অবশেষে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন।

"মদ খেয়েছ না কি"

"খেয়েছি। মানে, খেতে বাধ্য হয়েছি। শরীর আর বইছে না। আমি উট নই, মানুষ"

"খাওয়ার ইচ্ছে যদি ছিল স্টেশনের কেলনারে ঢুকে ভদ্রভাবে খেলেই হ'ত। আমাদের হোটেলে বসিয়ে রেখে একটা বাজে তাড়িখানায় ঢুকে ষাঁড়ের মতো তাড়ি না গিললে চলছিল না"

"তাড়িখানা নয়, ভাল দোকান। 'বিয়ার' পেয়ে গেলাম"

"কতটা খেয়েছ? মাতলামি করবে না কি রাস্তায়"

"কোয়ার্টখানেক খেয়েছি। ওতে নেশা হয় না। ভাল বোধ করছি বরং"

"আমরা নোংরা হোটেলে এক ঝাঁক মাছির মধ্যে বসে' একদল অসভ্য লোকের সঙ্গে বকাবকি করছি, আর তুমি গিয়ে ওদিকে মদ মারছ। লজ্জা করে না তোমার?"

"না"—মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন জিতুবাবু—"আমার সঙ্গ যদি তোমার পছন্দ না হয় বল এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি"

"ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বস। তোমার পাশে বসতে পারব না। গন্ধে বমি আসছে"

"বল তো বাড়ি ফিরে যাই"

"যা বলছি কর"

১৬

ছকুবাবু পিছনে হাত দিয়ে লাইব্রেরি ঘরে উত্তেজিত-ভাবে পদচারণ করছিলেন। ব্রজেশ্বরবাবুদের কিভাবে অভ্যর্থনা করবেন তারই নানা রকম মক্সো করছিলেন তিনি মনে মনে। কি এক ফ্যাসাদ এসে জুটল, রাম কহো! অভ্যর্থনা! এসে পড়লে করতেই হবে, উপায় নেই এবং যদি করতে হয় এক-হাত দেখিয়ে দেবেন তিনি। সুচারুরূপে সংক্ষেপে এবং অভিনবত্ব সহকারে যাকে বলে। মাঝে মাঝে খেমে ঝাঁকড়া ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গেটের দিকে চাইছিলেন। এখনই আসবে! ওই বোধহয়! অনতি-বিলম্বেই একটা মোটরকার সশব্দে এসে দাঁড়াল। ছকুবাবুও এক নিমেষে গ্লাসে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং যে সাদর সম্ভাষণ করবেন ঠিক করেছিলেন সেটা আওড়ালেন আর একবার মনে মনে।

মোটরের ভিতরও রিহার্সাল চলছিল একটা। ভিন্ন রকমের। নেবেই প্রথম আলাপের মোহড়ায় কতটা প্রকাশ করা উচিত এবং কতটা চেপে যাওয়া উচিত—তারই আলোচনা চলছিল দু'জনের মধ্যে। দু'জনেই বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। সাধনা অবশ্য চোখে মুখে খুব একটা সহজ ভাব ফুটিয়ে রেখেছিল, রাখবার চেষ্টা করছিল অন্তত। মুখে খুব একটা সপ্রতিভ হাসি ফুটিয়ে জানলা দিয়ে ঝুঁকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সে বাড়ির সামনেটা।

সুশোভন ঝোঁকে নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে গাড়ির এককোনে সেঁটে বসেছিল—চোখে মুখে একটা বে-পরোয়া ভাব ফুটিয়ে।

রমলকে অবতীর্ণ হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে উইংসের ধারে দণ্ডায়মান নূতন অভিনেতাদের যে মনোভাব—এদের উভয়েরই মনোভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল প্রায়।

"প্রথম ঝোঁকটা তুমিই সামলে নাও, বুঝলে সাধনা, যা কৈফিয়ত টৈফিয়ত দেবার দিয়ে ফেল তুমিই প্রথমে। 'উঃ, কি বিশ্রী যে পড়েছিলাম' গোছের একটা কিছু—বুঝলে। বাড়ীটা দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ"

"কেউ দাঁড়িয়ে আছে না কি"

"না। সামনের ঘরজাটা তো বন্ধ"

"বাঁচা গেল। অনীতা দাঁড়িয়ে থাকলেই হয়েছিল আর কি! একটু ঘম না নিয়ে অনীতার সামনা সামনি দাঁড়াতে পারব বলে' তো মনে হয় না। কিন্তু দেখো, ঠিক তার সঙ্গেই আগে দেখা হয়ে যাবে! যা কপাল—"

"সে যা হয় হবে। আচ্ছা, আমিই আগে যাবি। আপনি ভিতরেই থাকুন এখন। আমি আগে দেখে আসি—হাওয়া কি ভাবে কোন দিকে বইছে"

"বেশ। তাই যাও। শুছিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে' দিও আগে, বুঝলে। তারপর আমাকে এসে টেনে বার কর—'এই যে সুশোভনবাবু এখানে রয়েছেন'—এই গোছের কিছু একটা, বুঝলে। সব নির্ভর করছে অনীতা কোথা আছে তার উপর। প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি—"

মোটর এসে বারান্দার সামনে দাঁড়াল। পরেশ একটা আড়িমুড়ি ভেঙে স্টিয়ারিং ছেড়ে নামল নীচে।

সান্ত্বনা নামবার আগেই বারান্দার ঘরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল পরেশ। পরেশ ঘাড় ফিরিয়ে কাকে যেন ডেকে বলছে—"ছটু—এই ছটু—ডাক্তারবাবুরা এসে গেছেন, খবর দাও ভিতরে"—বলে নিজেই চলে গেল আবার ভিতরে।

একটা অজানা আতঙ্কে দু'জনেরই বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আতঙ্কের সঙ্গে মিশল বিস্ময়। কপাট খুলতে না খুলতেই ঝুনু বেরিয়ে এল। তখনও ধর ধর করে' কাঁপছে। কান দুটো খাড়া। বারান্দায় একটু দাঁড়িয়েই এক ছুটে নেবে এল নীচে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আবেগে গদগদ একেবারে। কি যে করবে ভেবে পেল না বেচারি, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অস্থির হয়ে উঠল।

"ওমা, ঝুনু যে"—বলে' উঠল সান্ত্বনা।

"ও আবার জুটল কি করে"—গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সুশোভন।

"আপনাদের সেই কুকুরটা দেখছি যে"—পরেশ বলল—"কেউ কুড়িয়ে দিয়ে গেছে বোধ হয়"

"হ্যাঁ। জিনিসপত্রগুলো নাবিয়ে ফেল"

সুশোভনের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা বললে—"কেউ এসেছিল এখানে তাহলে"

"হ্যাঁ এবং সব কাঁস করে' দিয়েছে হয় তো।"

"কে হতে পারে"

সুশোভন গম্ভীরভাবে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে গোঁফ জোড়ার উপর তা দিতে লাগল।

"ওই চাকরটাকে জিগ্যেস করলে হয় না। উঁকি মেরেই সরে পড়ল কোথায় লোকটা"

"আমি যাই। আপনি অপেক্ষা করুন"

পরেশ আবার বেরিয়ে এল। ঠোঁটে মধুর একটি হাসি ফুটিয়ে সান্ত্বনা এগিয়ে গেল তার দিকে।

বিনীত নমস্কার করে' পরেশ বলল—"আপনারা যে এ সময়ে এসে পড়বেন তা আমরা আন্দাজ করতে পারি নি। ওঁরা তাই শিকারে বেরিয়ে গেছেন সবাই। গিন্নিমাও সঙ্গে গেছেন। আপনারা আসবেন জানলে উনি অন্তত থাকতেন"

"তাতে কি হয়েছে। বরং ভালই হয়েছে এক হিসেবে। আমাদের আসবার খবর পেলে হয়তো শিকার পার্টিটাই মাটি হয়ে যেত। ট্রেণ ফেল করে' আসতে পারি নি আমরা। ঝুনুকে কে দিয়ে গেল। কাল রাত্রে হারিয়ে গিয়েছিল। সে কি ঝুনকিল"

পরেশ সন্ধানী চোখে একবার ঝুনুর দিকে।

"সব শুনেছি আমরা। একটু আগেই এ অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক দিয়ে গেলেন ওকে। তিনি আপনাদেরও চেনেন। কাল রাত্রের সব খবরও বললেন। তাঁর কাছে খবর পেয়ে আমরা বুঝলাম ব্যাপারটা—তখন গিন্নিমা চলে গেলেন—"

"কে বল তো ভদ্রলোকটি"

"সদারঞ্জবিলাসীবাবু"

"ও"—সান্ত্বনা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল একটু, তারপর তাড়াতাড়ি বললে—"জিনিসপত্রগুলো নাবিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা কর তাহলে"

"হ্যাঁ, এই যে"

"সুশোভনবাবুর স্ত্রীও শিকারে গেছেন না কি"

"তাঁরা তো আসেনই নি। কোনও খবরও আসে নি"

সান্ত্বনা মোটরের দিকে এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে একটু ইশারা করতেই সুশোভন মুণ্ড টেনে নিলে গাড়ির ভিতর। সে অবাক হয়ে

উঁকি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল ব্যাপার কতদূর গড়াল।

"আচ্ছা"—সান্ত্বনা আবার পরেশকে জিজ্ঞাসা করলে—"সদারঙ্গবাবু আসবার আগেই মেসোমশায়রা শিকারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, নয়? আমাদের খবর ওঁরা তাহলে কিছুই পান নি"

"না। পেলে কি আর বেরিয়ে যেতেন! ছকুবাবু আর আমি ছাড়া কেউ জানে না"

"ছকুবাবু?"

"হ্যাঁ। গিন্নিমার দূর সম্পর্কের কে যেন হন। বেড়াতে এসেছেন।"

"ও। ছকুবাবুর সঙ্গে সদারঙ্গবাবুর দেখা হয়েছে তাহলে"

"হ্যাঁ। অনেকক্ষণ ধরে' গল্প-সল্প করলেন দু'জনে"

"ও। আচ্ছা, জিনিসগুলো নাবিয়ে নেন"

গণেশ ও পরেশ দু'জনে মিলে জিনিসগুলো সামনের হলে রাখতে লাগল। সান্ত্বনা এগিয়ে গেল মোটরের দিকে।

"সুশোভনবাবু, আপনার নাবা চলবে না। শুধু তাই নয়, চাকরটা যেন আপনাকে দেখতে না পায়"

"অদৃশ্য হব কি করে! যাদু বিদ্যা তো জানা নেই। কেন, কি হল?"

"পরেশ হরিমটর হিন্দু-পান্থ-নিবাসের সমস্ত কথা শুনেছে"

"সমস্ত?"

"কতটা ঠিক জানি না। কিন্তু সদারঙ্গবিহারীবাবু যখন বুহুকে এনেছিলেন তখন—"

"সেই ব্যাটাচ্ছেলে যাকে বাঁশী এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছিল? অ্যাঁ, বল কি! আঃ! অনীতার খবর কি!"

"অনীতা এখানে নেই"

"যাক্, এটা সুখবর। কোথা সে এখন? শিকারে—"

"সে আসেই নি"

"আসেই নি! বল কি! আসেই নি! কোথা গেল সে তবে!"

"তা এরা কি করে' জানবে। পরেশ বলছে, আপনাদের আসবার কথা ছিল কিন্তু আপনারা কেউ আসেন নি"

"কি হল অনীতার তাহলে! কি হতে পারে!"

অতিশয় বিচলিত চিত্তে গাড়ীর মধ্যেই উঠে দাঁড়াল সুশোভন।

"সে হয়তো আর একটা হোটেলে আর কারও সঙ্গে রাত কাটিয়ে আসছে একটু পরে"

অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা ক'টি বলে' নির্ব্বিকার-ভাবে চেয়ে রইল সান্ত্বনা।

"না, রসিকতা ভাল লাগছে না সান্ত্বনা। ব্যাপার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, সে কি ফিরে গেল না কি? তা'হলে তো—আমি বরং চলে যাই, বুঝলে"

"আমিও তো তাই বলছি। পরেশের দৃষ্টি থেকে সরে' থাকতেও বলছি সেই জন্যে। হিন্দু পান্থনিবাসের কীর্ত্তি ওঁরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনে থাকেন তাহলে আপনার আত্মগোপন করে' এই মোটরেই সরে' পড়া উচিত। আমি বলব বিশেষ একটা জরুরি দরকারের জন্য আমার স্বামীকে এই মোটরেই ফিরে যেতে হল—"

"এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামী হয়তো রাত্রির ট্রেণে যাবেন পরের ষ্টেশনে"

"কালকের আগে তাঁর আসবার সম্ভাবনা নেই"

"কিন্তু শোন, আমরা সত্য কথাটা অকপটে বলব বলেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছি। তাই করি না কেন। কি দরকার এই লুকোচুরির? এই হোটেলে দু'জনে রাত্রিবাস করলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। সে কথা যদি কেউ ভাবে, তাহলে নিতান্ত ইতর বলতে হবে তাকে—"

"কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন"—সান্ত্বনা শান্তভাবে বোঝাতে লাগল—"বুহুকে সদারঙ্গবাবু এখানে যখন দিয়ে গেছেন তখন এখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করতে হয়েছে তাঁকে গোঁসাইজির কাছে। গোঁসাইজি তাঁকে কতটা কি বলেছেন তাতো জানা নেই—তার ওপরই সব নির্ভর করছে"

"পরেশকে জিগ্যেস করেছিলে কিছু এ বিষয়ে?"

"নিশ্চয় না। তা কি করা যায়?"

"ধর যদি গোঁসাইজি সদারঙ্গবাবুকে সব কথা বলেই থাকেন যে আমরা একঘরে দু'জনে শুয়েছিলাম, তাহলে সে কথা কি গাড়োলটা এখানে এসে চাকরদের কাছে গল্প করবে—এও কি সম্ভব না কি"

"ইচ্ছে করে' না করলেও কথায় কথায় বেরিয়ে পড়তে পারে বই কি। বলা যায় কি কিছু। বুহুকে নিয়ে কম কাণ্ড তো হয় নি, বুহুর গল্প করতে করতেই হয়তো বেরিয়ে পড়েছে সব। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে হোটেলে ছিলাম, এর বেশী অত লোককে জানতে দেবার দরকারই বা কি। আপনি যদি এখন ফিরে যান লুকিয়ে, মানে, কেউ যদি আপনাকে দেখে না ফেলে, তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে এখানে প্রচার করতে পারি যে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে হিন্দু পান্থনিবাসে ছিলাম, সকালে এখানে মোটরে করে' এসেছিলাম, হঠাৎ একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আমার স্বামীকে ফিরে যেতে হল, কাল নাগাদ আবার হয়তো তিনি এসে পড়বেন। তার পর কাল যদি উনি সত্যি সত্যি আসেন তখন আমি ওঁকে বুঝে করব সব। তারপর আপনারা সংস্ত্রীক এসে পড়ুন, কেউ ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে পারবে না"

"তুমি দেখছি পাকা মিথ্যুক একটি। ওক্—! বেশ, ব্যাপারটা যদি এইভাবে দাঁড় করাতে পার মন্দ হবে না নিতান্ত"

সান্ত্বনা হেসে বললে, "এ সব ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলার দোষ নেই। সব দিক যাতে রক্ষে পায় তাই করাই ভালো নয় কি"

"বেশ। কিন্তু ভেবে দেখ আমি চলে গেলেই সব দিক রক্ষে হবে তো! ফাঁকি ধরা পড় গিয়ে শেষকালে আরও জটিল কিছু না হয়ে পড়ে"

"না, তা হবে না। অনীতার খবর নেবার জন্যে আপনি তো যেতেই চাইছেন। আমি কেবল বলছি এখানে আত্মপ্রকাশ করবেন না। লুকিয়ে চলে যান আমি সব ঠিক করে' নিতে পারব"

"তা পারবে। যদি না ওই সরসরমবাবু হুড়মুড় করে' এসে আবার—"

"সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না। পরেশ আসছে এ দিকে, ডাকতেই আসছে বোধ হয় আমাদের। তাহলে কি ঠিক হল, কি বলব আমি এখানে"

"যা তোমার খুশী। কিন্তু আমি যদি অনীতাকে নিয়ে ফিরি আবার, কি করে' জানব তুমি কি বলেছ"

"আমি কি বলব, সেটা নির্ভর করছে এরা কতটা কি জেনেছে তার উপর। এখানে পরেশ ছাড়া আর একজন ভদ্রলোক আছেন কি না"

"আবার কে"

সান্ত্বনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হল না। অতিশয় নাটকীয়ভাবে হুকুবাবু স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করলেন। হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এসে সামনের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে' তিনি বলে উঠলেন—"আঁই, আঁই রোঁয়া আঁরি আঁরি—এতানা দেরি কাহে ভইল—আঁরি, উপর পাবারি—"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখ তাঁর। খোঁচা খোঁচা গোঁফগুলো পর্যন্ত হর্ষ-কণ্টকিত।

"সর্বনাশ, ও কি!"

সান্ত্বনাও সবিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছিল।

"বেহারের ভাষা বোধ হয়। উনি বলিয়া জেলায় ছিলেন, কিছুদিন ওঁর মুখে এই ধরণের কথা শুনেছি"

"যাব কি না একটু দ্বিধা হচ্ছিল, কিন্তু এ ভাষা শোনার পর আর দ্বিধা নেই। বুঝলে, আমি চললাম। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। গণেশ"

"এই যে"—

"আঁরি. আঁরি, রোঁয়া, আঁরি—"

সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে রইল স্মিতমুখে।

গণেশ দ্রুত হস্তে 'গিয়ার' বদলে গাড়ি স্টার্ট করে' দিলে এবং স্টিয়ারিং ঘুরে' সোঁ করে' গাড়িটা ঘুরিয়ে একেবারে পঁচিশ মাইল বেগে সুরু করলে চালাতে। গাড়িটা দৃষ্টির বাইরে বেরিয়ে যেতেই সান্ত্বনা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল বারান্দায়। পরেশের দিকে চেয়ে বললে—"একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়াতে উনি ফিরে গেলেন এই গাড়িতে"

"ও"

"কালই ফিরবেন সম্ভবত"

জনৈকা মহিলার সান্নিধ্য সত্ত্বেও হুকুবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। তাঁর ভাষা বদলে গেল। তিনি বলে ফেললেন—"আরে মোলো, এ যে চোঁচা দৌড় দিলে! ব্যাপার কি বাত!"

তার পর সান্ত্বনার নমস্কারের উত্তরে প্রতি নমস্কার করে' হুকুবাবু বললেন—"ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো। আসুন, ভিতরে আসুন" (ক্রমশঃ)

শান্তিনিকেতনে ২৩ বৎসর পরে

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

আমি যেদিন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পড়ার জন্য শান্তিনিকেতনে পৌঁছি তার পরদিন গুরুদেবের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ আশ্রমে আসে। তারপর যতদূর মনে পড়ে ১৯১৬ সালে আমি ওখান হইতে অন্যত্র পড়াশুনার জন্য চলিয়া যাই। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার আশ্রমবাসীরা যে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করিতেছিলেন এবং গান্ধীজী যে আসিয়া আমাদের রান্না ঘরের ঠাকুর চাকর ছাড়াইবার জন্য আমাদের মত করান, সেই স্মৃতিটি আবার মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে। আর শান্তিনিকেতন আশ্রমের জীবনযাত্রার যে ছবিটি আমার মনে আনন্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যমণি হইলেন গুরুদেব। তাঁহাকে ঘেরিয়া করিয়া আছেন—অধ্যাপক ভগবানন্দ রায়, নেপালচন্দ্র রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার রায়, প্রমোদরঞ্জন রায়, কালিদাস বসু প্রভৃতি।

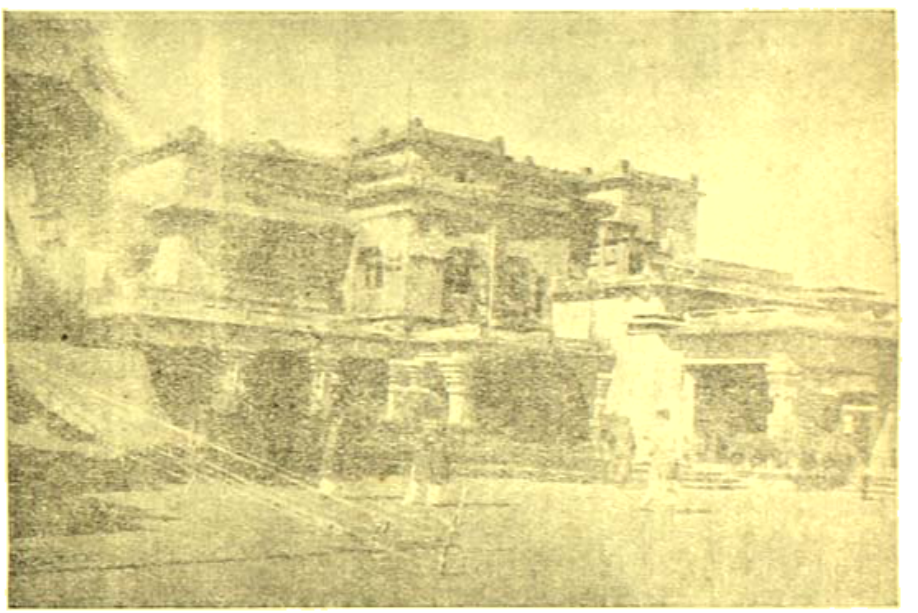

উত্তরায়ণ

তখনকার দিনে ঘড়ি কি ঘড়ি থাকিলে তাহা কি চলিত কি চলিত না তাহা বলিতে পারি না, তবে ঘড়ি ধরিয়া কোন কাজ করা হইত না। সকালে ৭টা বাজিলে ঘণ্টা পড়িত। তার পরের ঘণ্টার সাথে সাথেই শালবীথিতে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া প্রভাতদাদার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অনুকরণ করিয়া যাবার কথা ছিল। তখন পূর্বদিকে মাঠের উপর রেললাইনের ওপারে সূর্যোদয় হইতেছে দেখিতাম। তারপরই স্নানের ঘণ্টা। তারপরই উপাসনার ঘণ্টা। মাঠের মধ্যে দূরে দূরে আসন পাতিয়া নিরিবিলি বসিয়া থাকিতাম। উপাসনার শেষে শালবীথিতে দাঁড়াইয়া উপনিষদের শ্লোক পাঠ করিতে হইত—'যো অপসু, যো বনস্পতিষু'। (প্রতি বুধবার মন্দিরে উপাসনা হইত)

তারপরই জলখাবারের ঘণ্টা পড়িত। সেখানে সারি দিয়া বসিয়া গরম গরম লুচি বেগুণী, মুড়ি বেগুণী, মুড়ি গুড়, দুধ চিড়া চিনি, লুচি তরকারী, অথবা হালুয়া খাইতাম। শরৎকুমার রায় মহাশয় সারির মধ্যে হাঁটিয়া বেড়াইয়া তদারক করিতে করিতে বলিতেন, 'ফেলিও না, চাদরে বাঁধিয়া দিব'।

ইহার পর সুরু হইত গানের তদারক ক্লাশ। জগদানন্দবাবু বসিতেন আম্রকুঞ্জের পাশে শালবীথির শেষপ্রান্তে। প্রভাতবাবু বসিতেন—লাইব্রেরীর কাছাকাছি হলঘরের বারান্দায়, ঐ বারান্দারই অপরপ্রান্তে বসে শিখাইতেন শরৎবাবু. ক্ষিতিমোহনবাবু বসিতেন দোহিত কুটিরের মধ্যে অথবা তাহার বক্ষিদের মাঠে। অনিলবাবুরা বসিতেন ছাতিমতলার পথে বেতবাড়ির বীথিতে। তাঁহারা বলিয়া থাকিতেন, ক্লাসের ঘণ্টা বাজিলে আমরা একজন অধ্যাপকের ক্লাশ হইতে উঠিয়া অন্যের কাছে যাইতাম।

প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত এই ভাবে ক্লাশ চলিত তারপর দুপুরের আগার, ভাত ডাল তরকারী ও নিরামিষ ঘোল বা চালতা। মাছ ছিলনা, কোন কোন দিন ডিম হইত। দুপুরে প্রায় পাতে ঘি

খাওয়া যাইত। নিজ নিজ থালা বাসন ধুইয়া ঘরে লইয়া আসিতে হইত।

আম্রকুঞ্জের দক্ষিণে ছিল শিশু বিভাগ। তাহারই পূর্বে কতকগুলি বাড়ী। উহার একটির বারান্দায় পিয়ার্সন সাহেব আমাদের ইংরাজী পড়াইতেন। পেটাভেল সাহেবও পরে ঐ বাড়ীটাতেই বাস করিতেন। উহার পূর্বের খোলার বাড়ীটায় গুরুদেব থাকিতেন। তাহার পেছনে ছিল হাসপাতালের বাড়ী।

দুপুরের খাওয়া হইয়া গেলে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম। তারপর আবার ক্লাশ বসিত। বিকালে ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে জলখাবার সুরু হইত।

ইহার পর আবার সারি বাঁধিয়া লাল কাঁকরে ঢাকা পথে দাঁড়াইতে হইত। সেখানে অধ্যক্ষগণ নিয়মভঙ্গকারীদের নাম প্রকাশ করিয়া দিয়া লজ্জিত করিতেন। তারপরই বিস্তীর্ণ খেলিবার মাঠে খেলা—

রাত্রে কুমার কেরোসিনের বড় আলোতে বসিয়া পড়িতে হইত। কখনো কখনো নেপালবাবু গল্প বলিতেন, কোনদিন বা নাটক হইত। প্রাতে বৈতালিক হইত। ধীরুবাবু গান শিখাইতেন, আর তালমান শিখাইতেন একজন বারাণসী ওস্তাদ।

পশ্চিমে পাওয়ার ঘর ও ছাতিমতলা, উত্তরে মন্দির, পূর্বে বোলপুরের রাস্তা, দক্ষিণে সতীশ ও মোহিত কুটীর—ইহাই ছিল আশ্রমের পূর্বাদির সীমা—তারপরই চতুর্দিকে ধূ ধূ করে মাঠ। কেবল মোহিত কুটীরের ওপারে মাঠ পার হইয়া দ্বিজেন ঠাকুরের বাড়ী, রাস্তার ওপারে সন্তোষ মজুমদারের বাড়ী, আর শ্রীনিকেতনের পথে সাওতাল পল্লী—পাঁচখানা বাড়ী মাত্র ছিল, পশ্চিমদিকের মাঠে ওস্তাদ হইত এবং সুরবরণ অবিলম্বে ওস্তাদ সাহেবকে ঘেরিত।

আলিপনা—মন্দিরের একাংশ

দ্বিজেন ঠাকুরের বাড়ীর দক্ষিণে খেতপাথরের দীঘি। উৎসব দিনে প্রাতে কত পদ্মই না আহরণ করিয়া আনিতাম।

বড়ই ইচ্ছা হইল এবার আবার সব একবার দেখিব। এমন সময় প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ—আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক পৌষ উৎসব সম্পর্কে আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। এই পৌষ সকালে বেলার গাড়ীতেই রওনা হইয়া গেলাম। ১৯২২ সালে একবার ও ১৯২৪ সালে আর একবার শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম। এবার আমার ২০ বৎসর পর যাত্রা।

বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া একটা সাইকেল রিকসা লইয়া আশ্রমে রওনা হইলাম। বোলপুর সহরের প্রান্তের গির্জাটি আর দেখিতে পাইলাম না। আর সহরের প্রান্তও তো দীর্ঘতর হইয়াছে দেখিতেছি। দ্বিজেন ঠাকুরের বাড়ী পর্যন্ত মাঠটির ডাহিনে বামে এখন বিস্তর বাড়ী হইয়াছে—তাক বাঙ্গলা, অধ্যাপক প্রভাতবাবুর একাধিক বাড়ী, ইলেকট্রিক কারখানা, একটি শিল্পকারখানা, তৈলের কল, বিশ্বভারতীর কতকগুলি কুটীর, আরো অনেক বাড়ী। দ্বিজেনবাবুর উদ্যান আর নাই, পল্লবীথিও নাই, সেখানে অনেকগুলি অধ্যাপকের গৃহ নির্মিত হইয়াছে। সন্তোষবাবুর বাড়ীর মাঠে বিস্তর বাড়ী উঠিয়াছে। খেলার মাঠটি ছোট হইয়া গিয়াছে। তাহার উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম ঘেরিয়া বিরাট বিরাট বাড়ী উঠিয়াছে। খেলার মাঠের আয়তন এখন ½ অংশ হইয়াছে। আর সব বাড়ী উঠিয়াছে—কতক কলভবনী, কতক বিশ্বভারতীর শিক্ষালয়। গ্রন্থাগারের আয়তনের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অধ্যাপকরা অধিকাংশই এখন সপরিবারে নিজ বা বিশ্বভারতীর গৃহে বাস করিতেছেন। মোহিতকুটীরের দক্ষিণের মাঠটিতে এখন বিস্তর বাড়ী হইয়া গুলপানী স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদের সেই বাল্যকালের আশ্রম ঘেঁটিয়া এই যে সব নূতন বাড়ী তৈরী হইয়াছে তাহার মালিক কতক বা বিশ্বভারতী, কতক তাহার অধ্যাপকগণ, কতক প্রাক্তনছাত্রগণ, কতক রবীন্দ্রভক্তগণ, কতক বা অবসরযাপনকামী বিত্তশালী ব্যক্তিগণ, কতক বা ব্যবসায়ী।

বিশ্বভারতীর নূতন বাড়ী দুই প্রকার। ছাত্র, ছাত্রী এবং অধ্যাপকদের বাসগৃহ এবং অধ্যাপনাগৃহ। অধ্যাপনাগৃহের মধ্যে রবীন্দ্রভবন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে আমার কোন কোন বিষয়ের আলোচনা ছিল। দুপুরে আশ্রমে পৌঁছিয়া আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে আমি তাঁহার নিকট এই রবীন্দ্রভবনে উপস্থিত হইলাম। রবীন্দ্রনাথের যুক্তসম বাসগৃহ উত্তরায়ণে এই রবীন্দ্রভবন এবং সেই বৌঠানীর অর্থেই তাঁহার পরবর্তী বাসস্থান 'কঙ্কালী' ও 'পুনশ্চ'। বিবিধ ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্য, জীবনী ও আলোচনামূলক পুস্তক, চিত্র ও অন্যপ্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া এই বাড়ীতে কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে এই রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ মহাশয় তাহা দেখাইলেন।

সন্ধ্যার পর বাহির হইলাম আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক নিরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সন্ধানে। সতীশকুটীর মোহিতকুটীরের মূলে যে উন্নত অট্টালিকা হইয়াছে তাহার একটীর নাম হইয়াছে 'সিংহসদন'। উহাতে সভাগৃহ বা বাটীশালায় দেখিলাম খেলাধূলার ও সেবিকাদের

উৎসব উপলক্ষে কাজের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। উহার পশ্চাতে একটি ছাত্রমুখের একাংশে নিরঞ্জনবাবুর সন্ধান পাইলাম। প্রাচীন কালের ও একালের কত কথাই আমাদের হইল। এখন বিশ্বভারতীর কর্মীদের ছেলে মেয়েরা এখানে পড়িতেছে। তাহাদের সংখ্যা আশ্রম-বাসী ছাত্রছাত্রীর তুল্য। খাবার ঘণ্টার আগের খাবার, স্নান ও উপাসনা আর পূর্বের মত হয় না। থালা মাজিতে হয় না, টেবিলে খাইতে হয়। ক্লাসের ব্যবস্থা পূর্ববৎ। খেলার ব্যবস্থাও তাই। তবে চারিদিকে বহু বসতি হওয়াতে মিরিবিলি আবহাওয়া কিছু কমিয়াছে। কিন্তু সঙ্গীত, ছবি আঁকা, হাতের কাজ প্রভৃতির প্রচুর আয়োজন হইয়াছে। তখন ছিল ম্যাট্রিক ট্রাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়া—এখন হইয়াছে বি, এ পর্যন্তপড়া। তারপর সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয় গবেষণার প্রচুর আয়োজন। সেই সালরীখি, সেই আম্রকুঞ্জ, সেই শান্তি-নিকেতনের বাড়ী, সেই কাচ-ঘরমন্দির, সেই ছাতিমতলা, সেই নীচু বাংলা সবই আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পুরাতন বাড়ী (এখনকার মাধবিকা) ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীর ফুলের বাগান নাই। হল ঘর ও দেবদারু বীথির মধ্যকার সঙ্গীতবাগানটিও অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু আসিয়াছে চীনা অধ্যাপক ও চীনা ছাত্র চীনভবনে পড়িতে; আসিয়াছে হিন্দী-ভবনে হিন্দী গবেষক। আরও নব নব নানা আয়োজন।

উপাধি সভায় মিঃ এণ্ড্রুজের বক্তৃতা

উপাধি দান

খরচা বাড়িয়াছে, আমাদের সময় ছাত্রদের মাসিক ২৫৲ টাকা এখন লাগে ৭০৲ হইতে ১০০৲ টাকা। সে দোষ বিশ্ব-ভারতীর নয়। সে দোষ এই দেশের ও কালের। কলিকাতায়ও এই খরচই হয় ছাত্রদের। তবে এখানে উন্মুক্ত আবাসগুলে শান্তিনিকেতন এই শান্তিনিকেতনে উৎকৃষ্টের খাদ্য ও নির্মলতর আবাসপরিবেশের মধ্যে হৃদয়মনসেই গড়িয়া উঠিবার অবসর পায়। কলিকাতায় সম্ভব কেবল জীর্ণতা ও বন্ধ।

পরদিন ৯ই পৌষ সকাল হইতে আকাশে ঘোরণ মেঘ জমিয়া যেল। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন স্থাপন উৎসব। পাছে তাহা বৃষ্টিতে ব্যাহত হয়, এজন্য সকলের মন বড়ই শঙ্কিত। আমি পরিচিত প্রাক্তন ছাত্রদের সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলাম। দেখা

পাইলাম তপনদা, মুকুলদা ও ঈটেনদা'র। সকলে মিলিয়া প্রফুল্লদা ও প্রদ্যোতদার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। পরে বীরেনদা ও কালিপদ রায় আসিলেন; সাগরময় ঘোষ ও পুলিন সেনের সঙ্গেও দেখা হইল। আরও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অনেক আসিয়াছেন। অনেকদিন আমাদের পরবর্তী কালের বলিয়া বোধ হইল। বিভূতিদাকে দেখিলাম, বিদ্যালয় বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। বিশ্বভারতী সৃষ্টির আগেকার ছাত্র ও পরবর্তীকালের ছাত্রদের মধ্যে এই প্রভেদ দেখা গেল যে পূর্বকালের ছাত্রদের মনে তাঁহাদের কাল সম্বন্ধে অধিকতর স্নেহ ও শ্রদ্ধা; কিন্তু পরবর্তীদের আগের দুঃখ অভিমান; তাহাদের মনে জোর দুঃখই নাই। আশ্রমের মধ্য দিয়া সাইকেল রিক্স চলিয়া যাইতেছে, পূর্বদিন আজ্ঞাদিন সূর্যোদয় আশ্রম হইতে আর দেখিবার উপায় নাই, সকল দিকেই ঘর বাড়ী একসঙ্গে বসিয়াছে, সবুজ

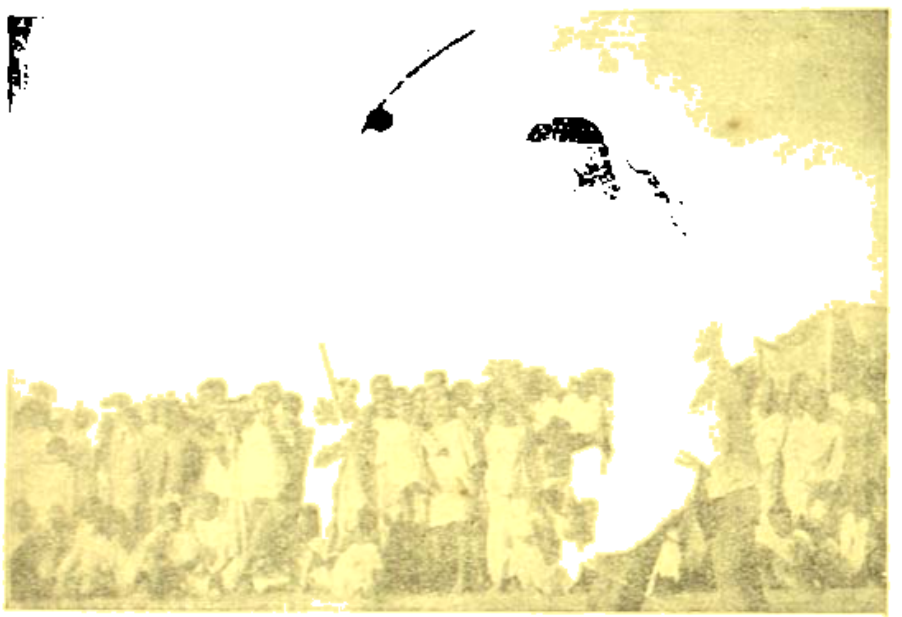

দেশোদ্ধারের দাঁড়াটানের তীব্র প্রতিযোগিতা

খেলাধূলা আমার কালে এত পরিবারভুক্ত হয় না এবং নিয়ম পালন বিষয়ে আর পূর্ববৎ কড়াকড়ি নাই, বহিরাগত দর্শকের দ্বারা ছাত্রছাত্রীর ক্লাস অল্পমাত্রায় ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সঙ্গীত ও কলার অনুশীলনে অল্প পড়ার গতি ও মনোযোগ বাড়িয়া চলিতেছে এবং বহু সংখ্যক ছাত্রীর বসবাসে মন্দিরের পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিকালে গরুর গাড়ি চড়িয়া—আমাদের কালের সবুজ বন এখন শ্রীনিকেতন হইয়াছে—বন আর নাই। শিল্প-কার্যের জন্য ও কর্মীদের জন্য বহু বাড়ী উঠিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি অবসর সময় এখানেই থাকেন। গ্রাম উন্নয়ন কার্যের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারক ঘর মহাশয় পল্লীর অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। শান্তি-নিকেতন হইতে শ্রীনিকেতন পল্লী মাত্র ১৷৷০ মাইল। এ পল্লীর ছাত্র ছাত্রীদের লইয়া বিশ্বভারতীর বটার বাস ৭টায় আশ্রমে পৌঁছায়, ১১৷ টায় আহারার্থ ফিরাইয়া আনে। এবং আবার ১টায় আশ্রমে দিয়া যায়।

বোলপুর সহরের সঙ্গেও বিশ্বভারতীর এই যোগ হইয়াছে। সেখান হইতে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বভারতীতে কলেজের ক্লাসে আসিয়া পড়ে, কোন বাধা নাই। এই ভাবে আর ইহা এখন পূর্বের শিক্ষায়তন নাই—পূর্বে একস্থানে একত্র বাস করিয়া ছাত্ররা এক পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িত। সেই এক পরিবারের লোক এক বিদ্যালয়ে পড়িত। এখন বিভিন্ন পরিবারের লোক এক স্থানে বসিয়া পড়িতেছে।

আমার প্রাচীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহারা আর ক্লাস পড়ান না এখন। ক্ষিতিবাবু বিদ্যাভবনে বসিয়া গবেষণা করিতেছেন এবং প্রভাতবাবু গ্রন্থাগারের অবসরে সেখানে আসেন বটে কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীতে প্রায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত রহেন। বধূমাতার সঙ্গেও দেখা করিলাম (শান্তি-নিকেতনে যে কয়জন পুরাতন গৃহ নির্মাণ করিয়াছে তাহার প্রথমে হাতে প্রভাতবাবু। তিনি আমে-রিকার কৃষি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী মিঃ বি, এম, সেন ইহাকে কাজে প্রথমে কাজ করেন)। শান্তি-নিকেতনের পুরাতন ছাত্রদের বিভিন্ন সমিতির পৃথক প্রকাশ কক্ষ ইতিমধ্যে কার্যালয় সংলগ্ন সভার প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন বলিবেন।

কাল উৎসব সুরু হইবে। আজ রাত্রি ৯টায় একটি রবীন্দ্রনাথের আরাধনা সঙ্গীত গাহিয়া আশ্রম পরিভ্রমণ করিয়া তাহা উদ্বাপিত হইল।

পরদিন ৭ই পৌষ প্রাতে ৬টায় "আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে যাও ধুয়ে" গাহিয়া উৎসব সুরু হইল। সেই গান যখন সমস্ত আশ্রমে গীত হইল তখন আকাশের ঘন মেঘ ও গুঁড়িবৃষ্টি যেন দূরিয়া যাইতে লাগিল। ৭টায় ক্ষিতিবাবু মন্দিরে উপাসনা করিলেন। সকলের সকলের কপালে চন্দন তিলক মন্দিরের প্রবেশ পথে পরাইয়া দেওয়া হইল এবং উপাসনায় ও সঙ্গীতে মন্দির একটি শান্তরসাস্পদ আনন্দ-লোকে পরিণত হইল। উপাসনান্তে আমরা প্রাক্তনছাত্রগণ অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া "কত তার রামধনু রঙ্গিন মেঘে মেঘে গ্রাণ" গাহিয়া বহুদূর দেবেন্দ্রনাথের সাধনস্থল ছাতিমতলে চলিয়া গেলাম এবং

সেখানে বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিয়া উটীজ বেখিলাম প্রস্তর ফলকে আগের মতই লিখিত আছে—

তিনি আমার
প্রাণের আরাম
মনের আনন্দ
আমার শান্তি

(বেদীটি সংস্কৃত হইয়াছে)

আকাশের মেঘ কাটিয়া তখন সূর্য্যালোকে শান্তিনিকেতন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তীদের লোক রঙ্গনাথ যে মেলা হয় তাহা তখন বসিয়া গিয়াছে। চা, পান, তাজা, মিষ্টি, খেলনা ও মনোহারী জিনিষ এবং কাপড়ের দোকান। দুপুর ১টায় সেখানে কর্ণ-অর্জ্জুনের বিষয় স্থানীয় কবির লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল। সেখান হইতে উঠিয়া ২টায় আম্রকুঞ্জে আশ্রমিক সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিলাম। সেখানে প্রাক্তন ছাত্র হাইকোর্টের জজ সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় সভাপতিত্ব করিলেন এবং অপর প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ প্রবোধ বাকচী মহাশয় বক্তৃতা দিলেন বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। প্রাক্তন ছাত্রদের বিধবাশ্রম জন্য রথীন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব করিলেন তাহা পাশ হইয়া গেল এবং 'প্রান্তনী' নামে প্রাক্তন ছাত্রদের যে গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই সংলগ্ন আরও গৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে স্থির হইল। প্রায় ১৫০ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেখিলাম পুরাতন ছাত্রছাত্রীদের শান্তিনিকেতনের প্রতি কত মমতা। জামাতাসহ এখানে বাড়ী করিয়াছেন, তিনিও সভায় উপস্থিত হইলেন। হীরেনদা, সুহৃদদা, অমিতা বেদী, বীরেন সেন প্রভৃতিও এখানে বাড়ী করিয়াছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত দ্বারা প্রার্থনা হইল এবং 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গাহিয়া অনুষ্ঠান শেষ হইল। বার্ষিক ব্যয় পরচ ও রিপোর্ট দেখিয়া আমাদের মনে হইল যে ভারতবর্ষের আর কোন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণ এত সংঘবদ্ধ নহেন।

রাত্রে মেলার মাঠে বাজী পোড়ান হইল এবং তারপরই রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ছায়াচিত্রে দেখান হইল। স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, নির্ধন, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই দেখিলাম মাঠে বসিয়া সে ছবি দেখিতেছেন।

পরদিন ৮ই পৌষ আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী পরিষদের সভা হইল। প্রায় ৩০০০ লোক ইহাতে বসিয়াছিলেন। উচু বেদীর উপর চন্দ্রাতপতলে বসিয়াছিলেন সভানেত্রী শ্রীযুতা সরোজিনী দেবী, গভর্ণর রাজাগোপালাচারি মিঃ হোমস, ক্ষিতিবাবু ও রথীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ বার্ষিক রিপোর্ট পড়িলেন, ক্ষিতিবাবু মঙ্গলাচরণ করিলেন এবং মিঃ হোমস, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়া ও শ্রীযুতা সরোজিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও কর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সেই আলোকে মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও বিশ্বশান্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। বিশ্বভারতীর ছাত্র ছাত্রীরা একে একে আসিয়া সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত ও গ্রাম উন্নয়ন বিষয় উপাধি লইলেন—সভানেত্রী হাতে তুলিয়া দিলেন এক একটি 'ডিপ্লম পত্র' আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রধান অধ্যাপকগণ অনিল চন্দ, নন্দলাল বসু, শৈলজা চক্রবর্ত্তী ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় দিলেন লিখিত মানপত্র। 'শান্তিনিকেতন' গান দিয়া সভা শুরু হইল। তারপর বিশ্বভারতীর সঙ্গীতের সভা সুরু হইল ওপাশে বসিয়াই।

কিন্তু এই যে এত লোক আসিয়া এইখানে সমবেত হইয়াছেন ইহারা কাহারা? বিশ্বভারতীর ছাত্র ছাত্রী কর্ম্মী ও তাহাদের পরিবার পরিজন অনেক আছেন। প্রাক্তন ছাত্র আসিয়াছেন অনেক। বোলপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীও আসিয়াছেন অনেক। বিশ্বভারতীর সমর্থক ও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণও কিছু আসিয়াছেন। সাংবাদিক ফটোগ্রাফারের সংখ্যাও প্রায় ৭।৮জন হইবে। আর শত শত লোক দেখিলাম একবেলা আসিয়া ও বেলা চলিয়া যাইতেছেন। ইহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইয়া আমেরিকান ট্যুরিষ্টরা যেমন তাজ সম্বন্ধে বিস্ময় হন সেইরূপ শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবেন। উৎসবের করদিনই বিশ্বভারতীর দ্বার বন্ধ থাকে।

মেলা স্থলে দুইচারি কিছু কিছু বৃক্ষ দেখিয়াছি। উহার কতখানি এই আশ্রমকন্যের আমলের এবং শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদের সঙ্গেই বা ইহার কতখানি যোগ, তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি না। সমস্ত দেশই যান্ত্রিক সভ্যতার লোহার জিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, সেই উচ্ছৃঙ্খলার ঢেউ যুক্তিও স্পর্শ করিবে—শান্তিনিকেতন কোন ছার। এই বহুর হইতে বেলকে রক্ষা করিতে হইবে, তবেই শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করা যাইবে। বহুরা টাকা শান্তিনিকেতনকে কিনিতে পারিবে না, টাকায় শান্তিনিকেতন হয় নাই। শান্তিনিকেতনে চাই এমন নৈতিক চরিত্রের অধিষ্ঠান ও প্রভাব যাহাতে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা আশ্রয় না পায় ও জন্মিতে না পারে।

৭ই পৌষ প্রত্যুষে উঠিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম সমস্ত আশ্রম ও বিদ্যালয় ঝাঁট দিয়া ঝকঝকে করিয়া রাখিয়াছে। মন্দিরে উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। বৈতরণী করিয়া সাধক। আম্র বেদীতে বসিয়া গুরুদেবের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আকাঙ্ক্ষা। পৌষোৎসব যে সময়ে ও যাহার আমলে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা কালে কালে দীনদানে পরিণত হইল। শঙ্করাচার্যের চেয়েও তাহা দূরে গেল।

রবীন্দ্রনাথ মহামানবতার সাধক। মানব সভ্যতা রক্ষার উহাই একমাত্র পথ। সে পথ সমস্ত মানবজাতির। যদি মানবজাতি সেই অনুশাসনকালে উহা কণ্টকিত করিয়া কলুষ করিয়া তোলে তবে সে দুর্ভাগ্য মানবজাতিরই।.....শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধনার আসন পাতিয়াছিলেন। তাহা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই।

৯ই পৌষ প্রাতে প্রাচীনতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরলোকগত আশ্রম বন্ধুদের শ্রাদ্ধ সভা হইল। আশ্রমবাসীরা সকলেই একপরিবারভুক্ত, সুতরাং পরলোকগতদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান আমাদের কর্ত্তব্য, এই কথা বলিয়া হরিচরণবাবু পরলোকগতদের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধেয়া জ্ঞাপন করিলেন। প্রার্থনা সঙ্গীত দ্বারা সভা শুরু হইল।

পুরাতন ও নূতন বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া আসিলাম।

আমার বাল্যকাল যেখানে কাটিয়াছিল, যে রবীন্দ্র বিদ্যালয়ের কঠোর শিক্ষা ব্যবস্থার স্পর্শ পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, যাহার ক্রমপরিণতি এবার আসিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম বে তাহা আমার মনে গভীর রেখাপাত করিল। তাহার সঙ্গীত আমাকে আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু যুগপরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কতক কালধর্ম, যুগধর্ম বলিয়া মানিয়া লইলাম। কিন্তু এই ক্রমপরিণতির সূত্র ধরিয়া আরো কি ঘটিবে জানি না। যদি আর অনেকদিন না যাই, যদি ২০ বৎসর বাঁচিয়া থাকি এবং তারপর যাই তখন কি আমি আমার সেই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে তাহার প্রাণকে চিনিতে পারিব? যেন চিনিতে পারি, এখানের মতই যেন তাহাকে প্রণাম করিতে পারি আমার তাপসিবিধাতা যেন তাহাই করেন

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যম্।

৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৮

শ্রীমতী লীলা মজুমদার এম্-এ

পৃথিবীর মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে আমি আজ দিলীপকুমারকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে যা জানে আমরা স্বভাবতঃ বাকাতীরু এবং প্রশংসাবাদে বীতরাগিণী। মুখের উপর প্রশংসাতে আমরা অভ্যস্তুক ত' বটেই; পারত পক্ষে অসাক্ষাতে প্রশংসা পর্যন্ত এড়িয়ে চলতে চেষ্টা ক'রে থাকি।

কিন্তু আজ আমাদের স্বভাবতের কোনও মূল্য নেই। কারণ আজকে আমাদের আপত্তি থাকলেও সকলেই দিলীপকুমারের প্রশংসা করবেই এবং আজ আমরাও অকপটচিত্তে স্বীকার করছি যে, যদিও আজীবন অধিবাসির ক্ষেত্রে দিলীপকুমার পরোক্ষভাবে জগতের সমগ্র নারী সম্প্রদায়কে অন্ততঃ প্রভাবিত করেছেন, তবুও অল্পকাল সান্নিধ্যে প'ড়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের ভালো জেনেছেন, সেই জন্য তাঁর কাছে আমরা ঋণী আছি।

মেয়েদের প্রশংসা যে পক্ষপাতদুষ্ট হয়, এ কথা নিঃসন্দেহ। কেন এতজনের কণ্ঠস্বর মধুময়, দৃষ্টিজাল নির্ভুল, হৃদয়বোধ অভিসন্ধানী, সেবনী পাণ্ডিত্যপূর্ণ, লাবণ্যশক্তি অপরাজেয় হবে, আর বাকী এক লক্ষ জনের হবে না। এ প্রশ্নকে যুক্তি দিয়ে সরিয়ে করা যায় না। কেন এতজনের সৌম্য সুদর্শন কান্তি হবে, শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতি হবে, আর পাঁচজনের হবে না, তাই বা কে জানে। ব্যক্তিগতভাবে দিলীপকুমারকে এ সকলের ভক্ত প্রশংসা করা যায় সঙ্গত কি না, তা নিয়ে পর্যন্ত প্রশ্ন উঠতে পারে।

কিন্তু আমরা, পৃথিবীর নারীরা, ঔচিত্যের কি বা ধার ধারি? সংসার আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। আমাদের জীবন কেটে যায় হাঁড়িবাড়া ছেলে-মানুষে, আর ঘরকন্নার শত শত কামেলা নিয়ে—দেখতে দেখতে আমরা আবছায়ী হ'য়ে যাই। নিজের কানের কাছে কানের দুধের চাকার ধ্বনি শুনতে পাই। ভেবে আকুল হই, সব বুঝি ফাঁকি ছিল।

ঠিক সেই সময়ে দিলীপকুমার পণ্ডিচেরী থেকে এসে দাঁড়ান করেন। তখনি আমরা আমাদের প্রতি সংসারের সমস্ত অমার্জনীয় অপরাধ, সংসারের প্রতি দিলীপকুমারের সমস্ত অবহেলা এবং দিলীপকুমারের প্রতি দেবতাদের অহেতুক কৃপাবৃষ্টি সমস্ত ক্ষমা ক'রে ফেলি।

কারণ আমাদের ঘরে তিনি একা আসেন না, সঙ্গে নিয়ে আসেন দলে দলে শত শত লাবণ্যময়, যাঁদের নাম করলেও নাকি পুণ্য হয়। কোথায় ছিল কমলাকান্ত, ওঁকে এনে আমাদের বাড়ীতে বসতে দেন। মীরাকে তিনি আমাদের দয়া দেখাবার জন্যে এনে দেন। আর কোথায় ছিল যমুনা নদীর তীরে কে আমি বাঁশি বাজিয়ে পৃথিবীর দুঃখ-ব্যথা দূর ক'রে দিয়েছিল, জোর ক'রে তার কথা আমাদের জানিয়ে দেন। নইলে কী ক'রে আমরা দিনের পর দিন ঘরকন্নার হিসাব আর বাজারের ফর্দিতা আর সংসারের অনন্ত চাহিদা মেটাই?

দিলীপকুমারের প্রতিভার বিচার করবার আমরা কে? যা ছিল আমাদের নাগালের বাইরে, তাকে তিনি আমাদের হাতের মধ্যে এনে দেন। মাটির সঙ্গে বাঁধা থাকি, কেবল কেটে দেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কোনও দিনও যাঁকে লাভ করা যায় না, তাঁর সন্ধান ব'লে দেন।

যুগে যুগে পৃথিবীতে কত কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, লিখিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে, অভিনেতার চাবিকাঠি হাতে নিয়ে এসেছেন। কা'কে কতখানি মূল্য দেব, আমরা তার কিবা খবর রাখি?

মেক্সিকোর পণ্ডিত-সভা থেকে চিঠি এসেছে যে, দুনিয়ায় একশ'জন সেরা গুণীর মধ্যে দিলীপকুমার একজন। মেক্সো গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠছে। দিলীপকুমার ত' উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু অসীম প্রতিভাশালী পিতার পুত্র, ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া অশেষ শক্তির উত্তরাধিকারী, পুরুষমানুষরা তাঁর যোগতত্ত্বের সমালোচনা করবেন—আজকের দিনে অতিরিক্ত যোগক্রটীর কথা উত্থাপন করাও অশোভন হবে,—কিন্তু আমরা নারীরা দিলীপকুমারের প্রতি আমাদের অপরিমেয় ঋণ স্বীকার করব এবং প্রণতচিত্তে চিরকাল ঋণীই থেকে যাব। ●

● আই-সি-এস প্রেক্ষাগারে দিলীপকুমারের একান্নতম জন্মবাসরে প্রীতির ভাষণ।

'ভারতবর্ষে' গান্ধী-কথা—

আজ মহাত্মা গান্ধীর কথা ভারতের সর্ব্বত্র ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু যে সময়ে তাঁহাকে কেহ জানিত না, সে সময়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১ম বর্ষের ২য় খণ্ডে, ২য় সংখ্যায় (মাঘ, ১৩২০) 'দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসী' শীর্ষক প্রবন্ধে গান্ধীজির জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। সে প্রবন্ধের লেখক ছিলেন—শ্রীসুধীচন্দ্র সরকার ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। উভয়েই এখন সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। প্রবন্ধটি ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী—তাহাতে একখানি চিত্রও ছিল। তাহা হইতে আমরা নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

"১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কারাগারে গমন করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানটি কঠিন পীড়ায় মৃতপ্রায়। তাহাকে দেখিতে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবাসীকে সেবা করাই তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক—ঈশ্বরের হস্তে তাঁহার মৃতপ্রায় সন্তানটিকে দান করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তারপর দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হইবার সময় সংবাদ আসিল—তাঁহার পত্নী অত্যন্ত পীড়িত। এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেট গান্ধীকে সামান্য জরিমানা দিয়া পীড়িত পত্নীর সহিত মিলিত হইতে বলিলেন—কিন্তু অসংখ্য ভারতবাসী যখন অকাতরে জেলে যাইতেছে, তখন কি করিয়া তিনি

বারাসতে বাপুজীর চিত্রাঙ্কনরত শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী ... হাতে—অরিন্দমকুমার মুখোপাধ্যায়

গৃহে ফিরিয়া আসেন? তাই তিনি স্বেচ্ছায় কারাগারে গেলেন। তাঁহার ১৭ বৎসর বয়সের বালকটি যাহাতে দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়া মানুষ হইতে পারে, এ আশায় তিনি তাহাকে এই নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ ব্যাপারে যোগদান করাইয়াছেন। তাহার পর এই নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ মন্ত্রে ভারতবাসীগণকে দীক্ষিত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—Remember that we are descendants of

আমার জীবনই আমার বাণী — মো. ক. গান্ধী

Prahlad and Sudhanva, both passive resisters of the purest type. They suffered extreme torture, neither of them inflicted suffering on their persecutors."

ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা আর কোন সাময়িক পত্রে এতটা বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর পরে আমরা লেখকদ্বয়কে অভিনন্দিত করিতেছি এবং

ঘাটাকপুরে ভূমিষ্ঠ হইবার পর রাজাগোপালাচারী কর্ত্তৃক ভবানীর গ্রহণ ফটো—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

'ভারতবর্ষ' যে সে সময়েও স্বাধীনতার আন্দোলনে সাহায্য করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া গৌরববোধ করিতেছি।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সুচিন্তিত ব্যবস্থা—

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগে তিনটি পদ সম্বন্ধে হৃদয় করিতেছেন—(১) এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেল ও অফিসিয়াল ট্রাষ্টী (২) অফিসিয়াল রিসিভার ও (৩) অফিসিয়াল এসাইনী। সম্প্রতি ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেল ও অফিসিয়াল ট্রাষ্টী পদে এবং ব্যারিষ্টার মিঃ আজিজুল হক অফিসিয়াল রিসিভার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বাধীন বাঙ্গালায় ঐ সকল বিভাগের কার্য্য দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া জনহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে ঐ গুলি পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

মহাত্মাজীর আদেশমতে ঘাটাকপুরে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ—কোরাণ পাঠ ফটো—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

ম্যালেরিয়া নিবারণ ব্যবস্থা—

গত ২৫শে জানুয়ারী মেম্বর জেনারেল অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সেণ্ট্রাল কোঅপারেটিভ এণ্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটীর অষ্টাবিংশ বার্ষিক সাধারণ উৎসব হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ১৯১৮ সালে পানিহাটী ও সুখচর কেন্দ্র করিয়া যে ম্যালেরিয়া নিবারণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, আজিও তাহা সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখনও ডাক্তার গোপালচন্দ্রের নেতৃত্বে একদল কর্ম্মী এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের মহত্পকার সাধন করিতেছেন। সোসাইটীর গ্রাম্য কেন্দ্রের সংখ্যা ২৫৬—তাহা বাঙ্গালার ৫টি বিভাগের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। বাঙ্গালা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য এই দেশহিতকারী প্রতিষ্ঠান এতদিন ধরিয়া যে কার্য্য করিয়া

আসিতেছেন, বর্ত্তমান স্বাধীন দেশে পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের সেই অসমাপ্ত কার্য্যভার গ্রহণ করা উচিত।

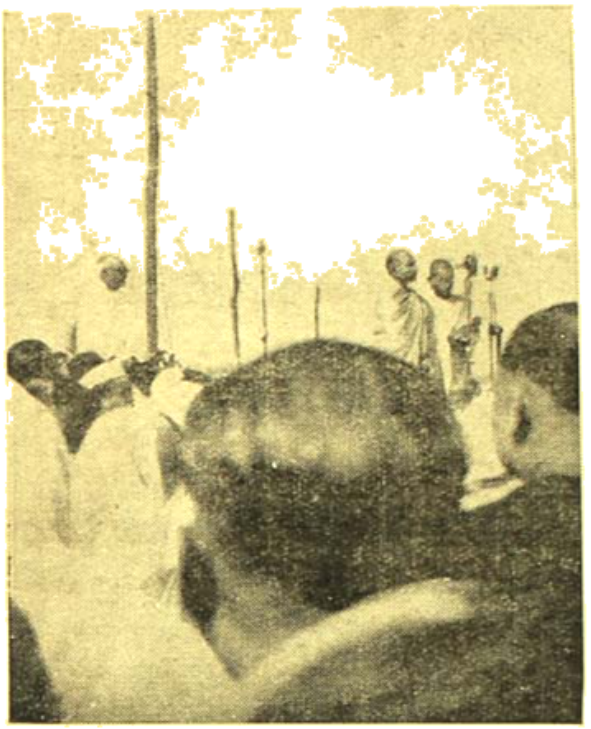

বারাকপুর গান্ধী ঘাটে কীর্ত্তনানুষ্ঠান ফটো—অমিতকুমার মুখোপাধ্যায়

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার—

কলিকাতা ৬৫-২বি বাডন ষ্ট্রীটস্থ দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার নামক প্রতিষ্ঠানটি গত ১৯২২ সাল হইতে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের নানাভাবে সেবা করিতেছেন। ভাণ্ডারের সেবা বিভাগ হইতে দুগ্ধ বিতরণ, আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দান প্রভৃতি করা হয়। চিকিৎসা বিভাগ (১) চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয় (২) কিরণশশী সেবায়তন ও(৩) গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতাল পরিচালনা করেন। কিরণশশী সেবায়তনের ১০৪।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে বিজস্ব ত্রিতল গৃহ আছে—তাহার পার্শ্বে জমী সংগ্রহ করিয়া আর একটি গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। তথায় বন্ধ্যা চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভাণ্ডারের শিক্ষা বিভাগ সুচিবানন্দ গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন—ছাত্রাবাসে কয়েকটি ছাত্রকে বিনা ব্যয়ে আহার, বাসস্থান প্রভৃতি প্রদান করা হয়। ভাণ্ডারের সব বিভাগ লইয়া ১৯৩৪ সালে আয় হইয়াছিল—৮২৪৩৬ টাকা ও ব্যয় হইয়াছে ৬৪২৯৯ টাকা। ১৯৩৬ সালে আয় হইয়াছে ৪৬৫১১ টাকা ও ব্যয় হইয়াছে ৪৩৭৪১ টাকা। তাহা ছাড়া গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ৬৪৭৩৪ টাকা জমা আছে। কলিকাতার বর্ত্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী ভাণ্ডারের পরিচালক কমিটীর সম্পাদকরূপে ভাণ্ডারের প্রসার ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সৈন্যবাহিনী ভারতীয়করণ—

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের পরিচালনাধীন হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সৈন্যদল পরিচালনা করিবেন। প্রধান সেনাপতি লেফ্টেনাণ্ট জেনারেল কারিয়াপ্পা, সেনাপতি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ—মেজর জেনারেল কুলবন্ত সিং, কোয়েটার মাষ্টার

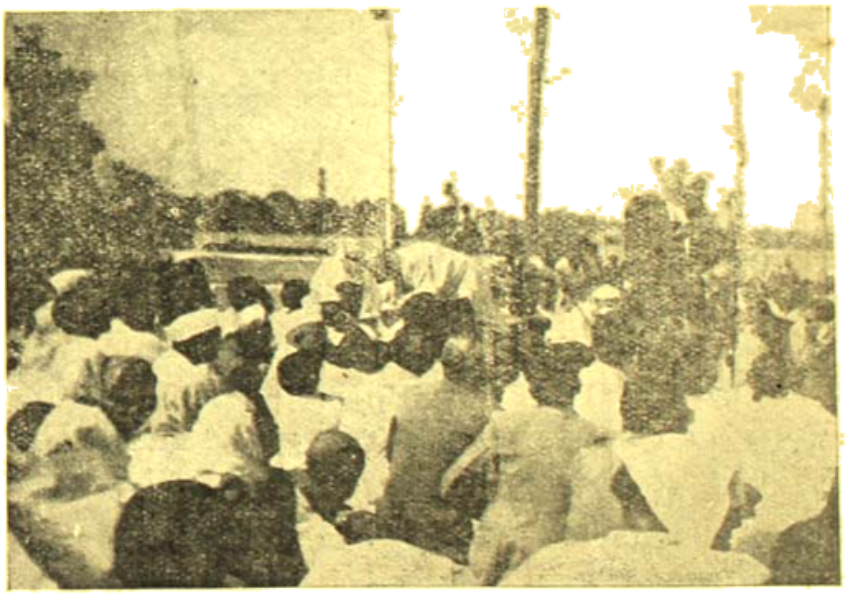

বারাকপুর গান্ধী ঘাটে বাইবেল পাঠ ফটো—অমিতকুমার মুখোপাধ্যায়

জেনারেল—মেজর জেনারেল চিমনী, মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর জেনারেল থাপার, এডজুটাণ্ট জেনারেল—মেজর

জেনারেল শ্রীনাগেশ, দিল্লী ও পূর্বপাঞ্জাব কমাণ্ডের সেনাপতি—মেজর জেনারেল বিশারা, কাশ্মীর জম্মু সেনা-বাহিনীর সেনাপতি—মেজর জেনারেল চৌধুরী। কয়েকজন বৃটিশ সিনিয়র অফিসার পরামর্শদাতারূপে কাজ করিবেন।

গঙ্গাবক্ষে মহাত্মাজীর অস্থি নিমজ্জন

ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পরলোকে ডাক্তার মুঞ্জে—

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও নাসিকস্থ শিবাজী ভোঁসলে সামরিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার বি-এস-মুঞ্জে গত ১৯শে ফাল্গুন রাত্রিতে ৭৬ বৎসর বয়সে নাসিকে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিলাসপুরে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯৮ সালে চিকিৎসক হইয়া কাজ আরম্ভ করেন। প্রথম জীবনেই তিনি লোকমান্য তিলকের অধীনে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি বহু বৎসর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন ও আজীবন দেশহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রথম দেশপ্রেমিক সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বহুবার তিনি বাঙ্গালা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও ১৯৪৪ সালে জলপাইগুড়ীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি পাটনায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসম্মিলনেও সভাপতি হইয়াছিলেন। যে সকল নিষ্ঠাবান দেশকর্ম্মীর চেষ্টায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ডাক্তার মুঞ্জে তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

ত্রিবেণী সঙ্গম অভিমুখে শবযাত্রা—সঙ্গে লোকারণ্য পণ্ডিতজী

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়—

গত ২০শে ফাল্গুন শুক্রবার খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় পশ্চিম বঙ্গে অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া পশ্চিম বঙ্গের মোট মন্ত্রীর সংখ্যা হইল ১৩জন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে যোগদান করিয়া পাকিস্থান গণ-পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা হইয়াছিলেন। সহসা তিনি সে কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া এখানে মন্ত্রী হওয়ায় জনসাধারণ বিস্মিত হইয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে ও তাঁহারা নিজেদের নিঃসহায় ভাবিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিবেন। পশ্চিম বাঙ্গালা প্রদেশ আয়তনে অতি ক্ষুদ্র—কাজেই এখানে ১২র পর নূতন মন্ত্রীরও প্রয়োজন ছিল না। কিরণবাবু

বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু কখনও তাঁহার বুদ্ধি কোন শুভ কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। কাজেই এই নিয়োগে দেশবাসীর মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষই দেখা যাইতেছে। তথাপি আমরা আশা করি, নূতন মন্ত্রী তাঁহার অসাধারণ কার্য্যের দ্বারা যেন লোকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে সমর্থ হন।

রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইন্‌স্টিটিউট—

কর্ণেল ডি-এন-ভাদুড়ী তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর স্মৃতি-রক্ষা কল্পে কলিকাতা বালীগঞ্জে ১১১ রসা রোডস্থ বাড়ীটি রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইনিষ্টিটিউটকে দান করিয়াছেন। গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী ইনিষ্টিটিউটের নূতন

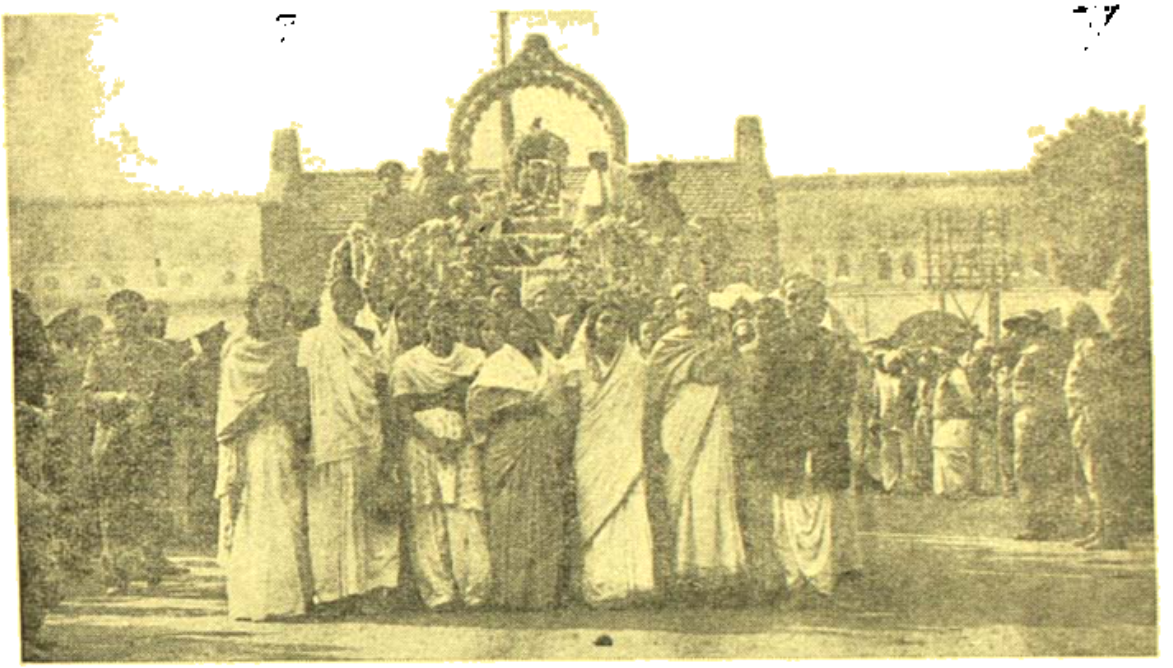

এলাহাবাদ গঙ্গা অভিমুখে ভস্মাধারসহ শোকযাত্রা—সম্মুখে সুচেতা কৃপালনী, অরুণা আসফ আলী প্রভৃতি

আসামে নূতন মন্ত্রী—

আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মৌলানা মহম্মদ তায়েবুল্লা গত ৫ই মার্চ্চ আসামের অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া মোট ৮ জন মন্ত্রী হইল। তিনি আজীবন কংগ্রেসের সেবক।

কাশ্মীরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—

৫ই মার্চ্চ কাশ্মীর ও জম্মুর মহারাজা ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি ১লা মার্চ্চ হইতে শেখ মহম্মদ আবদুল্লাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন ও নূতন মন্ত্রীসভার হাতে শাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন। মহারাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত দেওয়ানও অন্যতম মন্ত্রী হইয়াছেন। স্বাভাবিক অবস্থা ফেরার পর প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নূতন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু মহারাজার নূতন ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছেন।

গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে তথায় এক উৎসব হইয়াছিল। ইনিষ্টিটিউট হইতে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাত খণ্ডে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি উৎসবে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পরলোকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ—

শনিবার ১৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭-২০ মিনিটের সময় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাটিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। ১২৭৩ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ তিনি ঢাকা জেলার পারলোয়ার পরগণার গুতাঢ্য গ্রামে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তাঁহার অগ্রজ জগৎচন্দ্র শিরোমণির একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। দুর্গাচরণ অগ্রজের নিকট ব্যাকরণ পড়িয়া গ্রামস্থ পণ্ডিত রামমোহন সার্বভৌমের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পরে বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নিকট সাংখ্য ও বেদান্ত পাঠ করেন। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তের বিভিন্ন উপাধি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে স্যর যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র কলিকাতায় যে ভাগবত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন তিনি তাহার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মধুসূদন সরস্বতীর "ভক্তি রসায়ন" গ্রন্থ তিনি টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন। বেদান্ত দর্শনের দুরূহ তত্ত্ব সকল তিনি যেরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন আর কেহ সেরূপ পারেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতাও অসাধারণ ছিল। ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ এবং বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘের সভাপতি ছিলেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সহকারী সভাপতি ছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয় (Bengal National

তন্মধ্যে বামে পণ্ডিত জহরলাল ও রবি আহরণ কিরণরাই —সঙ্গে সরোজিনী নাইডু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, আভা গান্ধী প্রভৃতি—এলাহাবাদ

১৯২৯ সালে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। তিনি ২বার শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বেদান্ত ফেলোশিপ বক্তৃতা প্রদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত হন। উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সম্পাদিত প্রধান উপনিষদগুলি বাঙ্গলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ; ব্রহ্মসূত্রের রামানুজ ভাষ্য (শ্রীভাষ্য) তিনিই প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হয়। Council of Education) এর প্রারম্ভ হইতে তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য যেরূপ বিশাল ছিল, তাঁহার নিরহঙ্কার ও অমায়িক ব্যবহারও সেইরূপ হৃদয়স্পর্শী ছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার খ্যাতি সমগ্র ভারত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সুধীসমাজে বক্তৃতা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালে কলিকাতায় এক জনসভায় তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া ২০০০৲ উপহার প্রদান করা হয়। বিচারপতি

শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় সেই অভিনন্দন পাঠ করেন। পাশ্চাত্য সংস্কার দ্বারা বিজ্ঞ না হইয়া হিন্দু দর্শনের নির্মল ধারা যে সকল পণ্ডিতদের মধ্য দিয়া এখনও প্রবাহিত হইতেছে তিনি তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যে বিজাতীয় ভাবধারা বর্তমান ভারতকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে তিনি তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রতিভা লইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধান বর্তমান সময়ে হিন্দু সংস্কৃতির পক্ষে অসাধারণ ক্ষতির বিষয় সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত্যুর তিনদিন পরে তাঁহার পত্নী পরলোকগমন করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর সময় তাঁহার পত্নীর কোনও অসুখ ছিল না। তাঁহার পত্নীর রোগ নির্ণয় হয় নাই।

আন্দামানে পোর্ট ব্লেয়ারের শোক—

আন্দামান দ্বীপস্থ পোর্ট ব্লেয়ার হইতে শ্রীঅরুণেন্দু সেনগুপ্ত জানাইয়াছেন—৩০শে জানুয়ারী মহাত্মাজীর শোক সংবাদ পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছিলে চীফ কমিশনার পরদিন সকল অফিস আদালত বন্ধ করিয়াছিলেন ও ৩১শে জানুয়ারী বিকাল ৪টায় জিমখানা ময়দানে এক জনসভায় মিঃ জে-এস-মাথুর গীতা পাঠ ও প্রার্থনা করেন। চীফ কমিশনার মিঃ আই-মজিদ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় ইতিহাসের আশুতোষ-

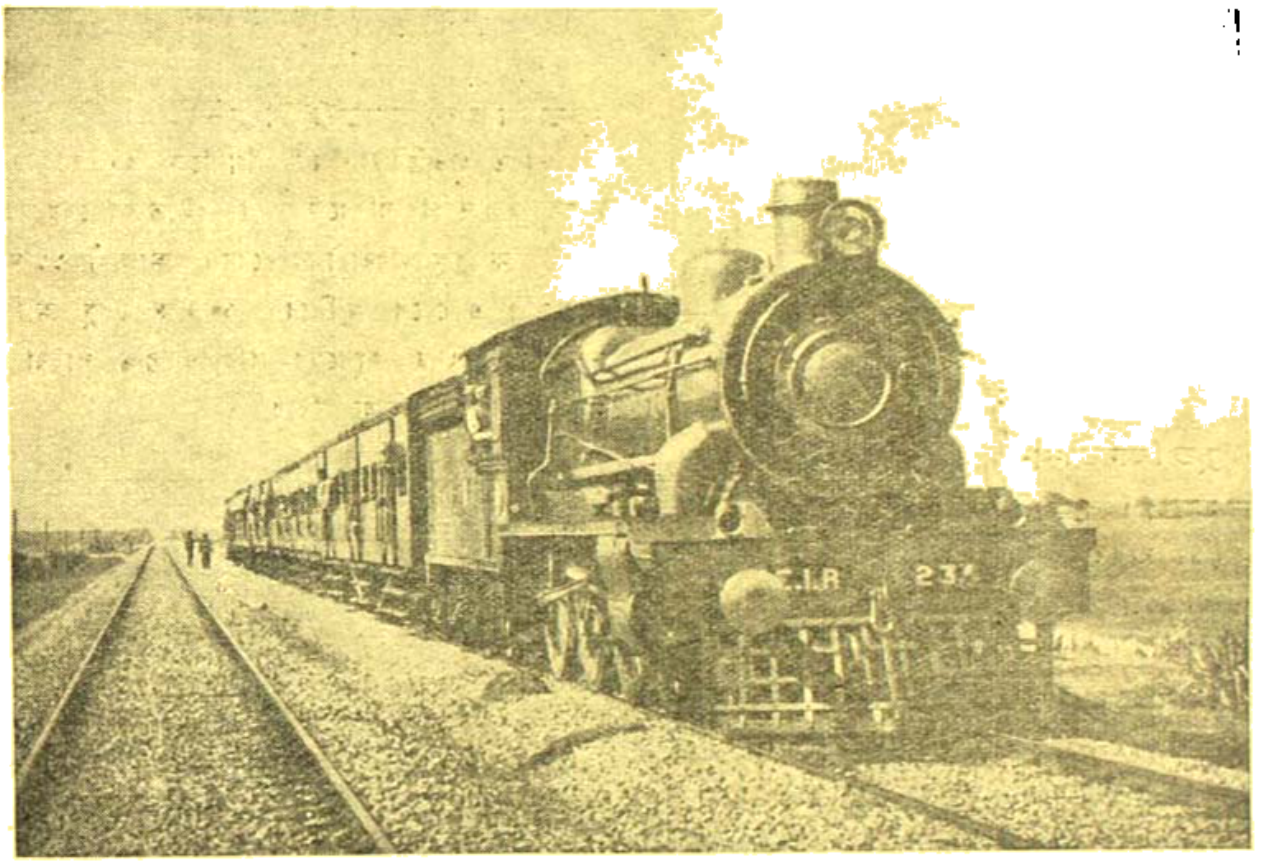

এলাহাবাদের পথে জন্মাধারবাহী ট্রেন—এটোয়া

অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি গত ৩০ বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন।

বঙ্গীয় আয়ুর্বেদিক মহাসম্মিলন—

গত ১৫ই ও ১৬ই ফাল্গুন শনিবার ও রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে কবিরাজ শ্রীযুত প্রমথনাথ রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ মহাসম্মিলন হইয়া গিয়াছে। গভর্ণর শ্রীযুত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী সম্মিলনের উদ্বোধন করেন এবং মন্ত্রী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কবিরাজ শ্রীযুত অনাথনাথ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। স্বাধীন বাঙ্গালায় আয়ুর্ব্বেদের প্রসার ও উন্নতি বিধানের জন্য সকল চেষ্টা করা প্রয়োজন।

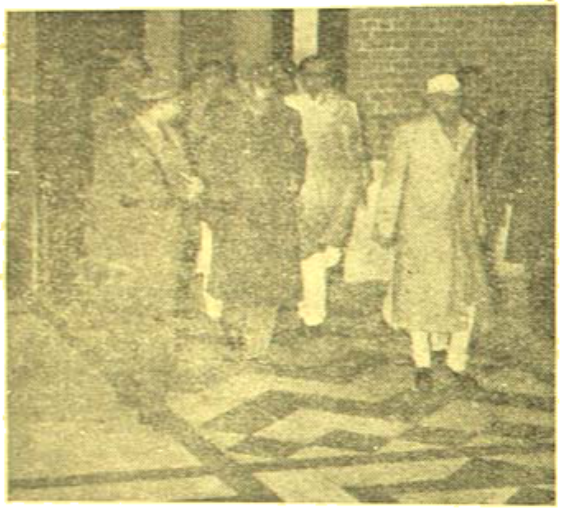

ভন্নাধার দিল্লী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ভন্নাধারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থ তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর গমন

শ্রীযুত ক্ষিতীশ-চন্দ্র নিয়োগী—

পশ্চিম বঙ্গের আতরিক্ত নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী গণ-পরিষদের সদস্য বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ক্ষিতীশবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি মন্ত্রীরূপে সাফল্যের সহিত কাজ করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী—

পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ব্যবস্থা পরিষদের নিম্নলিখিত ৬ জন সদস্যকে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছেন—(১) শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২) শ্রীবনবিহারী মণ্ডল (৩) শ্রীরুক্ষচন্দ্র মণ্ডল (৪) শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর (৫) শ্রীরামাপদ ভট্টাচার্য্য ও (৬) শ্রীবিশ্বপতি মাঝি।

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ই মার্চ্চ হইতে আরও ২ বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকাল বৃদ্ধিতে সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সঙ্কট-জনক পরিস্থিতিতে তাঁহার মত অভিজ্ঞ কর্ম্মীর পক্ষেই সকল দিক রক্ষা করিয়া কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব।

কয়লার পরিবর্ত্তে টাকু—

ভারত গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই জাপানকে ৩০ হাজার টন কয়লা দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে জাপান হইতে কাপড়ের কলের জন্য ১ লক্ষ টাকু আমদানী করিবেন। আগামী ১১ মাসে টাকুগুলি এ দেশে আসিবে। ১ লক্ষ টাকু আসিলে ভারতবর্ষে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বস্ত্র সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে।

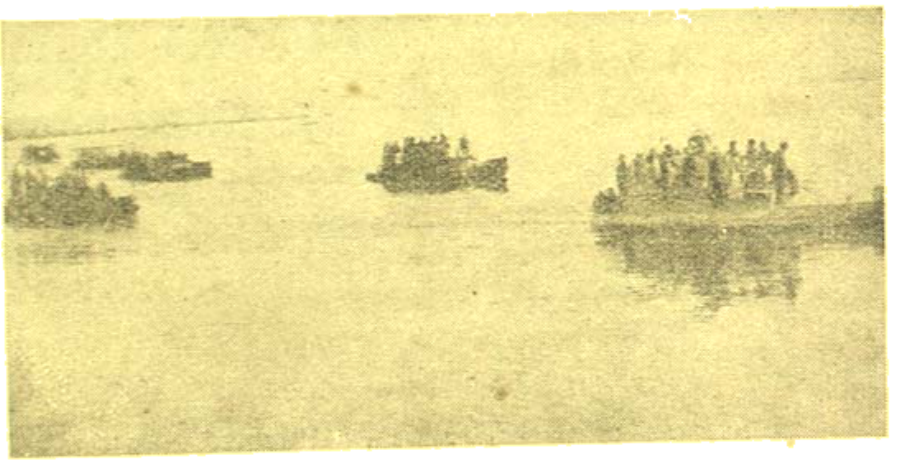

গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে উত্তর প্রদেশ (দক্ষিণে) গান্ধীজীর অস্থি—এলাহাবাদ

ফটো—জগদিন্দ্রন বন্দ্যোপাধ্যায়

পরলোকে অপেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী—

খ্যাতনামা পণ্ডিত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী গত ৯ই ফাল্গুন ৯৬ বৎসর বয়সে কলিকাতা ভবানীপুরে গঙ্গাতীরে স্বর্গলাভ করিয়াছেন—তিনি কলিকাতা গীতা সভা, ভবানীপুর সনাতন ধর্ম্মসভা প্রভৃতির আচার্য্য ছিলেন।

পুরীর মন্দির পরিচালনা—

পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিচালনার জন্য উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদে শীঘ্রই একটি বিল উপস্থিত করা হইবে। বিলটি উড়িষ্যা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। মন্দির ও তৎসংশ্লিষ্ট সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত কমিটীর উপর ন্যস্ত করা হইবে। ফলে যাহাতে আর কোনরূপ অব্যবস্থা না থাকে তাহার চেষ্টা হইবে।

জুনাগড়ে গণভোটের ফল—

সম্প্রতি জুনাগড় রাজ্যে যে গণভোট গৃহীত হইয়াছে গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লীতে তাহার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্র সংঘে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়াছে ১৯০৭৭ ব্যক্তি ও পাকিস্থানে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়াছে—৯১ ব্যক্তি মাত্র।

পরলোকে রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর—

বীরভূমের প্রসিদ্ধ ময়নাডাল গ্রামনিবাসী মিত্র-ঠাকুরবংশীয় কীর্ত্তন বিশারদ পণ্ডিত রাসবিহারী মিত্র-ঠাকুর রসসাগর গত ৬ই ফাল্গুন ৮২ বৎসর বয়সে কলিকাতা তারক প্রামাণিক রোডে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তনের সহিত বাঙ্গালী মাত্রই পরিচিত ছিলেন।

গান্ধীজির ৭৯ ফিট উচ্চ প্রস্তরমূর্ত্তি—

২৯শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে কাথিয়াবাড় রাষ্ট্র সংঘের নেতা নবনগরের জাম সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে বোম্বাইয়ের উত্তরস্থ চওটিলী গ্রামে ৬১৯ ফিট উচ্চ এক শৈল শিখরে মহাত্মা গান্ধীর ৭৯ ফিট উচ্চ এক বিরাট প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কাথিয়াবাড়ের রাজন্যবর্গ শুধু সৌরাষ্ট্র রাজ্য গঠন করিবেন না—সকলেই জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কাজ করিবেন। মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পথে সকলে পরিচালিত হইবেন।

উড়িষ্যার নূতন আদিবাসী মন্ত্রী—

সম্বলপুর জেলার পদমপুর হইতে নির্ব্বাচিত উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য লালা রণজিৎ সিং বরিহা ২৮শে ফেব্রুয়ারী উড়িষ্যা মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে প্রথম আদিবাসী মন্ত্রী। তিনি ৬ বৎসর বিলাতে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

মহীয়সী মহিলার পরলোক গমন—

মৈমনসিংহ হেসনগর নিবাসীখ্যাতনামা দানশীল জমীদার ৺হেমচন্দ্র চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী গত ৩০শে অগ্রহায়ণ সজ্ঞানে ৺কাশীলাভ করিয়াছেন। তিনি জীবনব্যাপী কঠোর নিয়ম-ব্রত প্রতিপালন, দেব দ্বিজে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, দরিদ্রের দুঃখ মোচনে মুক্তহস্তে দান ও সরল মধুর ব্যবহারের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন। তিনি বিধবা হইয়া কঠোর জীবনযাপন করিতেন ও বৃদ্ধ বয়সেও স্বপাক খাইতেন—ফলে কখনও তাঁহাকে রোগ ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি বহু পুত্র-পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির সমাবর্ত্তন—

গত ৬ই মার্চ্চ কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ ভবনে বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা-সচিব রায় শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসাবে উৎসবে উপস্থিত হইয়া জানাইয়াছেন যে পশ্চিম বাঙ্গালার সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিবার জন্য সরকার শীঘ্রই এক কমিটী গঠন করিবেন ও আগামী বৎসর সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। সমিতির সম্পাদক ও কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তাহার বিবরণে বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। উৎসবে বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী—

গত ৭ই মার্চ্চ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বহু খ্যাতনামা সুধীকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ও রাজকুমারী অমৃত কাউর ছাড়াও ১৩ জন পণ্ডিত ব্যক্তি ঐরূপ উপাধি পাইয়াছেন। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক দিল্লীস্থ জাতীয় মহাফেজখানার অধ্যক্ষ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহাদের অন্যতম। সুরেন্দ্রবাবুর এই সম্মানলাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ—

কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে বেলগেছিয়া রোডে যে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আছে, সম্প্রতি তাহার কর্তৃপক্ষ উক্ত কলেজ ও হাসপাতালের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল' নামকরণ করিয়াছেন। খ্যাতনামা ডানবার চিকিৎসক ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের প্রাণপাত চেষ্টায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে উহা প্রতিষ্ঠার সময় সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির জন্য তৎকালীন গভর্ণরের নামে উহার নামকরণ করা হইয়াছিল। সেই দাসমনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়া স্বাধীন বাঙ্গালায় যে উহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব ও আনন্দ বোধ করিবেন।

স্বাধীন সিংহলের প্রতি শুভেচ্ছা—

সিংহল দ্বেশ সম্প্রতি স্বাধীনতা লাভ করায় গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সকালে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার মহাবোধি সোসাইটীতে এক বিরাট অনুষ্ঠানে স্বাধীন পশ্চিম বঙ্গের পক্ষ হইতে তাহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। উৎসবে গভর্ণর শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী, প্রধান মন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, ডাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু রাষ্ট্রদূত বক্তৃতা করিয়া নূতন স্বাধীন লঙ্কার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়াছেন। গভর্ণর রাজাগোপালাচারী পৃথিবীর সকল দেশকে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

গান্ধীজি

শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হাহাকারে ভরে ব্যাপ্ত আকাশ, হত্যা চতুর্দ্দিকে।
আমরা পেয়েছি প্রেমের প্রতীক দেবতা গান্ধীজিকে।
সত্যাগ্রহী সহজ সরল
মুছাতে বেদনা ঘুচাতে গরল
ডাক দিয়ে কহে—"করুণা তরল বাঁচাবে ধরিত্রীকে—
"হে মৃত্যু মাধব! প্রেমের বাহুতে নিয়ে যাও ফিরে ফিরে।

"একই মায়ের অঙ্গজ পুত্র হিন্দু মুসলমান।
"যে নামেই ডাকো "আল্লা" বা "হরি" একই সে ভগবান।
"একই শোণিত ধমনিতে নিয়ে
একই মাতা বাঙ্গে শিশুর শিয়রে,
একই আনন্দে প্রাণ গলে যায়, একই সুরে একই গান।

"একই শস্য ফুল ফলে ভূমি—ভূমার একই জল
"একই রবির রশ্মিতে জাগে জীবনের সকল।
"জননী হৃদয়ে আছে একই স্নেহ
শিশু কলরোলে মথিত গেহ
একই মন একই প্রাণ একই দেহ
একই গানে একই বল।

নমঃ নমঃ নমঃ ওগো প্রিয়তম! মৃত্যুর অবতার
ধরা ভরে সব তবু অবিরত বহিয়ায় কত ভার।
ভারতের মহ তুমি পৃথিবীর
ধরে ধরায় তুমি ধীর-স্থির
মেষ মাধব হে মেষ বীর প্রেমের কৃপাণ ধার—
দ্বিপ্র দ্বিপ শতাব্দী ধরে সকলের আপনার।

উদার দুখা হাসিল তোমার বক্ষে আঘাত হানি—
করুণ কণ্ঠে উঠিল ধ্বনিয়া শেষ "হরে রাম" বাণী
কুল তনুখানি রঞ্জিয়াছে ধারা
প্রীতি ঢোখা! মুখে প্রীতি ছিল মাখা
নয়নের কোণে করুণা ছিল আঁকা ঠোঁট দুটি পাশি।
আমাদের শত শত অপরাধ ক্ষমা করে গেছ আসি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

মৃণালশেখর চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চম টেষ্টম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৫১৫ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ভারতবর্ষ ঃ ৩৩১ ও ৬৭

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ১৭৭ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

৬ই ফেব্রুয়ারী মেলবোর্ণ মাঠে শেষ পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হয়। খেলা আরম্ভের পূর্বে উভয় দলের খেলোয়াড়েরা একত্র দাঁড়িয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এক মিনিটকাল মৌন অবলম্বন করেন। খেলার মাঠের দর্শকগণও নিজ নিজ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে অনুরূপভাবে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ব্র্যাডম্যান টসে জয়লাভ করে প্রথমে দলকে ব্যাট করতে পাঠান। আবহাওয়া ক্রিকেট খেলার অনুকূল ছিল না। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছিল। ঐ সময়ে এক উইকেটে ৯৬ রাণ উঠে। দিনের শেষে খেলার নির্দিষ্ট সময়ে তিন উইকেটে ৩৩৬ রাণ উঠে। ব্রাউন ৯৯ রাণ করেন এবং ব্র্যাডম্যান ৫৭ ক'রে পেশীর টান ধরায় জন্য অবসর গ্রহণ করেন। নেলহার্ভে ও লরটন যথাক্রমে ৭৮ ও ৪৮ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

খেলার দ্বিতীয় দিন ৭ই ফেব্রুয়ারী, চা পানের সময় অষ্ট্রেলিয়া দলের ৮ উইকেটে ৫১৫ রাণ উঠলে পর ব্র্যাডম্যান ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করেন। নেলহার্ভে ১৫৩ ও লরটন ৮০ রাণকরেন। নেলহার্ভে ২৪৯ মিনিট উইকেটে ছিলেন এবং বাউণ্ডারী করেন ১১টি। নেলহার্ভে ও লরটন ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ১৫৯ রাণ তুলেন। চা পানের পর ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। সূচনায় অশুভ লক্ষণ দেখা দিল। মাত্র তিন রাণে প্রথম উইকেট পড়ে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ভারতীয় দলের ৪৩ রাণ উঠেছে এক উইকেট গিয়ে।

খেলার তৃতীয় দিন ৯ই ফেব্রুয়ারী, ভারতীয় দল সারা দিনই ব্যাট করলো। মানকাদ ১১১ রাণ করলেন। এই দিনে ভারতীয় দলের ৬টা উইকেট পড়ে যায়।

খেলার চতুর্থ দিনে ১০ই ফেব্রুয়ারী, ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৩১ রাণে শেষ হয়। হাজারে৭৪ রাণ করেন এবং ফাদকার ৫৬ রাণ করে নট আউট থাকেন। ভারতীয়দল 'ফলোঅন' করতে বাধ্য হ'ল। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতে ভারতীয় দল অতি শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মাত্র ১১০ মিনিটে দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৬৭ রাণে শেষ হয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়া দলের বোলার জনসন ৮ রাণে ৩ এবং রিং ১৭ রাণে ৩টে উইকেট পান। ভারতীয় দলকে ১ ইনিংসে ও ১১৭ রাণে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অষ্ট্রেলিয়া

সফরের রক্ষণাবলী ঃ

মোট খেলা—২০ ; জয়—৪ ; ড্র—৭ ; পরাজয়—।

সেঞ্চুরী ভারতীয় দল—১৫টি : ভারতীয় দলের বিপক্ষে ১৭টি।

ভারতীয় দলের পক্ষে সেঞ্চুরী :

লালা অমরনাথ—৪

১৪৪ (দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে ১ম ইনিংসে)

২২৮ নট আউট (ভিক্টোরিয়া দলের বিপক্ষে ১মইনিংসে)

১৭২ (কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ম ইনিংসে)

১৭১ (টাসমানিয়ার বিপক্ষে ১ম ইনিংসে)

১৩৫ (টাসমানিয়ার ২য় খেলায় ১ম ইনিংসে)

ভি মানকাদ—৩

১১৬ (দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে ২য় ইনিংসে)

১১৬ (তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ, ১ম ইনিংসে)

১১১ (৫ম " ")

বিজয় হাজারে—৪

১৪২ (নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে)

১১৪ (টাসমানিয়ার বিপক্ষে ১ম ইনিংসে)

১১৬ (৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ, ১ম ইনিংস)

১৪৪ (" ২য় ইনিংস)

কে রঙ্গনেকার—১২৩ (ভিক্টোরিয়া কাউন্টি একাদশের বিপক্ষে ১ম ইনিংসে)

ডি জি কাদকার ১২৩ (৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ ১ম ইনিংস)

সিটি সারভাতে

১২৮ (টাসমানিয়ার বিপক্ষে ১ম ইনিংসের দ্বিতীয় খেলায়)

ভারতীয় দলের বিপক্ষে সেঞ্চুরী ঃ

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াদলের পক্ষে : আর নিহাল—১৩৭ ; আর জে ক্রীগ—১০০ ; ডি ব্র্যাডম্যান—১৫৬। মোরিস—১৬২ (নিউ সাউথ ওয়েলসদলের পক্ষে ১ম ইনিংসে) ; ডি ব্র্যাডম্যান—১৭২ (অষ্ট্রেলিয়া একাদশ দলের পক্ষে ১ন ইনিংসে) ; ডবলউ মোরিস—১১৫ (কুইন্সল্যাণ্ডের পক্ষে ১ম ইনিংস) ; সি ম্যাকুল ১০১ (ঐ খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে) ; আর মরিসবাই—১৩০ (টাসমানিয়ার দ্বিতীয় খেলার ১ম ইনিংসে) ; ডবলউ ওয়ামসলি—১৮০ নট আউট (ঐ খেলার ১ম ইনিংসে)

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে—টেষ্ট সেঞ্চুরী : অষ্ট্রেলিয়া—৮ ; ভারতবর্ষ—৫টি ডি ব্র্যাডম্যান—৩টি

১৮৫ (প্রথম টেষ্ট ম্যাচ, ১ম ইনিংসে)

১০২ (তৃতীয় " "

১২৭ (" ২য় ইনিংস)

২০১ (৪র্থ " ১ম ইনিংসে)

এ মরিস ১০০ (তৃতীয় " ২য় ইনিংস)

এ এল হাসেট ১৯৮ (৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ ")

এস বার্ণেস ১১২ (" ")

নেল হার্ভে ১৫৩ (৫ম " ১ম ")

ভারতীয়দলের পক্ষে

ভি মানকাদ—২

১১৬ (তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ, ১ম ইনিংস)

১১১ (৫ম ")

ভি এস হাজারে—২

১১৬ (৪র্থ " ")

১৪৪ (" " ২য় ইনিংস)

ডি জি কাদকার—১

১২৩ (৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ ১ম ইনিংস)

নিখিল ভারতীয় অলিম্পিক ঃ

ত্রয়োদশ বার্ষিক নিখিল ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের গোমতী ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। পাতিয়ালা ৯৮ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছে। মহিলাদের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে মহীশূর ৩৪ পয়েন্ট পেয়ে। ভায়োত্তোলন প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলাপ্রদেশ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। ফলাফল (১ম) পাতিয়ালা—৯৮ পয়েন্ট;, (২য়) বোম্বাই—৩৯, (৩য়) মহীশূর—২৩, (৪র্থ) যুক্তপ্রদেশ—২২, (৫ম) বাঙ্গলা—১৭, (৬ষ্ঠ) পূর্ব্ব পাঞ্জাব— (৭ম) মাদ্রাজ—১১, (৮ম) কোলাপুর ও বিহার—৬, (৯ম) ফরিদকোট—৩ এবং (দশম) বরোদা—১।

আন্তঃস্কুল স্পোর্টস ঃ

ভারতীয় স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখার উদ্যোগে নবম বার্ষিক আন্তঃ স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর অনেক বেশী ছাত্র যোগদান করেছিল।

ফলাফল : ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান : বড়দের—রবিন মল্লিক (স্কটিশ স্কুল)—১১ পয়েন্ট। মধ্যম শ্রেণীর—তাপস গুপ্ত (স্কটিশ স্কুল)—৬ পয়েন্ট। ছোটদের—জগন্নাথ দাস (সুটবিহারী)—৮ পয়েন্ট।

স্কুল চ্যাম্পিয়ানশীপ—স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল—৩৯ পয়েন্ট।

খেলা-ধূলা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট

অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল তাঁদের তালিকাভুক্ত সব খেলা শেষ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। তাঁদের খেলার ফলাফলে তাঁরা আমাদের বিশেষ সন্তুষ্ট ও আশান্বিত করতে পারেননি সত্য, কিন্তু সব কিছু বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় তাঁদের খেলার ফলাফলে অসন্তুষ্ট বা নিরাশ হবারও কিছু নেই। তবে যাঁরা অত্যধিক আশা করেছিলেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। একে ভারতের ক্রিকেট স্ট্যাণ্ডার্ড অষ্ট্রেলিয়ার চেয়ে অনেক নীচে তার উপর তিনজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, মার্চেণ্ট, মাঞ্জরেকর ও মোদী না যাওয়ায় ভারতীয় দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দলের সঙ্গে তার সর্ব্বশক্তি না নিয়েই। এরূপ একটি দুর্ব্বল দলের কাছ থেকে, যার মধ্যে নূতন ও অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়ই বেশী, আশাতিরিক্ত ভাল ফলাফল আশা করা অন্যায়। তা' ছাড়া মনে রাখতে হবে ইহাই ভারতীয় দলের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাবর্জ্জিত সর্ব্বপ্রথম অষ্ট্রেলিয়া সফর। এর উপর ঘটেছে ভাগ্যবিপর্য্যয়। গোড়ার দিকে খেলতে হয়েছে অতিরিক্ত বৃষ্টিসিক্ত নরম উইকেটে এবং শেষের দিকে অত্যধিক গরমে। এই অনভ্যস্ত আবহাওয়ায় ভারতীয় দল নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারায় অনেক সময়ে তাঁদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। ভারতবর্ষে সব সময় ক্রিকেট খেলার আদর্শ আবহাওয়ার মধ্যে খেলবার চেষ্টা হয়ে থাকে। এটা একটা মস্ত বড় ত্রুটি বলেই মনে হয়। দেখা যায় ভারতের বাইরের কোন দেশে সফরের সময় প্রায়ই অত্যধিক বৃষ্টি, শীত বা গরমের মধ্যে খেলতে হয়। এই রকম অনভ্যস্ত আবহাওয়ায় ভারতীয় দল অনেক সময় তাঁদের স্বাভাবিক ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখাতে পারেন না। এই জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে যাঁরা টেষ্ট ম্যাচের উপযুক্ত, তাঁদের বৃষ্টিসিক্ত নরম উইকেটে এবং বেশী গরমের সময়েও খেলার অভ্যাস রাখা দরকার।

অধিনায়ক অমরনাথের অধিনায়কত্ব সম্বন্ধে অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে এবং রয়টারের বিশেষ সংবাদ-দাতা, প্রিন্স দলীপ সিংজী, অমরনাথকে গোড়ায় থেকেই আক্রমণ করে এসেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় অমরনাথ দল পরিচালনায় বিশেষ অযোগ্যতার পরিচয় দেন নি। তাঁর অধীনস্থ খেলোয়াড়দের তিনি যে ভাবে খেলিয়েছিলেন খেলোয়াড়দের গুণাগুণ বিচার করে দেখলে বোঝা যায় তার চেয়ে ভালভাবে খেলান সম্ভব ছিল না। খেলোয়াড়দের নিজের দোষে খেলতে না পারার জন্য অধিনায়ককে সব সময়ে দায়ী করা ঠিক নয়। হয়ত অল্প-স্বল্প ত্রুটিবিচ্যুতি অমরনাথের পরিচালনার মধ্যে ঘটেছিল।

অমরনাথ

যেমন সি, এস, নাইডুকে আরও বেশী ওভার বল করবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল এবং অনবরত ব্যাটিং অর্ডার পাল্টানও ঠিক হয় নি। কিন্তু এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি ভারতীয় দলের বিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ নয়। বরং অমরনাথের ভুলের চেয়ে তাঁর দুর্ভাগ্যকেই দোষ দেওয়া

হলতে পারে। পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচের মধ্যে চারটিতেই তিনি টসে ব্র্যাডম্যানের কাছে পরাজিত হয়েছেন। এই টসের জয় পরাজয়ের উপর ক্রিকেট খেলায় বিশেষ করে টেষ্ট ম্যাচের জয় পরাজয় অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রথম ব্যাট করার সুবিধা পাওয়া প্রায় একশ' রাণের সমতুল্য। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী অমরনাথকে সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন চারটি টেষ্টেই। একে ভারতের দল অষ্ট্রেলিয়ার চেয়ে অনেক দুর্বল, তার উপর ভাগ্য বিপর্য্যয় ও বৃষ্টিপাত মিলে ভারতীয় দলকে একেবারে কোনঠাসা করে তুলেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও অমরনাথের সিংহ হৃদয় ছিল অটল এবং তিনি প্রকৃত অধিনায়কের মত ও খেলোয়াড়োচিতভাবে এই সব বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। টসের পরাজয় তিনি গ্রাহ্য করেন নি, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদলের বিপুল রাণ-সংখ্যা তাকে দমিয়ে দিতে পারে নি, ভিজে মাঠের নরম পীচ্ তাঁকে ভীত করেনি। যখন সব কিছু তাঁর বিপক্ষে গিয়েছে তখনও তিনি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিপক্ষে তাঁর দুর্বল দল নিয়ে জয়লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পরাজিত হয়েছেন সত্য কিন্তু গৌরবজনক-ভাবে। তাঁর দৃঢ়তা এবং বলাংশে শক্তিশালী ব্র্যাডম্যান পরিচালিত অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে জয়লাভের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। অমরনাথ ও তাঁর দলের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এই দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা অষ্ট্রেলিয়াবাসীদেরও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। এ পর্য্যন্ত যত ক্রিকেট দল অষ্ট্রেলিয়ায় খেলতে গেছে তার মধ্যে এই ভারতীয় দলই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ব্যারাকিং অন্যান্য অষ্ট্রেলিয়ান দর্শকদের কাছ থেকে এই জনপ্রিয়তা লাভই অমরনাথ ও তাঁর দলের যোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমরা অমরনাথকে তাঁহার সাহসিকতাপূর্ণ অধিনায়কত্বের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিজয় মার্চেন্টের অনুপস্থিতিতে ভবিষ্যতে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার হয়ত পুনরায় অমরনাথের উপর পড়বে। তখন আশা করি অমরনাথ তাঁর যোগ্যতার পরিচয় আরও ভালভাবে দিতে পারবেন। আমরা তাঁর ভবিষ্যত সাফল্য কামনা করি।

এই সুযোগে আমরা ভারতীয় দলকে, বিশেষ করে বিজয় হাজারী, মানকাদ, ফাদকার, অধিকারী এবং ভারতের সুযোগ্য উইকেট রক্ষক প্রবীর সেনকে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ খেলার জন্য আমাদের আগত সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই সঙ্গে আমরা ভারতের সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীযুত পঙ্কজ গুপ্তকেও তাঁর নিখুঁত ব্যবস্থাপনার জন্য অভিনন্দিত করছি এবং তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

* * * *

এই মরশুমে বাংলা দেশের ক্রিকেট খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের পঙ্কজ রায় ছাড়া আর কোন খেলোয়াড়ই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। পঙ্কজ রায় হোলকারের বিপক্ষে তাঁর শতাধিক রাণ ও এই মরশুমে তাঁর সহস্র রাণ পূর্ণ করা ছাড়া গণেশ বসুর বাংলা দেশের সর্ব্বোচ্চ রাণের রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। বাংলার খ্যাতনামা খেলোয়াড় গণেশ বসু ল্যান্সডাউন শীল্ডের খেলায় সিটি কলেজের পক্ষে খেলে যে সর্ব্বোচ্চ রাণের রেকর্ড করেছিলেন, শ্রীমান পঙ্কজ

পঙ্কজ রায়

এতদিন পরে এল, রায় মেমোরিয়াল শীল্ডের ফাইন্যাল খেলায় বিদ্যা-সাগর কলেজের পক্ষে খেলে সেই রেকর্ড ভঙ্গ করে নিজস্ব ২৮০ রাণের নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন। পঙ্কজের এই রেকর্ড আবার কবে ভঙ্গ হবে জানিনা। তবে আশা করি শ্রীমান পঙ্কজ নিজেই অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্য কোনও ছাত্র অচিরে এই রেকর্ড ভঙ্গ করে বাংলার ক্রিকেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের পরিমাণ বর্দ্ধিত করবেন। শ্রীযুত বসু যখন ২৭১ রাণ করে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন তখন তাঁর ছাত্রাবস্থা ছিল। তার পর এতদিন কেটে গেছে এবং শ্রীযুত বসুও অনেক খেলায় তাঁর ব্যাটিংকৃতিত্ব দেখিয়ে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের সম্মান পেয়ে এসেছেন, কিন্তু ভারতীয় দলে স্থান পাবার যোগ্যতা তিনি অর্জন করতে পারেন নি। পঙ্কজ গণেশবসু স্থাপিত রেকর্ড ভঙ্গ করে এবং নিজের অন্যান্য ব্যাটিং কৃতিত্বে এখন বাংলার ক্রিকেট জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকারূপে বিরাজমান। পঙ্কজেরও এখন সবে ছাত্রাবস্থা এবং তাঁর

সামনে পড়ে আছে সমুজ্জ্বল ক্রিকেট ভবিষ্যত। আশা করি পঙ্কজ গণেশ বসুর মত বাংলার ক্রিকেটই সীমাবদ্ধ না থেকে ভারতীয় টেষ্ট দলে তাঁর স্থান করে নিতে পারবেন। বাংলার ক্রিকেটে সর্ব্বোচ্চ রানের নূতন রেকর্ড স্থাপন করার জন্য আমরা পঙ্কজকে আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এ্যাথ্‌লেটিক্‌স্‌ ঃ

শীতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্পোর্টসের মরশুমও শেষ হল। ক্রিকেটের ন্যায় এ্যাথলেটিক্‌সেও বাঙালী যে কত পেছিয়ে আছে তা এই সব স্পোর্টসের ফলাফল দেখলেই বোঝা যায়। বাংলা থেকে এ পর্য্যন্ত যত পুরুষ এ্যাথলেট নাম করেছেন তাঁদের বেশীর ভাগই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। মহিলাদের কথা আর না বললেও চলে। আজকাল তবু বাঙালী মহিলারা

তপতী মিত্র ফটো—জে. কে. সান্যাল

লজ্জাশীলতা কাটিয়ে স্পোর্টসে নামছেন। এর আগে যাঁরা স্পোর্টসে নাম দিতেন তাঁদের মহিলা না বলে বালিকা বলাই উচিত। কিছুদিন আগেও বাঙালী মেয়েরা একটু বয়স্কা হলেই খেলাধূলা ছেড়ে দিয়ে গৃহের কোণে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু যাঁদের খেলাধূলায় প্রতিভা আছে তাঁদের কর্ত্তব্য খেলাধূলার মধ্য দিয়ে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করা। আজকাল বাঙালী মহিলাদের মধ্যে যাঁরা স্পোর্টসে কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে কুমারী তপতী মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কুমারী তপতী সাইকেল চালনায় বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। কুমারী তপতীর যে প্রতিভা আছে তার উপযুক্ত মত অনুশীলন যদি তিনি করে যেতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে ভারতে এবং ভারতের বাইরেও স্পোর্টসে বাঙালী-মেয়ের ছুর্নাম ঘুচিয়ে বাংলার মুখোজ্জ্বল করতে পারবেন বলে আশা হয়।

এবারে সর্ব্বভারতীয় আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে ৩০শে জানুয়ারী যে সময়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেই সময় মোহনবাগান মাঠে শেষ হয়। এবারে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়

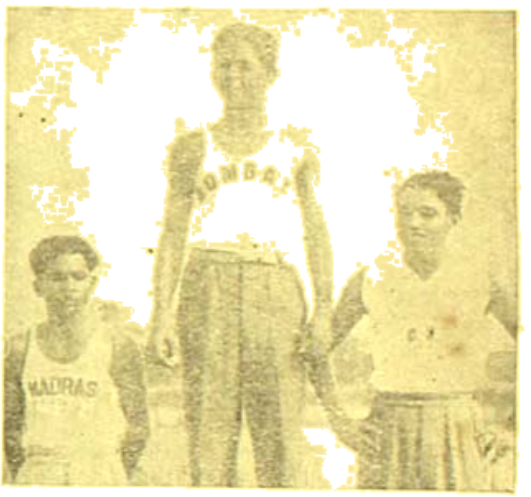

আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসে ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম—এল. জে. ক্রীচ্‌ (বোম্বাই), দ্বিতীয়—এ. আর. এস. দোহা (কলিকাতা), ও তৃতীয়—ডি. সিল্‌ভা (মাদ্রাজ)

ফটো—জে. কে. সান্যাল

দল প্রতিযোগিতায় যোগদান না করায় আশা হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি সহজে চ্যাম্পিয়ানশীপ পাবে। কিন্তু বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল শেষ মুহূর্ত্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোহা ও অধিনায়ক টেমী শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন কলিকাতাকে চ্যাম্পিয়ানশীপ পাওয়াতে; কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নি। বোম্বাই কয়েক পয়েন্টে শেষের দিকে অগ্রগামী

হয়ে যায় এবং চ্যাম্পিয়ানশীপ পায়। এই স্পোর্টসে কয়েকটি বিষয়ে ষ্টার্টিং দেওয়া বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। ঠিকমত ষ্টার্টিং পাওয়ার উপর প্রতিযোগিতায় বিশেষ করে দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ অনেকাংশে নির্ভর করে এবং এ রকম একটি বিশিষ্ট স্পোর্টসে এরূপ ত্রুটি হওয়া অবাঞ্ছনীয়। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে স্পোর্টসের জনপ্রিয়তা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল। এই সব ছাত্রদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যত ভারতের এ্যাথলেট তৈরী হবেন যাঁদের উপর ভারতের এথলেটিক স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়িয়ে বিশ্ব-অলিম্পিক স্ট্যাণ্ডার্ডের তুল্য করার দায়িত্ব পড়বে।

• • • •

এবার বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতা লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হবে এবং এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে প্রতিযোগিদল পাঠানো স্থির হয়েছে। ভারতবর্ষ এ্যথলেটিক্সে বিশ্ব-অলিম্পিকের স্ট্যাণ্ডার্ডের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে এবং এই বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় প্রতিযোগিদল যে বিশেষ ভাল ফল দেখাতে পারবেন না তা আমরা জানি। তবে ভারতীয় প্রতিযোগিদল যে বিশ্ব-অলিম্পিকে যোগদান করতে যাচ্ছেন এইটাই আশার কথা। বড় বড় প্রতিযোগিতায় যোগদান না করলে প্রতিযোগিদের স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়ে না। এই বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ভারতীয় প্রতিযোগিদল তাঁদের ত্রুটিগুলি কোথায় তা বুঝতে পারবেন বলে মনে হয় এবং আশা করি তাঁরা সেই সব ত্রুটিগুলি শোধরাবার চেষ্টাও করবেন। ভারতীয় অলিম্পিকের কর্ণধারগণও এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন বলে মনে করি। তাঁরা যে গুরুভার নিয়ে দল পাঠাচ্ছেন তার জন্য তাঁদের প্রশংসা করি এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "কালো টাকা"—২৲

শ্রীবিজয়লাল মজুমদার প্রণীত রাজনীতিক প্রবন্ধ-সমষ্টি
"আমাদের বাঙ্গলা" (দ্বিতীয় পর্ব্ব)—১৷৹

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত "শরৎচন্দ্রের গল্পাবলী"—৩৲

শ্রীযামিনীলাল রায় চৌধুরী ও শ্রীরঞ্জিত সিংহ প্রণীত শিশু-সাহিত্য
"দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে"—১৷৹

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল প্রণীত "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা"
(১ম খণ্ড)—৪৷৹

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস (কিশোর-সংস্করণ)
"নবীপুর পাঠশালা"—২৷৹

শ্রীগোপালভট্ট ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "শেষ কদমে"—২৲

মৌলবী আলী আহমদ্ প্রণীত
"বাংলা কলমী পুথির বিবরণ" (১ম ভাগ)—১৷৹

শ্রীমলিনা মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বাদল ধারা"—১৷৹

শ্রীসীতেশ রায় চৌধুরী সম্পাদিত "মহাত্মাজীর চিঠিপত্র"—২৷৹

স্বপনবুড়ো প্রণীত ছোটদের নাটক "বিদূষকী"—১৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

৩০।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

CALCUTTA * CENTRAL LIBRARY * UNIVERSITY.

বৈশাখ—১৩৫৫

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

মহাভিক্ষুক

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি-শেষের নির্ঘোষ শুনিলাম
কোথারি কণ্ঠে মুক্তি-উষার দ্বারে,
নবীন সূর্য্য উদয়ের পথে জানাইল আহ্বানে ;
শাসন-রুদ্ধ কণ্ঠ হঠাৎ অবিমুক্ত হয়ে
তব জয়গানে দিক্ দিগন্তে মুক্ত করিল পাখা ;
ঘন-সকল প্রভাত বেলায়
দু'শ বছরের বন্ধন-শৃঙ্খল
ভূতলে লুটায় দেখিলাম বিস্ময়ে।

তবু বিমর্ষ জাতির জনক,
আশঙ্কা জাগে প্রলয়ের সঙ্কেতে
মনে তাহার তাই কি ঘনায় ব্যথার অশ্রু কণা ?
হিমালয় হতে কন্যাকুমারী
জাতিবর্ণের মিলন-মহোৎসবে
—হাতে বেঁধে দিয়ে রাঙা-রাখী মিলনের
সে সাধনা তাঁর সফল হোল না

জাগা দেশ জুড়ে কাটল ধরিল যেন
কাটল ধরিল তাহারও বীর বুকে।

সেই দুখে বুঝি তুমিও রাজেন্দ্রাণী
মুহূর্ত্ত তরে নুয়ে সরাইয়া অঞ্চলে ঢাকো মুখ ?
এত আশা, এত উদ্যমনার মাঝে
মুখে নাই কথা জল জল দুটি আঁখি ?
বৈভব তব এমনি কি হীন
দুর্ব্বার স্নেহ সেকি বিশুষ্ক আজি
তুমি পারিলে না শাসন করিতে
বিপথে আজ অযুত দুর্ব্বিনীতে ?

মহাব্রহ্মণের ডাক এল—
পথে প্রান্তরে, গ্রামে ও গ্রামান্তরে,
জনে জনে ডাকি মহাভিক্ষুক
ভিক্ষা মাগিল অহিংসার মাঝে,

প্রভাত-আলোয় ঘুমিত জাগিয়া ;
রাত্রি-শোণিতে সিক্ত পথের পর
শান্তির জল সিঞ্চন করি'
সে ফিরেছে ঘরে পরিশ্রান্ত দেহে।
সফল হয়েছে কখনও যাত্রা
কখনও বিফল হইয়াছে আহ্বান,
তবুও যাত্রা থামেনি জীবনে তার
সেই যাত্রায় মহা যাত্রাই হোল।

তাই আহ্বানে তুমি আসিয়াছ যদি
বন্ধুর এ কালো বন্ধলবাসী রাতে,
অকাল-যৌবনে জাগো জাগো শর্বরী।
মহাজীবনের শেষ আহুতির অনন্ত সম্ভাবনা
এ মহা শ্মশানে এসে ফিরে বরাভয়।
তব ভাণ্ডারে অমূল্য ধন
যেখানে যা' কিছু আছে
মর্ত্যের মাঝে যে মহতী বাণী
ছিল এতদিন মৌন হতাশনে—
তাহারি কণ্ঠে দিয়েছিলে সেই বাণী
অন্তর তার দিয়েছিলে ভরি'
সেই সে মন্ত্র অভিনব সন্তারে।
তিমি শুবালের সকল-বর্ণ-সংহতি-সংহিতা
সব ভারতের সেই ও নবীন গীতা
রাষ্ট্রীতি তার আবরণ উত্তরীয়।

আজি বিশ্বের উৎসুক আঁখি
ফিরেছে তাহারি দিকে,
ব্যাপী অযুত মহাজীবনের আশা
ধারা বিশ্বের আশাভরা সব
তারা তাঁরি পানে।
মাঝে মাঝে দিবা, মাঝে মাঝে তবু
জাগিতেছে সংশয়
সংশয় জাগে বিশ্ববাসীর মনে—
প্রচারিত যেথা সাম্যের বাণী
মানব-সমাজ-বিলয়-বাত্যাসিক্ত,
ভগ্ন রাজ্যের উষার হোল
যেথা বিপ্লব মন্ত্র অহিংসার
শত্রুরও সাথে হোল বাক সম্ভাষ,
ত্রাস মৌন উন্মনতা
মহামানবের পায় আশ্রয়ীমাঝে
সেথায় সেদিন ফেলনে না আসি
বাধাবা বাজিল যজ্ঞ-বিরোধের
রাত্রি ভরে মন্ত্রিত হোল
ভাইয়ের দু'খানি হাত,
সেই বিদ্রোহ বিটাতে যে জন
অনশন ব্রতে করিল মৃত্যুপণ
একক জীবনে দুরহ তপস্যায়—
সেথায় অকস্মাৎ
তাহি ঝুকে দিবে আহ্বান
সেই সে ভাইয়েরই হাতে।
কাল চক্রের চাকা ঘুরে গেল
আসিল শ্রাবণ আসিল প্রলয় ঝড়
রক্তকরীষ দেহ-অবসাদ
শোণিত অঙ্ক প্রকাশ দিবালোকে।

তাই মাঝে মাঝে সংশয় জাগে মনে
সন্দেহ জাগে বিশ্ববাসীরও মনে,—
অযুত যাদের বিলাবার কথা
তারা বহুতে পান করে হলাহল।
সেই হলাহলে নীলকণ্ঠের
আকণ্ঠ তৃষাপানে
মৃত্যু ঘুচিয়া অমর হইল আজি।

মাগো, তুমি আজ ফিরায়ে পেয়েছ
তব মুকুট অসি,
ফিরায়ে পেয়েছ অনুভবাধার হৃদয়ের পরশন,
রাজরাণী তুমি ফিরায়ে পেয়েছ
বিশাল হৃদয় শক্তি অপরিমেয়
তুমি এক হাতে দিবে বরাভয়
অন্য হতে হরিবে আতঙ্কের
চির রাতের উল্কলতায়
বিশ্ব দিগন্ত আবার উঠিবে ভরি।
রত্ন-খচিত মুকুটে তোমার
অপূর্ব শিরোলোভা
বিশ্বের চোখে জাগাইবে বিস্ময়,
বিস্ময়ে মোরা চাহিয়া দেখিব
তোমার আসন 'পরে
অপরূপ হাসি ফুটিতেছে ধীরে ধীরে,
হারা-মণি তুমি ফিরায়ে পেয়েছ
ঘরে ঘরে তার জ্যোতি বিকীর্ণ হেরি'
নাচুনা গানে শোকাকুল অন্তরে

সে যে দিয়ে গেল কণ্ঠে তোমার
শ্বেত পদ্মের অমর জয়মালা।

নয়নে তোমার তেমনি আবার
সেই চল চল স্নিগ্ধ দৃষ্টিখানি
সবার উপরে তেমনি পড়িবে আসি।
আলো ঝলমল চন্দ্রাতপের তলে
মিলন-বেলার সঙ্গীত শুনি
দূর দূরান্ত হতে
তারায় তারায় ফিরিয়া আসিবে
গৃহহারা তব কোটি কোটি সন্তান ;
তেমনি আবার দাঁড়াবে তোমারে ঘিরি'।
মসী প্রাচীর যবনিকা বেলা
সব উৎসাহে আসিবে অন্তর্হিত
বিগত বেলা বর্ণনত
সুগন্ধে তার পাঠাবে নিমন্ত্রণ,
সম্মুখে তুমি দাঁড়াবে রাজেন্দ্রাণী।
তোমার চরণে নত মস্তকে
নিবেদিবে তারা প্রাণের প্রণতি শত,
আকুল হৃদয়ে যাবার আগে
করিবে অন্বেষণ
সেথা আহুতির কোথা সে পীঠস্থান
ধ্যান নিমগ্ন কোথায় সে মহাযোগী—?
সেথা কি এখনও শেষ আহুতির
লোহিত চিহ্ন আছে,
সেথা কি ফুটেছে অমরাবতীর
পারিজাত মালার ?

ব্যথা বেদনার সব্‌টু অব্‌টু
অতীত দিনের কত না মর্মকথা
জানাইবে তারা প্রাণের আবেগে মাগো।
মহাজীবনের বিচিত্র ইতিহাস
মর্মে মর্মে গাথা হয়ে রবে যেথা ;
মহা মহিমার মহিমান্বিতা
তুমি যে রাজেন্দ্রাণী,
প্রাণ-বিনিময়ে মহান আত্মা
যহা ভিক্ষুক ফিরেছ দ্বারে দ্বারে
অঞ্জলি পাতি দাঁড়াবে তব দ্বারে।

গান্ধী-অর্থনীতির গোড়ার কথা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যা ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ, ইহার মধ্যে মাত্র ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ সহরের অধিবাসী, বাকী ৩৩ কোটি ৯৩ লক্ষ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করিয়া থাকে। আগে ভারতের গ্রামগুলি শিল্পের দিক হইতে সমৃদ্ধ ছিল, ইংরেজ রাজত্বে বিভিন্ন কারণে এই সমৃদ্ধ কুটীরশিল্প ধ্বংস হইয়াছে। ইহার ফলে কৃষিজীবনের উপর উত্তরোত্তর চাপ বাড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দারিদ্র্য বাড়িয়া গিয়াছে। এখন এদেশে অশিক্ষিতের বেটুকু প্রসার হইয়াছে, প্রায় সবই হইয়াছে সহরে বা সহরতলী অঞ্চলে। সুতরাং ভারতের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী গ্রামে বাস করিলেও কৃষিকর্ম ছাড়া তাহাদের অধিকাংশেরই অন্ন সংস্থানের আর কোন উপায় নাই। এদিকে ভারতের কৃষিব্যবস্থা এখনও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পড়িয়া আছে। ভারতে সব কয়টি পুত্র মৃত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে বলিয়া জমি খণ্ডিত হইয়া যায় এবং কৃষিকার্য ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে। এ দেশে কৃষিকর্মও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় না। এইভাবে কতকটা জমির দোষে এবং কতকটা ব্যবস্থার অভাবে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের গড়পড়তা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পৃথিবীর অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশের তুলনায় অনেক কম। কাজেই ৩১ কোটি গ্রামবাসী গ্রামে বাস করিলেও গ্রামগুলি স্বভাবতঃই তাহাদের অন্নসংস্থান জোগাইতে পারে না। ইহার উপর আবার গরীব চাষীর ফসল উপভোগ বা বাজারজাত করার ব্যাপারে জমিদার, সমৃদ্ধ কৃষিজীবী, মাড়োয়ারী ও ব্যাপারীদের প্রবঞ্চনা এবং শোষণ আছে। ফলে ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী দারিদ্র্যের শেষস্তরে ক্রমান্বয়ে জীবনধারণে বাধ্য হয় এবং অভাবের তাড়নায় আত্মবিস্মৃতি ও হতাশাবোধের ভিতর দিয়া তাহাদের মনে নিদারুণ জড়তার সঞ্চার হয়। এই সব কারণে বিপুল সম্ভাবনায় অফুরন্ত প্রাণসম্পদ বৃথা নষ্ট হইয়া জাতীয় অস্থিমজ্জা হইয়া, তাছাড়া যাহাদের লইয়া সভ্যতার দেশ, তাহাদের মানসিক অধঃপতনের ফলে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের প্রাণশক্তিও ক্রমেই কমিয়া আসে। দুইশত বৎসরেরও অধিকাল ধরিয়া ভারতবাসীর বিদ্যাবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব জাহাইয়া বহির্জগতে ভারতবর্ষ যে সাম্রাজ্যেরই অধিকারী হউক, এইরূপ নিরুদ্যম, নিঃস্ব ও প্রাণধারণের সমস্যায় আজও গ্রস্ত ৩১ কোটি অধিবাসীর অস্তিত্বের গ্লানি তাহার অগ্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতের মত দাঁড়াইয়াছে। ভারতের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর যে কোন পুনর্গঠন পরিকল্পনায় এই

অসংখ্য দরিদ্র ও অসহায় দেশবাসীর কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে।

খুবই দুঃখের বিষয়, বিদেশী শাসনের আমলে ভারতবাসীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশের সমস্ত সম্পদের চাবিকাঠি মুষ্টিমেয় একটি বিত্তবান শ্রেণীর হাতে চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষ বর্তমানে যে অর্থনৈতিক পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে কোটি কোটি দরিদ্র-অভুক্তিতে সহানুভূতির ভারতবর্ষের কোন মর্যাদা বা অধিকার নাই। কুটিরশিল্প ও তাহার সমাজ কুটিরশিল্পের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে আর্থনিক পরিবেশে বড় বড় যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব হইয়াছে। মালিকত্বের মায়াবাদ (magic of proprietorship) দেশের সমস্ত অর্থব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জনসাধারণের নিতান্ত জীবিকার যাবতীয় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। দীর্ঘকালের একটানা দুর্নীতি ও অব্যবস্থার ফলই যে পরিস্থিতি এতটা শোচনীয় হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। শিল্পপতিরা এদেশে যে পণ্য উৎপাদন রীতি চালু করিয়াছেন, তাহাতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্যটুকু রক্ষার দিকেও নজর রাখা হয় না। এখনকার বাজার যদি লাভজনক মনে না হয়, ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্ন বড় করিয়া দেখিয়া পণ্যাভাবে এ দেশের কোন সত্তিয় প্রয়োজন শিল্পপতিরা অকাতরে বিদেশের বাজারে পণ্য পাঠাইয়া মুনাফা লুটিবার অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন। ফোটের উপর, দীর্ঘদিনের দুর্নীতি আর শাসন কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাকৃত উদাসীনতা বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতির চারিপাশে যে জবড় ধনতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার দ্রুত আমূল পরিবর্তন না ঘটিলে স্বাধীন ভারতে সাধারণ ভারতীয় নাগরিকের সহযোগে স্বাধীনতা ভোগের আশা স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা হইয়া যাইবে। ইংরেজ ভারতবর্ষকে আধুনিক পৃথিবীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করাইয়া দিবার কিছুটা গৌরব দাবী করিতে পারে সত্য, কিন্তু একথা ঠিক যে, ইংরেজের এই কীর্তি ভারতের জনগণের পক্ষে সুখের কারণ না হইয়া মর্মান্তুদের কারণ হইয়াছে। কৃষি ও কুটিরশিল্পের সাম্যালো ভারতের, বিশেষ করিয়া গ্রাম্য ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি অবশ্যই দৃঢ় ছিল। ইংরেজ সেই ভিত্তি চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আধিক ব্যয় সম্পূর্ণতায় উপযোগী বিকল্প কোন ব্যবস্থা স্থির করিয়া না দেওয়ায় আধুনিক জীবনের যাচ্ছন্দ্য ভারতের দারিদ্র্য বৃদ্ধিরই কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের এই কীর্তি ফলহীন বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থপর বেনিয়াবৃত্তির শোচনীয় ফল।

ভারতের জনগণের কল্যাণ সাধন মহাত্মা গান্ধীর জীবনব্রত। সত্যেরের ভিত্তিতে গ্রাম্য ভারতের দরিদ্র ও অসহায় এই ৩৫ কোটি নরনারীর অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির অভিপ্রায়েই গান্ধী-অর্থনীতির গোড়ার কথা।

বর্তমান পৃথিবীতে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাতে পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদ স্বাভাবিকভাবে অল্পসংখ্যক এক শ্রেণীর পরশ্রমজীবীর কুক্ষীগত হইতেছে, দরিদ্র পরশ্রমজীবী বা শ্রমজীবীদের সম্বল স্বাতন্ত্র্য এই ব্যবস্থায় স্বীকারই করা হয় না। শ্রমিক এখানে পণ্য উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র, এ যন্ত্রে তাহার আর কোন পরিচয় বা মর্যাদা নাই। মালিক নিজ স্বার্থেই তাহাকে কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দেয়। তাহাকে তাহার শ্রমশক্তির বাড়তি দামে মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া মুনাফাখোর মালিক সেই সম্পদে নিজের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তোলে। গান্ধীজী বৃহত্তর এই অসাম্য ও অন্যায় শোষণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অহিংসনীতি শুধু ইংরেজের সহিত যুদ্ধেই প্রযোজ্য নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল অন্যায়ের প্রশ্নেই তিনি এই অহিংসানীতির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। যেটুকু পরিশ্রম করিলে শ্রমিকের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত, শ্রমিককে তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা হয়। এইভাবে ধনতন্ত্রবাদের আওতায় ধনিক শ্রমিকের যে বাড়তি শ্রম বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া ফাঁপিয়া উঠে, ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তি সেই শ্রমশক্তির বাড়তি মূল্যের শোষণকে (Exploitation of the surplus value of human labour) তিনি কুৎসিত হিংসানীতির চরম পরিচয় বলিয়াছেন। ভারতের সনাতন জীবনাদর্শ হইতেছে—জাগতিক অভাববোধকে সীমাবদ্ধ করিয়া আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশে জ্ঞান সম্প্রসারণের চেষ্টা করা। গান্ধীজী এই জীবনাদর্শের ভিত্তিতেই ভারতীয় অর্থ-নীতিকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। যে শ্রেণীর মানুষই হউক,- মানুষ মাত্রেই তাঁহার চোখে সম্মানের অধিকারী। এই মানব মর্যাদাকে কেন্দ্র করিয়া গান্ধীজীর অর্থ নৈতিক আদর্শ বা পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে। মানুষের পরিশ্রমকে গান্ধীজী কখনও ছোট করিয়া দেখেন নাই। বিশ্বের দরিদ্র জাতীরা কায়িক পরিশ্রম করিয়া বহু কষ্টে জীবিকার্জন করে, সেই ধনকুবের বিড়লার রাজ-অট্টালিকার সহিত জাতীয়ের কুটীরও মহাত্মা গান্ধীর বাসগৃহের মর্যাদা পাইয়াছে। গান্ধীজীর ভাষায় পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাতেও অহিংসানীতির প্রবর্তন করিতে হইবে। ইহার অর্থ, মানুষকে এমনভাবে দেশের পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হইবে, যাহাতে পণ্য উৎপাদন পণ্যের প্রয়োজন এবং প্রকৃত ব্যবহারের সহিত সমতারক্ষা করিয়া চলে ; অর্থাৎ পণ্য যেন অধিকহারে ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন হয়, ইহা ব্যবসায়ীর বা মুনাফাখোরদের স্বার্থসাধনের উপায় হইয়া না উঠে। বর্তমানে দেখা যায়, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পণ্য প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও মানুষকে সেই পণ্য ব্যবহারে বঞ্চিত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে নিউইয়র্ক সহরের অসংখ্য শিশু যখন দুধের অভাবে দীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন বাজার চড়া রাখিবার জন্য মার্কিন দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা সহস্র সহস্র গ্যালন দুগ্ধ মিসিসিপি নদীতে ফেলিয়া দেয়। মানুষের প্রতি মানুষের এই মমতার অভাব লোভ হইতে জন্মায়। এই দুর্নীতিই গান্ধীজীর মতে হিংসাত্মক কার্য। শিল্প যদি কেন্দ্রীভূত না হয়, মুষ্টিমেয় অনেকজন শিল্পপতির হাতে অজস্র শিল্পপণ্য ঘটনের অধিকার যদি না থাকে, কৃষি ও কুটীরশিল্পের সত্যতার উন্নতি যদি হয়, অর্থাৎ একরকম পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে বর্তমান শোষণনীতি সম্পূর্ণ ভাবে না হইলেও যদি অনেকাংশে বিদূরিত

হয়, তাহা হইলে তাহারও তাহাকেও হিংসা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। 'বিয়ন্ড টু ফার' গ্রন্থে মরীয়ী এইচ জি ওয়েলস যথার্থই বলিয়াছেন যে, মানুষ আর উন্নতির নামে অস্থিরতা চায় না, এখন তাহার প্রয়োজন শান্তির, প্রয়োজন বিশ্রামের। জীবনের উদ্দেশ্য হইল সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকা। ওয়েলস তাঁহার 'দি রাইটস্ অফ ম্যান' গ্রন্থেও যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অপরাপর জীবনের প্রতি অসংখ্য মানুষের নিষ্ঠারুণ ঔদাসীন্য বর্ণনা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী মানুষের এই—সুখে স্বচ্ছন্দে সহজভাবে জীবনযাপন বড় করিয়া দেখিয়াছেন। এইভাবে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে, পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তাহা সম্ভব নয়। সমতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধনীরা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উপায়ে সর্বসাধারণের চলাফেরা ও কথাবলার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করে; সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কঠোর হয় বলিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা কতকটা বিসর্জন দিতে হয়, কিন্তু গান্ধীজীর পরিকল্পিত গ্রামরাজ্যে শক্তিমানের শোষণের কোন সুযোগ না থাকায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা রাষ্ট্রের পক্ষে কোন আশঙ্কারই কারণ হয় না। গ্রামরাজ্যে স্বাস্থিক পরিশ্রমের বিনিময়ে সকলকেই অন্নসংস্থান করিতে হইবে, সকলের প্রয়োজনই যথাসম্ভব বৈচিত্র্যহীন ও সীমাবদ্ধ হইবে, পাশ্চিব সম্পদ-প্রাচুর্য্যের চেয়ে স্বাস্থিক বিকাশ ও নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টিবোধ অনেক বেশী মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহা স্বীকার করিয়া লইতে একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও শিক্ষিত মন চাই। লোভ একপ্রকার পশুপ্রবৃত্তি, ইহা ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়। ব্যক্তিজীবনের অমঙ্গলকে স্বরূপ এই লোভকে কেন্দ্রীভূত ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্যই গান্ধীজী কতকগুলি গ্রামকে এক একটি একক হিসাবে ধরিয়া লইয়া সেই সব গ্রামের পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং সমগ্রভাবে গ্রামসমূহ পরিচালনার ভার জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত গ্রাম-পঞ্চায়েতের হাতে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছেন। যন্ত্রশিল্প বেকার-সমস্যার পোষক, গান্ধীজী ভারতের মত জনবহুল দেশে সমতার ভিত্তিতে সার্বজনীন কর্মসংস্থানের জন্য যন্ত্রশিল্পের সংকোচসাধন করিয়া কুটীর-শিল্পের সম্প্রসারণ কামনা করেন। গান্ধীজী বারবার বলিয়াছেন, শিল্প যা অর্থ দুইই মানুষের জন্য, মানুষ শিল্প অথবা অর্থের চেয়ে অনেক বড়। এই জন্য ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর সহজ সুন্দর জীবনধারা অব্যাহত রাখিতে গ্রামোদ্যম, কুটীরশিল্পের প্রসার, কৃষির উন্নতি প্রভৃতিকে গান্ধীজী তাঁহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিস্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া বা ক্যানাডার মত যে সব জনবিরল দেশে বেকারদের কর্মসংস্থানের সমস্যা নাই, সেখানে যন্ত্রশিল্পের প্রসার গান্ধীজীও অপরাধ করেন নাই। ভারতে সার্বজনীন কর্মসংস্থান একটা প্রকাণ্ড জটিল সমস্যা। (হরিজন, ১৬-১১-১৯৩৯) কাজেই ভারতের লাড়ে ছ লক্ষাধিক গ্রামকে আর্থিক হিসাবে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে তিনি খাদি আন্দোলনের ন্যায় কুটীরশিল্পের প্রসারের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কৃষিজীবী ভারত অন্ন উৎপাদন করে, কিন্তু অন্ন ছাড়া মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটি জিনিষ আছে। এই সব জিনিষের মধ্যে বস্ত্রের স্থান সর্বাগ্রে। এদেশে চাষী গৌণবৃত্তির অভাবে বৎসরে অন্ততঃ ছয়মাসকাল বেকার হইয়া বসিয়া কাটায়। কুটীরশিল্পের সম্প্রসারণ হইলে ইহাদের এই দুর্বহ বেকারবৃত্তির অনেকটা লোপ হয় এবং ইহারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলভাবে বাঁচিবার সুযোগ পায়। এই শিল্পপ্রসার অবশ্য ব্যয়-ও আয়োজনসাপেক্ষ এবং ইহার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকে লইতে হইবে। কুটীরশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে সহজভাবে যন্ত্র প্রসারিত হইবার সুযোগ আছে সুতা কাটা ও কাপড় বোনায়। অর্থকরী দিক ছাড়া স্বয়ং-সম্পূর্ণতার আদর্শের দিক হইতে কৃষিজীবী ভারতে খাদি আন্দোলনের বিপুল সার্থকতা আছে। গ্রাম্য ভারতের অধিবাসীরা অবসর সময়ে তুলা উৎপাদনের, সুতা কাটার এবং কাপড় বোনার চেষ্টা করিলে তাহাদের অন্নের ও বস্ত্রের অনেকটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। এদেশের লোকের জীবনযাত্রার যে মান, তাহাতে বৎসরে মাথাপিছু বুড়ি গজ করিয়া কাপড় হইলেই উপস্থিত মোটামুটি চলিয়া যাইবে। মিলের কাপড়ের চেয়ে খদ্দরের কাপড় কিছু কমই লাগে। গ্রাম্য ভারতের ½ অংশ লোকও যদি রুগ্ন, অক্ষম, বৃদ্ধ বা শিশু হয়, তাহা হইলেও বাকি লোক বৈনিক মাত্র একঘণ্টা হিসাবে বৎসরের এগারো মাস বস্ত্রোৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করিলে অর্দ্ধেক গ্রামের সব লোকের সম্বৎসরের কাপড়ের সমস্যা মিটিয়া যাইতে পারে। গান্ধীজীর প্রীতি-ভাজন শিষ্য ও ওয়ার্দ্ধার সেক্সারিয়া বাণিজ্য কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমান নারায়ণ অগ্রবাল তাঁহার 'The Gandhian Plan' গ্রন্থে (৭৩ পৃঃ) নানা সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব দিয়া এই কথা প্রমাণ করিয়াছেন। খাদি ব্যবহার জীবনযাত্রার সারল্যেরও পরিচায়ক। সুতরাং যদি খাদি উৎপাদনের ব্যাপারে গ্রামবাসী যত্নবান হয়, তাহা হইলে খাদি শুধু তাহাদের বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিবে না, উদ্বৃত্ত খাদি বিক্রয় করিয়া তাহারা দারিদ্র্যপূর্ণ কৃষিজীবনকেও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল করিয়া তুলিতে পারিবে।

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র সাধারণ ভারতবাসীর কথা আলোচনার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের কথাগুলি বলা হইল। সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন বিচার করিবার সময় গান্ধীজী বৃহদাকার মূলশিল্প এমন কি অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করেন নাই। ভারতবাসী সম্পর্কে যে সব কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহাও প্রধানতঃ গ্রাম্য ভারতের অধিবাসীদের স্বার্থের বা প্রয়োজনের কথা। ভারতের গ্রামগুলির অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা ও নোংরামি গান্ধীজীকে অবিরাম ব্যথিত করিয়াছে। গান্ধীজী বিশ্বাস করিতেন—গ্রামবাসীদের বা গ্রামের অবস্থা এরূপ খারাপ হইবার কোন কারণ নাই, সুযোগের অভাবে তাহাদের সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না। 'কনষ্ট্রাকটিভ্ প্রোগ্রাম' (গঠনমূলক পরিকল্পনা) পুস্তকে গ্রামের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্তমানে প্রকৃতির সহিত বুদ্ধিবৃত্তির যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে গ্রামের নোংরামি তাহারই অনিবার্য্য ফল। তাঁহার মতে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য যদি গ্রামের লোক হইত (এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক দিক হইতে-

স্বাভাবিক ছিল। এবং তাহারা গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য চেষ্টা করিত, তাহা হইলে গ্রামগুলির অবস্থা বর্তমানের ন্যায় শোচনীয় হইত না।

কেহ কেহ অর্থনীতির দিক হইতে বনেদ্যমবাদের সমর্থক এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তিতে সংগঠিত শ্রমিকসঙ্ঘের শত্রু হিসাবে গান্ধীজীর সমালোচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট লেখক ইন্দুক রবনী পামি দত্তও তাঁহার India-to-day গ্রন্থে এই দৃষ্টিকোণ হইতেই প্রকারান্তরে গান্ধীজীর নিন্দা করিয়াছেন। সমাজের স্বার্থসাধনের হিসাবে এইরূপ অসংযত ও অসঙ্গত উক্তি করিয়া হয়তো এই সব লোক লাভবান হইয়াছেন, কিন্তু গান্ধীজীর জীবনাদর্শ, প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগও তাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই গান্ধীজীর ন্যায় মানবদূত সম্বন্ধে এইরূপ বিকৃত মন্তব্যের অযৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। গান্ধীজী দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, বন্ধু ছিলেন অসহায় হতভাগ্যদের। দুঃখী দুর্ভাগাগ্রস্ত মানুষের নিকট-সান্নিধ্যে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়া গিয়াছে। কথায়, কাজে বা জীবনযাপন প্রণালীতে কখনও তিনি নিঃস্ব ও অসহায় দেশবাসীকে পরিহাস করেন নাই। তবে গান্ধীজী বৈবর্তনিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিতেন এবং ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়াই দেশে সত্যকার কিষাণ-মজদুর প্রজারাজের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তাঁহাকে কখনও দেশের সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আকস্মিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য উত্তেজিত হইতে দেখা যায় নাই। ধনীদের সম্পদ লুণ্ঠনের তিনি সব সময়ই ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ধনীরা বর্তমানের যত যৌগিক বৃত্তির সাহায্যে ধন সঞ্চয় করিয়া ফেলে একদিন না একদিন সর্বহারা শোষিতের দল ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিবে। স্বাধীন ভারতে ধনী দরিদ্রের ফারাকের একটি দিনের জন্যও স্থায়ী হইবে না, ইহাই ছিল গান্ধীজীর মত।*

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর গান্ধীজীর মৃত্যু হইয়াছে এবং মোটামুটি গান্ধীজীর নির্দিষ্ট পথেই এখনও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালনার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃত কিষাণ—মজদুর প্রজারাজ বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গান্ধীজীর সারাজীবনের স্বপ্ন সার্থক করিতে রাষ্ট্রকর্ণধারগণ অতঃপর কতটুকু কি করেন, তাহা এখন সাগ্রহে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

---

* The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the labouring class can not last for one day in a free India in which the poor will enjoy the same power as the richest in the land.

Gandhiji.—Constructive Programme, P 18.

সত্য ও অহিংসার মহাসাধক

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

সত্য শব্দের উৎপত্তি হ'ল সৎ শব্দ থেকে, যার অর্থ—অস্তিত্বশীল, বিদ্যমান বা নিত্য। একমাত্র সত্যই শুধু চিরন্তন, সত্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না, সমস্তই মিথ্যা। তাই সত্যই হ'ল ঈশ্বর বা ঈশ্বরই হ'ল সত্য। তবে ঈশ্বর সত্য হ'লেও, তিনি সত্য ছাড়াও আরও অনেক কিছু এবং তাঁর নামও অসংখ্য। মহাত্মা গান্ধী এই সত্যরূপী ভগবান সম্বন্ধে তাঁর আত্ম-কথায় তাই লিখেছেন—"পরমেশ্বরের বিভূতি অগণিত, তাঁর সংজ্ঞাও অগণিত। এই প্রকাশ আমাকে আশ্চর্য ও স্তম্ভিত করে, অগাধের জন্য মুগ্ধ করে। কিন্তু আমি সত্যরূপী পরমেশ্বরেরই পূজারী। এই এক সত্যই আছে, আর সব সকলই মিথ্যা।" এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন যে, এই সত্যলাভের জন্য তিনি তাঁর প্রিয় মতেও বা প্রিয় আচারও ত্যাগ করতে এবং সত্যসন্ধানরূপ যজ্ঞে তাঁর শরীরকে হোম করতেও তিনি প্রস্তুত। এই সত্যকেই তিনি আজীবন তাঁর পথপ্রদর্শক প্রদীপ জেনে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই সত্য সন্ধানের পথে তিনি চলেছিলেন বলেই, তাঁর ভয়ঙ্কর ভুলও তাঁর কাছে অতি ছোট বলে মনে হয়েছে এবং এই পথের জন্য তিনি ভুল করেও বেঁচে গেছেন। এই সত্য সম্বন্ধে বিশ্বের পর দিন তাঁর এই বিশ্বাসই বেড়ে গিয়েছিল যে, "কেবল সত্যই আছে, উহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনও বস্তু পৃথিবীতে নাই।"

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অতি শৈশবকাল হ'তেই এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। বাল্যে তিনি এক নাটক কোম্পানীকে একবার হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখেছিলেন। এই নাটকের উপাখ্যান তাঁর বালক মনের উপরেই এক গভীর ছাপ রেখে যায়। নাটক দেখে অবধিই তিনি নিজের মনে এই প্রশ্নই করেছিলেন যে, সকলে হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যবাদী হয় না কেন? তিনি নিজে সেই বয়সেই স্থির করে নিয়েছিলেন যে, হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বিপদে পড়ে তাঁরই মতন তিনিও সত্য পালন করবেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সত্যেরই সেবায় জীবন ব্যয় করে গেছেন। এর জন্য তিনি অশেষ লাঞ্ছনা, অপমান ও যন্ত্রণা ভোগ করতে, সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকারে, এমন কি মৃত্যুর জন্যও সন্তাপ-পর হন নি। তিনি বলতেন—মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আমি আর ভগবানের বিরোধিতা করতে পারি না। তাই তিনি সর্বদা বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব মানুষ মাত্রেরই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর

যেখায় যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেই সত্য থেকে বিচ্যুত হলেন না বলেই বিশ্বী সহরে তাঁকে জীবন দিতে হ'ল।

মহাত্মা গান্ধী যে আত্ম-কথা লিখেছেন, তার নাম দিয়েছেন তিনি "সত্যের প্রয়োগ।" নিজের জীবনকে তিনি সত্যের কষ্টিপাথরে ফেলে যাচাই করেছেন এবং তাতে তিনি কতটা উত্তীর্ণ হয়েছেন, তারই প্রকাশ দেখিয়েছেন এই আত্মকথায়। তিনি তাঁর দোষের কোনও কথা গোপন না ক'রে, অকপটে সবগুই মেলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"সত্যরূপ পায়ের পরীক্ষা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য, লোকটা কেমন—তাহা বর্ণনা করার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নাই।"

মহাত্মাজী রাজনীতিতে যে অভিনব আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, তারও নাম দেন "সত্যাগ্রহ"। কারণ তিনি বুঝেছিলেন—একমাত্র সত্য যেমন শাশ্বত, তেমনি সত্যের জয়ও অবধারিত এবং সে অপরাজেয়। মহাত্মার এই আন্দোলন ও এর মহান্ সাফল্য পৃথিবীর ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল অধ্যায়।

মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ কুড়িটা বছর সৌরবময় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালিয়ে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ফিরে এলেন ভারতে। পর বৎসর আমেদাবাদ শহরের নিকটে সবরমতী নদীর তীরে তিনি যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন, তারও নাম দিলেন—সত্যাগ্রহ আশ্রম। আর এই আশ্রমবাসীদের জন্য তিনি যে একাদশ ব্রতপালনের নির্দেশ দিলেন, তার অন্যতম দিলেন স্থান হইল "সত্যে"র।

সত্য-ব্রত পালনের মধ্যে মহাত্মাজী কেবল সত্যভাষণকে বুঝেছিলেন না। সত্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"এই সত্য শুধু সত্যবাদিতা নহে। ইহা যেমন বাক্য তেমনি বিচার সম্বন্ধেও সত্য। ইহা কেবল আমাদের কল্পনা লোকের সত্য নহে, পরন্তু স্বতন্ত্র স্বাধীন চিরন্তন সত্য অর্থাৎ পরমেশ্বর।" তিনি বলতেন—শুধু বাক্যে নয়, কাজে এমন কি চিন্তায়ও সত্যের স্থান থাকা চাই। তিনি আরও বলতেন যে, কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই যে সত্যের প্রয়োগ হবে তা নয়, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এর প্রকৃষ্ট প্রয়োগ করতে হবে এবং সেই সত্য পালনের জন্য জীবনপণে প্রস্তুত থাকতে হবে। একথাও অবশ্য তিনি বলেছেন যে, সত্য বলতে গিয়ে অনেক সময়ে অপ্রিয় সত্যেরও সম্মুখীন হতে হয়। সে ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব বিনয়ের সঙ্গেই তার প্রকাশ করা উচিত। কারণ সত্য যে তাকে প্রকাশ করতেই হবে, তাকে ত আর বিকৃত করা চলে না। তবে কারুকে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত দেবার উদ্দেশ্য না নিয়ে অপ্রিয় সত্য বলার মধ্যেও যে কোন দোষ নেই একথা বলা যেতে পারে।

সত্যের যাঁরা পূজারী তাঁদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—সত্যের অনুসন্ধান যে করতে চায় তাকে ধূলিকণার চেয়েও নিচু হতে হবে। জগৎ ধূলিকণাকে পিষে ফেলে, কিন্তু সত্যের পূজারী যদি এমন দীন না হয় যে, ধূলিকণা তাকে পিষে ফেলতে পারে, তবে তার পক্ষে স্বতন্ত্র সত্যের দর্শন দুর্লভ।" বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানে এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। খৃষ্টান ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মেও এ বিষয়ের প্রমাণ আছে।

পৃথিবীতে ধর্মের পার্থক্য থাকলেও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সর্বধর্মেই এই সত্যের প্রয়োগ ও প্রচার অপরিহার্য। এমন কি যারা নাস্তিক তারাও সত্যের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারে না। পৃথিবীর সকল ধর্মগুরুই তাঁদের ধর্মে তাই সত্যের প্রচার করেছেন। হিন্দুধর্মে ত সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরম্ বলে ব্যাখ্যাই করা হয়েছে ভগবানের। তাছাড়া সত্যের প্রয়োগ ও প্রয়োগে হিন্দুশাস্ত্র তুলনা ; খৃষ্টধর্মের প্রচারক যীশু তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন—Ye shall know the Truth and the Truth shall make you free (John viii 32) তোমরা সত্যকে জানবে, তাহলে সত্যই তোমাদের মুক্তি দেবে। যীশু সত্য সম্বন্ধে আরও বলেছিলেন যে, To this end was I born and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. (John xviii 37) এই উদ্দেশ্যেই আমি জন্মেছি এবং এই কারণেই আমি পৃথিবীতে এসে এসেছি যে, আমি সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করব।

বুদ্ধও তাঁর ভক্তদের ধারণাতীত জন্য যে "আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ" বা আট প্রকার পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, তার মধ্যেও সত্য অন্যতম।

মহাত্মা গান্ধী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বড়দিনে মাঠ তাঁরেখের হারজনে তাঁর নিজের জীবনে সত্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—পৃথিবীকে আমি নূতন কিছুই শেখাই নি ; আমি আমার নিজস্ব উপায়ে, আমার দৈনন্দিন জীবনে এবং আমার বহুবিধ সমস্যায় শাশ্বত সত্যের প্রয়োগ করেছি মাত্র। সত্য ও অহিংসা এরা পৃথিবীতে আমির পর্বতের তায়ই সুপ্রাচীন। আমি যা কিছু করেছি, যতটা সম্ভব এদের মধ্য দিয়েই করার চেষ্টা করেছি।

মহাত্মা গান্ধী বলতেন—সত্য উপলব্ধি বা ধর্মের প্রকৃষ্ট পথ হ'ল অহিংস সাধনায়। কেন না অহিংসা বর্জিত সত্য, সে ত সত্যই নয়, সে মিথ্যারই সামিল। মহাত্মা গান্ধীর আচার্য কৃপালনী লিখিত "দি গান্ধীয়ান ওয়ে" পুস্তকের মুখবন্ধে নিজে লিখেছেন যে, তিনি সত্যের সন্ধানে থাকার কালে অহিংসারূপ রত্নকে লাভ করেন। এরপর থেকে তিনি সত্যের সঙ্গে সঙ্গে অহিংসাকেও তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। অহিংসা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—সকল ধর্মেরই প্রাণকেন্দ্র হ'ল অহিংসা এবং এই অহিংসার পরিণতিই হচ্ছে সত্য লাভ। তাই অহিংসাও সত্য ছাড়া কিছু নয়। তিনি উপমা দিয়ে বলতেন—সত্য আর অহিংসা এরা যেন, একটা রাশহীন মসৃণ ধাতু নির্মিত থালার এপিঠ আর ওপিঠ, এবং এরা এমনি একই ফলকের যে এদের পৃথক করা কঠিন। মহাত্মার কাছে তাই সত্য ও অহিংসা একটা যমিজ সম্পর্কযুক্ত, দুটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু মোটেই। তাঁর কাছে সত্য ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং অহিংসা ছিল তারই পথ।

এই যে অহিংসা, মহাত্মাজীর মতে এর মূলসূত্র হ'ল প্রেম। অহিংসার সরলতম অর্থ যে, শুধু হিংসা না করা, এই অর্থে তিনি অহিংসা গ্রহণ করেন নি। কেননা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, বেঁচে থাকার জন্য মানুষ কিছু না কিছু হিংসা করতে বাধ্য। তাছাড়া সে বাঁচতে পারে না। তাই মহাত্মাজী বলেছেন—জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য

হিংসাকে ত্রাণ করাই হ'ল অহিংসা। চিন্তা, বাক্য এবং কাজের দ্বারায় কাকেও অপ্রয়োজনে কষ্ট না দেওয়া—সেই ত অহিংসা। মহাত্মাজী বলছেন—হিংসা এমন কি হত্যাকাণ্ডও, অনেক সময় অহিংসাই সাধিত, অবশ্য যদি সেটা প্রেমপ্রসূত হয়। এর উদাহরণস্বরূপ ইয়ং ইণ্ডিয়াতে তিনি এক সময়ে লিখেছিলেন—Should my child be attacked by rabies and there was no helpful remedy to relieve his agony I would consider it my duty to take his life." আমার কোন সন্তান যদি জলাতঙ্কে আক্রান্তহয় এবং তার যন্ত্রণা উপশমের ও জীবনের যদি আর কোনও উপায় না থাকে, তখন তার জীবন নাশ করাই আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

এক সময়ে মহাত্মার আশ্রমে একটি বাছুর এক কঠিন রোগে পড়ে এবং তার জীবনের কোন লক্ষণ থাকে না, অথচ বেচারা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। তখন মহাত্মা বাছুরটির শরীরে বিষের প্রয়োগ ক'রে তাকে যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়ে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এইভাবের প্রেমমূলক হিংসা বা হত্যাকে মহাত্মা আদৌ দোষের বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে যাদের নিশ্চিত মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে অথচ অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, তখন তাদের শান্তিময় মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দেওয়াটা ঠিক হিংসা নয়।

এছাড়া বিশেষকালীন কর্তব্য হিসাবেও মহাত্মা গান্ধী কয়েকটি ক্ষেত্রে হিংসাকে সমর্থন করেছেন। যেমন—সমাজের ক্ষতিকারক পাগলা কুকুর, দেশের বীজাণু বাহক ইঁদুর, ম্যালেরিয়াবাহী মশা, বংশনোদ্যত সাপ, আক্রমণ করতে আসছে এমন যে বাঘ প্রভৃতিকেও তিনি হত্যা করার কথা বলেছেন। এমন কি মানুষের ক্ষেত্রে পরে গিয়ে তিনি বলেছেন—যদি এমন হয় যে, একজন হত্যাকারী কোনও লোককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, অথচ সেই হত্যাকারীকে কোনওরূপে প্রতিনিবৃত্ত করা যাচ্ছে না, তখন তাকে হত্যাকরা ছাড়া উপায় কি? এ ছাড়া তিনি আরও বলেছেন যে, যদি হনুমানে কিংবা বাঁদরে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করতে থাকে, তখন তা মেরিয়ে বা হিংসার পথ অবলম্বন করে, তাদের ক্ষেত থেকে তাড়াতে হবে এবং কোন পাগল ব্যক্তি যদি পাগলামি করতে থাকে, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে তার সঙ্গে হিংসার পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হতে হবে।

এই সব ব্যাপারগুলোকে মহাত্মা ঠিক হিংসার মধ্যে ধরেন নি। কারণ এর মধ্যে কোন মন্দের গন্ধ তিনি পান নাই, বরং মঙ্গলেরই সন্ধান রয়েছে বলে এদের সমর্থন করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী তাই বলেছেন যে, অহিংসার মূল সূত্রটা হবে ভালবাসা। এইদিক থেকে অহিংসাপন্থীর কোন শত্রুই থাকতে পারে না, কারণ যারা তার শত্রুতা করতে চেষ্টা করবে, তিনি তাদের নিজে পরিণত করবেন ভালবাসার দ্বারায়। মহাত্মা বলছেন—শত্রুকে আঘাতের বদলে আঘাত না দেবে, তাকে প্রেম ও ভালবাসার দ্বারাতেই জয় করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনব্যাপী অহিংসা সাধনায় সকল ক্ষেত্রেই প্রেমের প্রয়োগ দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি সারা জীবন ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছেন, ইংরাজকে তিনি কোনদিনই শত্রু ভাবেন নি, বরাবরই তাঁদের মিত্র বলে ভেবেছেন। জীবনে বহু লোকের হাতে তিনি অপমান, কিল, চড়, গদাঘাত ও লাঠি খেয়েছেন, কিন্তু কারও উপরে তিনি কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন নি, সকলকেই ক্ষমা-সুন্দর হাসিতে মার্জনা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সেদিন ভারতের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ঘোর দুর্দিনে তিনি যখন শান্তি অভিযানে বাহির ছিলেন, তখন সঙ্কীর্ণ মনোভাব নিয়ে যারা ব্যক্তিভাবে তাঁর উপরে বোমাক্রোপ করেছিল তখনও তাঁকে একথা বলতে শুনেছি—যাঁরা আমার উপরে বোমাক্রোপ করেন, তাঁদের হাতে যদি আমার মৃত্যুও হয় তবু যেন তাঁদের অমঙ্গল কামনা না করি, ভগবান আমাকে এরূপ মানসিক শক্তি দিন।

মহাত্মার মৃত্যুর ১০দিন পূর্বে নয়া দিল্লীতে তাঁর প্রার্থনা সভায় এক উগ্র-সাম্প্রদায়িক উন্মাদ মহাত্মাকে লক্ষ্য ক'রে বোমা নিক্ষেপ করেছিল। তার সম্পর্কে মহাত্মা পরদিন তাঁর প্রার্থনাস্তিক ভাষণে বলেছিলেন—যেই এরূপ করে থাক, আমি তার মঙ্গল কামনা করছি। পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলকে এ কথাও আমি বলে দিয়েছি যে, যুবকটিকে যেন কোন রকম উৎপীড়ন করা না হয়। তাকে বুঝিয়ে সৎ পথে আনার চেষ্টা করাই উচিত।

তার পর মৃত্যুর দিনে মহাত্মা আততায়ীর হস্তে গুলিবিদ্ধ হ'য়ে তাঁর ইষ্টদেবতা রামকে শুধু ডাকার সময় ছাড়া, সংজ্ঞাহীন না হয়ে আর একটু যদি সময় পেতেন, তাহলে যীশু যেমন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুকালে তাঁর পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে তাঁর হত্যাকারীদের জন্য প্রার্থনা করে বলেছিলেন—"Father forgive them, for they know not what they do." পিতা, এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না যে এরা কি করছে—মহাত্মা গান্ধীও তেমনি মৃত্যুকালে তাঁর আততায়ীর জন্য যীশুর মত শুধু ক্ষমাই চাইতেন না, অধিকন্তু তার মঙ্গলও কামনা করে যেতেন।

আজ হতে প্রায় তিন হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধ এমনিভাবেই ভারতের পুণ্যভূমে প্রচার করেছিলেন—

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।

ইহ জগতে শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা কখনই শমন করা যায় না। পরন্তু শত্রুতা শূন্যতা (অক্রোধ) দ্বারাই একে শমন করা যায়। ইহাই সনাতন ধর্ম।

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং।

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করবে, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করবে।

বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলতেন—ডাকাত ও হত্যাকারীরা যদি করাত দিয়ে তোমাদের শরীর খণ্ড বিখণ্ড করতে থাকে এবং তাতে যদি

তোমরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠ, তা হ'লে বুঝব, তোমরা আমার আদেশ ঠিক মত পালন করছ না।

বুদ্ধের মহানির্বাণের বহু বৎসর পরে ভগবানের প্রিয় পুত্র, মানুষের ত্রাণকর্ত্তা, ক্ষমার অবতার যীশু এই পৃথিবীতে নেমে এসে আর একবার প্রচার করেছিলেন—

"Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth,

"But I say unto you, that you resist not evil; but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also.

"And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also.

"And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain."

তোমরা শুনে আসছ, বলা হয় থাকে যে, একটা চোখের বদলে একটা চোখ এবং একটা দাঁতের বদলে একটা দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদের বলব,—মন্দে প্রতিরোধ ক'রো না, এবং কেহ যদি তোমার ডান গালে চড় মেরে, তবে তাকে অপর গালটিও পেতে দিও।

কেহ যদি তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করে এবং তোমার কোটটি নিয়ে যায়—তা হলে তাকে তোমার চাপকানটাও দিয়ে দিও।

কেহ যদি তোমাকে এক মাইল যেতে বাধ্য করে, তাহলে তার সঙ্গে তুমি দু মাইল যেও।

যীশুর এই ক্ষমাধর্ম প্রচারের বহু শত বৎসর পরে, বুদ্ধ ও যীশুর জন্মভূমি যেন-একটি যোগে রক্ত পরিগ্রহ ক'রে আবার এই ধরণীর বুকে "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধী এসে অবতীর্ণ হলেন এই পাপপঙ্কিল পৃথিবীতে। সত্যাশ্রয়ী ভগবানের মহাসাধক, অহিংসা ও ক্ষমার পরম পূজারী, যোগেশর এই মহামানব আজিকার এই হিংসা ও বিদ্বেষের পৃথিবীর ঘনান্ধকার পথকে, সত্য ও অহিংসার অনির্বাণ মশাল হস্তে আলোকোজ্জ্বল ক'রে গেলেন, আর একবার নতুন ক'রে।

গান্ধী-স্মরণে

শ্রীমতিলাল দাস

ভক্ত যারা, আসুক যারা, শুনেছি ও তাদের বাণী
যুগে যুগে আর্ত ধরার বিধাতারি বার্ত্তাবহ
আসেন যদি বন্ধুরূপে রক্ষাকবচ অঙ্কে আনি
গান্ধী ছিলেন সে দূত ধরার তাও প্রতি আজকে নহ।
জীবনে যা হয়নি সফল মরণে তা আজকে হবে
জগৎ ছেয়ে প্রাণে প্রাণে জাগবে তোমার প্রেমের সীতা
মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ। সবাই তোমার মন্ত্র লবে।
আসবে ফিরে আবার ধরে হারিয়ে যাওয়া আপন সীতা।
যেন মানবের জন্ম হবে, তোমার মতন সাধনাতে,
পশু মানুষ উঠবে জাগি মৃত্যু তব মন্ত্র শুনি
জগৎ জুড়ি যন্ত্র দৈত্য সে মহিমার কাছেতে
মৃত্যু তোমার হয়নি ক্ষতি, মরণজয়ী তুমি গুণী।
যুদ্ধ বুদ্ধ পারেন নি যা পারেন নি যা পার্থসখ
এবার তোমার আত্মবলি করবে তাহা করবে সাধন
মহামিলন প্রেম যাগের যোগন আজি হবে সুরু
শত যুগের লক্ষিত সব কাটবে আঁধার ঘুচবে বাঁধন।
প্রণাম লহ জগৎ গুরু, আজিও যেন জগৎজনে
অভিশপ্ত মানুষেরে রক্ষা কর অভয় দানে
তোমার জীবন গীতাখানি যেন আজি মৃত্যুপথে
জগৎ প্রাণি লাভবে জ্যোতি সত্য প্রেমের উজল ভাবে।

করিও মার্জ্জনা

শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

জীবনের প্রতি কর্ম্মে তোমারে করেছি অস্বীকার
কেন মিথ্যা শোকোচ্ছ্বাস তবে, কেন এই বৃথা আয়োজন?
হিংসা পাশে আজন্ম অন্ধ মানুষের বাসি মাই ভালো,
বিষারেছি ঘরেরের বায়ু, নিভায়েছি বিধাতার আলো।
তুমি যে দিয়াছ ডাক বারে বারে মোদের দুয়ারে
সেই নাই কোন সাড়া, বারে বারে ফিরেছি ফিরারে।
একেলা কণ্টকময় পথে চলে গেছ বান্ধবিহীন
মানুষের করেছ বিশ্বাস হৃদয় রেখেছ শঙ্কাহীন।

তুমি ছিলে অমানিশা মাঝে একমাত্র ধ্রুবহীন শিখা
তোমার অহিংসা বাণী একমাত্র আশার বর্ত্তিকা।
নিতে গেল সে মঙ্গলদীপ মানবের বিষাক্ত ফুৎকারে
নিশীড়িত হাহাকারে আকাশ আকাশ ভরিল চাহাকারে।
সে মানব সে কি পর? সে আমার, সে সবার পাপ
মোদের পুঞ্জীভূত হিংসা রচিয়াছে এই অভিশাপ।
মিতে হবে প্রতি ভবে জনে এই মহাপাতকের ভার
ঘুচাইতে হবে এ কালিমা, ক্ষমাহীন কলঙ্কের ধার!

হে অমর মুক্ত আত্মা, আমাদের করিও মার্জ্জনা
অন্তরের দ্বেষ করো দূর, পূর্ণ করো সব আবর্জ্জনা।

গান্ধীজীর প্রয়াণ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

খৃষ্টপূর্বের মতই গান্ধীজীর জীবনান্ত হইল। প্রভেদ এই যে, খৃষ্টপূর্বে ভগবান যে আত্মিক ক্লেশের ভিতর দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইলেন, গান্ধীজীর বেলা তাহা করেন নাই। গান্ধীজীকে অকস্মাৎ লইয়া যান এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পর্যন্ত অবকাশ দেন না।

লোক জিজ্ঞাসা করে—কে তাঁহাকে গুলি করিয়াছে—সে ধরা পড়িয়াছে কিনা, কোন দেশের লোক, ইত্যাদি। আক্রমণকারী ধরা পড়া না পড়ায় আমাদের আর কোন প্রয়োজন? তবে সে যে হিন্দু এইটুকু জানার বড়ই মূল্য আছে। ভারতবর্ষের হিন্দুদের আত্মপরীক্ষার পক্ষে উহা সহায়ক হইবে।

গান্ধীজীকে কোনও মানুষ হত্যা করিয়াছে ইহা স্বীকার করিতে পারি না ও পারিব না। মরণ বাঁচন ঈশ্বরের হাতে। যখন গান্ধীজীকে এই শরীর ত্যাগের প্রয়োজন শেষ হইল, তখনই তিনি তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন—গান্ধীজীও 'হে রাম' বলিয়া আমন্ত্র-লোকে প্রয়াণ করিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে লইয়াছেন। যাহার হাত দিয়া লইয়াছেন—তাহার পাপ পূর্ণ হইয়াছিল, সে যে সমাজের, সে সমাজের পাপ পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই ঈশ্বর এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাবার বেলায় গান্ধীজীর জীবন ও মৃত্যু সার্থক করাইয়া ভগবান তাঁহাকে লইয়াছেন।

গান্ধীজী সর্বকালের সর্বদেশের সর্বসম্প্রদায়ের নিজস্ব লোক। হিন্দুর হাতে তাঁহার পবিত্র শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ঈশ্বর প্রমাণ করাইয়া দিলেন যে গান্ধীজী মুসলমানদের কত হিতকারী ছিলেন। সন্ত্রাসকারীর ব্যামোহিত মনোবৃত্তি দেশের ভিতর কি প্রতিক্রিয়া করিতেছে তাহারও প্রমাণ হইয়া গেল। মাত্র বর্ষ পূর্বে হিন্দুসভার তখনকার সভাপতি সন্ত্রাসকার মহাশয় মুসলমান আগমন করিয়া হিন্দু-মুসলীম ঐক্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তিনি ও তাঁহার দল হিংসা দ্বারা হিংসার উত্তর দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসবান। গান্ধীজী বরাবর হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীর কথা বলিতেছিলেন, তদনুযায়ী চলিতেন, ইহা প্রতিহিংসাপরায়ণদের বরদাস্ত করা কঠিন হইত। মুলতানে এক বড় অধিবেশনে সন্ত্রাসকার মহাশয় বলেন যে, হিন্দু গাই, মুসলমান বাঘ। এই দুইয়ের ঐক্য তখনই হয়—যখন গাই বাঘের পেটে যায়। যে মনোভাবপ্রসূত: এই উক্তি করিয়াছিলেন উহা ব্যামোহিত। উহা প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত একটা সম্পর্কই স্বীকার করে—উহা হইতেছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে খাইয়া ফেলিতে হয়। সেই ব্যামোহ, ভারতবর্ষের কতকের মনোভাব যে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছে গান্ধীজীকে হত্যা করাই তাহার প্রমাণ। এই মনোভাব হইতে ভারতবর্ষ মুক্ত হউক, জগত মুক্ত হউক—গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ আমাদের সকলকে কল্যাণের পথে লউক। হানাহানি বন্ধ হউক।

যেভাবে গান্ধীজী অতর্কিতে আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন তাহাতে দুঃখের তীব্রতা অবশ্যম্ভাবরূপে দেখা দিয়াছে সত্য, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় গান্ধীজীর জন্য ঈশ্বর শ্রেষ্ঠতম মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন। গান্ধীজী যে অহিংস নীতির পূজারী, ঈশ্বরই তদনুরূপ তিনি জাতি, ধর্ম ও দেশ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সমান প্রেমপরায়ণ ও কর্তব্য-পরায়ণ। তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই। কিন্তু প্রাকৃত লোক ভেদ চায়। ভেদ নাই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেনা। আর যখন দেখে কার্যতঃ ভেদ নাই এইভাবে ব্যবহার চলিতেছে, তখন তাহা বরদাস্ত করিতে পারেনা। গান্ধীজী যাহাই বলুন আর যাহাই করুন—তিনি মুসলমানদের পক্ষ, এই বিশ্বাস সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে হিন্দুদের সম্প্রদায়ের ছিল। তিনি একই কারণে হিন্দুর বিশ্বাসভাজন ছিলেন। হিন্দুরা বলিত তাঁহার একদেশদর্শী মুসলীম-প্রেমবশতঃ তিনি হিন্দুদের প্রতি অন্যায় করিতেছেন ও হইতে দিতেছেন। ফলে কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, কি হিন্দু, কি মুসলীম তাঁহাকে পক্ষ করিতে পারেনা। অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান যে কংগ্রেস, তাহারও অনেক সভ্য ঐ কারণেই গান্ধীজীর বিরোধী ছিলেন।

গান্ধীজী মৃত্যু দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন সৎ পথ কি, মৃত্যুর দ্বারাই তাঁহার উক্তির সত্যতা প্রমাণ দিয়াছেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িক মিথ্যুকতার বলিস্বরূপ তাঁহাকে হিন্দুর হাত দিয়া হত্যা হইতে দিয়া বিধাতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, হিন্দুদের কৃষ্ণীর গর্বের মূল্য ততটুকু এবং মুসলমানদের নিকট প্রমাণ করাইয়াছেন যে মুসলমান তাঁহার কত আপন। এই ভাবে হিন্দুর হাতে, হিন্দুর গুলিতে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণ যে গেল ইহা বিধাতারই ইচ্ছা। তাঁহার প্রিয় ভক্তকে তিনি এই গৌরবময় মৃত্যু পথে নিজের নিকট টানিয়া লইয়াছেন। এই হেতু বলিব যে, গান্ধীজীর পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠতম সম্মান যাহা বিধাতা তাঁহাকে দিয়াছেন। তাঁহার জন্য শোক করার নাই। রাজা দশরথের মৃত্যুতে গুরু বশিষ্ঠ যাহা ভরতকে বলেন তাহা স্মরণ করার যোগ্য—

মৃত্যু সবার আগে প্রকল এ লিখি কেহউ ঘুচিনাথ।
হানি লাভু জীবনু মরণু জসু অপজসু বিধি হাথ।

হে ভরত, শোন। ভবিতব্যতা প্রবল আর সবই ক্ষতি, জীবন মরণ, ভাল মন্দ, এ সকলই বিধাতার হাতে।

অস বিচারি কেবি দেইয় দোষু।
ব্যরথ কাহি পর কীজিয় রোষু।
তাত বিচার করহ মন মাহীঁ।
সোচজোগ দসরথু নৃপু নাহীঁ।

এই কথা বিচার করিয়া কাহাকে আর দোষ দেওয়া যায়, হিন্দু

কাহার উপর রাগ করা যায়, যে ভাত, মনে মনে ভাবিয়া দেখ, রাজা দশরথ শোকের যোগ্য নহেন।

সোচিয় বিপ্র জো বেদবিহীনা।
তজি নিজ ধরমু বিষয় লয়লীনা॥
সোচিয় নৃপতি জো নীতি ন জানা।
জেহি ন প্রজা প্রিয় প্রাণসমানা॥

যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানশূন্য ও নিজের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করিয়া বিষয়-ভোগে ডুবিয়া আছে, সে শোকের পাত্র। যে রাজা রাজধর্ম অনুসারে চলে না, যাহার কাছে প্রজা প্রাণের সমান প্রিয় নয়, সেই রাজা শোকের যোগ্য।

সোচবীয় নহি কোসলরাউ।
ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ॥
ভয়উ ন অহই ন অব হোনিহারা।
ভূপ ভরত জস পিতা তুম্হারা॥
বিধি হরি হর সুরপতি দিসিনাথা।
বরনহিঁ সব দসরথ গুন গাথা॥

কোশলরাজ ত শোকের যোগ্য নহেন। চৌদ্দ ভুবনে তাঁহার প্রভাব প্রকাশিত আছে। হে ভরত, তোমার পিতার মত রাজা হয় নাই, হইবেও না। বিষ্ণু শিব ইন্দ্র ও দিকপালগণ সকলেই দশরথের গুণগান করেন।

সব প্রকার ভূপতি বড়ভাগী।
বাদি বিষাদ করিয় তেহি লাগী॥
এহ সুনি সমুঝি সোচু পরিহরহু।
সির ধরি রাজরজায়সু করহু॥

সকল রকমেই রাজা বড় ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁহার জন্য দুঃখ করা মিথ্যা। ইহা বুঝিয়া শোক ত্যাগ কর, রাজাজ্ঞা মাথায় হইয়া রাজত্ব কর।

গান্ধীজী জীবিতকালে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যে মৃত্যু পরম বন্ধু, মৃত্যু সর্বতাপহারী, মৃতের জন্য শোক কেবল বুদ্ধিপ্রসূত। যে এই দুঃখময় সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছে সে এযাবৎকার মত দুঃখের পরপারে গিয়াছে। তবে আর শোক কেন।

আমরাও গান্ধীজীর মৃত্যুতে শোক করিব না। বরঞ্চ তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিব তিনি এত অতর্কিতে গেলেন কেন? তিনি তো যাইতে চাহেন নাই। দিল্লীতে উপবাসের পূর্বে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া মৃত্যুই চাহিতেছিলেন। কিন্তু উপবাস কালে সর্বত্র হইতে যে প্রেম পাইয়াছিলেন, আত্মপ্রসাদিক মনোভাব উৎপন্ন হওয়ায় যে নির্বৃতি পাইয়াছিলেন, তাহাতে আনন্দিত হইয়া গান্ধীজী বলেন যে তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি বাঁচিতে চাহেন—পূর্ণ পরমায়ু ভোগ করিতে চাহেন—১২৫ বৎসর যখন পর্যন্ত তিনি বাঁচিয়া থাকিয়া জনসেবা করিতে চাহেন। তবে কেন বিধাতা তাঁহাকে লইলেন, কোথায় ত্রুটি ছিল। ত্রুটি যদি আমাদের মধ্যেই থাকে তবে সে ত্রুটি কি তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করা, জানা ও পরিহার করা দরকার।

নোয়াখালীতে পা দিয়াই গান্ধীজী আমাদ দিয়াছিলেন যে, তিনি নোয়াখালীর ও পূর্ব-বঙ্গের স্থায়ী বাসেন্দা হইয়া গেলেন। তিনি ১৯৪৬ সালের নবেম্বরে যখন আসেন তখন কলিকাতা, কুষ্টিয়া, গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, লাকসাম প্রভৃতি স্থানে সমবেত জনতাকে এই কথাই বলিতেন যে একটি হিন্দু বালিকাও যতক্ষণ বিপন্নে চলা ফেরা না করিতে পারিতেছে ততদিন তিনি এদেশে থাকিবেন। তারপর ছাইখোলা গ্রাম হইতে ১৯৪৭ সালের ২রা মার্চ এই বলিয়া বিহারে যান যে তিনি তিন সপ্তাহে ফিরিবেন। অদৃষ্টে যাত্রা হইল। তিনি আর ফিরিলেন না। কিন্তু এই সত্যসন্ধ ঋষির বাক্য মিথ্যা হয় না। গান্ধীজী যখন জীবিত ছিলেন তখনো তিনি মনোজগতে নোয়াখালীতেই বাস করিতেছিলেন, ইহার সাক্ষ্য আমি দিতে পারি। আজ অপরীরী গান্ধীজী অবশ্যই নোয়াখালীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন ও আমাদের কৃতি লক্ষ্য করিতেছেন এবং আমাদের প্রত্যেক সৎ চেষ্টার প্রতি পূর্বের ন্যায় তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

তিনি নোয়াখালীতে পা দেবার পূর্ব হইতেই হিন্দুদের ছোট বড় আলাদা এলেকা করার প্রস্তাব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হইতে আসিতেছিল—কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের পক্ষ হইতে ও হিন্দুসভার পক্ষ হইতে। অন্যথায় ইহারা স্থানান্তর গমনের পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধীজী এই ধারণার বিরুদ্ধ মত জানাইয়া আসিয়াছেন। তিনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে এক এক দল লোকের সম্প্রদায়গত ভাবে কোনও গভর্নমেণ্ট করিতে দিতে পারেন না, দিলেও উহাতে শান্তি রক্ষা হইবে না—অশান্তিই বাড়িবে। আর বাসেন্দার অদল বদল করা—সে তো গবর্নমেণ্টই করিতে পারে। সেজন্য দুই গবর্নমেণ্টের মধ্যে আলোচনা করিয়া যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার এবং সে কাজ নিষ্পন্ন করা খুবই কঠিন।

তাহার এই উপদেশ বেদবাণী শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। যাহারা হিন্দু পকেট বা জিলার মণ্ডল গঠন করিতে চায় তাহারা যে হিংসার পথেই চলিতেছে তাহা গত কয়েক মাসের ঘটনায় ও শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকে হত্যা করা দ্বারা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আর যাহারা বাসেন্দা অদল বদল চাহেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে বাসেন্দা অদল বদল নয়, বাসেন্দা নির্মূল করাই হইতেছে। তথাপি সকলকার দৃষ্টি সাফ হয় নাই।

গান্ধীজীর তরফ হইতে একই আবেদন নোয়াখালী ও পূর্ব-বঙ্গবাসীর নিকট ছিল, সে হইতেছে তাহারা মরণ পণ করিয়া সম্মান রক্ষা করিবে এবং কোনও ক্রমেই নিজ বাস্তু ত্যাগ করিবে না।

শিক্ষিত সম্প্রদায় বাস্তু ত্যাগ করিতেছে, ধনী সম্প্রদায়ও করিতেছে। নোয়াখালী হইতে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ ধীর ও স্থির গতিতে চলিতেছে। যে যাইতেছে সে যে সন্দেহে করিতেছে সে

জান তাহার আলা আবশ্যক। সমাজ-স্রোত এই জন্য যে সে নিজে নিকট আত্মীয় লইয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু সমাজের অপর যাহারা রহিল তাহাদের অবস্থা ইহাতে আরো খারাপ হইতেছে।

আজ গান্ধীজী শরীরে আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহার জন্য শোক না করিয়া আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার যে আমাদের এই সমাজ-স্রোতিতাও কি তাঁহার মৃত্যুর জন্য দায়ী নহে!

তিনি তো আরো ৫০ বৎসর বাঁচিতে চাহিয়াও, আমাদের দুর্বলতায় পীড়িত হইয়া মৃত্যু কামনা করিয়াছেন এবং আমার সাধারণের পরিবর্তিত মনোভাব দেখিয়া, সেবা করার অবকাশ পাইবার আগ্রহে পুনঃ জীবাণু লাভ করার সংকল্প লইয়াছেন। "অবশেষে আমাদের অবহেলায় তাঁহাকে মৃত্যুর কোলেই ঠেলিয়া দিয়াছি।

নোয়াখালির হিন্দু মুসলমানের আজ ঐক্য বদ্ধ হইবার জন্য সংকল্প দৃঢ় করার দিন। হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা বর্জন স্বীকার করার এই তো দিন—আর যাহারা নোয়াখালীতে অগ্নির মনে আছেন, চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াও নিজ বাস্তু ত্যাগ না করার সংকল্প সওয়ার দিন। এইরূপ করিয়াই আমরা গান্ধীজীর পুণ্য স্মৃতি তর্পণ করিতে পারি।

গান্ধী-ভক্তদের কর্ত্তব্য

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দত্ত

মহাত্মা গান্ধী মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার মতন লোকের কিছু লেখা ধৃষ্টতা। তাঁর গুণাবলীর অনেক আলোচনা হচ্ছে। আমার মনে হয় তাঁর কথা লিখবার বা বলার এখনও সময় হয় নাই। আমাদের ভবিষ্যৎবংশীয়েরা—কত বৎসর পরে জানিনা—গান্ধীজী কি ছিলেন এবং জগতের উপর তাঁর প্রকৃত প্রভাব কি বুঝতে পারবে। বর্ত্তমান কালের লোকেরা যদি তাঁকে বুঝতে ও চিনতে পারতেন তবে আর ৭৯ বৎসর বয়সের বৃদ্ধকে স্বাধীন ভারতের রাজধানীতে আততায়ীর হাতে এ ভাবে জীবন বিসর্জন দিতে হ'ত না।

বর্ত্তমানে গান্ধীজীর গুণপনার আলোচনা না ক'রে এই গত ২৭ বৎসরে ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক খেলা চলেছে, তাতে যাঁরা কম বেশী ভাগ নিয়েছেন এবং যে ভাবে বর্ত্তমানের স্বাধীন ভারত রূপ নিয়েছে এবং ছোট বড় কর্ম্মী ও দেশবাসী যে দুঃখ, দুর্বিপাক, কি অসুবিধা ভোগ করেছেন তাদের নিজেদের চিত্তবিশ্লেষণ করে দেখাই আজ সব চেয়ে দরকার এবং দেশের ভবিষ্যতের পক্ষেও তাহা প্রয়োজনীয়।

১৯২০ সালে মহাত্মাজী যখন জাতিকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জন্য আহ্বান করেন, তখন বুঝে না বুঝে অনেকেই তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। যদিও সে আন্দোলন মুখ্যতঃ স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন ছিল তথাপি তিনি বলেছিলেন "My movement of non-violent non-co-operation is essentially a movement for self purification." আমি জানিনা ছোট বড় অসংখ্য কর্ম্মীর মধ্যে কতজনের মনে এই কথা কটী স্থান পেয়েছিল এবং সেই ভাবে ভাবিত হয়ে কতজন তাঁদের চিন্তা ও কার্য্য সেই পথে চালিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। মনে হয় খুব মুষ্টিমেয় লোকই গান্ধীজীর এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন। বর্ত্তমানে স্বাধীনতা লাভের পর দেশের চতুর্দ্দিকের অবস্থা, বড় বড় কৃতী বলে পরিচিত কর্ম্মীদের লোভ, কামনা-লোলুপতা এবং চতুর্দ্দিকের মলিনতা দেখে ইহা বড়ই মনে হয় আমরা গান্ধীজীর নেতৃত্ব পাবার অধিকারী ছিলাম না। শুধু হাওয়ার সঙ্গে তাল দিয়ে নিজেকে ও দেশকে ভুল বুঝিয়েছি যে আমরা গান্ধীজীর অনুগত দেশপ্রেমিক। এর চরম পরিণতি আজ যেন বিরাগ, সর্ব্বত্র হাহাকার এবং আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজীর মৃত্যু এবং সমগ্র পৃথিবীর নিকট ভারতবর্ষ বিশেষতঃ হিন্দু ভারতবাসীর অধঃপতনের কালিমাময় চিত্র উদ্ঘাটন।

যাহা হবার হয়েছে। তা নিয়ে আর বেশী বলার প্রয়োজন নাই।

তবে এই চিত্রের পরও কি আমরা আমাদের ভুল বুঝেছি? আজও কি আমরা সকলে আত্মবিশ্লেষণে প্রস্তুত আছি? কেন এমন হল? হাজার হাজার বৎসরের কৃষ্টির অধিকারী ভারতবাসী আমরা —আজ আমাদের এমন অধঃপতন কেন হল? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা নিজের নিকট দাখী করতে প্রস্তুত আছি কি? এবং এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য নূতন করে সর্ব্বরকম ত্যাগ স্বীকার করেও অতীতের ভুল ত্রুটী স্বীকার করে নূতন ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হতে প্রস্তুত আছি কি?

এই প্রশ্নের যথাযথ সন্তোষজনক উত্তর এবং কার্য্যক্ষেত্রে নূতন উদ্যমে অগ্রসর হলে বুঝব, গান্ধীজী জীবনে আমাদের মনে যে রেখাপাত করতে পারেন নাই মৃত্যু দ্বারা তাতে সফল হয়েছেন।

আমি আশাবাদী। যে মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে জন্মেছিলেন এবং নিজ আচরণ দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে কর্ত্তব্য পথ দেখিয়েছেন, তাঁর পুণ্যফল যেন একদিন পাবেই এ বিশ্বাস আছে। কিন্তু বর্ত্তমানের ঘন অন্ধকারে বর্ত্তমান ক্ষমতা অধিকারীদের দ্বারা ইহা কতদূর অগ্রসর হবে এ বিষয়ে দুর্ব্বল মনে সন্দেহ আসে। তবে সর্ব্বোপরি শ্রীভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছায় সব যেন ঠিক যাবে, এই ভরসা নিয়ে থাকাই সেরা মনে করি।

'বাপুজী' আখ্যার যৌক্তিকতা

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি

মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার আশ্রমবাসীরা 'বাপুজী' বলিয়া ডাকিতেন, 'বাপু'র অর্থ পিতা বা জনক। তাঁহার মৃত্যুর পরে আরও অনেকে তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করেন এবং অনেকে তাঁহাকে ভারতীয় জাতির বাপু বা পিতাও বলেন। এই কথার যাথার্থ্য আছে কিনা কোন কোন ব্যক্তির মনে সন্দেহ হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এই সন্দেহের কোন কারণ থাকে না। আমাদের নিজেদের পিতারা আমাদিগকে জন্ম দেন, কিন্তু অধি যাচনা ও টানাহেঁচড়ি উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়া যাইবার চেষ্টা করেন এবং আমাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া জ্ঞানদানের চেষ্টা করেন। এই দিক দিয়া যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে গান্ধীজীকে ভারতীয় জাতির পিতা বলা অযৌক্তিক হইবে না, বরং উহা সত্যই হইবে।

গান্ধীজী আমাদের কাছে তাঁহার এক বিরাট ভাবধারা আদিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সত্য ও প্রেমের দিব্য স্রোতে স্নান করিয়া চলিতে পারিলে আমরা সংসারের নানা আবর্তের মধ্যদিয়া প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পাইব। ভারতীয় পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সত্যকার জ্ঞান জন্মিবে, মানবজাতির উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব এবং তদনুযায়ী চলিতে পারিলে মানবসমাজকে উন্নতস্তরে লইয়া যাইতে পারিব। জাতির এই পিতা যে আমাদিগকে শুধু ঐ শাশ্বত ভাবধারা দিয়া কান্ত হইয়াছেন তাহা নহে তিনি আমাদিগকে এক বিরাট দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পিতারা দুই পাঁচ বিঘা বা দুইশত পাঁচশত বিঘা জমি দিয়া পরলোক গমন করেন। এই পিতা আমাদিগকে কোটি কোটি বিঘাওয়ালা এই ভারতবর্ষ দিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কুমারিকা, পশ্চিমে পাঞ্জাব, পূর্বে আসাম। কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত; উর্বর ও অনুর্বর ক্ষেত্রে এই দেশ পরিশোভিত। কত ভাষা কত ধর্ম, কত আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ লইয়া এই দেশ। এই বিরাট দেশ তাঁহার নিকট হইতে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি। এই সম্পত্তিকে রক্ষা করিতে হইবে, ইহার পালন বা সেবার ভার আমাদের হস্তে। হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে এই রকম হওয়া সম্ভব হয় নাই। এই দেশকে এখন পরিচালন করিতে হইবে—গড়ে করিতে হইবে, জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হইবে। এতবড় বিরাট সম্পত্তি কোন্ পিতা আমাদিগকে দিতে পারেন? কাজেই মহাত্মা গান্ধীকে এই জাতির 'বাপুজী' বা জনক বলা অসঙ্গত নয়। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, স্মরণে রাখিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট পথে চলিতে পারিলে তাঁহার সন্তান এই জাতি ধন্য হইবে।

ভগবান আমাদিগকে সেই শক্তি দিন এবং বাপুজী আমাদের আশীর্বাদ করুন।

মহাপুরুষ

নিরুপমা দেবী

লক্ষ লক্ষ পাপ আজে আসি এ ধরায়
হিসাব মাগি আমি অন্ত
পঙ্কিল আবিলতা ক্ষুব্ধতা হীনতায়
স্বার্থ খুঁজিয়ে নিজ পন্থ!
তবুও তাহারি মাঝেও অসীম পুণ্যাই
মুছে নিলে যে পাপ অপথ্য
তোমার চরণধূলি স্পর্শ লভিয়া এই
মর্ত্যের ধূলি হল ধন্য!
অন্ধ মানব যবে ধন্ধ করিয়া মরে
রক্ত লোলুপ তার দৃষ্টি
হিংস্র পুলকে মাতি পথে পথে ঘরে ঘরে
প্রান্তিতে চাহিবে শুধু সৃষ্টি।
মানবের মানবতা জাগারে তুলিলে যেই
পশুতা লুকাল কোথা বল।
তোমার চরণ যুগ স্পর্শ লভিয়া এই
মর্ত্যের ধূলি হল ধন্য!
তিক্ত গরল পানে জর্জ্জর এ ধরা
ভুলেছিল অমৃতের সত্তা
নিত্য রক্ত স্নানে কি দিবস কি রজনী
ডুবে ছিল মোহঘুমঘোরা।
ধ্যানীর মানস লোক স্বর্গ যে এখানেই
তাই শুধু দেখাবার জন্য
তোমার চরণ যুগ স্পর্শ লভিয়া এই
মর্ত্যের ধূলি হল ধন্য!

বাপুজী

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

শুধু ভারতের নহে, পৃথিবীর এক সঙ্কটময় মুহূর্তে বাপুজী আমাদের ছাড়িয়া গেলেন। ইহা অত্যন্ত আকস্মিক, অভাবনীয় ও বিয়োগান্ত ঘটনা। তিনি কেবল জাতির পিতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয়দের অকৃত্রিম বন্ধু এবং পথপ্রদর্শক। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনিই আমাদের বিজয়ী করিয়াছেন। একটি পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের পক্ষে হিংস্র পন্থাই একমাত্র পন্থা নহে ইহা তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর সকল স্বাধীনতাপ্রিয় মৌলিকত্বের তিনি 'অহিংস-সত্যাগ্রহরূপ এক নূতন অস্ত্রের সন্ধান দিয়াছেন। সুতরাং ভারতবর্ষ তাঁহার জন্ম দেওয়ার আধিক্যভাবে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক যে তিনি তাঁহার প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার মতে পূর্ণ স্বাধীনতা হইতেছে 'স্বরাজ' যাহার মূখ্য লক্ষ্য কিষাণপ্রজা-মজদুররাজের স্থাপনা। ভারতের এবং পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্ত সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁহার পরিকল্পনা ছিল অহিংসপন্থায় ভারতে এমন এক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করা—যেখানে কেহ খুব বড় বা কেহ খুব ছোট থাকিবে না এবং যেখানে কেহ কাহাকেও শোষণ করিবে না। সুতরাং এই দিক হইতেও তিনি মানুষকে এক নূতন পথের সন্ধান দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে অত্যন্ত অসময়ে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। তিনি ছিলেন সকলেরই বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী, কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা আগ্রহ দৃষ্টি ছিল ভারতের হরিজন এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর। কেবল ভারতেরই নহে, পৃথিবীর সংখ্যালঘু জাতিগুলির শুভাশুভের প্রশ্নের সম্বন্ধেও তিনি নিজেকে ব্যগ্রভাবে জড়িত রাখিতেন। আধুনিক জগতে তিনি শান্তি, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার চেষ্টার ত্রুটী ছিল না এবং ইহাতে যে কোনও ত্যাগস্বীকারে তিনি কার্পণ্য করেন নাই। ইহার জন্যই তিনি বন্ধুবান্ধব আত্মজন অনশন পর্যন্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন। নোয়াখালি, বিহার, কলিকাতা বা দিল্লী সর্বস্থানেই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি মানুষে মানুষে ঘৃণা ও হানাহানি দেখিয়া এক মহান আত্মার কী বেদনাবোধ। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এমন এক মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি জীবনদান করিয়া গেলেন যাহা তাঁহার নিকট ছিল স্বাধীনতালাভেরই ন্যায় প্রিয়। তাহা হইল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। আমি অন্তরস্থিত আশা ও বিশ্বাস রাখি যে তাঁহার ন্যায় শহীদের রক্ত বৃথা যাইবে না এবং ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিকতার ভিত্তিতে আজকের এই সংঘাতময় বর্বর পৃথিবীতে এক নূতন যুগের সূচনা করিবে।

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

জীবনটা নয় জীবন যাপন মৃত্যুটা নয় জীবন অন্যায়
বেঁচে থাকা সেথায় ভয়ে, জীবন কারে সেইটা জোঁয়ায়।
বাঁচতে হবে বাঁচার মত অপর সবাই বাঁচবে যাতে
বর্ম নেব বুকের জিনিস চিত্ত পূত প্রার্থনাতে।
নিজের অধীন স্বাধীনতা, নিজেই নিজের অভাব মোচন
পেটের ভাত আর পরার কাপড় সাধ্যমত সমুৎপাদন।
রক্তশোষা বাহুড় সহর পল্লী যেন শোষার ভয়ে
ব্যবসাদারের ব্যবসাদারীর, ধনীর ধনের সৌধগড়ে।
সৌধ ভাঙ্গি ধনের ভাঁড়ার বাইরে টেনে আনতে হবে
সব সমাজের বিষয় কেতন বিশ্ব জুড়ে উড়বে তবে।
পল্লী প্রধান এই যে ভারত, পল্লী যাহার বুকের কাঁপন
পল্লী যদি সচেতন না হয়, স্বাধীনতা মুখের ভাষণ।
ভেদ না হলে ভিত না মিলে, কংগ্রেসটা নয় ভেদের সাক্ষি
ভাঁওতা দিয়ে লোক ভুলানো দুষোগ বুঝে কাজের হাসি।
সত্য যদি কংগ্রেসী হও তোমার জীবন সেথায় ভয়ে
এগিয়ে চল অহিংসা ও সত্য প্রেমের প্রদীপ হয়ে।
সহর ছেড়ে প্রবেশ কর অন্ধকারে পল্লী তথায়
কথাতে নয় কাজের দ্বারা বোঝাও তোমায় যা বোঝাবার।
অহিংসা নয় অস্ত্র ভীরুর, বীর যে সে এর অধিকারী
ঈশ্বরেরই সৃষ্টি জগৎ যা করি সব করা তাঁরই।
বিষাণী এর মর্ম বুঝে কর্ম করে গীতার মতে
ভক্ত যে পায় শক্তি বুকে হত জীবন ত্যাগের ব্রতে।
মানুষ মানুষ ভেদে সবাই ভেদ কিছু নাই তোমার আমার
খাব সবাই পরব সবাই বাঁচব সবাই ডাকব তাঁহায়।
অভাব সবার মোচন হবে দুঃখ হবে দীন মূর্তি মিত্র
শাসিত আর শাসক একই শরীর মাথা বিভিন্ন নয়।
রামরাজত্ব স্থাপন করা তোমার আমার সবার হাতে
এস কে মোর অনুগামী কর এ হয় সফল যাতে।
অত্যাচারীর খড়্গ যেথায় সহ্যের সেথায় তুমি
মুক্তি কিনে আনিয়ে দিলে নিপীড়িতের মর্মভূমি।
অন্ধকারের নাশিক তুমি শক্তি তুমি মোদের বুকের
তোমার পথে চলব মোরা যদিও পাব স্বর্গ লোকের।"
তোমার জীবন তোমার বাণী—তুমিই বাণীর মূর্তি যদি
তবে তোমার মরণ তোমার? তবি তোমায় প্রণাম করি।

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সিপাহী অভ্যুত্থানের মধ্যে রূপায়িত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে। ঐ বৎসরই ১লা নভেম্বর তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় নানাবিধ পরিবর্তনের বিষয় সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই অভ্যুত্থানের পর হইতে তাঁহাদের ভারত-শাসনের নীতি পরিবর্তিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভারতীয়দিগকে ইংরাজগণ তখন হইতে বিশেষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের সময় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া সেই সম্প্রীতি দূরীভূত করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করাই ইংরাজদিগের প্রধান লক্ষ্য হইল। তদুপরি চলিল নানা আইন রচনা করিয়া ভারতীয়দিগের স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিবার পথে নানা অন্তরায় সৃষ্টির প্রয়াস। এইভাবে লর্ড লিটনের আমলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে Vernacular Press Act বিধিবদ্ধ করিয়া দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে Arms Act প্রণয়ন করিয়া অনুমতি ব্যতীত ভারতবাসীর পক্ষে অস্ত্ররক্ষা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভারতীয়দিগের অপমানের চরম হইয়াছিল এই লর্ড লিটনের শাসন-কালেই। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি দিল্লীর দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের অধিরাজ্ঞী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ইহার ফলে, কার্য্যতঃ বৃটিশ অধিরাজত্ব স্বীকার করিলেও যে সকল দেশীয় নৃপতি শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়া এতদিন বিজয়রাজা বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাঁহারাও একরাত্রের বৃটিশের অধীন সামন্ত নৃপতিতে পরিণত হইলেন।

কিন্তু ভারতবাসীদিগকে দমিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয়দের মনে নূতন জাতীয় প্রেরণার সঞ্চার হইতে লাগিল। সিপাহী অভ্যুত্থানের আমলে যে চেতনা ও বিক্ষোভ কেবলমাত্র সিপাহী, রাজ্যচ্যুত নৃপতি এবং প্রতিপত্তিবিহীন ভূস্বামী ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী ও ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—তাহা বিস্তারলাভ করিতে আরম্ভ করিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য ছাত্র-সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশময় একটা জাতীয়তাবোধ ও আত্মসম্মানবোধ যেন ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইহা ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীতে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব আমরা দেখিতে পাই। সময়ের প্রয়োজনেই যে এই সকল বিরাট পুরুষের আবির্ভাব এবং উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। এইভাবে আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—রাজনীতিবিদ্ হিসাবে আনন্দমোহন বসু, ডব্লিউ. সি. বনার্জি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল—সাহিত্যিক হিসাবে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিকে পাইয়াছিলাম। বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয়। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে অপর নেতৃবৃন্দ তো ছিলেনই। তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইতে লাগিল।

লর্ড রিপনের আমলে এতদ্দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে ইউরোপীয়দিগেরও বিচার করিবার অধিকার দিবার প্রস্তাব করিয়া ইল্‌বার্ট বিল উত্থাপিত হয়। এই ন্যায়সঙ্গত বিলেরও বিরুদ্ধে কিন্তু ইউরোপীয়-সম্প্রদায় তীব্র আপত্তি উত্থাপন করিলেন—কেননা, ভারতীয় বিচারকের নিকট আসামী হইয়া উপস্থিত হইতে তাঁহাদের দারুণ লজ্জা ও অসম্মান। শেষ পর্য্যন্ত বিলটি পরিত্যক্ত হইল। ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়গণের প্রবল ঘৃণা ও অবিশ্বাস ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলন উপলক্ষে প্রকটিত হইল।

যাহা হউক, অসন্তোষ ও অভিযোগ প্রকাশিত হইবার ন্যায়সঙ্গত পন্থাগুলি নানা বিধিনিষেধের দ্বারা রুদ্ধ হইলে চতুর্দ্দিকে গুপ্ত অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে লাগিল। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হইলে গুপ্ত-আন্দোলনের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী আশঙ্কা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ এ. ও. হিউমের পরামর্শ ও উদ্যোগে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি হইল। ইংরাজি শিক্ষার প্রসার দ্বারা ভারতীয়দিগকে বৃটিশভক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্কালেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে মেকলে ও তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিংয়ের চেষ্টায় তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পর বৃটিশ অনুপ্রপুষ্ট একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নাগরিকের উদ্ভব ঘটাইবার জন্য ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট ও ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। মিঃ হিউম ছিলেন লর্ড ক্যানিংয়ের বন্ধু। তিনি দেখিলেন, যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় ইংরাজ-শাসনের মহিমায় মুগ্ধ না হইয়া বরং ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হইতেছে। সুতরাং ইংলণ্ডেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রকাশ্য সভায় আবেদন-নিবেদনে রত একটি নীতিবদ্ধ আন্দোলনকারী নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মতান্ত্রিক দল হিসাবে মিঃ হিউমের চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি হইল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিণের শাসনকালে।

নব প্রতিষ্ঠিত এই কংগ্রেসের দ্বারা কিন্তু দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভ করিল না এবং দেশের সমস্যা সমাধানকল্পে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও কংগ্রেসের পরামর্শ গ্রহণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কংগ্রেসের দাবিত্ব ও কর্ত্তব্যও কেবলমাত্র অভিনয় মোক্ষারের জানায় বৃটিশের নিকট আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সমাপ্তিলাভ করিতে লাগিল। দেশের শিক্ষিত চরমপন্থী সম্প্রদায় ইহাতে বিরক্ত ও ধীরপ্রস্থ হইয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্য পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা যে পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন—সে পথ ছিল হিংসার।

রক্ত দান এবং রক্ত গ্রহণই যে স্বাধীনতার সাধনা। চরমপন্থীরা অবশেষে তাহাই সেই পন্থাই অনুসরণের সঙ্কল্প করিলেন। গোখেল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, যে ভারতে ইংরাজগণের অনুসৃত নীতিতে হিংসার উদ্ভব হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে গুপ্ত-হত্যার সূত্রপাত হইল।

মরাঠার বংশে জন্ম বিপ্লবী এই বিপ্লবীর দল জানিতেন, যে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের দ্বারা তাঁহারা বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া মাতৃ-ভূমির বন্ধনপাশ মোচন করিতে সক্ষম হইবেন না। তথাপি যে পররাজ্য-লোলুপ সাম্রাজ্যবাদের ধমনীসমূহ ভারতীয় জনমতকে প্রতিপদে লাঞ্ছিত ও পদদলিত করিয়া অবাধ প্রভুত্ব বিস্তারের দ্বারা রাজ্য শাসন করিতেছে, তাহাদিগকে খানিকটা শিক্ষা না দিয়াও তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না। হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। দেশ-প্রেমিকদের ক্ষুব্ধ চিত্ত ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইল আংশিক সান্ত্বনা। আবেদন-নিবেদনের শোচনীয় ব্যর্থতায় তাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ত্যাগ করিলেন।

ইংরাজগণের কূট রাজনীতিও ইত্যবসরে সক্রিয় হইয়া উঠিল। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর হইতেই ভারতীয় সমাজ-শরীরে সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। এই প্রচেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সাফল্যও লাভ করিল। কারণ পরাধীন দেশে এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে বিদেশ বেগ পাইবার কথা নয়। এই কারণেই মুসলমানদিগকে অযথা সুবিধা দেওয়া আরম্ভ হইল এবং নূতন বিধি অনুযায়ী সভাসমিতির সম্মুখে হিন্দুর বাজনাও নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। একদল মুসলমানও ধীরে ধীরে ইংরাজদের দিকেই আকৃষ্ট হইলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" রচনাকালে হিন্দুদের মনে মুসলমান বিদ্বেষ এই কারণেই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ কর্তৃক "প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েসন" নামে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল। ইহার পর ১৮৮৩ সালে বোম্বাইয়ে হিন্দু-মুসলমানে বাধিল দাঙ্গা এবং রক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রে হিন্দুদের মনে বৃটিশ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হইল তিক্ত মনোভাব। মহারাষ্ট্রের পুণা নগরীতে চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন মহারাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয়। মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ তাঁহাদের মধ্যে ছিল পূর্ণরূপে প্রকাশমান। পেশোয়াগণের উদ্ভব হইয়াছিল এই চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠী হইতে এবং নানা ফাড়নবীশ, তিলক, গোখেল, রাণাডে, পরাঞ্জপে, চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় ইত্যাদি বহু বিজ্ঞ রাজনীতিবিদই ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। ইংরাজগণ স্বভাবতঃই এই ব্রাহ্মণ-সমাজের সহিতই লড়াই করিয়া মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ইংরাজ-বিদ্বেষ এই দেশপ্রেমিক ব্রাহ্মণ বংশের অস্থি-মজ্জায় বর্ত্তমান ছিল এবং তাঁহারা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর নীতি ও কর্ম্ম-পন্থার বিশ্বাসবান। শিবাজীর আদর্শ লইয়া পুণা, বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও নাসিক ইত্যাদি স্থানে ধীরে ধীরে বহু সমিতি ও মেলার উদ্ভব হইতে লাগিল। ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতেই মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব মহা ধুম-ধামের সহিত উদ্‌যাপিত হইতে আরম্ভ হইল। গণপতি উৎসবে লাঠি, তলোয়ার, বর্শা, বন্দুক ইত্যাদি লইয়া এক-একটি শোভাযাত্রা বাহির হইত। ১৮৯৫ সাল হইতে ছত্রপতি শিবাজীর জন্ম ও রাজ্যাভিষেক উৎসব অতিশয় আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার এবং মন্ত্রশক্তির সাধন এই সকল উৎসবে গ্রহণ করা হইত। বৃটিশ বিদ্বেষমূলক পুস্তিকা ও গান প্রচার এই সকল উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সীতার উদ্বিগ্নচিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ বিপ্লবীদিগকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইত। ম্যাজিনী ও গ্যারিবল্ডীর ইতিহাস এবং আয়র্ল্যাণ্ড ও রাশিয়ার গুপ্ত-বিপ্লবান্দোলন তাঁহাদিগকে নিত্য কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ।

বাসোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামক পুণার সম্ভ্রান্ত চিৎপাবন ব্রাহ্মণ দুই ভ্রাতা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান-অপসারণ-সমিতি" নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। অবদমনের মৈথিক ও মানসিক উন্নতি বিধান এবং অস্ত্র-সাহায্যে শত্রুদের বিনাশ করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল আদর্শ। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারই উৎসাহে এই সমিতি কর্তৃক ১৮৯৫ সাল হইতে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে প্লেগ দেখা দিল মহামারীরূপে। এই মহামারীকে উপলক্ষ করিয়া সরকারী ও সামরিক কর্ম্মচারীরা দুষ্টলোক অত্যাচার-অত্যাচার আরম্ভ করিল—যাহার ফলে অবলাধারণের চিত্ত হইয়া উঠিল বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। প্লেগ নিবারণকল্পে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত প্লেগ কমিটির সভাপতি ছিলেন মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেঃ আয়ার্ট ছিলেন ঐ কমিটির একজন সদস্য। ইহাদেরই সৈন্যগণ উক্ত কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবার সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা ছিল একেবারে লোকাচার ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সম্পর্কে মহিলাগণের লাঞ্ছনা ও অবমাননার বিষয়ও শুনা যাইতে লাগিল। হাইকোর্টের জজ রাণাডে মহাশয় এই সকল অনাচার ও অত্যাচারের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিলাতে গোখেলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্য

বিষয় জন্য গোখলে ও দীনশা ইদলজী ওয়াচা তখন বিলাত গিয়াছিলেন। রাণাডের প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া গোখলে বিলাতে কতকগুলি অভিযোগের বিবরণ সাধারণ্যে প্রচারিত করিলেন। তাহার ফলে ভারতের বৈদেশিক শাসন-শক্তি তাঁহার উপর হইলেন রুষ্ট এবং গোখলে জাহাজযোগে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা স্থির হইল। গোখলে ও ওয়াচা যখন ভারতের পথে এডেনে উপনীত হইলেন, তখন কোনও হিতৈষী ব্যক্তি পূর্বাহ্নেই ওয়াচাকে গভর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ওয়াচা ও গোখলে পরামর্শ করিয়া তখন রাণাডের পত্রগুলি করিলেন অগ্নি-দগ্ধ; কারণ ঐরূপ না করিলে ঐ তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে রাণাডেকেও জড়িত হইয়া পড়িতে হইত। তাঁহাদের জাহাজ অতঃপর যখন বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিল, তখন পুলিশের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্রটি স্বীকারের দ্বারা গোখলে পরিত্রাণ পাইলেন। ক্রটি স্বীকার না করিয়া তাঁহার উপায় ছিল না; কারণ রাণাডের পত্রগুলি অগ্নি-দগ্ধ করিতে হওয়ায় অভিযোগ প্রমাণের সকল তথ্যই নষ্ট হইয়াছিল।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তখন মহারাষ্ট্রের সর্বজনপূজ্য নেতা এবং তাঁহার সম্পাদনা ও পরিচালনায় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "কেশরী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বহু উত্তেজনাপূর্ণ রচনা ইহাতে স্থান পাইত এবং অল্পকাল পরে স্বদেশ-উৎসাহনের বিষয়ে জনসাধারণকে ইহা উৎসাহিত করিত। প্রকৃতপক্ষে তখন "কেশরী" পত্রিকাই চরম ও বিপ্লব-পন্থীদের মুখপত্র-স্বরূপ। ঐ পত্রিকাখানি বিপ্লবীদের সকল কাজেই সমর্থন জানাইত।

১৮৯৭ সালে প্লেগের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের অনাচারের মাত্রা যখন তীব্র হইয়া উঠিল, তখন প্লেগ রেগুলেশনের অত্যাচার লইয়া "কেশরী" পত্রিকায় চলিতে লাগিল উহার কঠোর সমালোচনা। উহাতে লিখিত হইল,—"নগরে নর-রূপী প্লেগের অত্যাচার অপেক্ষা প্লেগ আমাদের নিকট বহুগুণে উত্তম।" ঐ সালেরই জুন মাসের ১৩ই তারিখে তিলকের সভাপতিত্বে যে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে তিলক এক উদ্দীপনাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করিলেন। উক্ত উৎসব ও সভার বিবরণ ১৫ই জুনের "কেশরী"তে প্রকাশিত হইল এবং লিখিত প্রবন্ধে সকলকে দেশের শত্রু-নিধনকল্পে শিবাজীর আদর্শ অনুকরণ করিতে আহ্বান জানান হইল। প্রকৃতপক্ষে ইহা বৃটিশেরই বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান।

ইহার কয়েকদিন পরেই অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। ২২শে জুন, ১৮৯৭। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বীরক জুবিলীর আয়োজন হইল। বড় বড় নগরগুলি হইল রাত্রিকালে আলোকমালায় সজ্জিত। উৎসবানুষ্ঠানের পর বোম্বাইয়ের লাট তখন হইতে মিঃ র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ট সাহেব রাত্রিকালে যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকারের হস্তে তাঁহারা দুইজন প্রাণ হারাইলেন। দামোদর চাপেকার কর্তৃক বোম্বাইয়ে অবস্থিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তর মূর্তিটিও আলকাতরা লেপনে বিকৃত হইল।

আদালতে অভিযুক্ত হইয়া দামোদর চাপেকারের দুইজন প্রাণদণ্ড। "কেশরী" পত্রিকায় ১৫ই জুনের প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তিলকের দেড় বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। এই সকল আন্দোলনে লিপ্তি থাকার সন্দেহে পুণায় বাটুলাতৃদ্বয়ও নির্বাসিত হইলেন।

১৮৯৮ সালে শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপের সম্পাদনায় "কাল" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকা এবং "বিহারী" নামে অপর একখানি মাসিক পত্রিকা রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হইল।

ইহার পর ১৮৯৯ সালে পুণায় চীফ কন্‌ষ্টেবলকে হত্যা করিবার জন্য যে চেষ্টা করা হইল—তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। গোয়েন্দাগিরি করিয়া যে দুইটি ভ্রাতা দামোদর চাপেকারকে ধরাইয়া দিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহারা অকস্মাৎ নিহত হইল। এই সকল হত্যাকাণ্ডের ফলে চাপেকারভ্রাতৃদ্বয় প্রতিষ্ঠিত সমিতির চারিজন সভ্যের হইল ফাঁসি ও একজনের হইল দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহের কয়েক বৎসর পরে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নামক কাথিয়াবাড়ের এক ব্যক্তি বোম্বাই হইতে লণ্ডনে গমন করিলেন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সেখানে India Home Rule Society নামক একটি সমিতি গঠন করিলেন। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্য হইতে উক্ত সমিতির সভ্য সংগ্রহ চলিতে লাগিল। তাঁহার প্রচেষ্টায় "Indian Sociologist" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। যাহাতে ভারতীয় ছাত্র, লেখক, সাংবাদিক ইত্যাদি উপযুক্ত ব্যক্তিগণ ইংলণ্ড আমেরিকায় গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া ভারতে আসিয়া জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালেই শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা এক হাজার টাকা হিসাবে কয়েকটি বৃত্তি দিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন।

নাসিকবিবাসী ২২ বৎসর বয়স্ক তরুণ যুবক বিনায়ক দামোদর সাভারকর শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার ঐ বৃত্তি লইয়া ১৯০৬ সালে ইংলণ্ডে গমন করিয়া India Home Rule Society-র সভ্য হইলেন। পুণার ফারগুসন কলেজ হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা কিন্তু অধিক দিন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতে পারিলেন না। তাঁহার পরিচালিত ইণ্ডিয়া হাউসকে বৃটিশ সরকার সুনজরে দেখিতেন না। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বিলাতে থাকা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। তিনি প্যারীতে চলিয়া গেলেন।

ছাত্র জীবনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর "মিত্র মেলা" নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি উক্ত সমিতির নাম "অভিনব-ভারত (Young India) রাখিয়া উক্ত সমিতিটিকে নূতনভাবে সংগঠিত করেন। ১৯০৬ সালে পুণার ছাত্রদের দ্বারা গঠিত একটি সমিতির সভাপতি-পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কামলী ফুকর্ণা প্যারীতে চলিয়া যাইবার পর ১৯০৯ সালে ইণ্ডিয়া হাউসের পরিচালনার ভার সাভারকরের উপরই পড়িল। ইণ্ডিয়া হাউসের সভ্যরা বিপ্লবের চালনা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিনায়কের ভ্রাতার নাম গণেশ সাভারকর। একখানি রাজদ্রোহাত্মক পদ্য-গ্রন্থ প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ১৯০৯ সালের ২১ই জুন নাসিকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন কর্ত্তৃক গণেশ সাভারকর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই লণ্ডনে এক চমকপ্রদ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। মদনলাল ধিংড়া নামক এক ব্যক্তি বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ইণ্ডিয়া হাউসের সভ্য ছিলেন। ইম্পিরিয়্যাল ইন্‌স্টিটিউটের একটি সভার অধিবেশনকালে মদনলাল ধিংড়া তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড মর্লির A. D. C. কর্ণেল স্যার উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলীকে ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই গুলিবিদ্ধ করিয়া নিহত করিলেন। ওয়াইলীকে রক্ষা করিতে গিয়া ডাঃ লালকাকাও নিহত হইলেন। গ্রেপ্তারের সময় ধিংড়ার পকেট হইতে প্রাপ্ত একখানি লিপিতে তাঁহার এইরূপ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় যে, ভারতীয় নরনারীর প্রতি প্রবল কারা ও প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদস্বরূপ একান্তভাবে নিজেরই ইচ্ছায় তিনি ইংরাজ-রক্তপাতের চেষ্টা করিলেন! নরহত্যার অভিযোগে ধিংড়ার ফাঁসি হইল।

একজন ভারতীয়ের দ্বারা খাস লণ্ডন সহরে প্রকাশ্য সভায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় সেখানকার ভারতীয়-সম্প্রদায় প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সভা আহ্বান করিয়া তাঁহারা এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিবেন। তদনুযায়ী একটি সভা আহ্বান করা হইল, কিন্তু সেই সভায় ওয়াইলী-হত্যার নিন্দাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব সর্ব্ববাদীসম্মত হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে বিনায়ক দামোদর সাভারকর দাঁড়াইয়া বজ্রকণ্ঠে উহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে জানাইলেন যে, উক্ত প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করিতেছেন। ইহার পরই বিনায়কের উপর চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ আরম্ভ হইল। সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া কোনও মতে তিনি রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ জাহাজযোগে বোম্বাই পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল।

দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের নিকট জাহাজখানি উপস্থিত হইলে সাভারকর এক অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া বসিলেন। জাহাজের স্নান-কক্ষের ছিদ্রপথ দিয়া তিনি সমুদ্রের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ জাহাজের উপর হইতে রক্ষীরা তাঁহার উপর গুলিবৃষ্টি করিতে সুরু করিল। দুর্জ্জয় সাহসে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া জলের তলদেশে আত্মগোপন করিয়া তিনি সাঁতার কাটিতে লাগিলেন এবং অতি কষ্টে ফ্রান্সের তীরে গিয়া উঠিলেন। বৃটিশ পুলিশের নিকট তিনি ধরা দিলেন না—ধরা দিলেন ফরাসী পুলিশের হস্তে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশের হস্ত হইতে রেহাই পাওয়া; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা হইল না। ফরাসী পুলিশ তাঁহাকে বৃটিশ পুলিশের নিকট অর্পণ করিল।

আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুযায়ী তাঁহার বিচার বিলম্ব করাইবার জন্য ইহার পর বহু আন্দোলন হয়—কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। বোম্বাইয়ের আদালতেই তিনি অভিযুক্ত হইলেন এবং বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে এইভাবে তাঁহার জীবনের অমূল্য চৌদ্দটি বৎসর আন্দামানে নির্ব্বাসিত অবস্থায় কাটিয়া যায়। ইহা ব্যতীত রাজবন্দী হিসাবে আরও চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয় তাঁহাকে রত্নগিরিতে।

বিলাতে থাকাকালে সাভারকর প্যারী হইতে দুটি Browning Automatic পিস্তল বোম্বাইয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাসমূহের কিছুদিন পরে গণেশ সাভারকরের মামলায় বিচারক নাসিকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। জ্যাকসন-হত্যার তদন্তপ্রসঙ্গে পুলিশ একটি ব্যাপক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া মামলা রুজু করিলে বিচারে তিনজনের ফাঁসি হইল। ইহার পরই নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। সেই মামলায় প্রকাশ পাইল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ "অভিনব ভারত" সমিতির সভ্য—যাহার সহিত বিনায়ক সাভারকরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্ত্তমান ছিল। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের যে ফর্ম্মুলা টাইপ করা হইয়াছিল, তাহার একটি কপিও গণেশ সাভারকরের বাড়ী হইতে পাওয়া যায়। এই ষড়যন্ত্র মামলায় সাতাশজনের কারাদণ্ড হইল। সাতারা, খোলাপির ইত্যাদি স্থানের ষড়যন্ত্রও ফাঁস হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পন্থ-প্রতিভূ

শ্রীমতী মীরা ভট্টাচার্য্য

অবশ-করা দিন তিমির-ভরা রাত্রি
বন্ধুর দীর্ঘ পথ একাকী আমি যাত্রী।
তখনো ঘটিকারা বিকট করে ভঙ্গি
প্রলয় রূপে মাতে কঠিনাহীন অঙ্গি।
জীবনে কেহ নাহি দুখের ধাতা ধাত্রী,
অবশ-করা দিন তিমির-ভরা রাত্রি।

আমার গতি মহে সরস-সুখ-পথে,
নিবিড় যাতনায় সকল ফল মধে।
উপল পথ ভাঙি আমার মহাযাত্রা,
অসহ বেদনায় কোথায় পাব মাত্রা।
এমনে অভিশাপ আসেনি বর ধাত্রী
অবশ-করা দিন তিমির-ভরা রাত্রি।

বনফুল

১৭

শুনে ঘরে' গেলেন ছকুবাবু। চলে' গেলেন ভদ্রলোক। আকশোষ কি যাত।

"আপনি বলিয়া জেনার ভাষা বোঝেন ?"

"না, আমি বুঝি না"

ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আলাপ করে' যেতে হবে না কি ক্রমাগত। সর্ব্বনাশ। তাহলে তো শক্তি-সংগ্রহ করা দরকার। শক্তি-সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তিনি লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিলেন—এমন সময় সান্ত্বনা কথা কয়ে উঠল।

"আমাদের বন্ধু সদানন্দবাবু খুব বিরক্ত করে' গেছেন নিশ্চয় আপনাকে"

"না, না বিরক্ত আর কি। আপনার কুকুরটা যে পাওয়া গেছে এতে খুশীই হয়েছি বরং"

"হ্যাঁ কুকুরটার জন্যে আমরা—বিশেষ করে' আমি—বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সব শুনেছেন নিশ্চয়"

"নিশ্চয়। শুনতে কিছু বাকি নেই আর। সব শুনেছি। ভদ্রলোক শুনিয়ে তবে ছেড়েছেন"

সান্ত্বনা একটু ইতস্তত করতে লাগল, তারপর ছকুবাবুর দিকে মাথা নেড়ে এমন একটা প্রত্যাশাসূচক ভঙ্গী করে' রইল যার অর্থ—যা' শুনেছেন বলুন না সব।

"উঃ কি রাতই কেটেছে আপনাদের কাল"—মুচকি হেসে বললেন ছকুবাবু।

ঈষৎ আদুনাসিক আবদার-তরল-কণ্ঠে সান্ত্বনা বললে, "আপনি হাসছেন কিন্তু কাল রাত্রে কি বিপদেই যে পড়েছিলাম আমরা"—

"বহুবচনটা কি গৌরবে ব্যবহার করছেন ? বিপদে তো পড়েছিলেন আপনার স্বামী ভদ্রলোক। শীতকালে রাতদুপুরে বিছানা ছেড়ে কুকুর আনতে দৌড়ানো—হ্যাঁ ? হা হা হা"—

"হা—হা—হা"—কলকণ্ঠে সান্ত্বনাও হেসে উঠল—"হ্যাঁ তা দৌড়েছিলেন বটে। কুকুরটা এত কাঁদছিল আমরা ঘুমুতেই পারছিলাম না যে"

"তাই ভদ্রলোক বিছানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সমঝেছি। আমারও এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। কিন্তু কুকুরের জন্য নয়, শেয়ের, মানে বাঘের জন্য। দিল বাথরুমে ঘিরেছিল একেবারে"

"ও"—সান্ত্বনার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

"পোষমনবাবুর সঙ্গে শিকারে যেতে হত কি না। বাঘের সে কি আবাজ—তার রাত বসে কাটাতে হয়েছে—ভয়ে দিল কাঁপছে। আপনার স্বামী একটা বিপদে পড়েন নি। কুকুরটাকে খুলে দিয়ে এসে বিছানায় আবার এসে শুধুনি শুলেন তো—দু'চার লহমার ব্যাপার—"

চোখ মটকে আবার হাসলেন ছকুবাবু।

"আপনাদের কাণ্ড সব শুনেছি, কি ভাবছেন, সব জানি। হা-হা-হা—"

মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে আনত নয়নে বসে রইল সান্ত্বনা। ছকুবাবু সোৎসাহে লাইব্রেরির দিকে চলে গেলেন।

খাসা মেয়ে। অচেনা এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বিকেলটা কেমনভাবে কাটবে ভাবনায় পড়েছিলেন ছকু-বাবু। এখন মনে হচ্ছে—খাসা কাটবে। চৌ চৌ করে' তিনি সান্ত্বনার স্বাস্থ্য পান করে' ফেললেন খানিকটা।

…একটু পরে তিনি দেখলেন সান্ত্বনা কাপড়চোপড় বদলে একটি বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে সনের দিকে মুখ করে' বারান্দায় এসে বসল। বেশ ছিমছাম মেয়েটি। কুকুরবাবু তর্জনীটি নাকের উপর মৃদুভাবে রেখে লাইব্রেরির জানলা থেকে সান্ত্বনার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। সান্ত্বনাও যেন বুঝতে পারছিল আড়াল থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। আচ্ছন্নতাটা কিছুতেই সে যেন কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল।

…আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে গোছের। বাতাসে ইউক্যালিপটাস্ গাছের ডালপালাগুলো হুয়ে হুয়ে পড়ছে। চীৎকার করে' চলেছে একদল দাঁড়কাক। সান্ত্বনার কিন্তু প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ করার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। জটিল পরিস্থিতিটার কথাই সে ভাবছিল মনের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে কি জটই না সে পাকিয়ে তুলেছে। কি করে যে এখন ছাড়ানো যায়! ভ্রূকুঞ্চিত করে' নিবিষ্টচিত্তে ভাবছিল সে। মনে হচ্ছিল সে যেন কোন অদৃশ্য দাবার ছকের দিকে চেয়ে চাল ভাবছে। হিন্দিভাষীবাবুর পল্লীভবনের নিবিড় শান্তি কিন্তু ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করছিল তার মনে। অর্দ্ধ-বিস্তৃত রূপকথালোকের স্নিগ্ধ মায়া চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণার জ্বালাকে জুড়িয়ে দিচ্ছে যেন। সান্ত্বনার ছেলেবেলার খানিকটা এখানে কেটেছে। কোলকাতার অত্যুগ্র কোলাহলের পর এখানকার শান্তি যে কি মধুর তা' অজানা নেই তার। চুপ করে' বসে রইল সে। গাছের মর্ম্মর আর পাখীর ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। অনেক দূরে একটা মালী ফুলের গাছগুলো নিয়ে কি যেন করছে। আরও দূরে একটা ছোটবাছুর মনের উল্লাসে ছুটে বেড়াচ্ছে লেজ তুলে। নানা রকম দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল সান্ত্বনার। পল্লীপ্রকৃতির স্নেহ-ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করল সে ধীরে ধীরে।

…এখানে কেউ ছল চাতুরি করবে কেন? কিসের প্রয়োজন? কুকুর হারিয়ে গিয়েছিল—একজন যত্ন নেটা পেয়ে ফেরত দিয়ে গেছেন—এ আর এমন কি একটা ঘটনা, যার জন্যে তার গত চব্বিশ ঘণ্টার গতিবিধির ওর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন? ভাবনা কি! তাকে কেউ ধরা করতেও আসছে না। মাসীমাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলেই বলবে সে লুকিয়ে। আর বাকি সকলের জন্য অত মিথ্যার জাল বোনবার দরকারই বা কি।

…নিজের স্বামীর উপর তার আস্থা আছে। মনে মনে ছবিটা কল্পনা করছিল সে। সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে' শুনবে, তারপর ছোট্ট হাসির আভায় মিলিয়ে যাবে সমস্ত ভ্রূকুটি।

…গোঁসাইজির সঙ্গে জীবনে আর দেখাই হবে না হয় তো।

…সদারঙ্গবিহারীলাল? হ্যাঁ, ও ভদ্রলোককে সামলাতে হবে। মোটরবাইকে চড়ে' আর অধিক দূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই ওকে রুখতে হবে। ওঁকে সঙ্গে করে' নিয়ে গেলেই হবে না হয় তাঁর বাড়িতে একদিন। এখান থেকে কত দূরই বা। কিন্তু না, একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে। গোঁসাইজির হিন্দু পান্থনিবাসে অবস্থিত সেই অতিকায় ছাদের খাটে যে রহস্য নিহিত আছে তার খবরটা ভদ্রলোক জানেন যে। একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে বই কি। যিনি তাঁদের একখাটে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি ছাড়া সদারঙ্গবিহারী-লালই এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভরসার সাক্ষী। পরেশ কিম্বা কুকুরবাবু তার সাজানো-স্বামীটিকে চাক্ষুষ করে নি বটে, কিন্তু সদারঙ্গবিহারীলাল রীতিমত গল্প করেছেন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে' উচ্ছ্বসিত হয়ে। গোঁসাইজি নিশ্চয় তাঁর কাছে তাদের পাশাপাশি শুয়ে থাকার গল্পটাও করেছেন। গোঁসাইজি যে রকম নিখুঁত প্রকৃতির লোক—নিজের গল্পকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সদারঙ্গবিহারীলালকে উপরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ছাদের খাটটা দেখিয়েওছেন হয়তো। মোট কথা, যা জানবার সবই তিনি জেনেছেন এবং যে রকম উর্ব্বরমস্তিষ্ক উৎসাহী লোক, হয়তো অনেক কিছু যুগও চড়িয়েছেন তাতে কল্পনা থেকে। না, সদারঙ্গ-বিহারীলাল সম্বন্ধে সাবধানতার খুবই প্রয়োজন আছে।

…সুশোভনের সম্বন্ধেও। ওই অল্পবুদ্ধি হাসিখুশীমান লোকটিকে রীতিমত তালিম না দিয়ে অমন হুড়মুড় করে পাঠানোটা ঠিক হয় নি মোটেই। কোন অবস্থায় কি বলতে হবে, তা অন্তত বলে' দেওয়া উচিত ছিল। অনীতার

কাছে সাফাই গাইবার জন্ত উলটো-পালটা যা-তা বলে' বসবে হয় তো।

…ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর মাথায় আকাশটা ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে এল বেশ। দাঁড়কাকগুলো আরও জোরে চীৎকার করছে। মালীটা ঘাড় তুলে চেয়ে দেখলে একবার, তারপর টবটা মাটিতে নাবিয়ে ছুটল তার ঘরের দিকে। বাছুরটাও ছুটে পালাল। বৃষ্টি এল। মানুষের বহুবিধ ভ্রান্তির জন্ত রোষে ক্ষোভে দুঃখে প্রকৃতি যেন কেঁদে ফেললেন।

সান্ত্বনা উঠে ভিতরে গেল। তার চিত্ত তখন রীতিমত বিচলিত।…

পরেশ এসে সসম্ভ্রমে খবর দিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। সান্ত্বনা গিয়ে দেখলে ছকুবাবুও চায়ের টেবিলে সমাসীন। সান্ত্বনার হাব-ভাব দেখে ঘাবড়ে' গেলেন কিন্তু ছকুবাবু। যে রকম উচ্ছলতা তিনি আশা করেছিলেন তাতো মোটেই নেই। মিইয়ে গেল কেন হঠাৎ! তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। নানাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে' তার জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ছোট ছেলের সঙ্গে তার করবার জন্তে লোকে যেমন নানা উপায় উদ্ভাবন করে, ব্যাপারটা অনেকটা সেই গোছের দাঁড়াল। কিন্তু তেমন জুত করতে পারলেন না তিনি। তাঁর মনে হতে লাগল একটা অদৃশ্য যবনিকা যেন সান্ত্বনার মনকে তাঁর রসিকতা-কিরণ থেকে আড়াল করে' রাখছে। মনে মনে চটতে লাগলেন খুব, অথচ মুখে বেতো হাসি হেসে নানা রকম রসিকতাও করে' যেতে লাগলেন। সান্ত্বনাও গম্ভীরভাবে শুনে যেতে লাগল। খাওয়াপ্রসঙ্গে অবতীর্ণ হলেন শেষে ছকুবাবু। কোনও দিক থেকে সুবিধে করতে না পেরে মনের নেপথ্যালোকে রাগটা জমে' উঠেছিল বেশ। ঝালটা ঝাড়লেন ডালের উপর। লুচির সঙ্গে ঘন বুটের ডাল ছিল খানিকটা।

"ডালটা ভাল লাগছে আপনার? রাম কহো, এর নাম কি ডাল! এরা কি ডালের মর্ম বোঝে! বুটের ডাল বলে' চেনবার উপায় আছে! খেঁটেখুঁটে সেই বানিয়েছে একটা। আমার 'খাওয়াশ'টা যদি থাকত, ডাল কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম আপনাদের। আপনাদের 'খাওয়াশ' কি বাঙালী? 'খাওয়াশ' আছে নিশ্চয়"

"না বোধহয়। 'খাওয়াশ' জিনিসটা কি"

"সীতারাম, আপনি বুঝি বাইরে এক ডেগও যান নি। 'খাওয়াশ' মানে চাকর"

"ও। না, বাংলার বাইরে আমি যাই নি কখনও"

"তাহলে ডালের মর্মই বোঝেন নি। ওদেশের বুটের ডাল, বুটের হালুয়া, পুদিনায় চাটনি, লিট্টি, ডালরুটি, তিলুয়া, ঠেকুয়া, সিদ্ধির সরবৎ—অপূর্ব্ব জিনিস সব। আবার ওদেশে ফিরতে হবে দেখছি। ডালই আমাকে তাড়াবে এ দেশ থেকে"—

"ওদেশের ডাল খুব ভাল বুঝি"

"বেশক্"

"শুনে আমারও খেতে লোভ হচ্ছে"

মুচকি হেসে বললে বটে সান্ত্বনা, কিন্তু তার একটুও ভাল লাগছিল না। একটু আগে সামনের বারান্দার বেতের চেয়ারটিতে একা বসে তার মনে যে শান্ত স্নিগ্ধ ভাবটি এসেছিল তা যেন খিঁচড়ে গেল। একটা অজানা আশঙ্কা তার মনের শান্তিকে বিঘ্নিত করছিল, এই ছকুবাবু লোকটির অসহ্য আস্ফালনও নষ্ট করছিল এখানকার নির্জ্জন নিস্তব্ধতাকে। মনে হচ্ছিল একটা বাঁদর যেন এসে মন্দিরে ঢুকেছে।

আহারান্তে ছকুবাবু উঠলেন এবং দাঁড়ালেন গিয়ে জানলার ধারে। বৃষ্টিটা থেমেছে। একটু-আধটু রোদও দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির মেজাজটা একটু যেন প্রসন্ন হয়েছে মনে হল। ছকুবাবুর মেজাজও প্রসন্ন হয়েছিল। সে কথা বললেনও তিনি। এমন কি বৈকালিক ভ্রমণের ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। বললেন—"দেখে আসি ওরা কোনদিকে গেল। আপনি যাবেন? চলুন না"। সান্ত্বনা অন্তরভাবে অসম্মতিজ্ঞাপন করাতে একাই বেরিয়ে পড়লেন তিনি।… বারান্দায় সূর্য্যালোক এসে পড়ল আবার। মালীটা তার ঘর থেকে বেরিয়ে আবার গাছগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। সুরেশ্বরী দেবীর বুড়ো স্প্যানিয়েলটা থাবার উপর মুখ রেখে শুয়েছিল গম্ভীরভাবে। কুকু তার চারদিকে লাফালাফি করে' তাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু উৎসাহের কোনও লক্ষণ প্রকাশ করল না সে। প্রবীণ দাদামশাই দামাল নাতনীর দুরপনেয় সহ্য করেন যেমন ভাবে—তেমনি একটা মুখভাব করে' সে থাবার

উপর মুখ রেখেই শুয়ে রইল। সাইকেল দেখা গেল দূরে একটা। টেলিগ্রাফ পিওন। সুরেশ্বরী দেবীর নামে টেলিগ্রাম। সাহনাই সই করে' নিলে। খামটার দিকে চেয়ে রইল সে খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে'। কার টেলিগ্রাম হতে পারে? খুলবে? না, সেটা উচিত হবে না। ভিতরে গিয়ে পরেশের হাতে দিয়ে দিলে সেটা। পরেশ সুরেশ্বরী দেবীর চিঠি লেখার টেবিলে এমনভাবে সেটা রেখে দিলে—যাতে এলেই তিনি দেখতে পান।

মৃত্যুর সম্বন্ধে যেমন অনাসৃষ্টির সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। প্রত্যেক মানুষের ধারণা আমি ঠিক বেঁচে যাব। বৃষ্টিটা অপ্রত্যাশিতভাবে মোটেই আসে নি। আকাশ অনেকক্ষণ থেকেই ঘনঘোর হয়েছিল। তবু কিন্তু অনেকগুলি লোক ভিজে গেলেন এতে। রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় একজন। সুরেশ্বরী দেবী আর একজন। মাধব গোমস্তার বাড়ি থেকে বেরিয়েই বৃষ্টিটা পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি ফিরলেন না, কারণ একটু-আধটু বৃষ্টিতে ভিজলে তাঁর কিছু হয় না, এই তাঁর ধারণা। দ্বিতীয় কারণ শিকারীদের জন্যে যে খাবার তিনি এনেছেন তিনি না গেলে সেগুলো অভুক্তই পড়ে থাকবে। গ্রামের আরও যে দু'জন লোক শিকারে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাও ভিজেছিলেন বেশ। গোবর্দ্ধনবাবু ভিজে স্নাতা হয়ে গিয়েছিলেন বললেই হয়। শিকারের উৎসাহ-বহ্নিতেও জল পড়েছিল প্রচুর। প্যাচপেচে কাদায় ছপ ছপ করতে করতে একটা বড় গাছতলায় সবাই সমবেত হলেন এসে!

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড"—দিগ্বিজয় বললেন সুরেশ্বরীর দিকে চেয়ে—"ওঃ—বড্ড ভিজে গেলে যে তুমি। আর শিকারে কাজ নেই, চল বাড়ি ফেরা যাক"

"আমি? আমি কিছু ভিজি নি। কিন্তু আমার মনে হয় ফেরাই ভাল; তুমি বড্ড ভিজেছ—এঁরাও—"

"কি যে বল, আমি একটুও ভিজিনি"

"তোমার গা থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি বলছ ভিজিনি!"

"টপ টপ করে' জল পড়ছে ওয়াটার প্রুফ বেয়ে। ভাগ্যে ওটা সঙ্গে এনেছিলাম। ভিতরে কিছু ভেজেনি আমার। শোন, গাড়ি ক'রে তুমি বরং ফিরে যাও, তোমার শাড়ি ভিজে সপসপ করছে"

সুরেশ্বরী দেবী চুপ করে' রইলেন।

"সত্যি, তোমাদের শিকারটা মাটি হল"

"বিশ্রী দিন আজ। কিছু ভালো লাগছে না আমার"

এ সুযোগ সুরেশ্বরী দেবী উপেক্ষা করলেন না। দিগ্বিজয় নিজমুখে স্বীকার করেছেন তাঁর কিছু ভাল লাগছে না।

"চল তবে ফেরাই যাক"

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিজয়িনীসুলভ সুর বেজে উঠল।

অন্যান্য শিকারিরাও ভিজেছিলেন এ বৃষ্টিতে। একটি বুড়ো চাষা ভিজতে ভিজতে ছুটছিল। শুধু ছুটছিল না, চীৎকারও করছিল প্রাণপণে।

গণেশ খুব ভেজেনি। তার গাড়ির রেডিয়েটার আবার খারাপ হয়েছিল। ঝুঁকে তারই তদারক করছিল সে, এমন সময় বৃষ্টিটা এল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভিতর ঢুকে সে জানলার কাচগুলো তুলে দিলে—আর বিরক্ত মুখে ভাবতে লাগল কি অশুভক্ষণেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল।

সুশোভন বেশ ভিজেছিল। কিন্তু নিজের চিন্তাতেই এত তন্ময় ছিল সে যে বৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না তার। সে হাঁটছিল। দ্রুতবেগে হাঁটছিল ফাৎনা-কিরিঙ্গিপুর অভিমুখে। আর মনে মনে ভাববার চেষ্টা করছিল কোন ট্রেণ কখন পাওয়া যাবে, কাকে কি টেলিগ্রাম করবে, আর ফোন করবার সুযোগ যদি পাওয়া যায় কি বলবে ফোনে।

স্বয়ম্প্রভা দেবী যে ট্রেণটায় আসছিলেন সেটাও ভিজেছিল বৃষ্টিতে। জিতুবাবু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে স্বয়ম্প্রভা বললেন, "তুমি বাজে কথা বলে' অন্যদিকে আমার মন ফেরাবার চেষ্টা করছ বুঝতে পারছি। কিন্তু অন্য কোনও কথা ভাবব না আমি এখন। ভাবতে চাই না"—জিতু সরকার আর কিছু না বলে বাতায়ন পথে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। সেই একই ট্রেণে—ঠিক তিনটি কামরা পরে—অধ্যাপক ব্রজেশ্বরবাবুও ছিলেন। তিনি এককোণে বসে' সেদিনকার কাগজটা পড়ছিলেন নিবিষ্টচিত্তে। কাচের জানালাটা বন্ধ ছিল। বৃষ্টির সঙ্গে

বাইরের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' চাইলেন তিনি একবার, তারপর আবার কাগজে মন দিলেন।

বাইক-বিহারী সদারঙ্গবিহারীলালেরই সব চেয়ে বেশী ভেজা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে বাইক চালিয়ে হরষানপুরে পৌঁছে গিয়েছিলেন ঠিক। বিশেষ ভেজেন নি।

যাঁর ভেজবার কথা নয়, তিনি কখনও কোনও উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চান না, সেই গোঁসাইজি ভীষণভাবে পড়ে গেলেন এই উচ্ছৃঙ্খল ঝড়-বৃষ্টির খাম-খেয়ালী খপ্পরে। গোঁসাইজি কদাচিৎ বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সেদিন প্রিয়বন্ধু নিতাই বৈরাগী নিমন্ত্রণ করেছিল তাঁকে। বাড়িটা একটু দূরে হওয়াতে যাবেন কি না ইতস্তত করছিলেন—কিন্তু অনেক সদ্বংশ গাড়োয়ান বিনা ভাড়ায় নিজের গরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেল যখন, তখন আর দ্বিধা রইল না। কিরতি মুখে গাড়োয়ান নিয়েও আসবে তাঁকে। তিনি ফদকা এবং পার্শ্ববর্ত্তী তাড়ির দোকানের চাকর গোকুলের হাতে তাঁর হিন্দু পান্থনিবাস ও অসুস্থ গুরুভগ্নীর ভার দিয়ে নিতাই বৈরাগীর সঙ্গসুখ লাভ করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একটি ছাতাও ছিল তাঁর—রেলিগ্রাফার্সের বৃহত্তম ছাতা, উপরে সাদা কাপড়ের মলাট দেওয়া—তবু কিন্তু তিনি রক্ষা পেলেন না। ঝড়-বৃষ্টির সমস্ত তোড়টা তাঁর উপর পড়ল এসে। (ক্রমশঃ)

মহাপ্রয়াণে

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

দেবতাত্মা হিমবান্ পর্বতের পাদদেশে আসমুদ্র বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ নামে এক দেশ আছে। সেই হিমবান্ পর্বতে দেবতারা কখনও কখনও লীলার ছলে অবতীর্ণ হন। গঙ্গাযমুনাসিন্ধুকাবেরীর কলঝঙ্কারে তাঁহাদের নূপুরনিক্কণ শোনা যায়। হিমাদ্রির তুহিন প্রপাতে তাঁহাদের শুভ্র চরণ চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। ঘুমের মধ্যের মতো, হোমানলের লীলায়িত শিখার মতো সেই দেবতাদের গমন ছিল ঊর্দ্ধমুখী।

কিন্তু মুনি-ঋষি-অধ্যুষিত পশ্চিম ধাম, যোগী তপস্বীদের সাধন ক্ষেত্র, শুকুকোবিদগণের লীলা-নিকেতন ভারতবর্ষ বিপন্ন, সন্ত্রস্ত, পাশবিকতে লাঞ্ছিত দেখিয়া একটি প্রধান দেবতা নামিয়া আসিলেন শৈলশিখর হইতে আমাদেরই এই মর্ত্ত্যধামে। তাঁহার আবির্ভাবে বুঝি জলদ গর্জন করিয়াছিল, পর্বত টলিয়াছিল, প্রস্রবণগুলি নির্ঝরিণী ছুটিয়াছিল। কত সাধক, কত ধ্যানী, ব্রতীব্রতী দেবতার আরাধনায়, অহিংসার অর্চনায় নিবিষ্ট হইল।

রাজার রাজসিংহাসন নড়িয়া উঠিল, অত্যাচারের হস্ত হইতে বজ্র অকস্মাৎ খসিয়া পড়িল, উদ্যত শাণিত ছুরিকা কোষবদ্ধ হইল, রক্তপিপাসু আততায়ী প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আলিঙ্গন করিল, চিরদরিদ্র অন্নহীন বস্ত্রহীন দুঃখের ঘন দেখিয়া জাগিয়া উঠিল। সেই দেবতার মস্তকে আকাশ হইতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইল।

ভারতবর্ষ মহান্ দেশ। মহান্ তার আত্মা। সেই দেবতা যখন জলদ মন্দ্রিত করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে উদিত হইলেন, তখন দশদিক্ প্রসন্ন হইল—সমস্ত গ্লানি কলঙ্ক কালিমা মুছাইয়া নির্মল বায়ু প্রবাহিত হইল। ইনি ভারতের আত্মা? হাঁ, এই দেবতাই ভারতাত্মা মহাত্মা। দীনদুঃখী কাঙ্গালের কানে কানে কে আশার বাণী বলিল? কে চাহিল তাহাদের মুখের পানে করুণায় বিগলিত হইয়া? কে চাহিল অন্নবস্ত্র বসতার সমাধানে করিয়া ভারতবাসীকে স্বাবলম্বী করিতে? কী বেখিলাম! হিংসা মাথা নত করিল, সত্য মাথা উঁচু করিল, ভয় পলাইল জয়ে। অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, অথচ হিমাদ্রির দৃঢ়তা, পাষাণের মতো অচল অটল! দুর্বলের যে বল আছে, তাহা কে জানাইয়া ছিল? সেই বলের কাছে রাজশক্তি পরাভব মানিল, ধনমদ রাজমদ কৌলীন্য আসিয়া গেল। অন্নহীন নিরন্ন বলিল যে, তাহার অন্ন কে কোথা পাতিয়া দিল? ভারতের মানচিত্রে সোনালী রঙ ধরিল। আবার ভারত রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখিল। কোটী কোটী জয়ধ্বনি করিয়া চারিদিকে ছুটিল; আসমুদ্র হিমাচল প্রাণের প্রাচুর্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুদূর পল্লীবাসী নিরক্ষর দীনাতিদীন ব্যক্তিও সেই মহাত্মাকে জানিল, বুঝিল, প্রণাম করিল। বিরাট জনসংঘ—এক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছুটিল এক আলোকলোকের পানে, যেখানে উচ্চ নীচ নাই, যেখানে ধনী দরিদ্র নাই, যেখানে সাম্য, মৈত্রী, শান্তি বিরাজ করে। থামাও অস্ত্রের ঝনঝনা—এই যুদ্ধে পশুবলের স্থান নাই। বিশ্ববাসী বিস্ময়ে দেখিল তপস্যার বল, অহিংসার ফল, দেখিল মনুষ্যত্বের উন্মেষ গরিমা। যিকে দিকে পড়িয়া গেল সাড়া। রাজা, রাজপুরুষ, সেনাধ্যক্ষ, ধর্মযাজক, কোটীপতি সকলে চাহিয়া দেখিল অর্দ্ধনগ্ন ফকির বিংশশতাব্দীর সন্ন্যাসী। কত কুসুমস্তবক্ষ পথে আস্তীর্ণ হইল, কত তোরণে

তোরণে পতাকা উড়িল, ধরণীর ধূলা পবিত্র হইয়া গেল—শান্তির এই মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহের পদস্পর্শে। জগতের রক্তরাঙা আকাশে ভাসিয়া উঠিল একটি অমলধবল নিষ্কলুষ মূর্ত্তি—যিনি তাঁহাকে ভারতের আত্মা বলিয়া বন্দনা করিল।

কিন্তু পুণ্যভূমি ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য মধ্যাহ্নে অস্তমিত হইল। আলোকের পথচারী, অহিংসা মন্ত্রের ঋষি, সর্বমেধের সর্বকালের পবিত্র যজ্ঞমূর্ত্তি হিংসার কবলে চলিয়া পড়িল। যেত পতঙ্গল রক্তে আসিয়া গেল—যিনি জগৎ হইতে রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিতে আসিয়াছিলেন, বিধাতা তাঁর অমলিন রক্ত বলিদান গ্রহণ করিলেন। যুগে যুগে দেবতা মানুষের পাপের চিতাবলে আত্মাহুতি দিয়াছেন। আবার কালচক্রের আবর্ত্তনে অতীতের পুনরাবৃত্তি হইল।

যাহাদের জন্ম তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল দুর্দিনের মাঝে, যাহাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তিনি দুঃখকে চিরসাথী করিয়াছিলেন, যাদের দুঃখ দূর করিবার জন্ম তিনি কায়ক্লেশ করিয়াছিলেন, অনেক সময় আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাদের রক্তরঞ্জিত পল্লীপথে পূতীবকণ্টকক্ষতের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন ক্ষিপ্ত করিয়া আসন্ন মৃত্যুমুখের মধ্যে আশার বাণী বহন করিয়াছিলেন, সেই আমাদেরই একজন একদিন সন্ধ্যায় চাহিল তাঁহার অমূল্য প্রাণ। পরক্ষণে মরণাহত হইয়া প্রার্থনা করিল তাহার মৃত্যু। অশ্রুবাষ্পে ঝরিল বিমল নিষ্কলুষ শোণিত-গঙ্গা—এমন অমল পবিত্র বিগলিত রক্তনির্ঝর আর কখনও বুঝি ধরণী চুম্বন করে নাই। হায়, হায়, কী লজ্জা, কী বিড়ম্বনা,—কী নিষ্ঠুর নির্মম মূলতা! পৃথিবীর এপ্রান্ত হইতে ওপ্রান্ত পর্যন্ত কত পাহাড় পর্বত মরীসঙ্কুল পার হইয়া বিদ্যুৎ ঝলকে ভারতের সেই মহাপাতকের কাহিনী, সেই দুরপনেয় কলঙ্কের বার্ত্তা নিমেষ মধ্যে প্রচারিত হইল। জগৎ হইল বিস্তব্ধ, বিশ্ববাসী হইল চকিত, ত্রস্ত, শোকার্ত্ত; অভিশপ্ত ভারতের গগনে পবনে উঠিল হাহাকার!

জীবনে যিনি ছিলেন মহাত্মা, মরণে তিনি হইলেন দেবতা। তাঁহার নিত্য সংগ্রাম দেখিয়া যাহারা একদিন উপেক্ষা ভরে বলিয়াছিল, পাগল, স্বপ্নবিলাসী, অবাস্তবের পূজারী—তাহারাই সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিল—দেবতা, মরজগতের অমৃত শিশু। তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু কান পাতিয়া শোনো দেবতারা বলিতেছেন শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। বিশ্বমানব ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া একতানে বাজ বাজাইতেছ—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। জীবনের সাধনা কি এতদিনে ফলিবে? তোমার জীবনের মহাদান—একতা, মৈত্রী, শান্তি—সার্থক হউক। আমরা তোমার যোগ্য সন্তান হইতে পারি নাই, এ দুঃখ আমাদের চিরদিন বহন করিতে হইবে। উপায় নাই। ভবিষ্যতের বংশধরেরা গাহিবে:

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।

যার বিশালতটে ভারতের বিশাল আত্মা, বিশ্বমানবের মুহূর্ত্তমণির চিন্তাধারা কোটী কোটী নরনারীর ঊর্দ্ধমুখিতে পরিণত হইয়াছে।

৩০শে জানুয়ারী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মরের আজও-রাত হ'ল সপ্রকাশ—
যাতকের অস্ত্র-ঝঞ্ঝা থামিল উঠিল আরবার;
ধরণী রচিল পুনঃ স্বর্গ-ইতিহাস।
মুহূর্ত্তের মুহূর্ত্তের করি অবীকার।
শতাব্দীর কাল-স্রোতে যত মিশিছিল,
মধ্যযুগের বর্ব্বরতার উন্মাদ উৎসাহে;
যুগে যুগে শুভ্র-মনে সঞ্চয় যাহা,
দেবতার অন্তর-প্রবাহে।
ভারত মথিত করি উঠিল গরল,
নীলকণ্ঠ তুমি এলে ধরাতল লয়ে;
আকণ্ঠ করিলে পান তীব্র হলাহল।
মৃত্যুঞ্জয় ধরিত্রীর অমৃত সঞ্চয়ে।
হে গান্ধী, হে যীশু সূর্য্য তব অস্তাচল,
সত্যেরে রাখিল পুনঃ উচ্চ সিংহাসন!
অপার্থিব জ্যোতি-রশ্মি দারুণ উজ্জ্বল,
দিয়া করি অসত্যের মুক্তা বন্ধন।

গান্ধী-প্রয়াণে

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

তুমিও চলিলে বাড়ি'? কে রহিল আর।
আজি এ ভারত জুড়ে সান্ধ্য অন্ধকার
ঘনাইছে ধীরে।
হায়, ওরে মুগ্ধ দেশ,
এ দুর্দ্দিনে ধরি' শিরে কাহার নির্দ্দেশ
চলিবি সম্মুখপানে? ওগো কর্ণধার,
টলমল এ তরণী কে রাখিবে আর
উদ্দাম আবর্ত্ত মাঝে তোমার বিহনে?

হিংসা দ্বেষ লোভ পাপ মাৎসর্য্য দহনে
দগ্ধ এ মাটির মাঝে তব দান দিবি
অজস্র পুণ্যের ফলে দিয়েছিলি বিবি
আমাদের। কার মূল্যে লভিলা কাঞ্চন—
ঘুরে ফেলে যেন মুঢ় বর্ব্বর সে জন।
এখনি বর্ব্বর ঘোরা। আজি তুমি নাই,—
পথে পথে কেঁদে তোমা খুঁজিয়া বেড়াই।

শহীদ সূর্য সেন

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৯৩০-সাল এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা ক'রে গেছে। রক্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছে সে কাহিনী পৃথিবীর মাটির বুকে—লেখা আছে মানুষের মনের পাতায়। ইতিহাস আনত-শ্রদ্ধায় বরণ করবে চিরদিন সেই গৌরবমণ্ডিত সংগ্রাম কাহিনী।

উষাকালের রক্তলেখার মতই জ্বলে উঠেছিল সেদিন এই বাংলার বুকে বিপ্লবের বহ্নিশিখা। দুর্বার হ'য়ে উঠেছিল জাতীয় জীবনের দুরন্ত উচ্ছ্বাস। পরাধীনতার বাধনপাশে আবদ্ধ বন্দিত জাতির প্রাণকক্ষে থাকায় ঘিরে উঠেছিল মুক্তির মহা আহ্বান। সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল বাংলার মধ্যবিত্ত যুব-সম্প্রদায়—শাসন-শোষণ দুই জীবনের গ্লানি অসহ্য ক'রে তুলেছিল তাদের সবুজ অন্তর। অধীনতার কলঙ্ক মোচনে তাই হ'য়ে উঠেছিল তারা দুর্বার দুর্বিনীত। দেশ-মাতৃকার মুক্তি সাধনায় জীবন মরণ পণ ক'রে তাই ঝাঁপিয়েছিল তারা নিকল রোষের জ্বালা তীব্র অভিযান। মনে ছিল তাদের ব্রত উদ্‌যাপনের অক্ষয় সংকল্প, স্বাধীনতায় অপরূপ স্বপ্ন—চক্ষে ছিল অটলতার গভীর দীপ্তি। জীবনের আরাম শাশ্বত হ'য়ে আছে তাদের মর্মরোড়া বেদনা আর অকুণ্ঠ সাধনার মধ্যে।.....

সেদিন চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে যুবকের তপ্ত শোণিত ঢেলে যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাময়িক পরাজিত করতে সমর্থ হ'য়েছিল তাদের অধিনায়ক ছিলেন চট্টলের নোয়াপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত রাজমণি দেনের পুত্র সূর্য সেন।

কবে এবং কেমন ক'রে সূর্য সেন বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছিলেন তার কোন সঠিক বিবরণ জানা যায় না; তবে অনুমান হয় বাল্যকাল থেকেই তাঁর অন্তরে বিপ্লবের অংকুর-উদ্গম হ'য়েছিল।৩ তাঁর কর্মনিষ্ঠার প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বহরমপুর কলেজের ছাত্রজীবনেই। তখন থেকেই এই স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী কর্মীটির প্রতি ভারতের রাজনীতিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তার পরে বহরমপুর থেকে শিক্ষালাভ ক'রে চট্টগ্রামে ফিরে শিক্ষকতা শুরু করলেন তিনি। সেই সঙ্গে শুরু করলেন তরুণদের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ প্রচার। অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষাদান তাঁর সার্থক হ'য়ে উঠলো—সার্থক হ'য়ে উঠলো তাঁর বিপ্লববাদ প্রচার। তরুণদলের সবুজ প্রাণে বিদ্রোহের যে বীজ ধীরে ধীরে রোপণ করলেন তিনি, অল্পকালের ভেতরই তাতে অংকুর উদ্গম হ'ল। রাজনৈতিক বিপ্লববাদ ও রাষ্ট্রিক আদর্শকে পুরোভাগে রেখে এগিয়ে চললেন তিনি দুঃখ জয়ের পথে। প্রাণের বিপুল আকাঙ্ক্ষায়, হৃদয়ের সমস্ত আকাশে, আত্মার সর্ব অন্তরাখানে সূর্য সেন ঢেলেছিলেন তাঁর বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ সার্থক করে তুলতে। এই খাটো মানুষটিকে কেন্দ্র ক'রেই সেদিন সারা চট্টগ্রামে অনুভূত হ'য়েছিল এক প্রচণ্ড বৈপ্লবিক শাসন—সাফল্যগৌরবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল সেই রোমাঞ্চকর বিপ্লব প্রচেষ্টা।

মানুষকে ভালোবাসতে জানতেন সূর্য সেন—ভালোবেসেই মানুষকে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। অসহায়ের প্রতি গভীর মমতা, পীড়িত অসমর্থ মানুষের প্রতি সহজাত সহানুভূতি সূর্যদাকে একান্ত আপনার ক'রে তুলেছিল সাধারণের কাছে। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে পরের অন্তর জয় ক'রে নিয়েছিলেন সূর্যদাদু। সাধারণ মানুষ তাঁকে ভালোবেসেই শুধু সুখী হ'তে পারেনি—দেবতা জ্ঞানে পূজা ক'রেও ধন্য হ'য়েছে।

বৈপ্লবিক রণিকরাজের শোষণ-শাসনে ম্রিয়মাণ তীব্র ভারত-বাসীর শান্ত জীবন-সরোবরে সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক ঢেউয়ের এনেছিলেন প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম। অত্যাচারী শ্বেত জাতির পদ-পেষণে নিষ্পীড়িত ভারতবাসী অপমান জর্জর বক্ষে শুধু প্রাণেই বেঁচে ছিল কোনরকমে—নিজেদের সর্ববিষয়ে নিঃস্বত্ব করে। সে অপমানের প্রথম প্রতি-শোধ নিতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন মজঃফরপুরের প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম। তাঁদের হাতের বোমা মজঃফরপুরের রাঙা মাটিতে যে ভীষণ শব্দ তুলে-ছিল, তার প্রতিধ্বনি জেগেছিল সারা ভারতের জাতীয় জীবনে। সেই বিস্ফোরণের দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনে জড়িয়ে ছিল জাতির প্রতি জাগরণের বিপুল আহ্বান—জীবন-মৃত্যু পণ ক'রে ভারতের বন্ধন-মুক্তির জন্য জাতির প্রতিটি যুবকের হৃদয় দ্বারে আহ্বান। তারপর দেখা দিলেন যতীন্দ্রনাথ—অপূর্ব বিপ্লবী বীর শহীদ যতীন্দ্রনাথ। তিনি সন্ধান দিলেন দেশকে নতুন পথের। জাগিয়ে দিলেন—জাগিয়ে শুধু জাগালেই চলবে না, সেই জাগরণের সঙ্গে তাকে প্রস্তুত হ'তে হবে যুদ্ধের জন্য। কেবল মাত্র বাণী প্রচার ক'রেই নিরস্ত হননি যতীন্দ্রনাথ—সে বাণীকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে বিদ্রোহীবীর যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দিলেন বালেশ্বরে—অবতারের নতুন হলদিঘাটে।

তারপর দেখতে দেখতে সারা ভারতের মাটিতে জ্বলে উঠলো বিপ্লবের আগুন—ছেপে উঠলো পরাধীন দেশের প্রাণ। বিপ্লব আর শুধু শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না, জনগণের মধ্যেও দেখা দিল জাগরণ। এই নতুন বিপ্লবের ক্ষেত্রেই প্রথম দেখা দিলেন সূর্য সেন। সেটা ছিল ১৯১৭ সাল। বহরমপুরে যতীন্দ্রনাথের 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে সে-সময় সূর্য সেন জড়িত। যতীন্দ্রনাথ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং তাঁর বহরমপুরের সহকর্মী অতুল ঘোষ আর সতীশ চক্রবর্তী পলাতক। কিন্তু তাঁরা দল তখনো সক্রিয়। যতীন্দ্রনাথের আদর্শে সূর্য সেন তৈরী করেছিলেন নিজেকে। যে বিপ্লব ঐতিহ্যের মধ্যে সূর্য

সেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তাতে শুধু বিপ্লব আর আন্দোলনেই স্থান ছিল না—মুক্তির প্রেরণাও তার সঙ্গে জড়িত ছিল। সেই আদর্শকেই সাথী করে তিনি বহরমপুর থেকে চট্টগ্রামে ফিরে যান এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে একটি বিশেষ বিপ্লবীদল গড়ে তুলে তাঁর নেতৃত্বে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হ'য়ে গেছে ইতিমধ্যে। সূর্যবাবুও এই সময় কংগ্রেসে যোগ দেন—চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে। দুর্গাশঙ্করের কর্মীরা তখন কংগ্রেসের কাজের ফাঁকেই বাংলার নানাস্থানে অনেকগুলি আশ্রম স্থাপন ক'রে ফেলেন। সূর্যবাবুও 'সাম্যাশ্রম' নামে একটি ছোট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন চট্টগ্রামে কর্মী গড়ে তোলার জন্য। জালালাবাদের যুদ্ধে চট্টগ্রামের যে সব বিপ্লবী বীর সহীদ হ'য়েছেন তাঁরা সকলেই এই সাম্যাশ্রমের কর্মী ছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বিদেশী শাসকগোষ্ঠী-চক্রান্ত হ'তে উঠেছিল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কায়। সন্ত্রাসবাদীদের উৎখাত করার জন্য তাই সরকারের পক্ষ থেকে চলে ছিল অবাধ দমননীতি। এই সময় প্রায়ই কলকাতায় আসা যাওয়া করতে হ'ত সূর্য সেনকে, বাইরের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য ও স্থানীয় সংঘ গুলিকে উজ্জীবিত ক'রে তোলার জন্য। এই সময়েই তাঁর সংগঠন প্রতিভা আরো প্রোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে কোন দিনই আটকায় নি তাঁর। সর্বক্ষেত্রেই দক্ষতা ও নৈপুণ্য তাঁর সুপরিস্ফুট।

চট্টগ্রামের 'সাম্যাশ্রম' 'দুর্গাশ্রম' দলেরই একটি অংশ বিশেষ ছিল। চট্টগ্রামে ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মী, চট্টগ্রাম শাখা নামে আর একটি বিপ্লবী সংঘও ছিল, যার সভাপতি ছিলেন মাষ্টারদা সূর্য সেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান 'অনুশীলনে'র কর্মীগণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন সূর্য সেন নিজের মধুর ব্যবহার ও প্রতিভা বলে।

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের সম্মুখে, জাতির সম্মুখে ত্যাগ ও দুঃখ বরণের আদর্শ স্থাপন করলেন মহাত্মাজী। ফলে বিপ্লবীরা কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও সংহতভাবে আন্দোলনকে শক্তিশালী ক'রে তোলার কাজে এগিয়ে এলো। গোপন কার্যকলাপে ভাটা পড়লো তাই সাময়িকভাবে। তারপর যখন চৌরীচৌরার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানে গান্ধীজী বিনাসর্তে আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন, বাংলার বিপ্লবী যুবশক্তি কিন্তু সায় দিতে পারে নি তাতে। ১৯২৩ সাল থেকে আবার তৎপর হ'য়ে উঠলো সন্ত্রাসবাদীরা। সরকারের চণ্ডনীতিও উগ্ররূপ ধারণ করলে। ১৯২৪ সালে বাংলার বহু তরুণকে আইন ও শৃঙ্খলার নামে বিনাবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ল। সূর্য সেনও এ নিগ্রহ এড়াতে পারেন নি। প্রথমে তাঁকে রেঙ্গিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে এবং পরে বোম্বাইয়ের হাজিরি ও হেজলীও জেলে রাখা হয়। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি চট্টলের আরো অনেক বীরকেই সেই সঙ্গে সরকার আটক করেন।

১৯২৮ সালে জেল থেকে বেরিয়েই পুনরায় বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করেন সূর্য সেনের দল। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সম্মেলন হল, সেই সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ, একান্তে শরীরচর্চা ছাড়াও বিশেষ কিছু শিক্ষা দেবার গোপন ব্যবস্থাও স্থিরীকৃত হল। বন্দুক রোঁড়া, তরবারী চালনা, বোমা চালানো প্রভৃতি আরো অনেক কিছুই সেই বিশেষ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বোমা প্রস্তুত করার কাজ যাঁরাই করা হোকেদের দেওয়া হ'ত। পুলিশের চোখধূলিতে ধূলো দিয়ে তাঁরা এক ব্যাপক পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টায় সচেষ্ট হ'য়ে উঠলেন। বিপ্লবের জন্য চাই ব্যাপক প্রস্তুতি আর সেই সঙ্গে বিপুল প্রয়াস; সীমাবদ্ধ প্রয়াসের ক্ষণিক সাফল্যের উত্তেজনাকে কখনোই প্রশ্রয় দেন নি সূর্যবাবু, তাই আগ্রহী হ'য়ে উঠেছিলেন তিনি বাইরের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে। আশা করেছিলেন—দেশের একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যদি এক সঙ্গে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুচিত হয়, তাহলে সে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়বে অনিবার্যরূপে দেশের সর্বত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাইরের সমকর্মীদের সহযোগিতা আশানুরূপ লাভ করেন নি তিনি। তথাপি নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম হয় নি সূর্য সেনের দল। চট্টগ্রামের মাটির ওপর দিয়ে বিদ্রোহীদলের সশস্ত্র অভিযানে স্বাধীনতার ইতিহাসে আপন আসন রচিত ক'রে গেছে।.....

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সারা ভারতবর্ষে উৎসাহের বন্যা বয়ে গেল। চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংঘও রীতিমত তৎপর হ'য়ে উঠলো চূড়ান্ত সংগ্রামের একটা বিরাট আয়োজনে।

১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ওপর চরম আঘাত দেবার জন্য শুরু হ'ল গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযান। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে নবতমরূপে প্রতিভাত হ'লেন ভারতের মহামানব—অর্ধনগ্ন ফকির গান্ধীজী। একগাছি যষ্টিমাত্র হাতে নিয়ে জাতির জনক মহাত্মাজী একাকী বার হ'লেন পথে নবতর সত্যাগ্রহের জন্য। কৃষ্ণকায় কৌপীন-পিনদ্ধ সন্ন্যাসীর পদভরে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো আদমুদ্র হিমাচল ভারতভূমি। মুখর হ'য়ে উঠলো জনহীন পথপ্রান্তর। এক প্রান্ত থেকে ভারতের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে গেল একটা মহা আলোড়ন। অত্যাচার প্রপীড়িত পরাধীন জাতির জীবনে বয়ে গেল যেন একটা প্রভঞ্জনের বিপুল উচ্ছ্বাস। ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণের জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠলো দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ।

১৭ই এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের এক বৈঠক বসলো, সে বৈঠকে স্থির হ'ল ১৯শে এপ্রিল জেলা কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি অম্বিকা চক্রবর্তী, সম্পাদক সূর্য সেন এবং নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ প্রভৃতি কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যগণ সরকারের আইন অমান্য করবেন। একথা প্রচার হ'তে দেরি হল না। জেলা কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রইলো ১৯ তারিখের পরে। কিন্তু অকস্মাৎ ১৮ই তারিখে সারা চট্টগ্রামের বুক কাঁপিয়ে ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

১৮ই এপ্রিল তারিখেই রাত্রি আন্দাজ দশটার কিছু পরে একখানি

মোটর এসে দাঁড়ালো চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সম্মুখে। উচ্চপদস্থ সৈনিকের মত সুসজ্জিত পোষাকে মোটর থেকে নেমে এলেন লোকনাথ বল। অস্ত্রাগারের অলিন্দে উঠতেই একটা প্রহরী সন্দেহ ক'রে তাঁকে বাধা দিলে—চ্যালেঞ্জ করলে তাঁকে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই বাধাদানকারী প্রহরী মৃত্যুযন্ত্রণায় বুক চেপে তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো। লোকনাথের সঙ্গী ছিলেন অনেকেই এবং তাঁরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় তাঁর আশেপাশেই অবস্থান করছিলেন। পিস্তলের আওয়াজে অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মেজর কারেন বাইরে বেরিয়ে এলেন হন্তদন্ত হ'য়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুলীবিদ্ধ বুকখানাকে চেপে তিনিও লুটিয়ে পড়লেন সেইখানে। অন্যান্য প্রহরীরা প্রাণভয়ে সে স্থান থেকে পালিয়ে বাঁচলো। বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারের তালা ভেঙে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মোটরে তুলে নিলেন। তারপর অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রওনা হ'লেন পুলিস হেড কোয়ার্টারের দিকে।

যথাসময়ে আক্রান্ত হল পুলিসের হেড কোয়ার্টার। একজন শান্ত্রী সাংঘাতিক আহত হ'ল, আর সকলে আকস্মিক আক্রমণের প্রচণ্ড ধাক্কায় বিহ্বল হ'য়ে যে দিকে পারলে আত্মরক্ষা করলে পালিয়ে। তারপর একে একে সেই বিপ্লবীদল অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে দখল ক'রে নিলেন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস—ভেঙে চুরমার ক'রে ফেললেন তাঁরা এরচেঞ্জ বোর্ড। দু'তিনদিন পূর্ব থেকেই বেরিয়ে পড়েছিলেন কয়েকজন বিপ্লবী রেল লাইন নষ্ট ক'রে দিয়ে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। ১৮ই এপ্রিল মধ্যরাত্রে ধুম আর নাসিরকোটের মধ্যবর্তী রেল পথকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললেন তাঁরা। চট্টগ্রামের দিকে আসবার সময় একখানা মাল গাড়ি উলটে গেল ভাঙা লাইনে পড়ে। ফলে পথও গেল বন্ধ হয়ে।

সেই মহা উত্তেজনাকর সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটলো অল্পকালের মধ্যেই। প্রথম প্রচেষ্টা সার্থক হ'তেই বিপ্লবীরা বিপুল উল্লাসের ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে দিতে লাগলেন আলোক সাঙ্কেতের নিশানা। অন্যান্য বিপ্লবীরা সে সাঙ্কেত বুঝতে পেরে একে একে এসে জমায়েত হ'তে লাগলেন পুলিসের হেড কোয়ার্টারে। সেই রাত্রেই সেই স্থানে চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনকে প্রেসিডেন্ট ক'রে গঠিত হ'ল সাম্রাজ্যবাদীদের অস্থায়ী সরকার।

রাত্রি দুইটা উত্তীর্ণ প্রায়। বিপ্লবীরা বিজয়োল্লাসে মত্ত। কোলাহল-মুখর হ'য়ে উঠেছে পুলিস-ব্যারাক। ঠিক এমনই সময় অকস্মাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে গর্জে উঠলো পুলিস বাহিনীর কামান। ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন বিপ্লবীরা। তাঁরা বুঝলেন সে আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজসাধ্য নয়। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তাঁরা তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করলেন এবং জালালাবাদের পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন গোপনে। এই সময় পুলিসব্যারাকে অগ্নিসংযোগ করতে গিয়ে একজন কর্মী সাংঘাতিক-ভাবে অগ্নিদগ্ধ হ'লেন। তাঁর নাম—হিমাংশু সেন। গোপনে তাঁকে শহরের মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু তিনদিন পরে তিনি মারা গেলেন।

সূর্য সেন যখন পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয়গোপন করলেন তখন তাঁর সঙ্গী বেশী ছিল না। কারণ যারা পুলিসের সন্দেহভাজন হয়নি তাদের শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি পূর্বেই। অবশিষ্ট কয়েকজনকে নিয়েই পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি। খাদ্য এবং পানীয়ের কোন ব্যবস্থাই ছিল না তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, যদিও লোকবল ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

২২শে এপ্রিল পাল্টা আক্রমণ শুরু হ'ল সরকার পক্ষের। জালালাবাদ পাহাড়টাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো সরকারী পুলিশ ও সৈন্যদল। প্রচণ্ডবেগে বাধা দিতে লাগলেন বিপ্লবীরা। বারুদের ধূমে আকাশ বাতাস ধূমায়িত হ'য়ে উঠলো। একদিকে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধভোগী সৈন্য, অপরদিকে শতাব্দীর শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী দল। একটা বিরাট শক্তির বিপক্ষে সামান্য কয়েকটি প্রাণীর সে কি অসংকর সংগ্রাম!

বিপ্লবী বীর শহীদ সূর্য সেন (মাষ্টারদা')

বৃটিশ সাম্রাজ্য উচ্ছেদসাধনে সে কি প্রাণান্তকর প্রয়াস! সারা চট্টগ্রাম ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠেছিল বিস্ফোরণের সেই ভীষণ শব্দে, বন্দুকের অবিশ্রান্ত আওয়াজে, কামানের গভীর গর্জনে। সৈন্যদের গুলীর মুখে দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল কয়েকটি অমূল্য প্রাণ। তাঁদের মধ্যে—গণেশ রায়, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার, মতিলাল কানুনগো, নির্মল লালা, প্রভাস বল, নগাংক ধর, ধরণীন্দ্র দাস, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ, ত্রিপুরা সেন, হরিগোপাল বল, বিধু ভট্টাচার্য প্রভৃতি ছিলেন। এঁরাই সেই রণক্ষেত্রে জালালাবাদের মাটিকে তীর্থে পরিণত করে গেছেন।

এতগুলি সন্তানের মৃত্যুর পরেও কিন্তু শান্ত বা ভীত হয়নি বিদ্রোহীরা। একই ভাবে তাঁরা প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন সৈন্যদের আক্রমণ। তাঁদের সেই দৃঢ়তান, সেই ঐকান্তিকতা ব্যর্থ হ'ল না—

রাত্রি আন্দাজ ৮।৯টার সময় ইংরেজ সৈন্যরা জন্ত মিলে ফিরে যায়। জেলখানা ঘিরে বিপ্লবীদল বিজয় ঘোষণা করলেন ওঁদের। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় ইতিহাস রক্তাক্ষরে অংকিত হ'য়ে গেল জালালাবাদ পাহাড়ের বুকে। বিপ্লব সাধনা সার্থক হ'ল তুলনা-বিহীন আত্মদান আর ঐকান্তিকতার জন্যে!

কিন্তু বিরাট বৃটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, আয়োজন ওঁদের অতি সামান্য—লোকবলও নগণ্য। সুতরাং গেরিলা-যুদ্ধ-কৌশল অনুসরণ করাই স্থির করলেন ওঁরা। সেই রাত্রেই সদলে বিপ্লবীরা মেতে এলেন সমতল ভূমিতে এবং দলে দলে জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়লেন।

সূর্য সেন এবং তাঁর সহকর্মীদের এইসময়কার জীবন রাত্রির অন্ধকারের মতই রহস্যজনক। যুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বিপ্লবীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য রীতিমত আত্মগোপন ক'রে চলাফেরা করতে লাগলেন। গ্রাম ও শহরের লোকেরা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ওঁদের আশ্রয় দিয়েছেন, নিরাপত্তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেছেন! পরিচয় জানারও প্রয়োজন বোধ করেন নি কেউ।

এই সময় পুলিশের নির্মম অত্যাচারে চট্টগ্রামের জনসাধারণের প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। সে অত্যাচার, সে উৎপীড়ন বর্ণনার অতীত। নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের ধরবার জন্য চট্টগ্রামের প্রতি গৃহে চললো পুলিশের তল্লাসী, চললো নিষ্ঠুর নিষ্পীড়ন। ঘিরে ঘিরে ছড়িয়ে পড়লো গোয়েন্দা—বিপ্লবীদের সন্ধানে। এক একটি বিপ্লবীকে ধরিয়ে দেবার জন্য সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলে। তারপর পুরস্কারের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিলে। সূর্য সেনের মাথার ওপর দশ হাজার টাকা—অম্বিকা নিয়োগী আর গণেশ ঘোষের ওপর দুই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হ'ল। নিরীহ চট্টলবাসীদের ওপর চলতে লাগলো পুলিসের অকথ্য অত্যাচার। ক্রমেই সে অত্যাচার বাড়তে লাগলো। শেষে চট্টলবাসীদের সেই অমানুষিক পীড়নের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আত্মপ্রকাশ করলেন অম্বিকা নিয়োগী—আত্মসমর্পণ করলেন তিনি পুলিসের হাতে। যুগে যুগে বাঙালী স্মরণ করবে সেই বিপ্লবী বীরের মহান হৃদয়ের কথা।

বৃটিশ-পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে জীবন ঘোষাল সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী চন্দননগরে নিহত হন। লোকনাথ, আনন্দ আর গণেশ বন্দী হন। কিন্তু তবুও নিষ্কৃতি নেই। ১৯৩১ সালে জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় এক ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন এঁরা, যাতে চট্টগ্রামের সমস্ত পাসনযন্ত্রটাকে মুহূর্তেই বানচাল ক'রে দেওয়া চলে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের অভাব ঘটেনি কোনদিন কোন কাজে—এক্ষেত্রেও কোন সভ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

চট্টগ্রামের কলহাট নামক গ্রামে এই সময় সাবিত্রী দেবী বলে এক বিধবার গৃহে অবস্থান করছিলেন সূর্য সেন। সঙ্গে ছিলেন—নির্মল সেন, অপূর্ব সেন, প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার এবং কল্পনা দত্ত। পুলিস এখানে সূর্য সেনের সন্ধান পায়।

সেদিন রাত্রি ১০টার সময় বৃটিশ-সৈন্য বাড়ী ঘেরাও করলে। সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করছিলেন ক্যাপটেন ক্যামারন। বিপ্লবীর গুলীতে সেইখানেই তিনি মারা যান। নির্মল আর অপূর্ব এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। সূর্য সেন, কল্পনা আর প্রীতিলতাকে নিয়ে সৈন্যদের বেষ্টনী ভেদ ক'রে পলায়ন করেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের অন্যতম নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তী ১৯৩০ সালের শেষভাগে ধরা পড়লেন। কিন্তু মাষ্টারদাকে তখনো ধরা পুলিসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের হুলিয়ার জাল বিস্তৃত চারিদিকে মাষ্টারদাকে ধরার জন্য—মাষ্টারদার ছিন্নভিন্ন বিপ্লব পরিকল্পনা বৃটিশ বিভাগের। এইখানেই সূর্য সেন আশ্চর্য, অদ্ভুত, অতুলনীয়। বিপ্লবী সূর্য সেনের বীরত্ব এইখানেই। একদিকে যখন পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন ক'রে বেড়াচ্ছেন তিনি, অন্যদিকে তেমনি সুযোগ খুঁজছেন আক্রমণের। যতদিন পর্যন্ত না ধরা পড়েছিলেন তিনি, সাম্রাজ্যলোলুপ বৃটিশের চোখে ঘুম নিদ্রা লোপ পেয়েছিল ততদিন।.....

সাবিত্রী দেবীর বাড়ী থেকে বার হয়েই ওঁরা স্থির করলেন—চট্টগ্রামের উপকূলস্থ পাহাড়তলীতে ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করতে হবে। এই আক্রমণের নেতৃত্বের ভার পড়েছিল বীরকন্যা প্রীতিলতার পরে। প্রীতিলতা এই সংঘর্ষে সাংঘাতিক আহত হন এবং পরে বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

সূর্য সেন এ যাবৎ সাফল্যের সঙ্গেই পুলিসকে এড়িয়ে চলছিলেন। গুপ্ত জীবনের অতি সামান্য মাত্র কয়েকটি সঙ্গী নিয়ে ফৈরলা গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে তখন বাস করছিলেন তিনি। ১৯৩৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় যখন তিনজন সঙ্গীসহ তিনি বাড়ী থেকে বের হ'তে যাবেন, ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ ঘাবা পেলেন বাড়ীর দরজার কাছে। সামনেই তখন প্রহরীদের বেষ্টনী দেখে বন্ধুকে হাঁকিয়ে পড়লেন তাঁরা। মুহূর্ত মধ্যে শুরু হ'য়ে গেল অগ্নিবৃষ্টি—মুহুর্মুহু গর্জে উঠতে লাগলো দুই পক্ষের বন্দুক পিস্তল। গৃহকর্তা পূর্ণ তালুকদার আর তাঁর ছোট ভাই প্রথমেই নিহত হ'লেন সৈন্যদের গুলীতে। ধরা পড়লেন সূর্য সেন—যখন যুদ্ধ চালাবার পর—পালাতে পারলেন না। কল্পনা দত্ত, মণি দত্ত এবং শান্তি চক্রবর্তী মুহূর্তেকের বেষ্টনী ভেদ ক'রে বেরিয়ে গেলেন পুলিসের বেড়াজাল ভেঙে। দুই মাস তাঁদের আর কল্পনা ধরা পড়লেন।

বৃটিশের আদালত 'মাষ্টারদা' সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসীর হুকুম দিলেন—কল্পনা দত্তের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অত্যাচারী বিদেশী রাজের চরম নির্দেশ ঘোষিত হ'ল বিপ্লবীদের প্রতি।

বাঙালীর জীবনে ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাব নেই। কিন্তু মাষ্টারদার জীবনে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বাঙালীর পক্ষে অনন্যসাধারণ। তাঁর সহকর্মীগণ অনেকক্ষেত্রে অনেক রকম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন—অপূর্ব কর্মপদ্ধতি, অনবদ্য-দক্ষতা দেখিয়েছেন, সে সব কথা স্মরণ করতে গেলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। আরো বিস্ময় লাগে যখন ভাবি যার এ সবের

সামঞ্জস্য বিধানে, সমন্বয় সাধনে, মীমাংসায় অপূর্ব ব্যক্তিত্বের কথা। ওঁর কর্মতৎপরতা, বুদ্ধির স্থিরতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা বাস্তবিকই তুলনারহিত। তাঁর নির্দেশের অভাব ঘটলে বোধ হয় চট্টগ্রামের সেই বৈপ্লবিক আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'য়ে যেত। তা ছাড়া সূর্যবাবু শুধু বিপ্লবধর্মীই ছিলেন না—শুধু বিপ্লবী যোদ্ধা বা সেনানায়কই ছিলেন না, সেই সঙ্গে শিক্ষকতার একটা দিকও ছিল তাঁর মধ্যে। ভাবীকালের জাতিকে গোড়ে তোলার একটা মৌলিক পরিকল্পনা ছিল তাঁর অন্তরে। সে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লিখিত একটি রচনার মধ্যে।

যতীন্দ্রনাথের যেমন রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল একটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে, যা চন্দননগরের পথে হরিণমারা জঙ্গলে তিনি ফেলে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই সূর্যবাবুরও একটি স্বরচিত পাণ্ডুলিপির কতকাংশ পাওয়া যায় বলপাটে তাঁর আশ্রয় শিবির সংলগ্ন একটা পুকুরের জলে ভাসা অবস্থায়। উভয় বিপ্লবীর সেই অমূল্য লেখা দুটি সম্ভবতঃ নষ্ট হ'য়ে ফেলেছে সাম্রাজ্যবাদীরা, নইলে সে দুটি স্বাধীন ভারতের মহামূল্য সম্পদ বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য ছিল।

সে রচনার মধ্যে সূর্যবাবু বিপ্লবপদ্ধতির আলোচনা করেন নি—বিপ্লবের পরে সমাজ গড়ে তোলার একটি সুকল্পিত সম্ভাবই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। লিখেছিলেন তিনি—জনগণের শাসিত, স্বাবলম্বী, পরস্পরের সহযোগিতা-সমৃদ্ধ এক স্বাধীন পঞ্চায়েত রাষ্ট্রের কথা। ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এক নব পরিকল্পনার।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদীদের যে ভাঙা-গড়ার আন্দোলন চলেছিল, তার মধ্য দিয়েই আমাদের জনগণের কাছে জাগরণের আবেদন পৌঁছে গিয়েছিল। বিপ্লবের উদ্ভবের প্রথম দিকেই রাজশক্তির যেরূপ স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছিল একান্ত সাধারণ ভারতবাসীর কাছেও অভাবের তাড়না ইতিমধ্যেই অঙ্গ হ'য়ে উঠেছিল ভারতবাসীদের জীবনে। ঠিক এমনি সময়েই সূর্যবাবু রেখে গেলেন তাঁর শেষ দান জনগণের কাছে—সমসমাজের নবকল্পনার ইঙ্গিত রেখে গেলেন দারিদ্র্য-নিপীড়িত সর্বহারা ভারতবাসীর কাছে।

ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের সার্থক দান সেরে গেছেন বিপ্লবী সূর্য সেন। তাঁর কল্পনার সুর সূর্যের কিরণের মতই আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে।—ছড়িয়ে আছে জনগণের আশায় আকাঙ্ক্ষায় আর স্বপ্নে। ফাঁসীর রজ্জু পৃথিবীর মাটি থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু দেশবাসীর মনভূমিতে চির অমর তিনি। তাঁর মৃত্যু নেই।

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রে বন্দীশালার এক নিভৃততম প্রকোষ্ঠে জীবন্দীপ চিরতরে নির্বাপিত হ'ল বীর বিপ্লবী সূর্য সেনের। নির্বাপিত হ'ল ভারতের এক গৌরবদীপ্ত তারকার সমুজ্জ্বল জ্যোতি। হারিয়ে গেল বাংলার এক সুসন্তান।

শতাব্দী-সঞ্চিত অত্যাচার গ্লানি ধ্বংস আর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে যেদিন যাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দেশজননীর বন্ধন মোচনের জন্যে সেদিন যাঁদের সাধনা আজ সফল হ'য়েছে। শাসন, শোষণ ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মৃত্যু-ভীত জাতিকে অন্ধকার যুগে যাঁরা জীবনের পথে এগিয়ে চলার পথ নির্দেশ দান ক'রেছিলেন তাঁরা যুগে যুগে স্মরণীয়,বরণীয়—তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়। জাতীয় সাধনার ঐতিহ্যকে বুকের তাজা খুনে অমর রেখে গেছেন তাঁরা। তাঁদের অধিকার, তাঁদের স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই শহীদ সূর্য সেনকে।

জয়হিন্দ্…

মহাত্মাজীর বিদায়

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অহিংস যাঁরে যায় জনের কোলটি,
দোসাইল জীবনের কর্মের দোলটি।
গোলাপের বরণে যে মেয়ে ছিল ফুল্ল,
তারে কারা চিনুবে যে?—দেবতা যা ভুলবা।
যাত্রায় পথ যার কণ্টক-শূন্য,
সমাজের ঘৃণা ও ঘর অভিশপ্ত,
দারুণী যার কাছে ছিল ভাইবোনী,
মানুষের দুঃখের হাহাকার অরি,—
তাই দিয়া পাতা যার জীবনের শয্যা,
অহিংসা মাঝে যার পরম প্রেরণা।

চলবার পথ যার দুর্গম ও বন্ধুর,
আদর্শে দৃঢ় যার খুঁটিমত মন যা',
স্পর্শমণি সে পায়—লোকে বলে মর্ম,
করে তারে বিদ্রূপ মানুষের ধর্ম!
মহান সে স্থিরমুখে বাজকের হাসে,
নিজ প্রাণ বিলাইল তাহাদেরি বাসে।
চলমান জনতের দুঃখ যার লক্ষ্য।
তাঁটার মুকুট যদি পরিল সে সজ্জা।
এসেছিল যদি সে যে মানুষের সব দুঃখ,
বিদায়েতে মিল মুখে মানুষেরি সুখ!

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অলোক আলোকতীর্থের তীরে যোগমগ্ন ভগবানের ধ্যানভঙ্গ হল আকস্মিক অন্তর্বেদনায়। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনন্ত সূত্রের ফুলে ফুলে অসংখ্য কোটি গ্রহলোক, বিপুল বিস্তার নীহারিকাপুঞ্জ তাঁরই নির্দ্দিষ্ট তালে তালে নিজ নিজ কক্ষ-আবর্ত্তনে রত। চেয়ে দেখতে দেখতে দৃষ্টি পড়ল নিম্ন নবুদ এতটি আলোর দিকে। তাঁর পায় আদরের সৃষ্টি এটি। ওইকে সৃষ্টি করেছিলেন একদিন এক বেদনার মুহূর্ত্তে। বেদনার ৫ ফোঁটা থেকে ৫ ফোঁটা জল পড়েছিল। তার এক ফোঁটায় পড়েছিলেন পৃথিবী, আর এক ফোঁটা থেকে আপনিই রূপ নিয়েছিল এক চির-কিশোর। অমর প্রেম সে।

পৃথিবী রচনা করেই তিনি সে খেলা শেষ করেন নাই। পৃথিবীতে থাকবার জন্যে পড়েছিলেন মানুষকে আপনার প্রতিবিম্ব দেখে। তাদের বুকে দিয়েছিলেন আপনার বুকের সব বেদনা আর আনন্দের অংশ। ভাবনা করেছিলেন তারা আপনার মনে খেলা করতে করতে একদিন তাঁরই মত হয়ে উঠবে। সেদিন আবার আদর করে সেই বড় আদরের খেলনাটি তুলে রেখে নেবেন আপনার বুকের মধ্যে। কিন্তু মানুষের নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দেখলেন—কোথায় ভুল ঘটেছে যেন। তারা তাঁর মত হতে গিয়ে ভুল করছে বার বার, কোন্ এক তাড়নায় আঘাত করছে পরস্পরকে। আরও তাকিয়ে দেখলেন—আবার তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে চাইছে পরস্পরের দিকে। পরমুহূর্ত্তেই আঘাত করছে পরস্পরকে। ক্রোধে তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠল, চোখ জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে আবির্ভূত হল পিঙ্গল, রুক্ষ, দীর্ঘ, দীর্ঘায় এক পুরুষ। চোখে তার ক্রকুটি। আরক্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। উদ্ধত ভঙ্গিতে বিধাতার দিকে চেয়ে বললে—ডাকলে কেন আমাকে? আমি ক্রোধ। বাব, ধ্বংস করে দিয়ে আসব তোমার ঐ খেলনাটাকে। বল?

মুহূর্ত্তে বিধাতার মন ব্যথিত হয়ে উঠল, বললেন—না, না, যাও তুমি। তোমায় ডাকিনি আমি।

সে চলে গেল। মানুষের ভ্রান্তিতে আর নিজের অনুশোচনায় মন তাঁর বড় ব্যথিত হয়ে উঠল। চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ল টপ করে। অমনি সামনে এসে দাঁড়াল এক কিশোর। সেই চির-কিশোর অমর প্রেম। তার বড় বড় চোখ দুটি করুণায়, মমতায় আর আশায় সজল, মুখে সস্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসি। সে হাত জোড় করে বললে—আমায় ডাকলেন কেন পিতা?

তাকে দেখেই ভগবানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—তাকিয়ে দেখ পৃথিবীর দিকে। মানুষদের দিকে চেয়ে দেখ। আবার মুষড়ে হয়ে উঠে পরস্পরকে আঘাতে উদ্যত হয়েছে তারা। তাদের সংশোধন করে, তাদের ক্রোধ আর হিংসা ভুলিয়ে প্রসন্ন হাতে পরস্পরকে ভালবাসতে শেখাবার জন্যে বার বার তখনে পাঠিয়েছি তোমাকে। কিন্তু আমরও তাদিকে প্রেরিত করে ভুলতে পার নাই তুমি। তোমাকে বহুরূপে বহুবার পাঠিয়েছি। কখনও পাঠিয়েছি সম্পদশালী করে, রাজার বেশে। কখনও পাঠিয়েছি বিপুল প্রতিভা দিয়ে, কখনও রূপে গুণে সর্ব্বজনপ্রীতিত করে। এবার তোমায় দিলাম যা কিছুই আমার আশীর্ব্বাদ ছাড়া। এবার তুমি যাও সাধারণ মানুষের বেশে। তোমার যাবার প্রয়োজন হয়েছে আবার। তুমি আবার যাও।

সলজ্জ হয়ে অপরাধীর মত কিশোর দাঁড়াল মাথা নীচু করে। বিধাতা বললেন—লজ্জা কি পুত্র। তোমার পরাজয় তো শুধু মানুষেরই পরাজয় নয়, আমারও পরাজয়। বলে আবার তার মাথায় দিলেন হাত বুলিয়ে। বলেন—আমার বল দিলাম তোমায় হৃদয়ে, আমার মমতা দিলাম তোমার চোখে। হে আমার আদরের ধীর কিশোর, তুমি যাও। জন্ম নাও অপমানিত প্রাচীবিদগ্ধে। তোমার জন্যে হাত বাড়িয়ে আমি অপেক্ষা করে থাকব। যাও পুত্র।

বিস্মৃতির যবনিকা নেমে এল সেই চির-কিশোরের মনে।

* * * *

তারপর। ভগবানের নির্দ্দেশে তিনি জন্ম নিলেন এক অতি প্রাচীন ভূমিখণ্ডে প্রাচীবিদগ্ধে, বহুকালাবধি অপমানিত, নিষ্পাতীত, কৃষ্ণকায় আর ভাগ্যাহত মানুষের ঘরে। পিতার নির্দ্দেশে যার বার এ ভূমিতে এসেছিলেন তিনি। আবার এলেন।

বিচিত্র দেশ। যার যার মানুষকে ভালবাসবার আর ক্ষমা করবার যে বাণী এ মাটিতে ছড়িয়েছিল, তার কিছুই হারায় নাই এরা। সব ধরে রেখেছে ভালো-বেসের অন্তরালে হৃদয়ের মণিপেটিকায়। শুধু বহু শতাব্দীর প্রবিষ্কলন শুরু হয়ে বসে গেছে, ধুলো পড়েছে তার উপর, পেয়ে ভুলেই গেছে যে তার কি ছিল। অনন্ত সম্পদের অধিকারী, তবু দরিদ্র, দুর্ব্বল। শুধু কি তাই? বিচিত্র শতভাগদল তার ভূমি, প্রতিটি পল্লব পরিপূর্ণ ফল, ভাণ্ডারে তার অফুরন্ত খনধান্যিকা। তারই লোভে ভিন্ন ভূমি থেকে বার বার এসেছে লোভীর দল। পল্লব হাতে লুণ্ঠন করেছে, তারপর বর্ষিতার মত ত্যাগ করে গেছে। কিন্তু কতকগুলি লোক এ মাটিকে মা বলে এরই মমতায় থেকেই গেছে এই ভূমিতে। একদল লোভাতুর মানুষ গেছে, আবার এসেছে আর একদল। পল্লব অপহরণের উন্মত্ততায় লোভাতুর হতে সম্পদ আহরণ করেছে, নিদারুণ হিংসায় আঘাত করেছে তাকে যে বলেছে—এ দেশ আমার, এ সম্পদ আমারই দেশের, হে বিদেশী তোমার অধিকার নাই এতে। শেষে যারা এল তারা হিংসায় নির্য্যাতন করেই ক্ষান্ত হয় নি, শেষে পশ্চিম সমুদ্রপার থেকে পূর্ব

সাগরের এই শস্যশ্যামলা ভূমিকে করায়ত্ত করে সে ভূমির স্বামী হয়ে বসল তারা।

শালক হয়ে এল যারা তারা নীল চোখে, আর সাথে হাতে নিয়ে এসেছিল শাসন আর হিংসা। পশ্চিম সমুদ্র পারে তাদের দেখে তখন তারাই কর্ষণ আরম্ভ করেছিল। আঘাতের পর আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে তারা বুকবন্ধ হয়ে প্রতিহত করলে আঘাতকে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলে বুকবন্ধতায় লক্ষশক্তি। তার সঙ্গে তরুণ যৌবনের সৃষ্টির উন্মাদনায় গড়লে নানানতরো খেলনা। নিজের দেহের আর মনের শক্তিই যথেষ্ট মনে হল না তাদের কাছে। অপরিমীম শক্তিলাভের মত কামনায় জাগ্রত করলে নূতন নূতন শক্তিকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পৃথিবীর শান্ত প্রান্তে প্রান্তে লোভ-জর্জ্জর দৃষ্টি, আর হিংসায় কঠিন মন নিয়ে।

পশ্চিম সমুদ্রপারের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকচ্ছটা পড়ল এসে পূর্ব্ব-দিগন্তের মানুষদের চোখে। তাদের দেহ তখন হিংসার আঘাতে জর্জ্জর, চোখের দৃষ্টি বহুযুগের কুসংস্কারে আর বর্ব্বরতায় আবিল, প্রায় অন্ধ। এমনি সময়ে সেই চির-কিশোর আবার এলেন মানবীর কোলে, পৃথিবীর মাটিতে। কিন্তু কোথায় গেল পিতৃদত্ত অমোঘ আয়ুধ! শক্তিহীন মানবশিশু তিল তিল করে শক্তিসঞ্চয় করতে লাগলেন মাটির বুক থেকে, মানুষের মুখ থেকে, নিজের অন্তরলোক হতে।

ছোট লাজুক ছেলেটী সঙ্গিহীন হয়ে একা একা গাছের তলায় আলোয় ছায়ায় ঘুরে বেড়ায়। মনে পড়ে যায় যেন কোথাকার কথা। ঘুমের ঘোরে দেখা স্বপ্নের মত। এক একদিন কাকে যেন মনে পড়ে আবছা আবছা। অথচ মনে পড়ে না ভাল করে। মন কেমন আতুর হয়ে ওঠে। অকস্মাৎ মনের প্রান্তদেশে যেন আষাঢ়ের আসন্ন-বর্ষণ আকাশজোড়া মেঘের মত, কচি ঘাসের শ্যামলতা নিয়ে দিগ্‌বিদিগন্ত ব্যাপ্ত করে করে আবির্ভাব হয়। কোন্ আসন্নের যেন পদধ্বনি শুনতে পায় সে এক দুরান্ত থেকে। কে সে বুঝতে পারে না সে। তবু বড় ভাল লাগে। মন প্রগাঢ় শান্তিতে ভরে যায়।

সময় সময় ভয় লাগে তার। নানান জীবের ভয়, প্রেতের ভয়, অন্ধকারের ভয়, অজানার ভয় তার ছোট জীবনটিকে বিপর্য্যস্ত করে। সে মুড়ির মত থাকে চুপটি করে। তখনই বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় সে। এমনি ভয়ের মুহূর্ত্তে একদিন অকস্মাৎ সেই পরম প্রাপ্তির আবির্ভাব ঘটল। এক ভয়ার্ত্ত মুহূর্ত্তে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটল সম্পূর্ণ নূতন রূপে। সে শুনলে সত্যসন্ধ ভয়হারী পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রের কথা। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম আষাঢ়ের ঘন মেঘের মত কান্তি তাঁর। মুখে কথার হাসি।

জন্ম নিয়ে সে হারিয়েছিল যাকে, হারিয়েও যে লুকোচুরি খেলত তার সঙ্গে, তাকে ফিরে পেলে সে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভজকে জয় করার মন্ত্র পেলে। আর পেলে সত্যকে। পিতা আসবার সময় যে দিব্য আয়ুধগুলি তাকে দিয়েছিলেন তার নবরূপগুলিকে হারিয়ে আবার নূতন করে সে অর্জ্জন করলে। সত্যাগ্রহী আর অভীক হল সে। প্রেমের অক্ষয় তূণীর নিয়ে সে জন্মেছিল। তাতে শক্তিত হল দুই দিব্য আয়ুধ।

পিতার নির্দ্দেশ। তার পতিতপাবন শ্রীরামের নির্দ্দেশ। বালক থেকে তরুণ হয়ে উঠল সে। পূর্ব্ব সমুদ্রের তটভূমি থেকে সে চলল পশ্চিম সমুদ্রের পারে। সেখানে বিচরণ করে গঠন করতে লাগল সে নিজেকে। সেখানকার যারা মানুষ, তারাই শালক তার দেশের। তাদের দেখলে সে ভাল করে।

তাদের দেখলে, বুঝলে, চিনলে সে। আর দেখলে কি উন্মাদ মারণ-মন্ত্রে এরা পাগল হয়ে উঠেছে। তৃপ্তিহীন তৃষ্ণায় এরা বাড়িয়ে চলেছে তাদের বাহ্যিক শক্তি, বাহ্যিক সম্পদ, আর বাহ্যিক সম্মান। তারই উপর ভর করে রক্তচক্ষু হয়ে একদল আর একদলকে আক্রমণ করছে, আর পরিতৃপ্ত করতে চাইছে আপনার মনের ক্ষুধাকে। মনের শান্তি, বুকের বিশ্বাস আর মুখের হাসি হারিয়ে নিদারুণ ভবিষ্যতের দিকে উন্মাদের মত ছুটে চলেছে এরা।

আর এক আয়ুধ সংগৃহীত হল তার তূণে। অভিজ্ঞতার অস্ত্র। সে কি জানত কি কাজে লাগবে এ সব? শুধু পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রেরই এই অভিপ্রায় ছিল বুঝি?

ফিরে এলেন সেই যুবক আপনার মাতৃভূমিতে। এবার আবার যেতে হল নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে আর এক দেশে। পার্থিব উদ্দেশ্য ছিল জীবদেহধারী মানুষটির। কিন্তু আসার ইচ্ছা পূর্ণ হল তাঁর জীবন দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের। সেখানে গিয়ে যুবকটি দেখলেন তাঁরই মত অনেক মানুষ, কালো কালো দেহ, জড়ের মত তারা। তারা দিবারাত্র অপমানিত আর নির্য্যাতীত হয়ে অশ্রুতে অন্ধ চক্ষু, আর বেদনায় কাতর হৃদয় নিয়ে সেবা করে চলেছে শক্তিগর্ব্বী উদ্ধত সাদা মানুষের। কারাগারে ছিলেন তিনি।

নেমে এলেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধারূপে। বজ্রে ধ্বনিত হল নববাণী। মানুষ মানুষই। তার সমান অধিকার চাই। প্রয়োগ করলেন আপনার অস্ত্র—প্রথম পরীক্ষা হল তাঁর অস্ত্রের। তাঁর অহিংসার। শক্তির শঙ্কিত উগ্র দৃষ্টিকে, আর শঙ্কিত শাসনের ভয়াল তর্জ্জনীকে উপেক্ষা করে তিনি অগ্রসর হলেন। তিনি আঘাত পেলেন। আঘাত ফিরে দিলেন না। হাসিমুখে গ্রহণ করলেন তাকে। পরীক্ষায় প্রমাণ পেলেন তাঁর দিব্যায়ুধের শক্তির।

তিনি আবিষ্কার করলেন নবতর সত্যকে—সাদা মানুষ আর কালো মানুষকে মনে মনে পাশাপাশি রেখে। তিনি দেখতে পেলেন—কই, তারা তো পরস্পরের দিকে প্রেম আর বিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে নাই? সমান মর্য্যাদার ভিত্তি ভিন্ন তা কি সম্ভব? এদের একদল অপমানিত, আর একদল অপমানকারী। একজনের দৃষ্টি ভীতি আর বিদ্বেষে আবিল, আর একজন তাকিয়ে আছে কঠিন শাসনের কুটিল ভ্রূভঙ্গি করে। দুজনের দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে যুগযুগান্তর হিংসা। নিজের মাতৃভূমির কথা মনে পড়ল তাঁর। সেখানেও এই কথা। তিনি উপলব্ধি করলেন যদি তারা স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যায়, তবে

কারাই হয়ন নাই। না পাশা মানুষের, না কালো মানুষের। তিনি বুঝলেন তাঁর স্থান তাঁর মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমি অপেক্ষা করে আছে তাঁর জন্যে।

এমনি সময়ে পশ্চিম সমুদ্রপারে যে যুবক হিংসা হুঙ্কারত হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সেই হিংসার হিংসার প্রচণ্ড সংঘাত বাধল। যুবক হয়ে এতকাল যারা হিংসার অস্ত্র শান দিচ্ছিল প্রকাশ্যে আর গোপনে, তারাই পরস্পরের গলা কামড়ে ধরেছে আজ উন্মত্ত হিংসায়। তিনি বুঝলেন হিংসা আজ একটু হয়ে উঠেছে। আজ তাঁর স্থান তাঁর মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমির আহ্বান পৌঁছল তাঁর মনোলোকে। তারই মধ্য দিয়ে পূর্ণ হল শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছা। তিনি স্বভূমিতে ফিরে এলেন।

ফিরে এলেন তিনি নিজের বেশে। এলেন যোদ্ধার বেশে। নূতনতর যোদ্ধা, নূতনতর তাঁর আদর্শ। এ যোদ্ধা সংগ্রাম করবেন না, করবেন সেবা। সুপ্রাচীন সুবৃহৎ দেশ, অতি প্রাচীন আর মহৎ তার শিক্ষা, জীবনাদর্শ, তার চিন্তা। তবু মানুষগুলি হয়েছে মৃতের মত, জড়ের মত। কুসংস্কারে অন্ধ, অহমিকায় মূঢ়, আত্মপরতন্ত্রতায় কুটিল, জড়বুদ্ধি। তার উপরে দরিদ্র, অপমানিত, লাঞ্ছিত, পতিত।

তাদের সেবায় নামলেন তিনি। কিন্তু কালো মান-হারা মানুষগুলিকে মর্যাদায় আর লক্ষ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লাগল সংঘাত, এল অসন্তোষ। এতদিনে দেশের প্রাণবেগ ভরল ভাগে পশ্চিমপারের সেই তীর-দেখা অন্তর্গামী সভ্যতার আলোক রেখায় রঞ্জিত হয়ে কতকগুলি মানুষ জেগেছে। তাদের একদল স্বাধিকার লাভের নামে হয় বীর্যহীন, নয় অর্থহীন কর্মে ব্যস্ত। আর একদল গ্রহণ করেছে সেই হিংসার অস্ত্র যাতে তার প্রয়োগই আজ জ্ঞান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নূতন যোদ্ধা সবিনয়ে উপস্থাপিত করলেন তাঁর অস্ত্রটিকে। কঠিন যুক্তি দিয়ে, করুণ আবেদনে বোঝালেন তাদের—এ পথ আমাদের নয়, এ পথ প্রেমের পথ নয়। তারা বুঝল, এই নবীন যোদ্ধাকে সেনাপতি করে বরণ করলে সকলে। আমার পরীক্ষা হল তাঁর অস্ত্রের।

সেই অস্ত্র নিয়ে শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে মাতলেন পরম স্নিগ্ধের মত। ডাকলেন দেশের সকল মানুষকে। ডাকলেন স্বধর্মীকে, ডাক দিলেন ভিন্ন ধর্মীকে। এল তারা। এল ধনী, এল দরিদ্র, এল উচ্চ, এল নীচ; এল পণ্ডিত, এল মূর্খ। সূর্যালোকের আহ্বানে বীজ হতে অঙ্কুরোদ্গমের মত সব ছুটে এল। বিপক্ষকে বোঝালেন তিনি। বোঝালেন তাদের যে অপরের দেশে উভয় পক্ষের কল্যাণে সেই দেশবাসীদের হাতেই স্বাধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু বুঝল না তারা। ক্রোধে শুভ্রের নীল চোখ জ্বলে উঠল অগ্নিশিখার মত, ক্ষুব্ধিত নাসারন্ধ্র থেকে অগ্নিশিখার মত ঘন ঘন ক্রুদ্ধ নিশ্বাস পড়তে লাগল, ক্রোধে মুখ উঠল বিকৃত হয়ে। কিন্তু অহীন তিনি। হাসি মুখে হাত জোড় করে হিংসাকে নতুন করার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে অগ্রসর হলেন। হিংসার উদ্যত খড়্গ পড়ল তাঁর উপর। তিনি হাসি মুখে গ্রহণ করলেন তাকে।

এমনি একবার নয়, বার বার তিনবার। তিনি শত্রুকে পরম স্নিগ্ধ জ্ঞানে বন্ধুর মত বার বার হাসি মুখে এই-ই বোঝাতে চাইলেন—এ দেশ তোমাদের নয়, এ দেশ এই অপমানিত মানুষগুলির। এ দেশ পরিত্যাগ করলে তোমার আর এদের দুইয়েরই সমান কল্যাণ হবে। তুমি এদের পরিত্যাগ করে যাও, দেখবে তোমার মনে প্রসন্নতা আর শান্তি ফিরে এসেছে, মুখে হাসি এসেছে, ঈশ্বরের প্রসাদ পাবে অন্তরে। এরা বুঝবে এরা অপমানিত নয়, সকলের সঙ্গে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত, এরা ফিরে পাবে লুপ্ত মনুষ্যত্ব। সংসার শান্তি আর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে পতিতপাবন রামের রাজভূমি হয়ে উঠবে।

আত্মপরতন্ত্রতার অহমিকায় মূঢ় তারা, লোভে আর হিংসায় অন্ধ তারা। তারা শুনলে না তাঁর বাণী। তাঁকে শত্রু ভেবে বার বার আঘাত করলে, নির্যাতন করলে, কারারুদ্ধ করলে। তবু তিনি থামলেন না। তিনি অসহযোগ করলেন তাদের হিংসাময় শাসনের সঙ্গে, তাদের হিংসাময় শাসন ব্যবস্থাকে ভঙ্গ করলেন, সর্বসমক্ষে তীব্রকণ্ঠে বললেন—তোমরা পরিত্যাগ করো এ দেশ। তিনি অগ্রসর হলেন সংগ্রামের পথে। তাঁর পদপাতে মাটির বুকে ক্ষুব্ধ ক্ষোভ ধ্বনিত হল, জলে জলে বিচিত্র শিহরণ জাগল, বনানীশীর্ষ কম্পিত হল, মানুষের বুক নিদারুণ দুঃখে উথলে উঠল বার বার।

ক্ষেপে গেল হল সেনাপতির। ভয় হল কালো মানুষের। সাদা মানুষরা ভিন্নের মতই পরিত্যাগ করলে এ দেশ। কিন্তু যাবার পূর্বে এ কি করে গেল তারা? তবে কি দেশের সঙ্গে হিংসারও জন্ম হল। বিজয়ী সেনাপতি ব্যথায় স্তম্ভিত হলেন।

তিনি ভেবেছিলেন বুঝি হিংসা মরে গেছে। কিন্তু এক রূপে সমাপ্ত হতেই আবার আর এক রূপে আত্মপ্রকাশ করল হিংসা। এতকালের সংগ্রামে আর সেবায় যারা পাশে ছিল বিশ্বস্ত প্রেমিক অনুচর, সহকর্মী আর বন্ধু হয়ে—তাদেরই মধ্যে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করল সন্দেহ আর বিদ্বেষ। সেবা আর সংগ্রামের অবসরে কোন্ গোপনে ভিলে ভিলে সঞ্চিত হচ্ছিল যে হিংসা—তাই এখন আত্মপ্রকাশ করল সন্দেহের মধ্য দিয়ে। তিনি দেখেই চিনতে পারলেন তাকে। তিনি শিউরে উঠলেন, আর্ত মর্মভেদনায় মন হাহাকার করে উঠল। যাকে ভেবেছিলেন মৃত তাকে—সে ত মরে নাই। সে অতি ধীরে ধীরে আবার আত্মপ্রকাশ করছে। মনে হল তবে কি তাঁর আয়ুধ অপটু হয়ে গেল? নবীন বিশ্বাসে আবার তিনি সেবায় মাতলেন। এ আয়ুধ ব্যবহার পরীক্ষিত, অহিংসা আর সত্য দিয়ে এর সৃষ্টি। ভগবানের আশীর্বাদে এর ব্যবহার।

সন্দেহ থেকে বিদ্বেষ, বিদ্বেষ থেকে হিংসা উঠল জাগ্রত হয়ে। তাঁর যোদ্ধার দল আবার দাঁড়াল যুদ্ধমান হয়ে। বিভক্ত হয়ে গেল অখণ্ড দেশ, সঙ্গে সঙ্গে বিভক্ত হল মানুষ। প্রেমিক, বিশ্বাসপরায়ণ মানুষটি আজুরের মত হাত জোড় করে বিপক্ষের কাছে কাতর অনুনয় আর আত্মবলি দিয়ে ছুটে গেলেন। বার বার বোঝাতে চাইলেন—

বিশ্বাস কর বন্ধু বিশ্বাস কর, কারও বিশেষ স্বার্থে নয়, প্রতিটি মানুষের সমান স্বার্থের নামে বলছি, বিশ্বাস কর।

হিংসাই জয় হল বুঝি। অবিশ্বাসে আর হিংসায় বিশ্বত একই দেহের দুটি পৃথক অংশ পরস্পরের দিকে বিষেষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। অকস্মাৎ জ্বলে উঠল হিংসা উন্মাদ বাহু নিয়ে, নিদারুণ আঘাতে মানুষের বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করে।

ব্যথিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মানুষটি। মন অসহায় হয়ে উঠল। হতাশায় ভরে গেল মন। ভাবলেন—তবে কি তাঁকে দিয়ে ঈশ্বরের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাই হোক। কিন্তু যতক্ষণ তাঁর দেহ আছে ততক্ষণ প্রার্থনা জানাবেন মানুষের কাছে, ভগবানের কাছে।

আগুন জ্বলে উঠেছে দিকে দিকে। হিংসায় উন্মত্ত মানুষ উন্মাদের মত হত্যা করছে মানুষকে। দুর্বল, ক্ষীণ দেহ নিয়ে তিনি ছুটলেন আগুনের মাঝে হৃদয়ের অক্ষয় প্রেমের কলস নিয়ে। তাদের বোঝালেন, তাদের হয়ে প্রার্থনা জানালেন ভগবানের কাছে, তাদের হৃদয়ের শাশ্বত প্রেমের কাছে। অনশনে অনশনে ক্ষয় করলেন আপনার ক্ষীণ দুর্বল দেহ তাদের ভ্রান্তি ঘোচাবার জন্যে, শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করবার জন্যে। যেখানে গেলেন সেখানেই শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন হৃদয়ের কলস হতে। অগ্নি নির্বাপিত হল।

আবার জ্বলে উঠল আগুন দেশের কেন্দ্রস্থলে। গভীর হতাশায় মুহ্যমান হলেন তিনি। কিছুতেই কি এ আগুন নিভবে না? হিংসা নিবৃত্ত হবে না? দীপের রবির মত দেহ দিনে দিনে ক্ষয় পেয়ে সমাপ্তির মুখে এগিয়ে চলেছে বুঝতে পারছেন তিনি। যদি না যেতে, যদি হৃদয়ের প্রেম দিয়ে আর অহিংসা দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করতে না পারেন তবে তাকে নির্বাপিত করবেন তাঁর শেষতম সম্বল দিয়ে। গোপনে কঠিনতম সংকল্প গ্রহণ করে দুর্বল দেহ নিয়ে তিনি চললেন অগ্রসর হয়ে অগ্নিশিখার মধ্যে দেহ দিয়ে তাকে নির্বাপিত করতে।

সেদিন ঘনিয়ে এল। সূর্য অস্তাচলে সন্ধ্যা সাগরের তীরে ধ্যানমগ্ন হয়ে। সে ধ্যানের দিব্য স্নিগ্ধতায় আকাশলোক থেকে মর্তলোক উঠেছে রঞ্জিত হয়ে। এগিয়ে চললেন মাটির সন্তান মাটির বুকে, মুখে অক্ষয় হাসি নিয়ে। উন্মাদ হিংসা এসে দাঁড়াল সম্মুখে অগ্নিশিখার মত চক্ষু নিয়ে, কঠিন ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপ হাস্য নিয়ে, হাতে সাপের মত হিংসার অস্ত্র নিয়ে। হাতজোড় করে হাসি মুখে তাঁর জীবনদেবতা শ্রীরামকে স্মরণ করে হিংসাকে দেখবার পরাজিত করবার, প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রামে নিজের দেহকে নৈবেদ্যের মত সাজিয়ে দিলেন। শেষে যেটুকু দেবার বাকী ছিল তাই নিবেদন করে গেলেন তিনি নিঃশেষে।

* * *

আবার গিয়ে দাঁড়াল সেই চির-কিশোর তার পিতার সম্মুখে হাত-জোড় করে, মাথা নত করে। লজ্জায় অস্ফুট কণ্ঠে সে পিতার পদযুগলের দিকে চেয়ে বললে—এবারও আমি পারিনি। আমার দেহও দান করেছিলাম পিতা। তবু পারিনি।

উত্তরে পিতা তাকে বুকে তুলে নিলেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—তাতে লজ্জা কি? আবার যাবে তুমি ওদের মধ্যে। বার বার ওরা ভুল করবে, নিশ্চিত সর্বনাশের পথে এগিয়ে যাবে। তখন তুমি । যতদিন না ওরা সর্বনাশা-মুক্ত হয়ে ওঠে ততদিন যেতে হবে তোমাকে। সেদিন আমার ঐ খেলার পুতুল মানুষগুলি আমারই মত হয়ে উঠবে, সেদিন তুমি ওদের হাতে ধরে এনে আমার সামনে উপস্থিত করবে। আমি তাদের কাছে দাঁড়াব শ্রদ্ধাভরে মাথা নীচু করে। সেদিন তোমার ছুটি। এই তো আমার খেলা।

বলে পিতা প্রিয়তম পুত্রকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

স্বাধীনতার নবজন্ম

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশ—(৩)

১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারীর আলোকোজ্জ্বল প্রভাত অভিনব বর্ষজ্যোতি নিয়ে জেগে উঠল ব্রহ্মবাসীদের ঘুমন্ত আঁখি চোখের সম্মুখে। পরাধীনতার শেকল ছেঁড়ার অভিযান সার্থক হল তাদের। বৃটিশ গভর্নমেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মদেশের জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ফিরিয়ে দিলেন দেশের শাসনভার। ব্রহ্মদেশের প্রতি নাগরিকের গৃহশীর্ষে মহোল্লাসে উড্ডীন হল জাতীয় পতাকা। সরকারী ভবনগুলির শীর্ষদেশ থেকে অপসারিত হল ইউনিয়ান জ্যাক। গগনে ব্রহ্মের বাইকমিশনারের ভবনে ও ব্রহ্মের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ান জ্যাকের স্থান গ্রহণ করল। এশিয়ার আর একটি দেশে স্বাধীনতার নবজন্ম হল। এখন থেকে ব্রহ্মবাসীরা ৪ঠা জানুয়ারীকে স্মরণ করবে অতি শ্রদ্ধাভরে। আগামী কালের ব্রহ্মবাসী প্রতি বছর প্রণাম পাঠাবে এই দিনটির উদ্দেশে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবাসীর কাছে যেরূপ বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছে, ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তেমনি রূপে দেখা দিল ব্রহ্মবাসীর কাছে।

ব্রহ্মদেশ ভারতের চেয়ে অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী এই কারণে যে ভারতবর্ষের মত সুদীর্ঘকাল তাকে বৃটিশের নাগপাশে আবদ্ধ থাকতে হয় নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্মকালের এক বৎসর পরে

(১৮৮৬) ব্রহ্মদেশ বৃটীশের পদানত হয়। সেই থেকে ব্রহ্মদেশ বৃটীশ ভারতের এলাকাভুক্ত হয়ে শাসিত হতে থাকে। ভারত শাসন আইনের বিধান অনুযায়ী চলতে থাকে তার রাজনৈতিক জীবন। ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতেরই অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম তারও স্বাধীনতার সংগ্রাম বলেই স্বীকৃত হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে ব্রহ্মের মুক্তি আন্দোলনের নেতারা উদ্বুদ্ধ হন। কংগ্রেসের পতাকাতলে চলতে থাকে উভয় দেশের মুক্তি-সংগ্রাম। চতুর বৃটীশরাজ এই আন্দোলনকে হীনবল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।

ইংরাজরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রহ্মকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন, তা সিদ্ধ হল না। তার প্রধান কারণ ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু করলেন। এর পরই এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ব্রহ্মদেশ এই যুদ্ধের একটা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। জাপ আক্রমণে বৃটীশ শক্তি পূর্ব্ব-এশিয়ায় পর্য্যুদস্ত হয়ে পড়ে। ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশকে সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে পলায়ন করে। ১৯৪৪ সালে জাপানের পরাজয়ের পর ইংরাজরা আবার ফিরে আসে এবং পুনরায় নির্লজ্জভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরের কঠোর আঘাতে জর্জ্জরিত সাম্রাজ্যবাদ তখনও দাঁড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। এশিয়ার দেশগুলি ও ইউরোপীয় শক্তির শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের' জাপানের এই শ্লোগান তাদের সকলের চোখ খুলে দেয়। ব্রহ্মদেশেও ইংরাজ তাই আর শোক হয়ে বসতে পারে নি।

যুদ্ধের সময় ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদী নেতারা কূটনৈতিক দুর্ব্বলতা সম্যক বুঝতে পেরে চালাতে থাকেন তীব্র আন্দোলন। তাদের মধ্যে ছাত্র-আন্দোলনের নেতা তরুণ অউঙসান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তুলেন। নেতাজীর মতই তিনি দেশ থেকে বৃটীশ শক্তি উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বাইরের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণের নীতি গ্রহণ করলেন। দেখতে দেখতে প্রায় ত্রিশ হাজার ব্রহ্মবাসী তাঁর স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিল। ব্রহ্মে তখন ডাঃ বা-ম জাপ-তাঁবেদার মন্ত্রিসভা গঠন করে কাজ চালাচ্ছেন। অউঙসান তাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা চান। মনে মনে এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি ব্রহ্মের রাজপথী দলগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে উদ্যোগী হলেন। কম্যুনিষ্ট নেতা থাকিন নো এই বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। অউঙ সান বাইরে ভাব দেখাতে লাগলেন যে তিনি জাপানের সমর্থক। জাপানীদের কাছ থেকে তিনি এইভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করলেন।

এদিকে মিত্রপক্ষ তখন ব্রহ্ম পুনরুদ্ধারের অভিযান সুরু করেছেন। অউঙসান সুযোগ বুঝে মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে জাপানীদের বিতাড়িত করলেন ব্রহ্মদেশ থেকে এবং বৃটীশ সেনানী জেঃ উইনগেট তাঁর চতুর্দ্দশ বাহিনী নিয়ে আসবার আগেই রেঙ্গুন অধিকার করলেন অতি সকলের সঙ্গে। ইংরাজরা অউঙসানের দক্ষতা ও প্রভাব দেখে তাঁকে হাত করবার চেষ্টা করলেন। অউঙসান এই সময় যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেন তা সবাই প্রশংসায় মেনে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সিংহলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কমাণ্ডের সর্ব্বাধিনায়ক লর্ড মাউন্টব্যাটেনের (বর্ত্তমান ভারতের গভর্ণর জেনারেল) সঙ্গে এক চুক্তি করলেন। তাতে ঠিক হল অউঙসানের সেনাবাহিনীর একাংশকে ব্রহ্মবাহিনীর (বৃটীশ কম্যাণ্ডের অধীন) অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে আর এক অংশ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। অউঙসান দেখলেন যে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় মহাসমরের আঘাতে হীনবল। কোনরূপে জের টেনে চলেছে তারা। তাছাড়া কূটনের সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে শ্রমিকদল মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। এটলী মন্ত্রিসভা বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের সাফাইয়ের নীতি ঘোষণা করেছেন তখন। তাহলেও ব্রহ্মের ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর যে শাসনপরিষদ গঠন করলেন তাতে অউঙসানের ফ্যাসীবিরোধী লীগকে মাত্র ছয়টি আসন দেওয়া হল। ব্রহ্মের জনসাধারণ এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেঙ্গুনে এক বিরাট জনসভায় অউঙসানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে এবং শাসনপরিষদ ভেঙ্গে দেবার দাবী করে এক প্রস্তাব গৃহীত হল। এইভাবে আরম্ভ হয় এক তীব্র আন্দোলন। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ফ্যাসী-বিরোধী স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনে গণপরিষদের গঠনের জন্য অবিলম্বে নির্ব্বাচন দাবী করা হয়। আরও দাবী করা হয় যে এই নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য গঠন করতে হবে এক জনপ্রিয় গভর্ণমেণ্ট। এই আন্দোলনে সারা দেশময় তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি স্যর ডরম্যান স্মিথ কঠোর দমননীতি চালাতে লাগলেন। ফলে তাকে ব্রহ্ম থেকে বিদায় নিতে হল। নূতন গভর্ণর স্যর হিউবার্ট র‍্যান্স বাধ্য হয়ে শাসন পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন এবং নূতন পরিষদ গঠনের জন্য অউঙসানের সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। ফ্যাসী-বিরোধী লীগকে শাসন পরিষদে সংখ্যাধিক্য দেওয়া হল। অউঙসান ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শাসন পরিষদে যোগ দিলেন ভাইস প্রেসিডেণ্ট হয়ে। ভারতেও তার কিছুদিন আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠিত হয়েছে। অউঙসান ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়ে উঠেছে।

কম্যুনিষ্টরা অউঙসানের নীতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁরা বিরোধিতা করতে লাগলেন। দেশময় ধর্ম্মঘট, শ্রমিক বিক্ষোভ চলতে থাকে, স্থানে স্থানে দেখা দেয় অরাজকতা। এমন সময় সকলকে স্তম্ভিত করে ফ্যাসী বিরোধী লীগের পক্ষ থেকে ঘোষিত হল—"শাসন পরিষদকে যদি অন্তর্ব্বর্ত্তী জাতীয় সরকারের মর্য্যাদা দেওয়া না হয়, গণপরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে যদি এপ্রিল মাসের মধ্যে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা না হয় এবং ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে ব্রহ্মদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার

করে ঘোষণা প্রচার করা না হয় তাহলে ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ফ্যাসী বিরোধী লীগের সদস্যরা শাসন পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসবে।"

কুটনের এই ঘোষণায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ব্রহ্মের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য শাসন-পরিষদের এক প্রতিনিধি দলকে আহ্বান করলেন লণ্ডনে। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে আউঙ্গসানের নেতৃত্বে ব্রহ্ম শাসন পরিষদের এক প্রতিনিধি দল লণ্ডনে গেলেন। লণ্ডন বৈঠকে বৃটীশ সরকার যে প্রস্তাব করলেন তাতে মোটামুটীভাবে ফ্যাসী বিরোধী লীগের দাবীগুলি সমর্থিত হয়। আউঙ্গসান বৃটীশ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু মহাবামা দলের ডাঃ ধা-ম. দোবামা দলের থাকিন-বা-সীন এবং বামোচিৎ দলের উ-সু বৃটীশ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না। বৃটীশ প্রস্তাবের ত্রুটী এই ছিল যে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর মধ্যে ব্রহ্মকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার কথা তাতে উল্লেখ করা ছিল না। আউঙ্গসান এই ত্রুটী সত্ত্বেও প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন এইজন্য যে—গণপরিষদের মারফৎ তাঁরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভ করতে পারবেন। চুক্তি সম্পন্ন করে দেশে ফিরে এলেন নেতারা। আরোজন চলল গণ-পরিষদ নির্ব্বাচনের। নির্ব্বাচনে আউঙ্গসানের ফ্যাসী বিরোধী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য লাভ করে। (ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষ দ্রষ্টব্য) তারপর গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হলে আউঙ্গসানের নেতৃত্বে গণপরিষদ ১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন তারিখে এক সিদ্ধান্তে ব্রহ্মকে বৃটীশ কমন ওয়েলথের বহির্ভূত পূর্ণ স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। কিন্তু হীন রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে এই মহান দেশপ্রেমিক নেতাকেও প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়। আউঙ্গসানের আততায়ীরা অবশ্য ধরা পড়ল এবং বিচারে তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। উ-সর নেতৃত্বেই চক্রান্তকারীরা পরিষদ ভবনে হানা দিয়ে আউঙ্গসান্ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের হত্যা করে। উ-স ও তাঁর অপর আটজন সহযোগীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। এই চক্রান্তে যে বৃটীশ অফিসারগণও জড়িত তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আউঙ্গসানের মৃত্যুতে তাঁর সহকর্ম্মী থাকিন-নু নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। স্বাধীন ব্রহ্মের মন্ত্রিসভা ফ্যাসী-বিরোধী লীগের অন্তর্ভুক্ত নব-গঠিত মার্কসিষ্ট লীগপন্থীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। সোস্যালিষ্ট ও গণ-স্বেচ্ছাবাহিনীর একটা অংশ নিয়ে এই মার্কসিষ্ট লীগ গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের শতকরা ৮০জন এই দলের। পরিষদের বিরোধী দলে রয়েছে কম্যুনিষ্টগণ। অবশ্য শাসনতন্ত্রের দিক দিয়ে এই বিরোধিতা কার্য্যকরী নয়। তবে মধ্য-ব্রহ্মে কম্যুনিষ্টদের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। প্রধান মন্ত্রী থাকিননুর অভিমত—মধ্যব্রহ্মের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মূলে কম্যুনিষ্টদের প্ররোচনা রয়েছে।

গত জুলাইমাসে আউঙ্গসানের ষ ড়যন্ত্রের পর ব্রহ্মের রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। বামোচিৎ দলের নেতা উ-সু তো এখন ফাঁসীর আসামী। মহাবামা দলের নেতা ডাঃ ধা-ম পাঁচ মাস পরে লক্ষ জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। দোবামা দলের নেতা থাকিন-বা-সীন এখন কারারুদ্ধ। এই দলের আরও অনেক বিশিষ্ট নেতাও বন্দী হয়ে আছেন। কাজেই ফ্যাসীবিরোধী দলের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের বিরোধিতাকে মোটেই আমল দেওয়া চলে না।

ফ্যাসীবিরোধী লীগ ক্রমে ক্রমে রেট সোস্যালিজমের পক্ষপাতী। কম্যুনিষ্টরা মাতামাতি সোস্যালিজম চায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ব্রহ্মকে এক বিরাট ঝুঁকি নিয়ে চলতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার মুখের উপর দিয়ে যে ধ্বংসলীলা চলে গেছে তার থেকে উদ্ধার পেতে হলে তাকে বিরাট পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। এই জন্য ধীর গতিতে বিচার করে চলা দরকার। ফ্যাসীবিরোধী লীগ ঠিক পথই নিয়েছেন।

প্রতিটি ভারতবাসী তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি এই মহান কার্য্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন ব্রহ্মের সৌহার্দ্যকে তারা গভীরতর দেখতে চায়। স্বাধীন ব্রহ্মের সমৃদ্ধিতে এশিয়ার সমৃদ্ধি। স্বাধীনতার যজ্ঞও সার্থক হোক।

সব হারানো

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

তোমারে হেরেছি হৃদয়ে আমার
বাহিরে তুমি যে নাই ;
অন্তর মাঝে অসীম হইয়া
লভেছ নীরব ঠাঁই।
পরাণে আমার বিশ্বের সিন্ধি
গভীর সাগর দোলা,
বক্ষ-বসনা উষার অসীম
হৃদয়ে তাইতো খোলা।

দিকে দিকে তাই ছুটিছে পরাণ,
ছুটিছে আকাশ পানে ;
দেখা যেন শত জ্যোতির মোহনা,
কি যেন কি করে টানে।
বাহিরে ভিতরে হেরেছি আজিকে
একটি পরম ধারা,
বাসনা কামনা যত ছিল মোর
হয়ে গেছি সব হারা।

মিস্টার শেপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মায়ের নজর কিন্তু যেমন কড়া, তেমনি সজাগ। খিড়কি দরজা দিয়ে নিরাপদে সরে পড়ছিল, মা ঠিক ধরে ফেললেন যথাসময়ে।

—এই ছেলে, মাথায় কেটি বেঁধে যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

—একটু মনসাতলায় যাবো মা—তো-তো করে জবাব দিলে যদু।

—ঠিক মনসাতলায় তো ? একটুও এদিক ওদিক নয় ?

জোর করে মিথ্যে কথা বললে যদু। সাধারণত মিথ্যেটা মুখে আসে না, কেমন বোকার মতো ধরা পড়ে যায়। কিন্তু আজ বলে ফেলল, আর বলে যেন অবলীলাক্রমেই। মনের মধ্যে অন্য রকম জোর এসেছে একটা, বুকের মধ্যে কী একটা জিনিস টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, চিরদিনের নিরীহ ভালো ছেলেটির ভেতরে ঘূর্ণি হাওয়ার মাতলামির মতো ঘটে গেছে কেমন বিপর্যয় ব্যাপার।

—না মা—সজোর গলায় যদু বললে, আর কোথাও যাব না।

—মনে থাকে যেন। আর সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে—কেমন ?

—আচ্ছা।

পথে বেরুতেই খাঁচার পাখির মতো হাল্কা লাগল মন। পায়ের ব্যথাটা একটু আড়ষ্ট বোধ হচ্ছিল, আঘাতের গ্লানিটা সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়নি এখনো। তবু এই আড়ষ্টতাটা কাটাবার জন্যেই যেন সে হেঁটে চলল আরো জোর পায়ে।

—উকু—উকু—উকু—

ঠিক যেন বানরের ডাক। শূন্য থেকে ভেসে এল বলে মনে হল। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল যদু, তাকালো চারদিকে।

—উকু—উকু—হুকা—হুয়া—

বানর আর শেয়াল এক সঙ্গে ডাকছে। কিন্তু তারা তো পাখি নয় যে আকাশ থেকে ডাকবে। তা হলে নিশ্চয় মানুষ। কিন্তু ডাকছে কোথেকে ?

হতভম্বভাবে চারিদিক তাকাতেই প্রশ্নটার জবাব মিলল। রেলওয়ে গুমটিটার পাশে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার মাথা সজোরে দুলছে। তার ওপর দিয়ে গুটি তিনেক বানরের মতো মুখ কাঁচা তেঁতুল চিবুতে চিবুতে দাঁত খিঁচোচ্ছে যদুকে। তোনা অ্যাণ্ড্‌ পার্টি। বেশ আছে।

তোনা চীৎকার করে 'বাহে' ভাষায় বললে, কুন্‌ঠে থাকি মাথা কাটাই আইলু বারে ? ও গদাকড়িং, শুনিছেন ?

নষ্টচন্দ্রের ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চটে আছে ওর ওপরে। তাই অকারণ পুলকে এই শেছু-লাগা। জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করে যদু হনহনিয়ে চলে গেল।

—হুকা—হুয়া—হুয়া—ধ্বনিটা যেন পেছন থেকে তাড়া করে আসতে লাগল।

কিন্তু যেটা আসল সমস্যা সেটা দেখা দিল এর পরে। এতক্ষণ মনে ছিল না কিন্তু ভারী অস্বস্তি লাগল এবারে। একে তো বড়লোকের বাড়ি, আদব-কায়দা নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ আলাদা। এ সব বাড়ির সামনে আসতে ভয় করে যদুর, কেমন নার্ভাস বোধ হয় নিজেকে। তার ওপর আবার ডাকতে হবে পরিমলকে। পরিমলের বাবা বড়লোক, দুর্দান্ত মেজাজ, হঠাৎ চাকর দেখিয়ে বেরেন কিনা কে জানে। আর তার সেই অপ্রস্তুত অপদস্থ অবস্থাটা যদি মিতার চোখে পড়ে তা হলেই বা ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে ?

শেষ কথাটা ভাবতেই রাঙা হয়ে উঠল কপাল, ঝুঁকড়ে গেল সমস্ত উৎসাহ। সব সহ্য হবে, কিন্তু মিতার চোখের সামনে অপমানিত হওয়াটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার—মৃত্যুর চাইতেও তা সাংঘাতিক। অথচ—

রাস্তার ওপরে ল্যাম্প-পোস্টটার তলায় দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল বহ্নু।

সামনে ফুলেভরা বাগান। প্রজাপতি উড়ছে, অল্প অল্প বাতাস লেগে একটা গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ল ঝুরু-ঝুরু করে। ঢেউ-তোলা পাঁচীলটার ওপরে একটা দোয়েল যেন বহ্নুর বিব্রত অবস্থা দেখে কৌতুকে লেজ নাচাতে লাগল।

বাড়িটার দিকে মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধিৎসু আর আকুল দৃষ্টি ফেলতে লাগল সে। ওই তো দোতলায় পরিমলের পড়বার ঘর, জানালাটা খোলা, তার সামনেকার টেবিলটাকেও এখান থেকে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বহ্নু ভাবল ওখানে যদি একবার পরিমল এসে দাঁড়ায়, তবে একটা হাতছানি দিয়েও অন্তত—

নাঃ, বৃথা। পরিমল যেন পণ করেছে জানালায় সামনে এসে দাঁড়াবে না। এত বড় বাড়িতে কি একটা জনমানুষও নেই। একবার দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা পশ্চিমা চাকর, উৎসাহভরে বহ্নু তাকে ডাকতে যাবে, কিন্তু মরাত খারাপ, কী মনে করে লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় বেকুবের মতো? ইতিমধ্যে আবার উকিল সারদাবাবুর ঢ্যাঙা ফোর্ড গাড়িটা ঘটর ঘটর করে চলে গেল রাস্তা দিয়ে—লাল ধুলোয় একেবারে স্নান করিয়ে গেল বহ্নুকে। খক্-খক্-খক্। নাকে মুখে একরাশ ধুলো এসে ঢুকেছে।

আর তো পারা যায় না। এগিয়ে গিয়ে একবার ডাক দেবে নাকি বুক ঠুকে? নাকি ফিরে চলে যাবে, অথবা সোজা চলে যাবে তরুণ-সমিতির জিমন্যাস্টিক ক্লাবের উদ্দেশে? কিন্তু সেও পলায়ন—আত্মসম্মানে ভয়ঙ্কর বাধছে। মরা ঝামেলাতেই পড়া গেল যা হোক।

কিন্তু এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল যেন যাদুমন্ত্রের বলে।

—নমস্কার—

কানের কাছে যেন কাঞ্চন-নদীর ছোট একটি ঢেউ ছলাৎ শব্দে ভেঙে পড়ল।

পরণে নীল রঙের শাড়ী, কপালে কাঁচপোকার টিপ, পায়ে শাদা স্ট্র্যাপের বর্মা চটি। হাতে উল আর ফুল-কাঁটা, কোথা থেকে যেন সেলাই শিখে এল—কুমারী সংযমিত্রা লাহিড়ী।

চমকটা সামলে নিলে বহ্নু, দ্বিতীয়বারের সাক্ষাতে খানিকটা সহজভাব এসে পড়েছে নিজের মধ্যে। প্রতি-নমস্কার জানিয়ে পাশ কেটে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু কিশোরী মেয়ে মিতা আসতে আসতে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে। হাসিমুখে বললে, এখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। কেন বলুন তো?

—এই, এই—মানে—

—দাদাকে ডাকছিলেন, না?

একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল, কিন্তু কেমন একটা লজ্জায় চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছে না মিতার দিকে। বহ্নু তেম্‌নি বিব্রতভাবে বললে, হ্যাঁ, এই—

—তবে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন কেন? ডাকলেই পারতেন।

—এই ভাবছিলাম—

—চলুন, চলুন, আসুন আমার সঙ্গে—

বার্মা চটির একটা মৃদু শব্দে ধোয়া ওঠা পথটা মুখর করে মিতা বাড়ির দিকে চলল, বহ্নু অনুসরণ করল তাকে।

—আপনি তাহা লাভুক।

মেয়েদের কাছ থেকে লাভুক অপবাদ পৌরুষে ঘা দেয়। কিশোর বহ্নুর মনের ওপর থেকে বোঝা সরে গেল। এবারে সে সোজা দৃষ্টি তুলে ধরল মিতার দিকে: কেন বলছেন এ কথা।

—বাঃ, সেদিন কী কাণ্ড ছুটে পালিয়ে গেলেন। আজ আবার এসে রাস্তার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন।—গেটের কবাটটা খুলতে খুলতে মিতা বলে ফেলল: কবিদের বুঝি এই রকম লজ্জা থাকে?

—কবি!—বহ্নু থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, কবি।—মিতা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল: কিছু জানিনা ভাবছেন? সব শুনেছি দাদার কাছে। চমৎকার কবিতা লেখেন আপনি—একদিন আপনার কবিতা শোনাতে হবে।

—বাজে কথা—ঘর্মাক্ত হয়ে জবাব দিলে বহ্নু।

—বাজে কথা বই কি। আপনি তো স্বীকার করবেনই না—যা আপনার লজ্জা! আমিই না হয় একদিন আপনাদের

বাড়ি গিয়ে কবিতার খাতা চুরি করে আনব। জানেন, কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসি আমি।

জানে বহু। 'কথা ও কাহিনী'র পাতা উলটেই তা বুঝতে পেরেছে।

মিতা বললে, বসুন এই বাইরের ঘরে। দাদাকে ডেকে দিচ্ছি আমি।

দরজার মাঝখানে বিহ্বল বহুকে দাঁড় করিয়ে রেখে সিঁড়ি দিয়ে চটুল ছন্দে উঠে গেল ওপরে—চটির শব্দটা ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে এল তার।

দাঁড়িয়ে থাকবে কি বসে পড়বে ভাবতে ভাবতে দেখল কখন এক ফাঁকে একটা গদীমোড়া চেয়ারেই বসে পড়েছে। নরম কুশনের আরামে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে মনে হল যেন অনেকক্ষণ কঠিন পরিশ্রমের পরে এই মাত্র বিশ্রাম পেল সে। তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ঘরটাকে। তেমনি সুন্দর করে সাজানো, বাইরের বাগানটায় ফুল আর পাতার বিন্যাসের সঙ্গে ঘরের সজ্জাও যেন সুর মিলিয়েছে। আজকে সে ধূপের গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছে না—কিন্তু তার রেশ যেন মূর্ছিত হয়ে আছে চারিদিকে। পাথরের মূর্তিগুলো তেমনি শোভা পাচ্ছে ছোটবড়ো টিপয়ের ওপরে। সব চাইতে ভালো লাগল এক কোণে একটা নতুন মূর্তি—যেটা আগের দিন চোখে পড়েনি। ও মূর্তিটা চেনা—নটরাজ, একটা মাসিকপত্রে ওর ছবি দেখেছে। অপূর্ব লাগে ওই মূর্তির ভঙ্গিটা, কেমন রোমাঞ্চ জাগে ওর চারদিকের শিখা-বিচ্ছুরিত বহ্নি-বলয়ের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু মিতা একটা কেমন চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়েছে মনের ভেতরে—জলে ঢোলা লাগবার মতো কেমন ছলছলিয়ে উঠছে শরীর। কবি বহুর পরিচয় পেয়েছে, কৌতুক করেছে তাই নিয়ে। যেটা তার একান্ত নিজের জিনিস, যা খানিকটা করুণ বেদনার মতো সে সযত্নে আগলে রেখেছে তাকে নিয়ে পরিহাস করাটা কেমন নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হয়, যেন আশা করা যায় না মিতার কাছ থেকে। কিন্তু ইচ্ছা করেই কি এই নিষ্ঠুরতা করেছে মিতা, না সত্যি সত্যিই সে কবিতা লেখে শুনে শ্রদ্ধাবোধ করেছে তার সম্পর্কে?

আবার মিতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে চেষ্টা করল, একসঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করল অনেক কিছু। আসবার সময় তো আজ বাগানে হরিণটাকে চোখে পড়ল না। নিশ্চয় বাড়ির ভেতরে আছে হরিণটা। কী বাল ওর চোখ দুটো—ভোরবেলাকার আকাশের সঙ্গে মিল আছে সে চোখের, ভিজে ভিজে নীল—যেন সকালের শিশির-ধোয়া আকাশের রঙ। ওই নটরাজ মূর্তির যে ছবি দেখেছিল পত্রিকার পাতায়—কী যেন একটা কবিতার লাইন লেখা ছিল তার নীচে? প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে—এত দেরী করছে কেন পরিমল?

মিতা—না মিতার সম্পর্কে আর ভাববে না বহু। হঠাৎ ছেলেবেলার একটা ছবি দেখা দিল চোখে। উষা। আঙুলের ডগায় তেঁতুলের আচার চাটতে চাটতে আসছে। বিয়ে দিয়েছিল অশ্বিনী, কচুবনে ছাত্‌নাতলা করে বিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে—আর মনে পড়েছিল। কী চমৎকার সে মনে। তারপর বিয়ের শোভাযাত্রা, আর তার বিয়োগান্ত পরিণতি।

আবছা একটুখানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তার বৌ। এখন তারই মতো বড়ো হয়েছে নিশ্চয়, আর কারো বৌও হয়েছে কিনা কে বলবে। আচ্ছা, উষার রঙও যেন টুকটুকে কর্সা ছিল। মনে হয় যেন তার সঙ্গে মিতার মিল আছে, যেন সেদিনের উষাই আজ কুমারী সংখমিত্রা হয়ে—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ভাবতে ভাবতে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে মন! নিজেকে বোধ হতে লাগল অত্যন্ত অসভ্য, অপরিসীম বর্বর। সেও কি তোমার স্তরে গিয়ে নামল, যার-বাড়ির বিধবাকে নিয়ে যে কুৎসিৎ কথা ওরা বলাবলি করেছিল, ও যেন প্রায় ওই ছেলেগুলোর পর্যায়েই নেমে এসেছে। ছিঃ ছিঃ—এ বাড়িতে আসবার সে অযোগ্য, ভদ্রসমাজে মেশা তার উচিত নয়। তোমাদের সঙ্গে ওই তেঁতুল গাছের ডগায় উঠে বসাই উচিত ছিল তার।

আত্মধিক্কারের পর্বটা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ির মাথায় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। ধক্ করে উঠল বুক—মিতা? বহুর যেন তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করল চেয়ারের কুশনের ভেতরে—যে ভাবনা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে তার—কেমন করে কথা বলবে সে মিতার সঙ্গে? কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে শব্দটা আরো একটু নীচে নামতেই

পরম তৃপ্তিতে খানিকটা বাতাস টেনে নিলে ফুসফুসে। এ নিতায় পায়ের আওয়াজ নয়, সে দৃঢ়তা নেই এতে। পরিমল নামছে বোধ হয়।

সত্যই পরিমল।

জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে পরিমল বলল: একটু দেরী হল। কিন্তু মিতা যে বললে তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলি, সত্যি নাকি রে?

—ধ্যেৎ।

—শোন্, লজ্জার কিছু নেই। এখানে এসে সোজা ডাক দিবি আমাকে—কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু উঠে পড়লি যে? বোস, চা খেয়ে নিই।

—না ভাই, আজ আর চা খাবো না—

—কেন, আপত্তি কী?

—এমনিই।

কিন্তু এমনিই নয়। এ বাড়িতে আর বসতে ইচ্ছে করছে না রঞ্জুর—বেরিয়ে যেতে পারলেই খুশি হয়। একটু আগেকার বিশ্রী ভাবনাটার রেশ কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না, এখানে যতক্ষণ থাকবে যাবেও না।

—তবে চল্—

দুজনে রাস্তায় এসে পা দিল। আঃ, বাঁচা গেল যেন। চেনা, অত্যন্ত, নিজস্ব জগৎ। মাথার ওপরের আকাশটা, ধুলো আর খোয়ার ভরা পথ, কাঠের উইয়ে-খাওয়া পোস্টের ওপরে কাটা আর কালিমাখা কেরোসিনের আলো।

—লাইব্রেরীতে যাবি তো?

—সেই জন্যেই তো এলাম।

—বাড়িতে কেউ কিছু বলেনি?

—মা বকেছিলেন। ফাঁকি দিয়ে এলাম।

পরিমল হাসল, কিন্তু বিষণ্ণভাবে।

—আমার মা নেই, তাই ফাঁকি দেওয়ার দরকার হয় না কাউকে।

মা নেই শুনলে কষ্ট হয়। আহা পরিমলের মা। রঞ্জু পড়ার ঘরে তাঁর ছবি দেখেছে। অমন সুন্দর মাকে হারানো সত্যি সত্যি দুর্ভাগ্যের কথা, পরিমলের জন্যে সহানুভূতি বোধ হল।

—কতদিন মারা গেছেন তোমার মা?

—অনেক দিন। ভালো করে মনেও পড়ে না।—পরিমল মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলল।

রঞ্জু ব্যথিত হয়ে চুপ করে রইল। নিজের মায়ের মুখখানা ভেসে উঠল মনের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে করুণাদিও। আজ একবার গেলে কেমন হয় করুণাদির ওখানে? কিন্তু কে জানে তিনি কী ভাববেন।

পথ চলতে লাগল দুজনে। একটা খয়েরী রঙের কোট-পরা লোক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সাইকেলে, অনর্থক ক্রিং ক্রিং করে বেলটা বাজালো একবার। পরিমলের চলার ভঙ্গিটা শিথিল হয়ে এল, কঠিন তীব্র-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সাইকেলটার দিকে—যতক্ষণ না পথের একটা মোড় ঘুরে মিলিয়ে গেল সেটা।

পরিমলের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করলে রঞ্জু।

—চিনিস লোকটাকে?

—হুঁ।

—কে ও?

পরিমলের দৃষ্টি এবার সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল রঞ্জুর মুখে। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললে, কুকুর।

—কুকুর! সে কি?

—পরে বুঝবি—পরিমল দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করে শব্দ করলে: একদিন ওই বুলডগগুলোকে ঠাণ্ডা করতে হবে। চিরকাল এভাবে তো চলবে না, আমাদের দিনও আসবে। সেদিন সব চাইতে আগে ধনেশ্বরের পালা।

—ধনেশ্বর কে?

—সবচেয়ে বেড়ে কুকুরটা।

—কিছুই বুঝলাম না ভাই—হতাশভাবে রঞ্জু জবাব দিলে।

—তুই কবিতা লিখলে কী হবে, তোর মোটা মগজ তোর—কথার সুরে মৃদু তিরস্কার মিশিয়ে পরিমল বললে, ওরা টিকটিকির দল—দিনরাত শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেশের কথা যারা এতটুকু ভাবতে চেষ্টা করে, তাদের গলা টিপে ধরাই এদের পেশা। আর প্রভুভক্তির পুরস্কার পায় কিছু হাড়-মাংস, দুনিয়ায় সব চাইতে কুৎসিৎ জানোয়ার।

এতক্ষণে কথাটা বুঝল রঞ্জু। কেমন ছম ছম করে উঠল মন। তাদের পেছনেই লাগেনি তো লোকটা?

বারেরাস্ত বই পড়াশুনো করে সে—ফাঁসির ভাক, শহীদ সত্যেন। আইনের দিক থেকে এগুলো অপরাধ—পরিমলই বলে দিয়েছে ধরা পড়লে খুব সুখের দাড়াবে না অবস্থাটা।

যেমন ভয় করল, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি একটা প্রখর বিদ্বেষ বিষিয়ে উঠল মুখ-না-দেখা খদ্দরী মতের কোট-পরা সেই অপরিচিত সাইকেলের আরোহী সম্পর্কে। লোকটা যেন শনিগ্রহের মতো মনের দিগন্তে সঞ্চার করে দিয়ে গেল অশুভ-সংকেত।

—বাংলা দেশের বিপ্লবীরা তো কত লোককে মেরেছে, ঠাণ্ডা করে দিতে পারে না এদের?

—দেবে, দেবে।—নির্জন পথটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে নিলে পরিমল: সকলের হিসেবই তৈরী আছে, কেউ বাদ যাবে না। ওদের বিচারের সময়ও আসবে।

রঘু আস্তে আস্তে বললে, যদি আজ কানাইলাল থাকত—

—কানাইলাল শুধু কি একজন? চারদিকে হাজার হাজার কানাইলাল তৈরীই আছে—শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা। কিন্তু—পরিমল নিজের উত্তেজনাটাকে সংযত করে নিলে: রাস্তায় এসব আলোচনা নয় রঘু, মুস্কিল হতে পারে।

রঘুর বুকের ভেতরে নাকাড়া বাজতে লাগল। ভুল নেই আর, সংশয়ের অবকাশ নেই কণামাত্র। একটু একটু করে নিজের অজ্ঞাতেই পরিমল ধরা দিচ্ছে তার কাছে, আত্মপ্রকাশ করছে। এইবার শুধু আস্তে আস্তে জেনে নিতে হবে চিচিং ফাঁকের মন্ত্রটা। তাড়াতাড়ি করলে হবে না, পরিমল বলবে, আর একদিন। তা ছাড়া তরুণ সমিতি সম্বন্ধে দারোগা যা বলেছেন—

সদর রাস্তা ছেড়ে দুজনে পাড়ার মধ্যে ঢুকল। প্রায় অচেনা পাড়া, কালে ভদ্রে এসেছে দু একবার, বারোয়ারী সরস্বতী কিংবা দুর্গাঠাকুর দেখতে। পাড়ার দুটি চারটি ছেলের চেনা মুখও চোখে পড়ল, কিন্তু আলাপ নেই রঘুর। এমনিতেই তার নিরালা আর ভীরু স্বভাব—নিজের পাড়াতেই তার ঘনিষ্ঠতাটা সীমাবদ্ধ। তরুণ-সমিতির চার পাঁচটি ছেলেও তার ওই রকম মুখ-চেনা, তাদের দুজন রঘুদের স্কুলেই পড়ে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে।

• • •

কয়েকখানা বাড়ি পেরোতেই চোখে পড়ল সাইন বোর্ড। তরুণ-সমিতি পাঠাগার, ১৩৩৬ সাল।

মাটির দেওয়াল, টিনের চাল। ভেতরে খানকয়েক বেঞ্চি আর একটা লম্বা টেবিল দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে। সেই টেবিলটার দুদিকে বসে একদল ছেলে হল্লা জমিয়েছে।

পরিমল বললে, এই আমাদের লাইব্রেরী। আয় ভেতরে।

ওরা ভেতরে ঢুকল। ভীরু চোখে রঘু একবার দেখে নিলে এই নতুন পরিবেশটাকে। ঘরের দুদিকের দেওয়াল ঘেঁষে গোটা চারেক বড় বড় বইয়ের আলমারি। এক-দিকে একখানা ছোট টেবিলের সামনে চশমা-পরা আধবুড়ো একজন ভদ্রলোক খাতায় লিখে লিখে বই দিচ্ছেন দু তিনটি ছেলেকে। জনকয়েক সামনের লম্বা টেবিলটায় বসে খবরের কাগজ আর মাসিকপত্রিকা পড়ছে, একজন একখানা পত্রিকা উঁচু করে ধরে জোর গলায় কী পড়ে শোনাচ্ছে আর একজনকে। পত্রিকাটার প্রচ্ছদপট রঘু দেখতে পেল, তার নাম স্বাধীনতা, একটি বলিষ্ঠ যুবক পুরুষ—বেণুধার মতো চেহারা—দুহাতে বাঁধা লোহার শিকল ছিঁড়ে ছুটকো করে ফেলছে।

দেওয়ালে কতগুলো ছবি—মানুষের ছবি। তাদের কাউকে কাউকে রঘু চিনেছে, একজন ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে পরিচিত, অবিনাশবাবু চিনিয়ে দিয়েছিলেন—মহাত্মা গান্ধী। আর একজনকেও চিনেছে, সত্যবতী গোয়েঙ্কা, দিনকয়েক আগে খবরের কাগজ তাঁর ছবিতে ছবিতে ছেয়ে গিয়েছিল—সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যিনি প্রথম কারাবরণ করেছিলেন বাংলা দেশ থেকে। তা ছাড়া দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, রবীন্দ্রনাথও আছেন। তা ছাড়া বাকী যাঁরা, তাঁদের না চিনলেও তাঁরা যে সবাই মস্ত বড় মানুষ এটা বুঝতে কষ্ট হল না।

ছবি ছাড়াও লাল-নীল কালিতে লেখা নানা রকমের পোস্টার।

—বন্দে মাতরম্—

—ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে

মোদের বাঁধন টুটবে—

—ওরে তুই ওঠ্ আমি,

আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি?

—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।
—স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার—
—আমরা ঘুচাব মা তোর কলিমা,
মানুষ আমরা নহি তো মেষ—
—দিন আগত ওই,
ভারত তবু কই ?

এম্‌নি সব লেখা—দেওয়াল একেবারে ছেয়ে রেখেছে। আধ ঘণ্টা ধরে ওগুলোই পড়া যায় মন দিয়ে। ইংরেজিও আছে :

—Freedom is our birthright
—Equality, Liberty and Fraternity—
—Arise, awake and stop not till
the goal is reached—

প্রত্যেকটি লেখার ভেতরেই একটা নিশ্চিত দৃঢ়তা, নিষ্ঠুর সংকল্প যেন ব্যঞ্জিত হয়ে পড়ছে। ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ-সমিতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিচ্ছে, শুধু গল্প আর উপন্যাস পড়া, শুধু বসে বসে আড্ডা দেওয়া আর বক্তৃতা করা—এইটেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সত্যও নয়। মানুষ হতে হবে, বীর হতে হবে, দেশের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে নিজেকে। জিমন্যাস্টিক ক্লাবে গিয়ে দেখেছিল শরীরকে ভালো করবার আয়োজন, এখানে এসে দেখল মনকেও সুস্থ ও প্রশস্ত করে নেওয়ার ব্যবস্থা।

বড় ভালো লাগল।

ওরা ঘরে ঢুকতে কেউ কেউ ওদের দিকে তাকালে, কিন্তু কোনো কথা বললে না। শুধু দু-একজনের জিজ্ঞাসু চোখের জবাবে মৃদু হাসল পরিমল, তারপর বললে, চল বন্ধু, তোকে আলাপ করিয়ে দিই আমাদের লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গে।

(ক্রমশ)

চরৈবেতি

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সূর্য্য যায় অস্তাচলে।
যমুনার কালো জলে
লাল আলো পাংশু হয়ে আসে
রাত্রির নিঃশ্বাসে।
তৃণখণ্ড হতে বৃদ্ধ বনস্পতি গোধূলি বেলায়,
ভাবে বুঝি সূর্য্য মিতে যায়,—
কাল সপ্ত বয়সের ঋণ
পাতায় সবুজ হবে, ফুলে ফলে রহিবে বিলীন
বিবিধ বিচিত্র সাজে।
তাই মিতা সাঁঝে
আলস মৃত্যুর জন্যে নত হয়ে আসে পত্ররাজি,
বুঝিলাম আজি।
পড়িতে পারে না ওরা গোধূলি-আকাশে
অবশ্য আভাসে
সূর্য্যের অক্ষরে লেখা আগামী দিনের বরাভয়
—তোমার বিদায় ক্ষেত্রে আমি যে অধ্বর্য্য,
হে তৃণ, হে বনস্পতি, আমি ধ্রুব, আমি চিরস্থির।
জননী পৃথ্বীর
প্রান্তিহীন পরিক্রমা আলোকের চির-তপস্যায়
ব্যর্থ নাহি যায়।

সূর্য্য ফিরে আসে
তৃণখণ্ড বনস্পতি হাসে।
যমুনার-তীরে
যুগের প্রবীণ সূর্য্য হিংসাকুল রাত্রির তিমিরে
গেল অস্তাচলে।
ভারতের মহাকাশে গোধূলির লোকালয় জ্বলে।
সংখ্যাতীত খদ্যোতের আলোক-সজ্জায়
একসূত্র বিবর্ণ লজ্জায়।
এই হাহাকার মাঝে শুনেছি সূর্য্যের প্রত্যাবেশ—
দিয়েছি নিঃশেষ ;
তোমার প্রণয়ের ক্ষেত্রে তবু আমি আছি পূর্ণ হয়ে—
যেখানে তোমার প্রেম আপন নিঃশঙ্ক পরিচয়
সহস্র শতাব্দী ধরে মানুষ গড়েছে ঠিলে ঠিলে
বিধাতার মিলে।
সে ভালবাসারে ঘিরে রাত্রি হতে দিন
মানুষের ইতিহাস কোটি কল্প করে প্রদক্ষিণ।
রাখিও বিশ্বাস,
রাত্রির তপস্যা হতে তোমার চলিষ্ণু ইতিহাস
প্রভাত আনিবে ফিরে
শোণিতাক্ত যমুনার তীরে।

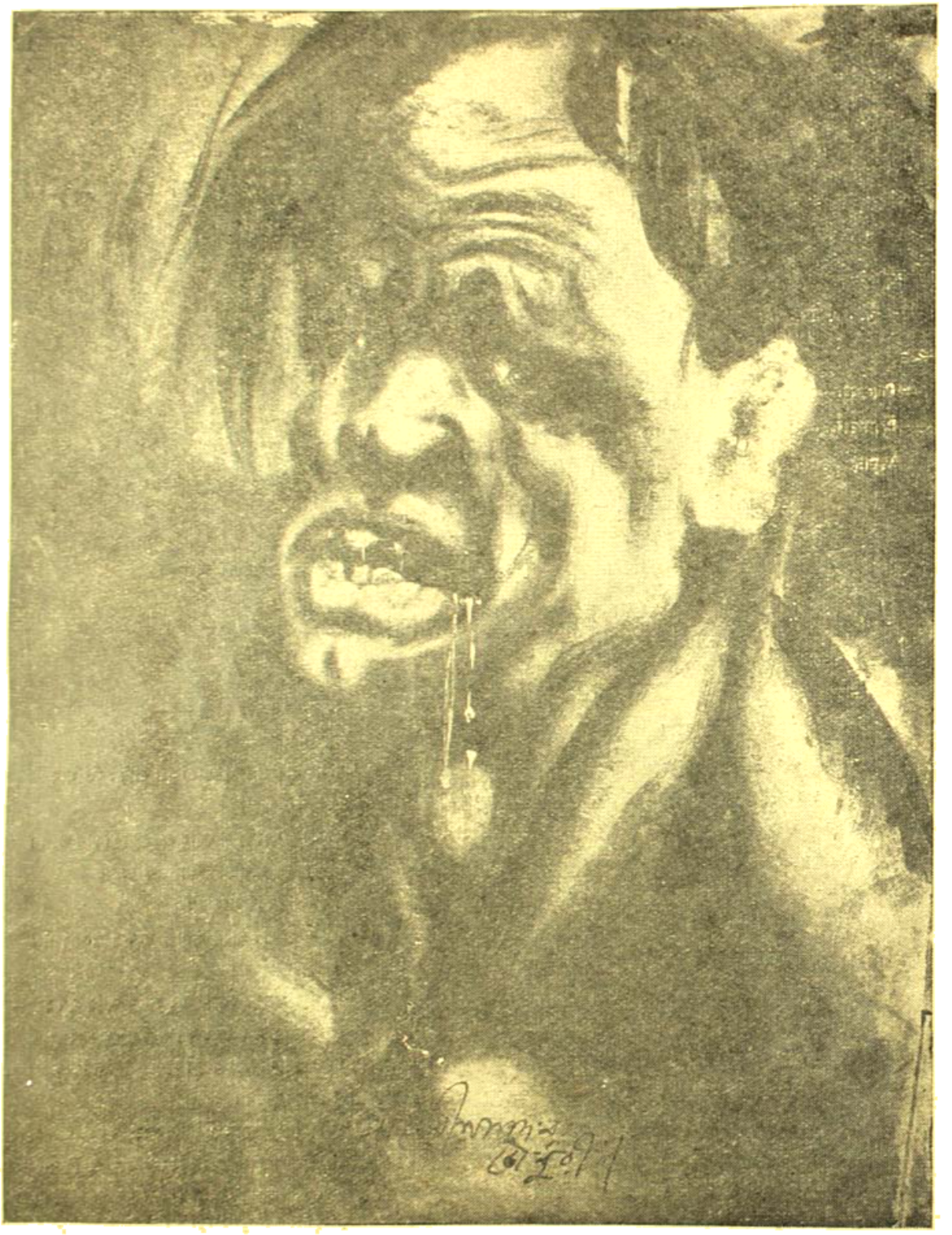

হিংস্র মানব

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (মাদ্রাজ)

ঘর নাই, ঘর নাই, ঘর নাই—হায় আজি চলিয়াছে আকাশ সমানে—বিশ্বপথে পথে। ওরা কোন বেদনার সাথী ? কে করিল ওদের বঞ্চিত ?
শিল্পী—শ্রীযুক্তা সমর চৌধুরী (কলিকাতা)

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

উদয়পুর

যোধপুরের ষ্টেশন মাষ্টার একজন ফুরোপিয়ান। ধীরেনভায়া ওঁকে বলে রাত অতিথিদের জন্য একখানি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করিয়ে রেখেছিলেন। একেবারে যোধপুর থেকে সোজা উদয়পুর যাওয়া যাবে। পথে কোথাও গাড়ী বদলের হাঙ্গামা নেই। আমরা খুব খুসী হয়ে ধীরেনভায়াকে অজস্র সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানিয়ে আমাদের লটবহর ও মালপত্র সব গাড়ীতে তুলে নিলুম। কুলি বিদায় ক'রে ইমাম তোলানাথ যখন বিছানাগুলি পাতবার ব্যবস্থা করছিল, অধ্যাপক বক্সী বললেন—একটা অনুরোধ রাখতে হবে। প্রশ্ন করলুম—আদেশ করুন। তিনি একখানি প্রথম সংস্করণের 'ওমর খৈয়াম' বই, বার ক'রে বললেন—বইখানির উপর আপনাকে একটি 'অটোগ্রাফ' দিতে হবে। 'তথাস্তু' বলে বক্সী মহাশয়ের অভিলাষ পূর্ণ করলুম।

গাড়ী ছাড়তে আর দেরী নেই, এমন সময় ট্রেন ইন্‌স্পেক্টর ও গার্ড সাহেব এসে সবিনয়ে বললেন, আপনারা অনুগ্রহ করে ট্রেনের অন্য কোনো কামরায় চলে যান। এ কম্পার্টমেণ্টখানি কেটে রাখতে হবে। কথাটা শুনে সকলেই বিস্মিত ও দুঃখিত হয়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করছিলুম। ডাঃ বিজয়কিশন্ ছুটে উঠলেন। প্রথম প্রথম এঁর নাম পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে 'ডাঃ বিজয়লাল' বলে উল্লিখিত হয়েছে। এঁর নাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসুহলেও কিন্তু সবত্র রাজপুতানায় ইনি 'ডাক্তার বিজয়কিশন্' নামেই পরিচিত। ধীরেনভায়া ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ সে ট্রেনে ঐ একখানি মাত্রই বগী—সেটি সোজা উদয়পুর পর্য্যন্ত যেত, চিতোরগড় পর্য্যন্ত যায়। অন্য কোনো কামরায় প্রথমতঃ জায়গা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, দ্বিতীয়তঃ মাঝরাত্রে গাড়ী বদলের হাঙ্গামা আছে।

ডাঃ বিজয়কিশন বললেন—সে হবে না। ট্রেন ছাড়বার আর সময় নেই। ধীরেনভায়াকে বললেন—তুমি যাও, ষ্টেশন মাষ্টারকে আমার নাম করে বলে এঁদের এই গাড়ীতেই যাবার ব্যবস্থা পাকা করে এসো।

ধীরেনভায়া তৎক্ষণাৎ ছুটলেন। ডাঃ বিজয়কিশনের নিবেধ সত্ত্বেও ইমাম তোলানাথ আবার জনকতক কুলি ডেকে এনে গাড়ী থেকে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর আমাদের জিনিসপত্র মাথাতে শুরু করে দিলে।

ধীরেনভায়া হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। বললেন—এ গাড়ীখানা আহমেদাবাদ থেকে আসছে। এই ষ্টেশনটাতেই দুর্ভাগ্যক্রমে 'হল্ট এ্যালাউ' হয়েছে, অর্থাৎ কলকত্তা সব তেতে উঠেছে। ষ্টেশন মাষ্টার বললেন—এখানাকে আজ বিশ্রাম দিতেই হবে। এর পরিবর্ত্তে আর একখানি বগী বিশেষ ভাবে এঁদের জন্য গাড়ীর পিছন দিকে জুড়ে দেবার ব্যবস্থা করে এসেছি। সেখানিও 'থ্রু' যাবে। গাড়ী বদলের প্রয়োজন হবে না।

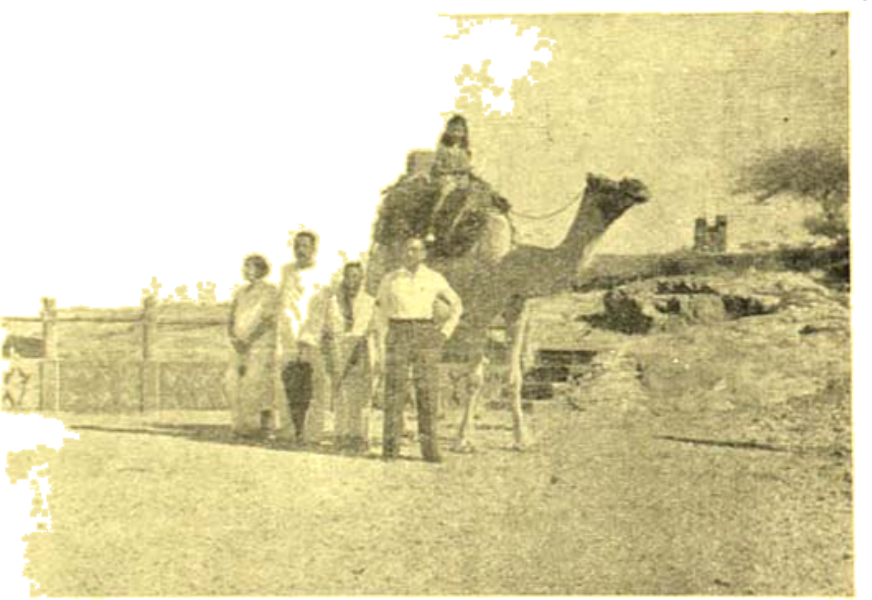

কৈলাস হ্রদের পথে—(আমরা ও মিঃ গুপ্ত)···ইষ্টুয়ার্ট পুত্তে নবনীতা

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। ট্রেনের পুচ্ছদেশে আর একখানি বগী জোড়বামাত্র আমরা সিয়ে সেটি দখল ক'রে ফেললুম। গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। দ্বিতীয় দফায় কুলিরা তাড়া করছিল। তাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিলুম। লোকসানের মধ্যে এইটুকুই যা।

শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল। তোলানাথের দেখা নেই। সেই যে

মাটির কুঁজো আর এ্যালুমিনিয়মের বড় প্যাকেজার ঘটি নিয়ে সে পানীয় জল আনতে গেছে এখনও ফেরেনি। গার্ডের বাঁশী তীব্র ধ্বনি ক'রে উঠলো। হাতে তার সবুজ আলো ঘন ঘন দুলতে লাগলো। ট্রেন ছাড়ছে! তোলানাথের তখনও পাত্তা নেই।

ডাঃ বিজয়কিশণ ব্যস্ত হয়ে উঠে বীরেনডাক্তারকে বললেন—তাই তো গাড়ী ছেড়ে দিলে যে! কি ব্যাপার! লোকটা প'ড়ে থাকবে? না না, তুমি যাও, ষ্টেশন মাষ্টারকে ব'লে গাড়ী detain করাও—

বুঝলুম—দেশীয় রাজ্যের রাজকর্ম, চারীদের কতখানি প্রতাপ। একবার বাঙ্গিলিঙ্, যাবার সময় এ-অভিজ্ঞতা হয়েছিল। টাইম ওভার হ'য়ে গেল, তবুও ট্রেন ছাড়ে না। মিনিট পনেরো কেটে গেল। শেষে অতিষ্ঠ হ'য়ে গার্ড সাহেবকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করে জানলুম—এই ট্রেনেই কুচবিহারের মহারাজা দলবল কলকাতা থেকে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁর ষ্টাফ এসে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু মহারাজা এখনও আসেন নি। প্রাইভেট সেক্রেটারী আগেই এসে ষ্টেশনে জানিয়েছেন—মহারাজার আসতে আরও মিনিট পনেরো দেরী হবে। গাড়ী যেন ছাড়া না হয়। অতএব বাঙ্গিলিঙ্ মেল সেদিন টাইমটেবল অগ্রাহ্য করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল! কিন্তু, তোলানাথের জন্য ডাক্তার বিজয় কিশণকে গাড়ী detain করাতে হল না। জানালার মুখ বাড়িয়ে যতদূর দেখা যায়, আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে তাকে খুঁজছিলুম। হঠাৎ দেখা গেল শ্রীমান তোলানাথ ছুটতে ছুটতে আসছেন। বাঁহাতের বগলে কুঁজোটা বাগিয়ে নিয়ে, বাঁ হাতেই জলের ঘটিটা দুলিয়ে ডান হাতে সে চলন্ত গাড়ীর হাতেল ধ'রে সামনের এক্সপ্রেস কামরায় যেন অবলীলাক্রমে উঠে পড়লো!

ডাঃ সাহেব এবং ডাঃ বিজয়কিশণ আমাদের যোধপুরে আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন। বিশেষ করে এ সময় উদয়পুরে ফেতে ডাঃ বিজয়কিশণ একরকম নিষেধই করেছিলেন। আমরা কিছুতেই আর যোধপুরে থাকতে রাজি নয় দেখে, অগত্যা তিনি বলেছিলেন—আপনারা যা হয় উপস্থিত বিকানীর চলে যান, কিম্বা একেবারে চিতোরগড়ে গিয়ে উঠুন। উদয়পুরে এখন যাবেন না।

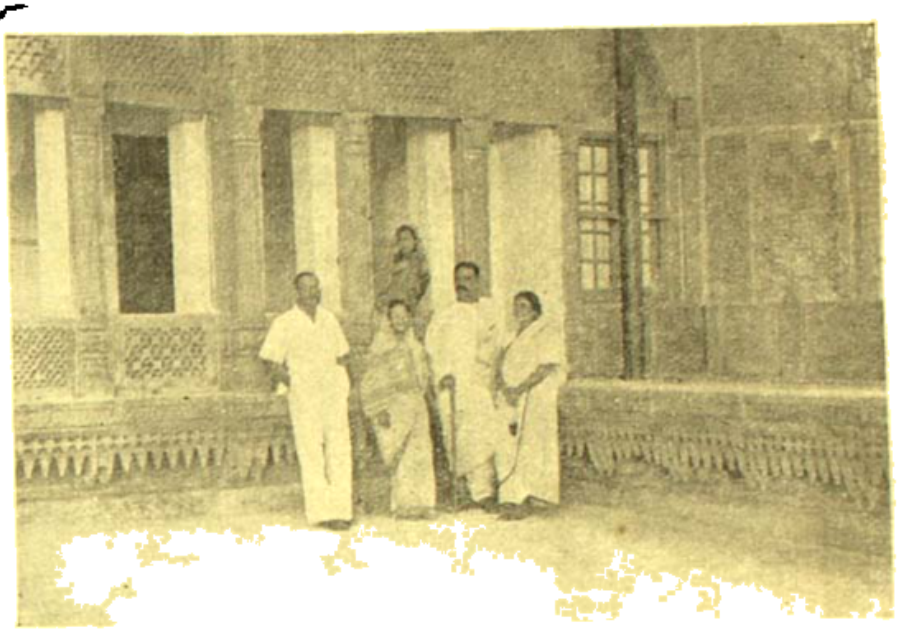

উদ্যানবাটীর এক কোণে—(আমরা ও মিঃ গুপ্ত)

রাজপুতের দেশের কূপ

রাজপুতের দেশের কূপ

যেখানে সমস্ত নেটিভ ষ্টেটের রাজা মহারাজাদের কনফারেন্স বসছে পরশু। আপনাদের সঙ্গে এই গাড়ীতেই যোধপুর মহারাজার এডিকং ও 'এ্যাচভান্স ষ্টাফ' আজ উদয়পুর যাচ্ছে মহারাজার জন্য স্পে

ব্যবস্থা করে রাখতে। মহারাজা নিজে পরশুদিন সকালে যাচ্ছেন By Air !

এই রকম ধারা 'ফলিং চীফ্' অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা তাঁদের লটবহর নিয়ে উদয়পুরের উপর চড়াও হ'য়েছেন। হতগুলি রাজপ্রাসাদ, অতিথিশালা, হোটেল প্রভৃতি আছে সেখানে, এমন কি ভাল ভাল ধর্মশালাগুলি পর্য্যন্ত এই সব রাজন্যবর্গের হাল-বেহাল অনুচর ও সাঙ্গপাঙ্গদের দ্বারা ভর্ত্তি হয়ে গেছে। খুব সম্ভব এখন কোথাও আশ্রয় পাওয়া মুস্কিল হ'য়ে পড়বে। গাড়ী ঘোড়াও পাবেন না একখানিও। উদয়পুরে ট্যাক্সী পাওয়া যায় না। অন্য সময় বিশিষ্ট অতিথিদের ব্যবহারের জন্য ষ্টেট্ থেকেও মোটর দেওয়া হয়। কিন্তু, এখন এ সময় সমস্ত যানবাহনই রাজন্যবর্গ ও তাঁদের সহচরগণের, জন্যই রিজার্ভ

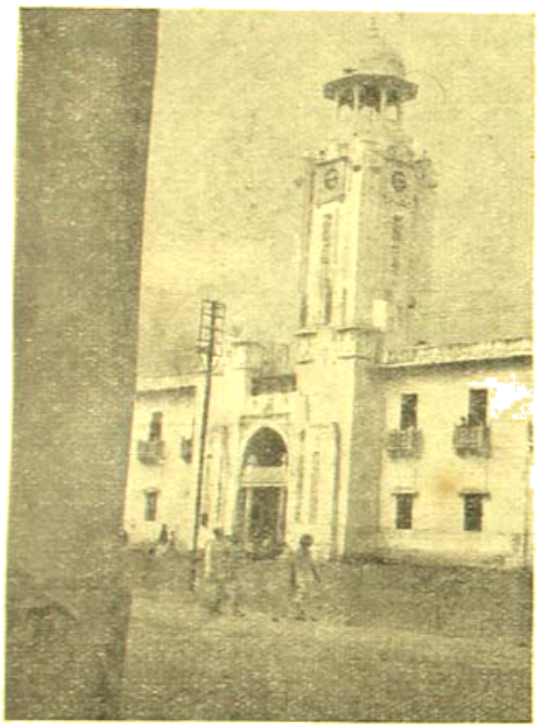

'ভক্তে-মেমোরিয়্যাল'

থাকবে। বাইরের লোকের পক্ষে একখানি গাড়ী পাওয়াও এখন সম্ভব নয়।

বন্ধুবর ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উদয়পুরের একমাত্র বাঙালী মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে আমাদের একখানি পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন এবং ভরসা দিয়েছিলেন যে প্রভাসবাবু আপনাদের কোথাও যেতে দেবেন না। তিনি আপনাদের তাঁর নিজের বাড়ীতেই সমাদরে রাখবেন। উদয়পুরে দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখবার ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি স্বজাতিপ্রিয়, অমায়িক ও অতিশয় অমলোক। চিঠিখানি বার করে ডাঃ বিজয়কিশন ও গুপ্তভায়াকে দেখাতে তাঁরা চুপ্‌টি ক'রে বলেছিলেন—সর্ব্বনাশ্! এই চিঠির উপর নির্ভর করে এখন ডাকা-ভোলের ভিতর উদয়পুরে চলেছেন ? ইনি যে এই কিছুদিন আগে স্বর্গলাভ করেছেন ! এখনও যোধপুর এক মাস পূর্ণ হয়নি !

আমরা এ দুঃসংবাদ শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলুম। কারণ, এই চিঠিখানিই ভরসা ক'রে আমরা এত জোরের সঙ্গে যোধপুরের এমন আরামের রাজ-আতিথ্য ছেড়ে উদয়পুর চলতা হচ্ছিলাম। উদয়পুরে আমাদের আর কোনও পরিচিত লোক নেই শুনে —ডাঃ বিজয়কিশন ব্যস্ত হয়ে উদয়পুরের চীফ মিনিষ্টারের নামে আমাদের কাছে একখানি চিঠি দিলেন। আর গুপ্তভায়া স্বর্গীয় সচিব প্রভাসবাবুর সুযোগ্যপুত্র সুরেশবাবুর নামে আমাদের কাছে একখানি চিঠি দিলেন।

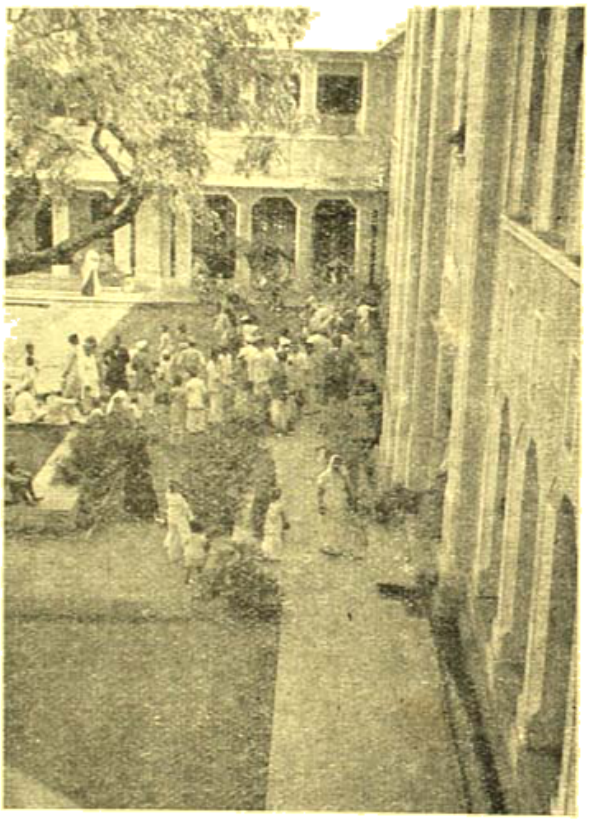

ভক্তে মেমোরিয়্যালের ভিতরের প্রাঙ্গণ

এছাড়া, যোধপুরের মহারাজার এডিকং যিনি এই ট্রেনেই আমাদের সঙ্গে উদয়পুর যাচ্ছিলেন ডাঃ বিজয়কিশন তাঁকে ডেকে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে দিলেন, উদয়পুর ষ্টেশনে আমাদের মালপত্র যেন কাষ্টম্ ও এক্‌সাইজ থেকে পরীক্ষা করা না হয়। আপনি বলে দেবেন যে—এঁরা যোধপুরের ষ্টেট-গেষ্ট্ ! ডাক্তার বিজয়-কিশন ওখানকার 'ভক্তে মেমোরিয়াল' নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অতিথিশালার ম্যানেজারকেও একখানি পত্র দিলেন, যাতে তিনি আমাদের জন্য যেমন ক'রে হোক একটা ভালো কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করেন।

যোধপুরপ্রবাসী এই দুটি বাঙালী বন্ধুর প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ

ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। কে বলে বাঙালী যন্ত্রাতি-বৎসল নয়? এঁদের এই আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে হয়ত আমরা ঐ সময় উদয়পুর ছেড়ে সাহস করতাম না।

রাত্রি প্রায় ৯'টা নাগাদ আমরা যোধপুর ছেড়ে পরদিন সকালে উদয়পুর ষ্টেশনে গিয়ে নামলাম। বেলা তখন দশটা। সকালের দিকেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হলদিঘাট ও আরাবলি গিরিবর্ত্ম এবং রাজস্থানের বিখ্যাত চৌধারী ফটক উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের ট্রেন ভারত-গৌরব মেবারের রাজধানী উদয়পুরে গিয়ে পৌঁছল। বীরের তীর্থক্ষেত্র—কত অগণিত রাজপুত রাণাদের শৌর্য্য ও বীর্য্যের লীলাভূমি এই উদয়পুরে একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধানত মন নিয়ে প্রবেশ করলুম। আমন্ত্রণ শিরস্ত্রাণ সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠছিল।

যোধপুরের মহারাজার সুশিক্ষিত এডিকং ঠিক সময়ে এসে আমাদের সঙ্গের সমস্ত লগেজগুলি আবগারী ও শুল্ক বিভাগের পরীক্ষার ঝামেলাটি থেকে মুক্ত করে দিয়ে আমাদের লোজা 'ফতে মেমোরিয়াল' অতিথিশালায় চলে যেতে বললেন। তাঁকে এখনি একবার বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে যোধপুর ক্যাম্পে উপস্থিত হ'তে হবে খবর এসেছে। ওখান থেকে কাজ সেরে তিনি ফতে মেমোরিয়ালে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বললেন। ষ্টেশনে টাঙ্গা ছাড়া আর কোনো গাড়ী ছিলনা। আমরা দু'জন লোক সঙ্গে ভেইশটি লগেজ, কারণ যোধপুর থেকে যাত্রারাড়ী সাড়ী, বাসরা জুতোর বাণ্ডিল এবং একটি জলের কুঁজো বেড়েছে। তাদের উপর রূপালি কলাই করা জলের কুঁজোটি ভারিসুন্দর। রম্য রাজপুতনার সুগভীর নিবর্শন। উটের পিঠে চড়ে মরুভূমি পার হবার সময় এই জলের কুঁজো সম্বল করে মরুপথযাত্রী বীরেরা বেরিয়ে পড়তেন। দীর্ঘদিন তাঁরা তপ্ত বালুকা সাগর পাড়ি দিয়ে কত দুস্তর গিরি কান্তার বন উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছান। কুঁজোর মুখে একটি সুগঠিত সেলাস আঁটা। জল ঢালার সুবিধার জন্য মুখে একটি সুদৃশ্য লম্বা নল লাগানো আছে। আবার জল তোলার সময় সরুমুখ জলের ঢাকনাটি খুলে ফেললেই চওড়া কাঁসের হাঁড়োল মুখ বেরিয়ে পড়বে। কুঁজোর জল ঠাণ্ডা থাকবে বলে বাইরে থেকে কুঁজোর পেটে বরফ রাখবার একটি পকেটও আছে, এবং এর সর্ব্বাঙ্গে সূক্ষ্ম শিল্পকলা সম্বলিত রঙীণ মেয়েটোপ ঢাকা আছে। গলায়, পিঠে বা কাঁধে ঝুলিয়ে অথবা ঘোড়ার পিঠে কি উটের পিঠে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য কুঁজোর গায়ে রীতিমত বন্ধনের আঁটা লাগানো আছে।

তিনখানি টাঙ্গা নিয়ে আমরা আর ছজন মানুষ দু' জনে মাল সমেত উদয়পুর ষ্টেশন থেকে 'ফতে মেমোরিয়াল' অতিথিশালা অভিমুখে রওনা হলুম। তিনখানি টাঙ্গার ভাড়া ঠিক হয়েছিল ২৲ হিসাবে ৬৲ টাকা। ফতে মেমোরিয়ালে পৌঁছে মালপত্র নামিয়ে গাড়ীভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঘোড়ার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। তখন বেলা প্রায় ১২টা বাজে। পরিচয় পত্রখানি দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কোথায় আমাদের স্নান দেবেন। প্রাসাদতুল্য বিরাট ফতে মেমোরিয়াল বাড়ীটির এমন একখানি ঘরও খালি নেই, যেখানে তিনি আমাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রতে পারেন।

উদয়পুরের রাজপথ

খাতা-পত্র দেখে তিনি বললেন ফার্ষ্ট ক্লাশ ও সেকেণ্ড ক্লাশ ঘরগুলি সবই 'হিজ হাইনেসের' অতিথিদের জন্য রিজার্ভ করা হয়েছে। ইণ্টার ক্লাশ ও থার্ড ক্লাশ ঘরগুলি সব যাত্রীতে ভরা। তবে, ইণ্টার ক্লাশ ২ নং ঘরখানি বেশক্ষি ১২।১০টা ১টার মধ্যেই খালি হ'য়ে যাবে। ঐটে আপনারা নিতে পারেন। যদিও বুকিং দিয়ে আপনাদের আগে থেকে এসে অপেক্ষা করছেন এমন যাত্রীরাও রয়েছেন, তবে তাঁরা দেশওয়ালী। আপনারা বিদেশী অতিথি, তাদেরই দেশ এসেছেন, সুতরাং, তাঁরা না হয় একটু বাইই করবেন।

যাই হোক, এখন এই ১২টা থেকে একটা পর্য্যন্ত ৬টা প্রাণী স্নানাহার করনি, সঙ্গে ২৩টা লগেজ, খাবি কোথা—রাখি কোথা—খাই কি—দাঁড়াই কোথা? মনে মনে ভাবলুম ডাঃ বিজয়তিলক ও গুপ্তজায়ার পরামর্শ ও অনুরোধ না শুনে এ সময় উদয়পুর আসাটা খুবই

অন্যায় হ'য়েছে। ম্যানেজারকে আমাদের অসুবিধার কথা জানালুম। ম্যানেজার বললেন—কিছু যদি মনে না করেন তাহ'লে আপনারা এই ঘণ্টাখানেক সময় আমাদের 'সেণ্টার হলে' যাপন করতে পারেন। ওটি আমাদের এখানকার যাত্রীদের 'ওয়েটিং রুম'। ঘর খালি না হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই জিনিসপত্র নিয়ে ওইখানেই অপেক্ষা করেন। বাজারের খাবার কিনে তাঁরা কাজ চালান।

অগত্যা ওইটিই নব সেণ্টার হল বা ওয়েটিংরুমে গিয়ে প্রবেশ করা হল। ফতে মেমোরিয়ালের সামনে কুলি ও টংগা যাত্রীদের হাজির। কুলি এনে আমাদের সমস্ত মালপত্র অতিথিশালার প্রবেশপথ থেকে টেনে সেণ্টার হলে তোলা হল।

হাঁ। ওয়েটিংরুমই বটে! হলটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রী ও তাঁদের বিচিত্র বোচকা বুচকি, ট্রাঙ্ক ও বেডিংয়ে ঘরটি বোঝাই হয়ে রয়েছে। তারই একপাশে আমাদের ২৩টি মাল যখন একে একে প্রবেশ করতে লাগল সেখানে অপেক্ষমান শ্রী সুরেশ

উদয়পুর নগরী

আমাদের প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ থেকে বোঝা গেল যে তারা কেউই সেটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাকিয়ে দেখে বস্তুর প্রতিটি তাদের বিরাগ বেশী বোঝা গেল। ৩টি ট্রাঙ্ক, ৩টি সুটকেস, একটি এ্যাটাচীকেস, ৩টি হোল্ড্-অল, একটি কিট-ব্যাগ, ২টি বেডের বাণ্ডেল, ১টি বড় বালতি, ১টি মগ, ১টি ঘটি, একটি খাবার জলের সোরাই, ১টি থার্মোফ্লাস্ক, একটি ছুরের ক্যান, একটি টিফিন ক্যারিয়ার, একটি ইকুয়িক কুকার, একটি স্টোভের ব্যাগ এবং শ্রীমান তোলানাথের এক প্রস্থ বিছানা বাক্সর বাণ্ডিল। এই ২৩ রকা মাল একটির পর একটি যখন জমায়েত হয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল, আগে হতেই যাঁরা ঘরটি দখল করে ছিলেন তাঁদের পক্ষে চঞ্চল হ'য়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ অবস্থায় আমরাও নিশ্চয়ই নবাগতদের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠতুম। ছেলের কামরা হ'লে, হয়ত ঢুকতেই দিতুম না। একই ঘরে এতগুলি বিরক্ত হ'য়ে-ওঠা, সহানুভূতি-শূন্য স্ত্রী পুরুষের মধ্যে থাকাটা অত্যন্তপ্রীতিকর মনে হওয়ায় শ্রীমান তোলানাথকে জিনিসপত্রের পাহারায় রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লুম বন্দোবস্ত করতে। 'লক্ষ্মী-নিবাস' হোটেলের মালটা শুনেছিলুম ম্যানেজারের মুখে। ঐটি নাকি উদয়পুরের একেবারে 'মহৎ আশ্রম'—অর্থাৎ বিশুদ্ধ হিন্দু ভোজনালয়। ফতে মেমোরিয়াল থেকে বেশী দূর নয়। সেইখানেই বাসনা দিয়ে আসা গেল আমাদের জন্য থালাবাটি সাজিয়ে দিতে তার তাকাদী চাটনি ও রুটি দিয়ে আসবে। দাম বেশী নয়,—মাথা পিছু পাঁচ সিকা!

ফতে মেমোরিয়ালে ফিরে আসতেই ম্যানেজার খবর দিলেন,

ডাঃ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মজুমদার

দ্বিতলের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ১নং ইণ্টার ক্লাশ কামরা এইমাত্র খালি হয়েছে, আপনারা গিয়ে দখল করতে পারেন।

যেমনি শোনা অমনি আর কথাবার্ত্তা নয়, তুলিতেকে তড়মুড় করে সব জিনিসপত্র নিয়ে ঐ ১ নং ইণ্টার ক্লাশ কামরাখানি দখল করতে ছুটলুম। কিন্তু ঘরে পৌঁছে, তার চেহারা দেখে একেবারে ঘমে গেলুম। ঘরখানি ১২'×১৫'র বেশী হবে না। ঘরে প্রবেশের একটী মাত্র দরজা, এবং তারই দুদু দুদু একটি মাত্র জানালা, অবশ্য দুপাল্লা খড়খড়ি লাগানো খোলা বড় জানালা। জানালার কোলে একটু ছোট 'বাঙ্কবর্থ'।

বাসিচারের মধ্যে একখানি চারপাই, একটী কমাইনড্ ড্রেসিং ও রাইটিং টেবল এবং একখানি চেয়ার। আধলা আধে দেওয়ালের

গায়ে আঁচ। একজন লোকের পক্ষে ঘরখানি বন্ধ নয়, কিন্তু আধডজন লোকের পক্ষে 'ব্ল্যাক-হোল' বলা যায়! মন আরও খারাপ হ'য়ে গেল ঘরের কোনও সংস্রব রাখবার নেই এবং যাখানা অজানক নোংরা দেখে। রাত্রে এঘরে আমাদের বাস করা কিছুতেই চলতে পারে না। এমনকি সেটা কল্পনাও করা যায় না। অতএব, খেয়ে উঠেই অন্যত্র কোথাও যাবার ঠিক করতে যেতেই হবে স্থির হয়ে গেল। উপস্থিত কিছুক্ষণ মাথা গোঁজবার মতো এই গহ্বরটিকেই গ্রাহ্য করে নিতে হ'ল।

(ক্রমশঃ)

১৩৫৫ সাল

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

গত ৭ই চৈত্র ১৩৫৪ সাল ইংরাজি ২০শে মার্চ ১৯৪৮ শনিবার ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড সময় রাত্রি ১০টা ২৭ মিনিটে সূর্য বিষুব রেখার উপর এসেছেন। এই সময়ের গ্রহ সংস্থান আগামী এক বৎসরের জন্য পৃথিবীর উপর প্রভাব স্থাপন করবে। এ সময়ের গ্রহ সংস্থান এই রকম ছিল—

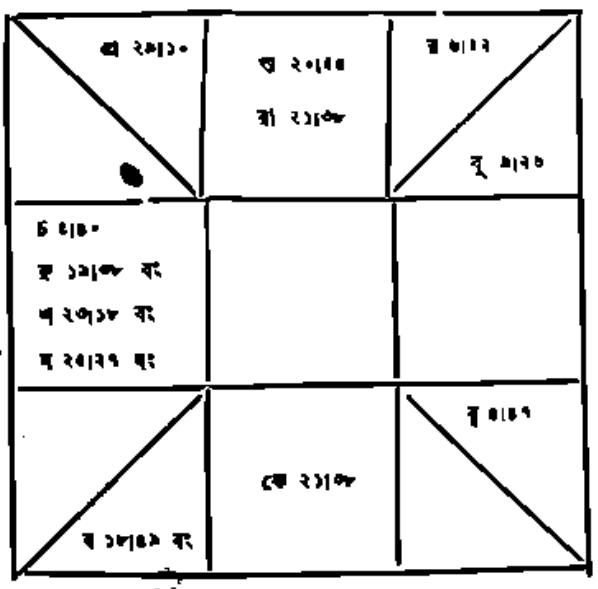

এবৎসর রবি নানা গ্রহের শত্রুপ্রেক্ষায় পীড়িত, কিন্তু চন্দ্র পাপ গ্রহযুক্ত হ'লেও বলবান্ এবং রবিকে মিত্রপ্রেক্ষায় অনুপ্রাণিত করবে। এর ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নানারকম গণ্ডগোল ও বিপক্ষনক অবস্থায় সম্মুখীন হতে হবে, সাময়িকভাবে প্রজাসাধারণের সহানুভূতি, সমর্থন ও সহযোগিতা তাঁরা পেতে পারেন কিন্তু প্রত্যেক দেশেই নানা শ্রেণীর বিরুদ্ধ প্রভাবে কর্তৃপক্ষের সংগঠন চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হবে। সব দেশেই কর্তৃপক্ষ প্রজাসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু নানারকম বাধা দানের ফলে সে চেষ্টা কোন ক্ষেত্রেই সার্থক হ'য়ে উঠবে না। প্রত্যেক দেশেই কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা হবে, কিন্তু কতক উৎপাদন বৃদ্ধি হ'লেও, দৈব দুর্বিপাক, চলাচলের বাঁধ, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সহযোগিতার অভাব, পরস্পরের গোপন বা প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কারণে বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের কোন শৃঙ্খলা থাকবে না এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বহু অপচয় ঘটবে।

আর্থিক ব্যাপারে সর্বত্রই একটা অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষিত হবে, কোন কোন দেশে একাধিকবার আর্থিক নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

প্রত্যেক দেশকেই নিজের নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে এমনিই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে যে, অপর দেশের দিকে সহানুভূতি-পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ কেউ পাবে না। প্রত্যেকদেশের বৈদেশিক নীতিতে একটা হৃদয়হীন উদাসীনতা লক্ষিত হবে।

এবৎসর ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থান উভয়েরই লগ্ন হয়েছে তুলা, কিন্তু ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে রবি এবং পাকিস্তানের মঙ্গল।

ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ রবি ষষ্ঠস্থ। এক চন্দ্র ছাড়া অপর কোন গ্রহের শুভ প্রেক্ষা তার উপর নেই। রবি সপ্তম কেতুর অশুভ-প্রেক্ষা থেকে বিমুক্ত হয়ে দশমস্থ শনির অশুভ প্রেক্ষায় যুক্ত হচ্ছে। সুতরাং বছরটিকে ভারতের পক্ষে মোটেই সুবৎসর বলা চলে না। জ্যোতিষের মতে ষষ্ঠভাব নির্দেশ করে; সেই সব ব্যাপার—যার সঙ্গে সাধারণ স্বাস্থ্য, অন্ন-বস্ত্র, দেশের প্রম-শক্তি, সৈন্যবল, দেশরক্ষার চেষ্টা ইত্যাদির সম্বন্ধ আছে। সূর্য একাদশ ভাবের অধিপতি এবং একাদশ ভাব নির্দেশ করে রাষ্ট্রপরিষদ বা আইন সভা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদকে দেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে নানারকমে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে এবং এ বিষয়ে নানা রকমের চেষ্টা হলেও তা সুপরিকল্পিত বা সুপ্রযুক্ত হ'তে পারবে না। ভারতীয় রাষ্ট্রের নেতাদের পক্ষে বছরটি মোটেই সুবিধার নয়। যদিও আইন-সভার সভ্য ও নেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতারা আইন সভার সমর্থন ও আনুগত্য পাবেন, তা'হলেও অনুদর্শন নীতির জন্য সাধারণের কাছে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতের রাশি চক্রে এ বছর লগ্নে কেতু এবং তা তার ভাগ্যনিয়ন্তা ষষ্ঠস্থ রবির অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত। কেতু একদিকে যেমন নির্দেশ করে সর্বহারা, পঙ্গু, অক্ষম, অসহায়—নিরাশ্রয়কে, অপরদিকে তা নির্দেশ করে গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী, দুর্নীতিপরায়ণ, দস্যু, রাহাজান প্রভৃতি শ্রেণীর জীবকে। তা ছাড়া দেশের সাধারণ অনুন্নত সম্প্রদায়, আদিবাসী, পাহাড়ী ইত্যাদি এবং বুদ্ধিবিবেচনাহীন গোঁড়ামির সূচকও কেতু। সুতরাং এই

সংগ্রহে নানারকমের অসুবিধার ব্যাপার দেখের মধ্যে ঘটবে এবং রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা এ বছর কোনমতেই ঠিকভাবে তার মীমাংসা করতে পারবেন না। এ বছর বেকার সমস্যা এবং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান ও বিপৃহীত স্ত্রীলোকের ব্যাপার দেশের একটা প্রধান সমস্যা হ'য়ে উঠবে। রাষ্ট্রনায়কদের এ নিয়ে খুবই চিন্তিত হ'তে হবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত সরকার পক্ষ থেকে দেশের শ্রমিক ও ধনিকদের মধ্যে সহযোগের চেষ্টা যতই হোক, তা কোন মতেই সম্পূর্ণ সফল হবে না।

রাষ্ট্রনায়কেরা মনে রাখলে ভাল করবেন যে এ বৎসর তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক ব্যাপারে নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে বটে, কিন্তু সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে শ্রমিক ও দেশ রক্ষার সমস্যা। যুদ্ধ জাহাজ, সামরিক বিমান ইত্যাদি সংগ্রহের জন্ত দেশের মধ্যে সুশিক্ষিত বাহিনী গঠনের আয়োজন করিতে হবে, তবুও বাহিরের ও ভিতরের ব্যাপার তা সুশৃঙ্খল ভাবে গ'ড়ে উঠবে না।

ভারতের তৃতীয়ে বৃহস্পতি ও পঞ্চমে বুধ থাকায় শিক্ষার ব্যাপারে কিছু উন্নতি সূচনা করে, কিন্তু পঞ্চমস্থ বুধের কোন জোরালো শুভ দৃষ্টি না থাকায় শিক্ষার ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার সম্ভব হবে না এবং তা কতকটা গতানুগতিক ভাবেই চলবে। উক্ত বৃহস্পতির সঙ্গে রবির ও শনির অশুভ প্রেক্ষা থাকায় অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করবেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আধার ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্ত স্বাধীন মতপ্রকাশের অছিলায় কর্তৃপক্ষকে হেয় করার কিম্বা কোন রকম গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টাও হবে। তৃতীয়ে বৃহস্পতি চলাচলের এবং পূর্ত ও যানবাহনের ব্যাপারে কর্মতৎপরতা নির্দেশ করে। সুতরাং নূতন রাস্তাঘাট তৈরী, পুরানো রাস্তার সংস্কার, নূতন গৃহাদি নির্মাণ ইত্যাদির জন্ত সরকারীভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক চেষ্টা চলবে। এ সংগ্রহে যথেষ্ট কাজও হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে কাজের অনুপাতে ব্যয় খুব বেশী হবে এবং চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্নীতিমূলক অপব্যয় ও অপচয় এড়ানো যাবে না।

বর্ষপতি রবির সঙ্গে যখনই বুধের সম্বন্ধ আছে এবং চন্দ্রের সঙ্গে তার যখনই মিত্রপ্রেক্ষা আছে, এ ছাড়া আর কোন শুভপ্রেক্ষা তার উপর নেই। বর্ষপতি বৃহস্পতি বলবান হলেও নানা ভাবে পীড়িত সুতরাং নানা রকম বিস্তারের জন্ত জাতিগঠনমূলক কাজের সকল চেষ্টা পিছিয়ে যাবে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত চেষ্টা হলেও স্বাস্থ্যের অবনতিই ঘটবে এবং নানা রকম সংক্রামক ব্যাধিতে ও মারীতে দেশ প্রপীড়িত হবে। বছরের শেষের দিকে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কিছু উন্নতি হওয়া সম্ভব।

বর্ষপতি শুক্র সপ্তমে থাকায় ভারতের বৈদেশিক নীতিতে সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ পাবে এবং অপর দেশের সঙ্গে সৌহার্দমূলক নানা রকম চুক্তি করার চেষ্টাও চলবে, কিন্তু শুক্র পীড়িত হওয়ায় অধিকক্ষেত্রে যে সকল চুক্তির ব্যবস্থা রচিত হবে না। বহুক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্ত ষড়যন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা ভারতের স্বার্থহানি ঘটবে ও অনেক সময় কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্র ভারতের নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচারেও দ্বিধা করিবে না। পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রকাশ্য বিবাদ হওয়া সম্ভব—এমন কি শক্তিপরীক্ষার উপক্রম হওয়া অসম্ভব নয়। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির ব্যাপারেও নানারকম গণ্ডগোল দেখা যাবে এবং অনেক সময় রপ্তানী মালের ন্যায্য মূল্য পাওয়া যাবে না, ও আমদানী মালের জন্ত অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে, যাতে ক'রে রাষ্ট্রের অর্থের বহু ক্ষতি হবে।

প্রজাপতি অষ্টমে থাকায় অর্থাভাবে সংস্কারমূলক কোন কাজ অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু প্রজাপতি দশমস্থ মঙ্গলের শুভপ্রেক্ষা পাওয়ায় যুদ্ধ সজ্জা ও সামরিক ব্যাপারে কিছু সংস্কার আশা করা যায়। যুদ্ধসজ্জা ও সামরিক কার্যকারিতার জন্ত ব্যয় বাহুল্য ঘটবেই। তা ছাড়া সাধারণত ব্যয়বাহুল্যের জন্ত সরকারকে নূতন করও বসাতে হবে এবং নূতন ঋণও গ্রহণ করতে হবে। অষ্টমস্থ প্রজাপতি অকস্মাৎ মৃত্যুর ও অপঘাতের সূচক, সুতরাং এ বছরে ঐ রকমের মৃত্যুর আধিক্য ঘটবে। বিশেষতঃ যানবাহন ও রেলপথে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাবে।

দশমে চন্দ্র ক্ষেত্রে আছে এবং সেখানে রবি, শনি ও নীচস্থ মঙ্গলও আছে এবং এ তিনটি গ্রহই বক্রী। দশমে চন্দ্র বলবান হওয়ায় এবং তা রবির শুভপ্রেক্ষা পাওয়ায় এ বছর গণপরিষদের প্রণীত রাষ্ট্রতন্ত্র নেতাদের দ্বারা সমর্থিত ও পৃহীত হবে এবং ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণাও করা হবে; কিন্তু সে রাষ্ট্রতন্ত্র বিধিবিধানে জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না—প্রকাশ্যভাবে তার বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। দশমে রবি ও শনি বক্রী হওয়ায় রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ সৃষ্টির নানারকম অপচেষ্টা হ'তে পারে যা দমনের জন্ত বিশেষ আইন বা অর্ডিনান্স করা প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া, প্রদেশে প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাজকর্মের স্বেচ্ছাচার ও শক্তিপ্রিয়তা প্রভৃতির সমাধানের জন্ত রাষ্ট্রের পরিচালকদের বিশেষভাবে বিব্রত হ'তে হবে। নানা দিকে ব্যস্ত হ'য়ে ও নানা ভাবে বিব্রত হওয়ার জন্ত রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সুদৃঢ় নীতি গ্রহণ করতে পারবেন না এবং অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের নীতি ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে দ্বিধা, সংশয়, অস্পষ্টতা ও ইতস্তত ভাব লক্ষিত হবে। অবশ্য দশমপতি চন্দ্র দশমে থাকায় শেষ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে রাষ্ট্রনেতাদের প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা পুনরায় অর্জিত হতে পারে কিন্তু নেতাদের সামনে এ বছর যে একটা মস্ত বড় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপস্থিত হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

একাদশপতি মঙ্গল বক্রী থাকায় এ বছর সাধারণের নির্বাচনের জন্ত সাধারণের পক্ষ থেকে সরকারের উপর চাপ পড়তে পারে, কিন্তু নির্বাচন কোনমতেই সম্ভব হবে না। দেশের মধ্যে নানারকম স্বার্থের সংঘাতে যথার্থ ঐক্য গ'ড়ে উঠতে পারবে না এবং ঐক্যের নামে একটা যোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থাই চালু করার চেষ্টা হবে কিন্তু স্থায়ীভাবে সমস্যা মিটিবে না—ভিতরে ভিতরে একটা অসন্তোষ ধুমায়িত হ'তে থাকবে।

দ্বাদশে দ্বাদশ বক্রী এবং তা জায়মিত্রা রবির সঙ্গে সমসপ্তম হওয়ায়

আর তার ঘনিষ্ঠ গুরুত্বেরা হচ্ছে ধনব রাশির সঙ্গে। কন্যা নির্দেশ করে কোটিপতি ধনিককে এবং বরণও ধনপতিকে দুইই নির্দেশ করে গুপ্ত কার্যকলাপ বড়যন্ত্র ইত্যাদি। এতে বোঝা যাচ্ছে যে এ বছরও ধনিক রাজত্বই চলবে এবং গণতান্ত্রিক বা সংস্কারমূলক সব আন্দোলনের গতিই ব্যাহত হবে। ধারণে বরণ থাকায় জনহিতকর কতকগুলি কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হবে—যেমন দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট তৈরী, খাল কাটা ইত্যাদি, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা থাকবে, যাতে করে এই সব জনহিতকর কাজের মধ্যেও ধনিকের শোষণ চিরার পথ খোলা থাকে। বিশ্বযুদ্ধাদীদ সমাজতন্ত্র এবং বৃথা রক্ত দেশের সমস্যাকে আরও জটিল ক'রে তুলবে বলে মনে হয়।

এক হিসাবে পাকিস্তানের জাগা এ বছর ভারতের চেয়ে ভাল বলতে হবে। পাকিস্তানকেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে বটে, কিন্তু দশমস্থ মঙ্গল তার ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়াতে, বিচার বিবেচনার চেয়ে গায়ের জোরেই সে তার সব মীমাংসা করতে চাইবে। মঙ্গল যষ্ঠী এবং নীচস্থ হলেও তা দশমস্থ এবং শনির সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে রাজযোগকারক হয়েছে ও প্রধানপতির সঙ্গে তার প্রথম সংযোগী শুভদৃষ্টি।

যাঁরা আমার লেখা "গণিত জ্যোতিষের মূলসূত্র" পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে, রবি বিজ্ঞানময়ের, অর্থাৎ বুদ্ধিবিবেচনার ক্ষেত্র, তার মূলসূত্র হচ্ছে সাম্য, উদারতা এবং উচ্চতর নীতিবোধ ও সংস্কৃতি; অপর ক্ষেত্রে মঙ্গল প্রাণময়ের অর্থাৎ শক্তির ক্ষেত্র; তার মূলময় হচ্ছে অহং ও পরমত অসহিষ্ণুতা, শক্তির দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা। তুঙ্গস্থানগত ও পীড়িত রবি ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায়, ভারত তার অনুসৃত উদার নীতির জন্য যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করবে। কিন্তু এই নীতির ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে তাকে কম-বেশী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে মঙ্গল ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় পাকিস্তানের অনুসৃত নীতি হবে শক্তির নীতি, তার জন্যে প্রকট হবে একনায়কত্ব ও সামরিক শাসন। তার ফেল-ঘন্ব, দলাদলি ইত্যাদি সকল ব্যাপারের মীমাংসা হবে শক্তির জোরে। তার নীতি উচ্চতর সংস্কৃতি বা নীতিবোধকে পীড়িত করলেও তা শক্তির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করবে অন্ততঃ বর্তমান বর্ষে। শক্তির এই অপপ্রয়োগের যে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় না অথবা স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠালাভ হয় না, তা বলাই বাহুল্য।

ভর

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

ব্যাপারটা খুব তুচ্ছ সূত্র ধরেই আরম্ভ হোল।

বাবুদের বাড়ীর মুচি-বি "দাসী" মানুষটা নিতান্তই সাধা-সিধা সাধারণ শ্রমিক-শ্রেণীর নারী। অতিশয় নিরীহভাবে নির্ব্বিবাদে "গতর খাটিয়ে" এতদিন জীবিকা নির্ব্বাহ করছিল। প্রকৃতিতে ক্রূরতা কুটিলতা যেন-কিছু থাকলেও ঠাকুর দেবতা বা অধ্যাত্মতত্ত্ব নিয়ে কোনও জ্ঞান বা ভক্তির মাতামাতি তার ছিল না। আকৃতিতে বেঁটে খাটো ক্ষয়া-ক্ষয়া চেহারা। শ্যামবর্ণ। বয়সে নাতি নাতনীদের দিদিমা হলেও খর্ব্ব ক্ষয়া চেহারার জন্য তাকে অল্পবয়স্কার মত দেখাত। অন্ততঃ নিজে সে তাই মনে করত। সে সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব-ঘটিত তর্ক ও যুক্তি আপাততঃ আলোচনা না করাই ভাল।

মেয়ে-জামাইয়ের ঘরে বাস করত। জামাতা শ্রীমান ষষ্ঠী বাবাজীও শ্রমিক এবং উগ্র মাত্রায় গঞ্জিকাসেবী। তাদের দু একটি সন্তানও হয়েছিল, কিন্তু বাঁচে নি। সম্প্রতি কন্যার আবার সন্তান হবার সম্ভাবনায় দাসী মাস খানেকের জন্য মনিব বাড়ী থেকে ছুটি নিয়েছিল।

যথাকালে তার কন্যার নির্ব্বিঘ্নে একটি সন্তান হয়েছে খবর পাওয়া গেল এবং দিন কতক পরে দাসী এসে আবার বাবুদের বাড়ীর কাজে ভর্ত্তি হোল।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মত ঘর ধুয়ে, বাসন মেজে, গরু বাছুরের সেবা করে, হাট বাজার করলে। কিন্তু থেকে থেকে কেমন-যেন চমকে উঠতে লাগল। কাজ করতে করতে হঠাৎ থমকে আড়ষ্ট-কাঠ হয়ে দাঁড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে নিজের মনে এলো মেলো কথা বলতে লাগল। কেমন যেন বিশৃঙ্খল-চিত্ততার পরিচয় দিতে লাগল।

বাড়ীর সকলের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হোল। সকলে বিস্ময় বোধ করলেন।

বাড়ীর অধিবাসিনী মেয়ে দুটি অতিশয় কোমলহৃদয়া। দাসীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে তাঁরা—বিশেষতঃ বড় নতুন

দিদি অত্যন্ত সমবেদনা বোধ করলেন। সহানুভূতি প্রকাশ করে তিনি বললেন "দাদা, তোমার শরীরটা কি ভাল নাই?"

দাসী হাতের কাজ ফেলে স্থির হয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে ভীষণ রহস্য-ব্যঞ্জক স্বরে বললে—"চার দিন পরে আমার মেয়ের জাঁতুড় উঠবে। তারপর আগে গঙ্গা-নেয়ে আসি, এসে সব বলব।"

ছোট দিদি মাট্রিক পরীক্ষার্থিনী। কথাটা কানে যেতেই বই খাতা ফেলে ছুটে এলেন। ব্যগ্র কৌতূহলে বললেন "কেন দাসী? কি হয়েছে? এখন তা বলতে নেই কেন?"

দাসী স্থির-গাম্ভীর্যে বললে "গঙ্গা নাওয়ার আগে সে সব কথা বলতে "দেবোতা" বারণ করেছে। গঙ্গা নাওয়ার পর তিনি আমাকে ছেড়ে যাবেন। তখন সব বলব।"

দু চক্ষু কপালে তুলে নতুন দিদি বললেন "দেবোতা! দেবোতা কোথা পেলে গো? এঁ্যা? কি বলছ? কি রকম দেবতা?"

ছোট দিদি বললেন "দেবোতা তোমায় ছেড়ে যাবেন? মানে? কোনও দেবতা তোমায় আশ্রয় করেছেন বুঝি?"

ছেলের বোকনো নিয়ে দাসী খোকাকে কেন খাওয়াতে যাচ্ছিল। দিদিদের প্রশ্ন শুনে বোকনো নামিয়ে রাখলে। রোয়াকের প্রান্তে জাঁকিয়ে বসল। দাসী জানত, দুই দিদিই পরম সহৃদয়া এবং অতিশয় ধৈর্যশীলা শ্রোত্রী। যদিও তার তথা কথিত 'দেবোতার' নিষেধ—কিন্তু অবরুদ্ধ মানসিক-উত্তেজনায় বাষ্পোত্তাপ উন্মোচন করার জন্য প্রাণটা তার রীতিমত আন্‌চান করছিল। অতএব নিরাহ নিকপট নতুন দি' ও ছোটদির কাছে, গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে নিজের হৃদয়ভার লঘু করাই উচিত বোধ করলে? তাতে দেবতার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য সম্ভবতঃ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না।

গুরু-গাম্ভীর্য মণ্ডিত মুখে, এক টানা সুরে সে বলতে লাগল তার সুদীর্ঘ কাহিনী! শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য-হীন, অদ্ভুত, অলৌকিক ব্যাপার!

কাহিনীর মূল মর্মার্থ:—তার কন্যার সূতিকাগারের পরিচর্য্যা কালে অকস্মাৎ এক 'দেবোতা'—(তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা আপাততঃ নিষেধ) তার ঘরে কিম্বা মুতে, তাও ঠিক বুঝতে পারছে না—তবে "ভর" যে তিনি করেছেন সেটা সুনিশ্চিত!……না, সে আর বেশীদিন ঝি-এর কাজ করবে না। শীঘ্রই উক্ত 'দেবোতা' তাকে প্রচুর ধন সম্পদ দান করবেন। তার জামাইকেও এক জোড়া মোহর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন (সম্ভবতঃ স্বেচ্ছায় নয়, দাসীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে!)……হাঁ তাদের ঘরের কোণে মাটী কেঁপে উঠেছে। সেই খান থেকেই মোহরের জোড়াটা মাটী ফুঁড়ে আগামী মঙ্গলবার দিন উঠবে। মোহরের জোড়াটা করায়ত্ত করার জন্য, জামাতা বাবাজীকে বিন্দু মাত্র পরিশ্রম করতে হবে না। শুধু একটি মাত্র কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করতে হবে। সেই দিন—শুধু সেই দিন মাত্র তার গঙ্গিকা সেবন নিষিদ্ধ! গঙ্গিকা সেবন না করে, কাঁপা মাটীর মধ্যে হাত দিলেই মোহরের জোড়া হাতে ঠেকবে। সজ্ঞানে তুলে নিলেই, জোড়া শুদ্ধ মোহর পাবে।……

সহসা-বৃষ্টি কঠোর করে উগ্র স্বরে দাসী বললে "কিন্তুন্ যদি গাঁজা খেয়ে জোড়া তুলতে যায় তাহলে মোহরের জোড়া সাত হাত মাটীর নীচে চলে যাবে।"

বিরাট ব্যাপার ভ! দিদিরা মুগ্ধ অভিভূত! অন্তরে বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগল! মনে হোল মোহরের জোড়াটা তাঁদেরই হাত করে সদ্যঃ সদ্যঃ সাত হাত মাটীর নীচে চলে গেল! সে মাটী খোঁড়বার ক্ষমতা বেচারাদের নাই।

প্রথমে বাক্য স্ফূর্তির সাহস হোল না। ক্রমে দাসীর একটানা আরও নানাবিধ কাহিনী শুনতে শুনতে সাহস বাড়ল।

নতুন দি পরম শ্রদ্ধাভরে সুকোমল কণ্ঠে সৎ পরামর্শ দিলেন—"তা এক জোড়া মোহর যদি পায় তাহলে নেই বা একদিন গাঁজা খেলে তোমার জামাই! তাকে বারণ কোরো যেন মঙ্গলবার দিন গাঁজা না খায়, বুঝলে?"

যেন দাসী সে তত্ত্ব জানে না এবং বারণ করতেও বাকী রেখেছে! হায় রে! শুই গাঁজায় ঘুমে মেঘাচ্ছন্ন ঘরে তার কন্যার সংসার যে উচ্ছন্নের পথে যেতে বসেছে, মূঢ়মতি জামাতা বাবাজীকে সে যে কোন মতেই দুর্মতি ত্যাগ করাতে পারছে না, সে মর্মব্যথার নিষ্পীড়ন দিদিরা বুঝবে কি করে? ঘরোয়া দুর্ঘটনা দাসী বলেই বা কোন্‌মুখে?……দাসী স্তব্ধ হয়ে রইল।

ছোট দিদি ততক্ষণে ম্যাট্রিকের অঙ্ক শাস্ত্র স্মরণ করে

বিজ্ঞ ভাবে হিতোপদেশ দান করলেন "এক ঘালা সোহর! সে যে অনেক টাকা! দেবতার কৃপায় তাহলে তোমার জামাই বড়লোক হয়ে যাবে। তাকে বুঝিয়ে বোল, মঙ্গলবার দিন যেন কোন মতেই গাঁজা না খায়।"

অকস্মাৎ দাসী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল! গলার শিরা ফুলিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জামাতার বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ ঘোষণা করলে?

দিদিরা তার জামাতাকে চিনতেন না। এবার দাসীর কথা শুনে চিনলেন!……'দেবোতার' শ্রদ্ধাহীন, অবিশ্বাসী—তার যা কিছু শ্রদ্ধা ভক্তি, তা শুধু গাঁজার উপর।

এমন দুর্বিনীত দুষ্টকে দেবতার কৃপায় সোহর পাওয়ানো দুষ্কর বটে! শুধু দাসী নয়, দিদিরাও যেন নিজেদের অসহায় ও বিপন্ন বোধ করলেন!

দাসীর বাক্‌প্রবাহ অবাধে অনর্গল স্রোতে বয়ে চলল। থামায় কার সাধ্য?

দেখতে দেখতে এবাড়ী, ওবাড়ীর অন্যান্য দিদিরা বৌদিদিরা কাজ ফেলে দাসীর কাছে দাঁড়ালেন। সোহরের জামাটার জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।…দৈব-কৃপা-পুষ্ট দাসীর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাও বাড়ল!

শুধু ও-বাড়ীর ছোটদিদি মুচকে মুচকে হাসতে আরম্ভ করলেন!—তিনি একটু অন্য ধরণের মানুষ। ছাপার বই থেকে ধার-করা-বিদ্যায় তাঁর বড় রোচে না। কিন্তু মানুষ জগৎ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানজ্ঞান বেশ তীক্ষ্ণ। গুরুজনদের অন্যায়কেও ক্ষমা করেন না—'চোট পাট' শুনিয়ে দেন। সময় বিশেষে বাক্ সংযম ক্ষমতাও যথেষ্ট।

দাসীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি হাঁ-হুঁ কিছুই বললেন না। শুধু বোনেদের ও বৌদিদিদের লক্ষ্য করে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন।

তাঁর রকম-সকম দেখে সকলের শ্রদ্ধা ক্রমে সন্দেহ, পরে রীতিমত শঙ্কায় রূপান্তরিত হোল। একে একে ভিড় পাতলা হতে লাগল।

মা পূজাহ্নিক সেরে ঠাকুর ঘর থেকে বেরুলেন। অনেকক্ষণ দাসীর দিকে চেয়ে থেকে শান্ত স্বরে বললেন "দাসি, যাও আগে গোরুকে ফ্যান খাইয়ে এস। তারপর তেল মেখে নেয়ে এসে আগে একটু শরবৎ খাও। তোমার এখন শরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা খাওয়া দরকার। ওসব কথা ছেড়ে দাও।"

মাকে দাসী অত্যন্ত সমীহ করে। আদেশ মাত্রেই বোক্‌নো নিয়ে গোয়ালে চলে গেল। আর কথা কইলে না।

সে অদৃশ্য হতেই মা দৃঢ় কণ্ঠে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করলেন, দাসীকে যেন ঠাকুর দেবতা সম্বন্ধে কোন কৌতূহলী প্রশ্ন না করা হয়। যেহেতু প্রশ্নের সুযোগ পেলেই সে কাজকর্ম্ম ভুলে অর্থহীন ভাষায় বক্তৃতা করবে। মাথাটা ওর গরম হয়েছে সন্দেহ নাই। এখন ওকে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে শরবৎ খাইয়ে ঠাণ্ডা করাই কর্ত্তব্য।

২

দিদিদের সতর্ক দৃষ্টির সামনে দাসী তেল মাখলে, স্নান করলে, শরবৎ খেলে। কিন্তু সুলক্ষণের পরিবর্ত্তে দুর্লক্ষণ-গুলা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানাবিধ অবস্থান্তর ঘটতে লাগল। কখনো সভয়ে বললে 'দেবোতা' তাকে কাজ করতে নিষেধ করছে। কখনো দেখা গেল ধনুষ্টঙ্কার রোগগ্রস্তের মত, স্নায়বিক বিক্ষেপে তার দুই হাত পিঠের দিকে বেঁকে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে—'দেবোতা' তার হাত পিছন দিকে টেনে রেখেছে, বাসন মাজতে দিচ্ছে না।…আবার দেখা গেল কিছুক্ষণ পরে সে আপনা-আপনি প্রকৃতিস্থ হয়ে কাজ করছে, গান গাইছে। আবার কখনো পুকুর ঘাট থেকে কাঁদতে কাঁদতে এসে জানালে—'তার হাত থেকে বাসন কেড়ে নিয়ে 'দেবোতা' পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিলেন! সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জলে নেমে বহুকষ্টে হাৎড়ে হাৎড়ে সেই বাসন তুলে আনলে।…সে আর পারে না বাপু…ইত্যাদি।

দেবতার উপদ্রবে দিদিরাও বিব্রত! দাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে 'দেবোতা'র নষ্টামীর বিরুদ্ধে তাঁরাও কটু সমালোচনা আরম্ভ করলেন। নাঃ, ধনসম্পত্তি যা-ই দিক, আপাততঃ দাসী বেচারাকে এতটা কষ্ট দেওয়া 'দেবতা'র পক্ষে মোটেই ভদ্রোচিত কাজ হচ্ছে না।…তবে দেবোতাদের কাণ্ড! কি উদ্দেশ্যে তিনি এমন করছেন—তার মূল রহস্য বোঝা দুষ্কর!

নির্দ্দিষ্ট দিনে জামাতার তত্ত্বাবধানে ট্রেণে চড়ে ত্রিবেণীতে গিয়ে দাসী গঙ্গা স্নান করে এল। কিন্তু দেবতা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে দাসীকে অব্যাহতি স্নান করা দূরে

থাকুক, আরও যেন বেশী মাত্রায় বিশ্বাসঘাতকতা করে দাসীকে সম্পূর্ণ অধিকার করলেন।

শোনা গেল তার দিন-রাত ঘন ঘন "জ্বর" হচ্ছে। কোনও কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব! অতএব সে কদিন কাজ করতে এল না।

দিদিদের উদ্বেগের সীমা নাই। নিজেদের পক্ষে সেখানে অর্থাৎ মুচি বাড়ী যাওয়া সম্ভব নয়, অতএব বার্ত্তাবহের ঘরে প্রত্যহ দু বেলা দাসীর কাছে পাঠানো হতে লাগল। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত খবর আসতে লাগল। সেগুলার অর্থ বিশ্লেষণ না করাই ভাল!

নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলবারও উত্তীর্ণ হোল।

উৎকণ্ঠিতা দিদিদের কাছে এসে এক ভয়দূত বিষাদ ভরে সংবাদ ঘোষণা করলে—অবাধ্য জামাতা সেদিন গর্ভিকা সেবনান্তে বোধহয় ভাল ঘরের কোণের মাটী সরিয়ে ফুলতে গিয়েছিল। কিন্তু তার মূঢ়তাকে উপহাস করে ভাল সাত হাত মাটীর অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেছে! আশা ভঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে জামাতা, দৈবী-কৃপা-বঞ্চিতা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে নির্ম্মম ভাবে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে!···দাসী না কি কোন কুটুম বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে!

'দেবোত্তা'র পরিণাম দেখে দিদিরা হতাশ, মুহ্যমান। দাসীর জন্য তাঁরা অত্যন্ত বেদনা বোধ করলেন।

৩

কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ দাসী গুটি গুটি চরণে এসে আবির্ভূত! বিনাবাক্যে কাজকর্ম আরম্ভ করলে। যেহেতু কুটুম্বরা তাকে অন্নদানে আর ইচ্ছুক নয়—অতএব অন্ন চাই।

মান নিষেধাজ্ঞা স্মরণ করে দিদিরা, বৌদিদিরা, কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করলে না। দাসী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থের মত নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি নীরবে সম্পাদন করলে। কোথাও কোন ত্রুটি দেখা গেল না।···সকলের আশা হোল, জামাতার প্রহারের চোটে দাসীর স্কন্ধ বা মুণ্ড ত্যাগ করে দেবতা মহাশয় অন্তর্হিত হয়েছেন!

কিন্তু ভুল সে আশা। পঞ্চম দিনে সহৃদয়া নতুন-দিদিকে আড়ালে একা পেয়ে দাসী বিনা প্রশ্নেই আরম্ভ করলে। চুপি চুপি বললে "আমাকে যিনি "জ্বর" করেছেন, তিনি কে জানো?"

জানা অসম্ভব। থাকতে গিয়ে নতুন-দিদি ভীতকণ্ঠে বললেন "কে?"

গম্ভীর মুখে দাসী বললে "পীর সায়েব।"

"পীর সায়েব!"

"হাঁ।"

"ওলা সে কি গো? এমন তো কখনো শুনি নি।"

অধিকতর গম্ভীর মুখে দাসী বললে "কাল পীর সায়েবের সঙ্গে দেবোত্তাদের খুব মারামারি হয়ে গেছে। বিষম মারামারি, জানো?"

নতুন-দি আশ্বস্ত হলেন। সময়টা তখন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ কাল। ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দু-মুসলমানে রক্ত রোষে ধানালানি চলছে। মারামারি দল অবাধে নিরস্ত্র ভাবে নেমে চলেছে।···এ বাজারে পীর সায়েবের সঙ্গে দেবতাদের মারামারি লাগা অতিশয় সঙ্গত এবং শোভন ব্যাপার! স্বর্গলোকে স্বর্গীয় অধিবাসী নেতাদের ভাগ বাঁটোয়ারা ব্যাপারে গোলমাল ঘটা এ সময় নিতান্তই প্রয়োজন! দাসীর সংবাদ অতিশয় যুক্তিসঙ্গত।

সুনিশ্চিত ভাবে ব্যাপারটা বোঝবার জন্য নতুনদি সাগ্রহে বললেন "কেন মারামারি হোল?"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীর মুখে দাসী বললে "পীরসায়েব দেবোত্তাদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি আমাকে "জ্বর" করেছেন। শুনে দেবোত্তারা বললেন—"সে কি? তুমি মুচির মেয়েকে "জ্বর" করেছ? তাহলে তোমার জাত গেছে।"

দু চক্ষু কপালে তুলে নতুনদি বললেন "সে কি গো? দেবতাদের কি জাত আছে? যে যাবে?"

সান্ত্বনাদায়ক কণ্ঠে বিজ্ঞভাবে দাসী বললে "আছে দিদি, আছে। ওদেরও সব আছে। পীর সায়েব তাই রেগে গিয়ে বলেছে—আমাকে তোমরা 'ঠেকো' করবে? বটে! এত আস্পর্দ্ধা!···তোমাদের মেলায় যত 'বাত্তিরি' আসবে, আমি সব ভাঙিয়ে নিয়ে যাব। দাসীর কাছে আলাদা মেলা বসাব। সব বাত্তিরিকে মুচি সন্দেশ খাওয়াব, তাহলে সবাই দাসীর কাছেই যাবে। তোমাদের মেলা বন্ধ হয়ে যাবে।"

নতুনদির স্মরণ হোল তাঁদের গ্রামের বুড়া শিবের কাছে

শিবরাত্রি ও গাজনের সময় প্রতি বৎসর জাঁকিয়ে মেলা বসে। যাত্রা, থিয়েটার, জুয়াখেলা, পাঁপর ভাজা, তেলে ভাজা ও মাটীর পুতুল—সে মেলায় বিশেষ আকর্ষণ। চারি-পাশের পল্লীগ্রাম থেকে এবং সহর থেকেও সে সময় বিস্তর যাত্রীর শুভাগমন হয়। সম্ভবতঃ সেই সমারোহ উৎসবের স্মৃতিই দাসীর দুষ্ট-ব্যাধি বিকৃত মস্তিষ্কে অলক্ষ্যে কল্পনার কুহক জাল রচনা করেছে। তার অবচেতন-মন, পীর সাহেবের যাত্রা মেলায় যাত্রী সংগ্রহের উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়েছে।

ভয়ে ভয়ে নতুনদি বললেন "বাবা! পীর সাহেবের রাগ ত কম নয়! দেবতাদের জাত মারবার ব্যবস্থা করছেন! তা মারামারি ত হল। শেষ পর্য্যন্ত জিতলে কে?"

ওকালতির সুরে দাসী বললে "পীর সাহেবের গায়ে খুব জোর। কিন্তু দেবোত্তারা সবাই মিলে মারামারি করলেন কি না? তাই পীর সাহেব হেরে গেলেন। রেগে টং হয়ে তিনি বলেছেন আর চারদিন পরেই, আমাকে পরী করে দেবেন।"

"পরী?"

"হাঁ। আমি পরী হয়ে গেলে তোমরা আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না দিদি, জানলে?"

শোকাকুল কণ্ঠে নতুনদি বললেন "আহা, সে কি! তোমায় আর দেখতে পাব না?"

অধিকতর গম্ভীর হয়ে দাসী বললে "না, পাবে না। কিন্তু আমি তোমাদের সবাইকে দেখতে পাব···আমার কাছে মস্ত মেলা বসবে। তোমরা যেও সেখানে। লুচি সন্দেশ খেয়ে এস।"

হেনকালে মাতৃদেবী সামনে এসে দাঁড়ালেন। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন "যাও দাসী, ক্ষার সিদ্ধ কাপড়গুলা আগে কেচে আনো।"

সুখ সৌভাগ্যের গল্পে বাধা পড়ায় দাসী ক্ষুব্ধ হোল। কিন্তু মার আদেশ অবহেলা করার সামর্থ্য ছিল না। অতএব ক্ষার-সিদ্ধ কাপড়ের বালতি তুলে নিয়ে দু'পা গিয়ে দাসী আবার ফিরে দাঁড়াল। বললে "আজকের মত কাজ করে যাই মা। কাল থেকে আর আসব না।"

মা বললেন "কেন আসবে না? কি হোল আবার?"

দাসী নির্লিপ্তার সুরে বললে "কাল থেকে আমি একটু একটু করে পরী হব কি না? আসব কি করে?"

অদূরে দাঁড়িয়ে কাকীমা মনোযোগ দিয়ে দাসীর ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করছিলেন। স্মিতমুখে এবার বললেন "পরী? সে ত সুন্দরী উপদেবতা! তুমি তাই হবে?"

"হ্যাঁ মা, পীর সাহেব বলে দিয়েছে।"

ক্ষার-সিদ্ধ কাপড়গুলার দিকে পুনশ্চ দাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে মা বললেন—"বলাবলির কথা পরে শোনা যাবে। এখন কাপড়গুলা কেচে আনো।"

দাসীর মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন ভাবী সুখ সৌভাগ্যের কল্পনার প্রচণ্ড উত্তেজনার জোয়ার এসেছে। সে কি থামতে পারে? বালতি নিয়ে পুনরায় দু'পা গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। উত্তেজিত দ্রুত কণ্ঠে বললে "যাই মা। হ্যাঁ পীর সাহেব বলেছে, আমাকে 'মাতা' থেকে পা পর্য্যন্ত সোনায় মুড়ে দেবে। 'মাতার' মুকুট দেবে, সারা গায়ে গয়না দেবে। আমার আঙ্গের বোবার বোল ফুটবে। কানার চোখ হবে। খোঁড়ার পা হবে। আমি যাকে বলব তোর কুষ্ঠ হোক, তার কুষ্ঠ ব্যাধি হবে। যাকে বলব তোর মুখে রক্ত উঠুক, তার রক্ত উঠবে।···হ্যাঁ, আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। তবে তোমাকে মা বলি কি না? তুমি শুধু দেখতে পাবে। তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসব। যখন আসব, আমাকে বসতে আসন দিও। যদি আসন না দাও, তবে তুমি কিছু পাবে না। যদি আসন দাও, তাহলে আমি সেই আসনে বসব। আমি চলে গেলে দেখবে সেটা সোনা হয়ে গেছে। সেই সোনাটা শুধু তোমায় দেব।"

ও-বাড়ীর জ্যাঠাইমা এসে অদূরে দাঁড়িয়ে নীরবে দাসীকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে মা একটু হেসে বললেন "যদি সোনা পাওয়া যায়, মন্দ কি? খুব বড় একটা পীঁড়ে তোমায় বসতে দেব—"

হিসাব জ্ঞানে জ্যাঠাইমা পাকা গিন্নি। বাধা দিয়ে স্থূল সংশোধন করে বললেন "পীঁড়ে কেন? ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটে বসিও। খাটটা সোনা হয়ে গেলে বেশী সোনা পাবে।"

তৎক্ষণাৎ দাসী দ্রুত কণ্ঠে বললে "হ্যাঁ, সেই সোনাটাই শুধু তোমায় দেব মা, আর বেশী কিছু দিতে পারব না। তোমায় মা বলি, তাই ওইটে তোমায় দেব—"

বাধা দিয়ে মা বললেন "আচ্ছা, এখন যাও। কাল কেচে আনো।"

"যাই মা যাই—" দাসী প্রস্থান করলে।

৪

পরদিন দাসী কাজ করতে এল না। তাকে ডেকে আনবার জন্ত 'কচি' নামক চাকরকে পাঠান হোল। সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে সভয় কণ্ঠে জানাল, দাসী তার প্রহারদাতা জামাতার যাওয়ায় নিশ্চিন্ত নির্ভীক ভাবে বসে রয়েছে! আকৃতি প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নি। কচির আহ্বানের উত্তরে জানিয়েছে—"সে আজ অর্দ্ধেকটা পরী হয়েছে। আর চারদিন পরে সম্পূর্ণ পরীত্ব লাভ করবে। অতএব ঝি'এর কাজ আর করবে না।"

কচিকে অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তাবিষ্ট এবং ভক্ত-জনোচিত শ্রদ্ধাশীলের মত দেখাতে লাগল। অর্থাৎ ব্যাপার গুরুতর! সবাই অবাক!

দিন চার পরে, একদিন প্রাতঃকালে দাসী তার নবজাত দৌহিত্রীকে বাঁ হাতে বুকের কাছে নিয়ে, ধীর মন্থর গমনে বাবুদের বাড়ী ঢুকল। তার মাথায় কাপড় নাই। খাটো চুলগুলি পিঠের উপর এলানো। ডান হাতখানি সর্প ফণাকারে ঈষৎ বক্র ভাবে ডান কাণের সমান্তরালে উঁচু করা রয়েছে। চোখ দুটি ভাবে কিম্বা কোনও নেশার প্রভাবে ঈষৎ ঢুলু ঢুলু।

গৃহিণীরা তখন যে যার নিজ গৃহে পূজাহ্নিকে ব্যাপৃত। দাসী উঠানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ কোমল কণ্ঠে ডাকলে "মা—"

নতুনদি ছুটে এসে সাহ্লাদে বললেন "মা পুজো করছেন। তুমি এসেছ? বেশ বেশ। কাজ কর।"

দাসী বিনয় নম্র বচনে বললে "কাজ করতে আসি নি দিদি, আমি মায়েদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আজ থেকে আর তো কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। তাই শেষ দেখা দিতে এসু।"

"কেউ তোমায় দেখতে পাবে না?

"না। আমি অর্দ্ধেকটা পরী হয়েছি, আজ রাত ন'টার সময় গোটাটা পরী হব।"

"তারপর কি হবে?"

"পীর সায়েবের সঙ্গে আমার যুগল-মিলন হবে।"

রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলনের বিগ্রহ ও ছবিগুলির স্মৃতি নতুনদির স্মরণ হোল। ভয়ে ও ভক্তিতে গা ছম্ ছম্ করতে লাগল।···না জানি দাসীর ও তার 'দেবোত্তা' পীর সায়েবের যুগল মিলন আবার কি রকম রোমাঞ্চকর মনোরম হয়। দেবতার কথা নাকি অবিশ্বাস করা অপরাধ। তার চেয়ে চোখ কান বুজে বিশ্বাস করাই মঙ্গল।···

পরমপ্রভাতের নির্দ্বিষ্ট মনে কিছুক্ষণ দাসীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নতুনদি তার পরীজনোচিত রূপান্তর কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সকরুণ কণ্ঠে ভয়ে ভয়ে বললেন—"তা—হ্যাগো, তুমি যে পরী হয়েছ—তা কই—কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না।"

দাসী নির্লিপ্তার মুখে উত্তর দিলে "এই যে দিদি, চুল এলিয়ে দিইছি, আর হাত উঁচু করে রেখেছি।"

অব্যর্থ প্রমাণ!—নতুনদির স্মরণ হোল এ পর্য্যন্ত আবক্ষ পরী কখনো দেখেন নি বটে, কিন্তু পাথরে খোদাই, মাটির তৈরী, ও ছবিতে আঁকা যত পরীমূর্ত্তি দেখেছেন, সবগুলির চুল খোলাই বটে। আর তাদের করমুদ্রার ভঙ্গিও প্রায় দাসীর অনুরূপ। অতএব অবিশ্বাস করা উচিত নয়।

কিন্তু স্নানের সময় এবং রোদে চুল শুকাবার সময় তারাও ত সবাই চুল এলিয়ে দেয়।

যাক। আজ রাত্রেই যখন দাসী পূর্ণ পরীত্ব লাভ করে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী হচ্ছে, তখন তর্ক করা নিষ্ফল। নতুনদি চুপ করে রইলেন।

দাসী গম্ভীর মুখে পুনশ্চ বললে "এমুনি চ্যাঁড়া দিতে আসবে, তখন শুনবে সব। সারা গাঁয়ে চ্যাঁড়া দেওয়া হবে। আজ ওইখেনে মেলা বসবে। গাঁয় বোল-আনা নোক যাবে। তোমরাও যেও সব। আসি এখন। আর ত দেখা হবে না। এই শেষ। নমস্কার।"

দাসী পায়ে পায়ে ঘড়িয়ে বিভোর বিদ্রান্তের মত ধীরে ধীরে বাড়া থেকে নিষ্ক্রান্ত হোল।

দাসীর রকম-সকম দেখে চণ্ডাল-নন্দন শ্রীমান কচি চাকর মুগ্ধ হয়ে উল্লসিত কণ্ঠে বললে "মা—মা—আমুও এবার সা—সা—সাদু হয়ে কা—কা—কাউরূপ যাব। ম—ম—মনুতোর নিয়ে আসব। আমুও সাদু হব। যাবই কা—কাউরূপ।—"

মা পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে দৃঢ় আদেশ ব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন—"আচ্ছা যাস্। এখন গোরুগুলোকে চরিয়ে আন।"

কাকীমা দূর থেকে হাসতে হাসতে বললেন—"ঘরে থেকে আপনাকেও ত খুব গোরু চরাতে হচ্ছে মেজদি।"

কচির দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করে মা বললেন "গোরু? এদের গাধা বললে গাধাকেও অপমান করা হবে। বুঝলে তাই, এরা এখন জন্তু। দাসী ক্ষেপেছে দেখে ওরও ক্যাপবার সখ জেগেছে। মন্ত্র শিখতে চলল কামরূপ।"

মাকে ক্রুদ্ধ হতে দেখেই কচির মত্ততা নিমেষে অন্তর্হিত হোল। ভাল মানুষের মত গোয়ালের দিকে তৎক্ষণাৎ রওনা হোল।

তখন জানা যায় নি বটে, কিন্তু বহুদিন পরে কচি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে দাসী তাকে গোপনে "কাঁউরূপ কামিখ্যের" ভূত প্রেতের মন্ত্র শিখিয়ে, সে সময় নিজের শিষ্য—তথা প্রচার-সচিব পদে নিযুক্ত করার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু মার ধমক ও পরবর্ত্তী ঘটনা-সংঘাত মাঝাস্থে কচির চৈতন্যোদয় হয়।

৫

সেই দিনে ঠিক-দুপুরের সময় অকস্মাৎ গ্রামশুদ্ধ লোক চমকে উঠলেন। শোনা গেল প্রবল বেগে ঢোল পিটানো হচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়।

ছুটোছুটি করে নিষ্কর্মা পুরুষ ও বালকদল রাস্তায় বেরুলেন। দেখা গেল দাসীর গল্পিকাসক্ত জামাতা ষষ্ঠী মুচি, উত্তেজনারক্ত মুখে, অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি অবস্থায়, চ্যাঁড়া বাদকের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বাক্যধ্বনিসহ পথিকদের জ্ঞাপন করছে, "আজ সন্ধ্যায় তার শ্বশুরবাড়ী—বাবুদের বাড়ীর ঝি—'দাসী' পত্নীত্ব ওরফে দেবীত্ব লাভ করবে। অতএব দয়া করে সবাই সন্ধ্যাকালে তার ভবনে পদার্পণ করবেন।···সেখানে সতীমায় আবির্ভাব হবে।···মন্দির উঠবে।···মেলা বসবে।···তার বাসগৃহের নিকটস্থ 'ঘোষ পুকুর' নামক পুষ্করিণীতে গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হবেন। সে জলে স্নান করা মাত্রেই সকলের সব আধিব্যাধি আপদ বিপদ দূর হবে। ধরাতলে স্বর্গের সুখ সম্পদ ভোগ করবে। ...স্বর্গীয় সমারোহ উৎসব।···কারুর কাছে কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করা নিষেধ। তবে নিজ-বিবেচনায় শ্রদ্ধা ভক্তিভরে যিনি যা সাহায্য করবেন, তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। এ হেন স্বর্গীয় ব্যাপারে যিনিই দান করবেন তাঁর অক্ষয় পুণ্য হবে। অক্ষয় স্বর্গ হবে···ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

পল্লীবাসীর দল চমকিত। ব্যাপারটার অর্থ বোঝবার জন্য সবাই উৎকণ্ঠিত।

গ্রাম্য পুরোহিত কপিল ঠাকুর সজ্জন ব্যক্তি। ষষ্ঠীর আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে শান্তকণ্ঠে বললেন—"এখন ওসব কথা থাক ষষ্ঠী, তুমি চান করে ভাত খেয়ে বিশ্রাম করগে। আগে মাথা ঠাণ্ডা কর।"

ষষ্ঠী যোড়হাতে উদ্‌ভ্রান্তভাবে বললে—"খাব কি বাবা ঠাকুর, মাথা ঠাণ্ডা করার কি যো আছে? এখন আমার শাউড়ীকে 'ভর' ছেড়ে গেইচে। এখন আমাকে ঘন ঘন 'ভর' হতে লেগেচে। 'ভরের' সময় চ্যাঁড়া দিতে হকুম হয়। তা 'লেখনটা' লেখাজ্জি করি নি। 'দোনা-সোনা' করেছিনু।—তা বললে পিত্যয় যাবে নি, এই তাকো। আবার 'ভর' হোল। দোনা-সোনা করেছিনু বলে দুঁই দুঁই করে মাতা ঠুকে দিলে।"

দেখা গেল সত্যই তার কপালটা ফুলে উঠেছে। পুরোহিত ঠাকুর নির্ব্বাক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা দূরে দাঁড়িয়ে বলাবলি করতে লাগল, সত্যই ষষ্ঠীর যখন নিয়মে "ভর" হয়েছিল। ভীষণ বেগে ঘাড়ের উপর মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে ষষ্ঠী দুহাতে নিজের দু গাল চেপে ধরলে। তার পর নিজেই নিজের মাথাটা ঠক্ ঠক্ করে মাটীতে ঠুকে দিলে। অনর্গল ভাষায় নিজেকে লক্ষ্য করে নিজেই উত্তেজিত কণ্ঠে ধমক দিতে লাগল "এখনো সোনাসোনা? এখনো সোনাসোনা? যা চ্যাঁড়া দি' গে। যা বলচি—যা—" ইত্যাদি।

টিফিনের সময় স্কুলের ছাত্রেরা পথে বেরিয়েছিল। তাঁরা সব শুনে গিয়ে শিক্ষকদের বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে "এ কি ব্যাপার স্যর?"

প্রথম শিক্ষক বললেন—"সম্ভবতঃ self-Hypnotised"

দ্বিতীয় শিক্ষক বললেন "কিম্বা গল্পিকা-মাহাত্ম্যও হতে পারে।"

তৃতীয় শিক্ষক বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। চিন্তিত ভাবে বললেন "হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিমত গ্রহণ করলে খুব সম্ভব তাঁরা বলবেন—

পুরুষানুক্রমিক কুসংস্কার ব্যাধির বিষে এখন সহসা এদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে !"

ছেলেরা বললে "সন্ধ্যাবেলা কি ঘটে, আমরা দেখতে যাব স্যর্ ?"

শিক্ষক মহাশয়রা বললেন "অনর্থক সময় নষ্ট ! অবশ্য কৌতূহল চরিতার্থ করতে চাও, যেও। তবে সাবধান ! এদের ধনিষ্ট সংস্রব থেকে দূরে থেক। আর এদের স্পর্শিত খাদ্য পানীয় কখনো গ্রহণ কোর না।···এদের দেহে রয়েছে ভয়াবহ বিষাক্ত ব্যাধি ! সে ব্যাধি পুরুষানুক্রমে সমস্ত সমাজ-জীবনকে অভিশপ্ত করার ক্ষমতা রাখে।"

অন্য এক প্রবীণ শিক্ষক বললেন—"ঠিক বলেছেন। সেই ব্যাধির eruptionই নগরে হয়েছে। নইলে এত বাড়াবাড়ি হওয়া সম্ভব নয়।"

৬

বৈকাল থেকেই ভিড় জমতে আরম্ভ হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা বন্দীর কুটীর প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হোল।

যত্নপূর্ব্বক সাজা উঠানে সেদিন গোময় লেপন করা হয়েছিল। মৃৎকুটীরের দাওয়ায় বদ্ধাঞ্জলি হয়ে সুখাসনে বসেছিল দাসী। তার সামনে আম্রশাখাযুক্ত পূর্ণ ঘট !

সমাগত নরনারীবৃন্দের উদ্দেশে দাসী গলবস্ত্র হয়ে বিনীতভাবে প্রণাম করলে। তারপর ঘটের উদ্দেশে শোক বিহ্বল সুরে খেদোক্তি করে গান আরম্ভ করলে। গানটা তার নিজস্ব মৌলিক রচনা। শৃঙ্খলা সাধনরতীন প্রণামোক্তির মূল তাৎপর্য :—"দাসী আজ থেকে পরী হয়ে যাবে। দাসীকে আর কেউ দেখতে পাবে না।····· দাসীর সঙ্গে পীর সাহেবের যুগল মিলন হবে·····" ইত্যাদি ইত্যাদি।

গান শেষ হোল। বন্দী সদ্যঃ স্নাত হয়ে সজল বস্ত্রে সিক্ত মস্তকে দাওয়ায় উঠে ঘট প্রণাম করলে। তার পর যুক্ত-করে দাসীর উদ্দেশে সসম্ভ্রমে বললে "মা এখন আসব ?"

দাসী বললে "না। এখন নয়।"

তারপর যাত্রাদলের বুড়ি গায়কের মত মুখ নেড়ে মুড়ি বক্তার ভঙ্গিতে দাসী পুনরায় গান ধরলে :—

"শোন শোন নর-বলিহি, দেবোতার কথা—
এ কথা শুনিলে কানে, যাবে মনের ব্যথা।"

পূর্ব্বেই স্কুলের ছাত্রগণ এসে একপাশে স্থান গ্রহণ করেছিল। দাসীর ভাবাবেগ বিহ্বলতা উত্তরোত্তর বাড়ছে দেখে একটি ছাত্র চুপি চুপি আর একটি ছাত্রকে বললে—"জানিস ভাই, আমাদের গাঁয়েও ক'বছর আগে একটা বাগ্দী না চাঁড়ালের মেয়ে অম্নিভাবে "কালী" পেয়েছিল। তারও ঘন ঘন 'ভর' হোত। ভরের ঝোঁকে ক্রমাগত বলত 'সে নর বলি দিয়ে আবার তাকে বাঁচিয়ে দেবে।' বলে একদিন নিজের ভাইকে কেটে ফেললে। কিন্তু বাঁচাতে আর পারলে না। শেষে পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল।"

একজন উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিমান ছাত্র নিম্নকণ্ঠে বললে—"এখানেও বোধ হয় তাই !"

আর একজন ছাত্র বললে "নর-বলি সুরু হবে না কি ?"

"আশ্চর্য্য কি ?"

"তাহলে উপায় ?"

"ধনঞ্জয় ! পাগলের উত্তাপনা শান্ত করার মন্ত্র ওষুধ—প্রহার। পাগল যুক্তি তর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণাকে সম্মান করে। শোন নি ? ওই জন্যে ক্ষ্যাপা হাতীর পায়ে বন্দুকের গুলি মারা হয়। তাতেই সে ঠাণ্ডা হয়।"

"কিন্তু, এ যে স্ত্রীলোক।"

"ওর জামাইটা স্ত্রীলোক নয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওটা-ও ক্ষিপ্ত হয়ে এর সহকারিতা করছে। ওটাকে ঠ্যাঙালেই এর কাণ্ড জ্ঞান সচেতন হবে আশা করি।"

"আরে শোন শোন, গান শেষ হয়েছে। আবার কি বলছে।"

দেখা গেল—গান শেষ করে দাসী ভূমিষ্ঠ হয়ে আবার ঘট প্রণাম করলে এবং বন্দী, সজল-বস্ত্র গলায় জড়িয়ে সকাতরে পুনশ্চ প্রার্থনা জানাচ্ছে—"মা এবার আসব ?"

মাথা চালতে চালতে, অর্থাৎ সবেগে মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে দাসী বললে—'আনো, আনো। দেবোতার ভোগ দাও, দেবোতার ভোগ দাও·····ভোগ··· ভোগ !'

বন্দী ঘরে ঢুকে এক থালা পাটালি গুড় নিয়ে এসে ঘটের সামনে রাখলে। দাসী মাটীতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে "নাও নাও দেবোতা, ভোগ নাও···। দাও দাও নর-বলিহিকে পেসাদ দাও, পেসাদ দাও।—"

তারপর থালা থেকে কতকগুলা পাটালি গুড় তুলে

টুকরা টুকরা করে জনতার উদ্দেশে হরির লুটের মত ছুঁড়ে দিলে। ছোট ছেলেরা কেউ কেউ তা তুলে নিলে।

তারপর অকস্মাৎ দাসীর নবতর ভাবান্তর উপস্থিত হোল! সহসা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সবেগে মাথা চালতে চালতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দাসী বললে "নর বলি চাই, নর বলি চাই! দেবোত্তা নরবলি চান,……যাও দেবোত্তার কাছে নর-বলি। ষষ্ঠীর ওই বৈমাত্তর ভাইকে নরবলি দিতে বলচেন দেবোত্তা! যাও ওকে নরবলি—ষষ্ঠীর ভাইকে নরবলি যাও—"

নরবলি প্রসঙ্গ আলোচনাকারী ছাত্রের দল ভয়ে ঘাড় তুলে ঊর্দ্ধগ্রীব হয়ে দাঁড়াল! তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তারা দাসী ও ষষ্ঠীর ভাব নিরীক্ষণ করতে লাগল।

ষষ্ঠীর একটা মাত্র বৈমাত্রেয় ভাই ছিল। বয়স তার বছর দশ বারো। শিশুকালে পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় সে ষষ্ঠীর গলগ্রহ হয়ে তার সংসারে বাস করত। ষষ্ঠীর শত্রু মাতা পত্নীত্ব লাভ করে, দেবতার প্রীত্যর্থে হঠাৎ তাকে নরবলির জন্য নির্ব্বাচন করে বসলেন!

জনতার মধ্যে এক দল লোক হতভম্ব হয়ে গেল!…এই জন্য এত আড়ম্বর!…আর এক দল মৃদু গুঞ্জনে দাসীর বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা করে উঠল!

ষষ্ঠী তৎক্ষণে সন্ত্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"নরবলি দিতে হবে? আমার ভাইকে? আচ্ছা মা, দেব। কখন নরবলি দেব মা?"

ভীষণ বেগে মাথা চালাতে চালাতে দাসী বললে "আজই আজই। এখুনি, এখুনি……"

বিমূঢ় কণ্ঠে ষষ্ঠী বললে "এখুনি? এই খানেই?"

"হাঁ এই খানেই, এই খানেই—এখুনি—"

জনতা আতঙ্কে স্তব্ধ!

ষষ্ঠী বোধ হয়—"এইখানে" এবং "এখুনি"র আয়োজন উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে অগ্রসর হোল। অকস্মাৎ স্কুল-ছাত্রের দল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠল "তবে রে ব্যাটা পেত্নেল! নরবলি দিবি? আয় আমরা সবাই মিলে আজ তোকেই এখানে নরবলি দিচ্ছি।"

লাফ দিয়ে দাওয়ায় উঠে, তারা ষষ্ঠীকে টেনে উঠানে নামালে। তার ঘাড়ে পিঠে ঘনাঘন শব্দে কিল চড় বর্ষণ করতে করতে বললে "এই নরবলি নামায় ওরান্—টু—থ্রি!…কেমন লাগচে বাছা ধন?"

ষষ্ঠী প্রথমটা হকচকিয়ে গেল! তারপর নবোদ্যমে বাবুরা যখন পুনরায় তার অঙ্গসেবা আরম্ভ করলেন, তখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলে—গা-গতর চূর্ণ হতে আর বেশী বিলম্ব নাই। আতঙ্কে তার "ভয়" ও শত্রু-ভক্তি যুগপৎ উবে গেল! বাস্তব জ্ঞান ফিরে এল। সত্রাসে যোড় হাতে বললে "দোহাই বাবু, আর এমন কথা বলব্ না।"

আঘাতের আকস্মিক লাঞ্ছনা দর্শনে—দাসীর অসঙ্গুচিত-ভাবে-বর্দ্ধিত দৈবী-ভাব-প্রবাহ সহসা বাধাপ্রাপ্ত হোল। দাওয়ায় বসে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চেয়ে, "নর মনিষ্যিদের" হঠাৎ মতিগতি বিগড়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। সে তার পৃষ্ঠপোষক "পীর সায়েব" ও "দেবোত্তা" গণকে আহ্বান করলে। যেন তাঁরা তদ্দণ্ডে এসে এই দুর্ব্বৃত্তগণকে শাস্তি দান করেন।

কিন্তু হায়! তাঁরা কেউ এলেন না! দাসীর অনুমান হোল—উত্তম ভক্ষ্য জোগ্য না পেলে তাঁরা রণক্ষেত্রে আসতে রাজি ন'ন। তাঁদের লোভ বর্দ্ধনের জন্য দাসী আবেগভরে উচ্চ কণ্ঠে বললে "দোহাই দেবোত্তা, দোহাই পীর সায়েব—নর বলি দেব, নর বলি দেব—"

ঠিক সেই সময় মোটা লাঠি হাতে আর এক ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন! তিনি দেবোত্তা ন'ন, পীর সায়েব ন'ন—গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী কোঙার মশাই! তিনি মানুষ চরিয়ে চুল পাকিয়েছেন। অবৈতনিক জন-সেবক বলে সুখ্যাতিও আছে। 'কর্ম্মবীর' বলে সবাই তাঁকে সম্মান করে।

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে তিনি উচ্চ নিনাদে বললেন—"আমাদের বৈমাত্তর ভাইকে যিনি নর বলি দিতে চান, সেই ধরাময়ী পত্নী ঠাকরুণকে আগে দাওয়াই দাও। কইরে বাগ্দী পাড়ার ছেলেগুলো কই? এই যে, আয় ত. বাবা তোকে দুটো টাকা দেব। আমার এই লাঠিটা নিয়ে, ওই ধরাময়ীর পিঠে ঘা-কতক ধরিয়ে দেত! বেটির মাথা থেকে ভূত নামিয়ে দে।"

বলরাম বাগ্দী পাড়ার যাত্রা দলের নর্ত্তক। উত্তম নৃত্য কৌশল প্রদর্শনে অভ্যস্ত। কোঙার মশাই তাকে ভাল বাসতেন। লাঠিটা তার হাতে দিলেন।

বলরাম লাঠি হাতে গম্ভীর মুখে দাওয়ার দিকে চলল।

দাসী সত্রাসে চেঁচিয়ে উঠল "নরবলি দেবোতা, নরবলি দেব।"

বলরাম দাওয়ায় উঠে লাঠি ঠুকে বললে "ফের!"

"নরবলি চান—দেবতা চান—নরবলি!"

"বেশ! নাও তবে নরবলি। কিম্বা নারীবলি?"

বা-কতক পিঠে পড়ল। শারীরিক যন্ত্রণায় দাসীর উন্মাদনা-বিহ্বল স্নায়ু মণ্ডলী সহসা প্রকৃতিস্থ হোল। 'নর বলির' আব্দার সে ত্যাগ করলে।

ধর্ম্মোন্মাদনা বা মস্তিষ্ক-বিকৃতির অজুহাতে পরের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করলে, তার নিজের দৈহিক অবস্থা যে সঙ্গে সঙ্গে বিপদাক্রান্ত হবে এবং কোতার দশাই ও বাবুরা যে কাছাকাছির মধ্যেই আছেন ও থাকবেন, তা সে বুঝলে। তার দেবোতা ও পীর সায়েবের চেয়ে এই সব "নর-মনিষ্যির" দল যে বেশী শক্তিশালী দেবতা, তা সে সসম্ভ্রমে স্বীকার করলে!

মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘুচলেও, সে আপাততঃ শান্ত।

* * * * *

সমস্ত ব্যাপার দেখে এসে প্রত্যক্ষদর্শী বার্ত্তাবহ দল সমস্ত ঘটনা নতুনদিদি ও ছোটদিদির কাছে নিবেদন করলে।

দুই দিদিই স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি! পরীক্ষের পরিণাম শেষে —এই!

অবশেষে সম্বিৎ ফিরে এল। বিনা বাক্যে নতুনদিদি নিভৃতে গিয়ে তাঁর অর্দ্ধসমাপ্ত স্কার্ফটা ক্ষিপ্র হস্তে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বুনতে লাগলেন। ছোটদিদি নিঃশব্দে হোতলার গিয়ে টেবিলের কাছে বসলেন। ঘাড় গুঁজে এক মনে ম্যাট্রিকের পড়া তৈরী করতে লাগলেন। কচি চাকরের "কাউরূপ" যাওয়া ও মন্ত্র শিখে "সাদু" হওয়ার উদ্দাম-উৎসাহও সেই সঙ্গে আঘাত মৃত্যু লাভ করলে!—কচি একেবারে স্তব্ধ।

মনে হোল, শুধু দাসীর নয়—তাদের বাড়ী থেকেও আজ ভূত নেমে গেছে।

পাঁচ বৎসর

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কলিকাতা সহরের যেখানে পাঁচিলে পতাকা উড্ডীন হয়; তাহাতে লিখিয়া রাখ—পাঁচ বৎসর। সহরের ট্রামের গায়ে বাসের গায়ে মোটা হরফে লিখিয়া রাখ—পাঁচ বৎসর। কলিকাতায় যে দুইটি রেল ষ্টেশন আছে, তাহাদের অঙ্গে নামাবলী পরাইয়া দাও, তাহাতে লেখা থাক্—পাঁচ বৎসর। জাহাজে, জাহাজঘাটে ঘোষিত হৌক —পাঁচ বৎসর। ডাকখানা চিঠিতে ডাকঘরের ছাপ মারে মারুক, তাহারই সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ছাপিয়া দিক, পাঁচ বৎসর। টেলিগ্রাফের তারও বহন করিয়া বেড়াক্—পাঁচ বৎসর। বেতার সকাল সন্ধ্যা সময় পাইবামাত্র স্মরণ করাইয়া দিক্—পাঁচ বৎসর। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকে ঐ কথা লিখিত হৌক—পাঁচ বৎসর। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে, জ্ঞানে অজ্ঞানে অহর্নিশ ঐ দু'টি শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হৌক—পাঁচ বৎসর! পাঁচ বৎসর!

বিদ্যালয়ে (স্কুল) বালক শিখিতে থাকুক, জন্মের দিন হইতেই সে মাতৃপদে উৎসর্গীকৃত। বিদ্যামন্দিরে (কলেজ) তরুণ বুঝিতে শিখুক, তিনি স্বাধীন দেশের নাগরিক। নূতন বায় নূতন বারিস্থ বর্ত্তিয়াছে; যাঁর বাড়িয়াছে, কালও বাড়িয়াছে। তরুণীগণ শিক্ষনের দিকে চাহিলে ভুল করিবেন। অতীত বিলুপ্ত হইয়াছে;-চিহ্নমাত্র নাই। তাহাকেও সম্মুখে চাহিতে হইবে। স্বাধীনতা কেবল পুরুষেই অর্জ্জন করে নাই। স্বাধীনতা সম্ভোগের অধিকার পুরুষ কর্ত্তৃক সর্ব্বতরসংরক্ষিত নহে। প্রকৃতি আজ আবার সৃষ্টিরহস্য যুগপৎ নর ও নারীর সম্মুখে পুনরুদ্ঘাটিত করিয়াছে। সৃষ্টির এমনই বিচিত্র কৌশল যে, উভয়ের সহযোগিতা ভিন্ন সৃষ্টি অচল।

আমাদের সমস্যা, অশিক্ষা। বিদ্যালয়ের যেখানে লেখা আছে, পাঁচ বৎসর। ছাত্র শিক্ষককে প্রশ্ন করিল, পাঁচ বৎসর অর্থে কি বুঝিব?

শিক্ষক অবশ্যই বুঝাইতে পারিবেন—পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে অশিক্ষা দূর করিতে হইবে?

"কিরূপে?"

"প্রত্যেক ছাত্রকে ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, একটি হৌক, দুইটি হৌক, পাঁচটি হৌক অশিক্ষিত, সুযোগবঞ্চিত অজ্ঞানকে হাত ধরিয়া, বয়সহকারে 'আলোক নিকেতনে' আনয়ন করিতে হইবে। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রত ধারণ, পালন ও ব্রত

উষাপদের মন্ত্রের ঝঙ্কারে যেন ধ্বনিত, যোষমুক্তের অমল শিখায় যেন প্রভাসিত হৌক। সময়—মেয়াদ—ঐ পাঁচ বৎসর। ঐ পাঁচ বৎসর শনি রবি নাই, গ্রীষ্মাবকাশ পূজাবকাশ নাই, ঈদ, বকর-ঈদ ও মহরম নাই, অলস-অবসর বিনোদনের অবকাশ নাই। মানুষের জীবনে পাঁচ বৎসর দীর্ঘকাল নহে। মুহূর্তের মত ক্ষণিক হয়, চকিতে বিলীন হয়। পাঁচ বৎসর পরে কোনও হতভাগা মা রক্ষিত থাকে। চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে, পাঁচ বৎসর; কাজের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে পাঁচ বৎসর; চিত্তের তারে তারে ঝঙ্কৃত হইতেছে, পাঁচ বৎসর।"

আমাদের সমস্যা—অন্নাভাব। স্মরণ রাখিতে হইবে, পাঁচ বৎসর! পাঁচ বৎসর পরে যেপ্রকার প্রয়োজনে তোমাকে যে তরুণ, তোমাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইতে পারে। তোমার স্বাধীন দেশ, তোমার দেশ সুফলা সুকলা, তোমার দেশ কিসের অন্নদাত্রী, তোমার দেশের জলে অমৃত, স্থলে স্বর্গ, ধরাতলে ধনিয়াগণ্য। এই দেশের পরে হা-ভাতে হা-অন্নের ছেলেরই বা থাকিতে পারে এমন নহে। তুমি তোমার দেশের রক্ষক, সতর্ক প্রহরী। তুমি রক্ষা করিতে পার, দেশ সুরক্ষিত; না পারিলে পুনঃ দাসত্ব। তোমাকে, তোমার আত্মীয়স্বজন প্রিয়জন-পরিজন, তোমার গৃহ, তোমার গ্রাম, তোমার নগর, তোমার দেশ —তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে—রাখিব তোমায়। একদিন সে রাখিব ভুলিয়াছিলে; মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীর প্রান্তরে স্বজাতিবাসম থাকিয়া স্রোতস্বিনী ভাগীরথীর জলে রাখিব নিরঞ্জন করিয়াছিলে, ভাগীরথীর জল শুকাইয়াছে, তোমার চোখের জল শুকায় নাই; দুইশত বর্ষকালের প্রায়শ্চিত্তে যদি বা পাপ বিধৌত হইয়া থাকে, সাবধান আর যে ভ্রমে পতিত হইও না। ঐ দেখ, লেখা রহিয়াছে, পাঁচ বৎসর। পাঁচ বৎসর মধ্যে খাদ্য অর্জন করিয়া খাদ্যবান হইতে হইবে। নিজে খাদ্যবান হইয়া, আর দুইজনকে খাদ্য অর্জনে সহায়তা করিবার ভার তোমার। সময় পাঁচ বৎসর; রাখিব শুরুতর। একটি মুহূর্ত আলস্যে ক্ষেপণ করিবার অবসর তোমার?

আর, নারী তুমি! রানমঞ্চের বারেকের তরে তুমি সেই মৃত কল্পনা কন্যা। পুরুষ জাতি দেশরক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিতে গিয়াছে; কিন্তু দেশ, দেশের ঘর, দেশের কুধা, দেশের তৃষ্ণা তাহারা ভুলিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই; দেশের কৃষি, দেশের শিল্প, দেশের ব্যবসা বাণিজ্য দেশেই রাখিয়া গিয়াছে। বিদ্যালয় আছে, চিকিৎসাগার আছে, আরোগ্যশালা রহিয়াছে। কে চালাইবে? কাল, তুমি ভগিনী, তোমার ক্ষুদ্র গৃহ, ক্ষুদ্র সুখদুঃখ, তোমার দারিদ্র্য, অনটন, তোমার রুগ্ন দেহ, দুর্বল শরীর ও অরানিপীড়িত খাদ্য লইয়া বিব্রত ব্যস্ত ছিলে। আজও কি তাহাই থাকিতে পারিবে? পুরুষ প্রাণ বলি দিয়া যে দেশ রক্ষা করিতে গিয়াছে, সেই দেশ তুমি অন্নের অবহেলায় উৎসন্ন দিবে? স্বাধীন দেশের নারী, দেহে প্রাণ থাকিতে তাহা পারিবে কি? স্বাধীন দেশের ইতিহাস তুমি অবশ্যই পাঠ করিয়াছ। তোমার ত অজানা নাই এমন দিন আসিয়াছে, যখন নারী যুদ্ধি কার্য করিয়া সৈনিকের সমর উপার্জন করিয়াছে, ডাকহরকরা হইয়া ডাক বিলি করিয়াছে, কারখানায় ঢুকিয়া গোলা বারুদ উৎপাদন করিয়াছে, গো-পালা রক্ষা করিয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন করিয়া দেশের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে, আবার সন্তানের মুখে অন্ন দান করিয়াছে। ছেলের ইজিবে কলম ঘিয়াছে, কল চালাইয়াছে, নাবিক হইয়া উপকূল বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াছে, বিমান বাহনে সমরসাহ অব্যাহত রাখিয়াছে; আবার দেশ দেবী অন্নপূর্ণা হইয়া অক্ষম-আতুরের মুখে অন্ন যাজন তুলিয়া দিয়াছে। ইহাকে যদি ভাগ্য বল, ভাগ্য তোমার দ্বারে উপনীত; দৌভাগ্য বলিতে ইচ্ছা কর, তাহাও বলিতে পার, সৌভাগ্য সমাগত। যেদিন বিশ্বচক্রবালে স্বাধীনতার অরুণিমার আলোকচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই দিনই প্রভাত সমীরণ তোমার কাণে সে বার্তা কহিয়া দিয়াছে; প্রভাতের পক্ষী-কূজন কি তুমি শুন নাই? কিন্তু তোমার খাদ্য নাই। ছিল না, তাহা জানি। আজ প্রয়োজন হইয়াছে, খাদ্য অর্জন করিতে হইবে। মেয়াদ—পাঁচ বৎসর। তপঃক্লিষ্টা শুষ্কপত্রপর্ণা অপর্ণা প্রয়োজনকালে মহিষমর্দিনী জগদ্ধাত্রী হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে, শক্তিস্বরূপিণী শক্তিময়ী নারী, তোমাকেও বরাভয়দায়িনী হইতে হইবে। তাই তোমার দুয়ারে, ঐ দেখ, লেখা রহিয়াছে, পাঁচ বৎসর।

আমাদের সমস্যা, খাদ্যাভাব। খাদ্যাভাব, খাদ্যাভাব, খাদ্যাভাব—শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, চিত্ত অস্বস্তি হইয়া গিয়াছে। বুঝি ইহাই অদৃষ্ট—বুঝি বিধাতার বিধান, খণ্ডন নাই, খণ্ডন নাই, ইহাই মানিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস দেখি, বিপরীত সাক্ষ্য দেয়; কাহিনী অন্ত কথা বলে; গল্প উপন্যাস, গাথা, উপকথা উপন্যাস করে। যে দেশে এত খাদ্যাভাব, সে দেশে যার মাসে তের পার্বণে বীরত্বে কুলাচার সমারোহ কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত? এত বাজনা, মরসার গান, সিঁদুলির গান, নবান্নের গান, ইতু মেঁচু ঝিটলার গান কি খালি পেটে গাহিয়া বেড়াইত? এত জলসত্র, এত আনন্দ, এত খেলা, এ কি মুষ্টিমেয় সমাজ-জীবনের আলেখ্য? হা-ভাতের অন্নসৌষ্ঠব-জন্ত কি ঢাকার খোলা মসজিদ-খুবিত? ঢাকার তাঁতি ঢাকাই বস্ত্র বয়ন করিত? দুই শত বৎসরের মৈস্তও যে শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার কারু-শিল্পের সৌকর্য্য রক্ষা করিতে পারে নাই, সেই শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার প্রতিষ্ঠা কি শূন্য উদরে হইয়াছিল? খাদ্যাভাব ছিল না; থাকিবার কথাও নহে। উপেক্ষিতা পল্লী খাদ্যাভাবের প্রধান কারণ। সেখানেও ঐ লেখা রহিয়াছে, পাঁচ বৎসর। পাঁচ বৎসর কাল "পল্লী চলো" করিতে হইবে। পতিত জমি উদ্ধার, এঁদো পুষ্করিণী সংস্কার, জঙ্গল পরিষ্কার—ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। অন্নে একদিন কানু ছাড়া কথা ছিল না; আজ বাসন্তী ছেলে পাঁচ বৎসর ছাড়া কথা নাই। সবাই বলে, পাঁচ বৎসর। অন্নাভাবী ছেলের দল বাজার দল গড়িয়াছে—বাজার পালায় বাস দিয়াছে, পাঁচ বৎসর। গান বাঁধিয়াছে,

পাঁচ বৎসর। পাঁচ বৎসর-পাঁচ বৎসর ক্রমে যাহারা বড় বেশী ঘাবড়িয়া উঠিল, লোকে তাহাদের পিতৃমাতৃত্বের নাম বিস্মৃত হইয়া পাঁচ বছুরে বাপ কাকা বানাইয়া দিল। ঘনিষ্ঠতা আরও কত নীচে নামিল শুনিবেন? মলিন বাসের বুদ্ধি গায়ের লক্ষ:প্রসূত এঁড়ে বাছুর যা যা রবে ক্ষেত খামার গ্রাম লাঙ্গলাদি সাপাসাপি করিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া মলিন লালের বৃদ্ধ পিতা করিলেন, বেটা যেন পাঁচ বছুরে এঁড়ে রে! সেই দিন হইতে বৎস বড় হইল, অন্নোপযোগী বয়স্কও করিল, লাঙ্গল চষিল, সাহের গাড়ী বহিল, ঘাই টানিল, পরু 'মাড়াইল' কিন্তু দুর্নামটী ঘুচাইতে পারিল না। পাঁচ হইতে চুণ খসিবামাত্র যেই কেন অপরাধ করিয়া বসুন না দুরন্ত ও বাখাল্ পাঁচ বছরের রাশ নাম ধরিয়া টানাটানি চলিত। বধূমতী মাইকি কোন্ সৌখীন নগর-নগরী হইতে লোকমীর যেন শিখিয়া আসিয়াছে—তাহাতে লয় লাগে সামান্য, শোভা বৃদ্ধি হয় অপরিমাণ, ধনখানা গ্রামে বার্ত্তা রটিল পাঁচ বৎসরী খোপা দেখিতে চাও ত মধুমতীর নবীন নও। হাতিকান্ধা কচুমপুরের মো-সীমানার লাভার বিবা জলকরের কচুরীপানার বিরুদ্ধে যেদিন দু'টি গ্রামের আবালবৃদ্ধ-যুবা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া একদিনে 'ডামডার্ক' করিয়া ফেলিয়াছিল, সেইদিন ধনখানা গ্রামের লোককে ডাকিয়া হাঁকিয়া পাঁচ বৎসরের মহামারীও ঘুচাইয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, পাঁচ বৎসর বড় লম্বা সময়, আমাতেও যদি না পারি, তবে আর এ কাঠামোয় পারিলাম না!

আমাদের দরকার, শ্রমিক অসন্তোষ। তাহারই ফলে, উৎপাদন হ্রাস। কারখানার প্রাচীরে লেখা, পাঁচ বৎসর, প্রস্তাবটি ফলের গায়ে লেখা রহিয়াছে, পাঁচ বৎসর; জো যাহে, বলে পাঁচ বৎসর। মালিকে-শ্রমিকে চুক্তি পাঁচ বৎসরের। পাঁচ বৎসর পরে যোয়া-পড়া, পাঁচ বৎসর পরে, হিসাব নিকাশ—কৈফিয়ৎ চাষা।

ক্ষেত্রে কৃষক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—পাঁচ বৎসর কাল নিজেও বিশ্রাম করিবে না, জমিকেও বিশ্রাম দিবে না; সে দেখিতে চাহে, বসুমতী কত ধন উৎপাদন করিতে পারেন! খনির মজুর সিলিসিলেলা গালিয়াছে, পাঁচ বৎসরে খনি উজাড় করিয়া ফেলিবে! রেলের কর্ণধারী কড়ায় করিয়াছে, পাঁচ বৎসর গাড়ির চাকা সে অধিরাঢ় দূষিত রাখিবে। বৎসজীবীর প্রতিজ্ঞা, পাঁচ বৎসর মরী নালা ছাঁকিয়া তুলিবে।

লোকে ছেলেমেয়ের বিবাহ দিবার অবসর পায় না—সকলেই বলে, সবুর। পাঁচটা বৎসর বৈ ত নয়! বুড়া-বুড়ীরা তীর্থ ধর্মে বাহির হইতে চাহে না—বলে, না-হয় পাঁচ বৎসর পরেই যাইব! বিষয় আশয় লইয়া মামলা মোকর্দ্দমায় কুলৎ মিলে না—বলে, পাঁচ বৎসর পরে করিব। সকলের মুখে এক কথা—পাঁচ বৎসর!

পাঁচ বৎসরে যেন শিক্ষকে ভরিয়া গেল; পাঁচ বৎসরে যেন চিকিৎসকে ভরিয়া গেল, শুশ্রূষাকারিণীর অভাব ঘুচিয়া গেল। দৌষ এই উৎপন্ন হইয়াছে যে, কাজ যা বাড়াইতে পারিলে স্বাভাবিক। কবলা এত উঠিয়াছে কারখানায় সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইলে, বিপদ। আমেরিকা আর্জেন্টিন পাট কিনিয়া ফুলাইতে পারিতেছে না। কিন্তু তখনও সময় নাবাবলী পরিয়া বসিয়া আছে—পাঁচ বৎসর! কারখানার বাঁশী তখনও ফুকারিতেছে—পাঁচ বৎসর। পল্লীগ্রামের কৃষক পাঁজি-পুঁথীর খবর রাখে না, তখনও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছে, মনের মধ্যে ঘুরিতেছে, পাঁচ বৎসর!

রাজমহল

শ্রীলীলাময় দে

গিরি-গঙ্গার উপকূল ঘিরে
দেখায় অতীত রূপে
উঠেছিল গড়ে বিশাল বিরাট
বাংলার রাজধানী,
এখন সেথায় পরম আরামে
হীনবীর্য্যেরা সুখে
কাটাতেছে কাল অতীতের ঘরে
স্মৃতি-বিষবিকা চানি।

বাঙালীর শেষ সেথা স্বাধীনতা
'উদয়নালা'র জলে
চিরতরে হায় ঘুমে ঘুমে গেল
নামিল পূর্ণ্য পাটে।
বঙ্গজননী আজিও কাঁদিছে
সেই বিষম তলে
মুক্তি কোথায়? মুক্তি বিকালো
জীবনের এই বাটে।

'সাহ-সুজা' হেথা শালিমারিতে
পাশিল যজ্ঞ যেন

বীর-কান্তিয়ের নবাবী আমল
লুটালো ধূলার পরে
বরণালী সেনা বীর পদভরে
ইহারই অঙ্কে সেব
বাঙালীর বীর-কাব্য-গাঁথা
এঁকে দিল ঘরে ঘরে।

সেই সে স্বাধীন চির পুরাতন
'রাজমহলের' বুকে
ঘনে ঘনে জাগে গাঢ়ন বিষাদ
অশ্রু সলিলে ভাসি।
স্মৃতি-প্রবাহিণী বহিয়া চলেছে
হিজলা করা দুখে
কুলু কুলু তান ওঠে নাকো আর
তরঙ্গে উচ্ছ্বাসি।

এরই প্রান্তর খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া
বাংলার ইতিকথা
কত না রূপেতে উঠেছে পড়িয়া
মানব মনের ত্রাস!
মোগল যুগের নবাবী যুগের
যত গৌরব গাঁথা

শুধু প্রাসাদে ইটের পাঁজরে
ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।

ক্রূর কৃতঘ্ন মিরনের সেই
মুক্ত কাটা হাহাকার
কবরের বুকে কেঁপে কেঁপে ওঠে
মিলায় মাটির তলে:
আজও শোনা যায় 'বেগম মহলে'
বীভৎস চীৎকার
কা'রা যেন ব'সে নীরবে নিশীথে
ভাসিয়ে অশ্রুজলে।

ঘাসনিহেরে হতমান বুকে
সিংহাসনের কাঁদে
নবাবী আমল ভরিয়া উঠেছে
জংগলে জংগলে;
বেগম মহলী শুকায়ে গিয়াছে
প্রখর সূর্য্য তাপে
'রাজমহলের' রাজারা ম'রেছে
স্মৃতি কাঁদে করকালে।

সংস্কৃতি ও সংস্কার

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ, পিএচ্-ডি

(২)

আমরা যদি কোন বৈদেশিক কৃষ্টি বলপূর্ব্বক ভারতের সমাজে বসাইবার চেষ্টা করি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না। প্রাচীন সংস্কারের স্তূপ আমাদের মজ্জাগত। নূতন শিক্ষাদীক্ষা বিপরীত সংস্কার সৃষ্টি করিবে। এই দুই বিপরীতমুখী সংস্কারের অন্তর্দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য। এই অন্তর দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তিও হইবে জনসমাজে। প্রাচীন-পন্থী ও নবীনপন্থীর মধ্যে ঘোরতর বিরোধ সৃষ্টি হইবে। কবি মধুসূদনের দৃষ্টান্ত আমরা অনুসরণ করিব। কবিবর বিদেশিনী ধাত্রী মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মায়ের কোলে ফিরিয়া গেলেন। কেন গেলেন? প্রাচীন সংস্কারই প্রবলতর বলিয়া নয় কি?

প্রাচীনের পরিবর্ত্তে নবীনকে অধিক ভালবাসার পূর্ব্বে এই দুইটী কৃষ্টির পরস্পর তুলনা আবশ্যক, কারণ অন্ধ অনুকরণ কোন পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে। এই তুলনা করিতে হইলেও প্রাচীনের জ্ঞান প্রয়োজনীয়। এই অবস্থায় আমরা কোন মতেই প্রাচীনকে ত্যাগ করিতে পারি না, বরং স্বাধীন ও নির্ভীক দৃষ্টিতে প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের আলোচনা করিবার এই প্রকৃত অবসর।

বাংলা ভাষা প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও এখনও পূর্ণাবয়ব হয় নাই। ইহাকে আরও উন্নত করিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্যের ও বিদেশী সাহিত্যের বহু গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধতর করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় দর্শনশাস্ত্র লিখিতে হইবে। দর্শনের পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে। এই পরিভাষার উৎস সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র। বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্বের গ্রন্থ লিখিতে হইবে। সংস্কৃত মনঃশাস্ত্রের আলোচনা না করিলে আমরা চিন্তার ধারার কোন সন্ধানই পাইব না। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে পরিভাষা আহরণ করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সংস্কৃত ভাষা এখনও অনেক কাল ধরিয়া বাংলা ভাষার মহাজনের কাজ করিবে। বিদেশী শব্দ অপরিহার্য্য না হইলে বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করা অন্যায়। এইরূপভাবে উচ্ছৃঙ্খল শব্দগ্রহণ কেবল দুর্বলমনের অজ্ঞতার পরিচায়ক। অতএব বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত সাহিত্য সেবা নিতান্ত আবশ্যক।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এখনও অতি শিশু। ব্যাকরণের দর্শন এখনও গড়িয়া উঠে নাই। পদ ও বাক্যের অর্থ নির্ণয়ের রীতি আরও করিতে হইবে। ভাষার প্রাণ ইহার অর্থসম্পৎ। এই প্রাণশক্তির স্বরূপ নির্ণয় করে ব্যাকরণের দর্শনের উপর। এক কথায় বাংলা ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠাই এখনও হয় নাই। এ কার্য্যটী করিতে পারেন একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ও বিচক্ষণ সমালোচক। এই অবস্থায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি বৈরাগ্য ও অনাদর বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির বিঘ্নস্বরূপ ঘটাইবে।

হিন্দু রাজশক্তির অভাবে হিন্দুর সমাজের অভিব্যক্তি হইয়াছে অসম্পূর্ণ। প্রাচীন হিন্দু সমাজে ও চিন্তা জগতে নানা সঙ্ঘাতের পরে আমরা জাতীয় জীবনে যুগের সমন্বয় আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণে আমাদের সকল আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। এখন আমরা নূতন পরিবেশের মধ্যে পড়িয়াছি। এখন আমাদের জাতীয় জীবনের গন্তব্য স্থল অর্থাৎ আদর্শ নিরূপণ করিতে হইবে এবং ইহজগতে স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিবার উপায়ও আহরণ করিতে হইবে। এক কথায় বিজ্ঞানের আধিপত্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার অভিশাপ দূরে পরিহার করিতে হইবে। ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের মধুর সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে এবং ধর্ম্ম ও নীতি-জীবনের ভিতর দিয়া সেই নূতন সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইবে। সাহিত্য, শিল্প, স্মৃতি, সঙ্গীত প্রভৃতির ভিতর দিয়া এই নূতন সত্যকে রূপ দিতে হইবে। কিন্তু এই সত্যকে প্রাচীন সিদ্ধান্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলিয়া দেখাইতে হইবে। সংস্কৃতি নদীর মত নিত্য প্রবহমানা। উৎপত্তি স্থলের সহিত নিঃসম্বন্ধ হইলে নদী শুকাইয়া যায়। সংস্কৃতি ও অতীতকে বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সেই অতীতের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলে সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়। এই জন্যই প্রাচীন শিক্ষাকে জীবিত রাখিতে হইবে। প্রাচীনের বর্ত্তমানের সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইবে। এই যোগ স্থাপন হইবে বাংলা ভাষার সাহায্যে।

এখন অনেকে আশঙ্কা করেন যে প্রাচীন আদর্শগুলি বর্ত্তমান সমাজে অচল। তাঁহাদের আশঙ্কা অমূলক, কারণ মহাত্মা গান্ধীর জীবন এই আশঙ্কার জীবন্ত প্রত্যুত্তর। বুদ্ধদেবের অহিংসা মন্ত্র যে মৃত হয় নাই তাহা মহাত্মাজী দেখান নাই কি? প্রাচীন উপনিষদের সত্য মন্ত্রের মহিমা যে অপূর্ব্ব তাহা প্রমাণিত হয় নাই কি? ব্রিটিশ শঠ রাজনীতি-বিদ্‌গণের ছলনার সুবাস সত্যের আলোকে ধরা পড়িয়াছে কিনা? ব্রহ্মচর্য্যের অসীম বল এখন স্থূল প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। মৌনব্রত ভণ্ডের ধর্ম্ম নয়। উপবাস অন্ধ সংস্কার নয়। আহার বিহার প্রভৃতির সংযম অজ্ঞতার পরিচায়ক নয়, বরং অপূর্ব্ব শক্তিরই উৎস। প্রেম কাপুরুষের ধর্ম্ম নয়, বরং টিক্ বিপরীতের ধর্ম্ম অর্থাৎ বীরের ধর্ম্ম। আধর্ম্মনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, চরিত্রের দৃঢ়তা, ক্ষমা, ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ, ঈশ্বরে অচল বিশ্বাস প্রভৃতি প্রাচীন সত্যসমূহ মহাত্মা গান্ধীকে আশ্রয়রূপে পাইয়া আপনাদের অবিনশ্বরতা প্রমাণ করিতেছে এই যুগে।

কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয় এবং বাঞ্ছনীয় নয়। কেবলমাত্র বিজ্ঞান চর্চ্চায় দেশের লোকের সকল ক্ষুধা মিটিতে পারে না। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, স্মৃতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির শিক্ষাও অবিসংবাদিতভাবে প্রয়োজনীয়। শহরের

শিক্ষা হয় এক রকমের, আর পল্লীর শিক্ষা হয় আর এক রকমের। পল্লী-সমাজে প্রাচীন শাস্ত্রের ও আচার ব্যবহারের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। এই সমাজ সংস্কৃতজ্ঞদের দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত। আমাদের মনে হয়, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া চতুষ্পাঠীর সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। চতুষ্পাঠীর সহিত বর্ত্তমান অশিক্ষিত সমাজের ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও শ্রদ্ধার লেশ নাই। অশিক্ষিতদের এই বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা আছে কিন্তু শিখিবার সুযোগ নাই। এই সুযোগ না থাকায় তাহাদের শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছে। ইহার ফলে সাধারণ লোক পণ্ডিতদের নিকট কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ লন্, কিন্তু শাস্ত্রকে ভয় করেন। সংস্কৃতে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদের পল্লীর জনসাধারণের সহিত মিতা সাহচর্য্য ও নিকটতর সম্পর্ক আছে। এই সকল লোকশিগকে পল্লী সংস্কারে লাগাইতে হইবে। আমাদের পরিকল্পনা গৃহীত হইলে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অভিযান সম্ভবপর হইবে।

ইহার ফলে অতীত ও বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। এইভাবে চলিলে জাতীয় জীবনে আবশ্যক মত সংস্কার সাধনের পথ সহজ হইবে। জাতীয় দুর্দ্দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বহু অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়া প্রাচীন সংস্কৃতিকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তাঁহারা সাদরে জাতির কল্যাণসাধনে জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে উপেক্ষিত পল্লী সমাজকে পথ দেখাইতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না।

এই সকল চতুষ্পাঠী বর্ত্তমান স্কুল ও কলেজের মত হইবে। একজন অধ্যাপক সমস্ত বিষয় পড়াইতে পারিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক থাকিবেন। যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনি সেই বিষয় পড়াইবেন। প্রত্যেক জিলায় অনেকগুলি এরূপ সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। এই বিদ্যালয়সমূহ গ্রামে স্থাপিত হইবে। অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এইখানেই বাস করিবেন। এই সকল বিদ্যালয়ে সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্র পড়িতে পারিবে। প্রত্যেক সংস্কৃত বিদ্যালয় গৃহটী সাধারণ পল্লীর গৃহের মত হইবে, কোন আড়ম্বর থাকিবে না। ছাত্রাবাস ও অধ্যাপকদিগের বাসস্থান বিদ্যালয়ের সংলগ্ন হইবে। ছাত্র ও অধ্যাপকদের এই স্থানে বাস করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সহিত কবিরাজি চিকিৎসালয় সংলগ্ন থাকিবে। বৈদ্যক মতে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকিবে। এই সকল কবিরাজেরা রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে ও ইন্‌জেক্‌সন্ দিতে জানিবেন এবং ধাত্রী বিদ্যায় সহিতও পরিচিত হইবেন। পশু চিকিৎসায় (বৈদ্যক-মতে) বিশেষজ্ঞ একজন থাকিবেন। জগতের জিলায় এরূপ লোক পাওয়া যায়।

ছাত্রেরা নিজেদের উপযোগী শাক, সব্জি ও ফল, ফুল প্রভৃতি উৎপাদন করিবে (অভিজ্ঞ অধ্যাপকের মতে)। ছাত্রেরা আপনাদের বস্ত্র বয়ন করিবে। ধানের জমিতে চাষীরা চাষ করিবে এবং ছাত্রেরা কৃষি-শিক্ষকের উপদেশানুসারে 'সার' দিবার ব্যবস্থা করিবে। পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী অথবা প্রশস্ত কূপ থাকিবে। ছাত্রেরা ইহার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সদা দৃষ্টি রাখিবে। স্নানের জন্য পৃথক্ পুষ্করিণী থাকিবে (নদী না থাকিলে)। নদীর সংস্কারের ভার লইতে হইবে এই বিদ্যালয়কে। পুষ্করিণীতে ছাত্রেরা মাছের চাষ করিবে এবং ছাত্রাবাসের মাছ যাহাতে নিজেরাই সংগ্রহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। ছাত্রেরা গরু, ছাগল ও হাঁস পুষিবে। পুষ্টিকর খাদ্যের কোনই অভাব হইবে না। ছাত্রাবাসের জন্য কূপ অথবা পাচক অল্পসংখ্যক থাকিবে, কারণ ছাত্রদের প্রথম হইতেই স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে হইবে। এই সকল ছাত্রদের মধ্যে যাহারা গীত বাদ্য অভিনয় প্রভৃতি শিখিবে তাহারা বিভিন্ন গ্রামে অভিনয় করিয়া অথবা বিভিন্ন বাহির করিয়া গ্রামবাসীদের শিক্ষা দিবে। ছায়া-চিত্রের সাহায্যে ছাত্রেরা অশিক্ষিত গ্রামবাসীকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিবে। এই ভাবে আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিবে এবং শিক্ষার অনুকূলে ব্যাপকভাবে জনমত সৃষ্টি হইবে।

উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা করিবে এবং তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। চাষীদের সঙ্গে মিলিয়া ছাত্রেরা সাধারণ জনহিতকর কার্য্য করিবে।

প্রথম পরীক্ষার্থি-ছাত্রদের মধ্যে যাহারা সংস্কৃত ভাষা বিশেষভাবে গ্রহণ করিবে না তাহাদের অল্প বেতন দিতে হইবে এবং ছাত্রাবাসের ব্যয় বহন করিতে হইবে। মধ্যম ও উপাধির ছাত্রদের কোন বেতন লাগিবে না।

প্রথমে সিদ্ধিইসংখ্যক ছাত্র লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। শিক্ষকদের বেতন অল্প হইলে চলিবে, কারণ তাঁহাদের ব্যয় অধিক হইবে না (তাঁহারা সপরিবারে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পাইবেন।) মফঃস্বল সহরের বাহিরে একটী বড় বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে হইবে যেখানে উপাধির ছাত্রদের পড়ান হইবে। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে উপাধি পড়ান সম্ভবপর নয়, কারণ বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে না। উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বৃত্তি ছাত্রদের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা থাকিবে বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজে। এই ভাবে শিক্ষিত ছাত্রেরা শিক্ষা জগতে ও সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্ত্তন আনিবে।

উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। ইঁহারা রাষ্ট্রের কাজেরও উপযুক্ত হইবেন। দেশের প্রগতির ইঁহারা অগ্রদূতও হইতে পারিবেন। সংস্কৃত পুঁথিসমূহের সংস্কার ও বিশদ সূচি পত্র করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই কাজ সুচারুরূপে করিতে পারিবেন। অল্প সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইবে। এই কাজে ইঁহাদেরই অধিকার। বিভিন্ন দেশে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন কৃষ্টি প্রচার করিতে হইবে। সে কাজেও ইঁহাদের উপযোগিতা অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না। নব শিক্ষায় যাঁহারা পারদর্শী হইবেন তাঁহারা জনগণের পরম হিতৈষী বন্ধুরূপে পরিচিত হইবেন। ছায়া-চিত্রের সাহায্যে অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীর শিক্ষা দিবেন এই কৃতী ছাত্রের দল। নূতন ধরণের মাত্রা ডিরেক্টার প্রভৃতি করিয়া পল্লী সমাজকে উৎসব-মুখর করিয়া ইঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। বিদেশীয়

ধর্মের, ভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহার, ভিন্ন ধর্মের ও সভ্যতার নীতির সমালোচনা করিবার প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতা অর্জন করিবেন সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিভাবান পণ্ডিত ব্যক্তিরা। সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক জগতে বিপ্লব আনিবেন ইঁহারাই। শান্ত, ধীর ও মেধাবী ছাত্রেরা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবেন। যে সব ছাত্রেরা সেবাধর্ম করিতে চাহেন তাঁহারাও তাহা করিতে পারিবেন, কারণ ছাত্র জীবন হইতে তাঁহারা কৃষকদের সহিত পরিচিত এবং পল্লীর হিতৈষী বন্ধু রূপে পরিজ্ঞাত। এই শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরাও স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাইবেন। সমাজ ও দেশ সেবার সুযোগ তাঁহারাও পাইবেন। এই শিক্ষার ফলে সমাজে নূতন কর্ম-শক্তির প্রবাহ বহিবে। ভারতীয় সমাজে এই শিক্ষার পরিবর্তন আনিবে। সমাজের (জনসাধারণের) কল্যাণ সাধন করিবে এই শিক্ষা। অন্যায় ও নিষ্পেষণ এই শিক্ষার জাতীয় জীবনের লক্ষ্যস্থল। এই মহৎ কর্তব্যের গুরুভার বহন করিবার শক্তি অর্জন করিবেন এই সংস্কৃতের কৃতী ছাত্রদল।

বর্তমানে বি-এ পর্যন্ত পড়িতে ১০+৪=১৪ বৎসর লাগে।

আমাদের এই পরীক্ষায় উপাধি লাভ করিতে ৫+৪+৩=১২ বৎসর লাগিবে। (আগামীবারে সমাপ্য)

ইংরাজ ভারত ছাড়িল কেন ?

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এস্‌সি

অধ্যাপক রমেশ মজুমদার মহাশয়ের ভারতবর্ষে (মাঘ, ১৩৫৪) প্রকাশিত সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধটির পরে নিম্নাংশ যোগ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ ইংরাজের পক্ষে আর পূর্বের মত একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। ভারতে এত লোক বাড়িয়াছে যে উহা হইতে আর ইংলণ্ডে খাদ্য প্রেরণ করা সম্ভব নহে। বরং দুর্ভিক্ষে লোক মরিলে বিপক্ষদের নিকট ভিক্ষা চাহিতে হয়।

ইংরাজের যে আর্থিক দুর্গতি হইয়াছে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে বিবিধ ইন্‌ডাষ্ট্রিতে অনেক লোক প্রয়োজন। যুদ্ধে যে সকল লোক নিযুক্ত থাকে তাহারা দ্রব্যোৎপাদন কার্য্য করে না, ধ্বংসই করে। বর্তমানে ইংরাজকে বহু সৈন্য ইউরোপে রাখিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করায় যত লোক ইন্‌ডাষ্ট্রিতে যোগ দিয়া দেশের অর্থোৎপাদন কার্য্য করিবে।

ভারত যন্ত্রশিল্প-সমৃদ্ধ হইয়াছে। উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নহে। চীন জাপ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ঐ দুই দেশ দ্রুত ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালাইজড্ হইবে। উহাদের যন্ত্রশিল্প পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে আরও ২০।২৫ বৎসর সময় লাগিবে। ইংলণ্ড এই সময় যুদ্ধ বিক্রয় করিয়া প্রভূত লাভ করিবে এবং নিজের আর্থিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবে।

সমস্ত ইউরোপ ইংলণ্ডের অপেক্ষা অধিকতর যুদ্ধবিধ্বস্ত বলিয়া ইংলণ্ড ঐ সকল দেশের সহিত ব্যবসায় করিয়া এবং ঐ সকল দেশের পূর্ব্ব ব্যবসায়-ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লাভবান হইবে। এই জন্যই ইংলণ্ডের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প রাষ্ট্রাধীন হইয়াছে।

তা ছাড়া এ যুদ্ধে ইংলণ্ডের আফ্রিকায় অফুরন্ত শিল্প দ্রব্য প্রাপ্তি ও প্রচুর শিল্প দ্রব্য বিক্রয় স্থান লাভ হইয়াছে।

ভারতকে পরাধীন রাখিলে উহা কখন রাশিয়ার আওতায় আসিবে, এই সম্ভাবনাও ইংরাজের ভারত ত্যাগের অন্যতম কারণ।

মজুমদার মহাশয় ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পক্ষে সাহায্যের জন্য যে তিন জনের নাম (মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ, হিটলার) করিয়াছেন তাহার সহ আমি আর দুইটি নাম যোগ দিই।

তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ। স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বৈপ্লবিক ভারতীয়গণের মধ্যে তিলক আদি পুরুষ, অরবিন্দ মধ্য ও সুভাষ উত্তর পুরুষ। বৈপ্লবিকগণের কার্য্য লোকলোচনের অন্তরালে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা ততটা খ্যাতি লাভ করেন নাই।

স্বাধীনতার পক্ষে হিন্দুমহাসভার সাহায্য নিতান্ত সামান্য নহে। যুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে ইংরাজের সাহায্যার্থে যুদ্ধে যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাবারকার, মুঞ্জে, শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি হিন্দুসভার নেতৃবৃন্দ হিন্দু-জনসাধারণকে যুদ্ধে যোগ দিতে বলিয়াছিলেন। তাহারা বলিয়াছিলেন জার্মানি আমাদের শত্রু নহে, জাপান আমাদের শত্রু নহে, কিন্তু আমরা ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিব—আমরা ইংরাজের ভক্ত বলিয়া নয়, যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইব বলিয়া। যে কারণেই হউক হিন্দুরা যুদ্ধে দলে দলে যোগ দেয়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় সৈন্য দলে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের তুলনায় খুব বেশী ছিল না, কিন্তু যুদ্ধের পরে খুব বেশী হইয়াছে। কংগ্রেসী মতানুসারে যদি হিন্দুরা যুদ্ধে যোগ না দিত—শুধু মুসলমানরাই দিত তাহা হইলে মুসলমান সৈন্যসংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা অধিকই হইয়া যাইত। এই দুর্দিনে ঐ অবস্থা যুক্ত ভারতের পক্ষে কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

শান্ত উপায় (non-violence) দ্বারা যে রাজ্যশাসন চলে না তাহা প্রমাণ হইয়াছে। কোনও সম্পূর্ণীকৃত শান্ত উপায়ের কৌশল (technique of non-violence) যে আবিষ্কার হইয়াছে তাহার আমরা এ যাবৎ কাল কোনও প্রমাণ পাই নাই। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে হিন্দু সিখের আক্রমণ হইতে মুসলমানকে রক্ষা করিতে, কাশ্মীর বা জুনাগড় রক্ষা করিতে অন্যান্য উপায়ই (violence) অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন ওঠা গেল। ঘুম থেকে উঠতে বেশ একটু বেলা হল, প্রাতের আহার সেরে চিঠি লিখতে বসলাম। তারপর একটু বেলায় রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে দেখি দলে দলে শিশুদের খেলাধূলা চলেছে। শিশুদের দেখে বয়স বোঝা যায় না—যেমন মোটা তেমনই বহরদার। এদেশের শিশুর ওজন আমাদের দেশের প্রায় দ্বিগুণ। সুইডিশদের স্বাস্থ্যও ভালো, আয়ুও খুব বেশী, ৮০।৮৫ বৎসর বয়সের বয়স্কাদের রাস্তায় অনেক দেখা যায়,তখনও তারা বেশ কার্যক্ষম থাকে।

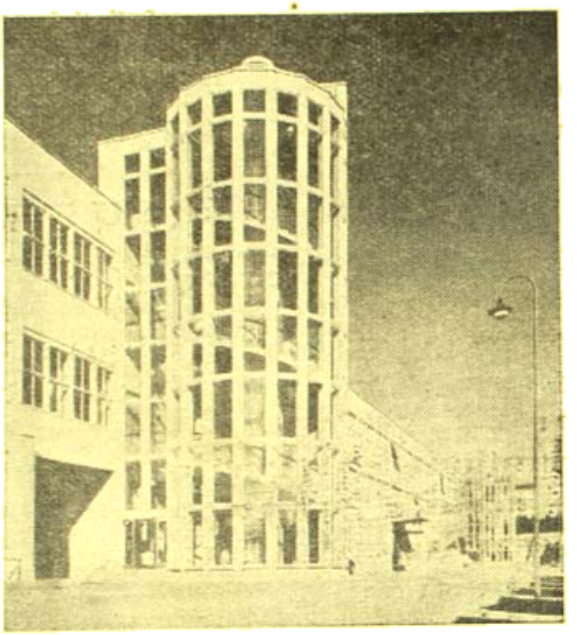

সুইডেনের অতি আধুনিক হাসপাতাল

ডাক্তার বন্ধুর—গতকাল হাসপাতালে একজন রোগী এসেছিল—বয়স ১০৫ বৎসর মাত্র।

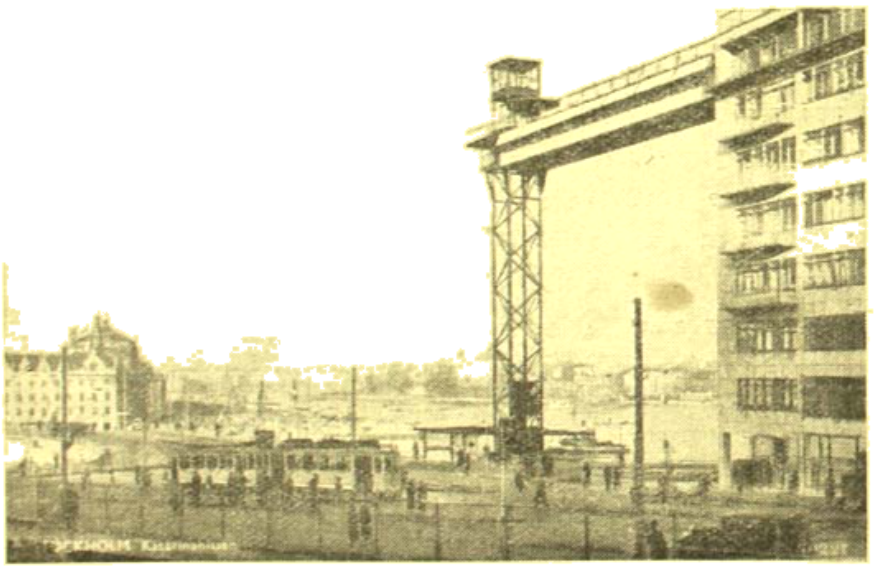

ষ্টকহল্ম—ফেরার পথে

আমরা বেড়িয়ে হোটেলে ফিরলাম। রাত্রে অপেরায় গেলাম। ব্যালেটের ঘটা দেখে চমক লাগে, প্রকাণ্ড বড় ষ্টেজ, অদ্ভুত দৃশ্যপট, দৃশ্য পরিবর্তনের কায়দাই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। অনেক রাত্রে ফিরলাম।

৭ই মে। আজ সকালে এক জার্মানিষ্টের পাল্লায় পড়লাম, তারা ছবি নিতে চায়, আপত্তিতের অন্ত নেই। শুধু বলে—"যাবা আপনে তো তোমার কপালে টিপ দিয়েছে, ছবি নইতেও দেব"। সুতরাং ছবি তোলার আগে ঐ টিপের কথা বলে রাখলাম, ছবি তোলা হল, তারপর আমরা

তাদের সাথে এখানকার Skansen দেখতে গেলাম। সেখানে বহুকের দেশের সাধা লোকে চাকা তাবুক ও জলের মধ্যে ঈলে যায় দেখে খুকু লাফিয়ে উঠলো, ওরো, ঠাণ্ডা দেশের আরো কয়েকটা জীবজন্তুও দেখলাম। অল্প উঁচু ছোট একটি পাহাড়ের চূড়ায় এই Skansen অবস্থিত। এখান থেকে সহরের বৃত্ত ছবির মত দেখায়। বহু প্রাচীন কয়েকটি সুইডিশ কটেজও এখানে স্মৃতিস্বরূপ রাখা হয়েছে। তার ভিতর যে রয়েছে তখনকার লোকেদের ব্যবহারের জিনিষপত্র, তখনকার পোষাক, গহনা ও আসবাবে বেশ সূক্ষ্ম কারুকরা রয়েছে। যুদ্ধের জন্য পিতলের বর্শা ও আরো নানা রকম লাজসজ্জাও ব্যবহার করা হত। মোট কথা—দেখা যায় সুইডিশ সভ্যতা আজকের নতুন নয়। কালের

ষ্টকহল্মের বিখ্যাত রেডিয়াম হাসপাতাল

স্রোতে কি ভাবে কোথায় ভেসে গিয়েছিল জানা নেই, আজ আবার নূতন করে সব গড়ে উঠেছে। আমরা পাহাড়ের ধারে বেড়িয়ে একটু পরেই ফিরে এলাম। আজ রাতে প্রফেসার Bergmanএর বাড়ী নিমন্ত্রণ। আমরা ৭টায় সেখানে উপস্থিত হলাম. হ্রদের ধারে ছোট একটি ফ্ল্যাটে

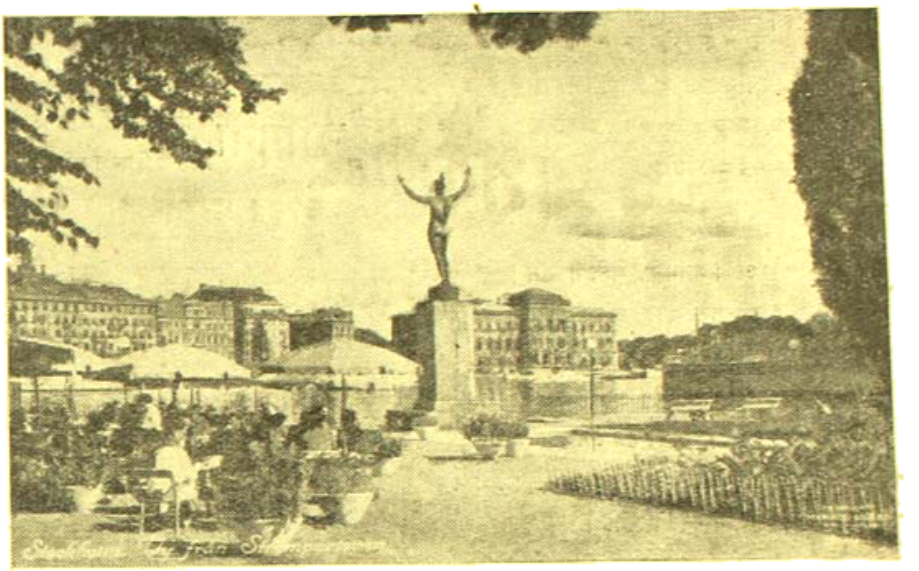

ষ্টকহল্ম—সাধারণ উদ্যান

তিনিও তাঁর স্ত্রী থাকেন, জায়গাটি অতি সুন্দর। প্রফেসারের স্ত্রী সুন্দর পিয়ানো বাজালেন ; বড় ভালো মানুষ ; আমাদের খুবই আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন। আমরা খেয়ে অল্পক্ষণ গল্প-গুজব করে হোটেলে ফিরলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি—আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, হ্রদের জলে রূপালী রং ঝকমক করছে ; ঠাণ্ডা ফনফনে হাওয়ায় বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। গাড়ীতে করে হোটেলে ফিরে গেলাম।

৬ই ও ৭ই মে আমরা সামান্য সামান্য বেড়িয়ে কাটিয়েছি। একটু ঠাণ্ডা লেগে শরীর অসুস্থ হয়েছিল। যাহোক্, অসুখের উপর দিয়েই গেল। আমরা মাত্র কালকের দিনটি এখানে আছি।

পরদিন ৮ই মে—আমরা সকালে গেলাম হাসপাতাল দেখতে। প্রকাণ্ড বাড়ী, ভিতরে চমৎকার ব্যবস্থা। মহিলা সেক্রেটারী আমাদের সাথে করে সুন্দর ঘুরে দেখাতে লাগলেন, শেষে গেলাম রান্নাবাড়ীতে। রান্নাবাড়ীটি একটি কারখানা বিশেষ, সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে কি না হচ্ছে। ২০০০ রোগীর রান্না মাত্র কয়েকজন মিলে করছে। সেক্রেটারি মিষ্টাপুরী এনে আমাদের খেতে দিলেন। আমরা বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। বিকেলে একটি হোটেলের রেষ্ট রেণ্টে কয়েকজন প্রফেসার ও তাঁদের স্ত্রীদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। খুকু একটু নাচ দেখালো, খুকুর নাচ দেখে তারা ভারি খুশী। এবারকার মত সকলকার কাছে বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এসে বিশ্রাম নিলাম। দিনের আলো এখানে রাত ১টা অবধি থাকে। শীতকালে এখানে দিন ছোট হতে হতে প্রায় ১ ঘণ্টায় দাঁড়ায়—সূর্য্য দেখা ২টায় উঠে ৩টায় অস্ত যায় ; তেমনি আবার গ্রীষ্মকালে রাত ছোট হতে হতে

প্রায় ১ঘণ্টা মাত্র অন্ধকার হয়—সূর্য্য রাত ৯টার সময় উঠে, তারপর দিন রাত ২টায় অস্ত যায়।

আমরা জাহাজের পাখা টেনে শুয়ে পড়লাম, তখনও দিনের আলো আকাশে রয়েছে।

পরদিন ২রা মে, আমরা সকালে উঠে তাড়াতাড়ি যাত্র গুছিয়ে নিলাম। হোটেলের হিসাব চুকিয়ে সকাল ৮টার সময় এয়ার টারমিনালে গেলাম। ১০টার সময় A. B. A.এর একটি ছোট বিমানে দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করলাম।

মানিনী

ভাস্কর

ওগো মানিনী, অভিমানিনি !
কম্পিত অধর, ভ্রূলতা বঙ্কিম,
নাসারন্ধ্র ওঠে ফুলে ফুলে,
নয়নের কোণে শুধু অশ্রু ওঠে জমে
কেন ? কোথায় হেরেছ বল,
বল, কখন তোমায় ওই হৃদয় কোরকে
দংশন করেছে কীট।
অহর্নিশি আছ তুমি নিজেরে ডুবায়ে
আমারি সত্তার মাঝে। কেমনে পশিল
সেই নিশ্ছিদ্র স্বপন মাঝে
সংশয় কণ্টক জ্বালা ?
মনে পড়ে সেই অতীত গোধূলী লগন,
প্রকৃতির মৃদু হাসি, আকাশের অলক্তক রাগ,
বনানীর স্নিগ্ধ মায়া, কুসুমের মোহ,
বিহঙ্গের চটুল কাকলী :
এসেছিনু নেবে বলে প্রান্তর প্রান্তে
রঙীন স্বপন রেখ। বাঁধি অযোরে
কল্পনায় বিন্দু রাশি রাশি
এঁকেছিনু রবের গহনে কত বিচিত্র
রামধনু। সেই দিন হ'তে
তোমায় মায়ায় ভোর
মূঢ়াভিমান জড়ায়েছে পরতে পরতে
আমার জীবনখানি
প্রভাত-অরুণ-রাগে, মধ্যাহ্নের তাপে
সায়াহ্নের প্রশান্ত আকাশে,
নিশীথের নিস্তব্ধ আঁধারে,
পূর্ণিমার শুভ্রালোকে, অমানিশা-মাঝে,
মলয় সমীরে, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায়,
প্রশান্ত সুষুপ্তি মাঝে, তীব্র অশান্ত জাগরণে,
সর্ব কর্ম, সর্ব চিন্তা, সর্বসাধনায়
রয়েছ জড়ায়ে
আপনার মায়ামোহ নিগড়ে বাঁধিয়া
এ ক্ষুদ্র হৃদয়খানি।
জীবনের যত আশা, যত তৃষা,
যত সকল প্রয়াস, যত ভ্রান্ত মরীচিকা,
দিবানিশি প্রহরান্ত গভীর উদ্বেগ,
অথবা প্রসন্নচিত্তে স্বপন-আবেশ,
তোমারি মুকুল হাতে যাত্রার পরশে
নবীন বরণীয় হয়েছে জীবনে।
তুমি কি জান না সখি,
নিজেরে কি ভুলেছ এমনি ?
সংসার-আবর্ত-মাঝে কণ্টকিত পথে
হারালেম প্রতিপদে চলের নির্ঝরে
কণ্টকে কুসুম মানি'। ভুলের পথের ক্লান্তি,
চাও নাই কভু প্রান্তির বিরাম।
যত ঘূর্ণি, যত ঘুম, যত ক্লিন্ন আবর্জনা
দুহাতে সরায়ে মোর গমনের পথ
সরল করেছ তুমি।
জীবনের ঘূর্ণ্যাবর্তে অর্ঘের মন্থনে
কেনায়ে উঠেছে যত বিষাদ-গরল,
নীলকণ্ঠসম তায় নিঃশেষে করিয়া পান
শুধুই অমৃতটুকু পরম আদরে
অধরে ধরেছ তুলি'।
কতক্ষণ রবে অভিমান ;
ওই তো ললাটে দেখি
ধীরে ধীরে চক্ররেখা যায় মিলাইয়া।
ওই তো নয়নকোণে চপল চাহনি
অধরে হাসির রেখা।
ওঠ, যাও, ভুলে যাও সংশয়-কল্পনা,
আপনার স্নিগ্ধ শান্ত অমির পরশ
বুলাও আমার প্রাণে। হাসিয়া উঠুক
আকাশ বাতাস তোমারি হাসির সুরে।

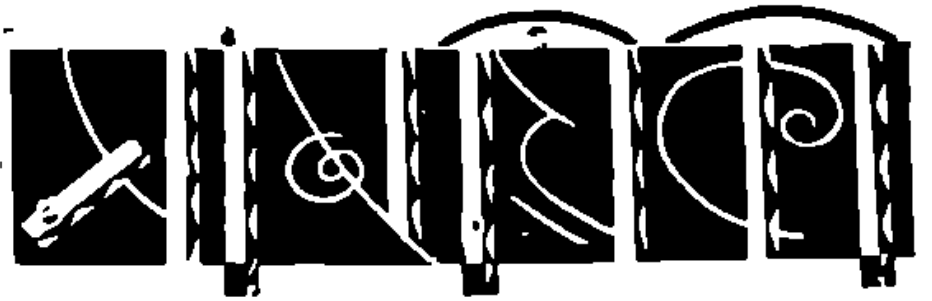

পশ্চিম বাঙ্গলা সম্প্রসারণ—

পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত বিহারের কতকগুলি বাঙ্গলা-ভাষাভাষী অঞ্চল ও সেরাইকেলারাজ্য যোগ করিয়া দিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে এবং সে বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে। সেই অঞ্চলগুলি এইরূপ—(১) সমগ্র ধলভূম জেলা (২) সিংহভূম জেলার ধলভূম মহকুমা যাহা জামসেদপুর সহর ও সেরাইকেলা রাজ্য (৩) সাঁওতাল পরগণার সমগ্র জামতাড়া ও পাকুড় মহকুমা এবং দুমকা ও রাজমহল মহকুমার অধিকাংশ এবং সাঁওতাল পরগণার পশ্চিমাংশ (যাহাতে মিহিজাম, মধুপুর ও দেওঘর অবস্থিত ও যাহা হাজারিবাগ জেলার সহিত সংলগ্ন), (৪) হাজারিবাগ জেলার গোমা, কাসমার ও রামগড় থানাগুলি (৫) রাঁচি জেলায় ৫ পরগণা অঞ্চল—যেখানে কুরু, বড়াগাঁ, রাহে, তামার ও সিল্লি অবস্থিত (৬) পূর্ণিয়া জেলার মহানন্দা, ননিহারা রাজার পূর্ব্বস্থিত অঞ্চল। ঐ অঞ্চলগুলি পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত যুক্ত করিবার অকাট্য যুক্তি আছে। এখন বিচার তার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি

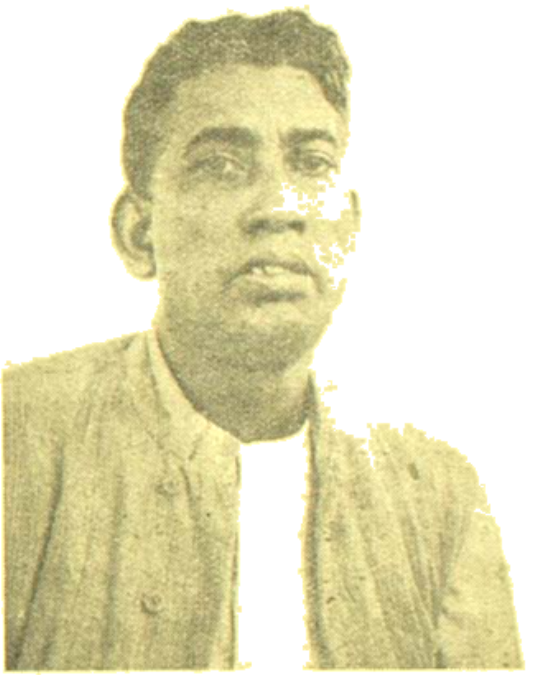

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতার যানবাহন ব্যবস্থা—

পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা সহর ও সহরতলীর যানবাহনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য সত্বর একটি ট্রান্সপোর্ট সিণ্ডিকেট গঠন করিবেন। সিণ্ডিকেট ১ কোটি টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে—তন্মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ মূলধন গভর্ণমেণ্ট দিবেন—সে জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিণ্ডিকেট নূতন ৪০০ বাস শীঘ্রই কলিকাতা ও সহরতলীর পথে চালাইতে দিবেন।

বেসরকারী একটি কমিটী ইহার পরিচালনভার প্রাপ্ত হইবে। সহর ও সহরতলীর বর্ত্তমান যানবাহন ব্যবস্থা আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে। কাজেই অবিলম্বে সিথিকেটের কার্য্যারম্ভ প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ

ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

মধ্যবিত্তদের জন্য গৃহনির্ম্মাণ—

পশ্চিম বাংলার গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের গৃহনির্ম্মাণ বাবদ সাহায্য দানের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। কলিকাতার চারিদিকে সরকার হইতে জমী সংগ্রহ করিয়া সেই জমী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারকে দেওয়া হইবে ও তাহার উপর গৃহনির্ম্মাণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দেওয়া হইবে। পরিকল্পনা সত্বর কার্য্যে পরিণত হওয়া প্রয়োজন।

কর্পোরেশন সম্বন্ধে অভিযোগ—

কলিকাতা কর্পোরেশনের আলো, ড্রেন, জলসরবরাহ, ময়লা পরিষ্কার, টাকা দেওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে সকল অধিবাসীকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিযোগ সরাসরী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লিখিয়া জানাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে—১নং ডিষ্ট্রিক্ট—চিফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ ডি-এন গাঙ্গুলী। ২নং ডিষ্ট্রিক্ট—সেকেণ্ড ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ এম রায়। ৩নং ডিষ্ট্রিক্ট—প্রথম ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ এ সরকার। ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট—চিফ একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ তারক মুখোপাধ্যায়।

রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী—

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সভাপতিত্ব করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নববর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক নিযুক্ত হইয়াছেন—সভাপতি ডাঃ ডবলিউ-ডি-ওয়েষ্ট, সহসভাপতি ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার উদয়চাঁদ মহাতপ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও সার বি-এস-মিত্র। সাধারণ সম্পাদক—ডাঃ কে-এন-বাগচী ও লাইব্রেরী সম্পাদক—ডাঃ বি-এস-গুহ।

কলিকাতা লাটপ্রাসাদে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, পশ্চিম-বঙ্গের গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন

ফটো—শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

যক্ষ্মা নিবারণ ব্যবস্থা—

পশ্চিম বাঙ্গালায় যক্ষ্মা নিবারণ ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত ও সুপরিচালিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তি-

গণকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন—সভাপতি—প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সদস্য—কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ এ-সি-টকীল, ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়, সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার ডাঃ ডি-পি-দত্ত, বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণ সমিতির সম্পাদক ডাঃ পি-কে-সেন ও যক্ষ্মা কণ্ট্রোল অফিসার ডাঃ এস-এন-মজুমদার। বাঙ্গালা দেশ যক্ষ্মা রোগে পূর্ণ হইয়াছে—রোগীদের অবিলম্বে ব্যাপকভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান মিউজিক্যাম—

কলিকাতায় বিরাট যাদুঘর 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম' নামে পরিচিত। আমাদের বিশ্বাস অচিরে উহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া কোন বাঙ্গালা নাম দেওয়া হইবে। গত ৮ই মার্চ্চ উহার কার্য্য নির্ব্বাহকদের বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্ব্বাহক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

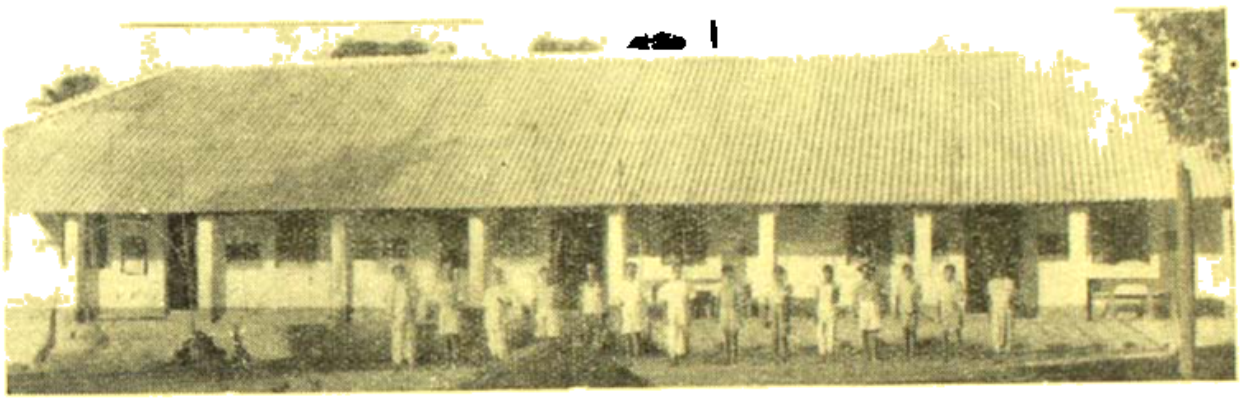

ভারত সেবাশ্রম সংঘের গড়িয়াস্থিত (২৪ পরগণা) রক্ষীদল শিক্ষাকেন্দ্র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—

১৯৪৮ সালের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিম্নলিখিতরূপ নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, চেয়ারম্যান—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, সম্পাদক—শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিনয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীএস-পি-মুকুল, প্রমীলচন্দ্র বসু, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জীবানন্দ সাহা, যোড়শীকুমার সরস্বতী, তিনকড়ি দত্ত ও এ-কে-রায় চৌধুরী। বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের জন্য ৫টি সাব কমিটীও নির্ব্বাচিত হইয়াছে। পরিষদের সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে দেশবাসী ও জাতীয় সরকারকে সচেতন হইতে আবেদন জানাইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি বিধান ও গ্রামে গ্রামে নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ত্তমানে শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এই সমস্যা সম্বন্ধে সভাপতি—সার আবদুল হালিম গজনবী, সহসভাপতি—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, সম্পাদক—শ্রীযুত এস-এন-বসু এবং কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসি-শিবরামমূর্ত্তি।

বিরাট দান—

দক্ষিণ ভারতের করাকাড়ি সহরের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ডক্টর আলাগাপ্পা চেটিয়ার ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া করাকাড়ি সহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ঐ কলেজের সহিত একটি ইলেক্ট্রো—কেমিকেল ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে ১৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজিকাল কলেজ, আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজিকাল কলেজ, কোচিন এর্নাকুলামে কার্ডাসিউটিকাল কলেজ, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল গবেষণা, ঠক্কর বাবা বিদ্যালয় প্রভৃতিতেও প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

সিমলায় বাঙ্গালী কমিশনার—

ইষ্টার্ণ ষ্টেট্‌স ইউনিয়নের হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিমলায় পূর্ব্ব পাঞ্জাব ষ্টেটস রাজ্যসমূহের আঞ্চলিক কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায়ের সম্মান—

ঢাকেশ্বরী কাপড়ের কলের পরিচালক বোর্ডের সভাপতি ও আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় ১৯৪৮ সালের জন্য বঙ্গীয় কাপড় কল-মালিক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুরেশবাবু খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

ডিল্লী কাউন্সেলে মিলিটারী হাসপাতালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

বাঙ্গালী সম্মানিত—

যেহেতু নাগপুর রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কেথ্রিজ অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে বিদায় গ্রহণ করায় তাঁহার স্থানে ই-আই রেলের ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পি-সি মুখোপাধ্যায় বি-এন রেলের অস্থায়ী জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর এই গৌরবে বাঙ্গালী মাত্রই সুখী হইবেন।

হাইকোর্টে নূতন বিচারপতি—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত ডবলি-উন-এম-সি-মার্প ছুটী লওয়ায় শ্রীযুত কমলচন্দ্র চন্দ্র আই-সি-এস নূতন বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতার খ্যাতনামা এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের পৌত্র ও প্রসিদ্ধ দেশসেবক শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের অনুজ। কলিকাতা হাইকোর্টের সিভিলিয়ান জজ মিঃ এলসী ছুটী লওয়ায় খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ নূতন জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রধান অধ্যাপকের নাম "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রাজনীতি অধ্যাপক" নামকরণ করিয়া স্বাধীনতা সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কম্যুনিষ্টদল বে-আইনি ঘোষিত—

গত ২৩শে মার্চ্চ পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল ও তাহার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনি ঘোষণা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শত কম্যুনিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন—মন্ত্রীদের আত্মীয়, অধিকা চক্রবর্ত্তী, আবদার রাজ্জাক খাঁ, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য জ্যোতি বসু, গোপাল হালদার, সতীশ পাকড়াশী, মণিকুন্তলা সেন, গীতা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ বসু, শিশির গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন হাজরা, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন। দৈনিক স্বাধীনতা কার্য্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের মতে নানাস্থানে শ্রমিক চাঞ্চল্যের ফলে এরূপ করা প্রয়োজন হইয়াছিল।

পাকিস্থানের ডাকমা শুল্ক বৃদ্ধি—

কেন্দ্রীয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট ১লা এপ্রিল হইতে ভারত হইতে পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ এবং পারস্ত উপসাগরের বৃটীশ পোষ্ট অফিস এজেন্সির এলাকাধীন পত্তরাইন, দিবা, কোয়ারেৎ ও সমটে প্রেরিতব্য চিঠিপত্রাদির মাশুলের হার বিদেশী ডাকমাশুলের সমান করিয়াছেন। যথা—(ক) চিঠি—অনধিক এক আউন্স—সাড়ে তিন আনা, অতিরিক্ত প্রতি আউন্স—২ আনা (খ) মুদ্রিত কাগজ (পাকিস্থান ও ব্রহ্মে প্রেরিতব্য সংবাদপত্র ছাড়া) —প্রতি ২ আউন্স—৩ পয়সা। সংবাদপত্রের হার বর্ত্তমানের মতই থাকিবে। (গ) পোষ্ট কার্ড—২ আনা। রিপ্লাই কার্ড—৪ আনা। (ঘ) ব্যবসায় সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি—অনধিক ১০ আউন্স—সাড়ে তিন আনা; অতিরিক্ত প্রতি ২ আউন্স—তিন পয়সা। (ঙ) নমুনা প্যাকেট—অনধিক ৪ আউন্স—৬ পয়সা; অতিরিক্ত প্রতি ২ আউন্স—তিন পয়সা। বিমান ডাকের হার ও ঐ দিন হইতে বর্দ্ধিত হইয়াছে—চিঠি ও প্যাকেট প্রতি আউন্স—ছয় আনা। পোষ্ট কার্ড—প্রতিটি ৩ আনা। পাকিস্থান ও পারস্ত উপসাগরস্থিত বৃটীশ পোষ্ট অফিস এজেন্সির এলাকাধীন অঞ্চলসমূহে প্রেরিতব্য পার্শেলের মাশুলের হার নিম্নলিখিত রূপ হইয়াছে—পাকিস্থান অনধিক ১ পাউণ্ড ওজনের ১ টাকা ১০ আনা। অনধিক ৩ পাউণ্ড ওজনের ১ টাকা ১৪ আনা। অনধিক ৭ পাউণ্ড ওজনের ২ টাকা ৭ আনা। অনধিক ১১ পাউণ্ড ওজনের ২ টাকা ১৫ আনা —অনধিক ২১ পাউণ্ড ওজনের ৪ টাকা ১৩ আনা। পারস্ত উপসাগরীয় অঞ্চল—অনধিক ২ পাউণ্ড ১ টাকা ৪ আনা, অনধিক ৩ পাউণ্ড—২ টাকা ৪ আনা। অনধিক ১১ পাউণ্ড ৪ টাকা। অনধিক ২২ পাউণ্ড—৮ টাকা। ব্রহ্মদেশে প্রেরিতব্য পার্শেলের মাশুল বাড়ে নাই।

নবরত্ন বিমান ঘাঁটিতে ভাইস্ চ্যান্সেলার ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লী বাজার উদ্বোধনে নবরত্ন বিমান ঘাঁটিতে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

পূর্ব্ব পাঞ্জাবে নেতা নির্ব্বাচন—

সম্প্রতি পূর্ব্ব পাঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদের পঞ্চিক দলের

২৩ জন সদস্য কংগ্রেস দলে যোগদান করিয়াছেন। ফলে পরিষদের মোট ৭৯ জন সদস্যের সকলেই কংগ্রেস দলের লোক। গত ২৪শে মার্চ্চ বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার গোপীচাঁদ ভার্গব পুনরায় দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনে বিরোধী দলের ২৮ জন সদস্য কোন পক্ষে ভোট দেন নাই।

রাজস্থান রাজ্যমণ্ডল—

২৬শে মার্চ্চ কোটার নিম্নলিখিত ৯টি দেশীয় রাজ্য লইয়া নূতন রাজস্থান রাজ্যমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—(১) কোটা, (২) বুন্দী, (৩) ডুনগরপুর, (৪) বালোয়ার, (৫) বাসোয়ার, (৬) প্রতাপগড়, (৭) টঙ্ক, (৮) কিষেণগড় ও (৯) শাহপুরা। উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর ও বিকানীর এখনও রাজ্যমণ্ডলে যোগদান করে নাই। নূতন রাজ্যমণ্ডলের আয়তন ১৬ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৩ লক্ষ ও বার্ষিক আয় প্রায় ২ কোটি টাকা।

দিল্লী হ্যাণ্ডলুমের মিলিটারী হাসপাতালে উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট সামরিক কর্ম্মীদের পত্নীগণ কর্ত্তৃক বস্ত্র ও কাশ্মীরের উপদ্রুত এলাকা হইতে আগত আহত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ সংগ্রহ

পরলোকে বেণীমাধব বড়ুয়া—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া গত ২৪শে মার্চ্চ বুধবার ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে তাঁহার জন্ম হয়—১৯১০ সালে এম-এ পাশ করিয়া ১৯১৪ সালে সরকারী বৃত্তি পাইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন। ১৯১৭ সালে ফিরিয়া ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে তিনি পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বক্তৃতা দানের জন্য সিংহলে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন বাতিল—

গত ২৪শে মার্চ্চ হইতে এক বৎসরের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিশেষ আইন করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই এক বৎসরকাল নির্ব্বাচিত কাউন্সিলারগণের দ্বারা কর্পোরেশন পরিচালিত হইবে না। সরকার কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান ও গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস-এন-রায়কে কর্পোরেশনের পরিচালক নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় শাসন-ভার গ্রহণের পর হইতেই সকল বিভাগের কার্য্যে তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী—

গণপরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, ডাক্তার হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রকুমার দাস, শ্রীমতী রেণুকা রায়, শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ, শ্রীসুধনানন্দ দাস ও শ্রীরামনারায়ণ সিং—৮ জনে পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আবেদন জানাইয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও পুনর্ব্বসতি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র

নিয়োগীর নিকট এক পত্র দিয়াছেন। পত্রে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কুচবিহার ও ত্রিপুরারাজ্যে পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়-প্রার্থীদিগকে পুনর্বসতি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা দিতে বলা হইয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাব সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধেও সেরূপ ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে গ্রাম-রক্ষী সেবক-বাহিনী—

পশ্চিম বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করিয়াছেন যে 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' নামে গ্রাম রক্ষী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের জন্য গভর্ণমেণ্ট ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। সীমান্তের ৩০০টি গ্রামের প্রত্যেকটি হইতে ২০ জন পল্লীবাসীকে উক্ত বাহিনীতে গ্রহণ করা হইবে। পল্লীবাসীদিগকে ট্রেণিং দিবার জন্য ১০০ শিক্ষক শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ১ বৎসরে ৬ হাজার পল্লীবাসী ট্রেণিং লাভ করিবে। বাহিনী গঠিত হইলে তাহা জরুরী কার্য্যের সময় পুলিসকে সাহায্য করিবে। অস্ত্র পাওয়া গেলে বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে একটি করিয়া রাইফেল দেওয়া হইবে। স্কুল ও কলেজ হইতে ৫ শত ছাত্রকেও ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

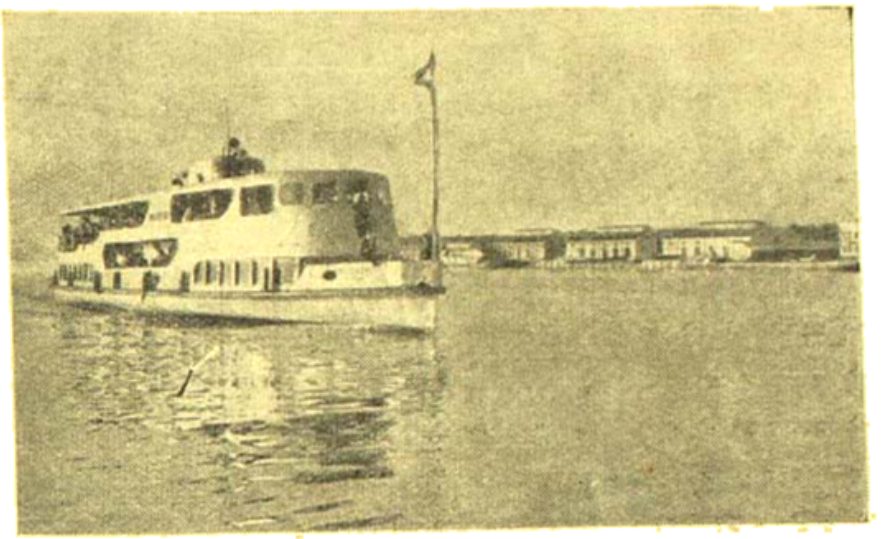

মধ্যে ভরা ক্যানেলের একাংশ—বিহকী লোক জাহাজ 'মদকত'

মধ্যে ভরা ক্যানেলের দশর বাসিকী অনুষ্ঠান। ভরা ক্যানেলের কৃত্রিম হ্রদ বিহকীর তীরস্থিত দশর

পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী হিন্দুদের সমস্যা—

সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দু হিতসাধন সমিতির একজন প্রতিনিধি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর সহিত দেখা করিয়া নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থিত করিয়াছেন—(১) সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের তথ্যানুসন্ধানের একটি শাখা অবিলম্বে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা (২) কেন্দ্রীয় সরকারের

সাহায্য ও পুনর্বসতি ব্যবস্থাদির যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সহ পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন ব্যবস্থা (৪) কেন্দ্রীয় সরকার বা পশ্চিম বঙ্গ সরকার বাঙ্গালার উন্নয়নমূলক যে সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবেন, পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়-প্রার্থীদের তাহাতে যথা-যোগ্য পদে নিয়োগ। আসাম ও ভারতের অন্যান্য স্থানের উন্নয়ন-মূলক কার্য্যেও তাহাদের চাকরী দান। ব্রিটিশ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আশ্রয়-প্রার্থীদিগকে অনুরূপ সাহায্য দান। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষও এক দীর্ঘ আবেদনে এ বিষয়ে ভারত সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—অর্থনৈতিক চাপ ও নূতন সামাজিক সংস্থা গড়িয়া উঠার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুরা চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের সাহায্যদানের জন্য অর্থদান প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সাধ্যে কুলাইবে না। ইহার জন্য প্রাদেশিক রাজস্বের উপর দাবী করা যায় না। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য করা উচিত। পশ্চিম বাঙ্গালায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে হিন্দু আগমনের ফলে যে অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা না করিয়া পশ্চিম বাঙ্গালাকেও দিল্লীর মত অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ইকনমিক্সের ডাঃ বিনোবিহারী দত্ত

পরলোকে দেবীপ্রসাদ খৈতান—

কলিকাতার খ্যাতনামা অধিবাসী দেবীপ্রসাদ খৈতান গত ২রা মার্চ্চ ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা ২৫ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের গৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু দিন কলিকাতা কর্পোরেশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির সদস্য ছিলেন—সম্প্রতি তিনি গণপরিষদের সদস্যরূপে কাজ করিয়াছেন। তিনি প্রথম জীবনে এটর্ণী ও পরে ব্যবসায়ীরূপে সুপরিচিত হন। তাঁহার মত সুপণ্ডিত ও সুবক্তা এযুগে বিরল।

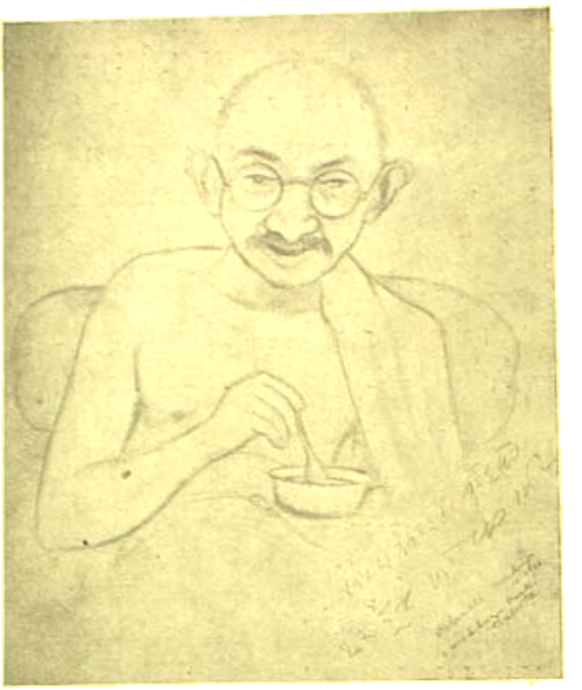

মহাত্মা গান্ধী— শিল্পী—শ্রীসুনাথ মুখোপাধ্যায়

ছাত্রীর কৃতিত্ব—

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও প্রবীণ দেশসেবক শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন মহাশয়ের একমাত্র সন্তান শ্রীমতী বাসনা

শ্রীমতী বাসনা সেন এম-এ

সেন এ বৎসর এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত বেহারে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়

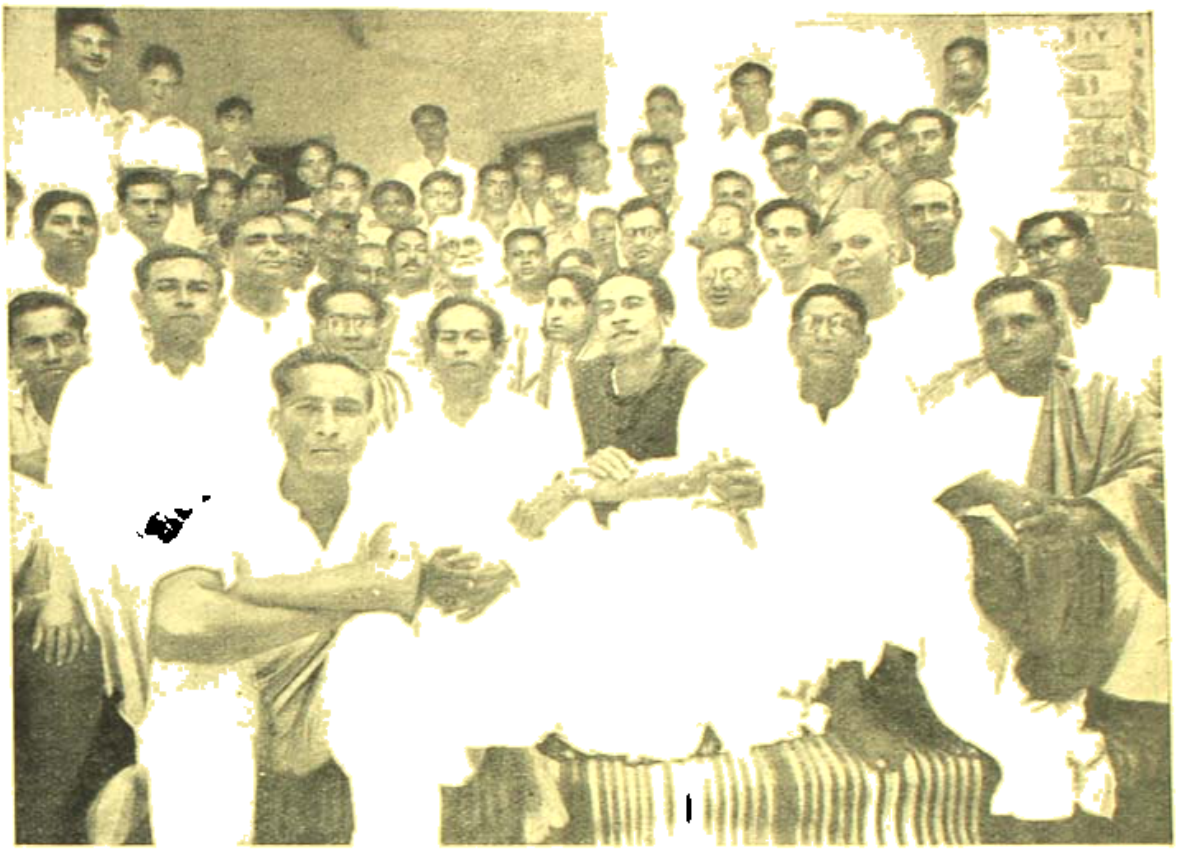

পূর্ণিয়ায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দ　　ফটো—রায় ষ্টুডিও (পূর্ণিয়া)

দিয়াছেন। গত বৎসর তিনি কাব্যতীর্থ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে মাখনবাবু তাঁহার কন্যাকে সংস্কৃত শিক্ষা দানের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সমাবর্ত্তনে সম্মান দান—

গত ২০শে মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পদকাদি দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে—(১) মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্ল্যাকেট—সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী স্বর্ণ পদক (২) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (৩) শ্রীমতী শান্তা দেবী—ভুবনমোহিনী দাস স্বর্ণপদক (৪) অধ্যাপক সুশীলকুমার দে—সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক (৫) শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্র স্মৃতি স্বর্ণপদক (৬) ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ বসু (৭) ডাঃ গণপতি পাঁজা ও (৮) ডাঃ প্রেমাঙ্কুর দে—কোটস্ স্বর্ণপদক (৯) শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য্য ও (১০) শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জুবিলী রিসার্চ স্বর্ণপদক (১১) শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ ও (১২) শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্ণপদক (১৩) শ্রীমতী সীতা দেবী—লীলা পুরস্কার ও (১৪) আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—আধুনিক ভারতীয় ভাষা

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক। আমরা সকলকে তাঁহাদের এই সম্মানলাভে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বেঙ্গল প্রেস এ্যাড্‌ভাইসরি কমিটির পক্ষ হইতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন—মধ্যভাগে শ্রীযুক্ত-সুধাংশুকান্তি ঘোষ-এবং দুই পার্শ্বে লর্ড ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন

জাগরণ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

দুরন্ত বর্ষণের
শ্রাবণ গহন তিমির হইতে
কে জাগালো ধীরে ধীরে।

কত জয়গান, কত কলরোল
কত উৎসব হর্ষ-হিল্লোল,
নবীন সূর্য্য গৌরবে আজ
ভাসিয়া উঠিল কি রে!

পরাধীনতার শত লাঞ্ছনা
হয়ে গেল অবসান;—
বর্ষণ বুকে জাগিয়া উঠিল
ভারতের জয়গান!
স্বাধীন আমরা, স্বাধীন ভারত;
বিজয় দীপ্ত তার জয়রথ
ছুটিল বহি যাব নব ঘন
আঁধারের বুক চিরে।

আদর্শ মনুষ্যত্ব

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, ডি-লিট

আততায়ীর হস্তে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কি ভারতবর্ষেও এরূপ ঘটনা অভূতপূর্ব্ব নহে। খ্রীষ্টের আগমনও হইয়াছিল তাঁহারই স্বজাতির ষড়যন্ত্রে, মহম্মদকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাঁহারই স্বগোত্র কুরেকোরা, গুরু গোবিন্দ সিংহ নিহত হইয়াছিলেন শত্রুর ছুরিকাঘাতে। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে লিঙ্কন ও আরকীডের অপমৃত্যুও এই শ্রেণীর অপকার্য্যের দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মের নামে যে সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়াছে তাহার সংখ্যা আরও বেশী।

মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মহাপুরুষেরা নশ্বর দেহত্যাগের পরও অমর হইয়া থাকেন আপনাদের আদর্শে। সুতরাং মহাত্মাজীর মৃত্যু যতই মর্ম্মান্তিক হউক তাহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কিনা তাহাই প্রধান প্রশ্ন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহাত্মাজী কোন স্থান অধিকার করিবেন তাহা স্থির করিবার সময় এখনও হয় নাই। সমসাময়িক লোকের পক্ষে ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগের প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন। মহাত্মাজীর অকৃত্রিম ভক্তের সংখ্যা অনেক, কিন্তু কেহ কেহ যে তাহার কণ্ঠে প্রচারিত নীতির অত্যন্ত প্রতিকূলে তাহার প্রমাণ ত ৩০শে জানুয়ারীর সন্ধ্যায়ই পাওয়া গেল। দেশের অধিকাংশ লোক মহাত্মাজীর অনুসরণে অহিংসা নীতি গ্রহণ না করিলে তাঁহার দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নৈতিক মৃত্যুও ঘটিয়াছে মনে করিতে হইবে।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে মহাত্মাজীর জীবিতকালে বা তাঁহার পরলোকগমনের পরে তাঁহার জীবনের আদর্শ সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও দেশের অধিকাংশ লোককেই অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবিতকালে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও তিনি সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে যাহারা পূর্ব্বে কখনও তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করে নাই বোম্বাই প্রদেশের সেই অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকেরা আততায়ীর স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে নির্য্যাতনের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

এই অবাঞ্ছিত মনোভাবের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। জীবজগতে মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা হিংস্র। বহু শতাব্দীর সাধনার ফলে মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি কতকটা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে কিন্তু লুপ্ত হয় নাই। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যখন সংঘর্ষ হয়, তখন শত্রুপক্ষকে হত্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মধ্যযুগে যখন মানুষের সভ্যতা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ছিল তখন যুদ্ধের নৃশংসতা নিবারণের জন্য কতকগুলি বিধান প্রচলিত হইয়াছিল। সেকালে নিরস্ত্র ব্যক্তিকে, নারী অথবা শিশুকে যুদ্ধের মাঝে হত্যা করা কাপুরুষতা বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মানুষ এই সকল বিধানকে কেবল অনাবশ্যক নয় অনুচিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ধর্ম্মের কোন অনুশাসনই যুযুৎসুদিগকে স্ত্রীপুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে শত্রু হনন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। আমি ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করি নাই। কিন্তু ইতিহাস অনুসারে ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যেরা যুদ্ধ-বিরাগী ছিলেন এরূপ বলা যায় না। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট উভয়েই হিংসা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাতিদিগের বিজিগীষা মুসলমানদিগের অপেক্ষা কম নহে। নাগাসাকি ও হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ মানুষের সভ্যতার বিকৃত স্বরূপ এমন ভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছে যে ভবিষ্যতে যে এরূপ নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি হইবে না এমন ভরসা করা কঠিন। যদি মানুষ মনে করিত যে এরূপ নির্ব্বিচার নরহত্যা কল্যাণের পরিপন্থী তাহা হইলে হয়ত ভবিষ্যতে শান্তির আশা করা যাইতে পারিত। কিন্তু বিবর্ত্তনবাদী বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে যুদ্ধ প্রকৃতির নিয়ম এবং বিজয়ী পক্ষই বর্ত্তমানে সভ্যতার ধোয়া অভিভাবক। আমাদের যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিগত যুগের মহাপুরুষেরা যে অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন মহাত্মা নিজের জীবনে দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে কারণে শান্তিবাদী যুদ্ধ ও খৃষ্টের শিষ্যেরা নৈতিক ভাবে তাঁহাদের নীতি গ্রহণ করিয়াও কার্য্যতঃ তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের অবজ্ঞা করিতেছেন, সেই কারণেই বহু গান্ধীবাদী কার্য্যে, বাক্যে এবং মনে অহিংস হইতে পারেন নাই।

পৃথিবীতে আবার যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ না হইতে হইতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। লোকক্ষয় যদি লোককল্যাণের একমাত্র পন্থা না হয়, মানুষের ঐহিক মঙ্গলের জন্য যদি শান্তির প্রয়োজন থাকে তবে মহাত্মাজীর আদর্শই মানুষের একমাত্র মঙ্গলের পথ। কিন্তু সকল দেশে সকল মানুষ যদি সেই পথের যাত্রী না হয় তাহা হইলে যুদ্ধ ও তাহা। আনুষঙ্গিক বর্ব্বরতা অনিবার্য্য। বিগত কয়েক বৎসরে দেখা গিয়াছে যে একপক্ষ অহিংস হইবার চেষ্টা করিলে অন্য পক্ষ হিংসার সাহায্যে আপনার সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাত্মাজী শ্রদ্ধা পাইয়াছেন কিন্তু শিষ্য পান নাই।

যদি ইহাই প্রকৃতির নিয়ম হয়, মানুষ যদি জাতিগত ভাবে আপনার স্বভাব সংশোধন করিতে না পারে তবে মহাত্মাজীও কালক্রমে বুদ্ধ ও খৃষ্টের ন্যায় দেবতার পর্য্যায়ে উন্নীত হইবেন। মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, হয়ত তাঁহার নামে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টিও হইবে কিন্তু যে আদর্শের জন্য তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি অনশনে দেহরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে আদর্শ অক্ষুণ্ণ হইবে না, সে উদ্দেশ্য বিফল হইবে। আদিম মনুষ্যত্বের নিকট আদর্শ মনুষ্যত্ব পরাজিত হইবে।

মহাত্মা স্মরণে

মহারাজকুমারী শ্রীপূর্ণিমা ব্রহ্মচারী

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠাবার যারে যারে
এ হীন সংসারে—
তারা বলে গেল ক্ষমা কর পরে বলে গেল ভালোবাস
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশ।

আজ আমার মন খালি এলোমেলো অগোছাল কথা বলতে চায়, কিই বা লিখব কথা, আমার লেখনি আজ পরাজয় স্বীকার ক'রেছে আমারই মত। লেখার মাঝে নেই কোন আবেগ, কোন উৎসাহ। আজ শুধু বন্ধ ঘরে ক'রে বেরিয়ে আসে করুণ ক্রন্দন ; যে কান্নায় আমার মন আমার শুকিয়ে কুঁকড়ে যাবি ফুলের মত হয়ে যায়। এ আত্ম-অবমাননা কেন স্বীকার করে নিতে হয়, পৃথিবীতে অহিংসের কি কোন স্থান নেই। মানুষের মন থেকে কলুষিত পশু প্রবৃত্তি যাবে, সেই দিনটা অপেক্ষায় ব'সে থাকবো, হয়তবা না মুছা যাবেনি কিছু চাক যেন ; যত পাপ কর অকপটে স্বীকার, তা হ'লেই পাবে মন, পাবে শান্তি। শান্তিরও কোন দাম দেবে না তোমায়। কি বিষাক্ত মানুষের মন ! যে দুর্বল, কর তাকে যত পার আঘাত, দুর্বলের প্রতি সকলের নিষ্ঠুরতা—এই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। সত্যিতাও হার মানল, সে পারল না—পরিবর্তন করতে মানুষের আদিম মনোবৃত্তি। যে সবল তার অধিকার আছে সব সময় হিংসকার ক'রে বলার,—ওগো তোমরা নিরীহের দল, কেন তোমরা মাথা তুলতে চাও দিয়াদিদি, তোমাদের স্থান যে আমাদের পায়ের তলায়। স্বাধীনতার বাণী তোমাদের মুখে পাগলের প্রলাপের মতই শোনায়। তাই বলি তোমরা—ওরে তোমরা চুপটী ক'রে অবোধ শিশুর মতই আমাদের দাসত্ব স্বীকার ক'রে। এত অত্যাচার অপমান হয়ত ঈশ্বরেরও সহ্য হল না, তাই তিনি পাঠালেন তার প্রতিনিধি,—আমাদের বাপুজিকে। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের দূতকে পারলাম না চিনতে, দিলাম তাঁকে ফোর করে বিদায়। যে ঋষি এসেছিলেন আমাদের মাঝে—অহিংসা—ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে, তাঁর অমর অস্ত্রের কাছে তীক্ষ্ণ তরবারীর কোন শক্তিই ছিলনা। তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ, তিনি ছিলেন বীর, তাই মৃত্যুকেও গ্রহণ করলেন বীরের মত। সেই মহাপুরুষ মহাত্মাকে পারলাম না আমরা চিনতে।

সেদিন ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার ঘড়িতে তখন ফেব্রুয়ে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ, এই সময়ট মুহূর্তের কথা কোনদিন মন থেকে মুছে যাবে না। এই সময়ট কি নিদারুণ খবর শোনাল বিশ্ববাসীকে, যা কারো কোনদিন কল্পনাতেও আসে নি। চারদিক থেকে শুধু ধ্বনিত হতে লাগল, বাপুজি আর নেই, তাঁকে হত্যা করেছে। সমস্ত নগর যেন চকিতে মুহ্যমান হ'য়ে গেল। লক্ষ লক্ষ নরনারী শোকে বিহ্বল হ'ল ; কারো মুখে কোন কথা নেই। দু-চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে জল। যিনি ছিলেন শান্তির প্রতীক, তাঁকেই কিনা দিয়ে হত্যা করা হ'ল। মহাত্মাজী যাচ্ছিলেন প্রার্থনা সভায়,সেই প্রার্থনা সভাতেই,এক নরাধম বুকে বাপুজীর বিবাদক গুলির পর পর তাঁকে তিনটি গুলি করে, মহাত্মাজী হে রাম হে রাম ব'লে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। তাঁর বুকের শোণিতে লাল হয়ে উঠল বিড়লা মাটি। বহু লোকের বুকের রক্তে বিশ্বের যে মাটি অভিশপ্ত হয়েছিল, মহামানবের রক্তে সিক্ত হয়ে সে ভূমি পুণ্যময় হয়ে উঠল। কে আর অমর বাণী শুনিবে তোমার অশান্ত ছেলেদের শান্ত করবে, কে চাইবে সাম্য-মৈত্রী, কে জ্বালবে আলো দুর্গম পথে, কে বাসবে এমনি ক'রে ভাল ? বহু যুগের সাধনার রাষ্ট্র ও সাধারণের যে স্বাধীনতা আজ ফিরে এসেছে কে তাকে রক্ষা করবে। আমার ফিরে এলো বাপুজী আমাদের মাঝে—অবোধ শিশুদের তোমার জ্ঞানের আলোকে মানুষ করে গড়তে। যে কলঙ্ক কিন্তুরাতি আজ মাথায় তুলে নিয়েছে, সে কালিমা কি কোনদিন আর মুছবে। তুমি আজ নেই, কিন্তু তোমার বাণী তোমার আদর্শ রেখে গেছ, তোমার সাধী ভগবানের কাছ। এখন তারা যেন তোমার আদর্শে গড়ে উঠে দেশকে রক্ষা করতে পারে। এইটুকুই কর তুমি আশীর্বাদ। পরদিন মহাত্মাজীর নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হল বিড়লা প্রাসাদ থেকে যমুনার তীরে, চিরনিদ্রায় শায়িত বাপুজী। সামনে ধূ ধূ করছে যমুনা, নির্বাক দর্শকের মত দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ নরনারী। চোখে নেমেছে শ্রাবণের ধারা। আগুনের লেলিহান শিখা ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠে, আমাদের প্রিয় বাপুজীর শান্ত সৌম্য মূর্তি ঢেকে দিচ্ছে আমাদের সম্মুখ থেকে চিরদিনের মত। আকাশে তখনও সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু দেখা যাচ্ছে।

যশ শান্তি, যশ শান্তি—যেন সাথে সব ক্লান্তি মুছে যেন যাই।

গান ও স্বরলিপি

বাজিবে সখী, বাঁশি বাজিবে ;
ছয়ছয়রাগ ছয়ে রাগিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল, করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
সরমে সুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

II মা জ্ঞা রা | জ্ঞা জ্ঞরা | সা রা I জ্ঞা রা সা | -া -া | -া -া I
বা জি বে ন খা• বাঁ শী বা জি বে • • • •

I সা গা গা | গা গা | গসা গা I মা গা মা | -া -া | -গমা -গপা II
ছ য় ছ রা গ ছ• য়ে রা গি বে • • •• ••

II মা ধা ধা | ধা ণধা | পা মা I গা মা মা | গা মা | গা মা I
ব (ন) চ রা শি• রা শি কো থা যে যা বে ভা সি
(০) ম র মে সু র• ছি য়া মি লা তে চা বে হি য়া

I ণ্‌া ধ্‌া ণ্‌া | সা সা | রা রা I জ্ঞা রা জ্ঞা | -া -া | -মা -জ্ঞমপা II
অ ধ রে লা জ হা সি সা জি বে • • • •••
(০) সে ই চ র ণ যু গ রা জী বে • • • •••

I { ণ্‌া রা রা | জ্ঞা জ্ঞরা | সা রা I জ্ঞা জ্ঞপা মা | জ্ঞমা জ্ঞা | রা [সা] সণ্‌ধ্‌া } I
ন য় নে আঁ খি• জ ল ক রি• বে ছ• ল ছ ল••

I সা গা গা | গা গা | গসা গা I মা গা মা | -া -া | -া -া I
সু খ বে দ না ম• নে বা জি বে • • • ••

রবীন্দ্র-সংগীত স্বরলিপি

রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার জন্য উৎসুক্য দেশে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বর্তমান অবস্থায় তদনুপাতিক সত্বরতার সহিত স্বরলিপি-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয় বলিয়া, বিশ্বভারতী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-সংগীত-স্বরলিপি প্রকাশ করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক নিযুক্ত স্বরলিপি-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এই স্বরলিপিগুলি প্রকাশিত হইবে। ভারতবর্ষ পত্রিকায়ও ভবিষ্যতে এইরূপ স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক, ভারতবর্ষ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

স্বর্গতঃ দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় হকি দল ঃ

বিশ্ববিখ্যাত হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে একটি ভারতীয় হকি দল পূর্ব্ব আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের হকি দলের সঙ্গে মোট ২৮টি প্রতিনিধিত্বমূলক ম্যাচ খেলে সগৌরবে দেশে ফিরেছে। এই ২৮টি খেলায় ভারতীয় দল কোন খেলাতেই পরাজিত হয়নি। সমস্ত খেলায় মোট ২৮৫ গোল দিয়েছে এবং স্বপক্ষে মাত্র ৯টি গোল খেয়েছে।

সমস্ত খেলার ফলাফল

নিম্নলিখিত দলগুলিকে ভারতীয় দলকে কিভাবে পরাজিত করিয়াছে—

১৬ই ডিসেম্বর, মোম্বাসা : মোম্বাসা সম্মিলিত দলকে ৭-০ গোলে।

২০শে ডিসেম্বর, নাইরবি : এশিয়ান স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে ৫-০ গোলে।

২২শে ডিসেম্বর, নাইরবি : কেনিয়ার হকি এসোসিয়েশনকে ৯-১ গোলে।

২৪শে ডিসেম্বর নাইরবি : নাইরবি সম্মিলিত দলকে ৪-০ গোলে।

২৯শে ডিসেম্বর, নাকুরু : এশিয়ান সম্মিলিত দলকে ৯-০ গোলে।

৩০শে ডিসেম্বর, নাকুরু : ইউরোপীয়ান সম্মিলিত দলকে ১৪-১ গোলে।

৩১শে ডিসেম্বর, কিসুমু : কিসুমু সম্মিলিত দলকে ১৬-০গোলে।

২রা জানুয়ারী, কিসুমু : কিসুমু সম্মিলিত দলকে ১১-০ গোলে।

৩রা জানুয়ারী, কিসা : উগাণ্ডা পূর্ব্ব প্রদেশ দলকে ৯-০ গোলে।

৪ঠা জানুয়ারী, কিসা : উগাণ্ডা একাদশকে ৬-০ গোলে।

৬ই জানুয়ারী, কাম্পালা : উগাণ্ডা গোয়ান একাদশকে ১৭-০ গোলে।

৭ই জানুয়ারী,—কাম্পালা : উগাণ্ডা ইউরোপীয়ান একাদশকে ৯-১ গোলে।

৮ই জানুয়ারী,—কাম্পালা : উগাণ্ডা ভারতীয় একাদশকে ১২-০ গোলে।

১০ই জানুয়ারী,—সমগ্র উগাণ্ডা যুক্তদলকে ১১-০ গোলে।

১৪ই জানুয়ারী,—কেল : সম্মিলিত একাদশকে ১৩-১ গোলে।

১৬ই জানুয়ারী,—এলডোরেট : এলডোরেট সম্মিলিত দলকে ৯-১ গোলে।

১৭ই জানুয়ারী,—কিটেল : কিটেল সম্মিলিত দলকে ১১-০ গোলে।

২০শে জানুয়ারী, নাইরবি : এশিয়ান স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে ১০-০ গোলে।

২২শে জানুয়ারী, নাইরবি : নাইরবি সম্মিলিত দলকে ১৩-০ গোলে।

২৪শে জানুয়ারী, নাইরবি : কেনিয়া একাদশকে ৫-০ গোলে।

২৬শে জানুয়ারী, নাইরবি : কেনিয়া ও উগাণ্ডা দলকে ৭-০ গোলে।

৩০শে জানুয়ারী, আকলা সম্মিলিত দলকে ১২-০ গোলে।

৩১শে জানুয়ারী, ডি সালাম সম্মিলিত দলকে ১০-২ গোলে।

২রা ফেব্রুয়ারী, ডি সালাম সম্মিলিত দলকে ১০-০ গোলে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, আক্রিবার সম্মিলিত দলকে ১০-০ গোলে।

৫ই ফেব্রুয়ারী, টাঙ্গা সম্মিলিত দলকে ১৪-০ গোলে।

৭ই ফেব্রুয়ারী, মোম্বাসা : মোম্বাসা সম্মিলিত দলকে ৫-০ গোলে।

গোলদাতাদের নাম

ভারতীয় দলের পক্ষে গোলদাতাদের নাম, গোলসংখ্যা :

ডি সিং ওরফে বাবু (যুক্তপ্রদেশ)	৭০
ধ্যানচাঁদ (সৈন্যবিভাগ)	৬১
পি জ্যানসেন (বাঙ্গলা)	৫৩
লেঃ সাকুর (ভূপাল)	৪০
কিবেণলাল (বোম্বাই)	১৬
আর কার (বাঙ্গলা)	১৪
ওরবচন সিং (ফরিদকোট)	১১
রাজাগোপাল (বাঙ্গালোর)	৬
লেঃ মান্না সিং (গোয়ালিয়র)	৫
স্কেটস (দিল্লী)	৪
কে সি দত্ত (পাঞ্জাব)	২

ভারতীয় খেলোয়াড়গণ :—ধ্যানচাঁদ (অধিনায়ক), আর কার সঃ অধিনায়ক (বাঙ্গলা), বাবু (যুক্তপ্রদেশ), পি জ্যানসেন (বাঙ্গলা), লেঃ সাকুর (ভূপাল), কিবেণলাল (বোম্বাই), ওরবচন সিং (ফরিদকোট), রাজাগোপাল (বাঙ্গালোর), লেঃ মান্না সিং (গোয়ালিয়র), স্কেটস (দিল্লী), কে সি দত্ত (পাঞ্জাব), এস জাফর (বোম্বাই), বি কাপুর (বাঙ্গলা), ডব্লিউ ডি' সুজা (বোম্বাই), লিও পিন্টো (বোম্বাই), ক্রান্সিস (মাদ্রাজ), মুস্তাক আমেদ (বাঙ্গলা)। এস কে সিংহ (বাঙ্গলা) ও সি পিয়ার্স (যুগ্ম ম্যানেজার)।

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট :

আন্তঃ প্রাদেশিক রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে এবছর হোলকার দল ৯ উইকেটে বোম্বাই দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে হোলকার দল ১৯৪৫-৪৬ সালের ফাইনালে বরোদা দলকে পরাজিত করেছিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৪-৪৫ সালের ফাইনালে বোম্বাই-হোলকার দলের ফাইনাল খেলায় বোম্বাই বিজয়ী হয়েছিল।

বোম্বাই : ১৯১ ও ২৬১

হোলকার : ৩৬১ ও ৯৫ (১ উইকেট)

বোম্বাই প্রথমে টসে জিতে ব্যাটিং আরম্ভ করে। উভয় দলের উভয় ইনিংসের সর্ব্বোচ্চ রাণ করেছিলেন হোলকার দলের সি এস নাইডু; বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসে ইব্রাহিম ৪৯ এবং মুস্তাকের ৪২, দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় মঞ্জী ৬২, ফাদকার ৫৫ এবং ইব্রাহিম ৫২ রাণ করেন। অপরদিকে হোলকার দলের গাইকোয়াডের মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৬১ রাণে শেষ হয়। গাইকোয়াড ৯০ রাণে ৬টি উইকেট নিয়ে উভয় দলের বোলারদের মধ্যে এক ইনিংসে বেশী উইকেট পাওয়ার সম্মান লাভ করেন। সদ্য অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যাগত সি এস নাইডু এবং সারভাতে হোলকার দলে এবং মুস্তাকের ও ফাদকার বোম্বাই দলের পক্ষে খেলেছিলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী বিজিতদল

বিজয়ী		রানার্স আপ
১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	উত্তর ভারত
১৯৩৫-৩৬	বোম্বাই	মাদ্রাজ
১৯৩৬-৩৭	নবনগর	বাঙ্গলা
১৯৩৭-৩৮	হায়দরাবাদ	নবনগর
১৯৩৮-৩৯	বাঙ্গলা	দক্ষিণ পাঞ্জাব
১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র	যুক্তপ্রদেশ
১৯৪০-৪১	মহারাষ্ট্র	মাদ্রাজ
১৯৪১-৪২	বোম্বাই	মহীশূর
১৯৪২-৪৩	বরোদা	হায়দরাবাদ
১৯৪৩-৪৪	পশ্চিম ভারত	বাঙ্গলা
১৯৪৪-৪৫	বোম্বাই	হোলকার
১৯৪৫-৪৬	হোলকার	বরোদা
১৯৪৬-৪৭	বরোদা	হোলকার

লণ্ডন অলিম্পিকে নির্ব্বাচিত

ভারতীয় দল ঃ

লণ্ডনে যে পৃথিবীর অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন খেলায় যোগদানের জন্য নিম্নলিখিত ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোনয়ন করা হয়েছে।

১০০ মিটার দৌড়—ই কিলিপস (মাদ্রাজ)

৪০০ মিটার হার্ডল—বলবেন্ত সিং (বোম্বাই)

ম্যারাথন রেস—ছোটালাল (পাতিয়ালা)

হাইজাম্প—ওয়াধসিং (পাতিয়ালা)

১১০ মিটার হার্ডল—জে ডিকাস্ট (বোম্বাই)

ফেদারওয়েট (কুস্তি)—সূর্য্যরাণী (বোম্বাই)

লাইটওয়েট (কুস্তি) বক্তসিং (পাতিয়ালা)

পোলভল্ট—মুসার ও হোসেন (ইষ্ট পি)

মিডলওয়েট (কুস্তি)—কে পি যাই (ইষ্ট পি)

ওয়েল্টারওয়েট (কুস্তি)—এ আর মার্গু (ঐ)

হপ ষ্টেপ ও জাম্প—এইচ রেবেলো (মহীশূর)

ফ্লাই ওয়েট (কুস্তি)—কে ডি যাদব (কোলাপুর)

ব্যান্টম ওয়েট (কুস্তি)—নিরঞ্জন দত্ত (বাঙ্গলা)

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ক্রিকেট টেষ্ট খেলায় এবছর 'রবার' পেয়েছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল। সুদীর্ঘ চোদ্দ বছর পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল পুনরায় 'রবার' পেল। এবছর উভয় দলের ১ম ও ২য় টেষ্ট ম্যাচ খেলা ড্র যায়। শেষ দুটি টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ১০ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে।

অ্যাডম্যান কর্তৃক ভারতীয়

ক্রিকেটের প্রশংসা ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার বাম্বাই ক্রিকেট দল ডন ব্রাডম্যানের নেতৃত্বে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা ক'রে বোম্বাই বন্দরে উপস্থিত হলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের পক্ষ থেকে এই দলটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ডন ব্রাডম্যান অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যাগত ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলার প্রশংসা করেন। তিনি নিজ মুখে বলেন—"It was one of the happiest and most popular teams that ever visited our country. I Could never remember so much genuine sympathy for any visiting team. The Australian public appeared to be anxious that the Indian team should win matches." অষ্ট্রেলিয়াতে অমরনাথ ও লালাবের ব্যাটিংয়ের দক্ষতা উল্লেখ করে বলেন, "ব্যাটিংয়ে ভারতীয়দের চিন্তার বিশেষ কারণ নেই তবে বোলিং আরও উন্নত হওয়া দরকার। ভারতীয় খেলোয়াড় বিজয় মার্চ্চেন্ট সম্পর্কে তিনি বলেন—"We were sorry that your great batsman, Merchant, could not make the trip. Had he been able to do so, I am afraid the bowling averages of our bowlers would not have been as good as they were."

কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড রেস ঃ

কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ৩৯ বাৎসরিক ৪¼ মাইল বোট রেস প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ ৪ লেংথে অক্সফোর্ডকে পরাজিত ক'রে ১৭ মিনিট ৫০ সেকেণ্ডে নূতন রেকর্ড করেছে। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল ১৮ মিঃ ৩ সেকেণ্ডে এবং ১৯০৪ সালে কেম্ব্রিজই তা করেছিল। ১৮২৯ সালে কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এই বোট রেস প্রথম আরম্ভ হয়। ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত অক্সফোর্ড বিজয়ী হয়েছে ১৪বার, কেম্ব্রিজ ১৮বার। ১৯১৮-১৯ সাল পর্য্যন্ত কোন বোট রেস হয়নি। পর্য্যায়ক্রমে কেম্ব্রিজ বিজয়ী হয়েছে ১০বার, অক্সফোর্ড ৭বার।

ব্যাডমিণ্টন খেলা ঃ

কৃষ্ণনগর টাউন ইউনিয়ন ব্যাডমিণ্টন ক্লাব পরিচালিত উমেশচন্দ্র স্মৃতি কাপ প্রতিযোগিতার ডাবলস্ ফাইন্যাল খেলা বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনার সহিত 'কৃষ্ণনগর ওল্ড নিবাস' গ্রাউণ্ডে কৃষ্ণমোহন পাল ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বনাম রাজেন্দ্র মল্লিক ও লক্ষ্মী সেনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় প্রথমোক্ত দলটী ১৫-৮, ১৫-৭, ১৫-৮ পয়েণ্টে সেটে জয়লাভ করেন। বিশেষ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য রবিন ব্যানার্জিকে একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হয়। সমস্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে অনুরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য অশোকচন্দ্র খাসনবিশকে একটি রৌপ্য কাপ দেওয়া হয়।

খেলা-ধুলা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

এ্যাথ্‌লেটিক্‌স্‌ ঃ

এ্যাথ্‌লেটিক্‌সে ভারতীয়গণ পাশ্চাত্যের এ্যাথ্‌লেটদের তুলনায় অনেক পেছিয়ে আছে। এই পিছনে পড়ে থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনের অভাব। তারপর হচ্ছে স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তির অভাব। যে কোন আউটডোর গেমে এই শারীরিক শক্তির অনুবিস্তর দরকার হয় এবং স্বাস্থ্যের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য্য। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী না হ'লে ভাল এ্যাথ্‌লেট হওয়া খুবই শক্ত, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ক'জন? তার উপর ভারতবর্ষ শীতপ্রধান দেশ নয় বলে বৎসরের সকল সময়েই এ্যাথ্‌লেটিক্‌স্‌ বা অন্যান্য খেলাধূলার চর্চ্চা গরমের জন্য করতে পারা যায় না। শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশগুলির আবহাওয়া শরীর চর্চ্চার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের জন্য সেখানকার এ্যাথ্‌লেটদের স্বাস্থ্যও হয় অটুট। তার উপর আছে বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন। ভারতবর্ষের আবহাওয়াকে বদলে ঠাণ্ডা করা যাবে না, কিন্তু এ্যাথ্‌লেটদের পুষ্টিকর খাদ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিং দেওয়া অসম্ভব নয়।

এ্যাথ্‌লেটদের পক্ষে পুষ্টিকর ও নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এর অভাব হ'লে এ্যাথ্‌লেটদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা দুরূহ হয়ে উঠে। তখন শুধু ট্রেনিং দিয়ে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার সাহায্যকারী এই পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আজকাল দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠেছে আর নির্ভেজাল খাদ্যবস্তু তো স্বপ্নের জগতে স্থান পেয়েছে। বেশীর ভাগ এ্যাথ্‌লেটই ধনী নন এবং তাঁদের পক্ষে এই দুর্ম্মূল্যের ও ভেজালের বাজারে পুষ্টিকর ও নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়েছে। শুধু এ্যাথ্‌লেটদেরই এই অসুবিধা নয়। যাঁরা বক্সিং, কুস্তি, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি শ্রমসাধ্য খেলাগুলির চর্চ্চা ক'রে থাকেন তাঁদেরও স্বাস্থ্য রক্ষা করতে নির্ভেজাল ও পুষ্টিকর খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। শ্রমিকেরা যাতে তাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য পায় তার জন্য গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করছেন। এর জন্য আন্দোলনেরও অন্ত নাই। কিন্তু কঠিন শ্রমসাধ্য খেলা যে সব খেলোয়াড়রা খেলে থাকেন এবং যাঁদের অবস্থা স্বচ্ছল নয় তাঁরা এই দুর্ম্মূল্য ও ভেজালের বাজারে যে কি ভাবে খাঁটি ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করে তাঁদের শ্রমজনিত দৈহিক ক্ষয় নিবারণ করে স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন তা' গভর্ণমেণ্ট বা খেলাধূলার কর্ম্মকর্ত্তাগণ ভাবছেন বলে মনে হয় না। জাতীয় জীবনের দিক থেকে একজন শ্রমিকের স্থান একজন এ্যাথ্‌লেটের চেয়ে যে অনেক বেশী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা' বলে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন একজন এ্যাথ্‌লেটের একজন শ্রমিকের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। যদি ভারতীয় এ্যাথ্‌লেটিক্‌সের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাড়িয়ে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ করতে হয় তা হ'লে উদীয়মান এ্যাথ্‌লেটদের বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিং দেওয়া এবং তাঁদের অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলার দিকে ভারতীয় এ্যাথ্‌লেটিক্‌সের কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। আশা করি জাতীয় গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে সাহায্য করবেন। আমাদের বরেণ্য নেতাগণকে অনুরোধ যেন তাঁরা আন্তর্জ্জাতিক খেলাধূলার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে পেছিয়ে পড়তে না দেন। বাংলার স্বাস্থ্যরাগী জননীর প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টিও আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি। আশা করি প্রধান মন্ত্রী ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ণধাররূপে তিনি এ বিষয়ে এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন যা' ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও অনুসৃত হবে।

এবার লণ্ডনে যে বিশ্ব আলম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তাতে যোগদান করবার জন্য ভারত থেকে সাতজন এ্যাথ্‌লেট পাঠান হচ্ছে। তাঁরা যে বিশেষ ভাল ফল দেখাতে পারবেন তা' মনে হয় না। তবে 'হপ্‌-ষ্টেপ্‌ এণ্ড জাম্প'এ মহীশূরের এইচ, রেবেলো খানিকটা সফলতা লাভ করবেন বলে আশা হয়। ১০০০০ মিটার ওয়াকিং রেস্‌ বিজয়ী বাংলার সুবোধ সিংহকে ভারতীয় দলে স্থান না

দেওয়ার অনেকেই হয়ত খুশী হয়েছেন; কিন্তু ট্রায়ালে প্রথম হলেই যে অলিম্পিকগামী দলে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করা যায় তা নয়। তবে সুবোধ সিংহকে ট্রেণিংএ রেখে তিনি আরও উন্নতি করতে পারেন কিনা সেটা দেখা যেতে পারত। যাই হোক, ভারতের যে প্রতিনিধিগণ অলিম্পিকে যোগদান করতে যাচ্ছেন তাঁদের সাফল্য কামনা করি। তাঁরা যদি আংশিক সাফল্যও লাভ করে স্বস্থানে ফিরে আসতে পারেন তা' হ'লে সেটাও ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করবে।

ক্রিকেট ঃ

—হোলকার ক্রিকেটদল কৃতিত্বপূর্ণ ভাবে বোম্বাই দলকে পরাজিত ক'রে এইবার রঞ্জি ট্রফি লাভ করেছে। হোলকার দল এমনিতেই শক্তিশালী, তার উপর অভিজ্ঞ অধিনায়ক কর্ণেল নাইডুর পরিচালনায় হোলকার দল এক

কর্ণেল সি, কে, নাইডু ফটো—সৈলেন চট্টোপাধ্যায়

উঠেছে দুর্জ্জয়। সাধারণ খেলোয়াড়ও যেন নাইডুর পরিচালনায় অসাধারণ হয়ে উঠে। হোলকার দলের বৈশিষ্ট্য তাঁদের একাদশ ব্যক্তি পর্য্যন্ত ভাল ব্যাট করতে পারেন। ব্যাটিংএর দিক দিয়ে হোলকার দল একেবারে নিখুঁত বলা চলে এবং এর জন্য দায়ী কর্ণেল নাইডুর ট্রেণিং। সায়ন্তাতে ও সি, এস, নাইডু অষ্ট্রেলিয়া সফরে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। সি, এস, নাইডু তাঁর এই কর্ম্ম যদি অষ্ট্রেলিয়ার দেখাতে পারতেন তা' হলে আমরা খুবই খুশী হতুম। দেখা যায় সি, এস নিজে দেশে যে রকম খেলেন বাইরে সফরে গেলে তার অর্দ্ধেকও খেলতে পারেন না। এর কারণ কি? তাঁর নার্ভের অভাব না স্ট্যামিনার? সেটা তিনি নিজেই ভাল জানেন। অবশ্য এই অষ্ট্রেলিয়ান টুরে তাঁর স্বপক্ষে বলবার আছে যে তিনি বেশী রান করবার সুযোগ পান নি। যাই হোক তাঁর খেলার আরও উন্নতি করতে না পারলে হয়ত অদূরভবিষ্যতে ভারতীয় টেষ্ট দলে স্থান পাবার সুযোগ তিনি হারাবেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভারতের সুপ্রবীণ খেলোয়াড় কর্ণেল সি, কে নাইডু, ও তাঁর দল লাভ করায় আমরা খুবই সুখী হয়েছি। আমরা কর্ণেল নাইডু ও হোলকার দলকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করি ভবিষ্যতে আরও বহুদিন আমরা ভারতীয় ক্রিকেটের এই প্রবীণ যোদ্ধাকে ভারতের নানা ক্রিকেট যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করব।

• • • •

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ডন্ ব্রাডম্যানের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা করেছেন। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার এই ঐতিহাসিক ক্রিকেট যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুনরায় ইংলণ্ডের মাটিতে আরম্ভ হতে চলেছে। পৃথিবীর ক্রিকেট মহলের দৃষ্টি আবার ক্রিকেটের জন্মভূমির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহলে এসেছে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা। পূর্ব্ব থেকেই খেলার ফলাফল সম্বন্ধে অনেক মতামত শোনা যাচ্ছে। ইংলণ্ড নিজের দেশে খেলে 'এ্যাশেস' লাভ করে অষ্ট্রেলিয়ার তাদের শোচনীয় পরাজয়ের শোধ নিতে পারবে, না আবার পরাজয়ের গ্লানি তাঁদের স্পর্শ করবে—এই নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চলেছে। ইংলণ্ডের যে টিম্ বর্ত্তমানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে খেলেছে তাদের উপর নির্ভর করে ইংলণ্ডের প্রকৃত শক্তির বিচার করা চলে না। ইংলণ্ডের এই দলটি যে বিশেষ দুর্ব্বল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের তালিকাভুক্ত খেলার একটিতেও তাদের জয়লাভ করতে না পারায় এবং চারটির মধ্যে দুটি টেষ্টে পরাজিত হয়ে রবার হারানোয়। তবে ইংলণ্ডের পুরা শক্তি নিয়ে যে এই দলটি গঠিত হয় নি তা সবাই জানেন। দলটির বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই নূতন ও অনভিজ্ঞ। এম, সি, সি কর্ত্তৃপক্ষ

নিজেদের দলের শক্তি ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না বলেই মনে হয়। তা না হলে এরকম দুর্বল দল পাঠিয়ে ইংলণ্ডের সুপ্রতিষ্ঠিত ক্রিকেট মর্য্যাদা এভাবে ক্ষুণ্ণ করতেন না। যাই হোক, ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তার সমগ্র শক্তি যে নিয়োগ করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতেও ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করতে পারবে কিনা সন্দেহের বিষয়। আমাদের মনে হয় স্বাভাবিক উইকেটে ইংলণ্ডের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়াকে টেষ্ট ম্যাচে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। তবে যদি ভাগ্যলক্ষ্মী ইংলণ্ডের প্রতি প্রসন্না হন তা হলে বৃষ্টিপাতের সহায়তায় ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করলেও করতে পারে এবং সে সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়।

ইংলণ্ডকে ব্যাটিংএর দিক দিয়ে নির্ভর করতে হবে, কম্পটন, হাটন, এডরিচ, ওয়ানরুক ও ইয়ার্ডলের উপর। নূতনদের মধ্যে যাঁদের দলে স্থান পাবার সম্ভাবনা আছে তাঁদের মধ্যে গ্রেভ, আইকিন, ক্রেসার এবং ওয়াটকিংএর উপরও কিছুটা নির্ভর করা যেতে পারবে বলে মনে হয়। কিন্তু বোলিংএর দিক দিয়ে ইংলণ্ডের এমন কোনও বোলার নেই যাঁর উপর ইংলণ্ড সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারে এবং যাঁর সহায়তায় অষ্ট্রেলিয়ার ছয় সংখ্যাকে সাধারণের পর্য্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে। বোলিংএর দিক দিয়ে ইংলণ্ডকে নির্ভর করতে হবে এডরিচ, ইয়ার্ডলে, কম্পটন এবং বেডসারের উপর। এর মধ্যে বেডসার আবার দলে স্থান পাবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। নূতনদের মধ্যে ল্যাকার, ইয়ন, হাওয়ার্থ ও কুক্‌এর উপরও খানিকটা নির্ভর করা চলবে। অবশ্য তাঁরা যদি দলে স্থান পান। দেখা গেছে পুরাণ খেলোয়াড়দের মধ্যে গত অষ্ট্রেলিয়ান টুরে এডরিচ ও কম্পটন ছাড়া আর কেউই বিশেষ ভাল খেলতে পারেন নি। নূতন খেলোয়াড়রা কেহই অষ্ট্রেলিয়ানদের বিপক্ষে খেলেনি। তাই তাদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। তা হলে সেই এডরিচ ও কম্পটনের উপরই ইংলণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হবে এবং মাত্র দুজন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে ব্র্যাডম্যান পরিচালিত দুর্দ্ধর্ষ অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচে জয় লাভের আশা দুরাশা বলেই মনে হয়। তবে আগেই বলেছি বৃষ্টিসিক্ত উইকেটের সাহায্যে বা ইংলণ্ডের নবাগত খেলোয়াড়রা যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে ভাল খেলেন কিংবা অন্য কোনও ভাগ্যপ্রেরিত সাহায্যে ইংলণ্ড জয়লাভ করলেও করতে পারে।

* * * *

আগামী শীতকালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতে খেলতে আসছেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তি যে নগণ্য নয় তার প্রমাণ আমরা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম এম, সি, সি, দলের খেলার ফলাফল থেকেই পেয়েছি। এম, সি, সি'র ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরকারী দলটি যে বিশেষ দুর্বল ছিল তাতে কোন সন্দেহই নাই। এই দলে হাটন, হার্ডষ্টাফ ও এ্যালেন ছাড়া ইংলণ্ডের পুরান ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় প্রায় কেহই ছিলেন না এবং সেই জন্যেই যে ইংলণ্ডের অবস্থা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল তাও সত্য। কিন্তু তাই বলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের শক্তিকে অবহেলা করলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রতি অবিচার করা হবে। বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান জর্জ হেড্‌লি পরিচালিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল যথেষ্ট শক্তিশালী বলেই মনে হয়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এইটাই হবে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সফর। ভারতীয় খেলোয়াড় এবং ভারতবর্ষের উইকেট সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই। তার উপর ভারতীয় খেলোয়াড়গণ অষ্ট্রেলিয়া থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরেছেন। সুতরাং নিজেদের দেশে, প্রথম সফরকারী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে বিশ্বের ক্রিকেট মহলে ভারতবর্ষের ক্রিকেট মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার যথেষ্ট সুযোগ ভারতবর্ষ পাবে বলেই মনে হয় এবং আশা করি ভারতবর্ষ এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে। কিন্তু আগেই বলেছি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তি মোটেই নগণ্য নয় এবং তাঁদের পরাজিত করতে হলে পূর্ব্ব থেকেই ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিশেষ করে প্রস্তুত হতে হবে। এই প্রস্তুত হওয়া শুধু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করবার জন্যই যে একান্ত দরকার তা নয়; ভাল রকম ভাবে প্রস্তুত হতে না পারলে আমাদের নিজেদেরও পরাজয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এখন থেকেই সমস্ত প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলির এই প্রস্তুতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তোড়জোড় করা উচিত। প্রত্যেক প্রদেশ থেকেই যে সব খেলোয়াড়ের ভারতীয় দলে স্থান পাবার সম্ভাবনা আছে তাঁদের প্র্যাকটিস ও ট্রেনিং

দেওয়ার উপর প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলির বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলে মনে হয়। আমাদের 'ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'এর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ তাঁরা যেন এখন থেকেই তৎপর হন এবং বাংলাদেশ থেকে যে সব খেলোয়াড়ের ভারতীয় দলে স্থান পাবার সম্ভাবনা আছে তাঁদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখে। এসোসিয়েশনের কর্ত্তব্য খালি ট্রায়ালের ব্যবস্থা করে খেলোয়াড়দের পরীক্ষা করাতেই সীমাবদ্ধ নয়। খেলোয়াড়দের ভাল ট্রেনিং দিয়ে উপযুক্ত করে তাঁরা যাতে সর্ব্বভারতীয় দলে স্থান পান তার জন্য চেষ্টা করাও এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলে মনে হয়। খেলোয়াড়দেরও যদি তাঁদের মধ্যে কেউ ভারতীয় দলে স্থান পেতে চান, এখন থেকেই উঠে পড়ে লেগে তাঁদের খেলার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত।

বাংলা থেকে পি, সেন ছাড়া নির্ম্মল চ্যাটার্জি, পঙ্কজ রায়, এন চৌধুরী ও এস ব্যানার্জির সর্ব্বভারতীয় দলে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আশা করি বাংলার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ এঁদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত "মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান"—১৲
শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "মুক্তির ডাক"—১৷৹
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তবর্ত্তী প্রণীত "আমার ভিত্তিতে যজ্ঞেশ"—১৲
স্বামী বরদেবানন্দ গিরি প্রণীত "Vedic Culture"—৭৷৹
শ্রীরামায়ন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "যাত্রাপথে"—২৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "প্রেতাত্মার প্রতিশোধ"—৸৹
শ্রীরাখালদাস সোম প্রণীত "স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা"—৸৲
শ্রীমৃণালকান্তি দত্ত প্রণীত মহাত্মাপ্রসাদ "সোনার ধনি"—১৲
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "আমাদের বাপুজী"—১৷৹
সুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "পাখির বাসা"—২৷৹
ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত
"শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত (১১শ খণ্ড)—১৷৹

হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের নব-প্রকাশিত রেকর্ড

হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের নব-প্রকাশিত রেকর্ডগুলি এবার নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ। গান্ধীজীর রামধুন ও তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কিত, উদয়শঙ্করের "কল্পনা" নৃত্যনাট্যের সেরা সঙ্গীতগুলির এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ডগুলি বিশেষ উপভোগ্য। গান্ধীজীর প্রিয় "রামধুন" আমাদের জাতির জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে থাকবে। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কের গানগুলির সঙ্গে একটা করুণ বেদনার স্মৃতি জড়িত। এই রেকর্ডগুলির ভাবব্যঞ্জনা বিশেষ মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে সেই কারণেই। উদয়শঙ্করের "কল্পনা"র রেকর্ডগুলির মধ্যে নৃত্য-নাট্য-লীলায় সেরা সঙ্গীতকে ধরে রাখা হয়েছে। এই রেকর্ড ক'খানিতে মহৎ চিন্তা ও ভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে। একটি পেয়েছেন :—
সুকৃতি সেন, রমা দেবী ইত্যাদি "রামধুন" N 16933, কমল দাশগুপ্ত ও মুখিকা রায়, "দুঃখ নিয়া জিনবং" N 16934, কৃষ্ণচন্দ্র দে "শ্রীগান্ধীজী কি" N 16935 ও "সব জীবনের হোমানলে" P 11890, সুকৃতি সেন "হে মহাত্মা হে ঋষিবর" N 27827, জগন্ময় মিত্র "গান্ধীজী মোদের কর্ণধার" N 27828 ; রবীন্দ্রসঙ্গীত—কুমারী সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—তবে একলা চলরে" N 27823, কল্পনা নৃত্য-নাট্যের—"জয়ের মন্ত্র" ও "মৃত্যুঞ্জয়" N 16774, "শাশ্বত সঙ্গীত" ও "কালিকের" N 16778, "লোকসঙ্গীত" ও "রাসলীলা" N 16775, "জাতিরা" ও "খোল বাদ্য" N 16779, "বীণ বাজাও" ও "ভারত জয়" N 16770, "কথা-পুতলী" ও "হাল সন" N 16771

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

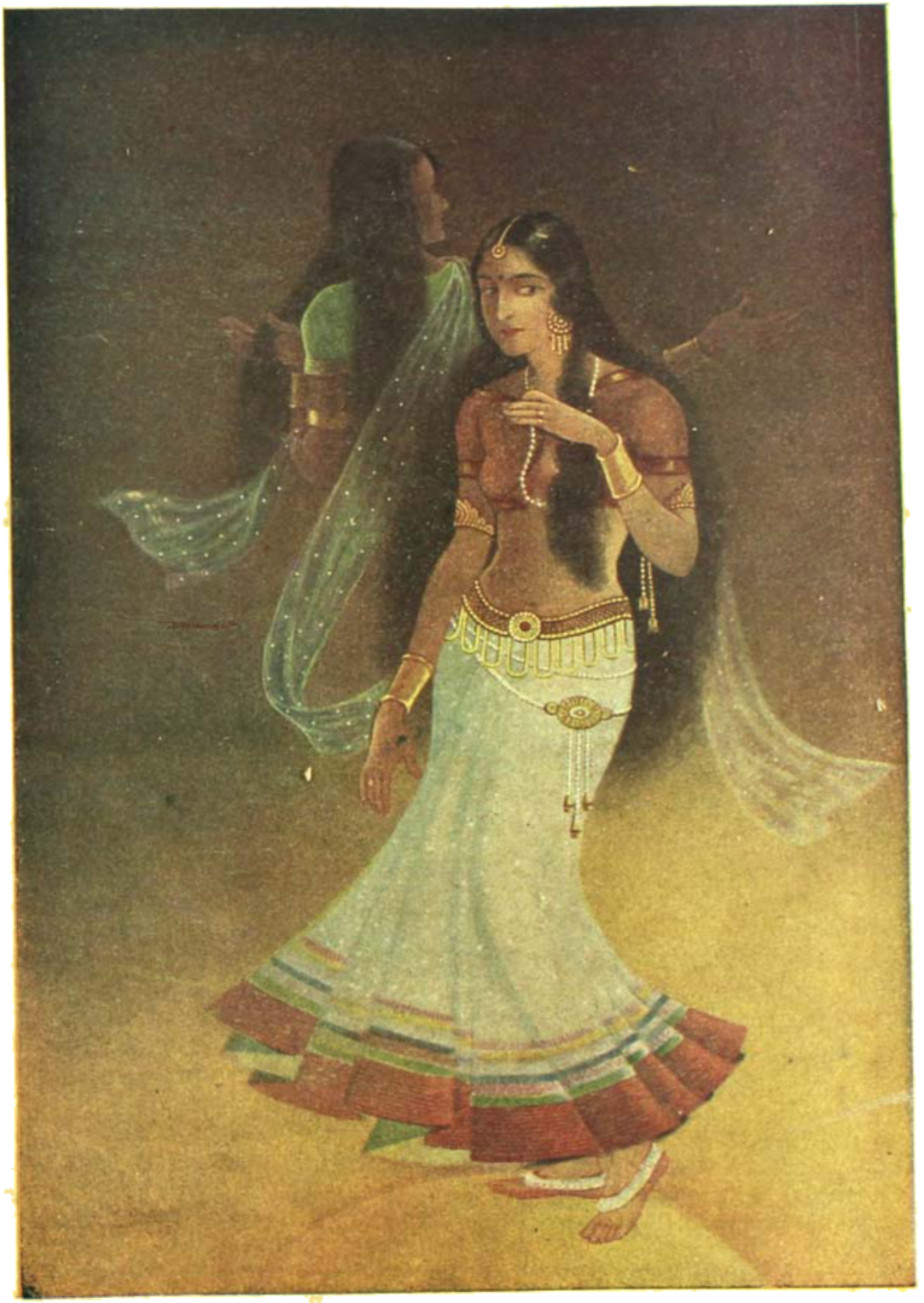

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যামেন্দ্র বিশ্বাস প্রভাতি ও সন্ধ্যা ভারতবর্ষ প্রেস, ৩৫।৪।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৫

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চত্রিংশ বর্ষ	ষষ্ঠ সংখ্যা

পরীক্ষা

শ্রীসুজাতা রায় এম-এ, এম্-এড্ (লীড্স্)

শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে পরীক্ষা এখন একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে, এমন কি স্কুল জীবনে প্রত্যেক বৎসরে ছাত্রদের জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট করে যে পরীক্ষা। তাছাড়াও নানা ব্যবসায়ে এবং নানা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ-অধিকার পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার ওপরে নির্ভর করে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে পরীক্ষা ব্যাপারটির প্রভাব আমাদের জীবনে কম নয়। বার্ষিক স্কুলের মাসিক পরীক্ষা যার পাঁচ দিন সময় ছিলো তার বৎসরের বাকী ৩৬০ দিন এই চিন্তাই করে—পরীক্ষায় কি লিখতে হবে এবং কোন্ জিনিষ না লিখলে বা না শিখলেও চলে যায়। কাজেই শেখার থেকে ফাঁকির ব্যাপারটাই জীবনে বড় হয়ে ওঠে। আই এখন আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রথাটা কি এবং সে বিষয়ে সংশোধনের কোনও প্রয়োজন এবং অবকাশ আছে কি না।

আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি কার্ণেগী কর্পোরেশনের সহায়তায় উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে একটি সভা আহ্বান করেছিলেন। সেই সভাতে যোগ দিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, স্কটল্যাণ্ড, সুইট্‌জারল্যাণ্ড এবং আমেরিকা। এই সভায় ফলে প্রত্যেক জাতি নিজের দেশে তিন বছর ধরে পরীক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্য চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সনে সকলে তাঁদের কার্য্য বিবরণ দাখিল করেছিলেন। আমরা আজ যে আলোচনা করবো তার খানিকটা ভিত্তি হবে ইংল্যাণ্ডের এই বিষয়ের কার্য্য বিবরণ।

বিভিন্ন পরীক্ষক একখানি পরীক্ষার খাতাতে কি নম্বর দেন তা স্থির করাই এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল।

ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাবিদ্‌রা কেমনভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন তার প্রণালীটি সম্বন্ধে আগে বলে নিই, তার পরে ফলাফলের কথা বলব।

১। এই কাজের জন্য যে সব কাগজ গ্রহণ করা হয়েছিল তার প্রত্যেকটি কোনও প্রকৃত পরীক্ষায় গৃহীত কাগজ।

২। নিম্নলিখিত পরীক্ষার কাগজগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল।

(ক) স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। মুখ্যতঃ ১৬ বৎসর বয়সের ছাত্রেরা এই পরীক্ষা দেয় এবং এই পরীক্ষার ফলে তারা অনেক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নানা ব্যবসায়ে প্রবেশ-অধিকার পায়। প্রত্যেক বৎসর এ পরীক্ষায় ছাত্রের সংখ্যা হয় ৬০,০০০ থেকে ৭০,০০০।

(খ) বিশেষ পরীক্ষা (Special place Examination)।

১০ থেকে ১৭ বৎসরের ছাত্রেরা এই পরীক্ষা দেয়। এই পরীক্ষার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রত্যেক বছর ৪,০০০০০ থেকে ৪,৫০০০০।

(গ) অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজের কোনও কলেজে পড়বার বৃত্তির জন্য "মাতৃভাষায় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা।"

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবিত পাত্রে অনার্স পরীক্ষা।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অনার্স পরীক্ষা।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোট ছয় সব রকম পরীক্ষাকেই বাছাই ক'রে নেওয়া হয়েছিল।

৩। মূলত পরীক্ষকের কাছে খাতা পাঠাবার আগে পূর্বের পরীক্ষায় নম্বর সম্পূর্ণভাবে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

৪। পরীক্ষকেরা প্রত্যেকেই (সেই বিষয়ের পরীক্ষায়) অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। মূল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় চারিটি বিষয়ে এমন পরীক্ষক গ্রহণ করা হয়েছিল, যাঁরা এক সঙ্গে কাজ করে অভ্যস্ত। (মহিলা এবং পুরুষ দুই রকম লোকই ছিলেন।)

৫। পরীক্ষা করবার সময় সম্বন্ধে কোন রকম তাড়াহুড়ো করা হয়নি, কাজেই সময়ের অভাবে সিদ্ধান্তে গোলমাল হওয়ার অবকাশ ছিল না।

৬। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল যাতে প্রশ্নের উত্তর কোনও ক্ষেত্রে পরীক্ষক অবধানতাবশতঃ উপেক্ষা করে না যেতে পারেন এবং সন্দেহের কারণ ঘটলেই পরীক্ষকের কাছে কারণ জিজ্ঞাসা নেওয়া হয়েছিল।

৭। পরীক্ষা করবার জন্য পরীক্ষককে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক সাধারণভাবে দেওয়া হয়, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই পরিমাণ অথবা কিছু বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল। বিনা পারিশ্রমিকে উপযুক্ত অনেক পরীক্ষক পাওয়া যেতে পারতো, কিন্তু তাহলে এই পরীক্ষাগুলির প্রকৃতি কৃত্রিম হয়ে পড়তো, সেই জন্য তা করা হয়নি।

এই নম্বরগুলি একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ রোডস (Dr. Rhodes) করেছিলেন। এর ফলে প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠার একটী বই তৈরী হয়েছিল। তার প্রথম ভাগে প্রত্যেকটী পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ ও ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় ভাগে দেখানো হয়েছিল যে পরীক্ষায় নম্বরের পার্থক্য কিভাবে বিভিন্ন পরীক্ষকের বিভিন্ন মান (Standard) গ্রহণের ওপর নির্ভর করে; আবার একজন পরীক্ষকেরই নিজের মনের ভেতর হঠাৎ কি রকম ভাবে বিচ্যুতি ঘটে।

৩৫০ পৃষ্ঠার বইয়ের কথা বলবার সময় আমাদের নেই এবং প্রয়োজনও নেই। এখানে শুধু দুইটিমাত্র উদাহরণ আমরা আলোচনা ক'রব। সেইগুলি বুঝলেই সমস্ত বইটার সার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হবে।

মূল সার্টিফিকেট পরীক্ষার মাধ্যমিক স্তরের নম্বর পেয়েছিল এমন ১৫ খানি খাতা ১৪ জন পরীক্ষক আবার পরীক্ষা করেন। তারপরে বছর খানেক পরে তাঁরা দ্বিতীয়বার সেই খাতাগুলি পরীক্ষা করলেন, প্রথমবারের কোনও নম্বর তাঁরা নিজেদের মনে রাখেন নি। একেবারে মূল পরীক্ষায় এই খাতাগুলি মাধ্যমিক স্তরের নম্বর পেয়েছিল, মানে বছর ১০।১৫ পেয়েছিল—কিন্তু গবেষণামূলক প্রথম পরীক্ষায় কেউ পেল ২১ এবং কেউ ৭০; গবেষণামূলক দ্বিতীয় পরীক্ষায় নীচের দিকের নম্বর হয়েছিল ১৩, আর উপরের দিকের নম্বর হয়েছিল ৭১। ১৪ × ১৫ = ২১০টী মতামতের মধ্যে ৯২টী ক্ষেত্রে এই পরীক্ষকেরা প্রথমবারে যা নম্বর দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বারে অন্য রকম দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র নম্বর হিসাবে পার্থক্য হয়নি, অনেকেই একই ছাত্রকে কোনও বার পাশ কোরওয়ার ফেল করিয়েছিলেন।

এই রকম ভাবে উপরিউক্ত সব পরীক্ষাগুলির সম্বন্ধে গবেষণামূলক কাজ করে দেখা গেল যে পরীক্ষকদের নিজেদের মধ্যে এবং একই পরীক্ষকের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া নম্বরের মধ্যে পার্থক্য ঘটে। পরীক্ষকদের মধ্যে এই বিভেদ প্রত্যেক বিষয়েই দেখা গেল। আমরা মনে করতে পারি যে অঙ্কের খাতা পরীক্ষায় অন্ততঃ মতের পার্থক্য খুব বেশী হয়নি। কয়েকখানি অঙ্কের খাতায় ফলাফল একই রকম হয়েছিল তা ঠিক; কিন্তু একটি অঙ্কের প্রশ্নের ফলের কথা জানলে একটু আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। সেই প্রশ্নটির পূর্ণ সংখ্যা ছিল ১৫; ১০ জন পরীক্ষকের মধ্যে একজন তাতে ১৫ই দিয়েছিলেন, ৩ জন ১২, ২ জন ৮, ২ জন ৭ এবং আর ২ জন ৪ দিয়েছিলেন।

মোট কথা পরীক্ষকদের কাজ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে কেউ কেউ সব সময়েই বেশী নম্বর দেন, কেউ কেউ সব সময়েই কম দেন এবং অনেক সময়ে একজন লোকই কখনো বেশী কখনো কম দেন।

লিখিত পরীক্ষা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষায় দুই দল পরীক্ষক কি ভাবে নম্বর দিয়েছিলেন তার ফলাফলও বিশেষ বিবেচনাযোগ্য। মৌখিক পরীক্ষা সাধারণতঃ নেওয়া হয় পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি বিবেচনা ও সাধারণ জ্ঞান দেখবার জন্য। খুব নামজাদা লোকেদের নিয়ে পরীক্ষকদের দুটী বোর্ড সংগঠন করা হয়েছিল। এঁরা প্রত্যেকে নিজেরা একবার নম্বর দিয়েছিলেন এবং তারপরে এক সঙ্গে হয়ে বোর্ডের মত হিসেবে প্রত্যেকটী পরীক্ষার্থী সম্বন্ধে দুই বোর্ডের আলাদা মত জানিয়েছিলেন। কোনও একটী ছাত্র সম্বন্ধেও সকলের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য ঘটেনি। ঐক্যের কাছাকাছি এসেছিল এই রকম দুটী এবং বিশেষ পার্থক্য ঘটেছিল এ রকম দুটী উদাহরণ এইখানে দিয়ে যাচ্ছি।

ছাত্র	১নং বোর্ড পরীক্ষক					একক মত
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
১	২২০	২৪০	১৭০	২২০	৪৫০	২৩০
২	১৮০	১০০	১৪০	১৮০	২৪০	১৭০
৩	২৪০	২৩০	২৪০	২৩০	২৪০	২৩০
৪	৪১০	১৮০	১৫০	৩৫৪	২০০	৯০০

	২নং বোর্ড পরীক্ষক			একক মত
	ছ	ঝ	ঞ	
১	২৭০	২০০	৭১০	২৩৫
২	২০০	১৫০	১৯০	৩১৫
৩	৪১০	২০০	১৪০	১৯০
৪	২৮০	২৮০	২৭০	২৭০

এ রকম সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষকদের নেওয়া নম্বরের পার্থক্য দেখে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে দৈবের (chance এর) প্রভাব অত্যন্ত বেশী। পরীক্ষকের পরিবর্তন ঘটলেই পরীক্ষার্থীর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটা অবশ্যম্ভাবী।

পরীক্ষায় নম্বর দিতে পরীক্ষকদের মধ্যে মতের এরকম পার্থক্য হয় কেন, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। এই চিন্তার ফলে মনে হয় নিম্নলিখিত কারণ গুলি দায়ী হতে পারে :—

১। একই পরীক্ষক যখন এই খাতাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নম্বর দেন তখন আমাদের বুঝতে হবে যে তাঁর শারীরিক বা মানসিক কোনও পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক সময়ে হজমের পরিপাক ক্রিয়ার গোলমালের জন্য অথবা কোনও অপ্রিয় ব্যাপার আলোচনার জন্য মানুষের মন খারাপ হয়ে যায় এবং অন্যের মধ্যে এমন একটা অনুযায়ীতা এসে পড়ে যে সে সময়ে পরীক্ষার কাগজে নম্বর কম দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। আবার যখন স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কিম্বা কোনও কারণে মন প্রসন্ন থাকে তখন পরীক্ষার খাতায় বেশী নম্বর দিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়।

২। মনীষা বা অন্যের বিচার ছাড়াও অন্য যে কারণে পরীক্ষার নম্বরে পার্থক্য হওয়া সম্ভব তা' হচ্ছে পরীক্ষকের মনে আদর্শ উত্তর সম্বন্ধে ঠিক ধারণা নেই। ধরে নেওয়া যাক্ যে Class X এর ছাত্রদের কাছ থেকে বসু সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষকের কোনও সময় মনে হতে পারে যে এ বিষয়ে ছাত্র নিজে যা লিখেছে তাই যথেষ্ট। কোনও সময় মনে হতে পারে যে তা যথেষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথ থেকে কবিতা উদ্ধৃত করা উচিত ছিল; আবার কোনও সময় মনে হতে পারে যে কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথ কেন কালিদাস, সেক্সপীয়র ইত্যাদি কবির কথাই বা লিখলে না কেন? এই রকম ভাবে প্রত্যেকটী প্রশ্ন সম্বন্ধেই প্রায় বিভিন্ন রকমের ভাবা যায়। পরীক্ষক যে সব সময়েই এক আদর্শ সামনে রাখতে পারবেন, এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই; কাজেই পরীক্ষার ফলে পার্থক্য হওয়া বিচিত্র নয়।

৩। একই পরীক্ষকের মনে বিভিন্ন সময়ে নানা আদর্শ আসা সম্ভব হলে বিভিন্ন পরীক্ষকের যে আদর্শের তফাৎ হবে এটা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই সঙ্গে আরও একটি নিগূঢ় কথা ভেবে দেখা দরকার। প্রত্যেকটী প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় যে তার জন্যে অনেকগুলি ভাগ আছে। যে রকম একটি রচনার মধ্যে আছে (ক) ভাব (খ) পরিকল্পনা (গ) বানান (ঘ) ব্যাকরণ (ঙ) বাক্য সংগঠন (চ) বাক্য বিভাগ ইত্যাদি। একটি ছাত্র হয়তো অন্য সকল অংশে ভাল করলো, কিন্তু অসম্ভব বানান ভুল করলো। অন্য আর একজন, একটিও বানান ভুল করলো না কিন্তু তার রচনায় কোনও রকম ভাব নেই। আর একজনের রচনায় ভাব যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার ভাষায় মাধুর্য্য নেই। আর একজনের হয়তো একেবারেই ব্যাকরণ জ্ঞান নেই। এর মধ্যে কোন্ দোষটার জন্য কত নম্বর কেটে নিতে হবে সেকথা কেউ ঠিক্ করে দেয় না। প্রত্যেক পরীক্ষকই নিজের মত অনুসারে সে বিষয়ে স্থির করেন। এরকম অবস্থায় আমরা পরীক্ষার নম্বরের ঐক্য কি করে আশা করতে পারি?

কেবল মাত্র রচনায় যে এরকম বৈষম্য ঘটে তা নয়, প্রত্যেকটী পরীক্ষার বিষয়েই এই বৈষম্যের সম্ভাবনা আছে। অঙ্ক পরীক্ষায় এই সম্ভাবনা নেই মনে করলে ভুল হবে। সব থেকে যে সরল অঙ্ক, একটি সাধারণ যোগ, তাই নিয়েই দেখা যাক্। যদি তিন সংখ্যার যোগ দেওয়া হয় এবং ছাত্র প্রথম দুইটী সংখ্যা ঠিক্ যোগ করে তৃতীয় সংখ্যাটিতে ভুল করে তাহলে তার সম্পূর্ণ নম্বর কেটে নেওয়া হবে কিনা—এ বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে। সাধারণ প্রথা হচ্ছে সব নম্বরটাই কেটে নেওয়া, কিন্তু যে শিশু সবে মাত্র যোগ শিখতে আরম্ভ করেছে প্রথম দুটী লাইন ঠিক্ করে করবার জন্য কোনও নম্বর না দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত কথা হয়?

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটী প্রশ্ন বিশ্লেষণ না করে বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে কাজ দিলে পরীক্ষার ফলে ঐক্য আশা করা যায় না এবং বিশ্লেষণ করে দিলেও দৈবের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাওয়া যায় না।

পরীক্ষা সম্বন্ধে যে গবেষণামূলক কমিটি বসেছিল তার কাজের ফলাফল থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল যে পরীক্ষার ফলের ওপরে খুব বেশী আস্থা রাখা যায় না। নম্বর সম্বন্ধে একমত না হলেও পাশ ফেল্ সম্বন্ধে, ধরে নেওয়া যাক্ ৭০টী ছাত্রের বিষয় পরীক্ষকেরা একমত হলেন। কিন্তু বাকী ৩০টীকে হয়তো কেউ পাশ করালেন কেউ ফেল করালেন। যে ৭০টী সম্বন্ধে একমত হয়েছেন তাদেরও বিভাগ সম্বন্ধে বেশীর ভাগেই ভিন্ন মত। পরীক্ষার ফলের ওপরে ছাত্রদের জীবন অনেক রকমে নির্ভর করে। কাজেই এর প্রণালী পরিবর্তন করে পরীক্ষাকে দৈবের ব্যাপার না রেখে প্রকৃত বিদ্যার নিকাশের ব্যাপার করে তোলা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে হয়।

পরীক্ষার প্রণালী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি নূতন প্রণালীর পরীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ বিষয়ে যে রকম ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিচ্ছি।

নূতন প্রথায় যে পরীক্ষাগুলি প্রবর্তন করা হচ্ছে তাদের তিনটী বিশেষত্ব আছে।

১। যে প্রশ্নটী করা হবে তার উত্তরটীর বিষয়ে কোনও বিতর্ক থাকবে না। যেমন, ২+৩=৫ এ বিষয়ে মনে কোনও সন্দেহ থাকে না, সেই রকম সব প্রশ্নেরই উত্তর হবে।

২। উত্তরটী যখন স্বতঃসিদ্ধ তখন পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে কোনও মীমাংসা হবে না। যে উত্তর ঠিক্ করা আছে তিনি কেবলমাত্র সেই উত্তরই গ্রাহ্য করবেন।

৩। পরীক্ষার নম্বর তৈরী করবার আগে ভেবে দেখতে হবে যে, যে বয়সের ছাত্রের জন্য এটা করা হচ্ছে সে বয়সের ছাত্রের পক্ষে তা উপযুক্ত হবে কি-না। এই কাজটী কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ

গবেষণা হয়ে গিয়েছে এবং বয়স অনুযায়ী আদর্শ প্রশ্ন অনেক রকম তৈরী হয়েছে। এই কাজগুলি কি ভাবে করতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষকের শিখে নেওয়া দরকার।

পরীক্ষামূলক নতুন কাজকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

(১) Intelligence tests অথবা বুদ্ধি পরিমাপক পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ছাত্রের বুদ্ধি কতখানি প্রখর তার পরিমাপ করা। ছাত্র কতখানি শিখেছে এই পরীক্ষাগুলি দিয়ে তা মাপবার চেষ্টা করা হয় না, কেবলমাত্র তার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রখরতা দেখা হয়। এই পরীক্ষার ফলে এমন হতে পারে—লেখা পড়া শেখেনি এমন একটি ছেলে হয়তো শিক্ষিত অন্য আরেকটী ছেলের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ হয়ে গেল।

(২) School subjects tests অথবা স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞানের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলি দিয়ে দেখা হয় যে ছাত্রের পড়াশুনা কতদূর হয়েছে। কিন্তু স্কুলের সাধারণ পরীক্ষার থেকে এগুলি সম্পূর্ণ অন্যরকম। নূতন প্রণালীর পরীক্ষায় যে তিনটি বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন আগে বলা হয়েছে এগুলির তা আছে।

বিভিন্ন বিষয়ে কিভাবে এই পরীক্ষাগুলি নেওয়া হয় তার নমুনা এখানে কিছু দিচ্ছি।

১। সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা (True False Test) নির্দেশ—নিম্নলিখিত কথাগুলির প্রায় অর্দ্ধেক সত্য এবং অর্দ্ধেক মিথ্যা। সত্য কথাগুলির প্রত্যেকটী লাইনের বামদিকে একটি যোগ চিহ্ন দাও, মিথ্যা কথাগুলির (যাহা আংশিক বা সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহার) প্রত্যেকটি লাইনের বামদিকে একটি শূন্য চিহ্ন দাও। যা জানিনে কথাগুলিতে কোনও চিহ্ন দিও না।

কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না।

উদাহরণ।

+। আকবর তাইমুরের বংশধর ছিলেন।

০। বাবর আকবরের পিতা ছিলেন।

১। আকবর যৌবনের অধিক সময় দিল্লীর রাজধানীতে কাটাইতেন।

২। আকবর নিজেকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' নামে ঘিরাছিলেন।

৩। আকবর যখন সম্রাট হন তখন তাঁহার বয়স খুব কম ছিল।

৪। বেরামখাঁ আকবরের প্রতিনিধি ছিলেন।

৫। বিদ্রোহী বৈরামের প্রতি আকবর সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৬। আকবর যখন সিংহাসনারোহণ করেন তখন তাঁহার সাম্রাজ্য তাঁহার পিতামহের সাম্রাজ্যের অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল।

৭। আকবরের সাম্রাজ্য কুযারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৮। আকবর একটি নূতন ধর্ম স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৯। আকবর তাঁহার রাজত্বের বড় বড় পদগুলি মুসলমানদের জন্য রাখিয়াছিলেন।

১০। আকবরের রাজত্বের অধিকাংশ প্রণালী আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে।

সত্য-মিথ্যা পরীক্ষার প্রশ্নের ভেদ করে আর একরকম পরীক্ষা করা যায় তার নাম "হাঁ" ও "না"।

(১) মজোলিয়ানরাই কি প্রথম অশ্বকে মানুষের ব্যবহারে লাগিয়েছিলেন? হাঁ না

(২) মহারাজ অশোকের সময়ে কি প্রথম শকটের ব্যবহার হয়েছিল? হাঁ না

(৩) বালকের ঘাবিংশার কি চীনদেশে হয়েছিল? হাঁ না

ছাত্র যে উত্তরটা ঠিক্ মনে করবে সে উত্তরটার তলায় বা পাশে দাগ দেবে।

২। The Multiple-choice Test : বহুর মধ্যে আসল-নির্ণয়

এই পরীক্ষাতে চার রকম উত্তর দেওয়া আছে, তার মধ্যে একটি মাত্র ঠিক্। যেটি ঠিক্ তার পাশে + চিহ্ন দাও।

(১) আকবরের জন্ম পিতার প্রাসাদে হয়নি, তিনি সিন্ধুদেশে জন্মেছিলেন ; কারণ (ক) তাঁর মাতামহ সেখানে ছিলেন, (খ) সেখানে তাঁর পিতামাতা ছিল, (গ) সেসময়ের আফগানের ভয়ে তাঁর পিতামাতা পালিয়ে যাচ্ছিলেন, (ঘ) তাঁর পিতামাতা সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

(২) আকবর নূতন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন ; কারণ (ক) তিনি মুসলমান ধর্মকে মিথ্যা মনে করেছিলেন, (খ) তিনি বিভিন্ন ধর্মের লোককে এক করতে চেয়েছিলেন, (গ) তিনি স্বপ্নে এই আদেশ পেয়েছিলেন, (ঘ) তিনি নিজের নাম প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

(৩) আকবরের রাজত্ব কাল ছিল (ক) পঁচিশ বছর, (খ) ছত্রিশ বছর, (গ) দশ বছর, (ঘ) উনপঞ্চাশ বছর।

The Matching Test : কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ পরীক্ষা—

কতকগুলি কথা দুই ভাগ করে সাজানো হবে। একদিকে থাকবে কারণ, আর একদিকে থাকবে কার্য্য। কারণগুলির পাশে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা থাকবে, সেই সংখ্যাগুলি উপযুক্ত কার্য্যের পাশে বসাতে হবে।

১	২
কারণ	কার্য্য
১। বৃষ্টি	ভূমিকম্প
২। বিদ্যুৎ	জোয়ার ভাঁটা
৩। ঊর্দ্ধ আবহাওয়া	বজ্রপাত
৪। জলীয় আবহাওয়া	দিনে গরম ও রাত্রে ঠাণ্ডা
৫। আগ্নেয়গিরির কাজ	পলিপড়া
৬। চন্দ্রের আকর্ষণ	নিবিড় আহার্য্য

The Completion Test : শূন্য-পূরণ পরীক্ষা—

এই পরীক্ষাটি সাধারণ ভাবে সকলেই জানে। সমাজের প্রশ্নের পরীক্ষাতেও অনেক সময়েই দেওয়া হয় "শূন্য স্থান পূর্ণ কর"। এই পরীক্ষায় সাবধান হওয়া দরকার যে উত্তর একরকমের বেশী দুরকম কিছুতেই না হতে পারে।

(১) আকবরের পিতার নাম—ছিল।

(২) হুমায়ুন—দেশে পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই ধরণের প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এই প্রকার প্রশ্নে করা যায় একটি ছবির মধ্যে কোনও একটি অংশ বাকী রেখে; যেমন একটি মুখ এঁকে নাক অথবা কান বাকী রেখে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা যায় যে এ ছবিতে কি নেই। পর্যবেক্ষণ শক্তির পরীক্ষা হিসাবে এই রকমের প্রশ্ন খুব কাজে লাগে।

Classification Test : জাতি-পর্য্যায় পরীক্ষা

অনেকগুলি একরকমের একজাতীয় জিনিষের নাম দিয়ে মাঝখানে অন্য জাতীয় একটি জিনিষের নাম দিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রকে বলা হয় যে বিজাতীয় জিনিষের নামটি কেটে দাও। উদাহরণ :—

১। বেড়াল, ঘোড়া, গরু, আম, কুকুর।

২। সর্ষপ, কয়োপলাশ, গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র।

৩। কাশ্মীর, বোম্বাই, হায়দরাবাদ, বাংলা, মণীপুর।

এই তিনটি লাইনে আম, কয়োপলাশ এবং বাংলা কেটে দিতে হবে, কারণ এগুলি অন্যগুলির থেকে বিজাতীয় পদ।

এই রকমভাবে আরও অনেক নতুন ধরণের পরীক্ষা করা যায়। স্কুল পাঠ্য বিষয়ের একটি বিষয়ের মধ্যে ১।২ রকমের নতুন ধরণের পরীক্ষা দিয়ে দিলে সে বিষয়টি সম্বন্ধে খুব চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা হ'য়ে যায়।

এই পরীক্ষাগুলির একটা সুবিধা আছে। এগুলি দেখতে খুব সহজ এবং পরীক্ষকের পক্ষে এগুলি আয়াসসাধ্য বটে; কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার কাজটি সহজ নয়। এরকমের প্রশ্ন করতে অনেক ভেবে করতে হয় এবং পাশের মানও সাধারণ পরীক্ষার মানের মত একটা নিজের খেয়ালমত নম্বর (arbitrary marks) ঠিক করে রাখা যায় না, অনেক বিচার করে সেটা ঠিক করতে হয়। একবার সব ঠিক হয়ে গেলে তারপরের কাজ অবিশ্যি খুবই সোজা।

নূতন ধরণের পরীক্ষা—

গুণ ও দোষ—

গুণ।

১। এই পরীক্ষায় বিচার পরীক্ষকের মতের ওপরে নির্ভর করে না। প্রত্যেকটি প্রশ্ন এমন ভাবে তৈরী হয় যে ইচ্ছা করলে একটি কল দিয়ে পর্য্যন্ত এ পরীক্ষার নম্বর ঠিক করা যায়। কোনও কোনও জায়গায় কল ব্যবহারের চেষ্টাও হয়েছে কিন্তু তা ব্যয়সাধ্য এবং একটু অসাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়ে। এগুলির উত্তরে নম্বর দিতে পরীক্ষক নিজেই কলের মত কাজ করে যেতে পারেন।

২। পুরাতন প্রথায় পরীক্ষা করলে একটি বিষয়ের খানিকটা অংশ মাত্র পরীক্ষা করা যায়। কারণ ছাত্রের উত্তর লিখতে এত বেশী সময় চলে যায় যে বিষয়টি সমগ্রভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। তার ফলে এই হয় যে ছাত্রেরা সাধারণতঃ বিষয়ের খানিকটা অংশ মুখস্থ করে রাখে, আর বাকী অংশটা দেখে না। কাজেই ব্যাপারটা লটারীর মত দাঁড়িয়ে যায়। যারা যে অংশটা মুখস্থ করেছে প্রশ্ন সৌভাগ্যক্রমে সেখান থেকে এলে তারা পাশ হয়ে যায়, না এলে তারা ফেল হয়, কিন্তু নতুন প্রণালীর পরীক্ষায় এই রকম লটারীর অবসর থাকে না। বিষয়টি সমগ্রভাবে ভাল করে না শিখলে ছাত্রের পাশের সম্ভাবনা থাকে না।

৩। যদিও নতুন ধরণের ছাত্রের বিষয়টি ভাল করে শেখা প্রয়োজন হয়, তবুও ছাত্রেরা এই রকমের পরীক্ষা অনেক বেশী পছন্দ করে। কারণ এই রকম পরীক্ষায় লিখবার পরিশ্রম অনেক কম হয় এবং পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্ব করবার কোনও সুযোগ থাকে না। পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে অনেক সময়ে অকারণ ভয়ও থাকে; এক্ষেত্রে পরীক্ষক সেই অকারণ সন্দেহের হাত থেকে রক্ষা পান।

৪। এই প্রথায় পরীক্ষা পরীক্ষকের পক্ষেও খুব সুবিধাজনক। পরীক্ষায় কাগজ দেখা একটা কতদূর বিরক্তিকর ব্যাপার, তা পরীক্ষকেরা সকলেই জানেন। এই রকমের পরীক্ষায় একটি আদর্শ উত্তর পরীক্ষার্থীর কাগজের সামনে অথবা পাশে রাখলেই পরীক্ষক অতি সহজে নম্বর গুলি দিয়ে যেতে পারেন।

৫। পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষকের সুবিধা ছাড়াও শিক্ষালয়ের দিক থেকে দেখলে এই পরীক্ষাগুলির প্রশংসা করতে হয়। এগুলি শুধু বৎসরের শেষে পরীক্ষা নেবার জন্য ব্যবহার না করে ক্লাশের পড়াটা ঠিক ভাবে শেখানো হচ্ছে কিনা তা বোঝবার জন্যও ব্যবহার করা যায়। এই রকম একটি পরীক্ষা ক্লাশে নিয়ে শিক্ষক যদি নিজে উত্তর গুলিতে নম্বর না দিয়ে ছাত্রদের কাছেই সেগুলি পরীক্ষা করতে দিয়ে যেন তাহলে ছাত্রেরা খুব সহজে নিজেদের ভুল ত্রুটী বুঝতে পারে।

আমাদের দেশে বৎসরের শেষের পরীক্ষার আদর্শের ওপরেই সারা বৎসরের শিক্ষার গতি নির্ভর করে। সেই জন্য নতুন ধরণের পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তন করে দেওয়া যায়।

দোষ।

এই পরীক্ষাগুলির আরও অনেকরকম গুণ আছে। এখানে তা নিয়ে আর আলোচনা করবার দরকার নেই। এইবারে এই গুলির একটি বিশেষ অসুবিধার কথা বলব। এই পরীক্ষাগুলি দিয়ে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিমাণ এবং শুদ্ধতা ভাল ভাবেই যাচে নেওয়া যায়, কিন্তু তাদের রচনা শক্তি বা সংগঠন শক্তি সম্বন্ধে কিছু বোঝা যায় না। রচনা ও সংগঠন শক্তির পরিমাণ না করা হলে ছাত্রকে পরীক্ষা করা সম্পূর্ণ হ'ল এমন কথা বলা যায় না।

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতির যদি আমরা উন্নতি করতে চাই, তবে এই নূতন পদ্ধতির পরীক্ষাগুলি এবং পুরাতন প্রথার পরীক্ষা দুই রকম মিলিয়ে পরীক্ষা নেওয়া উচিত। ছাত্রের বয়স যখন কম তখন রচনা শক্তির ওপর সামান্য নম্বর রেখে তার জ্ঞানের পরিমাণ বোঝবার জন্য নূতন পদ্ধতির পরীক্ষাই বেশী করা উচিত। ছাত্রের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে রচনা ও সংগঠনের ওপর জোর বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তবে এই রচনা পরীক্ষার জন্য আমাদের আর একটু বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করা দরকার। পরীক্ষার হলে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে একটা রচনা করতে না দিয়ে যদি ছাত্রকে ক্লাশে বেশী সময় দিয়ে এবং নানা বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করবার সুযোগ দিয়ে ছাত্রদের অবসর

দেওয়া হয় তবে সেই কাজ দুই এক ঘণ্টার মধ্যে তাড়াতাড়ি করে লিখে দেওয়া রচনার থেকে বেশী মূল্যবান লিখিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবে যে ক্ষেত্রে আমরা ছাত্রের কেবলমাত্র উপস্থিত বুদ্ধি, উপস্থিত রচনার শক্তি ও স্মরণ শক্তির পরীক্ষা করতে চাই সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বর্ত্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা নেওয়াই প্রয়োজন। কাজেই আমাদের ভালভাবে চিন্তা করে পরীক্ষার প্রশ্ন ও ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের দেখতে হবে, কোন্ বয়সের ছাত্র আমরা পরীক্ষা করছি এবং তার বয়স অনুপাতে (১) তার জ্ঞান (২) তার রচনা করবার শক্তি এবং (৩) তার উপস্থিত রচনা ও স্মরণশক্তি, কোন শিরিবেট কতখানি পরীক্ষা করতে চাই, সেই অনুপাতে পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরারী করা দরকার। (৩) সম্বন্ধে আরও একটু কথা বলা দরকার। এই রকম পরীক্ষার বাইরের আবর্ণ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিচার করা সম্ভব না কাজেই পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত এখানে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই; কিন্তু অনেক আগে একটি কথা বলেছিলাম যে একটি রচনার মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যেমন (ক) ভাব (খ) পরিকল্পনা (গ) ধারণ (ঘ) ব্যাকরণ (ঙ) বাক্য সম্পদ (চ) বাক্য বিন্যাস ইত্যাদি—এইগুলিতে রচনা ভাগ করে নিয়ে কোন্ ভাগের জন্য কত নম্বর ধরে দেওয়া হবে সে বিষয়ে পরীক্ষকদের মধ্যে বিশদ আলোচনা হয়ে যাওয়া দরকার। এই কাজটা করে নিলে এই রকমের পরীক্ষার ফলও অনেকখানি ঐক্যের পথে এসে যায়। পরীক্ষা নেওয়া একটি বিষম দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এর উপরে ছাত্রদের জীবনের গতি এবং অনেক সময়ে জীবন-মরণ পর্য্যন্ত নির্ভর করে। আমরা যদি ধরেও নিই যে বেশীর ভাগ ছাত্র সম্বন্ধে অবিচার হয় না তবুও দু' চারটী ছাত্র সম্বন্ধে অবিচার ঘটতে দেওয়া পরীক্ষকের পক্ষে দায়িত্বশূন্য কাজ। তাছাড়া পরীক্ষাই যখন আমাদের সারা বছরের শিক্ষার গতি নির্দ্দেশ করে দেয় তখন পরীক্ষা পদ্ধতিকে গতানুগতিক না রেখে সুপরিকল্পিত পথে চালিত করবার ভার শিক্ষকদের ওপরেই রয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করতে এবং অবিলম্বে আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থায় সাহায্য করতে দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষককে অনুরোধ করছি।

সোমনাথ মন্দির

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তব বেটলের পটলের মনে দেশের অবসাদ—
জাতির জীবনে যাদব বজ্রাঘাত।
বিরাট বিশাল দেব মন্দির,
শুভ গৌরব যুগ সঞ্চিত,
ক্ষীত উদার দানবের বল করে দিল ভূমিসাৎ।
উঠিত ভূবার বেলা গভীর শঙ্খ ঘণ্টা রব,
সাগর প্লাবিত মহামহিম স্তব,
স্নিগ্ধ দিব্য পুণ্য আলোক,
সুদূর হইতে জুড়াইত চোখ,
দীপান্বিত যে প্রভাস বেলার মুছে গেল গৌরব।
অনন্ত যাঁর মূর্ত্তি এবং অনন্ত রূপ যাঁর—
লিঙ্গ ভাতি' করে গম্ভীরা চীৎকার।
বিজাতীয় বিষ বহ্নি প্রবল,
বিষাক্ত করি গেল ধন জন,
ছড়াইয়া পাপ আবিলকারী মন অন্ধ আঁধিয়ার।
কে নাশে তোমারে? তুমি কালজয়ী, জাতীর হৃদয়ে রাজো
শুভ্র রক্তে রাঙা হয়ে আছ আজও।
মরমে ও মনে তব ছায়া রবি,
সতত সিক্ত আঁখিধারা সুতি,
কোণ খুঁড়ি দিলে, গোটা ভারতের মন খুঁড়ি তুমি আছ।
ফেরে, তাণ্ডব মৃত্য করিয়া প্রলয়ঙ্কর শিব.
গড় মণিকোঠা আলো আরতির দীপ।
নব শতাব্দী চলে নেছে আমি
লয়ে অশান্তি অশিবের বাণী.
পাষাণ পেয়েছে লক্ষিৎ ফিরে আর মাথি নির্জ্জীব।
অস্থি মজ্জা রক্তে যে বাধা রহিয়ে নিরন্তর,
যে চূড়ার কথা তোলেনি নীলাম্বর,
রক্তেতে রাঙা রাঙা-পাঞ্জরে
তবকেতে রচ বেদী আবরে,
কোটি মর্ম্মের মর্ম্মর ভূমে বন্ধন অহরহ।
নূতন ভুবন যে গড়ে গড়ুক তাহাতে দুঃখ নাই.
ও বেটল ঘোরা নূতন গড়িতে চাই।
এসো পুরাতন মহিমায় পুনঃ
কোটী কণ্ঠের আহ্বান শুনো,
এসো হে জগন্মঙ্গল শিব তব পূজা যেন যাই।
বিদর্শী ভাই, তাহার সবস্থবিধি সেদিন নেই—
গড়ার সনদ্ আজি পাঠায়েছে সেই।
মহৎ সৃষ্টি বিনাশই যে পাপ,
তাহাকে গড়ায় আসি অনুতাপ,
পূর্ণ করার গৌরব আছে চূর্ণ করার নেই।

বনফুল

১৮

সদাশরবিহারীলাল যে ঐতিহাসিক মন্দির ও মূর্তিগুলির উল্লেখ সুশোভনের কাছে করেছিলেন সেগুলি দেখতে হলে যে স্টেশনে নামা দরকার সেই স্টেশনে নেবেই মুচুকুন্দ কুন্তলেশ্বরীর জন্যও গাড়ি বদল করতে হয়। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর যে সুতরাং সেই স্টেশনে নেবেছিলেন। নেবে নিজের খদ্দরী ঝোলা থেকে কিছু ফলমূল বের করে' এবং স্টেশনের নিকটবর্তী দোকানটা থেকে কিছু লুচি ভাজিয়ে নিয়ে আহারটা সমাধা করে' নিলেন তিনি প্রথমে। তারপর হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ট্রেণের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এখনও। স্টেশনের দেওয়ালে টাঙানো টাইম-টেবিলটা দেখলেন আর একবার। হ্যাঁ, এখনও অনেক দেরি আছে ট্রেণের। স্টেশন মাস্টারের কাছে গেলেন। তাঁর কাছে নিজের খদ্দরের ঝোলাটি এবং স্যুটকেসটি গচ্ছিত রেখে বেরিয়ে পড়লেন তিনি স্টেশন থেকে। বেশ দ্রুত পদক্ষেপেই বেরিয়ে পড়লেন। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর যে আস্তে হাঁটেন না কখনও। ঐতিহাসিক মানুষ তিনি। মাউতপুরের উক্ত প্রাচীন মন্দির ও মূর্তিগুলির কথা তিনিও শুনেছিলেন। এ সুযোগ ত্যাগ করা অনুচিত হবে তাঁর মনে হল। একটু দূর গিয়ে স্থানীয় একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। লোকটি তাঁকে সোজা একটি রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে—"এ রাস্তা দিয়ে গেলে দূর হবে একটু, মাঠামাঠি গেলে শিগ্‌গির পৌঁছবেন।" অধ্যাপক ব্রজেশ্বর যে মাঠে নেবে পড়লেন।

...মন্দিরের কাছে পৌঁছে হাতঘড়িটার দিকে চাইলেন একবার। তারপর চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন। আর একবার হাতঘড়িটা দেখলেন। অবাক হলেন একটু। মোটে তিন মিনিট কাটল। হঠাৎ তাঁর মনে হল সুবিশাল মন্দিরটা যেন আধুনিকতার সমস্ত হৈ চৈ হুড়োমুড়িকে অগ্রাহ্য করে' অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যসহকারে সময়ের গতিরোধ করে' দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা মনে হতেই তাঁর ডানদিকের ভ্রূর শেষ প্রান্তটা ওড়াক করে' উপরের দিকে উঠে গেল খানিকটা। তারপর সচেতন হলেন তিনি—সময় নষ্ট হচ্ছে—কবিত্ব করে' সময় নষ্ট না করে' মন্দিরটাকে যেখা উচিত আগে ভাল করে' নানাদিক থেকে।

একটু এগিয়ে একটা কোণ ঘুরেই থমকে দাঁড়াতে হল তাঁকে। যা চোখে পড়ল তা অপ্রত্যাশিত। সামনেই একটা মোটর বাইক স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড় করানো রয়েছে। তার সামনেই মন্দিরের একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশেই প্রকাণ্ড একটা সুরঙ্গ-গোছের, মাটির নীচে চলে গেছে। তার ভিতর চামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছেন কে একজন। তাঁর দেহের নিম্নার্দ্ধ—বিশেষ করে' পশ্চাদ্ভাগটা—দেখা যাচ্ছে কেবল। এখন এই সুযোগে একটা ছোঁড়া পা দিয়ে তাঁর মোটর-বাইকটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। ব্রজেশ্বর-বাবুর বুঝতে দেরি হল না যে মোটর-বাইক ওই ভদ্রলোকের, ছোঁড়াটা দুষ্টুমি করবার চেষ্টায় আছে। বাইকটা পড়ে' গেলে জখম হতে পারে। পরুষ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন তিনি—"এই কি হচ্ছে—"

ছোঁড়াটা ছুটে পালাল এবং নানা রকম কসরৎ করে' সুরঙ্গ থেকে নিজের দেহকে অতি-কষ্টে মুক্ত করে' বেরিয়ে এলেন সদাশরবিহারীলাল। হাতে টর্চ।

"কি! বলছেন কি! মুক্তদের ভিতরও খানিকটা কারুকার্য্য আছে কি না আমি সেইটে দেখছিলাম। মানে, আশা করি অন্যায় হয় নি তাতে কিছু। আপনি কি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ?"

"না। আমি—"

"এই মন্দিরের কারুকার্য্য সম্বন্ধে কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে আমার। আপনি যদি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কেউ না হন তাহলে হঠাৎ অমন ধমকে উঠলেন যে। মাথাটা এমন ঠুকে গেছে আমার। উঃ—"

মাথার পিছন দিকে হাত বুলোতে লাগলেন তিনি।

"আমি আপনাকে কিছুই বলি নি। এ মোটর-বাইক কি আপনার?"

"হ্যাঁ, আমারই। কিন্তু এ কথাই বা জিগ্যেস করছেন কেন তাও তো বুঝতে পারছি না। আমি এ নিয়ে চটাচটি করতে চাই না, কিন্তু অমন আচমকা চীৎকার করবার সত্যি কি কোনও দরকার ছিল? আমার মোটর-বাইক নিশ্চয় আপনার কোনও ক্ষতি করে নি। আশেপাশে প্রচুর জায়গা রয়েছে, স্বচ্ছন্দে আপনি চলে' যেতে পারতেন। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু ওখানে মোটর-বাইক আমি কেন রাখতে পার না তা আমি বুঝতে পারছি না। বিশেষ আপনি যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কেউ নন তখন অমন করে' চেঁচাবার—"

"মশাই, আমার কথাটা শুনুন আগে শেষ পর্য্যন্ত। শুনলে হয় তো আপনার রাগ আর থাকবে না—"

"না, না, রাগ আমার হয় নি, রাগের প্রশ্নই উঠছে না। আপনার চীৎকারে আমি এমন চমকে উঠেছি যে মাথাটা ঠুকে গেছে। মুক্তদের ভিতর সব পাখর কিনা—"

"একটা ছোঁড়া আপনার বাইকটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল, আমি তাকেই একটা ধমক দিয়েছিলাম"

"ও, তাই না কি! আরে বাঃ—সো সরি, কিছু মনে করবেন না মশাই, ক্ষমা করুন, মানে করতেই হবে। ছি ছি ধারণার অতীত ছিল—ঠিক—মানে, আচমকা মাথা ঠুকে গেলে মানসিক অবস্থাটা একটু—বুঝতেই পারছেন। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য"

এগিয়ে এসে বাইকটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন একবার। ব্রজেশ্বরবাবু লক্ষ্য করলেন তাঁর দুটি হাতেই প্রচুর কাদা-মাটি লেগে রয়েছে। গবেষণার ফল সম্ভবত। সদারঙ্গ-বিহারীলাল ব্রজেশ্বরবাবুর মুখের দিকে ক্ষমা-প্রার্থনা-ব্যঞ্জক অদ্ভুত রকম ছোট্ট হাসি হাসলেন একটা। যেন হারমোনিয়মের একটা 'রীড'কে গ্যাঁক করে টিপে দিলে কে একবার। ব্রজেশ্বরবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন কেবল। তাঁর মুখে কোমলতার কোনও আভাস ফুটল না।

"আপনার মাথায় চোট লেগেছে অবশ্য, কিন্তু আপনার বাইকটা চোট খেকে বেঁচেছে"

"নিশ্চয়, আর কোনও ক্ষোভ নেই আমার—একদম না। ছোঁড়াটা গেল কোন দিকে? ছোঁড়া!"

ব্রজেশ্বরবাবু ঘাড় নাড়লেন।

"এ অঞ্চলের ছোঁড়া ছুঁড়ি সব পাজি। আপাদমস্তক। পরশু দিন বাইকটা রাস্তায় রেখে একজনের বাড়িতে গেছি ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট ছুঁড়ি এসে হর্ণটা বাজাতে সুরু করেছে। আর একটা প্যাং বাইকটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই যে ছুট। হা-হা-হা—"

"এটা ছোঁড়া। আমার ধমক খেয়ে ছুটে পালাল"

"পালিয়ে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন"—পাশের ঘন ঝোপটার দিকে চেয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল বললেন। এমন-ভাবে বললেন যেন ছোঁড়াটা পাশের ঝোপেই লুকিয়ে আছে এবং তাঁর কথা শুনছে।

"প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উচিত এই সব হতভাগা ছোঁড়াদের এখানে ঢুকতে না দেওয়া। এখানে গরু চরাচ্ছে, ছাগল চরাচ্ছে—যা তা। একদিন দেখি একটা ছোঁড়া হাতুড়ি কাঁটি ঠুকছে মন্দিরের গায়ে—একটা চমৎকার বিষ্ণুমূর্ত্তি ছিল সেখানে—বিষ্ণুর কপাল কেটে চৌচির—দেখবেন? আসুন না। প্রত্নতত্ত্ববিভাগে লেখা উচিত। লিখব ভাবছি। একে বর্বর বললে কিছু অন্যায় হয় না। হয়?"

বলা বাহুল্য সদারঙ্গবিহারীলাল একটা আলঙ্কারিক উপমা মাত্র দিয়েছিলেন। এই আগন্তুক ভদ্রলোক কিন্তু যে ভাবে সেটা নিলেন তা অপ্রত্যাশিত। রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। দ্বিতীয়বার যেন তাঁর মাথা ঠুকে গেল।

"বয়"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"আপনি যখন প্রশ্ন করলেন তখন আমাকে বলতেই হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই।"

অপ্রস্তুত সদাশিববিহারীলাল সবিস্ময়ে এই খদ্দর-পরিহিত ব্যক্তিটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন বার দুই। আশ্চর্য্য। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে আসলে ইনি এতবড় একটি কালাপাহাড়।

"মিল নেই? সত্যি? প্রত্যাশা করি নি। ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু"

"আপনাদের মতো লোকই কেবল এসব জায়গায় আসতে পারবে, অন্য কেউ পারবে না—এটা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না আমার"

"হয় না? আশ্চর্য্য কাণ্ড। এটা নিশ্চয়ই আপনাকে মানতে হবে অতীতের এই গৌরবময় মন্দিরে এমন লোকের প্রবেশ করা উচিত নয় যারা এর মূল্য সম্বন্ধে সচেতন নয় এবং সেই জন্যেই যারা সশ্রদ্ধ নয়, মানে, এককথায় চাষার স্থান এ নয়। চাষারা এখানে এসে যে কি কাণ্ড করে—উঃ কি সাংঘাতিক জানেন? কে একজন হারাধন বসাক ছুরি দিয়ে নিজের নাম খোদাই করেছে একটা মূর্ত্তির পেটের উপর। চোয়াড়ের দল সব! স্বচ্ছন্দে সঙ্গে' থাকলেই পারে। অতীতের প্রতি যাদের শ্রদ্ধাই নেই তাদের এখানে দরকার কি—তারা আসবেই বা কেন। হারাধন বসাকের দল যখন এসবের দফা নিকেশ করে দেবে তখন কি হবে বলুন তো? আর কি কিরে পাওয়া যাবে? এসব কি বাজারে পাওয়া যায় যে আর একটা কিনে এনে বসিয়ে দিলেই চলবে? আমার মতে এমন কোনও বাজে লোককে এখানে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয় যারা এসবের মর্ম্ম বোঝে না, এসবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না—"

সদাশিববিহারীলালের কণ্ঠস্বরে উষ্মা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আসলে যে সুর তাতে বাজছিল তার উদ্দেশ্য এই অদ্ভুত প্রকৃতির আগন্তুকটিকে স্বমতে আনয়ন করা।

ব্রজেশ্বরবাবু মন্দিরের ভগ্নস্তূপের দিকে অতিশয় তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন একবার। তারপর পরিষ্কার শান্তকণ্ঠে বললেন, "মাপ করবেন, এই সব চুণ-সুরকির স্তূপকে শ্রদ্ধা করতে আমি প্রস্তুত নই"

তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বললেন না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চাইলেন। সদাশিববিহারীলাল নাকের মাঝখানটা চুলকুলেন একবার এবং যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন হঠাৎ। নির্ব্বাক হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্য। লোকটা বলে কি!

ব্রজেশ্বর পুনরায় মুখ ফেরালেন এবং নিজের দৃষ্টিকে ধীরে ধীরে পুনঃস্থাপিত করলেন সদাশিববিহারীলালের অস্থিবিকিরণশীল চশমার উপর। একটা অতি ক্ষীণ হাসি—যা ঠিক হাসি নয়, হাসির আভাষ—তাঁর অধরে ফুটি ফুটি করেও যেন ফুটল না।

"না"—নিজের চিন্তাধারাকে বাধায় করে' তিনি যেন বললেন—"এমন সব মন্দির আছে যার গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত কাটতে পারে না কেউ—ধ্বংস করা দূরে থাক। কিন্তু সে সব মন্দির হাতে-তৈরি চুণ-সুরকির মন্দির নয়। বিজ্ঞানের মন্দির, সাহিত্যের মন্দির, যে সব মন্দিরে পূজারীরা জ্ঞানলাভ করে' প্রকৃত আনন্দ পান সেই সব মন্দিরই পবিত্র, সেই সব মন্দিরকেই আমি শ্রদ্ধা করি। একটা পচা পুরোণো শিবমন্দির বা বিষ্ণু মন্দির"—ভগ্নস্তূপের দিকে হস্ত প্রসারিত করলেন তিনি—"থাকল বা গেল কি এসে যায় তাতে। একটা হাত পা ভাঙা মূর্ত্তির চেয়ে জীবন্ত হারাধন বসাক ঢের বেশী শ্রদ্ধেয় আমার চোখে—"

সদাশিববিহারীলাল ঈষৎ ব্যাহত আননে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। অদ্ভুত লোক! আর একবার কৌতূহলভরে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন দীর্ঘাকৃতি লোকটির দিকে। এদেরই কি গৌরাঙ্গ-গোবিন্দ বলে! অসম্ভব নয়। সরু লম্বা মুখখানা। মনে হয় ছেলেবেলায় সমস্ত মুখখানা ধরে' লেবুর মতো নিংড়ে দিয়েছে কেউ যেন। ছুঁচলো থুতনিটাতে ফুটে উঠেছে ভদ্রলোকের চরিত্র—ঠিক দৃঢ়তা নয়—একগুঁয়েমি। চোখ দুটি কিন্তু ঠিক উলটো। আশ্চর্য্য! যদিও বসা কিন্তু চোখে একগুঁয়েমি বা রুক্ষতার কোনও চিহ্ন নেই। বরং দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছে তা স্নিগ্ধ। সদাশিববিহারীলাল এ-ও লক্ষ্য করলেন ভদ্রলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুব। খদ্দরের জামা কাপড় ধপধপ করছে। পোষাকে আড়ম্বর নেই, কিন্তু মার্জ্জিত রুচির পরিচয় আছে। এঁকে দেখে তো মনে হয় না যে ইনি কোনও মূর্ত্তি নষ্ট করতে পারেন বা কোনও অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের গবেষণায় বাধা দিতে পারেন। মোটেই মনে হয় না। অথচ কথাবার্ত্তা থেকে—! আশ্চর্য্য!

এ কথাটা ব্রজেশ্বরবাবুরও মনে হল সম্ভবত। কারণ এর পরই তিনি যা বললেন তার সুর অন্যরকম। বেশ নরমই—অনেকটা ক্ষমাপ্রার্থনার মতো শোনাল।

"আমার মতামত তা বলে' জোর করে' চাপাতে চাই না আপনার ঘাড়ে। প্রত্যেকেরই নিজের মত পোষণ করবার অধিকার আছে"

"তা আছে বই কি। বাঃ। ভাল লাগল এ কথাটা—" চশমাটা ঠিক করে' নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন সদারঞ্জনবিহারীলাল হাস্যোদ্ভাসিত মুখে।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন, "খাপছাড়াভাবে আমার অভিমতটা শুনে আপনার একটু বেখাপ্পা ঠেকছে বোধহয়। একটু হকচকিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। যদি আপত্তি না থাকে আপনাকে একটু পরিষ্কার করে' বুঝিয়ে বলি"

"আপত্তি? মোটেই না। ভারী ইন্টারেস্টিং বরং"—

"আপনার কি ধর্মবাই আছে? কারণ ও ব্যাধি আক্রমণ করেছে যাঁকে তাঁর কাছে যুক্তির অবতারণা করা বৃথা। তিনি চাইবেন সকলে তাঁর প্রলাপকে যুক্তিযুক্ত বলে' মেনে নিক"

সদারঞ্জনবিহারীলালের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হয়ে উঠল।

"বিপক্ষের যুক্তিকে সবাই প্রলাপ বলে' প্রতিপন্ন করতে চায়। সে কথা থাক। আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন না। বেশ লাগছে"

"দেখুন"—ধীরে ধীরে সুরু করলেন ব্রজেশ্বরবাবু—"যে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ, যে সূক্ষ্ম আত্মোপলব্ধি প্রত্যেক ধর্মেরই মূলকথা, তার সঙ্গে এই পাথরের স্তূপের সম্পর্ক নির্ণয় করা একটু কঠিন নয় কি? ধর্মটা হল আত্মিক ব্যাপার—আর এগুলো—পাথরের শিব-লিঙ্গই হোক বা সোনার ষাঁড়ই হোক—যাতে তৈরি স্থূল ব্যাপার—"

"এক মিনিট"—সোৎসাহে বলে' উঠলেন সদারঞ্জনবিহারী—"থামুন—বাঃ চমৎকার জমবে মনে হচ্ছে। কিন্তু গোড়াতেই একটা কথা জিগ্যেস করে নি। আপনার এবং আমার ধর্মমত কি এক"

"হওয়া সম্ভব বলে' মনে হয় না"

"খ্রাস্ট না কি আপনি"

ব্রজেশ্বর ঘাড় নাড়লেন।

সদারঞ্জনবাবু তাঁর মুখের দিকে ক্ষণকাল নির্নিমেষে চেয়ে থেকে আবার যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন।

"তা হোক। হিন্দু বলে' পরিচয় যেন নিশ্চয় নিজেকে"

"নিশ্চয়"

"ভারতীয় বলেও"

"অবশ্য"

"তাহলে, মানে, শুনুন আপনার কাছ থেকেও এরকম আচরণ তো প্রত্যাশা করা যায় না। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার তর্ক তুলব না—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পড়ে দেখুন গিয়ে—তুললে অনেক সময় নষ্ট হবে। আমি শুধু এই কথা বলছি যে এটা প্রত্যাশা করা যায় না আপনার কাছ থেকেও যে হিন্দু হয়ে আপনি হিন্দুত্বের গায়ে কাদা ছিটিয়ে বেড়াবেন, ভারতীয় হয়ে ভারতের গৌরব সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন। যাযাবর বলাকাকে আপনি অজন্তার শ্রদ্ধায় চক্ষে দেখছেন, যে ছোঁড়াটা আমার বাইক ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল তাকেও মনে টানবেন না কি!"

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সদারঞ্জনবিহারীলালের মুখ। চোখ দুটো বুজে গেল।

ব্রজেশ্বরবাবু উত্তর দিলেন, "টানতে আপত্তি নেই। আমি যদি বুঝতে পারতাম যে আপনি ওই সুত্রদের ভিতর ঢুকে ভারতীয় হিন্দুত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করছেন, তাহলে মৃদু প্রতিবাদস্বরূপ আমি নিজেই হয়তো আপনার সাইকেলকে লাথি মেরে ফেলে দিতাম"

"দিতেন? বাঃ, চমৎকার তো। ব্যাপার কি বলুন দেখি। আপনার মনোভাবটা বুঝতে পারছি না ঠিক"

"সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই। আপনি যখন একটা ভাঙা কার্নিস বা অন্ধকার সুরকি নিয়ে আপনার হিন্দুশক্তি ব্যয় করেন তখন ভেবে দেখেন না যে আরও কত দরকারি কর্তব্য অকৃত রয়েছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে, তামসিকতার বিরুদ্ধে কত যুদ্ধ করতে হবে—"

"ঠিক। এ সব তো জানিই—বাঃ"—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে কথা বলে ফেললেন সদারঞ্জন—"ওদের বিরুদ্ধেই তো আমারও জেহাদ। আমিও যোদ্ধা একজন, পলাতক নই, রোজ যুদ্ধ করছি। কিন্তু এটা হচ্ছে বিশ্রাম—অবসর বিনোদন—ইংরেজিতে যাকে 'রিল্যাক্সেশন' বলে"

"কিন্তু আপনার এই অবসর বিনোদন দেশের অনিষ্ট

করছে তা জানেন? যা আপনি স্বচক্ষে দেখছেন তাই প্রেরণা জোগাচ্ছে আপনার অকৃপক্ষকে—সেই শত্রুপক্ষকে যারা কুসংস্কারের বেড়াজালে ঘিরে, ধর্মের ভয় দেখিয়ে, নানারকম আইন অনুহাত খাড়া করে' লক্ষ লক্ষ লোকের শ্বাসরোধ করে' মেরে ফেলছে। তাদের সংস্কার-ধর্ম-আইনও এই ধ্বংসস্তূপের মতো নেকেলে, কিন্তু একটু তফাত আছে—ধ্বংসস্তূপের মতো নিষ্ক্রিয় নয় সেগুলো, কারাগারের মতো ভীষণ। তবে দেখেছেন এসব কখনও?"

সদাশিবিহারীলাল কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে উচ্চতর কণ্ঠে বললেন, "আপনারা অতীত অতীত বলে' লাফিয়ে বেড়ান, কিন্তু ইতিহাস উল্টে দেখুন অতীতে আনন্দজনক তেমন কিছু নেই। ডাকাতদের রোমহর্ষণ কাহিনী কেবল। আমার মতে অতীতের অধিকাংশই পুঁছে ফেলা উচিত; উপরে ফেলা উচিত, বর্তমানের জীবনযাত্রায় অতীতের ছায়া-পাত অসহ্য। অতীতের যেটুকু শ্রদ্ধেয় তার কথা আগেই বলেছি—সাহিত্য আর বিজ্ঞান। এই সব ইঁটের টুকরো, সুরকির গুঁড়ো, প্রথার হুমকি, কুসংস্কারের দাসত্ব—এরা প্রাণহীন মৃত এবং সেই জন্যেই অনিষ্টকর। এদের ঝেঁটিয়ে পুড়িয়ে ফেলে দিলে তবে আমাদের বর্তমান জীবন হালকা ঝরঝরে হবে"

"সর্বনাশ! আপনি কি সোশালিষ্ট?"

"নিশ্চয়। যদিও এই দেবেশ গায়ে এঁটে দেশের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছেন অনেকে"

"অ্যাঁ? আপনার চেয়েও বেশী ঝাঁকালো সোশালিষ্ট আছে না কি। ও বাবা"

মৃদু হাসি ফুটে উঠল ব্রজেশ্বরের মুখে। চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল।

"কোন বিষয়েই বেশী ঝাঁজ আমি ভাল মনে করি না। আমি—"

কি একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করে থেমে গেলেন তিনি। নিজের কথা বলতে সঙ্কোচ হল বোধ হয়।

"কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলতে লোভ হচ্ছে"

"কি বলুন"

"প্রগতিশীল নামে আজকাল একটা যে দল হয়েছে আপনাকে সেই দলে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার। ভুল করলাম বোধ হয়, না?"

"না মারাত্মক ভুল হয় নি। তবে এটাও ঠিক, তেমন প্রগতি হয় নি আমার। বেশী প্রগতি বরদাস্তই হয় না। কাজ করার চেয়ে চাততালির লোভ যাদের বেশী তাঁদেরই প্রগতি হুহু করে' বেড়ে যায়। হাঁপিয়েও পড়েন তাঁরা চট করে'। পেছিয়ে যান শেষে—প্রগতি পশ্চাৎ-গতি হয়ে দাঁড়ায় শেষটা। সত্যি যারা কর্মী তারা হুড়োহুড়ি করে' এগিয়ে যেতে চায় না, পেছিয়েও পড়ে না। আমি কোনটাই করি নি"

"ও। যাক আপনাকে দেখে খুশী হয়েছি খুব। মানে, খুব। আমি রাজনৈতিক কর্মী নই—সে যোগ্যতাই নেই সম্ভবত আমার। কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে কৌতূহল আছে, —ভীষণ। আমার ভাঙা তক্তাপোষের উপর বসেই রাজাউজির লাটবেলাট গান্ধি জহরলাল সবাইকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি হরদম!"

(ক্রমশঃ)

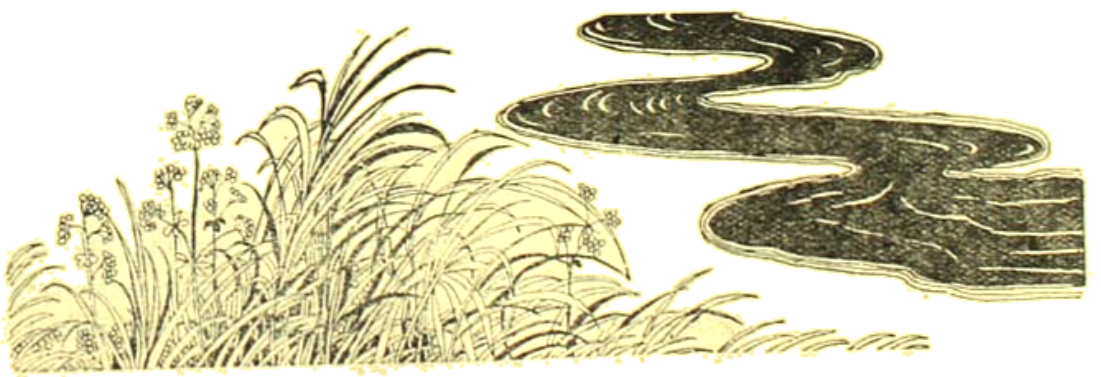

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৮

বৈশাখী পূর্ণিমা আসিল। অদ্য সন্ধ্যায়, অথবা প্রথম যামের প্রথম পাদে আমরা যাত্রা করিব—আমরা দ্রব্যজাত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আছি। মহাস্থবির গণনা করিয়া আমাদের যাত্রার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—বলিয়া পাঠাইয়াছেন, পণ্ডিত শুভক্ষণের মধ্যে যেন যাত্রা করা হয়। স্থির হইয়াছিল আমরা বাণিজ্যের বাপদেশে সংগৃহীত দ্রব্য সম্ভার লইয়া দুইজন অনুচরের সহিত নৌকাযোগে কপিষার স্রোতধারা বাহিয়া প্রথমে কপিষা নগরীতে গমন করিব। তথায় সুবর্ণবিহারে আমাদিগকে দিন কয়েক অবস্থান করিতে হইবে। সুবর্ণবিহারের সংঘস্থবির আমাদিগের যাত্রিক গমনের সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। উত্তর ও প্রতীচ্যগমনযাত্রী বৌদ্ধ সার্থবাহ ও বণিকগণের পথে বিশ্রামের জন্য, কিংবা যাত্রার কোনও বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ প্রতীক্ষাকল্পে কপিষায় সুবর্ণবিহারে সমাবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সন্ধিস্থলে অবস্থিত ও প্রতীচ্যের দ্বারস্বরূপ এই কপিষায় বণিকবীথিতে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া থাকে। বণিক ও সার্থবাহগণ কর্ত্তৃক আনীত অনেক দ্রব্য কপিষায় উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয় এবং সুযোগ বুঝিয়া অনেকে তাহাদের পণ্য অনেক সময় কপিষার বীথিতে বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক আপনাপন সম্ভার লঘু করিয়া লইয়া থাকে। আমাদেরও হয়ত এইরূপ আমাদের সংগৃহীত পণ্যসম্ভার পথিমধ্যে লঘু করিয়া লইতে হইবে। আমরা যথাসম্ভব আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া আমাদিগের তথাকথিত বাণিজ্যের পণ্যসমূহ বর্জ্জনপূর্ব্বক বাহ্লিকে প্রবেশ করিব। বাহ্লিকে আমরা বুদ্ধব্যবসায়ী যবন বলিয়া পরিচিত হইব। মহাস্থবিরের প্রদত্ত পরিচয় পত্র আমাদিগের এই অভিনব প্রচেষ্টা সমর্থন করিবে। বাহ্লিকে প্রজ্ঞা ও আমি সাম্রাজ্যের মহামাত্য মহাবলাধিকৃত ট্রাটেগস্ ফিলোট্টাটেসের সহিত সম্মিলিত ও পরিচিত হইব। আর্য্য মহাস্থবির মহামাত্যের নিকট আমাদের যে পরিচয়পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমাদিগকে পুরুষপুরবাসী বৌদ্ধ যবন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রজ্ঞাকে ও আমাকে তিনি যথাক্রমে সংঘোবিডস্ ও থেওডোটস্ এবং আমাদের দুইজন অনুচরকে পালিডস্ ও আন্ত্যোকিডস্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দুই ব্যক্তি আমাদের প্রধান অনুচর হইবে।

পূর্ব্বাহ্নে মহাস্থবির ত্রাণ সঙ্ঘের দুই জন সদস্যসহ আমাদিগের নিকট আগমন করিলেন। সদস্যদ্বয় আমাদিগের অভিযানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ মহাস্থবিরের নির্দ্দেশানুসারে বহন করিয়া তাঁহার সহিত আসিল। ত্রাণসঙ্ঘের এই দুইজন সদস্য পুরুষপুরবাসী ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের দুইজন প্রবর।

অভিযানের আনুষ্ঠানিক ও যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহাস্থবির আমাদের উভয়ের হস্তে ত্রিশ সহস্র করিয়া ষষ্টি সহস্র সুবর্ণ দিনার অর্পণ করিলেন। আমাদিগের বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের কোনও অভাব হয় নাই। প্রাচ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে নানা প্রকার বহুমূল্য পণ্যসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল। মহাচীন হইতে চীনাংশুক আসিয়াছিল, গৌড়, সমতট ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইতে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, পট্ট ও কৌষবাস, মগধ ও গৌড় হইতে ইক্ষু, খর্জ্জুর ও তাল বৃক্ষ নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত শর্করা ও মদ্যসমূহ, সমতট হইতে মধু সংগৃহীত ও আনীত হইয়া আমাদের বাণিজ্য সম্ভার সমৃদ্ধ করিল। এমন কি ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধের উপদেশ বাণীতে বিভিন্ন হইলেও প্রতীচ্যে সম্রাট ও ধনবিত্তের বিলাসের জন্য প্রাচ্যের "সুরাসবের মত" পর্য্যন্ত আমাদিগের সংগৃহীত বাণিজ্য সামগ্রী মধ্যে উপেক্ষিত হয় নাই—গৌড়ী ও মাধ্বী সুবিখ্যাত প্রাচ্যসুরা বিক্রয়ের জন্য বংশ ও কাচ নির্ম্মিত আধারে সযত্নে ও সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইয়া আমাদের পণ্য দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। গৌড়দেশ হইতে আনীত তিনখানি সুবৃহৎ নৌকা আমাদের পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ ও সজ্জিত হইল। পুরুষপুরের একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ও যাত্রোপযোগী সুসজ্জিত নৌকা যামার্দ্ধিকাল পূর্ব্ব হইতে আমরা আমাদের ঘাটায় তীরতরুর আনত স্রোতধারি চুম্বিত কৃষ্ণশাখার ঘন পল্লব ও পুষ্পাবলীর অন্তরালে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সেই খানিতে অভিযানের সময় আমাদের অবস্থানের জন্য স্থির হইল এবং তাহাতে দিবসে বসিবার ও আহারাদির জন্য এবং রাত্রে শয়ন ও বিশ্রামের জন্য সব্যবস্থার ব্যবস্থা হইল। আনন্দের উপর নৌকাগুলি সৌষ্ঠবের সহিত সজ্জিত ও রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইল। আজি চারিদিন সে এই কার্য্যে ব্যাপৃত—বিশ্রাম নাই, কোনও প্রকারে দিনান্তে মাতাপুত্র সমাপন করিয়া লয়।

আমরা স্থির করিয়াছি যে কপিষার পণ্য বীথিকায় এবং পথে দূরে পাশ্চাত্যদেশগামী সার্থবাহ ও বণিকগণের নিকট আমাদের সংগৃহীত পণ্যসমূহ বিক্রয় করিয়া আমরা তাহাদিগেরই সহিত বাহ্লিকাভিমুখে প্রয়াণ করিব এবং বাহ্লিকসমরীতে আমাদের অভিযান আপাততঃ শেষ হইবে। কপিষায় সুবর্ণবিহারে আমাদের অনেক দিবসের অবস্থানের কথা উল্লেখ করিয়া পুরুষপুরস্থিতদের আর্য্য মহাস্থবির সুবর্ণবিহারের মহাস্থবিরকে সেই মর্ম্মে পত্র দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

অপরাহ্নে আর্য্য মহাস্থবির পূর্ব্বদায় প্রমণ মুদ্গলায়নের দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন যে অদ্য রাত্রের প্রথমযামে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে সৌর্পণাশীতে অশ্বতরযোগে যাত্রা করিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ নিষিদ্ধ। সায়াহ্নে সংঘারাম হইতে আরক্তিক মাঙ্গল্য আসিলে আমরা উহা গ্রহণ করিয়া যামিনীর প্রথমযামে কৌষুদী-উদ্ভাসিত কপিবাস্তুতে আমাদের তরুণীয় বন্ধন মুক্ত করিব।

অনুচর তাহাকে লইব তাহাই এখন বিবেচ্য। প্রজ্ঞা যাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে সে তাহার আশৈশব ক্রীড়াসঙ্গী এবং এখন তাহার পরিচারক ও সেবক। তীর্থকের উপর প্রজ্ঞার অপরিসীম বিশ্বাস ও নির্ভর। প্রজ্ঞার জন্য সে অনেকবার আপনাকে বিপন্নগ্রস্ত করিয়াছে।

কিন্তু আমি কাহাকে সঙ্গে লইব? এখন সমস্যা তাহাই। আনন্দ কি যাইবে? সে ত এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথের কষ্ট কি সহ্য করিতে পারিবে?

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে প্রজ্ঞা ও আমি সজ্জিত নৌকাসমূহ দেখিতে কপিবাস্তুর পত্তন করিলাম। দেখিলাম, আনন্দ তাহার কার্য্য শেষ করিয়া ঘাটার সন্নিকট বৃক্ষচ্ছায়ায় একটি প্রস্তর বেদীতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। মুখে বিষাদ ও চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে। আমরা নৌকার সজ্জিত পণ্যসম্ভার দেখিলাম। দেখিলাম, সকলই সুসজ্জিত ও সৌষ্ঠবের সহিত রক্ষিত। আমরা পণ্যসজ্জা পর্য্যবেক্ষণ সমাপন করিলাম। প্রজ্ঞা তীর্থকের সহিত গৃহে ফিরিল। আমি আনন্দের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আমি আনন্দের পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহার হইয়াছে, আনন্দ!"

—হাঁ, ভাই, হইয়াছে।

—আজ এত বিষণ্ণ কেন, আনন্দ!—একেবারে মৌন, নির্ব্বাক—ব্যাপার কি—বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ কি!—বড় কষ্ট হইয়াছে, না?—আজ কয়দিন অবিরাম পরিশ্রম হইতেছে।

—আমাকে না কি তুমি সঙ্গে লইয়া যাইবে না স্থির করিয়াছ?

—এই বয়সে পথের কষ্ট কি সহ্য করিতে পারিবে?

—পারিব।—আমার শরীর এখনও ত বেশ ভালই আছে।—রুগ্ন ত নহি!

—কিন্তু, তুমি যাইবে কেন, আনন্দ?—আর সেখানে গিয়াই বা তুমি কি করিবে?—তুমি কি সেখানে যবনের ছদ্মবেশে—যবনের মত—থাকিতে পারিবে?—এখন কি, যবনের সঙ্গে—যবনের ঘাটিতে থাকিতে হইবে।—পারিবে কি?

—কেন পারিব না? পারিব বলিয়াই ত যাইবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি। তুমি আর বাধা দিও না, দাদা।

—তার পর, ভাষা,—তুমি ত যবনের ভাষা জান না।

—লিখিতে পড়িতে পারি না—তবে পুরুষপুরে যবনদিগের সহিত বাল্যকাল হইতে মিশিতাম—আমি তাহাদের কথা বুঝিতে ও বলিতে পারি।

—সে কি? তুমি তাহা হইলে যাবনিক ভাষা জান? আর তীর্থক—প্রজ্ঞার অনুচর—সেও কি তোমার মত যাবনিক ভাষা জানে?

—সে আমারই মত জানে।

—পিতা কি তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন?

—দিবেন কি? দিয়াছেন। তুমি আমাদের বয়সের মণি—আমাদের সর্ব্বস্ব—সেজন্য নির্ব্বাসনে চলিয়াছ। বিদেশে একেলা—না জানি কত কষ্ট পাইবে—আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি কি? পিতা আমাকে তোমার সহিত যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

—তুমি প্রৌঢ়বয়স্ক—পথের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কি না জানি না.—তাহার পর তোমাদের সেখানে ছদ্মবেশে থাকিতে হইবে—সর্ব্বদা সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়া বাস করিতে হইবে—পারিবে কি? জানি না—হয়ত, যোদ্ধযোগের সৃষ্টি হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিলম্ব ঘটিবে।

—কোনও ভয় নাই, ভাই!—তোমাদের মত আমরাও যবনের বেশে—যবনের আচারে থাকিব। যবনের মত কথা কহিব। তাহাদের মত চলাফেরা করিব। কোনও গোলযোগের সৃষ্টি হইবে না। আমি প্রভুর সহিত অনেকবার প্রতীচ্যে যবন ও রেঞ্জ দেশে গিয়াছিলাম। সেই দূর দেশের অনেক ব্যাপারই দেখিয়া আসিয়াছি। গত বৎসর গন্ধারে গিয়াছিলাম—সেখানকার অবস্থার সহিত আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। সেখানকার অনেক যবন তাহাদের নিজের ভাষা ভাল জানে না, তাহাদের অনেকে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব। আমার এই বুড়া বয়সে আর কেন আমাকে কাঁদাইবে ভাই? আমার আর আছে কে বল ত? আর বাধা দিও না, ভাই! তীর্থক যাইতেছে; আমিও তোমার সঙ্গে যাইব—চল।

আমি ত বড় বিপদে পড়িলাম। আনন্দ যেরূপ আগ্রহ দেখিতেছি তাহাকে নিবারণ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। যেরূপ দেখিতেছি, সে কোনও বারণ শুনিবে না। তীর্থকও শুনিলাম, এইরূপ আগ্রহের সহিত প্রজ্ঞার অনুগামী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আমি আনন্দকে নিরস্ত করিবার অনেক বিফল চেষ্টা করিলাম। আমি আরও বলিলাম—"আনন্দ, তোমার এখন অনেক বয়স হইয়াছে—এখন বিশ্রামের আবশ্যক। পিতা তাহা বুঝেন—এবং সেইজন্য তিনি তোমাকে কোনও প্রয়াসসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাটীতে সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। পথে অনেক কষ্ট পাইবে। অনেক বিপদের সম্ভাবনা। হয়ত তোমাকে লইয়া গণ্ডগোলে পড়িব।"

—না দাদা, কোনও বিপদে পড়িতে হইবে না। এখনও আমি তত নির্জ্জীব ও বলহীন হই নাই। তোমার কোনও চিন্তা নাই, ভাই! এখনও আমার শরীরে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে।

আনন্দ শৈলবেদিকা হইতে উঠিল এবং উহার উপরের বৃহৎ শিলাপট্টখণ্ড ধীরে ধীরে উচ্চে উত্তোলন করিয়া কিছুক্ষণ পরে সন্তর্পণে উহা ধীরে ধীরে নামাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিল। আমি যে

জীবনের অপরাহ্নেও আনন্দের বাহুতে অমিতশক্তির শক্তি আছে। এতগুলি বছর হয় অনেক যৌবনতেজদৃপ্ত যুদ্ধব্যবসায়ী মনের বাহুতেও বিষম। তাহার এই বয়সে এইরূপ কথা দেখিয়া আমি বিস্মিত ও প্রীত হইলাম। আনন্দের লৌহ-কঠিন দেহ যে অপরিমিত শক্তিশালী তাহার পরিচয় ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার পাইয়াছিলাম। আর, আমার প্রতি স্নেহও ছিল তাহার অপরিসীম। তাহার সেই সমগ্রজীবনব্যাপী ভালবাসা ও প্রীতি সৌহার্দ্যের তার আশৈশব আমার জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

আবেগ-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আমার কম্পিত হস্ত আমি আনন্দের স্কন্ধে রাখিলাম; দেখিলাম, তাহার স্নেহোৎফুল্ল নয়ন প্রান্তে অশ্রু টলটল্ করিতেছে। লৌহদণ্ডোপম তাহার বজ্র বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া তাহার বিশাল বক্ষের উপর সে আমাকে টানিয়া লইল। শৈশবে ও বাল্যে যেমন তাহার বাহু বন্ধনের মধ্যে আমি আশ্রয় লইতাম, অদ্য যৌবনের পূর্ব্বাহ্নে ঠিক তেমনিভাবে তাহার বিপুল স্নেহবেষ্টনীর মধ্যে শিশুর মত আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে আমাকে মুক্ত করিয়া তাহার প্রসারিত দুই হাতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নয়ন প্রান্ত হইতে অশ্রুবিন্দু তাহার গণ্ডের ও কপোল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল।

সে বলিল, "আমাকে সঙ্গে লইতে চাও না কেন, দাদা? আনন্দ কাছে না থাকিলে আগে ও অস্থির হইতে ভাই! আনন্দ না খাওয়াইলে যে তোমার খাওয়া হইত না। এখন বড় হইয়াছ, আনন্দকে আর ভাল লাগে না! কিন্তু আনন্দ আর এখন কি লইয়া থাকিবে ভাই? বলত! তার আর এখন কি আছে, দাদা?"

আমি বলিলাম, "না আনন্দ, আর দুঃখ করিও না! চল! তুমিত আমার সঙ্গে যাইবে।"

আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। আমার বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ আর কোনও কথা উচ্চারণে অস্বীকৃত হইল।

আনন্দ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, বলিল, "তবে কে বলে, দাদা, তুমি আর তোমার আনন্দকে ভালবাস না? তোমার আপত্তির কি আর আমি অপেক্ষা রাখি ভাই? আমি ভাইবই ত—তুমি না লইয়া যাইতে চাহিলেও আমি যাইব। আমাকে বলিয়া রাখে কে? আজ তিন দিন ধরিয়া যে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণের পাদপীঠে আমি মাথা কুটিতেছি—তাহা কি কখনও বৃথা হয়? ভক্তবৎসল আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন—তাহাত জানিই।"

বৃদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবের নয়ন হইতে অশ্রু ঝরঝরিত ধারায় তাহার কপোল ও গণ্ড যেন প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল।

আমি আনন্দের প্রীতিপ্রফুল্ল ও স্নেহোদ্ভাসিত মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলাম—প্রৌঢ়ের মুখমণ্ডলে কি যেন একটা অজ্ঞাত অভূতপূর্ব্ব জ্যোতির বিচ্ছুরণে আমি একটু অভিভূত হইয়া পড়িলাম। হৃদয়ও আমার পূর্ণ হইয়া উঠিল—তখন আনন্দের স্নেহ ও প্রীতির প্লাবনে আমার প্রাণ কূলে কূলে পূর্ণ। অন্তরের মধ্যে তখন আমি জীবনের প্রেম-সাধুর্য্য উপভোগ করিলাম—নয়ন অশ্রুতে প্লাবিত হইল। মুখে কথা আ[illegible]

বৃদ্ধ বৈষ্ণব শিলাতলে বসিয়া ভক্তিতে বিভোর হইয়া গান ধরিল—

"দিনের আলো নিভে আসে,
পার কর আমারে!
আজি একা বসে আছি নদীর কিনারে
সঙ্গে এসেছিল যারা
সবে ফেলে গেল তারা
এখন তোমার নায়ে নিয়ে চল
আমায় এই দুপুর পারে!
আঁধার ওই আসছে নেমে
পায়ের বাতাস যাবে থেমে
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে
শাঁখের আঁধারে!"

সায়াহ্নে প্রথম বৃদ্ধপালিত বৈশাখী পূর্ণিমার আরম্ভিক মাঙ্গল্য বহন করিয়া পুনরায় আসিলেন। আমরা তাঁহার হস্ত হইতে মাঙ্গল্য গ্রহণ করিলাম। আর্য্য মহাবুধির তাঁহার সেই বিষণ্ণ শ্রবণ দ্বারা তাঁহার আশীর্ব্বাণী শ্রবণ করিয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যায় তিনি সংঘারাম পরিত্যাগ করিয়া আসিতে সমর্থ হইলেন না।

রাত্রের শুভ মুহূর্ত্ত আসিল। মাতাপিতা ও ভগ্নী চিত্রলেখার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। পিতামাতার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মঙ্গল কামনায় আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া লইলাম। আর্য্য পালকের গৃহে গমন করিলাম। তথায় বিদায় সম্ভাষণ শেষ করিয়া নাবারোহণোদ্দেশ্যে ঘটায় সজ্জিতা তরণীর সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলাম। আর্য্য পালকের গৃহ হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময় প্রজ্ঞা ভগ্নী আমার বাগ্‌দত্তা প্রেয়সী সুমনার সহিত একান্তে মিলনের সুযোগ দিল। সে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল—তাহার শুভ্র দুই বিন্দু অশ্রু আমার পায়ে পড়িল—অনুভব করিলাম। ঘটায় আসিয়া দেখিলাম যে তথায় আমাদিগের বাণিজ্য যাত্রা অবলোকন করিতে সকলেই সমবেত হইয়াছেন। সেখানে শেখর, সৌম্যির ভট্ট ও শেখরের পিতৃস্বসা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণের পূজারিণীও উপস্থিত আছেন দেখিলাম। পিসিমা জনতা হইতে অনতিদূরে বিমলে শিলাতলে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া তাঁহার আশীষ গ্রহণ করিলাম। তাঁহার পর সকলের সহিত সম্ভাষণ ও সংলাপ শেষ করিয়া নৌকায় উঠিলাম। নৌকার বন্ধন মুক্ত হইল। মাঝি ও দাঁড়ীরা সকলে স্বস্থানে অবস্থান করিয়া স্ব-স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। তরণীর পাল খুলিয়া উহা যাত্রাভিমুখে সংরক্ষিত হইল। যাত্রাভিমুখী বিস্তৃত পালে বায়ুভরে পূর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠিলে নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণোদ্দেশ্যে পালের রজ্জু যথাস্থানে সংযোজিত হইল। আমাদের তরীগুলি বিস্তৃত পক্ষ মরালের মত কপিবার জলোচ্ছ্বাসের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল।

ইতি মেঘদূতের আত্মচরিতে
বাণিজ্যাভিযান নামক
ঊনবিংশ বিবৃতি। (ক্রমশঃ)

নামকো বাস্তে

শ্রীকানাই বসু

স্বাগলে অনিলের জ্ঞান থাকে না। তারপর গাধা ইস্টুপিড্ ড্যাম্ ফুল্ শেষে কাঁহাকা পর্যন্ত বলে ফেলল। এক ঘর ছেলের সামনে এ-রকম অপমান করলে কার মনে না লাগে। অনিলেরও লাগল। কিন্তু কী করবে? বড় লোকের ছেলে অনিল, গায়েও জোর আছে, দলেও ভারি সে, আজ গালাগাল দিয়েছে, কাল চাটি মারবে, পরশু হয়তো তার জামাটাই ছিঁড়ে দেবে। বেচারা অনিল, দুর্বল দেহ, গরীব, নতুন ভর্তি হয়েছে, কে বা তাকে চেনে, কে-ই বা তার হয়ে একটা কথা বলবে। কী করবে সে, বলবেই বা কাকে। অসহায় অভিমানে অনিল কেঁদে ফেলল এবং এই চোখের জলের লজ্জা লুকোবার জন্যে অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে স্কুলের বাইরে চলে গেল।

এ-রকম যুদ্ধ অনিল প্রত্যাশা করে নি। সে জানে গাল দেবে, গাল খাবে। চড়টা চাপড়টা আদান প্রদান হবে। তারপর শত্রু পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলে তার পিছনে পিছনে হাত তালি দিয়ে সে সদলবলে জয়যাত্রা করবে। কিন্তু এমন করে যুদ্ধ ঘোষণা করবামাত্র যে শত্রু সমস্ত যুদ্ধায়োজন নিষ্ফল করে দিয়ে বিনাবাক্যে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে, পাল্টা আক্রমণের নাম গন্ধ না করে শুধু জলভরা চোখে আক্রমণকারীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে চলে যায়, সে-শত্রুকে নিয়ে অনিল কী করতে পারে? আর কাঁদবার যে কী ছিল তা তো অনিলের মাথায় এল না। সে বারবার কল্পনা করল, তাকে কেউ ড্যাম ফুল্ বলেছে কাঁহাকা গাধা এমন কি কচ্ছপ ব্যাং বা জিরাফ পর্যন্ত বলছে। কিন্তু তাতে চোখে তো কই জল আসে না। ভেবে যখন কিছু ঠিক করতে পারল না, তখন সে ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

কিন্তু মন থেকে ঝেড়ে ফেললেই ব্যাপার মেটে না। পার্টিশনের ওপারে স্কুলের লাইব্রেরী। তখন লাইব্রেরী বন্ধ থাকার কথা। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই যে হেডমাষ্টার মশায় কী পুরোনো বই খুঁজতে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে বসেছিলেন তা কে জানে। তিনি পুরোনো ডাকসাইটে ছেলে অনিলকে চেনেন, তার গলাও চেনেন। পরাজিত ক্রন্দনরত নতুন ছেলেটিকেও তিনি তক্তার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলেন। নতুন ছেলেদের নতুন নতুন কিছু দিন নাজেহাল করা কতকগুলো পুরোনো ছেলের যে অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে হয়ে পড়েছে তা-ও জানতে তাঁর বাকী নেই।

পরের দিন সকালে প্রথম ঘণ্টাতে হাজিরা ডেকে ক্লাস-টিচার অটলবাবু সবে বইখানি ধরেছেন, হেডমাষ্টারের বেয়ারা এসে একটা স্লিপ কাগজ দিল। অটলবাবু ছুটলেন হেডমাষ্টারের ঘরে। ফিরে এসে যখন বললেন তখন তাঁর কপালের নীচে ভাঁকড়া ভ্রু দুটো একত্রিত হয়ে গেছে, চোখের কোল থেকে গলা পর্যন্ত যে চাপদাড়ির জঙ্গল, তা নড়তে শুরু করেছে। এটা অতি কুলক্ষণ। অটলবাবু চর্বণ শুরু করেছেন। অতিশয় রাগ হলেই অটলবাবু চিবোতে থাকেন। কী চিবোন, তা কেউ ভেবে পায় না। কেউ বলে নিজের জিবটাই চিবোন। কিন্তু দেখা গেছে জিব সুস্থ থাকে। তাই অনেক দেখে দেখে সকলে সিদ্ধান্ত করেছে তিনি দাঁতই চিবোন। নীচের দাঁত দিয়ে উপরের দাঁতকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপরের দাঁত দিয়ে নীচের দাঁতকে।

চিবোতে চিবোতে অটলবাবু ক্লাসের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলেন। ছেলেদের বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করে উঠল। অটলবাবুর দাড়ি নড়ার ও ক্লাসের সর্বত্র চোখ বুলোনোর অর্থ অনিলের জানা নেই। ক্লাস খুব থমথমে ভাব দেখে সে বিস্মিত কৌতূহলে চেয়ে রইল। কিন্তু অনিলের তো তা জানতে বাকী নেই। সে অটলবাবুকে জানে, তাঁর দাড়িও জানে। বুঝলে এইবার একটা কাণ্ড ঘটবে। ঘটলও।

সাধু ভাষায় যে ঘরকে বলে জলধরস্থ, সেই ঘরে অটলবাবু ডাকলেন—অনিলচন্দ্র মুখার্জী।

ইয়েস্ সার।

হোয়ার?

'এই যে সার' বলে অনিল উঠে দাঁড়ালো।

আবার মেঘ ডাকলো—কাম্ হিয়ার। এদিকে এস।

ভূষ্টচিত্তে ও কম্পিত চরণে অনিল এসে অটলবাবুর টেবিলের অদূরে দাঁড়ালো। ক্লাস-শুদ্ধ ছেলে সভয় কৌতূহলে চেয়ে আছে, নতুন ছেলেটা মরে বুঝি আজ। অটলবাবুর কঠোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধীন কয়েকবার অনিলের কদমছাঁট চুল থেকে ঘোড়তোলা জুতো পর্য্যন্ত উঠানামা করলো। তারপর তিনি বললেন—ইউ আর অনিলচন্দ্র মুখার্জ্জী? হুম্। অনিলচন্দ্র মুখার্জ্জী তুমি?

অটলবাবুর বিশ্বাস এই উপায়ে তিনি ছেলেদের ইংরেজি জ্ঞানবুদ্ধির সহায়তা করেন। তিনি ইতিহাসের শিক্ষক, কিন্তু ইংরেজিতে ছেলেদের অজ্ঞতা দেখে কাতর হয়ে এই পন্থা ধরেছেন। ইংরেজি ভাষায় কথা কয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার তর্জ্জমা করে দেন বাংলা ভাষায়।

অটলবাবু আবার বললেন, সো ইউ আর অনিলচন্দ্র মুখার্জি। হুম্। হু ডু ইউ থিঙ্ক ইউ আর? তুমি কে মনে কর?

এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে অনিল?

অটলবাবু গর্জ্জন করে উঠলেন, আন্সার মি। উত্তর দাও। হু ডু ইউ থিঙ্ক্ ইউ আর?

ভয়ে ভয়ে অনিল বললে—আই য়্যাম্ অনিলচন্দ্র মুখার্জি সার।

মেঘ ডাকলো—সে আমি জানি। কিন্তু তুমি নিজেকে কে মনে কর? আর ইউ দি গভর্ণর অফ্ বেঙ্গল, কিম্বা এক্সেলেন্সি মিষ্টার সি রাজাগোপালাচারিয়ার? না, ভারতবর্ষের কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ্? য়্যাঁ?···আন্সার মি।

অনিল হতভম্ব নীরব রইল। আবার একবার তার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে অটলবাবু বললেন—আই ওয়ার্ণ্ ইউ মাই বয়। এ চলবে না, হ্যাঁ সিয়ার। ভবিষ্যতে যদি আর কোন দিন এ রকম শুনতে পাই, কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছ, অভদ্র অসভ্য আচরণ করেছ বা কাকেও অপমান করেছ বলে শুনি, সেই মুহূর্ত্তে এক্সপেল্ করে দেব। দূর করে দেব স্কুল থেকে। বুঝেছ? নট ইভন্ দি গভর্ণর উইল সেভ্ ইউ। মনে রেখো। আকাশের দেবতারাও তোমাকে তখন রক্ষা করতে পারবে না। এ অটলের কথা, টলে না। যাও, ক্লাসের প্রত্যেক ছেলের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাও। বল, ভাই আমি অন্যায় করেছি, আমি অপরাধী, তুমি আমাকে মাপ কর। সকলের কাছে গিয়ে বলতে হবে। কারণ তোমার অপরাধ আপাতঃ দৃষ্টিতে একজনের প্রতি হলেও, প্রকৃত পক্ষে তুমি অপমান করেছ ক্লাসের সকল ছাত্রকে, স্কুলের সমস্ত ছাত্রকে, সমগ্র ছাত্র সমাজকে, নিখিল মানব জাতিকে। গো, মাই বয়, গো এণ্ড আস্ক্ দেয়ার পার্ডন। যাও, ক্ষমা চাও। নচেৎ আমার ক্লাসে তোমার স্থান নেই। মনে রেখো মানুষকে গালি দেবার দিন চলে গেছে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার আর চলবে না।

ক্লাস স্তম্ভিত। অনিল আহত। কিন্তু অটলবাবু কঠিন বিচারক। তাঁর গম্‌গমে কণ্ঠস্বরে ঘর আবার ভয়ে উঠল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। হে মোর দুর্ভাগা বালক, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। কী? পারবে না ক্ষমা চাইতে? এক মিনিট সময় দেওয়া হল তোমাকে অনিল, তার মধ্যে যদি তোমার ক্ষমা ভিক্ষা না সুরু হয়, তাহলে —তাহলে ইউ উইল বি কেয়ার্ড্ মাই বয়, এণ্ড্ জিভ্ন্ আউট্ অফ্ দি ক্লাস। বেত খেয়ে তোমাকে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এক মিনিট সময়।

অটলবাবু তাঁর গলার কার টেনে বুক পকেট হ'তে বৃহৎ ঘড়িটি বার করে টেবিলের উপর রাখলেন এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘড়ির মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন—নাউ আই স্টার্ট কাউন্টিং দি সেকেণ্ড্স্। এবার সেকেণ্ড গুণ্‌তে আরম্ভ করছি আমি।

দাড়ির আবরণের ভিতর জোরে চর্বণ চলছে।

হতভম্ব অনিল সেই কম্পনশীল চাপ দাড়ির পানে চেয়ে কী বলতে চাইল—আমি—আমি—বেচারা আর বলতে পারল না। দাড়ির মধ্য থেকে কঠোর স্বর বেরোলো—নো আমি আমি। এ অটলের হুকুম। তেরো সেকেণ্ড, চৌদ্দ সেকেণ্ড, পনেরো—

হঠাৎ ঈষৎ চেঁচিয়ে ডাকলেন—হরিয়া, আমার বেতটা। তারপর আবার—আঠারো, উনিশ, কুড়ি—

অনিলের দুটি চোখ এই নির্মম অবিচার ও অকারণ শাস্তির আদেশ আর সহ্য করতে পারল না। জল ছাপিয়ে ঝরে ঝরে পড়ল। অনিলের সঙ্গে সারা ক্লাসও যন্ত্রাহত।

বাজ পড়েছে একজনের মাথায়, কিন্তু এত কাছে চোখের সামনে বাজ পড়লে মানুষ বিহ্বল না হয়ে পারে না।

অটলবাবুর গণনা চলছে—সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ, উনচল্লিশ, টোয়েন্টি সেকেণ্ড্স্ লেফ্ট্, নাইন্টিন এট্টিটিন—

বাঙলা হতে অটলবাবু অকস্মাৎ ইংরেজিতে চলে গেলেন। গণনা অগ্রসর না হয়ে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে চলল। এ রকম পরিবর্তন অটলবাবুর স্বভাব। কিন্তু শাস্তির আদেশ তাঁর পরিবর্তিত হয় না। বলেন—হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। অটলের বাক্য অটল।

ওনলি টুয়েল্‌ভ ইলেভেন—আর দশ সেকেণ্ড্, নয়··· ছয়িয়া-ন-···সাত ছয়···

হরিয়া বেত এনে রাখল। শুধু আনল না, কোঁচার কাপড়ে পালিশ করতে করতে বেত নিয়ে এল দুর্বৃত্ত হরিয়া। চকচকে লকলকে নধর বেত। দেখলে গা শিউরে ওঠে। খোকা ছেলেটা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত বেতের গায়ে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, গালের উপর ধারার দাগ শুকোয় নি।

কুটুস্ শব্দে ঘড়ির ডালাটি বন্ধ করে অটলবাবু ঘোষণা করলেন—টাইম ইজ আপ্। সময় হয়েছে। কাম হিয়ার। ঘড়ি পকেটে রেখে অটলবাবু তাঁর বোপের মতো দুই ভ্রূর আশ্রিত গভীর চোখের দৃষ্টি হতভাগ্য অনিলের মুখের উপর স্থাপন করে বললেন—অব্‌জিনেট এণ্ড্ আনকরডুনেট বয়, আই গ্র্যাম্ সরি ফর্ ইউ। একঙ্গুঁয়ে হতভাগ্য বালক, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে—

এইবার অটলবাবু উঠবেন। তারপর বাঘের থাবার মতো হাত দিয়ে দুর্বল অনিলের অসহায় ঘাড়টি ধরবেন, তারপর—উঃ, ভাবলে দেহ শিউরে ওঠে···অনিল আর থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—সার, আমি একটা কথা—

হোয়াট? হুঙ্কার দিয়ে অটলবাবু ফিরে অনিলের দিকে চাইলেন।

সার, ওর সম্বন্ধে—

ওর সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোনও কথা কইতে দেব না। টেক্ ইওর সিট্, আই টেল্ ইউ।

সার, আমি বলছি—

সিট্ ডাউন্।

সার, একটা কথা সার—

নো সার সার, নো একটা কথা। বসো—

অনিল বসে পড়ল।

অটলবাবু তখন ওদিকে ফিরে অনিলকে বললেন—আই পিটি ইউ, মাই বয়, তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অন্যায় করে দোষ স্বীকার করতে যে পরাঙ্মুখ হয়, তাকে আমি মানুষ বলি না। আই ডোণ্ট্ কল হিম এ ম্যান। কাম হিয়ার। এগিয়ে এস, আই টেল ইউ।

বেচারা অনিল বড়ো বড়ো চোখে কেবল চেয়ে রইল সেই গভীর গোঁফ, চাপ চাপ চাপদাড়ী ও ভীষণ ভ্রূ-সমাকীর্ণ মুখখানার পানে। না পারল এগিয়ে আসতে, না পারল কথা কইতে।

তার সেই নির্বোধ চোখের চাউনি দেখে অনিল আবার উঠে দাঁড়ালো এবং ঘরিয়ার মতো চেঁচিয়ে বললে—না সার, এ হতে পারে না, কখ্খনো হতে—

বোমার মতো ফেটে গেলো অটলবাবু—গেট আউট, গেট আউট, বেরিয়ে যাও আমার ক্লাস থেকে তুমি, ইম্‌পার্টিনেণ্ট চ্যাপ, দুর্বিনীত বালক, বেরিয়ে যাও বলছি;

অনিল বেরিয়ে গেল।

ঘন ঘন চর্বণ চলছে। অটলবাবু বেত হাতে উঠে দাঁড়ালেন। বার কয়েক হাওয়ার মধ্যে সিকৃসিকে বেত গাছটা আস্ফালন করে শন্ শন্ শব্দের ঢেউ তুলে এগিয়ে গেলেন অনিলের দিকে। হাত দুটো পিছনে রেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে অটলবাবু বললেন—

আই পিটি ইউ, মাই ডিয়ার বয়, বিলিভ মি, আই পিটি ইউ। তোমার দেহকে যন্ত্রণা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কী করব, আই হ্যাভ নো অলটারনেটিভ। আর দোসরা পথ কিছু নেই। কারণ তোমার অব্‌স্টিনেসিকে ভাঙতে হবে আমার, তোমার দুর্মতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে।

অতি উত্তেজনায় অটলবাবুর ভাষা সাধু সংস্কৃত ঘেঁষা হয়ে ওঠে। তিনি বললেন—চিকিৎসক যেমন তিক্ত ঔষধ দিয়ে রোগীর জিহ্বাকে দুঃখ দেন, কিন্তু তার আত্যন্তরীণ ব্যাধিকে দূর করেন, তেমনি আজকের এই বেত্রাঘাত তোমার শরীরকে আহত করলেও তোমার চিত্তকে নির্মল নিরাময়

করবে। প্রার্থনা করি এই যেন তোমার জীবনে শেষ বেত্রাঘাত হয়।

বলির পশুর সামনে মন্ত্রোচ্চারণ করার মতো অটলবাবু তাঁর বক্তৃতা দিতে লাগলেন বেচারা অনিলকে লক্ষ্য করে। বক্তৃতা শেষ করে তিনি ক্লাসের ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন—মাই ডিয়ার বয়েজ, এ আনুষ্ঠানিক চিকিৎসা, তোমরা দেখো না, খবর্দার। তোমরা চোখ বুঁজে থাকো। অপরের যন্ত্রণা দেখবার আনন্দকে আমি বলি পৈশাচিক আনন্দ। আই কান্ট স্ট্যাণ্ড্ ইট্। এ আমি সইতে পারি না।

এই বলে অটলবাবু স্বীয় চক্ষু মুদ্রিত করে হাত ওঠালেন।

কিন্তু হাত নামাতে পারলেন না অটলবাবু। কিসে আটকালো দেখবার জন্য বিরক্ত অটলবাবু চোখ খুলে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে একব্যক্তি তাঁর বেত চেপে ধরেছেন। সেই ব্যক্তি হেড মাস্টার মহাশয়। হেড মাস্টারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, যাকে তিনি এইমাত্র ক্লাস থেকে বার করে দিয়েছেন।

হেড মাস্টার বেতটি ছেড়ে দিয়ে শুধু বললেন—অটলবাবু, আমি বলেছিলুম অনিলকুমার মুখার্জির কথা। আর এই ছেলেটির একটা কথা দয়া করে শুনবেন—বলেই তিনি চলে গেলেন।

হতবুদ্ধি অটলবাবু কিছু বলবার আগেই অনিল বললে—স্যার, আমি প্রথমটা বুঝতে পারি নি। আমার নাম অনিলকুমার মুখার্জি।

অটলবাবু বার দুই বললেন—অনিলকুমার মুখার্জি। অনিলচন্দ্র মুখার্জি। অনিলকুমার, অনিলচন্দ্র।

আপনার বিচার আমি মেনে নিচ্ছি স্যার। তুমি আমায় মাপ কর ভাই, তোমার কাছে আমি মাপ চাইছি। বলে অনিল এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই বেচারা হাবাগোবা অনিলের চোখ আবার জলে ভরে এল। অনিল বললে, এবার আমি ক্লাসের সকলের কাছে—

এমন সময় অটলবাবু এক কাণ্ড করে বসলেন! বেতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতদুটো জোড় করে অতি কাতর কণ্ঠে বললেন—আই আস্ক্ ইওর পার্ডন অনিলচন্দ্র, আমার হঠকারিতা, আমার ভুল অমার্জনীয়, তবু তুই আমায় মাপ কর বাবা। বল্ বাবা মাপ করলি?

মুখচোরা অনিল তবুও কথা কইতে পারলো না। কিন্তু তার ভরা চোখের জল আর চোখে ধরল না, ঝরে পড়ল গাল বেয়ে। অটলবাবু নিজের কোঁচার খুঁটে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন—কাঁদিসনে বাবা অনিলচন্দর কাঁদিসনে। এবং অপর হাত অনিলের মাথার ওপর দিয়ে বললেন—এণ্ড্ ইউ মাই ডিয়ার সন অনিলকুমার, তোকে কী বলে আশীর্বাদ করব জানিনে, তুই আমাকে মহাপাতক থেকে রক্ষা করেছিস। ইউ আর নট্ ওনলি গুড্ বাট ইউ আর গ্রেট। ভাল ছেলের চেয়ে ভাল তুই, মহৎ ছেলে। তোর ভাল হবে, আমি বলছি তোর ভাল হবে। তুইও আমাকে মাপ কর।

মুখফোঁড় অনিলেরও সেই একই দশা, কোনও কথা বলতে পারলে না। অতঃপর অটলবাবু ছেলেদের উদ্দেশ করে বললেন—আমি ক্লাসের সকল ছাত্রের কাছে ক্ষমা চাইছি। সমস্ত ছাত্রসমাজের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, নিখিল মানবজাতির কাছে আমি অপরাধী, তাঁরা আমায় ক্ষমা করুন। আর ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন নামের দর্প যেন না করি কখনও। বলতে বলতে দুই অনিলকে তিনি বুকের কাছে দুই পাশে জড়িয়ে ধরলেন।

স্তম্ভিত ছেলের দল দেখলে ব্যাঘ্রসদৃশ করাল-রসন অটলবাবুর ঘন কর্কশ চাপদাড়ির কম্পন থেমে গেছে আর সেই স্থির দাড়ির উপর দু ফোঁটা জল চিকচিক করছে।

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

জনম-মরণ কালের
কুসুম দুটি

আমি মাঝে গাঁথা জীবনের
ফুল বাটি।

তুমি ও আমি

কথা ও সুর :—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বরলিপি :—শ্রীশচীন দাশগুপ্ত

তাল—দাদরা

আধো আলো আধো ছায়া—
তোমার আমার মিলনের মাঝে—
রচিল কী নব মায়া।

তারায় তারায় করে কানাকানি,
আকাশে বাতাসে তারি জানাজানি ;—
স্বপন আবেশে তাই বুঝি মোর
সঙ্গীত গেল থামা।

তুমি হও বাঁশী, আমি তা'র সুর
তুমি হাসি আমি গান—
তুমি যে নয়ন, আমি তা'র মণি
ভালবাসা অভিমান !
আমি ফুলহার, তুমি যে সুরভি,
প্রেমের তুলিতে আমি আঁকা ছবি ;
তুমি মোর কবি, আমি যে তোমারি
কল্পনা কবি-মায়া।

স্থায়ী II { সা গা মা | পা র্সা র্সা | র্সানি ধপা ক্ষধা | পা -া -া | ক্ষ পা পা |
আ ধো আ লো আ ধো ছা - - - - - য়া - - তো না য়

পা রেক্ষ পাধা | পা পা পা | মা মা রে | রে পা পা | মা রে সানি |
আ মা - - য় মি ল নে র মা ঝে র চি ল কী ন ব -

রে রে রে | সা -া -া | } II
মা - য়া - - - }

অন্তরা II গা পা পা | পা নিধা র্সা | র্সা -া -া | র্সানি ধানি র্সার্রে | র্সা -া -া |
তা রা য় তা রা - য় ক রে কা না - - - কা - নি - -

-া -া -া | মা গা রের্মা | র্গা রের্সানি | রে র্সা র্সা | ধা ণ ধা |
- - - আ কা শে - বা তা সে - তা রি জা না - জা

পা -া -া | -া -া -া | II রে সা সা | ধাণ ধা পা | ক্ষ পা পা |
নি - - - - - - স্ব প ন আ - বে শে তা ই -

ক্ষ পা ধা | পা মা -া | -া -া -া | পা পা মা | মা রে সা |
বু - ঝি মো - - - ম স ং গী ত গে ল

মা মা গা | পা -া -া | গা মা পা | ধা নি র্সা | র্সানি ধাপা ক্ষধা |
থা - - মা - - আ ধো আ লো আ ধো ছা - - - - -

পা -া -া |
ঝা - -

সকারী II সা সা রে | রে গামা রেগা | পা -া -া | মা গা রেসা | সা সা রে |
তু মি হ ও ধা - - - শী - - - - - - - তু মি হ

রে গামা রেগা | পা -া -া | ক্ষপা ধানি র্সা — সা সা ধা | ণ ধা পা |
ও ধা - - - শী - - - - - - - আ মি তা হ তু হ

রেঁ র্সা র্সা | ধাণ ধা পা | ক্ষ পা ধা | মা -া -া | পা মা মা |
তু মি হা সি - আ মি গা - - - ন তু মি যে

রে সা সা | সা র্সা র্সা | মা মা -া | ধা ধা রে | রে সা সা |
ন হ ন আ মি তা হ হ মি তা লো বা সা অ ভি

মা মা গা | পা -া -া II
মা - - ন - -

গা পা পা | পা নিধা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সানি ধানি র্সারেঁ | র্সা -া -া |
আ মি তু ল হা - হ তু মি যে হু - - - র - ভি - -

-া -া -া | পাক্ষ গাক্ষ পাধা | পা -া -া | সানি্ ধ্‌নি্ সারে | সা -া -া |
- - তু - - - মি - যে - হু - - - র - ভি - -

গা পা পা | পা নিধা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সানি ধানি র্সারেঁ | র্সা -া -া |
আ মি তু ল হা - হ তু মি যে হু - - - র - ভি - -

-া -া -া | র্সা র্গারেঁ র্মা | র্গা রেঁ র্সা | রেঁ র্সা র্সা | ধা ণ ধা |
- - - প্রে যে - হ তু লি তে আ মি মা ধা - ছ

পা -া -া | -া -া -া | রেঁ র্সা র্সা | ধাণি ধা পা | ক্ষ পা পা |
মি - - - - - - তু মি লো - হ ক মি আ মি যে

ক্ষ পা ধা | পা মা মা | -া -া -া | প পা রে | রে সা সা |
ভো - মা মি - - - - - - ক ল্ প না ক মি

ক্ষপা ধানি র্সার্সা | র্সা মা -া | II
আ - - - - ঝা -

একখানি কাঁথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

রাত চারিটায় কলিকাতাগামী ট্রেণখানি ঘস্ ঘস্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। শীতের রাত, দারুণ শীত। ঘন কুয়াশায় সমস্ত চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, গাছ লতা-পাতার উপর যেন এক পরদা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—এমনি শিশির পড়িয়াছে। শীতার্ত্ত কুকুরের চীৎকার মাঝে মাঝে উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। চারিধার নিস্তব্ধ নিঝুম। পৌষ মাসের দুরন্ত শীতে মনে হইতেছে, সমস্ত পৃথিবী বুঝি জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে। গ্রামের শেষ প্রান্তে বাউরী পাড়ার ছোট-ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি ঘন কুয়াশার মাঝে যেন হারাইয়া গিয়াছে। তাহাদের কুঁড়েগুলি বাঁশের কঞ্চির বেড়া দেরা কাহারও বা মাটীর দেওয়াল। ঘরের মাথা তালপাতায় ছাওয়া, শীত ও ঠাণ্ডা কোনটাই আটকায় না।

অভিলাষের ছোট্ট কুঁড়ে-ঘর—চারিধারে কঞ্চির বেড়া। হু-হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া কাঁপাইতেছে। ঐ একই ঘরে যারা রয়, তাহারা ঘুমায় ও একটী কুকুর এবং দুটী শূয়োর উহাদের সহিত রাত্রি যাপন করে। মানুষ ও অন্য শীতের রাত্রে জড়াজড়ি করিয়া ঠাণ্ডার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় খোঁজে।

বিন্দীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার সমস্ত শরীর যেন বরফ হইয়া গিয়াছে। উনুনের পাশে কুকুরটি শুইয়া কাঁপিতেছে, বোধ হয় উনুনে আর আগুন নাই। বিন্দী ঠেলা দিয়া অভিলাষকে জাগাইল। অভিলাষ বলিল, কি হ'ল? উঃ গেলাম রে—

বিন্দী বলিল, শীতে জমে গেলাম গো। তোমার হ'ল কি?

—আমি—ওরে পা-টা বড্ড টাটাচ্ছে—অনেকটা কেটেছে। আর গরগরানি—বোধ হয় পাকবে। কিন্তু শীতে তো আর পারি নে। ছেঁড়া চটের থলের ভিতর, দুইজনে ঠিক ধান চালের মতই কুণ্ডলী হইয়া ঘুমাইতেছিল।

বিন্দী বলিল, রাত চারটের গাড়ী গেল। এখনও পুর্বি উঠতে অনেক দেরী। পুর্বি উঠলে হয়—সারা শরীর যেন বরফপানা হয়েছে। ইস্ মা কালিরে—হাতের ভেতরটা পর্য্যন্ত কন্ কন্ করছে। ওগো একটু উঠে আগুন করনা গো। তামুক খেলে জাড় অনেকটা কমবে। বাকী রাতটা আগুন পুইয়ে কাটিয়ে দেব—

অভিলাষ বলিল, কথাটা মন্দ নয়। 'উহুঃ' পা-খানায় সব যেন পাকা ফোঁড়ার মতন বেদনা। অভিলাষ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। উনুনে ফুঁ পাড়িয়া পাড়িয়া দেখিল আগুন নাই। নূতন করিয়া আগুন করিয়া কতকগুলো শুকনো তাল পাতা দিয়া দিল। আগুন গন্ গন্ করিয়া জলিয়া উঠিতেই বিন্দী আসিয়া উনুনের ধারে বসিল। ঘর আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। গরম পাইয়া কুকুরটি আরামে কেঁউ করিয়া ডাকিল। শূয়োর দুটি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া ডাকিয়া আবার পাশ ফিরিল। অভিলাষ ও বিন্দী দুইজনে উনুনের পাশে পা ও হাত সেঁকিতে লাগিল।

বিন্দী বলিল, বাঁচলুম বাপু এতক্ষণে। একটুখানি তামুক ধরাও গো। শরীরটা বড্ড বেজুত। এই ঢেঁকীপড়া রাতে উঠলে, আবার ভোরে কাঠ নিয়ে বাজারে যেতে পারব? বুঝলে, আজ বাবুদের বাড়ী গেছনু, দেখি নোতুন নোতুন নেপ তোষক সব কলকাতা হ'তে এনিয়েছে। ওদের কি—কেমন নেপ তোষক, বিন্দী আরামে ঘুম—

অভিলাষ কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বলিল, বড়লোক যে সে। টাকাতেই সব হয়। ওই মোনা দিন দু-টাকা করে কামাচ্ছে। শরীর তাল থাকতে পারে। কুড়ি গণ্ডা গাছ মেয়েছে, রোজ শুড় নামাচ্ছে সাত আট সের। হিসেব কষ দেখি—রোজ নিচ্চয় দু-তিন টাকা করে জমাচ্ছে। তখন বললুম্ আমিও গাছ মারি—তা দুই মারণ করলি—

বিন্দী বলিল, তুমি পারতে গো? এই ভোরবেলা গাছ থেকে রস নামিয়ে, সেই রস জাল দিয়ে গুড় করে বাজারে নিয়ে যেতে পারতে? ও শরীরে আর হয় না। এই বলে

মুনিষ খেটে এসেই রাতে তোমার গা গতর টন্ টন্ করে—আর ঐ কাজ তুমি পারতে? বিন্দী চুপ করিল। অভিলাষ এক মনে তামাক খাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর বিন্দী বলিল, আচ্ছা, হাঁগা একখানা বড়-সড় কাঁথা হ'লে খুব ভাল হয় না? বেশ মোটা মোটা কাঁথা—

—কাঁথা? সে কে দেবে?

বিন্দী বলিল, কে আর দেবে? আমি তো সিখেছিনু। বাবুদিদির কাছ থেকে খেজুর ছড়ি কাঁথা বুনতে সিখেছিনু। কাপড় পেলে করি। চার পাঁচখানা ছেঁড়া কাপড় চাই—বেশ চওড়া পাড় থাকে, তার চারধার দিবে, বেশ করে মুড়িয়ে সুতুন দিয়ে খেজুর ছড়ি এঁকে সেলাই করি।

অভিলাষ হাসিয়া বলিল, কাপড় চাই যে পাগলী। মাত্র তোর ঐ একখান আর আমার এই আধখানা। এ দিয়ে কাঁথাতে দিই, তবে পরব কি?

বিন্দী মুখ ম্লান করিয়া বলিল, না তাই বলছি। আচ্ছা হাঁগা, আজ না হয় পুরোণো দুখানা বস্তা বাবুদের কাছ থেকে চেয়ে আন না। নইলে রাতে মরে যাব যে—

অভিলাষ হুঁকোটি বিন্দীর হাতে দিয়া বলিল—এই দুখানা দিয়েছে বাবুরা। আর কি কখনও দেয়। বিন্দী কিছুক্ষণ এক মনে তামাক টানিয়া বলিল, লোকে বলছিল, সরকারী থেকে গরীব লোকেদের কাপড় দেবে কখন দেবে। তার কি হ'ল? কেষ্টমামু তো চৌকীদার সরকারী লোক—ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ না। যদি একখানা কম্বল আর একখানা কাপড় পাওয়া যায়—

অভিলাষ বলিল, পাগল—সে কি আমাদের দেবে? সে সব পায় বাবুদের চেনা হাত-ধরা লোকেরা। গরীবরা কি কোন কালে কোন কিছু পায় রে—

বিন্দী বলিল, ভগবান দিলেই পাব। নইলে, মানুষে কি আর দিতে পারে? ভগবান দয়া করলে পাব। অভিলাষ বলিল, ভগবানও বড় লোকদের হাতধরা রে। বড় লোকেরাই ভাল জিনিষ পায়—ভগবান কটা গরীব-দুঃখীকে দিয়েছেন।

বিন্দী তামাক খাওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, ও কথা বলতে নেই গো। ভগবানের নাম নিয়ে—তোমার মতিগতি ভাল নয় তো—

রাত ভোর হইয়া আসিতেছে। বেড়ার ফাঁক দিয়া হু-হু করিয়া ঝন্‌কে ঝন্‌কে ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস আসিয়া কাঁপাইতেছে। উনুনের আগুনও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কুকুর ও শূয়োর দুটি আবার ডাকিয়া উঠিল। টপ্ টপ্ করিয়া গাছের পাতা হইতে ঠিক বৃষ্টির মতই শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে। অভিলাষ বলিল, না—আর একটু গা গড়িয়ে নিই। সেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হ'বে তো—

বেলা দশটার সময়, বিন্দী বাবুদের বাড়ির বাসন মাজিয়া ও কাজ শেষ করিয়া আসিয়া দেখিল, অভিলাষ তখনও শুইয়া—সে ভয় পাইয়া বলিল, তবে কাজে যাওনি—কি হয়েছে?

অভিলাষ বলিল, জ্বর হয়েছে রে। আজকের রোজটাই মিছে মিছে কামাই গেল। তুই যে আজ সকাল সকাল এলি—ওদব কি রে—

বিন্দী বলিল, বাবুরা দিয়েছে। পিঠে, পুলি, সক্কচুকলি অনেক কিছু। এ বেলা আর হাঁড়ির না। এই খেয়ে থাকবো। তুমিও দুখানা খেয়ো—আমি আবার একবার সহরের বাজারে যাব—

অভিলাষ বলিল, সহরের বাজারে? কেন রে—

বিন্দী বলিল—কাঠ নিয়ে যাব।

—তা আজ নাই গেলি। বিন্দীর মনে তখন কাঁথার কথাই ঘুরিতেছে, সে একমনে কাঠের বোঝা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, না—যাই বিক্রী করে আসি। কয়দিন বন হইতে শুকনো কাঠ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া জড় করিয়াছিল। আজ তাহাই বেশ করিয়া সাজাইয়া মস্ত এক বোঝা করিয়া বিন্দী সহরের বাজারে চলিল।

অভিলাষ বলিল, একটু তামুক আর কড়া বিড়ি এক-তাড়া নিয়ে আসিস। এখানকার বিড়ি তারী পানসে—বিস্রী। বিন্দী হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল, আচ্ছা আনব—

শীতের দিন—দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। বিন্দী ফিরিল সেই সন্ধ্যায়। অভিলাষের জন্য বিড়ি ও তামাক আনিয়াছে। আর আনিয়াছে দুপয়সার ফুলুরী দুই পয়সার একখানি আলুর চপ। অভিলাষ বলিল—ফুলুরী আর একটা চপ্—ওরে বাবা এ যে—তা তুই খেয়েছিস্। বিন্দী বলিল, যাঃ, সারাদিন কি উপোস করে আছি। মুড়ি খেয়েছি ফুলুরি দিয়ে—আর এই দেখ। বিন্দী তাহার

কাপড়ের তলা হইতে একখানি ফরসা পাড়ওয়ালা ছেঁড়া শাড়ী বাহির করিল। অভিলাষ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কাপড়—তা পেলি কোথায় রে—

বিন্দী বলিল—না গো না—চুরি করিনি। ভগবান যেন কখনও সে মতি না দেন। বাজারে এক দিনদে এই সব ছেঁড়া কাপড় জামা বিক্রী করে। আমাদের মত গরীব দুঃখী কিনছে—এটা আনলাম বার গণ্ডা পয়সা দিয়ে। কি করব জান? কাঁথা—আরও চার পাঁচখানা হ'লে তবে হ'বে। পাড়টা বেশ খাসা নয়?

অভিলাষের এতক্ষণে সব পরিষ্কার হইয়া গেল। কাঁথার স্বপ্ন বিন্দী তোলে নাই—সত্যই সে একখানা খেজুর ছড়ি কাঁথা করিবে তাহ'লে।

—বুঝলে, বার গণ্ডা পয়সা বেঁচেছে। বিন্দী আপন-মনে তাহার কাঁথার কথাই বলিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেছে। কালো কালির মত অন্ধকার চারধারে যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে। অদূরে পচুই মদের দোকানে মাতালেরা মদ খাইয়া গান ধরিয়াছে। তাহাদের ভক্তিরস উথলিয়া উঠিয়াছে। দম্ দম্ করিয়া বেতালা বাজনার সহিত তাহাদের সমবেত কণ্ঠের রামপ্রসাদী গান দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অভিলাষ ও বিন্দী এক পা এক পা করিয়া মদের দোকানের উদ্দেশে চলিল।

দুজনে যখন ফিরিল—রাত তখন নটা। বাউড়ীপাড়া ইহার মধ্যেই নিঝুম হইয়া গিয়াছে। কোথাও একটুও সাড়াশব্দ নাই বা আলোর রেখা নাই। অন্ধকার কন্‌কনে শীতের রাতে গাছের পাতা ঝরিয়া টুপটাপ করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে—

অভিলাষ ও বিন্দী ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, কুকুরটী উনুনের ধারে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া রহিয়াছে। শূয়োর দুটী জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। উহাদের সাড়া পাইতেই ঘোৎ ঘোৎ করিয়া উঠিল। অভিলাষ ও বিন্দী পেট ভরিয়া পচুই মদ খাইয়া আসিয়াছে। রাত্রের খাওয়ার দায় হইতে নিশ্চিন্ত। দুইজনে শুকনো খড়ের উপর চটের থলে গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িল।

বিন্দী বলিল, আর চারখানা কাপড়, তার মানে তিনটে টাকা। আর চারদিন বাজারে গেলেই কাঁথার কাপড় হয়ে যাবে। বড় দেখে সুঁচ আনব। তখন দেখবে কেমন কাঁথা করি—মস্ত বড়—ফরসা—কেমন খেজুর-ছড়ি কাঁথা হ'বে।

অভিলাষ গম্ভীর হইয়া বলিল, আরও তো চাই।

বিন্দী বলিল, আর কি হ'বে? বলে একখানা করতেই প্রাণ যাচ্ছে।

অভিলাষ হাসিয়া বলিল, কেন তোর ছেলের জন্যে—

বিন্দী ছেলেমানুষের মত হাসিয়া উঠিল—যাও গো। তা ছেলে যখন ভগবান দেবেন—তখন তার কাঁথার ব্যবস্থাও তিনি করবেন। বিন্দী শুইয়া শুইয়া তাহার কাঁথার স্বপ্ন দেখিতে থাকে। হঠাৎ দূরে বাঘ ডাকিয়া উঠিল। বিন্দী অভিলাষের অতি কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, বাঘ ডাকছে গো—হেই মা কি হ'বে।

—হ'বে আর কি? কিন্তু খুব কাছেই মনে হচ্ছে। অভিলাষ উঠিয়া হৈ হৈ করিতে লাগিল। কুকুর ও শূয়োর দুটী ডাকিয়া উঠিল। দূরে চাষীদের ক্ষেতে চং চং করিয়া টিন বাজিতে লাগিল। বাউড়ী পাড়ার ভিতর হইতে সমস্বরে চীৎকার হইতেই বাঘ ডাকিতে ডাকিতে দূরে চলিয়া গেল। আবার নিস্তব্ধ—কন্ কন্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেছে। শীতের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অভিলাষ ও বিন্দী দুইজনে শীতে ঠিক কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া শূয়োরগুলির গায়ের গরমে নিজেদের শরীর গরম করিতে লাগিল। শীতে বাঘে ও গরু এক হইয়া গিয়াছে। কয়দিন পরিশ্রম করিয়া বিন্দী তাহার কাঁথা প্রায় শেষ করিয়া আনিল। কাজের অবসরের মাঝে যখনই সময় পায়, তখনই সে সেলাই করে। তা ছাড়াই বিন্দী কাঁথা করিতে জানে। যেন মোটা মোটা—চাষি-ধারে লাল কাল চওড়া পাড় দিয়া ধারগুলি সেলাই করিয়াছে। রদ্দি দেওয়া খেজুর পাতা কাঁথার গায়ে আঁকিয়া, তাহাই নানান্ রঙের সুতার সাহায্যে সেলাই করিয়াছে। কাঁথাখানি যেন বিন্দীর এক মহামূল্য সম্পদ। আরও কয়দিন পর একদিন দুপুর বেলায় বিন্দী কাঁথা সমাধা করিল। বিন্দীর আনন্দ দেখে কে? কতবার কতভাবে কাঁথাখানি মেলিয়া অভিলাষকে বারবার দেখাইল। বাউড়ী পাড়ার সকলকে কাঁথা দেখাইয়া বিস্মিত করিল। সকলেই কাঁথা দেখিয়া প্রশংসা করিল। কাহারও কাহারও

হিংসাও হইল। অমন সুন্দর কাঁথা বিন্দী করিয়াছে। শীতের রাতে উহারা মহা-সুখে ঘুমাইবে। হিংসা ও লোভের চিহ্ন বিন্দী লক্ষ্য করিল না। তখন সে অসীম আনন্দে ভরপুর।

বিন্দী আর এক কাজ করিল। তাহার কেষ্ট-মানুকে দিয়া সদর হইতে একটী কপি ও কিছু আলু আনাইল। আজ রাতে সে রান্না করিবে। গরম গরম ভাত আর কপির তরকারী। আজ রাতটা যে তাহার উৎসব রাত্রি। বিন্দী সন্ধ্যার পরই রান্না চাপাইয়াছে। অভিলাষ গিয়াছে পচুই মদের দোকানে।

বিন্দী বলিল, সকাল সকাল ফিরো কিন্তুক। বেশী মদ খেওনা—ভাত রাঁধছি। আলু কপির তরকারী—

অভিলাষ বলিল—অ্যাঁ:—আলু কপির তরকারী—এ যে বড়লোকী তরকারী—

ভাত হইয়া গিয়াছে—তরকারী চড়াইয়া বিন্দী দেখিল, একটুও নুন নাই। কী সর্ব্বনাশ নূতন আলু কপির তরকারী এই প্রথম আজ তাহারা খাইবে, আর এই দিনই নুন ফুরাইয়াছে? একটুখানি ভাবিয়া, বিন্দী তাহার ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, এক দৌড়ে পাড়ার ভিতর ছুটিল।

বেশীক্ষণ সময় যায় নাই। হয়তো পাঁচমিনিট মাত্র লাগিয়াছে। বিন্দী নুন লইয়া আসিয়া দেখিল, তরকারী টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে। আন্দাজ মত নুন দিয়া, বাকী ফুলিয়া হাঁড়িতেই তাহার নজরে পড়িল—কাঁথা নাই। একি! তাহার নূতন কাঁথা কোথায় গেল? বিন্দী লাফাইয়া উঠিল।

না—কোথাও নাই। এইটুকু একহাত ঘর—থাকিবে কোথায়? এই তো খড়ের বিছানার উপর তাহার নূতন কাঁথা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল—কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় গেল। সেই গয়নার দোকানে আঁকা ছবির ময়ূরের সোনার হার সিলিবার মত হইল যে? বিন্দী হাত পা ছড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া ভুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সমস্ত অন্ধকারকে—শীতের রাত্রিকে—ঘন কুয়াশাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া—খান্ খান্ করিয়া তাহার মর্ম্মভেদী কান্না রাত্রির বুকে বাজিয়া উঠিল। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল। অভিলাষ হন্তদন্ত হইয়া দৌড়াইয়া আসিল—তাবিল বাঘ পড়িল নাকি?

বুক চাপড়াইয়া বিন্দী বলিল—সর্ব্বনাশ হয়েছে গো—কাঁথা—আমার নূতন কাঁথা চুরী হয়েছে—উঃ, আমার কাঁথা। বিন্দী চুল ছিঁড়িতে থাকে।

অভিলাষ বলিল—বলিস কি? চুরী হয়ে গেছে—অমন কাঁথা—অ্যাঁ! কি করে হ'ল? বিন্দী তখন মাটিতে লুটাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। রাত্রির বুকে শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে টপ্ টপ্ করিয়া—আর অভিলাষের হাতের মধ্যে বিন্দীর লবণাক্ত তপ্ত অশ্রু-জল ঝরিয়া পড়িতেছে টপ্ টপ্ করিয়া। তাহার দিনরাতের স্বপ্ন—তাহার বহু আশা বহু পরিশ্রমের জিনিষ—নাই। সে যে বহু পরিশ্রমে—বহু কষ্ট করিয়া দিনরাত খাটিয়া উহা তৈয়ারী করিয়াছিল। শীতের রাতে তাহারা দুইজনে যে গায়ে দিবে—হায় সব আশা নিঃশেষ হইল।

অভিলাষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, কাঁদিসনে বিন্দী, কাঁদিসনে। বুধনাথ আমাদের চেয়েও দুঃখী লোক, অভাবী লোক সংসারে আছে। নিক্—সেই নিয়ে গায়ে দিক্। তুই কাঁদিসনে। কিন্তু বিন্দীর কান্না বন্ধ হইল না, সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হিংসা কিংবা প্রতিহিংসা

শ্রীবিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

হিংসা কিংবা প্রতিহিংসা একবার অন্তরে হলে উত্তেজিত
সুকৌশলী হিতবাক্যে প্রাণহীন, হয় নাক একেবারে প্রশমিত।
ক্রোধের আগুন যেন অন্তরে অন্তরে জ্বলে, বাতাসে প্রকাশ পায়,
নিজে পুড়ে প্রতিক্ষণ, অন্যেরে প্রাণান্তক আঁচ লাগে অল্প গায়।
শাস্তির আগারে হয়ে অশান্তির অকরুণ অন্ধকার কারাগার;
আপদ্বিত প্রতিপক্ষে লক্ষ্যের বেড়াজাল,—অন্তরের এ সংসার।
আঘাত ও প্রত্যাঘাত প্রশান্তির যে ব্যাঘাত ঘটায় প্রতিক্ষণে
শান্তি ও শৃঙ্খলা নাশে, এনে দেয় মানব জীবনে শান্তিহীনতার দুঃখ মনে।
সভ্যতার পথে গড়া পরাধীন বন্দিদের বিক্ষুব্ধ আঘাত হানে;
দানবীয় উন্মাদেতে অপকর্ম্মে সৌন্দর্য্যের বীর ধর্ম্ম বলি' মানে।
রোষের কিংবা ক্রোধে অন্যায় নিরীহের কেড়ে যায় কত প্রাণ।
বাঁচিতে, বাঁচাতে প্রাণ প্রাণপণে, তরুণের তরুহীন প্রাণ যায়।
সভ্যতার ইতিহাসে দুর্ব্বৃত্তের হীন কর্ম্ম কলঙ্ক রাখিয়া যায়;
বেদনার অবসানে ত্যাগের মহিমালোকে সংসৌরবে শোভা পায়।

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভতে দেবোরিয়ালের বোতলায় কলপাইখানা আছে এবং অনেকগুলিই আছে। কিন্তু সেগুলি একসঙ্গে পাশাপাশি একজায়গায় এবং এক একটি ঘরের ইঁটার ও খার্ডক্লাস কামরার সমস্ত যাত্রীরই ব্যবহারের জন্য। অগত্যা আমরা সে পাইকারী গোসলখানা বর্জন করে একটি সেকেণ্ড ক্লাস বাথরুম বেছে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য পর্ব শেষ করে ফেললুম। এগুলির সুবিধা এই—একটি ঘরের মধ্যেই আবখানিটে একটি কল,

উদয়পুরের মহারাণা শ্রীভূপাল সিংহজী বাহাদুর

আবখানিটে পাইখানা। দরজা বন্ধ করে দিলেই একেবারে নিরিবিলি! আমরা একে একে পালা করে এটি ব্যবহার করলুম। স্যানিটারী প্রিভি ও ফ্লাশিং সিস্টেম থাকায় আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।

স্নান সেরে কল আসি। বেলা ১টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। খিদেয় পেট জ্বলছে, কিন্তু লক্ষ্মীবিলাস থেকে খাবার এসে পৌঁছায়নি তখনো। এমন সময় এক যুবক ব্রাহ্মণ একলিঙ্গজীর প্রসাদ এনে হাজির। আমরা সেবনা বললুম, কিন্তু সে ছাড়লে না। প্রসাদ রেখে চলে গেল। বলে গেল, এর জন্য পয়সা লাগবে না। প্রসাদ প্রত্যহ যাত্রীদের বিনামূল্যেই বিতরণ করা হয়।

শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। জয় বাবা একলিঙ্গজী! খিদের চোটে তখন চোখে অন্ধকার দেখছিলুম। একলিঙ্গজী যে জাগ্রত দেবতা—সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। ওঁর রাজ্যে অতিথি

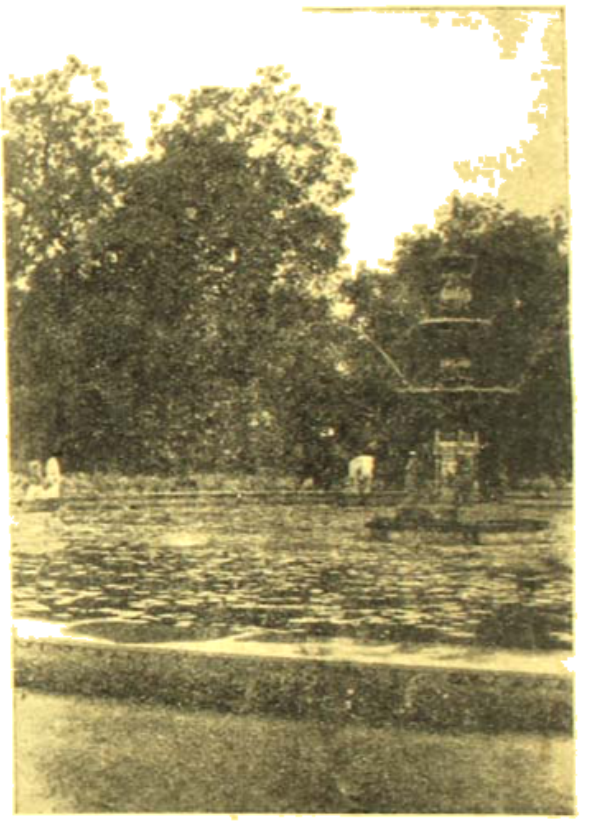

সৈলানাথের সর্ববৃহৎ জলাশয়

হয়ে অভুক্ত আছি আমরা, আমাদের অবস্থা বুঝে ঠিক সময়ে প্রসাদ পাঠিয়েছেন। শোনা যায় সমগ্র উদয়পুর রাজ্যই নাকি একলিঙ্গজীর দেবোত্তর সম্পত্তি। তিনিই প্রকৃত রাজা। মহারাণারা ওঁর সেবাইৎ স্বরূপ রাজ্য পরিচালনা করেন মাত্র। যাই হোক, প্রসাদ মুখে দিতে না দিতেই হাতে হাতে ফলও পাওয়া গেল! অর্থাৎ লক্ষ্মীবিলাস থেকে গরম গরম ডালভাজা তরি তরকারি ও ঘই মিষ্টি এসে উপস্থিত হল। আঃ! সে কি পরিতৃপ্তির সঙ্গেই না খাওয়া গেল।

খেয়ে উঠতে আমাদের বেলা ২টা বেজে গেল। কিন্তু বিশ্রাম না করলুম—সেই পর সকলে বাঁধিয়া যে যেমন সরাই খানা হাত ধরে বেরিয়ে পড়া গেল—রাজা দেখতে। প্রথমেই পরলোকগত মন্ত্রী ছুটে চলো।

উদয়পুর শৈলাবাস

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর!' বলে টংগাওয়ালা। আমাদের সারা পথ ঘুরিয়ে বেশ বাঁধিয়া সরাইখানা যেখানে তার কোনটাতেই কোনও ভদ্র লোক বাস করতে পারে না। অগত্যা হতাশ হয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলুম আবার সেই ভদ্র মেসোরিয়্যালেয়া ৯ নং ইষ্টার ক্লাস কামরায়। মন তখন দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। এ ঘরে রাত কাটবে কেমন করে? শুনলুম ইতিমধ্যে যোধপুর মহারাজের এডিকং তাঁর কথা মতো এসে আমাদের খোঁজ-খবর নিয়ে গেছেন এবং ষ্টেশনের মুখে আমাদের অসুবিধার কথাও শুনেছেন। 'ভদ্রে মেসোরিয়্যালের' ম্যানেজারকে ডাকিয়ে তিনি কি যেন বলে গেছেন। ডাঃ বিজয়কিশন্ উদয়পুরের চীফ্ মিনিষ্টারের নামে যে পত্রখানি নিয়েছিলেন আমরা বুদ্ধি ক'রে যোধপুরের মহারাজার এই এডিকং সাহেবের হাত দিয়েই সেখানি

প্রতাপবাবুর বাড়ী গেলুম। তাঁর ছেলে সুরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে —বীরেন তাহার চিঠিখানি দিল। গিয়ে শুনলুম সুরেশবাবু বাড়ী নেই। বিকানীরের মহারাজার সংবর্ধনা সভায় গেছেন। তখন আসবেন বাড়ীর কেউ বলতে পারলে না। অগত্যা

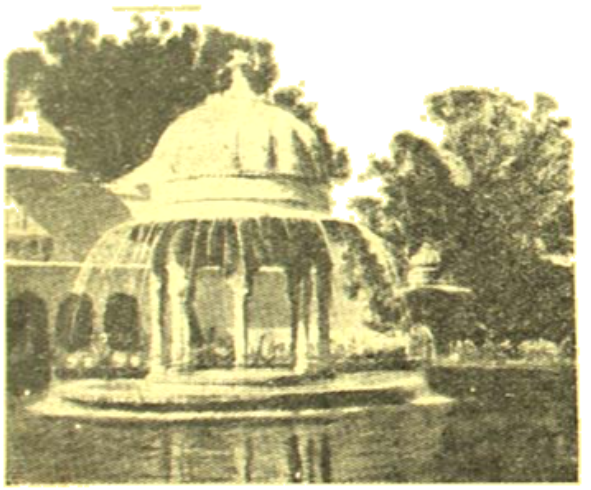

পিচোলা হ্রদের মধ্যস্থ প্রাসাদ

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের সকাশে প্রেরণ করেছিলুম। কারণ, জানি যে রাজদ্বারে গিয়ে অপরিচিত বিদেশী মানুষ আমাদের পক্ষে মন্ত্রীমহাশয়ের সংগোপন পাওয়া সম্ভব হবে না।

ইতিমধ্যে খবর এলো ম্যানেজার সাহেব দেখা করতে চাইছেন। দুশ্চিন্তা নিয়েই গেলুম তাঁর কাছে। আশঙ্কা হচ্ছিল, বোধহয় এবর-খানিও ছেড়ে দেবার হুকুম হবে। মহারাজার কোনও নূতন অতিথি

ধাবী-বাগ। (শৈলাবাস সরোবরের অপর তীরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বেড়াবার স্থান)

বীরেন তাহার চিঠিখানি ও তার সঙ্গে আমরাও একখানি করুণ আবেদন লিখে বাড়ীর লোকের হাতে দিয়ে এলুম। টংগা-ওয়ালাকে

হয়ত সমাগত হ'য়েছেন। কারণ, বেলা ১২টা থেকে ৪টে পর্য্যন্ত আমরা দেখে গেছি—দুএকটী বাঈজীরা আসছেন। বড় বড় ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়েরা আসছেন। কেরল কলাভবনের প্রসিদ্ধ নর্ত্তকেরা আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারসাহেব সপরিশ্রমে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে এক এক খানি ঘর খুলে খুলে দিচ্ছেন।

বিরক্ত হয়ে তাঁকে একটু রূঢ়ভাবেই বলেছিলুম—বহুদূর থেকে পরদেশী অতিথি এসেছে আপনাদের এই সুখ্যাত দেশ দেখতে। পরিচয়পত্র থেকেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয় আমরা সাধারণ তীর্থযাত্রীর দলভুক্ত নই। আপনি এই সব দেশোদ্ধার মাচিয়ে গাছিয়ে বলকে ভাল ভাল ঘর ছেড়ে দিচ্ছেন অথচ—

ম্যানেজার আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন—আপনাদের মতো বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত অতিথিদের উপযুক্ত স্থান দিতে পারছিনে বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত।" আমাকে ক্ষমা করুন। সমস্ত ভাল ভাল ঘর ও ফার্ষ্ট ক্লাস কোয়ার্টারগুলি মহারাজার আদেশে রিজার্ভ হয়ে আছে—ঐটে গেষ্টদের জন্য। এরা একেকে মহারাজের হুকুমনামা নিয়ে এসেছে। উদয়পুরে সমাগত রাজা মহারাজাদের entertain করবার জন্য এদের আনানো হয়েছে। আমি নিরুপায়!—এদের স্থান না দিতে পারলে আমার চাকরিটি খোয়াতে হবে।

একজন শুভ্রবস্ত্র ভদ্রলোক, বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী বলে মনে হল। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা রয়েছেন। তাঁদের মূল্যবান পাড়ী, হীরাজহরতের অলঙ্কার ও অসামান্য রূপলাবণ্য সুস্পষ্টই প্রমাণ করছে যে তাঁরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ। অত্র লোক রেগে উঠে বলছিলেন—যো হামকো রেওী আউর নাসাওয়ালা বালাল আদমিকোকে ইৎনা ইজ্জৎ, উনকো নাশ্ হোনা চাই অভ্র।

ম্যানেজারটি অতি খুব। দেখতেও সুপুরুষ। বয়স বেশী নয়, চিত্তে উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে অপেক্ষা করছিল—তাইত! এমন অসময়ে ম্যানেজার কী বলতে চায় আবার—? সুখবরটা শুনেই ঘর শুদ্ধ সবাই হড়মুড় করে ছুটলো ফার্ষ্ট-ক্লাস কোয়ার্টার নম্বর ৯ খুঁজতে। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলের প্রশস্ত বারান্দায় উঠে বাঁহাতি এই কোয়ার্টার নং ৯। ফার্ষ্ট ক্লাসই বটে। প্রকাণ্ড একটি হল; মেঝেয় কার্পেট পাতা, টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো। তারপাশেই মস্ত বড় একটি বেডরুম। ডবল খাট পাতা। সঙ্গে এ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুম। এর বাথরুমটাই আমাদের এই মাস ছেড়ে আসা ৯নং ইণ্টার ক্লাস ঘরের চেয়ে বড়। ঘরের পিছন দিয়ে লক পলি পথ। তার ওপর প্রান্তে গ্রীল দেয়া ও কিচেন্। কোলে একটি বাথ। কাপড় চোপড় ছেড়ে শুকানো চলবে বেশ।

ছেলেরা তোলাবাথও বুলিবারুৎ সমস্ত জিনিসপত্র ৯নং ঘর থেকে আনিয়ে নিয়ে মহা উৎসাহে নূতন বাসা সাজাতে বসলেন। বাঃ

উদয়পুর প্রাসাদ থেকে পিচোলা হ্রদের দৃশ্য

ব্যবস্থা দেখা গেল, একটি ভদ্রপরিবার বেশ আরামে এখানে বাস করতে পারে। প্রত্যেক ঘরের কোলে একটি করে 'ব্যালকনি' বা ছোট বারান্দা। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক লাইট। জানলা দরজায় পর্দা। আমাদের সঙ্গে যা কিছু ট্রাঙ্ক ছিল তা রায়সেবই ঘরে গেল। তাঁড়ার ঘরটিকে কলা হল ঐশ্বর্য ভোলানাথের সাউদার্ণ কোয়ার্টার্স! সুখবাস ঘরখোর ভাড়িয়ে দিয়ে সকপাতো বিছানায় শুয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে বিশ্রাম করছি। বাইরের ভেজিয়ে রাখা দরজায় টোকা পড়লো।

"কে?"

"May I come in?"

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি সামনে এক রাজপুতবেশী রাজপুত্র দাঁড়িয়ে। পায়ে মোজপুরী স্যাণ্ডাল ও জরীর নাগরা, গায়ে বুটিদার আচকান হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। মাথায় শিরস্ত্রাণ কথায় জরীর পাগড়ী। তার একপ্রান্ত কুলের মতো কানের পাশে ঝুলছে। অপরপ্রান্ত পিঠের দিকে ঝুলে পড়ে রয়েছে!

হ্রদের ওপার থেকে উদয়পুর প্রাসাদ

'জহিম্' বলে একটা স্যালুট দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম "আপ কিসকো মাঙ্তে হেঁ?"

পরিষ্কার বাংলায় রাজপুতবেশী রাজপুত্রটি বললেন—আমার। আপনিই বোধ করি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। আমার নাম শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

আর বলতে হ'ল না। দু'হাত বাড়িয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে হলঘরে এনে বসালুম।

ইনিই উদয়পুরের স্বর্গগত রাজস্ব মন্ত্রী জনরিল প্রভাসবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শুনলুম—এইমাত্র আমি বিকানীরের মহারাজার সংবর্ধনা সভা থেকে বাড়ী ফিরে আপনার চিঠি পেলুম। এখানকার দরবারী পোষাক হচ্ছে এই। ষ্টেটকাজে যুক্তি পাজামা পরে যাওয়া নিষেধ। য়ুরোপীয় পোষাকে যেতে বাধা নেই বটে, কিন্তু সে বিদেশীদের জন্যে! রাজকর্মচারীদের দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান এখানে বাধ্যতামূলক বিধি। কিন্তু এই বড়াচূড়া ছাড়বার আগে আমি অবসর পাই নি। এ বেশটাকে বাগ করে নেবেন। আপনার চিঠি পেয়েই আমি সভায় সামান্য অজুহাত আপনাদের থাকবার কোনও ব্যবস্থা করা যায় কিনা খুঁজে বেড়িয়েছি। কোথাও স্থান নেই। আর ভজন হোটেল চীফ্ এসেছেন। এক একজনের জন্যে প্রায় পাঁচশো রেটিনিউ। সর্বত্র স্থানাভাব। অসংখ্য ট্যাক্স্ ফেলেও ভূদিয়ে উঠতে পারা যাচ্ছে না। অতি অল্পে আমি একখানা best হোটেল Towerএ আপনাদের জন্য একখানা 'কোর-সুইটস' ঠিক করে এসেছি। একেবারে লেকের ধারেই এই হোটেল। চমৎকার জীর পাশের আরামদায়ী গিরিশ্রেণীর। হোটেল আজকের বাজারে খুব সুবিধা—মাথাপিছু দৈনিক মাত্র ১২৲ টাকা।

মনে মনে মাথা ক'সে ঠিক করে ফেললুম আমাদের দু'জনের সে হোটেলে দৈনিক খরচ পড়বে ২৫৲ টাকা হিসাবে। যদি দিন দশেক থাকি—হোটেল চার্জই দিতে হবে ২২০৲ টাকা। এ ভাবে চললে তো দেউলে হ'য়ে বাড়ী ফিরতে হবে।

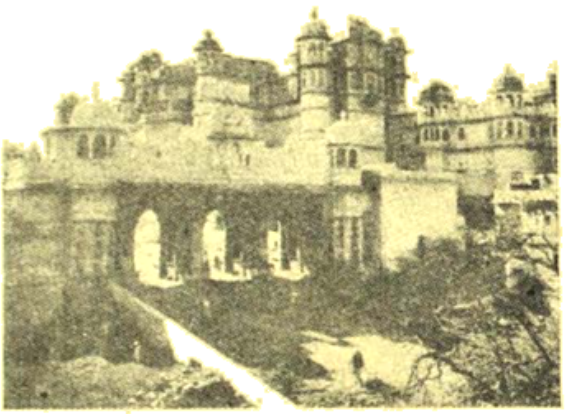

উদয়পুর রাজপ্রাসাদ

সুরেনবাবু যে এতখানি কষ্ট নিয়ে—আমাদের জন্য এই অসুবিধার মধ্যেও এমন সুব্যবস্থা করেছেন এর জন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললুম—একটু আগেই আমরা এই কাস্টমস এপার্টমেণ্টটা পেয়েছি। এখানে আমরা বেশ আরামেই থাকতে পারবো। আপনি শুধু অনুগ্রহ করে একখানা মোটরগাড়ীর যাতে তাড়া পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা একটু ঘুরে বেড়াতে চাই। গাড়ী পেলে আমরা কালই বেরিয়ে পড়বো। আগ্রহ দেবতা বাপ্পা একলিঙ্গজীকে দর্শন করতে।

সুরেনবাবু একটু হতাশভাবে বললেন—গাড়ী যোগাড় করাই এ সময় সবচেয়ে শক্ত কাজ। দেখি, একজন লোক এখানে তার প্রাইভেট কার মাঝে মাঝে ভাড়া দেয়, যদি পাওয়া যায়, কাল সকালে খবর দিতে পারবো। যা হ'লে একলিঙ্গ মন্দির ও বাপ্পারাও পর্যন্ত যে বাস যায় তার ফার্ষ্ট ক্লাস সীট দুটো আপনাদের জন্য রিজার্ভ করিয়ে

রাখবো। তাতে পেলেও আপনাদের একটুও অসুবিধা বা কষ্ট হবে না।

আমরা চাইলুম—বাস ধরতে হবে কোথায়? এখান থেকে বাসে ইষ্টাণ্ড কতদূর?

তিনি হেসে বললেন—বাস যথাসময়ে আপনাদের দরজায় এসে আপনাদের তুলে নিয়ে যাবে। আপনারা প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আপনাদের আর কি প্রয়োজন হ'তে পারে বলুন? কি কাজে লাগতে পারি?

বললুম—মাঝে মাঝে খবর নেবেন দয়া করে। আমরা এখানে একেবারে নির্বান্ধব। আপনাদের ভরসাতেই রইলুম।

সিগারেট ও চা আনার করলুম। বললেন ধূম্র রূপে বর্জিত। বিকানীরের মহারাজের যৌতুকে প্রচুর চা ও জলযোগ হয়েছে। বরং আপনারা একদিন আসুন আমাদের ওখানে একটু চা পাবেন। আজ বিকেলে গিয়ে আমরি মুখে ফিরে এসেছেন শুনলুম। 'তথাস্তু' বলে তাঁকে বিদায় দিলুম।

উঠে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দেখি কেউ নেই! ওইত! শ্রীমতীরা গেলেন কোথা? রান্নাঘর থেকে একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ এলো কানে। সন্ধানে সেদিকে চলনা হলুম। দেখি গৃহিণীরা ষ্টোভ জেলে চা-কুফি শুরু করেছেন। পাশেই ইকমিক কুকারে কি চড়েছে। জিজ্ঞাসা করতেই হাসির রিয়ে গৃহিণী বললেন—আমার সময় নেই। পুরুষমানুষের তো এত কৌতূহল ভাল নয়।

অগত্যা পুরুষের অভিমান নিয়ে ঘরে ফিরে এলুম। (ক্রমশঃ)

হিন্দু

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আমরা হিন্দু শত শতাব্দী ধরেছি ভারতবর্ষে;
সিন্ধুনদীর তটপ্রান্তে বাস করি বহুযুগ।
সমুদ্র আর পর্ব্বতমালা বেষ্টিয়া রাখে কৃষ্টি;
জীবনযাত্রা ছিল না কঠোর, করেছি কত না সৃষ্টি!
যেদিন ইহার শোভা-সম্পদে পড়িল পরার চোখ,
সেইদিন থেকে বিশ্ববাসীর হোলো বিচরণক্ষেত্র।
গিরিপথবাহী লুণ্ঠনকারী যুগে যুগে আসি' জুটে;
সভ্যতা ক্রমে ছড়ালো জগতে, শত শত দ্বীপপুঞ্জে।

আসিয়াছে শক, পারদ, কুষাণ, হুন, কোল, ভীল, যুঙা;
হিমালয় থেকে করিয়াছে বাস দক্ষিণে মোলকুণ্ডা।
লেপ্‌চা, ভুটিয়া, নাগা, খাসি, গারো সবাই জাতির অংশ;
সবার মাঝারে ছড়ায়ে রয়েছে বিরাট হিন্দুবংশ!
টীনা ও দ্রাবিড় মিশেছে আসিয়া আর্য্যশোণিত সঙ্গে;
লাক্ষা দিয়েছে চোখ মুখ বাসা বর্ণ যোগের অঙ্গে।
আর্য্য এবং অনার্য্য মিলি' ঘরে আধুনিক হিন্দু
মোরা বসবাস করিয়াছি আগে যেথায় সপ্তসিন্ধু।

শাস্ত্র এ জাতি রোধেনি অগ্রগতি, ছিল না একতাবদ্ধ;
তার প্রতিফল পেয়েছে কেবল, দুঃখের বাহি স্কন্ধ।
ছয়শো ও ষো—ছেচল্লিশেতে যা-কিছু হয়েছে লভ্য,
তাতেই ধরণী পেয়েছে প্রমাণ—হিন্দুরা সেরা সভ্য।
ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ববেদ, বহু বেদাঙ্গ গ্রন্থ
রচিল আর্য্য মুনি ঋষিগণ; জ্ঞানের কোথায় অন্ত!
প্রকৃতির বহু বিভূতির মাঝে হেরিয়াছে মহাশক্তি;
পরমাত্মাই নিত্য বস্তু, তাঁহারে জানায় ভক্তি।

বিশ্বরূপের পরব্রহ্মের পূজা করি মোরা নিত্য;
বহু-র মাঝারে একেরে হেরিয়া আমরা করি যে নৃত্য!
অন্যেরা কহে—"মূর্ত্তিপূজারী" বাঙ্গোক্তি করিয়া আজ,
প্রতীক কখনো নহে ভগবান্—জানে না এসব ভাজ।
মূর্ত্তি ভাঙিয়া হবে ভাই ভাই—ভেঙেছি হিন্দুধর্ম্ম;
ধর্ম্ম কখনো হয় না ধ্বংস, রহে এত সোজা কর্ম্ম।
"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্—" যাঁহাদের এই উক্তি,
মূর্ত্তা তাঁদের হবে না কখনো, দেহ থেকে পান মুক্তি।

দুধ ফল শাক-সব্জী মাংস খাদ্যের ছিল খাদ্য,
নীতি, পরিধান, অধিবাসে যারা ছিল চির-সুখী রাজা,
অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ যারা মানে নি সমাজ-কার্য্যে,
বিনাশ করিতে পারিবে না সেই সরল শোভন আর্য্যে।
পুনর্বিবাহ ছিল বিধবার, সমাদর পেতো কন্যা,
সকল কার্য্যে সমাজে নারীরা ছিলেন অগ্রগণ্যা,
সে-জাতির ঘুম ভেঙেছে আবার, তারা কভু নহে ক্ষুণ্ণ;
হিন্দু হিন্দু হিন্দুর মাঝে প্রণমিনু বরাভয়!

হ'তে কৌপীনবন্ত বলি না, পরিতে বলি না কন্থা;
ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করো ধরা—ধরো সে প্রাচীন পন্থা!
বাধার হবে যেতেছ কোথায়, ডুবিও না আর পঙ্কে!
সদা আনন্দে বাস করো সবে জন্মভূমির অঙ্কে।
বাড়ো অভিমান, ছাড়িও না মান, জীবন অতীব ইষ্ট;
আঘাত যে করে ভালবাস তারে, ভেবো না তাহারে দুষ্ট!
কালের বক্ষে মিলে মিশে যাবে দুঃখ সব দ্বন্দ্ব;
পূর্ব্বগগনে উদিবে অরুণ, আর নাহিবে না অন্ধ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কয়েক ঘণ্টা পরে গোটেনবার্গ (Gothenbrug) পৌঁছলাম। বিমান আবার আকাশে ছুটে চললো, সুইডেন পেরিয়ে ডেনমার্কের ছোট ছোট দ্বীপগুলির উপর এলাম। গত জানুয়ারী মাসে সুইডেনের লোক সংখ্যা

ব্রাইটন সমুদ্র-তীর

সম্বন্ধে একটু ভুল বলা হয়েছে। সুইডেনের লোকসংখ্যা ১৯৪১ সালের ষ্টাটেস্টিক্স এ্যালমানাক অনুসারে ৬৩,১০২১৩ জন। রাজধানী ষ্টকহল্মের লোকসংখ্যা ৫,১০,৭৭১ বেনামের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধাংশু ভট্টাচার্য মহাশয় এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ছোট বিস্তৃত খণ্ড খণ্ড ভূভাগের আঁকা বাঁকা তাজা তীরগুলি মানচিত্রের ছবির মত দেখায়। আমরা ডেনমার্ক ছেড়ে 'বর্ণ-সি'র উপর দিয়ে ছুটেছি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইংলণ্ডের মাটী দেখা গেল

ব্রাইটন সমুদ্র-সৈকতে

বিমান নীচে নেমে চললো—ইংলণ্ডের বৃক্ষ অতি সুস্পষ্ট—এক ধাঁচে গড়া চালু ছাদের অসংখ্য বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে, চারিদিকে শক্ত ঘাট-মাঠ, সবুজ ক্ষেত, উঁচুনীচু জমিগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সারা দেশটি যেন সাজানো বাগান।

ব্রাইটন সমুদ্র সৈকতে

প্রায় বেলা ৫টার সময় আমরা লণ্ডনের বিমানবন্দরে নামলাম। তারপর কাষ্টমের কড়াকড় পরীক্ষা পার হয়ে লণ্ডন পৌঁছে Gloucester Roads Bailays Hotels গিয়ে উঠলাম।

লণ্ডনে এবার ৭দিন থাকার কথা। পরদিন শনিবার সকালে বেরিয়ে কিছু কাজ সারা গেল। বেলা ১টোয় শহরের দোকানপাট আপিস আদালত সব বন্ধ হল! রবিবার পুরো ছুটী; কাজ কর্ম কিছু নেই, কি করা যায়, সমুদ্রতীরে বেড়াতে খুব ইচ্ছা হল। পোর্টারের কাছে

মোটর বোটে ব্রাইটন সমুদ্র বিহার

খবর নিয়ে জানা গেল Victoria Station থেকে fast trains করে একঘণ্টায় Brighton পৌঁছন যায়, Brighton এর সমুদ্রতীর দুটীর দিনে এ দেশের লোকের আনন্দ উপভোগের একটি বিশেষ স্থান!

কেম্ব্রিজের পথে

সকালের আহার সেরে খুব খুশী হয়ে আমরাও বেড়াতে গেলাম। পৌঁছে দেখি সমুদ্রতীর লোকে লোকারণ্য, একে ছুটির দিন তায় আবার জিতের শেষ, বাড়ী থেকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে সমুদ্রধারে রোদে বসে দিন কাটাবে বলে। তীরে বালি নেই, কেবল ছোট ছোট পাথরের নুড়ীতে ভর্ত্তি। আমরা এট ডেক চেয়ার ভাড়া করে পেতে বসেছি, খুব জলের ধারে বালি ছিল সেখানে গেল। বড় বড় মোটর লঞ্চগুলি অনবরত যাত্রী বোঝাই করে সমুদ্রের বহুদূর অবধি ঘুরে বেড়িয়ে ফিরছে,

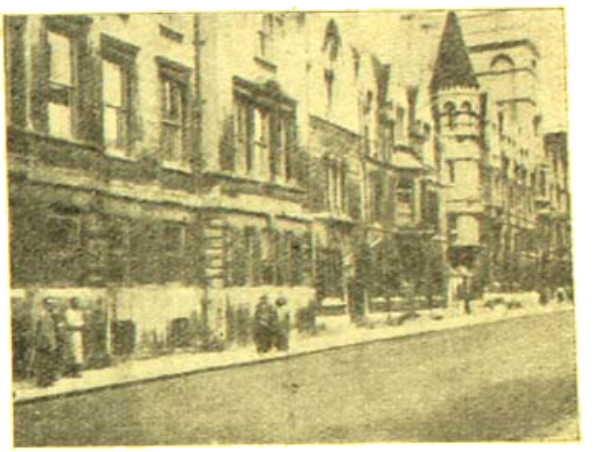

লণ্ডনের রাজপথে

খুব লোভ হল—মোটর লঞ্চে করে বেড়াতে যেতে হবে, বাড়ী ফেরার আগে সবাই মিলে একবার আমরা সমুদ্রে বেড়িয়ে এলাম! প্রায় ৫টার সময় হোটেলে ফিরেছি।

পরদিন ১২ই মে সোমবার। উমি হাসপাতালে কাজ দেখতে গেলেন। আমরা ইউব ট্রেন করে Countyতে বেড়াতে গেলাম।

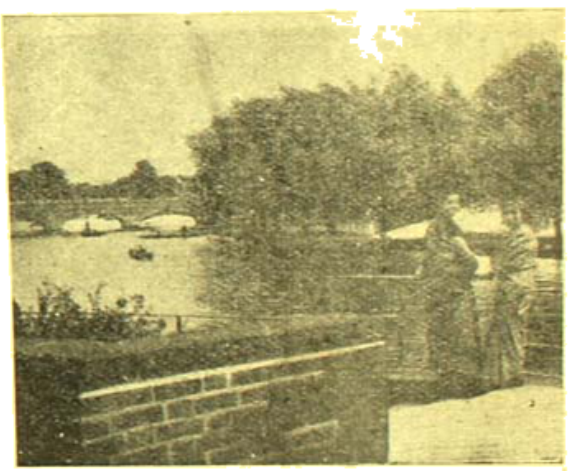

ষ্ট্রাটফোর্ড শহরে এক নদী তীরে

আণ্ডার গ্রাউণ্ড ষ্টেশনের Escalators (চলন্ত সীঁড়িতে) চড়তে খুব ভীষণ ভালবাসে—সীঁড়ির একটি ধাপে পা দিয়ে দাঁড়ালেই হল—আপনিই উপরে উঠে আসবে। ১টার সময় আমরা বেড়িয়ে ফিরে হোটেলে ঢাক খেলাম, কি অসাধারণ খারাপ খাবার, কিম্বে মরি, অথচ

দুধে আহার রোচে না। যুদ্ধের পর এ সব দেশে খাদ্যাভাব পুরই বেশী হয়েছে—মাংস নেই, ডিম নেই, সব্জি, তরকারী; দুধ চিনি কিছুই মেলে না। গত বছর দারুণ শীতে কয়লার অভাবে এদের ভীষণ কষ্ট গিয়েছে, সামনে শীতের ভাবনা তারা এখন থেকেই ভাবছে, তার উপায় খুঁজছে। এ ছেলে চরম দুর্দশাতেও এ দেশে বাঙালার মতো মনে মনে

শেক্সপীয়রের গৃহদ্বারে

মরুভূমি পথে পড়ে মরছে না। সাহায্যী মনের সুযোগায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আহার্য পায়—তা সে যতটুকু যেমনই হোক না কেন। দুঃখে কষ্টে এভাবে সবাই বাঁচে, কিন্তু তবুও একে অন্যের গ্রাস কেড়ে খায় না।

শেক্সপীয়র-পত্নী এন হাথওয়ের গৃহে

আমরা বিকেলে বেড়িয়ে ৭টায় অথবা ফিরে চিঠি পত্র লিখতে বসলাম। এখানে রাত ১০টা অবধি সূর্যের আলো আকাশে থাকে, সে আলোয় তখনও বেশ বই পড়া যায়।

১৩ই মে বুধবার। আজ সকালে কেম্ব্রীজের Cavendish Laboratoryতে ওঁর "মিলিয়ান ভোল্ট্ এক্সরে মেশিন" দেখতে যাবার কথা। ফিলিপ কোম্পানীর সৌজন্যেই সে বন্দোবস্ত হয়েছে, আমরাও সেই সঙ্গে কেম্ব্রীজ বেড়াতে যাব। ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়া গেল। চমৎকার রাস্তা, কোথাও উঁচুনীচু, কোথাও বা ঢালুর মত ধীরে নেমে গেছে; উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে যেতে আমি ভালো বাসি। রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট ক্ষেত, সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে গরু ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে, চাষীর বাড়ীর চারিদিকে প্রতি আনাচ কানাচটিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা কেম্ব্রীজে পৌঁছে Cavendish Laboratoryতে গেলাম। সেখানে এক মিলিয়ান, দুই মিলিয়ান, ৩ ৪০ মিলিয়ান ভোল্টের এক্সরে মেশিন ঐ দেশে বাইরে বেড়াতে বেরোলাম। রাস্তার ও-ধারে কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, পাশেই একটি প্রকাণ্ড গীর্জা, তখন প্রার্থনার সময়। ছেলেমেয়েরা সব মিলে প্রার্থনার গান গাইছে। দূর থেকে শোনা যায়। আমরা মাঠে বেড়াতে লাগলাম। উনি খেলেন

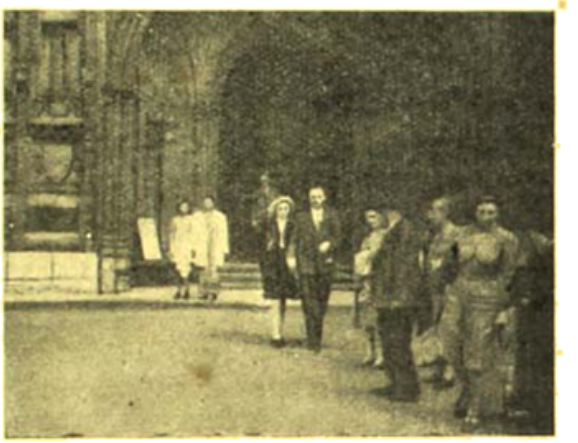

লণ্ডনে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবির সম্মুখে

স্থানীয় এক প্রফেসারের (Prof. Mitchel) সাথে দেখা করতে। স্থানটিতে শিক্ষা ও গবেষণার আবহাওয়ায় যেন সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে উনি ফিরে এসে বলেন যে প্রফেসারটি বড় ভালো মানুষ, এ যেন আবহাওয়ায় জীবন কাটিয়ে বাইরের বিষয়গুলিকে একেবারে ভুলে গেছেন, নিজেকেও কাজের ভিতর হারিয়ে ফেলেছেন। ওঁর উপস্থিতিতে তিনি তো খুব খুশী, স্বাচ্ছন্দ্যমত ঘুরে জীবনের সমস্ত গবেষণার তালিকা নিয়ে ওঁকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। সময় বড় কম, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে, তার আবার আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি, সুতরাং উনি তো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যাহোক কোনও রকমে ফেরে ফিরে এলেন। আমরা আবার লণ্ডনের দিকে রওনা হলাম। প্রায় ১০০ মাইল ঘোরানো বেড়িয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরলাম। লণ্ডনে সুন্দর বেড়িয়ে দিনগুলি বেশ কাটছে। এখানকার Countyতে ছোট ছোট বাংলোগুলি ছবির মত দেখতে, প্রত্যেক বাড়ীর সামনে ছোট একটু সবুজ মাঠ, পিছনে একটু জমিতে তরকারির বাগান।

১৩ই মে। আমরা সকালে বেরিয়ে প্রথমেই গেলাম Pan American Air offices। সেখানে কাজ সেরে টমাসবুকের অফিস হয়ে ইউস্টন ট্রেণে চড়ে হোটেলে ফিরলি। অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যত ট্রেণ ছুটছে, ২।৩টা ষ্টেশন পার হয়ে South Kensington Stationএর দিকে চলেছি। হঠাৎ মাঝপথে ট্রেণ থেমে গেল। কি হল? অল্প সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো, গাড়ী ভর্ত্তি যাত্রী। ধোঁয়াতে অর্দ্ধেক লোক দাঁড়িয়েই চলেছে। ইতিমধ্যে মেথি মিস্ত্রীরা যন্ত্রপাতি নিয়ে ইঞ্জিনের ভিতর ঢোকাঢুকি করছে, খুললাম কল বিগড়েছে।

আধঘণ্টা কাটলো, গাড়ী আর নড়ে না। ঘেমে উঠি, চোখ জ্বালা করছে, গরমে ও পরিশ্রমে হাতাদের অভাবে প্রাণ যায়—যেন ইঁদুর কলে পড়েছি। গাড়ীর ভিতর আবার কোথা থেকে ধোঁয়া আসতে আরম্ভ হল। সবাই ভয়ে অস্থির। বুঝি এইখানেই জীবলীলা সাঙ্গ হল।

একটু পরে একজন রেল কর্ম্মচারী এসে বলেন যে আপনারা গাড়ীর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে বরাবর রেঁটে চলে যান। ষ্টেশন অবধি পরপর ট্রেণ বন্ধ রেখেছে। উঠে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কামরার পর কামরা পেরিয়ে চলেছি, ইঞ্জিনের উত্তপ্ত কলকব্জার পাশ দিয়ে সরু পথে হেঁটে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। আমি খুকুর হাত ধরে কোনরকম করে পার হয়ে চলেছি। প্রায় দেড় মাইল ট্রেণের ভিতরে হেঁটে South Kensington Stationএ নেমে দাঁড়ালাম। বাইরে এসেই মাথা ঘুরে উঠলো। ৫।৬ জন মহিলা তখনই ষ্টেশনে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আমি ও খুকু একটু সেইখানে জিরিয়ে নিয়ে ওঁর সঙ্গে রাস্তায় উঠে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। আধঘণ্টা বিশ্রাম করে উনি রয়েল সোসাইটি অফ মেডিসিনে কাজের বিষয়ে বক্তৃতা দিতে চলে গেলেন।

১৭ই মে শনিবার। আজ আমাদের আমেরিকা যাত্রার দিন। সকালে উঠে খাওয়া সেরে একটু বাজারে বেরোব, এমন সময় হয়টাসের একজন রিপোর্টার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। কথায় কথায় তিনি বল্লেন যে বিদেশে ভারতের খবর খুব কমই পাঠানো হয়, অর্থাৎ মোটেই ভালো প্রপাগাণ্ডা করা হয় না। এই দেখিন ভারতে এত বড় ভূমিকম্প গেল, ভারত থেকে তার খবর বিস্তারিতভাবে কোথাও গেল না, কেউ জানতেই পারল না। আর্ম্মানীতে সেদিন কয়েকটামাত্র লোক খেতে পাইনি, কিন্তু তারা সারা পৃথিবীতে সে খবর রটিয়েছে। ফলে, হয় তো আমেরিকার কারু কাছে লাভালাভ মিলবে। এমন ধরণী কথা শুনলে মন প্রাণ ভুড়িয়ে যায়, কিন্তু খবর যে কেন যায় না সে তো জানি। কথায় কথায় কখন যাড়িয়ে ফোন লাভ নেই ভেবে করে উত্তর না দিয়ে দেখা সাক্ষাৎ শীঘ্র শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে সামান্য যা কিছু কাজ ছিল সেরে হোটেলে ফিরে এলাম। প্রায় বেলা ৩টার আমরা বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত হলাম, আকাশে মেঘ জমেছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়া সুরু হল। আমরা বিমান ঘাঁটির মাঠে গিয়ে Pan American Airlinesএর একটি বড় বিমানে উঠে পড়লাম। ৩৫জন আরোহী নিয়ে বিমানখানি আকাশে উড়লো। তার মধ্যে ৩২জন যাত্রী, ১জন হোস্টেস এবং ১জন ষ্টুয়ার্ড ও ষ্টুয়ার্ডেস। সেই ৩২জন বিমান-যাত্রীর মধ্যে তিনটি মাত্র বাঙ্গালী, আর সবাই ইউরোপীয়ান। আকাশের আবহাওয়া খারাপ। বায়ু প্রতিকূলগামী। ইংলণ্ড পার হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিমান আয়ার্লাণ্ড Shannon বিমান ঘাঁটিতে এসে দাঁড়ালো। এখানে আহারাদি শেষ করে আবার আকাশ পথে উড়ে চলেছি। সামনেই আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তাল জলরাশি ফুলে উঠে পাড় ভেঙে ফেনা ছড়িয়ে চলেছে। উপরে অনন্ত নীল আকাশ। নীচে নীলাভীন নীলাম্বুরাশি। আমরা যেন সুদূর কোন এক নীল পরীর রাজ্যের ওপর দিয়ে ছুটেছি। সূর্য্য অস্ত প্রায়। দিনের আলো ম্লান হয়ে এল, ঘুরে ঘুরে আরো উপরে বিমান উড়ে চললো। পৃথিবীর রবি মিলিয়ে এল। দূর থেকে দেখি সাগরের নীল জলে সাদা সাদা অসংখ্য ফেনার ঢেউ ভাসছে। চারিদিকে অন্ধকারে ঢেকে গেল। বিমানে তখন জোর আলো জ্বলছে। আমি বই পড়ে সময় কাটাতে লাগলাম। রাত হল, যাত্রীরা সব একে একে আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে গেল, আমি একা জেগে বসে আছি, ঘুম আর আসে না। জানলা দিয়ে দেখি—অন্ধকারের মাঝে বিমানের দুদিকে দুটী ডানায় মিটমিট করে আলো জ্বলছে আর নিভছে। হঠাৎ কেউ বাঁধার আলো জ্বলে উঠল, ষ্টুয়ার্ডেস এসে হাজির। যাত্রীরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেখে কাউকে না জাগিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। বিমানে সবুজ ঘোলা দেখে আমায় ডাক করতে লাগল, দেখতে দেখতে ছোট্টো হাওয়ার ওয়াটার ফেলে রেখে আমরা আরো উপরে উঠে পড়লাম। সারা রাত এমনি ভাবে কাটল। তখন প্রায় ৫টে বাজে, অন্ধকারের ভিতর মিটমিটিয়ে দীপে Gander বিমান ধীরে ধীরে নামলো। বাইরে বেরিয়ে দেখি ঈষৎ কনকনে শীত, অল্প গরম কাপড় পরেছি, উপরে ওভার কোটও চাপিয়েছি কিন্তু তবুও শীতে বাইরে থাকা যায়। বিমান ঘাঁটির ঘরে ঘরে আরামে প্রাতের আহার সেরে বড় কাঁচের জানলার ধারে এসে, দাঁড়ালাম, সবে তখন উষার আলো আকাশের কোণে দেখা দিয়েছে। সাউন্ড-সীকারের নির্দ্দেশ মত আবার আমরা ফিরে এসে বিমানে উঠলাম। আকাশপথে ছুটেছি—সারা মাঠে সাদা বরফের গুঁড়ো জড়ানো। নদী ও জলাশয়গুলি জমে চক্‌চক্ করছে। গাছের ডোপ ডাল বরফের ভারে নুইয়ে পড়েছে। খুব বরফ দেখে ভারি খুশী। আর ইচ্ছে ছিল ঘুমোলে পড়া সেই এস্কিমোল্যাণ্ডটা একবার লক্ষ্যে দেখে আসে, কিন্তু এবার তা আর হ'ল না। বেলা বাড়তে লাগল, আমরা মীল চশমা এঁটে পরদা টেনে বসে রইলাম। ষ্টুয়ার্ড বলে গেল আর ১০।১৫টায় নিউইয়র্ক পৌঁছাব। আমরা তীরের মত ছুটেছি। হঠাৎ দেখি কোথা থেকে কুয়াশা এসে আমাদের ঘিরে ফেলল, চারিদিক ঈষৎ ঘন কুয়াশায় ভরা বিমানের ডানা ২টীও দেখা যায় না,—আমরা যেন কুয়াশার জালে পড়ে বেরোবার পথ পাচ্ছি না। সাদা ধোঁয়ার উপর সূর্য্যের আলো পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে—চাওয়া যায় না। ১টা বেজে গেল, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই, কুয়াশার পথ আর ফুরোয় না। কেউ বাঁধার আলো জ্বলে উঠল, মনে মনে খুবই আতঙ্ক হল—এইবার

মধ্যেকার আমরা আমেরিকার মাটিতে মানব। বিমান সেই যে নীচের দিকে নেমেই চলেছে। হঠাৎ অনুভব করলাম বিমানখানা যেন উপরে মুখ তুলে সজোরে এক টান দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পাখীর মত উপরে উঠে পড়ল। 'একি!' 'একি!' বলে যাত্রীরা সব একটু হৈ হৈ করে উঠল। ষ্টুয়ার্টদের কাছে কোন খবরই মিলল না। বিরক্তায় হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে চলেছি। ভাল লাগছে না। এমন সময় খেয়াল হল একবার ইঞ্জিনের ঘরটা দেখে এলে হয়। আমাদের অনুরোধে ষ্টুয়ার্টেস চালকদের অনুমতি নিয়ে এল। আমরা একে একজন করে ইঞ্জিনের ঘরে ঢুকে দেখে এলাম। বিমানের সামনে ছোট একটি কাঁচের ঘর। চালকদের কালো কালো কলকব্জায় ভরা। সেগুলি ঘিরে মধ্যভাগে বসে আছে পাইলট, তারপর এখন অফিসার, দ্বিতীয় অফিসার করে ক্রমপর্য্যায়ে ৮জন চালক বসে মাথার 'হেড্-ফোন' এঁটে ক্রমাগত যন্ত্রপাতি নাড়ছে—একজনে তারা যে যার কাজ করে চলেছে। কোথাকিও ভ্রুক্ষেপ নেই!

একটু পরে ষ্টুয়ার্ড খবর দিল যে ভীষণ কুয়াশার জন্য নিউইয়র্কে নামা গেল না। সিধাই আমরা ওয়াশিংটনে নামব। প্রায় ঘণ্টার সময় আমাদের বিমান ওয়াশিংটনের উপর এলো। আকাশ পরিষ্কার দেখে বিমান সেখানে নামতে শুরু করলো; দেখতে দেখতে আমরা আমেরিকার মাটির উপর এসে দাঁড়ালাম।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীভূপতি মজুমদার

জানিনা কোন ভাগ্যসূত্রে অল্পবয়সেই স্বাধীনতার মন্ত্র শেখি ও মন্ত্র জপিয়া অশান্ত ব্যগ্রতা লইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করি। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে আজ একটুও দ্বিধা নাই যে, কংগ্রেসের কাজে ঘুরিবার পূর্ব্বে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কি, কি রূপ লইয়া সে স্বাধীনতা মানব জীবনে দেখা দিলে স্বাধীনতার সাধনা সফল হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝিতাম না। যাঁহাদের পদতলে এখন শিক্ষা পাই, সাধকের দূরদৃষ্টিতে তাঁহারা ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা বলিতেন—"এখনে দেশে ঘর ভাঙ্গিবার যুগ—তাই এখন মনকে নিজের পূর্ণ আহুতি দিয়ে দেশে ঘর বাঁধবার মন্ত্র করতে হ'বে। তারপর একদিন আসবে যেদিন মুক্তিপ্রাণ জাতির দেহে প্রাণ স্রোতের জোয়ার দেখা দেবে, আর তার সকল জড়তার সকল নিশ্চেষ্টতার অবসান ঘটবে।" এখন মহাযুদ্ধে লোহিত ভারতবর্ষের অর্থ ও সৈনিক লইয়া ছিনিমিনি খেলার সময় ইংরাজ অনেক কিছু ভালো কথা বলিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে ভারতের আগে মিলিয়াছিল জাতীয় উন্নতির স্বপ্ন ভঙ্গ করিবার জন্য রাওলাট এ্যাক্ট। এই সর্ব্বনাশা রাওলাট আইনের প্রতিবাদে ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। কিন্তু জেনারেল ডায়ারের পরিবেশিত হলাহলের সঙ্গে মিলিয়াছিল অমৃত—জাতীয়তাবোধ ও গান্ধীজীর অভিনব নেতৃত্ব।

দীর্ঘদিনের নির্ব্বাসন ও কারাবাসের পর যখন দেশে ফিরিলাম—দেখিলাম যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে অসহযোগের মন্ত্রে জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা আসিয়াছে, আর সেই কংগ্রেসের কর্ণধার রূপে মহাত্মা গান্ধী জাতিকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছেন স্বাধীনতার পথে। ফিলাফ্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী মন সহসা অহিংস অসহযোগের নীতি স্বীকার করিতে রাজী হইল না। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে মানিলাম, যে মন্ত্রে যুদ্ধপ্রাণ জাতির মুখে মহাত্মা নূতন আশার স্বপন জাগাইয়াছেন—তাহাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা চলিবে না। তাই ১৯২০-২১ সালে নাগপুর অধিবেশনে আমরা কংগ্রেসে যোগদান করিলাম। নূতন পদ্ধতিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হইল। স্বাধীনতাই সকল দুঃখের কারণ—এই চেতনা কংগ্রেস দেশবাসীর মনোজাগাইল—আর যদি কোন দিন স্বাধীনতা আসে তাহা রক্ষা করা ও ভোগ করার জন্য সত্যাগ্রহের 'মানুষ' সৃষ্টি করার দায়িত্ব নিল কংগ্রেস। "মরব তবু যাচব না—এবং এই করেই জয় হবে।" মহাত্মার এই বাণীকে শুধু প্রচার মন্ত্র প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য কংগ্রেসকর্ম্মীরা বদ্ধপরিকর হইলেন। জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে লাগিল। ফেব্রুয়ারী কারাবরণ ও সাম্রাজ্যবাদীর বিপীড়ন ও নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া দেশশক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। একদিকে যেমন সংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত হইতে লাগিল, আর একদিকে মহাত্মাজী জনগণের সহিত কংগ্রেসের একাত্মবোধ জাগাইবার জন্য গঠনমূলক কর্ম্মসূচীর প্রবর্ত্তন করিলেন। বিদেশ হইতে আমদানী করা নানাবিধ বিলাসদ্রব্যের সহিত যন্ত্রের তার অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য দেশ তখন পরমুখাপেক্ষী। অপরদিকে অসংখ্য গ্রামবাসী কৃষির প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতার ফলে মুমূর্ষুপ্রায়। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং পরিশ্রম কংগ্রেসকর্ম্মীর অবশ্য কর্ত্তব্য ঘোষণা করিয়া দুই সমস্যারই সমাধানের পথ দেখাইলেন। শিল্প হিসাবে খদ্দরের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের মনে তখনও দ্বিধা ছিল। কিন্তু শুধু জাতীয় 'uniform' বা উর্দ্দী হিসাবে নহে, আমাদের অপরিহার্য্য বস্ত্রের সামান্য অংশও যাহাতে দরিদ্র গ্রামবাসীর গৃহে পৌঁছাইতে পারে সেই কথা ভাবিয়া আমরা খদ্দরকেও মানিয়া লইলাম। কিন্তু যুদ্ধকালীন ও পরবর্ত্তী বিরাট বস্ত্রসংকটের সময় শিল্প হিসাবেও খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। তারা নিজ অভিজ্ঞতা লাভের সহিত নীতির দিক

বিরাট পথর ও মূলীয়-শিল্পকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাত্মাজী মূলতঃ যন্ত্র শিল্পের বিরোধী ছিলেন এই কারণে যে, যন্ত্রশিল্পের অবাধ প্রসারের ফলেই পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিয়াছে। একদিকে যন্ত্রের প্রভাবে মানুষের চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া যন্ত্র প্রভুত্ব পাইতে থাকে, অপরদিকে আর্থিক পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় করিয়া শ্রমশিল্প বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে। মূলতঃ শ্রমশিল্প মানবতার বিরোধী—এই কথাই মহাত্মাজী বারংবার বলিয়াছেন।

যারা যাউক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাই তাহার লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিল। বৎসরের পর বৎসর তাহারা এই দাবী কংগ্রেস জানাইতে লাগিল—কোন অবস্থার উপহাস—কোন নির্যাতন তাহাকে টলাইতে পারে নাই। তাহার ঘোষণাকৃত দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও ত্যাগের মহিমায় রূপান্তরিত হইল আত্মপ্রসাদে। গান্ধী নেতৃত্বই দেশকে এই অমর্য্য সাহস জোগাইয়াছে। বিদেশী রাজশক্তি বহুবার প্রয়াস পাইয়াছে ধর্ম্মের নামে—জাতি ভেদের নামে অপপ্রচারের দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে। কিন্তু জীবনপণ করিয়াও সত্যাগ্রহী মহাত্মা তাহাদের চক্রান্ত বারবার ব্যর্থ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আসিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কংগ্রেস কোন পথ লইবে তাহাই হইল সমস্যা। বিভূলি নির্দ্দেশ আসিল নেতার নিকট হইতে। তিনি বলিলেন—যাহাতে সন্ত্রশক্তির জয় হয় সে কাজ ভারতীয়ের কর্ত্তব্য নহে, আবার যাহাতে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষ ইংরাজ তাহার অধিকার চিরস্থায়ী করে তাহাও করা চলে না। গান্ধীজীর নির্দ্দেশ মতো কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধমান জাতিগুলির নিকট পাঠাইল আত্মনিবেদন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করিল যে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। 'না একপাই, না এক ভাই' কিছু দিয়াই এই যুদ্ধে সহযোগিতা করা উচিৎ নয়। আদেশ হইল কংগ্রেসের নীতি প্রচার করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চ স্তর হইতে একটি একটি করিয়া সত্যাগ্রহী দেওয়ার কারাবরণ করিবেন। যাহাতে এই সঙ্কট সময়ে প্রতিষ্ঠান একেবারে ভাঙিয়া না পড়ে তাহার জন্য ব্যাপক আন্দোলন ঐ সময় অযৌক্তিক হইত। কিন্তু অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গিত পুরুষার নেতা আহ্বান দিলেন জাতিকে—"করিব অথবা মরিব" মন্ত্রে শেষ সংগ্রামের জন্য। বাহির হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর আক্রমণ ও দেশের অভ্যন্তরে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন এই দুইয়ের সমবেত আঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারতে ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রামের দ্বারা ভারতবর্ষ তাহার হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল।

রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা যেমন দেশকে দিয়াছেন বিভূলি নেতৃত্ব, অপরদিকে সমগ্র মানব সমাজকে তিনি দিয়াছেন নূতন সুখের সন্ধান, দিয়াছেন নূতন ভাবধারা। মানব সভ্যতার বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ভৌগলিক পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন জাতি তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র অথবা জীবন দর্শন গড়িয়া তোলে। মানুষের অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে যেমন তাহার পূর্ব্বপুরুষের রক্তকণিকা তাহার বাহ্যিক আকৃতি ও অন্তর প্রকৃতিকে গঠন করে, তেমনই এই ভৌগলিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য তাহার ব্যক্তিগত ও সমাজের আদর্শ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এই সভ্যতার দুইটি বিপরীত-ধর্ম্মী ধারা আছে, একটি প্রেমধর্ম্মী—আর অপরটি স্পর্দ্ধাধর্ম্মী। ভারতবর্ষ সুদূর অতীতে গ্রহণ করিয়াছিল প্রেমধর্ম্ম—আর পাশ্চাত্য দেশে প্রচার হইয়াছিল স্পর্দ্ধা ধর্ম্মের। ভারতবর্ষ তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছে ঐক্য ও সমন্বয়—বিরোধকে জয় করিয়াছে প্রেমের দ্বারা। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এই প্রেম ধর্ম্মের প্রতীক। ভারতবাসী তাই সহজেই তাঁহার ব্যক্তিত্বে খুঁজিয়া পাইয়াছে আপন সত্তাকে—তাঁহার মুখে শুনিয়াছে আপন অন্তরের কথা।

আজ পৃথিবী নূতন বিপদের সম্মুখীন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যবনিকা না পড়িতেই ইউরোপে নূতন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে, দেশে দেশে আণবিক শক্তির প্রয়োগে শত্রুপক্ষের আবালবৃদ্ধবনিতাকে নিঃসঙ্গে নির্ম্মূল করিবার অনুশীলন লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের একটি কোণ হইতে যে সবল কণ্ঠ এতদিন ধরিয়া এই সর্ব্বগ্রাসী হিংসার হাত হইতে মানবতাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে বারংবার প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য ধ্বনিত হইতেছিল আজ তাহা নীরব হইয়া গিয়াছে। কোন শক্তিমান পৃথিবীর মানুষকে এখন ডাকিয়া বলিতে পারে—"যাব—আমিরা যেব" এ যুগে এক অতীন্দ্রিয়ের মহামানব মহাত্মা গান্ধীই শুধু ছিলেন, তিনি যাহাকের নির্ম্মমতা পক্ষে আত্ম-বলিদানের শুভ শতদল ফুটাইয়া হাঁক দিয়া বলিয়া গেলেন "দাঁড়াও, ঈশ্বরকে আহ্বান।"

মহামানব কোটি কোটি বিভীষিত মানুষকে প্রকৃত কল্যাণ পথের সন্ধান দিয়াছেন—দিয়াছেন আশার অমৃতবাণী আর অপূর্ব্ব প্রেরণা।

মায়ার ছায়া

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

রসময়ের বউ মায়া সিঁথের সিঁদুর নিয়ে ভাগ্যবতীর মত সংসারের মায়া কাটিয়ে গেছে আজ সতের দিন। শ্মশান থেকে ফিরে রসময় সেই যে বাড়ীতে ঢুকেছে এ পর্যন্ত আর কেউ তাকে বেরুতে দেখে নি। সেই থেকে আফিস যাওয়া বন্ধ করেছে রসময়—আফিসের বন্ধুরা বাড়ী বয়ে খবর নিতে গেলে গা ঢাকা দেওয়া দেখা হলেও ভাল করে কথা বলে না। রসময়ের এই শ্মশান-বৈরাগ্য নিয়ে সেদিন বন্ধুমহলে রীতিমত তর্কাতর্কি চলেছিল। রসময়ের অবস্থাটা যিনি সব চাইতে উপলব্ধি করে এসেছেন, তিনি একটু তাচ্ছিল্যভাবেই বললেন; 'হুঁ, স্ত্রীর অকালমৃত্যুতে রসময় অগাধ প্রেমের যে নমুনা দেখাল—সেটা স্ত্রী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা বটে।" পাশে বসেছিলেন শচীন ঘোষ, ভারি মুখফোড় লোক তিনি—মুখখানা বিকৃত করে বলে উঠলেন: "পরাকাষ্ঠা না পোড়াকাঠটা!" উপেন সেন তাঁর বাঁধানো সোনার দাঁতটি বের করে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: "তার মানে?"

মানেটা শোনবার জন্যে সবাই সোজা হয়ে বসলেন। হরিপদ মুখুজ্যে মুখ থেকে চুরুট নিয়ে বিস্ময়ের মত ঝেঁকে বসেছিলেন, আড়াআড়ি ভাবে কাঠে হেলটাকে একটু নাড়াচাড়া দিলেন। শচীন ঘোষ তখন মানেটা এই ভাবে ভেঙে দিলেন:

যে মায়ার শোকে রসময়ের আজ শ্মশান-বৈরাগ্য এসেছে, তার প্রতি তারার ব্যবহারের ইতিহাসটা তাহলে বলি শোন।

শোনবার জন্যে সবাই উৎকর্ণ হলেন। শচীন ঘোষ বলতে লাগলেন: একদা গভীর রাতে মায়ার সঙ্গে তারার কি ঝগড়া; আর শেষ পর্যন্ত সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল জান? উনানের পাশ থেকে একখানা পোড়া কাঠ এনে মায়ার কোমল অঙ্গে রসময়দা'র কঠিন হাতের কঠোর আঘাত। ও—সে কি বিভিষিকাময় কাণ্ড রে! তাই বলছিলাম—পরাকাষ্ঠা না পোড়া কাঠটা।

শচীন ঘোষের এই ব্যাখ্যানা আর বলার ভঙ্গিটা আর সকলে উপভোগ করলেন, কেবল গোলাপ সেন নামে দলের তরুণ ছোকরাটি মুখখানা বেঁকিয়ে সঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন, কথাগুলি ত বেশ বলে গেলেন এক নিশ্বেসে, কিন্তু পত্নীর হাতের এই গুপ্ত কথাটা আপনি কি করে জানলেন শচীনদা? প্রতিবাদ উঠতেই শচীন ঘোষের ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কথা বেরুবার আগেই উপেন সেন তাঁর সোনার দাঁতটি বের করে চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে বললেন—আহা, বুঝছ না গোলাপ, শচীন হচ্ছে ঝানুলোক, রাতে ঘুম হয় কম। আর মেয়েদের খবরটাই রাখে বেশী—তাই পোড়াকাঠের রহস্য জেনেছিল।

ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে শচীন মুখখানা ভার করে উঠে যাচ্ছিলেন, তাঁকে আটকালেন বৈদ্যনাথ সরকার। তিনি এতক্ষণ বাইরে ছিলেন, বৈঠকে ঢুকেই, শচীনের ক্ষুব্ধভাবে গমন ভঙ্গিটা তাঁর চোখে পড়েছিল। শচীনকে আটকে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: ব্যাপার কি? ব্যাপারটা বৃদ্ধ অভিনেতার মত রসভাসে জানালেন—যাযাবরণ। বেঁটে সেঁটে চেহারার লোক ইনি, সখের থিয়েটারে মেয়েলী কণ্ঠে নারীচরিত্র অভিনয় করতে ভারী ওস্তাদ। এঁর মুখে বৈঠকের ব্যাপারটা শুনে বৈদ্যনাথ তাঁর বাঁকা চোখ আরো বেঁকিয়ে বলে উঠলেন: এই কাণ্ড, আরে ছি! আমাদের বন্ধু রসময়ের শোকে কোথায় সহানুভূতি দেখাবে, না তা চুলোয় গেল—কবে কি হয়েছিল, তাই নিয়ে রসিকতা শুরু করেছ—তার ওপর সেই সূত্রে হাসাহাসি? আরে ছি! হরিপদ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, এক টিপ নস্যি নাকে দুকিয়ে দিয়ে নাক পুঁছে বলে উঠলেন: তাহলে রসময়ের শোকে কি ভাবে সান্ত্বনা দেওয়া যায় তার একটা উপায় আপনিই বাতলে দিন দাদা! বৈদ্যনাথের বাঁকা চোখের খরদৃষ্টি তখন ঘরের কোণে উপবিষ্ট দুটি নির্লিপ্ত নিরীহ ব্যক্তিকে নিশানা করেছে, মুখেও হাসির একটু তীক্ষ্ণ বিলিক খুলে বললেন: কেন, তার জন্যে ভাবনা কি—দেখতে

পাচ্ছ না—প্রবোধ দাশগুপ্ত আর নগেন বাঁড়ুয্যেকে? এঁরা হচ্ছেন ওরাকিভাল লোক, প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর পুনর্বিবাহ করেছেন। সাধনার ভাষা কিংবা কোন বাণী—ওঁদের মুখ থেকেই বেরুবে ভাল। প্রবোধ কথাটা শুনেও গায়ে মাখালেন না, একটিবার বক্তার দিকে চেয়ে শুধু হয়ে গেলেন। কিন্তু নগেন বাঁড়ুয্যে বাম্বফিক্সে উঠে বৈদ্যনাথের সামনে এসে হাতমুখ নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার নামে আপনারা কি কইছেন? বক্তৃতার শেষের দিকে ভৈরবী শংকর এতক্ষণ বুঝি ঝিমুচ্ছিলেন। বাঁড়ুয্যের তর্জনে তাঁর তন্দ্রা ছুটে গেল, সংগে সংগে ভুঁড়ি দিয়ে বিশাল দেহটাকে নাড়া দিয়ে বললেন: কি হচ্ছে যে ওখানে—কিসের এত চীৎকার? যেন মেছো হাট বসেছে! দারোয়ানকেই ব্যাপারটা বুঝান দিয়ে বলতে হল; শুনে এক গাল হেসে ভৈরবীশংকর শান্তি জল ছড়িয়ে দিলেন একটা প্রবচন বলে—আরে এই নিয়ে এত তর্কাতর্কি। এর সমাধান ত শাস্ত্রকারেরাই করে গেছেন; কেন, শোননি—'ভাগ্যিবানের বউ মরে—অভাগার গরু!' শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন—সভা ভঙ্গ হল।

হসময়ের শোকে বন্ধুদের মনোভাব যাই হোক—বাড়ীতে হসময়ের বুড়ী মা কিন্তু ছেলের অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। রাত্রে হসময় বিড় বিড় করে কি বকে—কখনও উচ্চৈস্বরে গল্প পড়ে—আবার কাঁদে। অন্তরঙ্গ বন্ধু রমেন এসে বোঝায়। নানান রকম কথা শোনায়—অমুক লোকের সুন্দরী—অমুকের বিদুষী বউ মরেছে। তুই বেটাছেলে—জোয়ান লোক, তুই কেন শোকে কাতর হবি? কিন্তু কে কার কথা শোনে? এদিকে আফিসের ছুটি ফুরিয়ে গেল। মা বললেন: বাবা হসু—ওঠ। খেয়ে দেয়ে আফিসে যা—কাজে, কথাবার্তায় অন্যমনস্ক থাকবি। হসময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে: আমি আর সংসারে থাকবো না, যেদিকে দুই চোখ যাবে—বেরিয়ে পড়বো সোটা কপাল নিয়ে।

মা সারদা ও শুনে কাঠ। মাথায় হাত দিয়ে আকাশ পাতাল ভাবেন—চোখে জল। প্রতিবেশিনী জানদা এসে বলল: ও, দিদি! অমনি করে বলে কেন? সারদা মনের দুঃখে কেঁদে ফেলে বলেন: বউ মরেও গেল, মেয়েও গেল বোন! আমি এখন কি করি? ছেলে ত বলে বিবাগী হবে। জানদা কাছে এগিয়ে নিম্নকণ্ঠে সমবেদনার সুরে বলে: দিদি, জোয়ান ছেলে তাতে সুন্দরী বউ হারিয়েছে; আবার একটি সুন্দরী বউ ঘরে আনো—ছেলে ঠিট হয়ে যাবে। তা আবার একটা ছেলে আছে। আচ্ছা, বউমার কোন বড়দড় বোন নেই—তাহলে ছেলেটাকেও দেখবে আর—

কথাটা সারদার মনঃপুত হলো, মুখে বলল: তার আপন বোন নেই ভাই—একটা খুড়তুত বোন আছে শুনিছি, খুব নাকি সুন্দরী—পশ্চিমে থাকে।

সেদিনই সন্ধ্যার পরে ছেলের গায়ে হাত বুলতে বুলতে মা বিয়ের কথাটা পাড়তেই ছেলে একবারে লাফিয়ে উঠে বলল: এখুনি আমি বাড়ী থেকে চলে যাব! মা তখন অঞ্চলে চোখের জল মুছে বললেন: তোর ছেলের কি হবে? আমি বুড়ী মা কি করব? কে কার কথা শোনে! "জানি না" বলে ছেলে ঘর থেকে সবেগে বেরিয়ে গেল—ছেলের ভাব দেখে সারদা অবাক!

সেদিন বন্ধু রমেন অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে হসময়কে দিয়ে টাইপ করা দরখাস্ত সই করিয়ে নিলো—ছুটির জন্য। হসময় বলে রমেনকে—চাকরী আর সে করবে না—মায়াই যখন চলে গেল তার বাঁচাই বৃথা! রমেন অবাক হয়ে বলে: তুই কি ক্ষেপলা নাকি রে? বউ ত অনেকের মরেছে কিন্তু তোর মত বাড়াবাড়ি কেউ করে নি? হসময় রুদ্ধ কণ্ঠে বলে: মায়ার মত বউ কার আছে? রমেন হেসে বলে: সকলের বউই মায়া! হসময় আশ্চর্য কণ্ঠে বলে: জানে? রমেন দুই মীতভরা মুখে বলে: প্রত্যেকেই নিজের বউকে মায়ার মত সুন্দরী দেখে—এরা মায়া, মোহ, সংসারের বন্ধন। হসময় অবুঝের মত রমেনের দিকে তাকায়। হসময়ের দরখাস্ত পড়ে বড়বাবু বলেন: ওরে রমেন—ও যে দেখছি তিন মাসের ছুটি চাইছে? সাহেব ত এখুনি অধৈর্য হয়ে পড়েছে তার 'পার্সন্যাল'—কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল ক্লার্কের অনুপস্থিতিতে। রমেন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বিনীত কণ্ঠে বলে: স্যার—বড়

মুখড়ে পড়েছে—আপনি ত সব বুঝছেন—বড়বাবু কিছুদিন পূর্বে বিপত্নীক হয়েছেন এবং আবার বিবাহ করেছেন।

সাহেবের কাছে দরখাস্ত পেশ করতেই তিনি ও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। বড়বাবুকে বললেন: একি যে! এ বড্ড বাড়াবাড়ি—তিন সপ্তাহে স্ত্রী বিয়োগের শোক সামলাতে পারলো না মিঃ বাসু? চাত কচলাতে কচলাতে বড়বাবু বললেন: এটা একটা বড্ড 'সক' স্যার!—সামলাতে পারে নি? সাহেব গর্বের সুরে বললেন: জানো, আমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ যেদিন পৌঁছালো 'হোম' থেকে, আমি সেদিনও আফিসে এসেছি! বড়বাবু কিক্ করে হেসে ফেললেন। তারপর সামলে নিয়ে মনে মনে বললেন: ঘউয়ের সঙ্গে তোমার তো কোন জন্মে সম্বন্ধ ছেদন হয়েছিল। সে থাকতো বিলেতে—তুমি থাকতে এখানে—মাস মাস এক গাদা টাকা পাঠাতে হতো তার খোরপোষের জন্য—মরে গিয়ে বেঁচেছ! মুখে বললেন: স্যার! আপনারা গৌরজাতি—আপনাদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়! সাহেব এবারে খুশী হয়ে বললেন: আচ্ছা, তোমার 'টাইমে' দু'মাস ছুটি নিয়েছিলে? বড়বাবু কিক্ করে হেসে বললেন: আড়াই মাস, স্যার!

হসময়ের ও শেষ পর্যন্ত আড়াই মাস ছুটি মঞ্জুর হলো।

কিন্তু হায়! কিছুতেই হসময়কে বোঝানো গেল না। একদিন রাত্রে সিদ্ধার্থের মত সে পুত্রের মায়াপাশ ছিন্ন করে গৃহত্যাগ করলো। বৃদ্ধা মা কান্নাকাটি করলেন, ক'দিন অন্নজল মুখে তুললেন না। পাড়াপ্রতিবেশীরা অনুরোধে জানবার প্রবোধ বাক্যে, বিশেষ করে কচি নাতিটির মুখ চেয়ে আবার তাকে সামলে-সুমলে সবই করতে হ'ল। দুখানি বাড়ী ছিল কর্তার আমলের, সেই ভাড়া হতে দু'টি প্রাণীর ভরণপোষণ চলতে লাগলো কায়ক্লেশে। বৃদ্ধা দিনের বেলা আনমনা থাকেন, ছেলেটাকে বুকে পিঠে করে সব দুঃখ ভুলতে চান—রাত্রে কেঁদে কাটান। নিয়তির পরিহাস! প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনা দেয়: ভেব না দিদি, হসময় আবার ফিরে আসবেই। সান্ত্বনা কি তাঁরা নিজেরা জানেন।

কাশীই সর্বাগ্রে বিবাগীকে আকৃষ্ট করে। এই সর্বজন নিন্দিত ও আকর্ষণে হসময়ও লোভা এসে পৌঁছল কাশীধামে। সেখানে সাধুর সন্ধানে ফিরতে লাগল। দৌনা বাবা, নাগা বাবা, বাঘ ভল্লুক প্রভৃতি নানান রকম বাবাদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিয়ে পড়ল। তাই জন্য গাঁজা সাজল, সিদ্ধি বাটল, ত্রিকুটের জিলিপি কিনে কাউকে বা ভোজন করাল, এমনি কত রকম তাঁবেদারী চলল। শেষে অভক্তি নিয়ে ফিরে এল। হসময়ের খুবই আশা ছিল—কাশীতে সাধুর কৃপা পাবে, সেই সঙ্গে মিলবে পথের সন্ধান। কিন্তু তেমন সাধু ত তার বরাতে মিলল না—এরা শুধু ভোগের গোঁসাই। সেদিন সন্ধ্যার পর এই সব ভাবতে ভাবতে অসিঘাটে নদীর কিনারা ধরে চলেছে, হঠাৎ কে যেন তাকে ডাকল: শোন বেটা! হসময় চেয়ে দেখল, গঙ্গার তীর ঘেঁসে এক সাধু বসেছেন ধুনী জ্বালিয়ে—সে ডাকছে হসময়কে। কাছে গেলে সাধু অগ্নিকুণ্ড থেকে একটু ছাই তুলে তার কপালে ঘষে দিয়ে বলল: বেটা, তোর মনে বিষের দুঃখ আছে—জানি জানি? তোর জেনানা—বলেই সাধু হসময়ের চোখমুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। হসময় ভাবাবেগে কেঁদে বলল: বাবা! সত্যি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী মায়া আমায় ছেড়ে চলে গেছে—আমি সন্ন্যাসী হবো বাবা! আগেকার সাধু বাবাদের উপর হসময়ের অভক্তি হয়েছিল, কিন্তু এই অন্তর্যামী সাধুটিকে দেখে সে ভক্তিতে গদগদ হয়ে এই সাধুজীর শিষ্যত্ব স্বীকার করল। পরদিনই হসময় গেরুয়া পরল, হাতে কমণ্ডলু, গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে চন্দন, সর্বগায়ে মুখে ছাই মেখে পূজাপাঠে সাধু সাজল। কে বলবে এই সেই হসময়। অন্তরের ভিতর থেকে হসময়ের কাঁচা হলুদের মত গৌরবর্ণ ঝিলিক দেয়—দিব্যকান্তি হসময়—নবীন মহাদেবের মূর্তি ধারণ করলো। তার চলবার সময় লোকে তার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। গুরু তার নামকরণ করলেন—ভোগানন্দ স্বামী।

হিমালয়ের পাদদেশে—হৃষিকেশ—লছমনঝোলার অদূর পাশে কুলুকুলুনাদী ভাগীরথীর তীরের এক কুটীরে এক সাধু এসেছেন। দিব্যকান্তি সাধুবাবা পূজাপাঠ আরাধনায় সময় কাটান। অতি প্রত্যূষে স্নানান্তে করেন। নূতন সাধুবাবার আবির্ভাবে হরিদ্বারে চাঞ্চল্যের সাড়া তুলেছে। সবার মুখেই সাধুর কথা। স্থানীয় ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এসে বাবার আশ্রমে বসেন—তাঁর ভোর—বেদগান—ধর্মগ্রন্থ পাঠ শ্রবণ করেন। ক্বচিৎ কথা বলেন সাধুবাবা—তাও দুএকটি। সাধুবাবার অদ্ভুত বেদ-পাঠ প্রণালী এবং সুষ্ঠু আবৃত্তি শুনে সকলে বলাবলি করতে লাগলো—এতদিন পরে হরিদ্বারে এক সাধু এসেছেন বটে। বেশ নবীন বয়েসের। কালীকমলীর আশ্রম থেকে বাবার ভোগের বরাদ্দ হলো। প্রচার হয়ে গেল, ইনি সিদ্ধবাবা। যাকে যা বলবেন, সিদ্ধ হবে। এরপরই তাঁর আশ্রমের দরজায় দু'চারজন মাথায় ঘামী পাগড়ী বাঁধা শেঠজীর আনাগোনা হতে লাগলো। একজন পাকা ফুলসীমক করে দিলেন, আর একজন পাহাড় কেটে একটি ছোট গুহার মত করে দিলো—শীতের দিনে সাধুবাবার আস্তানার জন্য। দেখতে দেখতে হৃষিকেশ, হরিদ্বার, কনখল, সাহারাণপুর, ডেরাদুন, মৌরুরী থেকে অনেক শেঠজী এসে জুটলো। খালি হাতে কেউ আসে না—দুধ, ঘি, আটা, ময়দা, কলা, বেল, হরেক রকম ফল, আরো কত কি প্রণামী পড়ে। সাধু কত খাবেন? কেউ বলে সাধুবাবা বায়ুভুক্—কিছুই খান না। কেউ বলে—উনি ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করেছেন। একদিন দিল্লী থেকে এক শেঠজী এসে বর্ণা দিলো সাধুর গুহায়ে। নাছোড়বান্দা, রাত্রি হলো, তবু শেঠজী বসে। সন্ধ্যার পরে সেখানে কেউ থাকে না—হিংস্র পশুর ভয়ে। সাধুবাবার ধ্যান ভঙ্গ হলো মধ্য রাত্রে। হঠাৎ লোক দেখে ভড়কে গেলেন। শেঠজী বিনিদ্র নয়নে সাধুবাবার ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সাধুবাবা চোখ খুলেছেন দেখে শেঠজী সোল্লাসে এগিয়ে এসে তাঁর চরণযুগল আঁকড়ে ধরলেন। প্রসন্ন হয়ে সাধুবাবা তাঁকে বসবার ইঙ্গিত করতেই, শেঠজী জানালেন তিনি গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টার ও ব্যবসায়ী—গভর্ণমেণ্ট তাঁর বিরুদ্ধে কালোবাজার—ওভারড্রাফ্ট বাজার, ঘুষের বাজার প্রভৃতির চার্জে মোকদ্দমা রুজু করেছে। দশ লক্ষ টাকার জামীনে খালাস আছে। এখন সাধুবাবা দয়া করে এমনি একটি মায়াজালের সৃষ্টি করে দিন যাতে পুলিশ আর হাকিমের মুণ্ড ঘুরে যায়। তাদ বেতালকে পাঠিয়ে দিয়ে সবকাল-গোল পাকিয়ে দেন। শেঠজী এখানে মন্দির করে দেবেন সাধুবাবার নামে। পূজাপাঠ—গ্রহপূজা—শান্তি কবচ ইত্যাদি বাবদ সাধুবাবার পায়ের নীচে রেখে দিলেন মোটা একখণ্ড নোট। সাধুবাবার চোখ দু'টো প্রথমে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হলেন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। শেঠজী যুক্তকরে বসে আছেন—মুখে চোখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন। দুই ঘণ্টা পরে সাধুর সমাধি ভঙ্গ হলো। শেঠজী হাতজোড় করে নির্নিমেষ নেত্রে সামনে বসে। অতল গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো: পাপী! মহাপাপী!! ঠাৎ গুহা মধ্যে—নিস্তব্ধ রাত্রি—হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থানে এই ভীষণ ধ্বনি শুনে শেঠজী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে সাধুবাবার পদযুগল ধরে ভীতকণ্ঠে বলল: বাবা, হাঁ, আমি পাপী—মহাপাপী। আমাকে এবারটি বাঁচান—আর কখনও পাপ কাজ করবো না। সাধুবাবা কিছুক্ষণ মৌনী থেকে শেঠজীর মাথায় হাত বুলিয়ে, কপালে বিভূতির টিপ দিয়ে বললেন: যা। এবার কোন ভয় নেই, কিন্তু আর কখনও আমার এখানে আসিস নি।

শেঠজীর মলিন মুখে এক ঝলক হাসি ফুটে বেরুল। সাধুবাবার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে আশ্রম ত্যাগ করলো। বলা বাহুল্য এই সাধুবাবাই ভোগানন্দ স্বামী নামধারী রসনয়।

পরের দিন। বৈকালে ভোগানন্দ স্বামী ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলেন—হঠাৎ তাঁর কানে এলো ধামাকণ্ঠ: বাবা, এই যে এখানে—এস। বহুদিন পরে হিমাচলে বাঙ্গালী মেয়ের কথার আওয়াজ পেয়ে স্বামীজি কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে দরজার দিকে চাইলেন—চারি চক্ষুর মিলন হলো। স্বামীজি হঠাৎ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলে উঠলেন: "মায়া—মায়া!" স্বামীজি মুহূর্তের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করে তাকালেন—কি অদ্ভুত সাদৃশ্য—সেই মুখশ্রী—সেই ঘাং—সেই চেহারা। তরুণী বিস্মিতা হলো স্বামীজির আচরণে। তাঁর বাবা বললেন: মা, ছায়া, সাধুবাবা মায়াবাদ পাঠ করছেন, শুনলে না, মায়া—মায়া বলে ধ্যানস্থ হলেন। ইনিই সেই খ্যাতনামা সাধুবাবা! ছায়া পিতার কথার কোন জবাব দিলে না—বিভ্রান্তভাবে পিতার সঙ্গে মাথা নত করলেন—সাধুর উদ্দেশে।

স্বামীজি চোখ খুলে দেখলেন, সেখানে কোন লোক নেই। তবে কি ছায়া মূর্তি বিভ্রম হলো—এহি স্বপ্ন!

তার হারানো স্মৃতির শোক আজ যেন তার বুকে পাথরের ভার চেপে বসল।

ছায়ার বাবা কমল মিত্র করেই ডিপার্টমেণ্টে স্যাজোর; ডেরাডুন থেকে সম্প্রতি হৃষিকেশে বদলী হয়ে এসেছেন। তিনি সাধু দর্শন করে কোয়ার্টারে ফিরি গিয়ে দেখলেন, একটি বাঙালী যুবক তার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। যুবকটি তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিলে। তিনি চিঠি পড়ে যুবককে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। যুবক আমাদের সে ডেরাডুনে গিয়েছিলো—সেখানে না পেয়ে এখানে এসেছে। কমল-বাবু বললেন: হ্যাঁ—আমিও কিছুদিন পূর্বে আমার ভাইঝি মায়ার অকালমৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি; তারপর মায়ার বন্ধুর সঙ্গে আমার মেয়ে ছায়ার বিবাহের প্রস্তাবও হয়েছিল—আমার দাদা লিখেছিলেন। ছেলেটি নাকি দেখতে শুনতেও ভাল, আর খুব বিদ্বান। আহা! ছেলেটি শোকে কাতর হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে, বড়ই দুঃখের কথা। এখানে কোথায় খুঁজতে চাও বাবা?

যুবক বিনীত কণ্ঠে বলল: এখানকার পাণ্ডাদের পর্যন্ত সন্ধান করব ভেবেছি। এই যুবকই আমাদের পূর্ব-পরিচিত হবেন। ছায়া পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। কমলবাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকে স্ত্রীকে গিয়ে সব বললেন, ছায়া মায়ের পাশে ছিল। কমলবাবু হেসে বললেন: ভাখো—এদের কাণ্ড! এরা এই দেশে সেই বাঙালী ছেলেকে খুঁজতে এসেছে, আর যায়গা পেলো না!—ছায়া নীচু হয়ে তার মায়ের কানের কাছে মুখ রেখে কি বলল। কমলবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন: ছায়া মা, কি বলছে? স্ত্রী সহাস্যে বলল: ছায়া বলছে তার মায়াদি'র বরকে এখানেই পাওয়া যাবে। কমলবাবু ভ্রু কুঞ্চিত করলেন।

দু'দিন পরে। সাধুবাবা—ভোগানন্দ স্বামীকে আর তাঁর আবাসে দেখতে পাওয়া গেল না—তাঁর নৈয়ায়িক বসন—পুঁথিপত্র সব পড়ে আছে কিন্তু সাধুবাবা নেই। সকলে বলাবলি করতে লাগল: ইনি সাক্ষাৎ মহাদেব, স্বপ্নের ছিটে দেখতে এসেছিলেন। কলযুগে ত তিনি যাবেন না, সতীর স্মৃতি সেখানে যে। তাই, এখানে ক'দিন থেকে বিভূতি বিলিয়ে গেলেন। স্বর্গের ঠাকুর—এখানকার পোষাক পরিচ্ছদ এখানে রেখেই স্বর্গে চলে গেছেন। কালীকমলীর আশ্রম থেকে একজন সাধু এসে সাধুবাবার পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে গেলেন—সেগুলি রেখে দিলেন সেখানকার বিগ্রহের সিংহাসনে।

• • • • •

কয়েক দিন পর। হসময় সপরীরে কলিকাতায় ফিরে এসেছে। মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়ে সে একাই প্রণাম করল না—সেই সঙ্গে ছায়াও। সারদা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু। একবার বউয়ের মুখের দিকে চান, তার পরেই সস্মিত দৃষ্টি ফিরিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকান। শেষে হতভম্বের মত হয়ে বলেন: এ তো দেখছি আমার বউ মা! এ কি স্বপ্ন দেখছি! বৃদ্ধা সারদামণি যেন ঘাবড়ে পড়েছেন, হকচকিয়ে গেছেন—প্রত্যেকের মুখের দিকেই অসহায়ভাবে তাকাচ্ছেন। মায়ের অবস্থা বুঝতে পেরে হসময় হেসে বলল: মা, মায়ার ছায়া। বৃদ্ধা তবু বিহ্বলের মত চেয়ে থাকেন। হসময় মিষ্ট স্বরে বলল: কাকীমা, এ মায়ার সেই বোন—ছায়া।

বুড়ী মা মনে মনে বলেন: কি আশ্চর্য সাধুরা! বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে থাকেন। ওদের কথায় তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না।

খবর পেয়ে শচীন ঘোষ ছুটে এলেন, মুখে দুষ্টুমীভরা হাসি; ব্যঙ্গ স্বরে বললেন: এবারে একখানি "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" কি "হিমালয় পরিভ্রমণ" লিখে ফেল তারা। হসময় একগাল হেসে বলল: উঁহু! আমি লিখছি "ভোগানন্দ স্বামীর আত্মকাহিনী"। শচীন চেয়ে থাকেন অবাক হয়ে বোকার মত। হসময় হেসে বলল: ইনিই ভোগানন্দ স্বামী।

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাংলা দেশে বিপ্লবান্দোলনের সূত্রপাত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই। এই আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে কয়েকবারই কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপিত হয়, কিন্তু কোনটিই বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। না পারার কতকগুলি কারণও ছিল—তন্মধ্যে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব অন্যতম। কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান না থাকায় সমিতিগুলির কার্যে তেমন শৃঙ্খলা ছিল না—এক দলের সহিত অপর দলের পারস্পরিক সহযোগিতার ছিল একান্ত অভাব। এইভাবেই কিছুদিন ধরিয়া বাংলা দেশে কিছু কিছু বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বরোদার রাজ-কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। বহুদিন বিলাতে কাটাইয়া আসিয়া উচ্চ কার্যে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। অরবিন্দ বরোদায় যাওয়ার পূর্ব হইতেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে একজন তরুণ বাঙালী উক্ত রেঞ্জে সেনা-বিভাগে কাজ করিতেছিলেন। সেখানেই অরবিন্দের সহিত যতীন্দ্রের পরিচয় হইল। পুণার ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত বিপ্লব-প্রতিষ্ঠান হইতে অরবিন্দ বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তিলকের সহিতও তাঁহার সংযোগ স্থাপিত হয়। অরবিন্দের নিকট হইতে লীলা দেবীর নামে একখানি পত্র লইয়া বরোদার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারী কার্য ত্যাগ করিয়া ১৯০২ সালে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলায় আসিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় বিপ্লব প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা। যুবকদের অন্যতম প্রধান নেতা ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্রের সহায়তায় তিনি হুকিয়া ষ্ট্রীট থানার নিকটে ১০২ নং সার্কুলার রোডে একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন।

ইহার পর যতীন্দ্রনাথ বাংলায় বিপ্লবের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কার্যরত বহু গুপ্ত-সমিতির দ্বারা বহু সদস্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতেছে: বাঙ্গালীরা যদি উপযুক্ত সময়ে তাহাদের ন্যায় প্রস্তুত হইতে না পারে, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতে যোগ্য স্থান ও মর্যাদা লাভে তাহারা সক্ষম হইবে না। সর্বভারতীয় বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য অবিলম্বে তাহাদের প্রস্তুতি আবশ্যক। অরবিন্দ শীঘ্রই বাংলায় আসিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব লইবেন বলিয়াও তিনি ঘোষণা করিলেন।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলায় আসার কয়েক মাস পরে অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষও ১৯০৩ সালের প্রথম দিকে বাংলায় আসিলেন। তাঁহারও আগমন ঐ একই উদ্দেশ্যে। অরবিন্দও ঐ সালে একবার বাংলায় আসিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার সেবা-সংঘ হইতে অভিজ্ঞ সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত, কারণ বিন্দুমাত্র অসাবধানতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টা পণ্ড হইয়া যাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা বর্তমান ছিল। লোকের মনে বিপ্লববাদ জাগাইয়া তুলিবার জন্য বিপ্লবাত্মক নানাবিধ পুস্তিকাও প্রচারিত হইতে লাগিল।

বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কীয় একটি ঘোষণার ফলে যেন বিপ্লবীরা এই সময় অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠিল।

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

প্রদেশসমূহ অপেক্ষা বাংলা প্রদেশই শিক্ষা-দীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী এবং বাংলা দেশ হইতে উচিত দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই সমগ্র ভারতবর্ষ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করিতেছে। সুতরাং ভারতে যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে সুদৃঢ় বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুর্ব্বল করিয়া ফেলা আবশ্যক। এই সাধু সঙ্কল্প অন্তরে লইয়াই বাদু রক্ষণশীল লর্ড কার্জ্জন বড়লাট হইয়া আসিয়াছিলেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা তখন এক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামকে একত্রিত করিয়া আর একটি নূতন বঙ্গ প্রদেশ সৃষ্টির অভিপ্রায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কার্জ্জন সর্ব্বপ্রথম ব্যক্ত করিলেন। এই সর্ব্বনাশা প্রস্তাব শুনিবামাত্র দেশের জনসাধারণ যেন চকিত হইয়া উঠিল। বৃটিশ কূটনীতিবিদ্‌গণের এই নূতন চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং প্রায় সকলেই একবাক্যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন ; কিন্তু এত বিরোধিতা সত্ত্বেও লর্ড কার্জ্জন তাঁহার দুর্জ্জয় জিদ ত্যাগ করিলেন না। এ দেশের জনমতের বিন্দুমাত্র মূল্য তাঁহার নিকট ছিল না। তিনি ছিলেন সর্ব্বপ্রকার প্রগতি ও স্বাধীনতার বিরোধী। ভারতীয়দিগকে দমন করিয়া খর্ব্ব করাই তাঁহার মূল নীতি ছিল। তাঁহার আমলে ১৯০৪ সালে নূতন আইন রচনা করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। ১৯০৪ সালে তিনি নূতন আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। নূতন পুলিশ আইনে তিনি পুলিশ-বিভাগের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাঁহারই দ্বারা গোয়েন্দা বিভাগের সৃষ্টি হয়।

লর্ড কার্জ্জনের মতে ভারতবাসীরা ছিল উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কেবলমাত্র ভারতবাসীদিগকেই নহে—সকল এশিয়াবাসীকেই তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ১৯০৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় তিনি এশিয়াবাসীদিগকে প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও অসৎ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সুতরাং এ যেন বাস্তবিক কার্জ্জনের নিকট বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ করিয়া বিশেষ ফললাভের আশা দুরাশা মাত্র। পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমানদিগকে বুঝান হইতে লাগিল যে, এই বিভাগ দ্বারা তাহাদের অত্যন্ত সুবিধা হইবে।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবে ভারত-সচিব সম্মতি দান করেন এবং ১৬ই অক্টোবর এই কার্য্যকরণ সংঘটিত হইবে বলিয়া ঘোষিত হইল।

এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণায় দেশবাসী বুঝিতে পারিল যে, দুঃখের কথায় আর কোনও কাজ হইবে না—হাতে-কলমে অচিরেই কিছু করা দরকার। ভারত-শাসনের ব্যাপারে বৃটিশের ভেদ-নীতির আসল রূপ আর একবার যেন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীরা মনে করিয়াছিলেন, বাংলার এই অপমানকে জাতীয় কংগ্রেস একটি সর্ব্ব-ভারতীয় ব্যাপার এবং সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহা হইল না। আবেদন-নিবেদনের সহজ সরল পন্থা ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দায়িত্ব লইতে নরমপন্থীরা প্রস্তুত ছিলেন না। কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে ইহা লইয়া মত-বৈষম্য প্রকট হইয়া উঠিল এবং ১৯০৬ সালের কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া দুই দলে বেশ একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। তখনকার চরমপন্থীদের মধ্যে লোকমান্য তিলক, পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়, কৃষ্ণ বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশেষে নরমপন্থীরা একটা বিটবাটের আশায় সর্ব্বজনমান্য নেতা দাদাভাই নৌরজীকে বিলাত হইতে লইয়া আসিলেন এবং ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনিই উঁহাদের সভাপতিত্ব উক্ত অধিবেশনে ভারতবাসীদের অধিকার সম্বন্ধে সেইবারই সর্ব্বপ্রথম ঘোষিত হয়—স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার। প্রয়োজন হইলে হাতিয়ারের "বয়কট আন্দোলন" চালান যাইতে পারিবে বলিয়াও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

মাদ্রাজ সভা-সমিতিতে ইহার পরই আরম্ভ হইল তীব্র ভাষায় বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল সমগ্র দেশময় যেন আগুন জ্বালাইতে লাগিলেন। স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন দানা বেঁধে অল্পদিনেই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। প্রতিবাদস্বরূপ নানা স্থানে হরতালও পালিত হইতে লাগিল।

দুইটি আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাও এই সময় জনগণের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে বুয়রদের সাফল্য এবং ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে বৃহৎ রাশিয়ার পরাজয় তাহাদের মনে প্রেরণা সঞ্চারে সহায়তা করে।

নেতৃগণ এই সময় উপলব্ধি করিলেন যে, বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। এই বিষয়ে ডাঃ তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীঅরবিন্দ হইলেন অগ্রণী। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ইত্যাদির অর্থানুকূল্যে ইহার পর National Council of Education প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অরবিন্দ বরোদা রাজ্যের মোটা মাহিনার চাকুরী ত্যাগ করিয়া অতি অল্প বেতনে ইহার অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিয়া ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে বাংলায় আসিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইল, তাহা ক্রমশঃ একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ লইয়া জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইতে লাগিল। বিপ্লবীদেরও ইহাতে অনেকটা সুবিধা হইল। এই একান্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের পশ্চাতে তাহারা আত্মগোপন করিয়া গুপ্ত বিপ্লবের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে লাগিল। এইবারের আন্দোলনে ছাত্রসমাজই বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিল এবং এই ছাত্রসম্প্রদায় হইতেই বিপ্লবীরা প্রথমতঃ লোক ও কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে লাগিল। ছাত্রদিগকে দমন করিবার জন্য তাহাদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয় এবং যাহারা অপরাধকারীদিগকে যোগাযোগ করা অথবা স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া চলিতে থাকে। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিবার উদ্দেশ্যে বিপুল বল-আওয়ার ঘোষণা

হইল এবং হিন্দু মুসলমান সন্ধীতির চিহ্ন-স্বরূপ রাখী-বন্ধন উৎসবের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামের নূতন লেঃ গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সকলকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া ঘোষণা করিলেন, আন্দোলন দমন করিবার জন্য "bloodshed may be necessary" এবং প্রকাশ্যে "মন্ত্রেমাতরম্" ধ্বনি করা আইনতঃ দণ্ডনীয় করিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় "যুগান্তর" দল এবং ঢাকায় "অনুশীলন-সমিতির" প্রভাব ছিল খুব বেশি। "অনুশীলন-সমিতি" প্রতিষ্ঠার একটু ইতিহাস আছে। বিপিন পাল ও ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র (পি. মিত্র) একবার ঢাকায় গিয়াছিলেন। পি. মিত্র ছিলেন সর্ব্বদাই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষপাতী। সেখানে পরামর্শের পর একটি বিপ্লবী দল স্থাপিত হয় এবং উকিল আশুতোষ সেনগুপ্তের অধিনায়কত্বে ও পুলিনবিহারী দাসের পরিচালনায় "অনুশীলন সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। পি. মিত্রের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতাতেও "অনুশীলন-সমিতি" গঠিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর "অনুশীলন" প্রবন্ধ হইতেই নাকি সমিতির ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। অপরপক্ষে শরিবাবু শরৎচন্দ্রের "যুগান্তর" নামক উপন্যাসের নাম হইতে তাঁর বিপ্লবী দলটির নামকরণ হইয়াছিল "যুগান্তর"।

যে সকল পুস্তিকা এই সময় বিপ্লবীদের মধ্যে প্রচারিত হইত, তাহার কয়েকখানির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ লিখিত "ভবানী-মন্দির" ও "No compromise," নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভেটকৃষ্ণের "দেশের কথা" ও "মুক্তি কোন্ পথে" এবং "বর্ত্তমান রণনীতি" ইত্যাদি পুস্তিকাসমূহ বিপ্লবীরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। "আনন্দ-মঠ" এবং "দেবী চৌধুরাণী" প্রভৃতি বিপ্লবীদিগের প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কাহিনী বিপ্লবীদিগকে একই প্রভাবিত করিয়াছিল, যে এই সময়কার বহু বিপ্লবীও সন্ন্যাসীর বেশ-ভূষায় বিপ্লবের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইত এবং ঐরূপ বেশেই অনেকেই পুলিশের হাতে ধরাও পড়িয়াছিল। বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ বিপ্লবীদের মনে জাগাইয়া তুলিত বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস।

বিপ্লববাদকে সমর্থনকারী কতকগুলি সাময়িক-পত্রেরও এই সময় উদ্ভব হইয়াছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় "সন্ধ্যা", অরবিন্দ "মন্ত্রেমাতরম্"এ এবং বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি "যুগান্তর" পত্রিকায় সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে বাঙালীদের এই জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রভূত দমন-নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। সুপ্রাচীন বিভেদ-নীতিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হইল। ১৯০৬ সালে যখন দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতেছিল, তখন ঢাকার নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদ-ভবনে স্থির হইতেছিল মুসলিম লীগ। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করা হইল; চতুর্দ্দিকে ইহা প্রচারিত হইল যে, হিন্দু-দলের পশ্চাতে মুসলমানদের প্রতি ভারত-সরকারের সমর্থন আছে এবং হিন্দুদের দোকান-পত্র লুটন ও বাড়ী-ঘরে (বিশেষ করিয়া বিধবা) সরকার শাস্তি দিবে না। সমগ্রটির পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নির্লজ্জের মত প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিলেন—মুসলমানগণ তাঁহার "দুলোরাণী"।

ফল যাহা হইবার—তাহাই হইল। প্রভূত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় কিছের করিয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ কিছুদিন যাবৎ বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন পাল প্রভৃতি নেতারা ইহাতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন "Purification by blood and fire"—রীতিতে বিশ্বাসী। ইহা ব্যতীত যে দেশের স্বাধীনতা আসিতে পারে না—তাহা তিনি জানিতেন। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাদিতে তিনি লিখিলেন—"If our people do not lift their finger or court death when seeing women violated before their eyes, they have morally ceased to exist. Long subjection has crushed the soul and left the mere corpse."

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সুযোগে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও পীড়নের মাত্রা বর্দ্ধিত করিলেন। বিপিনচন্দ্র প্রচার করিতে লাগিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী। দাদাভাই নৌরজীর ব্যাখ্যাত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের পরিবর্ত্তে, ইংরাজ-বণিকের পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের স্বাধী বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন; সুতরাং তাঁহার মতে কেবল বিদেশী দ্রব্য বয়কট করিলেই চলিবে না, বিদেশী শাসনকেও সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা চাই।

১৯০৭ সালে গভর্ণমেণ্ট সংবাদ-পত্র দলনে উৎপর হইলেন। ঐ সালের ২০শে জুলাই তারিখে "যুগান্তর"-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহার মাত্র কিছু দিন পরেই দুইটি অনুরূপ প্রবন্ধ "মন্ত্রেমাতরম্" পত্রিকায় প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই মামলা পরিচালনার ভার পড়িল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপর এবং বিপিন পাল ছিলেন এই মামলায় একজন সাক্ষী। আদালতে বিপিনবাবু কোনও প্রশ্নের উত্তর দানে স্বীকৃত না হওয়ায় মামলা ফাঁসিয়া গিয়া অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন। বিপিনবাবু কিন্তু রেহাই পাইলেন না। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁহার ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

বিপিনবাবুকে কারাদণ্ড প্রদানের দিন জনৈক গোরা পুলিশ কর্ম্মচারী আদালতে সমবেত জনসাধারণের কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়া ঘুসি মারে। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুশীল সেন নামক একটি অল্পবয়স্ক বালক উত্তেজিত হইয়া ঐ কর্ম্মচারীকে পাল্টা ঘুসি মারিয়া বসে। কলিকাতার তৎকালীন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড উক্ত অপরাধে বালকটির প্রতি ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন।

১৯০৭ সালের শেষভাগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদিত

"সন্ধ্যা" পত্রিকায় "ঢেঁকে দেছি প্রেমের বান" নামক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। আদালতে ব্রহ্মবান্ধব ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বিলাতের সিভিল যুদ্ধের সময় তিনি যে সাহায্য দান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জন্য কোনও বিদেশী সরকারের নিকট কোনও কৈফিয়ৎ তিনি দিবেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহাকে জেলে দেওয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত এবং মামলায় তিনি কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। মামলা বিচারাধীন থাকা কালেই তিনি অস্ত্রোপচারের পর ব্রহ্মবান্ধব পরলোকগমন করেন। তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া সরাই ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সাধ্যে কুলায় নাই।

১৯০৭ সালের ১লা ডিসেম্বর রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা-দমন-আইন প্রবর্তন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন ও সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ভারত-সচিব মর্লি এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণায় জানাইলেন,—"The Government have been obliged to take measures of repression; they may be obliged to take more."

কলিকাতার রাষ্ট্রিকতলা অঞ্চলে মুরারীপুকুর বাগানে একটি বড় রকমের গুপ্ত বিপ্লবী-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেবব্রত বসু (কানুদেবা), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র বসু, উল্লাসকর দত্ত ইত্যাদি সেবাশ্রম এই কেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দেবব্রত বসু ছিলেন মেদিনীপুরের একজন বিপ্লবী এবং তিনি ১৯০৬ সালে ক্লাসে গিয়াছিলেন বোমা তৈয়ারীর কৌশল আয়ত্ত করিতে। ১৯০৮ সালের প্রথম দিকেই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া মুরারীপুকুর বাগান কেন্দ্রে যোগদান করেন। চন্দননগর ও রাজাবাজারেও বোমার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারী এবং পিস্তল ও রিভলবার সংগ্রহ পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল।

এ দেশের জনমতকে উপেক্ষা করিয়া বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে ঘোষণায় ইতিপূর্ব্বেই যেন বাংলার যুব-শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছিল। তাহার উপর চলিতেছিল 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'র মত মধ্যে মধ্যে পাষণ্ড-দণ্ডাদেশের হুজোক্তি। অত্যাচার-উৎপীড়নও ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছিল। সমগ্র পরিস্থিতিটাই বিপ্লবীদের নিকট দুর্বিষহ হইয়া দাঁড়াইল। সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ এবং বক্তৃতা-দমন আইনের দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের উপায়ও অবশিষ্ট ছিল না। অন্তরাত্মার যুব-শক্তি তখন রক্তদান ও রক্তপাতের বিপ্লব-মন্ত্রই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

১৯০৬ সাল হইতেই পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসামের অত্যাচারী জোট লাট ফুলার সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা চলিতেছিল, কিন্তু সাফল্যলাভ সম্ভব হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনার অন্যতম প্রবর্ত্তক ও সমর্থক ছিলেন বিহার পশ্চিম হুগলীর জোট লাট স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার। বিপ্লবীদের রোষটা তাহার পর তাঁহারই উপর পড়িল। ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে চন্দননগরের বিখ্যাত উল্লাসকর দত্তের তৈয়ারী বোমায় তাঁহার ট্রেণ উড়াইয়া দিবার প্রথম চেষ্টা হইল। সে চেষ্টা সফল হইল না। জোট লাটের ট্রেণ ধ্বংসের দ্বিতীয় চেষ্টা হইল ১৯০৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে। ঐদিন তিনি ট্রেণে চাপিয়া মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। নারায়ণগড় ষ্টেসনের নিকটে বিপ্লবীরা ট্রেণের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া উহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিল। বোমার আঘাতে ট্রেণের কয়েকখানি বগী লাইনচ্যুত হইয়া গেলেও ফ্রেজার সে যাত্রাও রক্ষা পাইলেন।

এই ব্যাপারে সাক্ষ্যের অপরাধীদিগকে ধরিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয় এবং বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারে রেল ও জলপথ বন্ধ করিয়া চাপা দিবার জন্য অবশেষে অনেকগুলি কুলীকে ধরিয়া স্বীকারোক্তি করাইয়া তাহাদের বন্ধ দেওয়া হয়।

ঐ সালেই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকার পূর্ব্বতন ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে হত্যা করিবার জন্য খোয়াসপুর ষ্টেসনে বিদায় দেওয়ার উপর রিভলবারের গুলি নিক্ষিপ্ত হইল—কিন্তু সে চেষ্টাও হইল ব্যর্থ। মুক্তিদাতা ডিসেম্বর সাহেবের উপর ইহার পর বিপ্লবীরা গুলিবর্ষণ করে। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে বাংলার জোট লাটের ট্রেণ ধ্বংস করিবার জন্য আর একবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা হইল।

চন্দননগরের মেয়র মঃ তাভিচিলি চন্দননগরে অবৈধ-সভার অনুষ্ঠানে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেন এবং ফরাসী চন্দননগরে অস্ত্র-আইন না থাকায় বিপ্লবীদের অস্ত্র-সংগ্রহের যে সামান্য সুযোগ ছিল, তাহা একটি অস্ত্র-আইন পাশ করিয়া রহিত করিয়া দেন। ইহার ফলস্বরূপ চন্দননগরের মেয়রের বুকে ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রিল বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। শিবপুরে একটি অবৈধ ডাকাতিও এই মাসেই অনুষ্ঠিত হয়।

মিঃ কিংসফোর্ডের উপর বিপ্লবীদিগের ক্রুদ্ধ বহুদিন হইতেই সঞ্চিত ছিল। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিবার সময় হইতেই একজন অসমসাহসিক বিচারক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তখনকার দিনের বহু রাজনৈতিক মামলার বিচার তাঁহার এজলাসেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল এবং অভিযুক্তরা প্রায়ই কঠোর দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইত। "যুগান্তর", "বন্দেমাতরম্" এবং "সন্ধ্যা" পত্রিকার মামলার তিনিই ছিলেন বিচারক। রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ব্যক্তিদের তাঁহার নিকট প্রায়ই বেত্রদণ্ড লাভ করিতে হইত। সুশীল সেন নামক একটি অল্প বয়স্ক বালকের বেত্রদণ্ড লাভের কাহিনী পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সকল কারণে বিপ্লবীরা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। ১৯০৮ সালের প্রথম দিকেই মিঃ কিংসফোর্ড বদলী হইয়া মজঃফরপুরে যান; সেখানে গিয়াও তিনি কিন্তু রেহাই পাইলেন না—বিপ্লবীরা সেখানেও তাঁহার পিছু লইল। মিঃ কিংসফোর্ডের হত্যা-প্রচেষ্টায় যে দুইটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, তাঁহাদের কথা এখানে কিছু বলা যাইতেছে। সে দুইটি বোমা শহীদ প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসুর।

(ক্রমশঃ)

মিস্টার সিন্হা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চশমা-পরা ভদ্রলোকটি তখন ছেলেদের বিদায় করে দিয়ে গভীর মনোযোগে খাতার পাতা উলটে উল্‌টে কী দেখছিলেন। পরিমল সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ না তুলেই বললেন—হুঁ, কী বই?

পরিমল হেসে উঠল: বই নয় ক্ষিতিশদা, মানুষ।

—মানুষ—অ্যাঁ?—ক্ষিতীশদা এবারে চোখ তুললেন, বললেন, ও পরিমল? বেশ, বেশ। তার পর, সঙ্গে এ কাকে এনেছ? কোনোদিন দেখিনি তো একে—বন্ধু নাকি তোমাদের?

—হ্যাঁ, আমার বন্ধু রঞ্জন চ্যাটার্জি। মেম্বার হবে।

—মেম্বার হবে? বেশ বেশ।—ক্ষিতীশদা সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের এক পাশ থেকে একখানা রসিদ বই টেনে আনলেন: ভর্তি কী আট আনা, আর এ মাসের চাঁদা দু আনা—এই দশ আনা লাগবে।

পরিমল এবারে জোরে হেসে উঠল: আচ্ছা মানুষ তো আপনি ক্ষিতীশদা। খালি বই আর চাঁদা, চাঁদা আর বই। ওকে নিয়ে এলাম কোথায় আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি কাবলীওলার মতো চাঁদা চেয়ে বসলেন।

—ওহো, তাও তো, তাও তো—

যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন ক্ষিতীশদা। বললেন, বোসো, বোসো, ওই টুলদুটো টেনে নিয়ে বোসো দুজনে। বেশ বেশ।

বোঝা গেল বেশ বেশ কথাদুটো ক্ষিতীশদার মুদ্রাদোষ। ওরা বসতেই তিনি কেমন শান্ত আর নিরীহ চোখে চশমার মধ্য দিয়ে ওদের দিকে তাকালেন। কিছু একটা বলতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটা উত্তেজিত উগ্র কণ্ঠস্বরে থেমে গেলেন তিনি, পরম বিরক্তিভরে ভ্রূকুটি করে তাকালেন আর একদিকে।

'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাঠক সেই ছেলেটি। পড়তে পড়তে তার উৎসাহ যেন আর বাগ মানছে না। গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে বক্তৃতার ঢংয়ে শুরু করেছে:

'সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এ শিক্ষা আমরা ভুলব না। ভুলব না জাতির প্রাণশক্তির এই অকারণ অপব্যবহার। মহাত্মা গান্ধীর ভ্রান্ত নেতৃত্ব দেশকে দিনের পর দিন কাপুরুষতার পথেই ঠেলে দেবে। I have committed a Himalayan blunder বলে যিনি আজ নিজের অপরাধের বোঝা হালকা করতে চাইছেন—

—ওরে থাম্ থাম্, কানের পোকা তাড়িয়ে ছাড়লি যে ঘণ্টু!

ঘণ্টু থামল। বললে, খুব জোর লিখেছে কিন্তু ক্ষিতীশদা।

—জোর লিখেছে বলেই অত জোরে জোরে পড়তে হবে নাকি? একটু মনে মনে পড় বাপু, ঝালাপালা করে দিলি যে।

ঘণ্টু মনে মনে পড়ল না বটে, কিন্তু স্বর নামিয়ে নিলে। আর ক্ষিতীশদা লোকটিকে বেশ লাগল রঞ্জুর—যেমন নিরীহ, তেমনি গোবেচারা। ইস্কুলের ড্রয়িং মাষ্টার ড্রয়িং মাষ্টার ভাব, তরুণ সমিতির এই আগ্নেয় আর উগ্র পরিবেশের ভেতরে কেমন যেন আকস্মিক আর বেমানান বলে বোধ হয় তাঁকে।

ক্ষিতীশদা পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে এক টান টেনে নিলেন। বললেন, কী নাম বললে যেন? রঞ্জন চ্যাটার্জি, না?

—হুঁ—রঞ্জুর হয়ে পরিমল জবাব দিলে: ও ভারী বই পড়তে ভালোবাসে। আপনাকে ভালো বই দেখে দিতে হবে।

—তা দেব, নিশ্চয়ই দেব। বেশ বেশ। অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী আছে, ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধ আছে—

—আঃ, আপনি একেবারে হোপ্‌লেস ক্ষিতীশদা।

ক্ষিতীশদা নস্যির আমেজে সর্দি টানার মতো একটা আরামের শব্দ করলেন নাকে।

—আমি একেবারে হোপ্‌লেস? বেশ বেশ। তা ওসব বই পছন্দ না হলে অন্য জিনিসও আছে—মেঘনাদবধ, কৃষ্ণ-সংহার—

—উঃ, ক্ষিতীশদা থামুন। আপনি যে কেন মধুসূদনের যুগে জন্মাননি তাই ভাবি। ওসব ছাড়া একালে বুঝি আর পড়বার মতো বই নেই কিছু?

—একাল?—ক্ষিতীশদা একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন: ওই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র? ওদের লেখা আমি পড়ি না, ওরা লিখতেই জানে না। যাই বলো, বঙ্কিম বিবেকানন্দের পরে বাংলা দেশে সাহিত্য বলে আর কিছু লেখাই হল না।

এমন করে কথাটা বললেন ক্ষিতীশদা যে, পরিমলের সঙ্গে রঙ্কুও হেসে উঠল এবারে। আচ্ছা মজার মানুষ তো। তরুণ-সমিতির মতো কড়া লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হয়েও একেবারে সেকালে পড়ে আছেন—আশে পাশে সমস্ত পৃথিবীটাই যে বদলে যাচ্ছে দিনের পর দিন, খেয়ালই করেননি সেটা।

—হয়েছে, থাক—সদয়ভাবে পরিমল বললে, আপনাকে আর সাহিত্য-চর্চা করতে হবে না। কিন্তু আজ তো রঙ্কু চাঁদা আনেনি, কাজেই আমার কার্ডেই ওকে দুটো বই দিন।

—তোমার কার্ডে? তা বেশ বেশ।—ক্ষিতীশদা বড় খাতাটার পাতা উল্‌টে চললেন: কোনো বই-টই ইস্যু করা নেই তো?

—না, দেখুন না—

—খাতাটা উল্‌টে পাল্‌টে নিশ্চিন্ত হলেন ক্ষিতীশদা: বেশ, বলো কী বই নেবে?

পরিমল ক্যাটালগ খুলে চোখ বুলোতে লাগল।

—এটা আছে? শরৎচন্দ্রের 'তরুণের বিদ্রোহ?'

—না, ইস্যুড্।

—বাগীশ্রের আত্মকাহিনী?

—ওটাও বাইরে।

—নির্বাসিতের আত্মকথা?

ক্ষিতীশদা একটা হাই তুলে বললেন, দিলীপ নিয়ে গেছে।

—ধ্যেৎ, ভালো বইগুলো সব বাইরে।—পরিমল বিরক্ত গলায় বললে, এটা—সিন্‌ক্লিন্?

—হুঁ, আছে।

—থাক, মন্দের ভালো। আর এটা পাওয়া যাবে—বিমল সেনের 'মা?'

—এইমাত্র ফেরৎ এল। একটু দেরী হলে আর খেতে না।

বই দুটো নিয়ে পরিমল বললে, নে রঙ্কু।

বাঃ, তুই নিবি না একখানাও?

—আমার ওসব পড়া।

ক্ষিতীশদা আবার একটা হাই তুললেন, তারপর আর এক হাতে তুড়ি বাজিয়ে বাড়িয়ে নিলেন নিজের আয়ুটাকে। অলস্তই গলায় বললেন, কী যে সব বাজে বই পড়—কিছু হয় না। তার চাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ-চরিত্র' নিয়ে যাও, পড়লে কাজ হবে।

—ও জ্ঞানটা আপনার জন্যেই তোলা থাকল ক্ষিতীশদা—পরিমল খোঁচা দিলে।

—আমার জন্যে? তা বেশ বেশ। কিন্তু আজ-কালকার ছেলেদের দোষই এই—ভাল কথা কানে নিতে চায় না।

—হুঁ—দুঃখের কথাই বটে—সায় দিয়ে পরিমল বললে, চল রঙ্কু, এবার জিমনাস্টিক ক্লাবের দিকে যাওয়া যাক।

—জিমনাস্টিক ক্লাবে—এক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে নিলে রঙ্কু: কিন্তু আজ আর নয় ভাই। মাকে মিথ্যে কথা বলে চলে এসেছি, দেরী করে গেলে ধরা পড়ে যাব নিশ্চয়।

—তাও বটে। কিন্তু করুণাদির সঙ্গে দেখা করবি না একবার? তোকে যেতে বলেছিলেন কিন্তু।

করুণাদি! সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন আবেগে আর আগ্রহে আকুল হয়ে উঠল। মায়ের মতো সেবা করেছিলেন, দেহ-ঝরা নরম আঙুল আহত কপালে বুলিয়ে দিয়ে যেন সমস্ত যন্ত্রণা তার মুছে নিয়েছিলেন। কী আশ্চর্য ভাবে তুলন দেখা দিয়েছে কিশোর রঙ্কুর জীবনের

দিকচক্রে। একজন মিতা, আর একজন করুণাদি। অতটুকু ছোট মেয়ে মিতা, বয়েসে তো তারই সমান, তবু মিতাকে কেমন ভয় করে—কেমন যেন নিজেকে অপ্রস্তুত আর বিপন্ন বলে বোধ হয় ওর সামনে দাঁড়ালে। আর করুণাদি। প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে মনের, ছোড়দির মতো চেহারা, মায়ের মতো মন।

ক্ষিতীশদাকে নমস্কার জানিয়ে রঙ্কু উঠে পড়ল। ক্ষিতীশদা বললেন, চললে, বেশ বেশ। আবার কাল এসো। আর মনে করে ছয় আনা পয়সা এনো, আট আনা ভর্তি ফী, আর দু আনা চাঁদা।

—উঃ, কী দুর্দান্ত লাইব্রেরীয়ান! এর চাইতে কাবলীওলাও ভালো।

ক্ষিতীশদা জবাবে এক মুখ প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

পথে বেরিয়ে রঙ্কু বললে, অনেক বই আছে তো লাইব্রেরীতে।

—তা মন্দ নয়, আরো বাড়বে—অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলে পরিমল।

পথ চলতে চলতে হাতের ছুটো দেখছিল রঙ্কু। জিজ্ঞাসা করলে, সিন্‌কিন্ কী ভাই?

—পড়েই ভাখ না। তোর ওই দোষ রঙ্কু, ভারী অধৈর্য।

বেণুদার বাসার দরজায় কড়া নাড়ল পরিমল।

—কে?

তীক্ষ্ণস্বরে সাড়া এল বাইরের ঘর থেকে। বেণুদার গলা।

পরিমল সবিস্ময়ে বললে, ব্যাপার কী, বেণুদা এখনো ক্লাবে যাননি?

—কে?—আবার সাড়া এল তীক্ষ্ণ গলায়।

—আমি পরিমল, আর রঙ্কু।

—ওঃ, একটু দাঁড়াও।

মিনিট তিনেক চুপ চাপ বাইরে দাঁড়ানোর পর দরজা খুলে গেল। বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বেরুল তিন চারজন ছেলে, ওরা এতক্ষণ কিছু আলোচনা করছিল ওখানে। ওদের দুজনকে চিনল রঙ্কু, নিয়মিতই ক্লাবে দেখেছে। বাকী দুজন একেবারে অচেনা। নীরবে বেরিয়ে এল ওরা, কোনোদিকে তাকালো না, হন হন করে এগিয়ে চলে গেল।

বেণুদা বললেন, এসো, ভেতরে এসো।

সেদিন শোবার ঘর দেখেছিল, আজ দেখল বাইরের ঘর। ঘরে চেয়ার টেবিল নেই, চওড়া খাটে ময়লা চাদর পাতা। কিন্তু খাটটা দেখে বোঝা যায় আর যাই হোক ওর ওপরে কেউ শোয় না, কারুর শোয়াও চলে না। রাশি রাশি বই আর খবরের কাগজ। খাটের বাজো আনী বইতে ঢাকা, কতক ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। ঘরের একদিকে হেলান দেওয়া পিতলের তার দিয়ে গিটে গিটে বাঁধানো কালো কুচকুচে একখানা অস্তিকার লাঠি। দেওয়ালে একটা হকের সঙ্গে ঝকঝকে উজ্জ্বল একখানা তোয়ালে ঝুলছে।

বইয়ের স্তূপ সরিয়ে বেণুদা ওদের বসতে দিলেন। কিন্তু প্রসন্নমুখ বেণুদার আজকের চেহারা দেখে দুজনেই চমকে উঠল একসঙ্গে। বেণুদার চোখে কেমন একটা লালের আভা—আগুনের দীপ্তির মতো কী যেন ঝকঝক করে খেলে যাচ্ছে সেখানে। চাপা দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, পেশীর নাচে দুলে দুলে উঠছে চওড়া বুকটা। যেন এই মাত্র খানিকটা কঠিন পরিশ্রম করেছেন তিনি—সমস্ত বুকে একটা তীব্র উত্তেজনা অনঅন করছে।

—কী হয়েছে বেণুদা?

—উঁ? বেণুদা তীক্ষ্ণ চোখে পরিমলের দিকে তাকালেন।

—কী হল?

গভীর একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে বেণুদা বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

মুখের চেহারা বদলে গেল পরিমলের। দরজা বন্ধ করবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল, আর সেই সঙ্গে কেমন তির্যকভাবে তাকালো রঙ্কুর দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল রঙ্কু। কোনো বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, সে কথার ভেতরে তার থাকা উচিত নয়। অতএব—

রঙ্কু সূক্ষ্ম অভিমান নিয়ে উঠে দাঁড়ালো: আচ্ছা, আমি বাইরে যাচ্ছি।

—দরকার নেই—বোসো।

মৃদু বিস্ময়ে পরিমল বললে, ও থাকবে?

—থাকুক।

চোখের কোণা দিয়ে পরিমল ইঙ্গিত করলে রঞ্জুকে। ভাবটা বুঝতে পারা গেল। রঞ্জু ভাগ্যবান, পরীক্ষার প্রথম ধাপটা সে অত্যন্ত সহজেই পার হয়ে গেছে।

কল্পনাদির কথা রঞ্জুর মনে বাধা চাড়া দিচ্ছিল—প্রশ্নও জেগেছিল। কিন্তু এখানে এসে স্বাভাবিক একটা সংকোচ বোধ হচ্ছে তার। তাছাড়া বেণুদার মুখের এই থমথমে ভাব, এই কঠিন গাম্ভীর্য তাকে বিহ্বল করে ফেলেছে। ঠিক এই রকম মুখের চেহারা সে দেখেছিল অবিনাশবাবুর—যেদিন তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যেই যেন তাঁর চড়াইয়ের নৌকো ভাসিয়েছিলেন বানে ভাসা আত্রাইয়ের ঘোলা স্রোতে। আর সেই রাত্রি—যেদিন উঠোনে শুকনো কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব করেছিলেন বাবা—আগুনের শিখাগুলো থেকে থেকে তাঁর শ্বেত পাথরে গড়া প্রাণহীন মূর্তির মতো চেহারার ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে খেলা করে ফিরেছিল।

বেণুদা বললেন, চট্টগ্রামের খবর শুনেছ?

—চট্টগ্রাম!

—হ্যাঁ, চট্টগ্রাম। শোনোনি?

—না তো। কী হয়েছে?—বিস্ময় আর উদ্‌গ্রীব শোনালো পরিমলের স্বর।

—কাগজে এখনো কিছু বেরোয়নি—তেমনি চাপা দ্রুত নিশ্বাস পড়তে লাগল বেণুদার: কাগজে কিছু বেরোয় নি, গবর্নমেণ্ট বেরুতে দেয়নি এ সংবাদ। কিন্তু মোহিনী এসেছে চাঁদপুর থেকে, সেই বললে।

—কী বললে?

—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগুন প্রথম চট্টগ্রামেই জ্বলল। ওরাই দেশকে পথ দেখাল। অথচ আমরা পেছনে পড়ে রইলাম, কিছুই করা গেল না।

ওরা দুজনে বেণুদার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

—বাঘা যতীনের নাম ওরা রাখল। ওরাই দেখালো কেমন করে স্বাধীনতা আনতে হবে। আজ তাদের সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষ যদি তার প্রাণে প্রাণে সাড়া দিতে পারত, তাহলে হয়তো একদিনেই ভারতবর্ষ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পথ পেতনা।

বেণুদার কথা থেকে যেন একটা অজ্ঞাত আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল রঞ্জুর মনে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না অথচ তার সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। ঝড় আসবার আগে যেমন আকাশের এক কোণায় খানিকটা নিকষ কালো মেঘ ঘোষণা করে তার অনিবার্য সূচনা।

আকুল স্বরে পরিমল বললে, সবটা খুলে বলুন বেণুদা—

—বলছি—

বেণুদা বলতে শুরু করলেন। এ সেই আকাশ গঙ্গার ইতিহাস—রঞ্জুর কল্পনার ছায়া-পথের এক অপূর্ব কাহিনী। কিন্তু কোথায় লাগে এর কাছে শহীদ সত্যেন, ক্ষুদিরাম আর কানাইলাল। ফাঁসির ডাকে যে আগুন-ঝরা আহ্বান—সে আহ্বানের চাইতেও লক্ষ্য গুণ প্রখর হয়ে এ ডাক কানে এল যেন কামানের গর্জনের মতো। আকাশগঙ্গার ছায়াপথে জ্যোতির্ময়তা নয়—সেখানে আগুনের উত্তাল তরঙ্গ উঠছে। তিরিশ সালের বন্যা নয়, উনিশ শো তিরিশ সালে সত্যাগ্রহের প্রাণ বন্যাও নয়, এ যা এল তার নাম প্রলয়।

চরের আলোয় আর শিওলের গর্জনে মুখরিত হল অস্ত্রাগার। শান্তি অধিনায়ক রিভলভার হাতে বিপ্লবীদের বাধা দিতে এলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই ফুলফুস ছিঁড়ে বুলেট গেল বেরিয়ে, বাধা দেবার আশা মিটে গেল তাঁর। তারপর সমস্ত রাত্রি ধরে সহরের বুকের ওপর চলতে লাগল স্বাধীনতার শিকল-ভাঙা তাণ্ডব। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, উলটে গেল রেলপথ। পলাশীর পরের পর আর সিপাহী বিদ্রোহের ভুলের পর এই আবার নতুন করে জাগল আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বীর্যবান বিপুল ভারতবর্ষ—জাগল তার প্রাণশক্তি। এক রাত্রের মধ্যে চট্টগ্রামের বুকের ওপর থেকে পরাধীনতার কালো অপমান মুছে গেল—স্বাধীন, স্বতন্ত্র। 'আওয়াজ উঠা হয়ে হামারা'—এ মন্ত্রকে সার্থক করল চট্টলা, তার পাহাড়ের চূড়োয় উড়তে লাগল মুক্তির রক্ত-পতাকা, আর তার ছায়া কাঁপতে লাগল কলোচ্ছল কর্ণফুলীর জলে।

তিনদিন আগেকার খবর। এখনও সেখানে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলছে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর। বীরের মতো তারা প্রাণ দিচ্ছে, প্রাণ নিচ্ছেও। ভারতবর্ষের আকাশে রক্ত-প্রবাস—চট্টগ্রাম।

তীব্র চাপা গলায় কথাগুলো বলে গেলেন বেণুদা। গমগম করতে লাগল ঘর। তরল অন্ধকারের মতো ঘন ছায়া ঘরের মধ্যে, শুধু দেওয়াল আর ছাদের সংযোগে আড়াআড়ি কাটা ছোট ভাইনাইট থেকে একটা অস্পষ্ট আলো এসে ঝিমঝিম করতে লাগল তোষালীর উজ্জ্বল কলায়, তেল চকচকে লাঠির পিতল বাঁধানো গাঁটে গাঁটে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপরে হঠাৎ যেন প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন বেণুদা, ফিরে এলেন তাঁর স্বাভাবিকতায়। ওদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে তিনি হেসে উঠলেন, কালো মুখের ভিতরে ঝিকিয়ে উঠল শাদা দাঁতের সারি।

—ওই যাঃ—আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে। তারপর, যদুন?

আচমকা একটা ধাক্কা লেগে ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো যদু শিটিয়ে উঠল।

—আমায় বলছেন?

—হাঁ—হাঁ।—একটু আগে যে বেণুদা কথা কইছিলেন একটা ধারুদ ঠাসা কামানের মতো, তিনি যেন সম্পূর্ণ অন্য লোক: মাথার অবস্থা কেমন তোমার? সব ঠিক হয়ে গেছে।

যদু ঘাড় নাড়ল। ঠিক হয়ে গেছে।

—করুণা তোমার খবরের জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, আর খালি খালি বকাবকি করছিল আমাকে। যাক—এবারে আমি দায় থেকে রেহাই পেলাম। করুণাকে ডেকে দেখিয়ে দিই তার কার্ট এইড্ বেশ কাজ দিয়েছে।

বেণুদা চেঁচিয়ে ডাকলেন, করুণা, করুণা—

—আসছি—করুণাদির সাড়া পাওয়া গেল। তারপর মিনিট খানেকের মধ্যেই আঁচলে হাত মুছতে মুছতে করুণাদি ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

বেণুদা বললেন, এই নে, তোর আসামী হাজির। কিন্তু ভয় নেই, একেবারে ঠিক হয়ে গেছে।

—ঠিক হয়ে গেছে? বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে।—সস্নেহে করুণাদি হাসলেন। মাথা নীচু করে রইল যদু। করুণাদির স্নেহ ভালো লাগে, কিন্তু সেই সঙ্গে অস্বস্তিও লাগে যেন। তেরো বছর বয়েস হল তার—একেবারে ছেলেমানুষ সে নয়; সে নমস্কার পেয়েছে মিতার কাছ থেকে, মনের ভেতরে এসেছে বড় হয়ে উঠবার গর্ববোধ—পৃথিবীর কাছে এখন সে দাবী করতে চায় পৌরুষের স্বীকৃতি। কিন্তু করুণাদির স্নেহে সে স্বীকার কোথাও নেই, আছে ছেলেমানুষের অসহায়তা আর দুর্বলতার ওপরে একটা নিবিড় মমত্ববোধ।

করুণাদি বললেন, যা শক্ত পড়ছিল তাতে একদিনেই এমন তাজা হয়ে উঠবে ভাবতে পারিনি।

কথাটা কেড়ে নিলেন বেণুদা: হতেই হবে। কার জিনাটিক স্রাবের মেয়ে সেটা দেখতে হবে তো।, একদিন হাওয়া লাগলেই শরীর শক্ত হয়ে যায়।

—থাক, হয়েছে। ওকে আর হাওয়া লাগাতে হবে না তোমাকে। যদুন, এসো তো ভাই।

বেণুদা বললেন, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?

—আমার ডুয়িংরুমে। তোমার সংসর্গ থেকে ওকে বাঁচানো দরকার।—করুণাদি হাসলেন: কাল রাত্রে চা খায়নি, আজ গরম গরম সিঙাড়া ভাজছি, খেয়ে যাবে।

পরিমল কলরব করে বললে, বা-রে, একি পার্শিয়ালিটি? মাথা কাটবেই ও বুঝি সিঙাড়া খাওয়ার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল? আর আমরা যে—

—তুই ছেলেদের আমি খেতে দিই না—তুই মি করে হাসলেন করুণাদি: তবে ভালো ছেলের বন্ধু হিসেবে দু একটা পেলেও পেতে পারো।

—ভেতরে আসব?

—উঁহু—রান্নাঘরে শুধু আমি আর যদুন। এসো ভাই—

যদু অনুসরণ করল করুণাদিকে। ভুলে গেল দেরী হয়ে যাচ্ছে, মনে পড়ল না মাকে ফাঁকি দিয়ে আজ পালিয়ে এসেছে এখানে। তা ছাড়া চট্টগ্রামের যে আগুন একটু আগেই লক লক করছিল এই ঘরের মধ্যে, তার উত্তাপে যেন তখনো সমস্ত শরীরটা জ্বলছিল যদুর। একটু ছায়া চাই—বিশ্রাম চাই একটুখানি। সে ছায়া আর বিশ্রামের আভাস স্নিগ্ধ হয়ে আছে করুণাদির চোখে।

পরিমল পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললে, তোকে হিংসে হচ্ছে যদু। তিন বছরে আমি যা পারিনি, তুই যে এক দিনেই তা করে নিলি।

করুণাদি বললেন, তার জন্যে ভালো মানুষ হওয়া দরকার।

—আচ্ছা, আচ্ছা মনে থাকল।

—হুঁ, মনে থাকবে বই কি।—করুণাদি হাসলেন: কিন্তু এসো ভাই যদুন, কড়াইতে ঘি পুড়ে যাচ্ছে আমার। ভেতরের উঠোনটায় পা দিতে দেবদারুর জন্যে কানে এল পরিমলের অসহায় গলার আকুতি: ওরে পেটুক, সব সিঙাড়াগুলোই যেন খেয়ে ফেলিসনে, দুটো চারটে রাখিস আমাদের জন্যে—

সংযমিত্রা আর করুণাদি। একজন সরিয়ে দেয়, একজন মায়ের মতো কাছে টেনে আনে। শিলালিপির কঠিন পাথরের ওপরে রেখায়িত হয়ে ওঠে অপ্রত্যাশিত কবিতার ছন্দ। (ক্রমশ)

শহীদ প্রদ্যোতকুমার

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের মুক্তি সাধনার যেদিন যারা ফাঁসীর ফাঁস গলায় পরে হাসিমুখে জীবন-আহুতি দিয়ে গেছে—স্বাধীনতার সংগ্রামকে যারা অকুণ্ঠ দানে দান ক'রে গেছে বিন্দু বিন্দু বুকের রক্ত সিঞ্চন ক'রে, তরুণ শহীদ প্রদ্যোতকুমার তাদেরই একজন। ভারতবর্ষের আকাশে আজ স্বাধীন সূর্যের উদয়াস্ত সম্ভব হয়েছে—অপরাজিত হ'য়েছে পরাধীনতার কালো মেঘ, কিন্তু নিকৃষ্ট কারার অন্ধকারে যখন যেদিন যারা ভবিষ্যতের তপস্যায় এই সূর্যকে আবাহন জানিয়েছিল আজ তারা নেই। পৃথিবীর অন্ধকারে দুর্গম দুরন্ত পথের যাত্রী ছিল যারা, যাদের মৃত্যুঞ্জয়লগ্নীন উদাত্ত মুক্তি অভিযানে সমগ্র জাতির জীবন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সেদিন—আজ তারা নেই। ইতিহাসের পাতায় শুধু জেগে আছে তাদের অমর রক্তের স্বাক্ষর—তাদের ঐকান্তিকতার বাণী। বিপ্লবী প্রদ্যোতকুমারও আজ নেই, ইতিহাসের বক্ষপটে রক্তাক্ষরে লেখা আছে শুধু তাঁর বিপ্লব সাধনার গৌরবমণ্ডিত কাহিনী।

—'ভারতবর্ষ থেকে অত্যাচারী ইংরেজ জাতের উচ্ছেদ হউক। আমার প্রতি রক্ত বিন্দু ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে বিপ্লবীর সৃষ্টি করুক। ভারত স্বাধীন হউক। জয় ভারতবর্ষের জয়।'—আজ থেকে ষোল বছর আগে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের ফাঁসীমঞ্চে দাঁড়িয়ে আঠারো বছরের তরুণ প্রদ্যোতকুমার হাসিমুখে আবেগকম্পিত সুরে বন্দিজনের ওই মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে গেছে।

১৯১০ সালের ৩রা ডিসেম্বর। (বাংলা ১৩২০ সালের ১৭ই কার্তিক) সোমবার রাত্রি ৮টা ৪৮ মিনিটে প্রদ্যোতকুমার জন্মগ্রহণ করেন গোকুলনগর গ্রামে তাঁর পিতৃভবনে। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় হাসপুর থানার এলাকাধীন গ্রাম এই গোকুলনগর। গ্রামখানির বক্ষিণে কংসাবতী নদী প্রবাহিতা।

প্রদ্যোতের পিতার নাম ভবতারণ ভট্টাচার্য, মাতা শ্রীমতী পদ্মিনী দেবী, পিতামহ ঈশানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। গ্রামের নাম 'বিদ্যালঙ্কার ভবন'। প্রদ্যোত ভবতারণ ভট্টাচার্যের চতুর্থ সন্তান। তাঁর জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র, শ্রীশক্তিপদ, শ্রীসর্বেশ্বরীভূষণ এখনো জীবিত এবং তিনটি কনিষ্ঠ ভগিনী—লতিকা, কণিকা ও মণিকাও জীবিত। মাতৃকুল মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত আমবান গ্রামের প্রসিদ্ধ চক্রবর্তী বংশ। মাতামহ মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর মাতুল—শশিভূষণ, রথীন্দ্রজন, ক্ষীরোদনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র। সকলেই স্বর্গগত। একমাত্র মাসীমাতা সরোজিনী দেবীও স্বর্গতা।

প্রদ্যোতকুমারের পিতামহ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন তিনি। শান্ত ধীর সিগ্ধ স্বভাবের মানুষটি সহজেই সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। সংস্কৃত অধ্যাপনাই ছিল তাঁর পেশা। একালে তমলুকের মাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁনের রাজ-দরবারের সভাপণ্ডিত ছিলেন তিনি শোনা যায়। পিতা ভবতারণ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর শহরের অলিগলি যাওয়ার রেজিস্ট্রী এজেন্টের ব্যবসা করতেন। স্বভাবতই অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী ছিলেন তিনি। মাতুল শশিভূষণ ও ক্ষীরোদনাথ মেদিনীপুর শহরে অলিগলি যাওয়ার পৈতৃক বাড়ীতে থেকেই মেদিনীপুর জেলা আদালতে ওকালতি করতেন।

এই অবেষ্টনীর মধ্যেই প্রদ্যোতকুমার লালিত পালিত। এইরূপ আবহাওয়ার বর্ধিত হওয়ার ফলে প্রদ্যোতকুমারের মনেও রীতিমত জাগরূক হয়ে দেখা দেয়। তাঁর লাজুক আদুরালের মধ্যেই কৃতী ও মেধাবী ছাত্র হিসাবে বেশ সুনাম অর্জন করেন তিনি। আনুষাবিক তিন বছর বয়সে তাঁহার এক-ই স্কুলে ভর্তি হন এবং তারপর মেদিনীপুরের হিন্দু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাই কিছুকাল পরে শহরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য হিন্দু স্কুল বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রদ্যোতকুমার মেদিনীপুর কলেজে আই-এস্-সি ক্লাসে ভর্তি হন। সেই সময়েই তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন ও স্থানীয় শাখার অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কর্মীরূপে কাজ আরম্ভ করেন।

যাত্রারম্ভেই ১৯৩১ সালের ৩০শে এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ আনুমানিক ৪ ঘটিকার সময় প্রদ্যোতকুমার মেদিনীপুরের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর ডগলাসকে হত্যার মানসে আততায়ীরূপে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। অতঃপর তাঁর পাঠ্যজীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে এইখানেই।

শিশুকাল থেকেই প্রদ্যোত হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান। প্রকৃতি সামান্য একটু চঞ্চল ছিল বটিও, কিন্তু ব্যবহার ছিল অতিই বিনয়ী এবং সর্বকাজে একটা নিষ্ঠাসুসঙ্গতিতা ছিল। তা ছাড়া পরোপকার ও সেবাধর্মপরায়ণ ছিলেন তিনি। সমবয়সী ও সহপাঠীদের মধ্যে তাঁর নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সকল ব্যাপারে, সেইজন্য বন্ধুমহলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় সকলের। তাঁর চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব ছিল, তিনি কম কথা বলতেন এবং কোন রকম বিলাস তাঁর মধ্যে ছিল না।

শোনা যায় পিতামহ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন সাধু প্রকৃতির বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রদ্যোতের জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। পিতা ভবতারণ অবশ্য খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত উদার-মতাবলম্বী ছিলেন। অবেশপ্রীতি তাঁদের বংশের বিশেষত্ব। তাঁদের

পরিবারে বিদেশী সামগ্রী সর্বদাই পরিত্যাজ্য ছিল। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হ'লে প্রদ্যোতের পিতা গান্ধীজীর অত্যন্ত অনুরাগী হ'য়ে ওঠেন। যদিও প্রত্যক্ষভাবে কোন আন্দোলনে কখনো যোগ দেননি তিনি।

১৯২৩ সালের ১৪ই জুন বৃহস্পতিবার রাত্রে প্রদ্যোতের পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা পঙ্কজিনী দেবী সেই শোকে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েন। সাংসারিক ব্যাপারেও নানা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন প্রদ্যোতের নবপরিণীতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ মায়াময়ী ওরফে বনকুসুম দেবীর উপর প্রদ্যোত ও তার ছোট ভাইবোনগুলির দেখাশোনার সমস্ত ভার এসে পড়ে। সেই স্নেহময়ী মহিলা প্রকৃতই একটি আদর্শস্থানীয়া রমণী ছিলেন।...

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রদ্যোতকুমার মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে কনডেমড্ সেলে আবদ্ধ অবস্থায়ও খুব সবল বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। স্বাস্থ্য মোটেই ভাল হয়নি তাঁর। এই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ও কবি কাজী নজরুলের পুস্তকাবলী চেয়ে পাঠান তিনি। কিন্তু কাজী নজরুলের বই সরকারের অনুমতি পায়নি জেলের মধ্যে প্রবেশের, তাই রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁর নির্জন বন্দীবাসের একমাত্র সাথী ছিল। কারাজীবনে তাঁর দৈহিক ভার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হ'য়েছিল, এমন কি জীবনের শেষ রাত্রিতেও বাকি এক পাউণ্ড ওজন বেড়েছিল তাঁর।

বিপ্লবী প্রদ্যোতের অন্তর্জীবনের অপরাজেয় শক্তি ও চিত্তের প্রতিষ্ঠৈলতা, ভ্রাতৃবধূ বনকুসুম দেবীর নিকট কারাবাস থেকে লেখা একটি পত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছিল। তিনি বৌদিদিকে লিখেছিলেন :

"দুঃখের সম্ভাবনাবিহীন স্থায়ী আনন্দের নাম সুখ এবং আমি সেই সুখে অত্যন্ত সুখী। আর এক কথা—সুখ দুঃখ কিছুই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, সম্পূর্ণতাই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য—উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। এই উন্নতির মূলে সৌপানরূপে বিরাজ করে সুখ। সুতরাং আমরা সুখের আশায় না ফিরিয়া প্রকৃতিকে সাহায্য করিবার জন্য এই উন্নতির দিকেই যদি আমাদের শক্তি অর্পণ করি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুখ পাইতে পারি। পরে সুখকে উদ্দেশ্য করিয়া বাসনাচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইলে আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে। আমাদের জীবন অনন্তের রূপ বৃহৎ উন্নত প্রেমের এক একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ। কোন পরিচ্ছেদের হাহাকার, কোনটি মহানন্দময়। বিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের হইতে পারে না। আপনাদের এই দুঃখকষ্ট—এর অন্তরে যে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করিতেছে তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? আপনাদের স্নেহ ভালোবাসা আমাকে সুখে দুঃখে সমান করিয়া রাখিয়াছে। আমি জানি না—আমি জানিতেও চাহি না—আমার কি ভালো এবং কি মন্দ। সুবিশাল তেজস্বী অশ্বের ন্যায় কাল কাল বলিয়া আকুল হইয়া উঠে, মুহূর্তের মত স্থির হইয়া বসিয়া পায়ের পড়া মুখস্থ করিয়াই মুখস্থ তাহার উদীয়মান জীবন সূর্য্যকে অস্তপথে যাইতে দিতে চায়ে না। সে তাহার দেহমনকে খাটাইয়া লইতে চায়। খাটিতে তাহার আনন্দ, খাটুনি দেখিতে তাহার আনন্দ, ভবিষ্যৎ ও অতীতের পানে চাহিতে সে জানে না—বর্ত্তমানের পথেই সে ছুটিতে চায়। ছুটে ভবিষ্যতের উৎসমুখে গিয়া পড়িলে, অনুধাবন শেষ হইলে সুখদুঃখের অবসান হয়। আমার এখন একমাত্র প্রার্থনা যে, আমি নির্বাণ চাহি না, মোক্ষও কামনা করি না। আবার এই দেশের বাঙ্গলায় আসিতে চাই এবং মাতৃপূজার সেবার অধিকারী হইতে চাই। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'—এই আমার কাম্য।"—এছাড়া পত্রখানির অন্যত্র লেখা ছিল :—"খোকাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিবেন ও তাহাকে বলিবেন যেন সে মাপকে, অন্যান্যকে ও উৎপীড়নকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়া ঘৃণা করিতে শেখে এবং তাহাকে মনুষ্যত্বে অর্জন করিতে চেষ্টা করে। ভালোভাবে লেখাপড়া করিতে বলিবেন।.....এখন

শহীদ প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য

আমি যাহা লিখিলাম তাহা আপনারাই ধরিবেন। আমার অযোগ্যতার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। মাতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।"

এই সামান্য পত্রখানির মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় তরুণ বিপ্লবীর অন্তরের গভীরতম পরিচয়। বন্দী দেশজননীর ব্যথা বেদনা,সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই অনুভব ক'রেছিলেন তিনি—অনুভব করেছিলেন পরাধীন দেশের রিক্ততা, দীনতা, গ্লানি, অপমান। দুঃসহ হ'য়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে, প্রবলতর বিদেশী জাতির প্রভুত্ব। তাই জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই হ'য়ে ওঠেন তিনি অন্তরে বাহিরে দুরন্ত দুর্বার। দেশজননীর বন্ধন মুক্তির অটুট সংকল্প নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের কাজে। কোন বাধাই তাঁকে বাধা দিতে পারেনি।

মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের জন্য ক্ষুদিরাম বসু আর আলিপুরে বরেন্দ্র ঘোষপ্রমুখ বোমার মামলার অভিযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসীর

অল্পকাল পরেই মেদিনীপুরে বোমা বড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। মেদিনীপুর জেলায় বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি এইখানেই। ১৯০১ সালে আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই সময় মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের একটি কক্ষে মিঃ পেডী বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। ১৯০১ সালের ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে। তমলুক ও কাঁথি মহকুমার প্রবল সন্ত্রাসবাদীদের পরে অব্যর্থ অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই মিঃ পেডীকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু হত্যাকারীরা তখন ধরা পড়েনি।—সরকারের সমস্ত আয়োজন বিফল করে দিয়েছিল তারা আত্মগোপন ক'রে।

সে সময়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর মিঃ আর ডগলাসের আমলে সেই অত্যাচার, উৎপীড়ন আর নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। বিপ্লবী তরুণদল কিন্তু হয়ে উঠলো সে অত্যাচারে—প্রতিশোধ নেবার জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠলো তারা। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল আর এক মর্মবিদারক ঘটনা—হিজলী বন্দীনিবাসের আবদ্ধ বন্দীদের ওপর নির্বিচারে অকস্মাৎ হ'ল গুলিবর্ষণ। ফলে সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেন মারা গেলেন এবং অন্য অনেকেই হ'লেন আহত। সে ঘটনার পর আরো ভীষণভাবে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো তরুণরা। গভর্নমেণ্ট এই সম্পর্কে যে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করলেন তাতে পদস্থ কর্মচারী সকলেই রেহাই পেল, অপরাধী সাব্যস্ত হ'ল অবশ্য কয়েকজন কর্মচারী। বিপ্লবীরা কিন্তু তদন্ত কমিটির সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। তাদের ধারণা মিঃ ডগলাসই মূলতঃ এই গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী এবং তিনিই তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্য শাসনের প্রচণ্ড ও মোর্চিত প্রতাপ তখন পূর্ণমাত্রায় চলেছে দেশের ওপর। চণ্ডনীতির অত্যাচারে মেদিনীপুর জেলার বেহাল-দখল বেদ বাবাজলের মত জলতে শুরু করেছে। সে অনল দাবদাহে মেদিনীপুর ভূমি ছারখার হ'য়ে যায়। ছাত্র ও যুবকরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলে না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর থেকেই একদিন শুরু হয়েছিল বিপ্লবের জন্য ভীষণ অভিযান। সেই আদর্শ যুবকদের সামনে উজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে আবার দাঁড়ালো। গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ আবার সক্রিয় হ'য়ে উঠলো—গোপন পথে বিপ্লব অভিযান শুরু হ'ল আবার নতুন ক'রে। দেশবন্ধু প্রফুল্লকুমারও স্থির থাকতে পারেননি।—

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর ডগলাস তখন সরকারী নীতিকে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৯০৯ সালের ৩০শে এপ্রিল শনিবার বিকালে স্থানীয় জেলাবোর্ড ভবনে জেলাবোর্ডের পূর্ণ অধিবেশন। মিঃ ডগলাস সভাপতির আসনে উপবিষ্ট। সভায় আলোচনায় ব্যাপৃত। অকস্মাৎ ঘরে উঠলো কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র—রিভলবারের গুলির শব্দে ও ধূমে সভাকক্ষ আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। মুমূর্ষু অবস্থায় ডগলাস সাহেবের চেয়ারের ওপর ঢলে পড়লেন দেখতে দেখতে। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুক্ষণের জন্য সবাই হারিয়ে ফেলেছিল সম্বিৎ সভার সকলেই। তারপর ছোটাছুটি পড়ে গেল আত্মরক্ষার্থীর সন্ধানে। বোর্ড-গৃহের উত্তরের পথ দিয়ে দেখা গেল দুই যুবককে পালাতে। সভার সকলে বহু সশস্ত্র বেয়ারা ও কর্মচারী যুগপৎ ছুটলো তাদের ধরতে। অকস্মাৎ বোর্ড প্রাঙ্গণের পূর্বদিকের প্রান্তরের মধ্যে এক ভাঙা ঘুড়ির ধরা পড়লেন যিনি, তিনি প্রফুল্লকুমার—চারিদিকের বেষ্টনী ভেদ করে তিনি আর পালাতে পারলেন না। কিন্তু দেখা গেল, তাঁর হাতের রিভলবার কার্যকরী নয়। মারাত্মক গোলযোগের জন্য তা থেকে গুলি বর্ষণ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবুও হত্যার সমুদয় অপরাধ তাঁরই শিরে ন্যস্ত হ'ল। ইতিহাসে তাঁর সহকর্মী পালিয়েছেন। তাঁকে আর ধরা গেল না। মেদিনীপুর তখন পুলিশের জুলুমে আর অত্যাচারে জর্জরিত। বহু বালক যুবক, তরুণ-তরুণী পুলিসের সে বর্বর নীতির হাতে নিজেদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। মেদিনীপুরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সে অত্যাচারের দুর্বিসহ আলায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো। সে দৌরাত্ম্যের কবলে পতিত হ'য়ে গেল সারা মেদিনীপুর। আসামী প্রফুল্লের ভ্রাতার অল্পের পরীক্ষাস্বরূপও বাদ যায়নি সেই নিদারুণ নির্যাতনের হাত থেকে। তারপর বহু তদন্ত ও অনুসন্ধানের পর একমাত্র প্রফুল্লকেই অপরাধীরূপে চিহ্নিত করা হ'ল।

শ্রীযুক্ত কে-সি বাসুকে প্রেসিডেন্ট করে একটি ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে প্রফুল্লকুমারের বিচার আরম্ভ হ'ল। কিন্তু সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন হ'ল যে, প্রফুল্লের রিভলবার ঠিক ছিল না, নিরস্ত্রিত ব্যক্তির গুলিতেই ডগলাস নিহত হয়েছেন। সুতরাং প্রফুল্ল প্রকৃত হত্যাকারী নয়। শ্রীযুক্ত এন-সি সেন, বি-এল শামসুল প্রভৃতি প্রফুল্লের পক্ষ সমর্থন করেন। ট্রাইব্যুনালের তিনজন সদস্যই প্রফুল্লের অপরাধ সম্পর্কে একমত হ'য়ে যঃ দিঃ ৩০২।৩৪ ও ৩০২।১২০ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯(ঘ) ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত করেন তাঁকে। শ্রীযুক্ত বাগ ও অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত মুস্তফী তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত কে-সি বসু এক প্রকাশ করেন। আসামীর বয়স অল্প এবং ডগলাস হত্যার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাঁর না থাকার দরুণ তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের সংখ্যাধিক্য সদস্যের অভিমতই বজায় থাকে শেষ পর্যন্ত।

হাইকোর্টে আপীল করা হ'ল, সেখানে শ্রীযুক্ত এন-সি সেন ও শ্রীযুক্ত কে-সি বসু আসামীর পক্ষ সমর্থন করলেন। কিন্তু জাস্টিস সি-সি-ঘোষ ও জাস্টিস এ্যাক আপীল নামঞ্জুর ক'রে বহাল রাখলেন মৃত্যুদণ্ড।—

হাইকোর্টে আপীল-মামলা বিচারাধীন থাকার সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ক'রে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ দুটি প্রকাশের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং মুদ্রাকর আদালতে অভিযুক্ত হন ও পাঁচশত টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হয়।

এরপর প্রিভিকাউন্সিলেও আপীল করা হ'ল এবং সম্রাট, বড়লাট, ছোটলাট সকলের কাছেই বালক প্রফুল্লের প্রাণভিক্ষার আবেদন করা

হ'ল, কিন্তু সবই হ'ল বিফল। মুটপ নিয়ে অটল অচল—প্রদ্যোতের প্রাণ তাদের চাই।

১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী সকাল ৬টায় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের এক অন্ধকার কক্ষে প্রদ্যোতের জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হ'য়ে গেল। ফাঁসীর ফাঁসে জীবনের শেষ গান গেয়ে বিদায় নিল তরুণ শহীদ প্রদ্যোতকুমার। দেশ-জননীর কোল থেকে হারিয়ে গেল একটি মূল্যবান।

কয়েকজন আত্মীয় মিলে জেলের বাইরে তাঁর প্রাণহীন দেহটিকে কোলের জলে নাইয়ে শেষ স্নান সম্পন্ন ক'রে ফিরে গেলেন।

তারপর···

ভারতের বীর প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা আজ এসেছে। কিন্তু স্বাধীনতার বেদীমূলে চরমপন্থীর প্রাণ প্রদ্যোত আজ কোথায়? কোথায় আজ সেই স্বাধীনতাকামী তরুণ বিপ্লবী?

কেরাণীর মৃত্যু

শ্রীযামিনীমোহন কর

দাদার দোকানে বসে চা খাচ্ছিলুম। রেস্তরাঁর মালিকের নাম নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, কিন্তু আজ সে নাম কেউ জানে না। হয়ত' তিনি নিজেও ভুলে গেছেন। 'দাদা' নামেই তিনি পরিচিত।

সামনে দিয়ে হিন্দু সৎকার সমিতির লরী চলে গেল। দাদা বলে উঠলেন—"গোপাল বোস লেনের চণ্ডীবাবুকে নিয়ে গেল।"

আশ্চর্য্য হলুম। কোন মৃত ব্যক্তিকে লরী করে নিয়ে যায় না সাধারণত; তা সে যতই গরীব হোক। একলা থাকলেও বন্ধু বান্ধব নিশ্চয়ই থাকে। তাই প্রশ্ন করলুম, —"চণ্ডীবাবু কে? তাঁর কি কেউ নেই। লরী করেই বা মৃতদেহ সৎকার করতে নিয়ে গেল কেন?"

দাদা গম্ভীর হয়ে বললেন,—"সে অনেক কথা।"

সকলে ধরে বসল—"বলতেই হবে।"

দাদা বললেন—"চণ্ডীবাবু কেরাণী—তিন পুরুষ ধরে। যাকে বলে বনেদী কেরাণী। বাপের অফিসে ঢুকেছিলেন। মার্চেণ্ট অফিস। যুদ্ধের পর ছাটাই চলল বেদম ভাবে। চণ্ডীবাবু সাহেবকে অনেক ধরে করে কাজ বহাল রাখলেন, কিন্তু মাইনে গেল কমে। বাড়ীতে মা, দু'জন বিধবা বোন। অতএব আজকাল বাজারে বুঝতেই পারছ? সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা অফিস। মাইনে ৪০৲ টাকা। তারপর দুটো টুইশন। মোটা ৩০৲ টাকা। এই আশী টাকা নিয়ে সংসার। বাড়ী ভাড়া আছে, খাওয়া পরা আছে। দুরবস্থায় একশেষ। সর্ব্বত্রই ধার। আমারও বেশ কিছু পাওনা ছিল। কিন্তু তাগিদ করতে পারি নি। বেচারার মুখ দেখে মায়া হ'ত। তিনি মরে আমারও মেরে গেলেন।

বছর দু'য়েক আগে একদিন শুনলুম চণ্ডীবাবু প্রেমে পড়েছেন। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কেরাণীও মানুষ। তারও জীবনে বসন্ত আসে। পাশের বাড়ীর এক মিস্ত্রীর মেয়ের সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েছিলেন। এক মেয়ে। দেখতেও শুনেছি সুশ্রী। কায়স্থ। চণ্ডীবাবুর পাল্টী ঘর। মিস্ত্রী খাস গেলে শ'দুয়েক টাকা যৌতুক করত। কিন্তু বিয়ে হ'ল না। মা বোন সকলে হিঃ হিঃ করতে লাগলেন। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষে কিনা একটা মিস্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে। চণ্ডীবাবু জাত কেরাণী; কারো বিরুদ্ধে কথা কইতে সাহস করতেন না। বসন্ত চলে গেল বিফলে। ফুল ফুটল না।

মা অন্য জায়গায় বিয়ের চেষ্টা দেখতে লাগলেন। কিন্তু বিয়ে করতে চণ্ডীবাবু রাজী হলেন না। বললেন যে নিজেরাই খেতে পাই না, বিয়ে করে বৌকে খাওয়াব কি? জীবনে বোধহয় ঐ একবারই বুদ্ধির এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তারপর খাটুনী আরও বাড়িয়ে দিলেন।

এদিকে হাড়ভাঙা খাটুনী, ওদিকে মা বোনের চিটকিরি—মিস্ত্রীর মেয়ের জন্য ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। মেয়েটিকেও মধ্যে মধ্যে কথা শুনতে হ'ত। শেষে তারা উঠে চলে গেল অন্যত্র। অত্যধিক পরিশ্রম এবং উপযুক্ত

আহারের অভাবে চণ্ডীবাবু শুকিয়ে যেতে লাগলেন। মা বোন মনে করলেন, বিরহে। কিন্তু সে বেড়েই যেতে লাগল। শেষে চণ্ডীবাবু শয্যা নিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই কাবার।

দিনরাত শুধু খেটেছেন। কারো সঙ্গে মেশেন নি। বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। তাই গতি করতে এল হিন্দু সৎকার সমিতি। অথচ মিস্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে করলে হয়ত' তিনি বেঁচে থাকতেন। মিস্ত্রী তাকে কাজে লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল; আশা দিয়েছিল শ'খানেক টাকাই রোজগার হবে। হ'তও। কিন্তু কেরাণীগিরি ছেড়ে মিস্ত্রীর কাজ করলে নাকি মান ইজ্জৎ যাবে। এ কি মোহ।"

অনেকে অনেক কথা বললে। আমি চুপ করে সরে পড়লুম। কারণ আমিও কেরাণী।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ভিত্তি

ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় এম, আর সি, ও, জি (লণ্ডন)

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

এক কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য—"জ্ঞানলাভ"—জ্ঞানলাভের দ্বারা উদ্দেশ্য পরাশান্তি লাভ।

"জ্ঞানলব্ধা পরাংশান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।"

—"গীতা"—

জ্ঞানবিবিধ—পরা ও অপরা

পরাজ্ঞান—পরাবিদ্যা—ব্রহ্ম—আত্মবোধ। পণ্ডিতগণ অভিশ্রম করিয়া জীব ও জগৎ অনন্ত আনন্দময় পরমতত্ত্বের বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। ইহাই সত্যদর্শী পূজ্যপাদ ঋষিগণ কর্তৃক পরাজ্ঞান বা পরাবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞানলাভই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য—ইহা লাভ হইলে, মরণশীল মানব অমৃতত্ব লাভ করে। তখন সে জন্মমৃত্যুর কবল হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানবজীবন সার্থক হয়।

অপরাজ্ঞান—অপরাবিদ্যা—অনাত্মবোধ

আত্মজ্ঞান বা পরাবিদ্যা ব্যতীত যাবতীয় জ্ঞান যথা—আনুবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অর্থকরী বিদ্যা ইত্যাদি, সমস্ত জ্ঞানই অপরা নামে অভিহিত হয়।

মানবজীবনের সার্থকতা ভোগে নয়—ত্যাগে। প্রবৃত্তিমার্গে নয়—নিবৃত্তিমার্গে। এই শিক্ষাই মানবজাতির প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান।

মাত্র ভোগতৃপ্তিই মানবজীবনের একমাত্র কাম্য নয়। আহার-নিদ্রা-মৈথুন, মানবজীবনের কেবলমাত্র কাম্য নয়। পশু-পক্ষীরাও এই তিনটীর আচরণ করে। মানবদেহ ধারণ করিয়া—যাহারা কেবলমাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতেই রত—তাহারা পশুরই সমান।

আহার-নিদ্রা-ভয় মৈথুনঞ্চ।
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মোহিতেষাম্ অধিকো বিশেষো।
ধর্মহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।" —মনুসংহিতা।

দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কর্তব্যাকর্তব্য বিচারণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে—আজ দেশের সর্ব্বত্রই "হাহাকার"। ঘরে ঘরে অন্নাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অর্থাভাব, জ্ঞানাভাব, শিক্ষার অভাব—অভাব—অভাব—অভাব: অভাবের শিখা আজ প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ জ্বলিতেছে। এ অভাবের অভাব কবে হবে তা কে জানে?

"বহ্বাশ্যস্তা বসাধারা"।

হীনবীর্য্যতা, পরমুখাপেক্ষিতা, উচ্ছৃঙ্খলতার আজ দেশ সমাচ্ছন্ন। মানবকুল আজ অধঃপতনের চরমসীমায় উপনীত। এ দুর্দ্দশার মূলকারণ —"প্রকৃত-শিক্ষার" অভাব।

পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে আজ আমরা মুক্ত হইলেও আমাদের মধ্যে এত আবিলতা, এত মলত্ব বর্ত্তমান যে তাহার আমূল সংস্কার না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হইবে না—হইতে পারে না।

বহিঃআবিলতা বিদূরিত করা সহজ—কিন্তু অন্তরের আবিলতা বিদূরিত করা সহজ নয়। অন্তরের আবিলতা তখনই বিদূরিত হইবে—যখন দেশের প্রত্যেক শিক্ষক, প্রত্যেক শিক্ষার্থী, প্রত্যেক জননী ও প্রত্যেক সন্তান প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নবজীবনলাভ করতঃ ভারতের আকাশ বাতাস পবিত্রতায় পূর্ণ করিবে। তখন ভারতমাতা পুনরায় তাঁহার প্রদীপ্তপ্রভায় সমগ্রপৃথিবী আলোকিত করিয়া জগতে

পুনরায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন। ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শিক্ষার ভিত্তি

দেশে "প্রকৃতমানব" গঠিত না হইলে, "খাঁটি" মানুষ তৈয়ারী না হইলে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না।

আমাদের দেশ, ভগবানের দেশ। এ দেশের উন্নতিকল্পে যিনি যেদিক দিয়াই প্রচেষ্টা করুন—বহুরূপেরই দেখাদিতে করুন করুন, এ দেশের মজ্জাগত যে ভাব যে কৃষ্টি, তাহা ভগবানমুখী। আমরা এ শিক্ষা সমূজ্জল করিয়া ধরিবার দিকে যদি দৃষ্টি না রাখি—ভগবৎ-অভিমুখী সমাজ বিজ্ঞানের বিধিকে যদি অবহেলা করি—সমাজ পরিচালনে ভগবৎ বংশজাত বলিয়া যদি নিজেদের আত্মিক লক্ষ্য স্থাপন না করি এবং সেই জন্য মানববংশ ধারায় যদি "ঋষি" বা "অতিমানব" প্রসবের যোগ্য "মা" দেখিতে না পাই তবে দেশের কিছুমাত্র কল্যাণ সাধিত হইল, ইহা আমরা দেখিতে পাইব না।

যেমন বিশ্বজননী। লক্ষ্য সন্তানকে তুমি তুমি মনে, মানবীমায়ের লক্ষ্যও ঠিক সেইরূপ দিকে ফিরাইয়া রাখিতে হইবে—যদি এ দেশের সৃষ্টি ও জন্মের চিরকল্যাণধারা মানব বংশধারা রক্ষা করিতে হয়।

এইরূপ প্রকৃতি তৈয়ারী করা যায় যদি, এই মায়েদের চিত্তে এ আশা যদি সুদৃঢ় বিশ্বাসের ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়া যায় যে, তাঁহাদের বহুকালীন আচরণ হইতে গর্ভাবস্থা ও প্রসবের পর সন্তান পালন, যেন এই তিনটী অবস্থায় তাঁহারা সতর্ক লক্ষ্য সন্তানের দিকে রাখিয়া থাকিতে শিক্ষা করেন।

বহুকালই প্রকৃত সন্তান সৃষ্টি, সন্তান-প্রসব ও তাহাকে পালন করিয়া প্রকৃত মানবরূপে পরিণত করিবার উপযোগ পর্ব্ব।

নারীকে এই শিক্ষায় যদি দীক্ষিত করা যায় তবে নারী সহজেই চিরসুন্দর সন্তানরত্নের "মা" হওয়ার আশা করিতে পারেন এবং এইরূপে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যাইতে পারে।

দেশকল্যাণকর কার্য্য Constructive Programmeএর মধ্যে এটী যে অগ্রতম এবং প্রধান ব্যবস্থা সে কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত।

তাই বলিতেছি যে, দেশকল্যাণকর প্রকৃত মানব গঠনের প্রথম ও প্রধান সোপান, ভূমিষ্ঠি হইবে, নারীর শিক্ষা। শিক্ষার ভিত্তি যতই সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তদুপরি নির্ম্মিত শিক্ষালৌধও ততই দীর্ঘস্থায়ী ও সুরম্য হইবে। ইহার অন্যথায় মোক্ষোদ্ধার হইবে না।

নারীর শিক্ষা

যতদিন দেশের নারীগণ আদর্শ মহীয়সীরূপে গঠিত না হন, ততদিন সুসন্তান জন্মিবে না। সুসন্তান না জন্মিলে—সুসন্তানের দেশ পরিপূর্ণ না হইলে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না; বহু রক্তপাত ও কায়াবরণ দ্বারা অর্জ্জিত এই স্বরাজ স্বাধীনতা রক্ষা হইবে না।

বর্ত্তমানে স্কুল কলেজে আমাদের বালিকাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ। নারী জীবনের যে সকল বিশেষ ভগবদ্দত্ত সৃষ্টি, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক বালিকাগণকে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পালনীয় নিয়মগুলিও যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সকল নিয়ম না জানায় ও পালন না করায় বহুপ্রকার "স্ত্রীরোগের" সৃষ্টি হয়।

চল্লিশ বৎসরের অধিককাল স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, এদেশের মেয়েরা "বহুকালীন" "গর্ভাবস্থা" ও সন্তানপ্রসবান্তে পালনীয় নিয়মগুলি না জানায় এবং অনেকক্ষেত্রে জানিয়াও পালন না করায়—তাঁহারা অনেকেই দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হ'ন ও তাঁহাদের চিরবাঞ্ছিত সুসন্তান লাভে বঞ্চিত হ'ন।

বহুকালে নারীগণের যে নিয়ম পালন করা উচিত তাহা না করায় বহুনারী রোগগ্রস্ত হইয়া যাবজ্জীবন জীবন্মৃত অবস্থায় জীবনযাপন করেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

"আর্ত্তবস্রাবদিবসাদহিংসা ব্রহ্মচারিণী।
শয্যাঽস্পর্শপরাত্যক্তা পঞ্চরাত্রমপি পতিং ন চ।
অন্নে পরান্নে পর্ব্বে বা দিবাস্বাপং প্রবাহনম্।
অশ্রুপাতং নখক্ষেদং অভ্যঙ্গমসুলেপনম্।
নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবাস্বাপং প্রধাবনম্।
অত্যুচ্চশব্দহসনং হসনং বহুভাষণম্।
আয়াসং ভূমিখননং প্রধাবঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।"

অর্থাৎ "রজঃস্বলা স্ত্রী রজঃনিঃসরণ দিবস হইতে তিনদিন হিংসা করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, কুশাসনে শয়ন করিবে, পতিকে স্পর্শও করিবে না—যদিবার ভোজন করিবে; অশ্রুপাত, নখক্ষেদ, অভ্যঙ্গ, অঙ্গুলেপন, নেত্রয়োরে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, হাস্য, বহুভাষণ, পরিশ্রম, অত্যুচ্চশব্দ শ্রবণ, ভূমিখনন ও প্রবল বাত সেবন এইগুলি বর্জ্জন করিবে।"

প্রসবের পর, সন্তানপালন কি ভাবে করিতে হয় তাহা আমাদের দেশের কয়জন জননী জানেন? "গর্ভধারিণী" হওয়া সহজ, কিন্তু "মা" হওয়া অতি কঠিন।

শিশু পালন :—শিশুর প্রয়োজনীয়তা

শিশুই জাতীয়জীবনের ভবিষ্যৎ বল ও ভরসা। শিশু ভিন্ন অন্য কেহই কালে বংশরক্ষা, জাতিরক্ষা বা দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তাই শিশুর এত প্রয়োজন। কিন্তু সেই শিশু যদি দুষ্ট ও বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহার দ্বারা বংশরক্ষা, জাতিরক্ষা, বা দেশরক্ষা কোন কালেই হয় না; যদি শিশু চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইয়া চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হয়, সে বংশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, দেশের

কলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বল, চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হইলে যে কি বিষাদে, কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা—সে দুঃখ যে কি দুঃখ, পিতা মাতার সে যে কি জীবন্ত নরক—তাহা যাঁহাদের ঘটিয়াছে শুধু তাঁহারাই জানেন। ইহা অন্যের ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

শিশু এরূপ হয় কেন?

শিক্ষার দোষে।

শিশুর শিক্ষা: যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতে আহার বিহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে সৎশিক্ষা না পায় সে কখনও সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে না! সন্তানকে শুধু আহার ও পরিধান প্রদান করিলেই তাহাকে "পালন" করা পূর্ণ হয় না; সন্তানকে যথারীতি "পালন" করিতে হইলে তাহার খাদ্য-পানের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠনের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজে সৎ হইয়া—সৎদৃষ্টান্ত না দেখাইলে, সন্তান সৎ হয় না—হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, কিন্তু "মা" হওয়া সহজ নয়।

বাল্যে মাতৃক্রোড়ে শিশুর যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাই তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমান স্কুল, কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু যদি সে জীবনের প্রথম হইতেই সর্ব্ববিষয়ে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করিতে শিক্ষা না পায় তবে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন্ত ছবি আজ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

তাই, আজ আমার সভাতার নিবেদন যদি আমরা সুস্থ, বলিষ্ঠ চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান লাভ করিতে চাই—যদি আমাদের সন্তানকে বংশের গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরব স্বরূপ দেখিতে চাই—তাহার জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাহার আহার, বিহার, প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সতর্ক হইতে হইবে। এই নির্দ্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করিলে, জন্মভূমির প্রতি পুত্র সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পরিপূর্ণ হইবে।

"আঁতুড়ে" জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। বাল্যের শিক্ষা যত সহজে অভ্যাস হয়, পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা তত সহজে অভ্যাস হয় না—হইতে পারে না। বাল্যের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া যায়; সে শিক্ষা সহজে ভুলা যায় না—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

স্কুল কলেজে সাধারণ জ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যালাভ হইতে পারে, কিন্তু অমূল্য রত্নের মধ্যে অমূল্য লাভ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয়।

বাল্যকাল হইতে শিশুকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে এবং লোভ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিগুলি তাহার কোমলহৃদয়ে যাহাতে উদিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শিশুর শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট কাল ও স্থান; প্রকৃত-শিক্ষা—বাল্যের শিক্ষক:

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "আঁতুড়ে" জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। পিতৃমাতৃসন্নিধান ও পরিবারবেষ্টিত নিজ আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালয়। শিশু যখন পাঠশালা যাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার চরিত্র গঠনের ভার "গুরু" মহাশয়ের উপরও কতকাংশে ন্যস্ত হয়। কারণ তিনিও একজন বাল্যের অন্যতম শিক্ষক! পাঠশালাতে শিশুর গুরুকরণ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত মাতৃগুরু লাভ করিবার পূর্ব্বেই যেমন অনেকেই "মা" হইয়া পড়েন, দুঃখের বিষয় উপযুক্ত গুরুগৃহবিহীন হইয়াও অনেকে সেইরূপ গুরুগৃহযাত্রা হইয়া দাঁড়ায়।

"মা"-ই হউন আর "গুরু"-মহাশয়ই হউন, যাঁহার নিজের চরিত্র গঠিত হয় নাই, তিনি অপরের বিশেষতঃ ভাল-মন্দজ্ঞানহীন শিশুর চরিত্র গঠনের ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

শিশুর নৈতিক শিক্ষা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আহার, নিদ্রা, মৈথুন মানবজীবনের কেবলমাত্র কর্ত্তব্য নয়। পশুপক্ষীরাও এই তিনটীর আচরণ করে। মনুষ্যত্বের পরিচয় ভোগে নয়—নিয়মিয়ে। যাহারা কেবলমাত্র ভোগাভাজ্য তৃপ্তিতেই রত, তাহারা পশুর সমান।

সন্তানকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করিতে হইলে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিম্নলিখিত বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হইবে—

সৎসঙ্গ, সদাচার, সহবৎ, সত্যবাদিতা, সরলতা, অহিংসা, পরনিন্দা-বর্জ্জন, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সংযম, ব্রাহ্মণভক্তি, ভক্তিভক্তি, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা:—

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার অবসান তখনই সম্ভব যখন সুশিক্ষিত, সুসংযত, সচ্চরিত্র, শিক্ষামিপুণ, সদ্গুরু শিক্ষক-মণ্ডলী দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইবে; যখন মাতৃমণ্ডলী, সন্তান পালনে সুশিক্ষিতা, সুনিপুণা স্নেহময়ী মাতৃমণ্ডলী দ্বারা প্রতিগৃহ সুশোভিত হইবে। যখন দেশের যুবকবৃন্দ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান, ধর্ম্মপ্রাণ ও সুসংযত জীবন লইয়া সুগঠিত হইবে।

"ভারতমাতার লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হৌক—ইহাই প্রার্থনা।

"জন্মভূমিশ্চ"

মহাত্মার তিরোভাব ও গ্রহের প্রভাব

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

গত ৩০শে জানুয়ারি আততায়ীর হাতে মহাত্মার মহামূল্য জীবনের শোচনীয় অবসান নিখিল নীল আকাশ থেকে অশনিপাতের মত সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত ও বিমূঢ় ক'রে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের কাছে এই মর্মান্তিক ঘটনা একেবারে অপ্রত্যাশিত হ'লেও, গ্রহ নক্ষত্র মহলের মধ্যে কিন্তু এর জন্য প্রস্তুতি চলছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দেশের যাঁরা মাথার উপর আছেন সেই নেতাদের অনেকেই কলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসকে অজ্ঞতা-প্রসূত একটা অন্ধ কুসংস্কার ব'লে মনে করেন। তাঁরা যদি জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন এবং গ্রহ নক্ষত্রের নির্দেশ হিসাবে সতর্ক হ'তে পারতেন, তাহ'লে হয়ত আরও কয়েক বৎসর তাঁকে আমাদের মধ্যে ধ'রে রাখা সম্ভব হত। গ্রহ-নক্ষত্র যে কী ভাবে এই শোকাবহ ঘটনায় ইঙ্গিত করছিল, এই প্রবন্ধে তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখাবার চেষ্টা করব।

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর সকাল ৭টায় সময়। তাঁর জন্ম সময়ের রাশিচক্র হয়েছিল এই রকম—

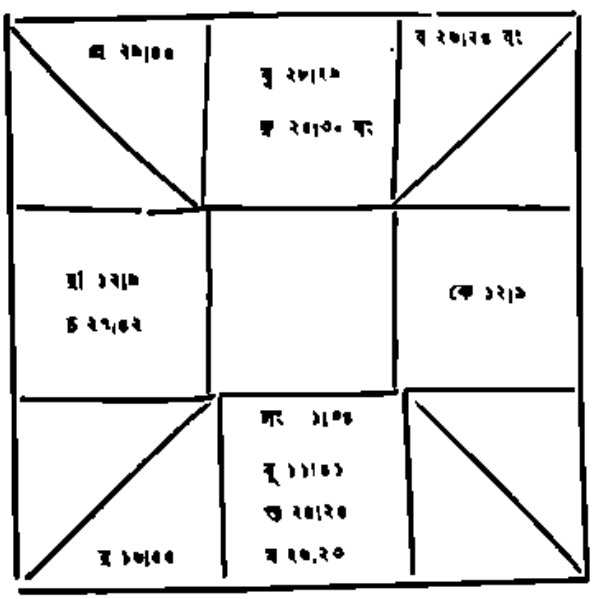

১০ম ৩১।৫৩ ; ১১শ ৪।৩০ ; ১২শ ৫।৩,৫৮ ;
লং ৩১।৩৪ ; ২য় ৭।৩০ ; অস্ত ৮০।৫২

মহাত্মার ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ ছিল প্রজাপতি। এই প্রজাপতি মহাত্মার কুণ্ডলীতে তাঁর লগ্ন ভাবস্থিত সূর্যের সঙ্গে সংযুক্ত এবং রবি লগ্নস্থ হ'য়ে বলবান লগ্নপতির, বৃহস্পতির, মঙ্গলের ও শুক্রের শুভদৃষ্টি পাওয়ায় তাঁর পৃথিবীব্যাপী অসাধারণ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। তাঁর ভুলা-লগ্ন ও ভাগ্যনিয়ন্তা প্রজাপতির বল তাঁর জীবনে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল। আমার লেখা 'লগ্নফল' গ্রন্থে ভুলা লগ্নের যা ফল দেওয়া হয়েছে এবং 'কলিত জ্যোতিষের মূল সূত্রে' প্রজাপতির যা ফল বর্ণনা করা হয়েছে তা যদি কেউ প'ড়ে দেখেন তাহ'লে বুঝতে পারবেন যে মহাত্মার জীবনের ফল কী ভাবে তাঁর জন্মকালীন গ্রহ সংস্থানের দ্বারা সূচিত হয়েছে। এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিলুম।

প্রথমে ভুলা লগ্নের ফল

চিকিৎসাধীনতঃ শান্তিপ্রিয় ও আত্মপ্রিয়, কিন্তু যে ব্যাপারে তাঁর ঝোঁক চাপে তার চরম ক'রে ছাড়েন।...অন্য লোকে যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মুহ্যমান হ'য়ে শুয়ে পড়ে, তিনি তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে অনায়াসে তা পার হ'য়ে যেতে পারেন...তাঁর সমস্ত কার্যকর্মের মধ্যে একটা সহানুভূতির ধারা দেখা যায়, অন্যের প্রতি ব্যবহার প্রায়ই মিষ্টতা, দয়া ও স্নেহের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে থাকে।...তাঁর সামাজিক ব্যবহার শান্ত ও মধুর এবং তাঁর মধ্যে সহানুভূতি প্রবল।

যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে বিসর্জন দেন না। অন্য লোকের সাহচর্যে কাজ করতে ভালবাসেন বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তিনি বড় একটা অনুগামী হন না; অধিকাংশ স্থলে নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে থাকেন। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে একটা খোলাখুলি ভাব আছে এবং যদিও মধ্যে মধ্যে তিনি ব্যবসাদারী চাল চেলে থাকেন, তাহ'লেও পরক্ষণেই তা স্বীকার করতে তাঁর বাধে না।...তাঁর কর্মের সঙ্গে প্রায়ই জনসাধারণের কোন সংস্রব থাকে...জাতক স্বদেশে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং প্রায়ই পরিবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব'লে গণ্য হন। উচ্চ ও সম্ভ্রান্তবংশীয় বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব থাকে।...জাতককে অনেক ভ্রমণ করতে হয়, দূরদেশে জলপথে ভ্রমণও অসম্ভব নয়।...জল ও জলীয় পদার্থ তাঁর দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।...তাঁর অনেক ব্যাধি জল চিকিৎসার দ্বারাই আরোগ্য হ'তে পারে।...জাতক বেশ লোকপ্রিয় হ'য়ে থাকেন। জনসাধারণকে সুখী করার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়।...জাতক নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হ'তে পারেন।

ভাগ্যনিয়ন্তা প্রজাপতির স্বরূপ

প্রজাপতি শক্তির বেগে কাজ করতে চায়। এই প্রচণ্ড বেগের জন্য প্রজাপতির মধ্যে একটা প্রবল ব্যক্তিত্ব প্রকটিত। সে ব্যক্তিত্ব এমনি প্রবল, এমনি প্রচণ্ড যে, সূর্যের মর্যাদা, বৃহস্পতির জ্ঞান-গৌরব, মঙ্গলের বীরত্ব ও শনির ধার্মিকতাও গান্ধীর, সকলকেই তার সামনে মাথা নত করতে হয়। তাঁর মধ্যে অহমিকা বোধ নেই, কিন্তু তাঁর তেজ অসহ্য। তিনি যে পথে অগ্রসর হন, সঙ্গে যারা থাকলেও

তাঁর অতিক্রান্ত হয় না, দৃঢ়, নির্ভীক অবিচলিত পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চলেন।

প্রজাপতির মধ্যে ভয় বা দ্বিধা ব'লে কিছু নেই—তাঁর বুলি "মন্ত্রয়া সাধয়েয়ং শরীরয়া পাতয়েয়ম্।" (কার্যসিদ্ধি ইহা মরেতে)!

মঙ্গলের সাহস চঞ্চল। তার পিছনে ক্রোধ আছে তা অপরকে আঘাত করে এবং আত্মরক্ষায় সতর্ক। প্রজাপতির সাহস শান্ত অথচ বেগবান—তার মধ্যে ভয়ের একান্ত অভাব। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আত্ম-রক্ষার চিন্তা সে সাহসের মধ্য দিয়ে উঁকি মারে না। সে সাহস দৃঢ় নীরব, অচঞ্চল।

প্রজাপতির অধিকারে যাঁদের জন্ম তাঁদের জীবনে অল্প আয়াসে সহসা ও অতর্কিতভাবে ঘটে। তাঁদের বিবাহ হয় সহসা, বিচ্ছেদ হয় সহসা, উন্নতি হয় সহসা, অবনতি হয় সহসা, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত সহসা ঘটে।

উপরে যে কিছু কিছু উদ্ধৃত করলুম, তার মানে আমি বোঝাতে চাই যে, মহাত্মার রাশি চক্রটি ঠিক। এটা বোঝানো দরকার এই জন্য যে, এই রাশি চক্রকে ভিত্তি করেই তাঁর পোড়ানীর অবসানের ব্যাপারে গ্রহের প্রভাব কতখানি ছিল তা জানা যাবে। মহাত্মার কর্মবহুল বিচিত্র জীবনের জ্যোতিষিক বিশ্লেষণ এখানে করব না, তাঁর ৭৯ বর্ষে গ্রহের কী রকম প্রভাবের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটল শুধু সেইটুকুই বিচার করব। কিন্তু তার পূর্বে তাঁর জন্মকুণ্ডলীর মধ্যে এই রকম কোন দুর্ঘটনা সূচিত হয় কিনা, তা দেখা দরকার। কেন-না, জন্মচক্রে যে ঘটনার সম্ভাবনীয়তা নেই, সে রকম কোন ঘটনা কারো জীবনে ঘটে না।

সাধারণতঃ রক্তপাত সূচিত হয় জন্মকুণ্ডলীতে যদি ষষ্ঠ ও অষ্টমের কোন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ থাকে। এই যোগ থাকলে, আঘাত অস্ত্রোপচার, দুর্ঘটনায় রক্তপাত, আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব প্রভৃতির কোনটা না কোনটা ঘটবেই; এবং তার সঙ্গে যদি লগ্ন জড়িত থাকে, তাহলে সে দুর্ঘটনায় মৃত্যু পর্যন্ত হ'তে পারে। মহাত্মার কুণ্ডলীতে ষষ্ঠপতি বৃহস্পতি ও অষ্টম-পতি শুক্র পরস্পরকে শত্রুদৃষ্টিতে পীড়িত করছে এবং এই শুক্র ও বৃহস্পতি আবার চন্দ্র, মঙ্গল ও রুদ্রের অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত। শুক্র লগ্নপতিও বটে। অবশ্য তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ প্রজাপতি বলবান লগ্নপতি, অষ্টমপতি ও ষষ্ঠপতিকে শুভদৃষ্টিতে অনুগৃহীত করায় এবং চন্দ্র কর্কক্ষেত্রে থেকে বলবান হওয়ায় মহাত্মার দীর্ঘ আয়ুর যোগ নির্দেশ করে। এ রকম ক্ষেত্রে যার নিজে আয়ু অনেক সময় নব্বুইএর কোঠায় পৌঁছে। কিন্তু মঙ্গল লগ্নে থেকে লগ্নস্থ বক্রী রুদ্রের দ্বাদশ অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত হওয়ায় নিজের হঠকারিতা অথবা অসতর্ক উদাসীনতায় সহসা আয়ু খণ্ডিত হ'তে পারে। বিশেষতঃ যে সকল বর্ষে এই মঙ্গল ও রুদ্রের প্রভাব প্রবল সেই সকল বর্ষগুলিতে এই শ্রেণীর দুর্ঘটনার আশঙ্কা খুব বেশী। দেখা যাক মহাত্মার ৭৯ বর্ষের চালিত চক্রে গ্রহের প্রভাব কী ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল। মহাত্মাজীর ৭৯ বর্ষের চালিত কুণ্ডলী হয়েছিল এই রকম—

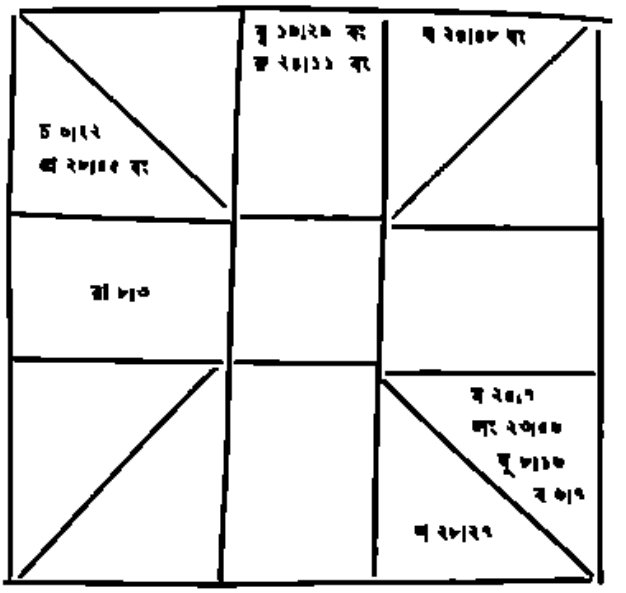

১ম ৩।৭।৪৭ ; ১১শ ৭।৪।১ ; ১২শ ৭।২৯।১৮
লং ৮।২৩।৫৬ ; ২য় ৯।২৮।৫৯ ; ৩য় ১১।৫।২০

এই চালিত কুণ্ডলীর কাল শুরু হয়েছিল গত ২রা অক্টোবর ১৯৪৭ থেকে। এই চক্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, লগ্ন-বিন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা হয়েছে মঙ্গল, রবি ও বুধগ্রহের এবং এই লগ্ন-বিন্দুর প্রধান সাংঘাতী প্রেক্ষা হয়েছে রুদ্রের সঙ্গে; সুতরাং রুদ্রের প্রভাবই এ বর্ষের সব চেয়ে বেশী। তাঁর জন্মকালে রুদ্রের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষা ছিল লগ্ন ও অষ্টমপতি শুক্রের সঙ্গে এবং লগ্নস্থ মঙ্গল ঐ রুদ্রের ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে ষষ্ঠপতি বৃহস্পতির অশুভ প্রেক্ষায় যুক্ত হয়েছিল। রুদ্র ও মঙ্গলই মহাত্মার প্রবল মারক, কেন না তারা তাঁর দেহ (লগ্ন), স্বাস্থ্য (ষষ্ঠ) ও আয়ু (অষ্টম) এ তিনটির উপরই অশুভ প্রভাব স্থাপন করেছে। সুতরাং বর্ষটি যে মহাত্মার নিষ্ঠুর বর্ষ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জন্মকালে মহাত্মার লগ্ন, ষষ্ঠ ও অষ্টম রুদ্র ও মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হয়েছিল, ৭৯ বর্ষের চালিত চক্রেও, রুদ্র চালিত-লগ্ন, অষ্টম ও ষষ্ঠকে পীড়িত করেছিল। লগ্নস্থ রবি যুক্ত অষ্টমপতি চন্দ্র ও ষষ্ঠপতি শুক্র সবই রুদ্রের দ্বারা পীড়িত। তা ছাড়া জন্মলগ্নে যেমন লগ্ন, ষষ্ঠ ও অষ্টমের বিরুদ্ধ যোগ ছিল, চালিত চক্রেও সেই যোগ প্রবল। অষ্টমপতি চন্দ্র লগ্নপতি বৃহস্পতির অশুভ প্রেক্ষা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে ষষ্ঠপতি শুক্রের অশুভ প্রেক্ষায় যুক্ত হয়েছে এবং এ সবগুলিই তাঁর বর্ষনিয়ন্তা রুদ্রের দ্বারা প্রপীড়িত।

রুদ্র কল্যাণীর অধিপতি, সুতরাং মহাত্মার কুণ্ডলীতে তা দ্বাদশ-পতি। এই দ্বাদশভাব নির্দেশ করে শত্রু, গুপ্ত ষড়যন্ত্র ইত্যাদি এবং রুদ্র লগ্নকে আছে, যে লগ্নভাবের শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদির প্রাবল্য। সুতরাং শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে কোন গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাঁর জীবন বিনষ্ট হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়।

এই ঘটনা কখনের কোন্ সময় ঘটবে, তা জানতে হ'লে, চালিত চন্দ্র লগ্ন ও চন্দ্রকে চালনা করতে হয় এবং সেই বর্ষের প্রত্যেক অমাবস্যের সময় গোচর ফল বিচার করতে হয়।

মহাত্মার ৭৯ বর্ষের চালিত কুণ্ডলীতে লগ্নের গতি ছিল প্রত্যেক মাসে ৪ কলা ক'রে এবং চন্দ্রের গতি ছিল প্রতি মাসে ১ অংশ ৩ কলা করে; সুতরাং ২রা জানুয়ারি (৩ মাস পরে) লগ্নবিন্দু হয় ধনুর ২৪ অংশ ১১ কলা এবং চন্দ্রের স্ফুট হয় বিণুনের ৯ অংশ ২৪ কলা। ২রা ফেব্রুয়ারি লগ্নবিন্দু ২৪ অংশ ১৩ কলা ও চন্দ্র ১০ অংশ ৩০ কলা।

চালিত কক্ষের সঙ্গে চালিত লগ্নের যে শুভ প্রেক্ষা ছিল ২রা জানুয়ারি তারিখে তা সম্পূর্ণ হয় এবং তারপর লগ্ন অগ্রসর হ'তে থাকে মঙ্গল ও বরুণের অশুভ প্রেক্ষার দিকে।

চন্দ্র ২রা জানুয়ারির কয়েকদিন আগেই চালিত কক্ষের অশুভ প্রেক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং ঐ ২রা জানুয়ারিতেই জন্মকালীন লগ্ন ও অষ্টমপতির সঙ্গে অশুভ সেরোয়ার প্রেক্ষা সম্পূর্ণ করে। তারপর ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে জন্মকালীন কক্ষের সঙ্গে তার অশুভ প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হয়—তার অব্যবহিত পরেই তার অশুভ প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হয় জন্মকালীন মঙ্গলের সঙ্গে ২০শে ফেব্রুয়ারি। সুতরাং ২রা জানুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি তাঁর অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়।

১১ই জানুয়ারি ১৯৪৮ যে অমাস্য হয়, তাতে দেখা যায় যে মহাত্মার লগ্নপতি ও অষ্টমপতি শুক্র মকরে চতুর্থ রাশিতে থেকে শনি ও রাহুর দ্বারা ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত হয়েছে এবং জন্মকালীন বৃহস্পতির সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষা। গোচরে ষষ্ঠী শনি জন্ম—বৃহস্পতির অশুভ প্রেক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জন্ম-চন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হ'তে যাচ্ছে। সুতরাং এই অমাস্যটিও যে বিশেষ অশুভের নির্দেশক, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই অমাস্যক্ষে একটি ভাল যোগ ছিল গোচরে শনি ও বৃহস্পতির শুভ প্রেক্ষা; কিন্তু ২৩শে জানুয়ারি ঐ শুভ প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়ে বৃহস্পতি প্রজাপতির অশুভ প্রেক্ষার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। ঐ অশুভ প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হয় ৩রা ফেব্রুয়ারি।

কাজেই ২৩শে জানুয়ারি থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহাত্মার এ বছরে সব চেয়ে সঙ্কটপূর্ণ সময় ছিল।

বড়ই দুঃখ হয় যে, মহাত্মার নিজেরও কলিত জ্যোতিষে আস্থা ছিল না এবং তাঁর যে সব ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করছেন, তাঁরাও জ্যোতিষকে আমল দেন না। এই নেতারা যদি জ্যোতিষে বিশ্বাস ক'রে ঐ ২৩শে জানুয়ারি থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহাত্মাকে সযত্নে রক্ষা করতে পারতেন, তাহ'লে তাঁকে আমরা হারাতুম না। অবশ্য কক্ষ ও মঙ্গলের প্রতিকূল প্রভাবে মহাত্মার মধ্যে এ সময়ে উদাসীনতা ও হঠকারিতা প্রকাশ পেয়েই; কিন্তু তাঁর রক্ষকদের কর্তব্য ছিল, এই কটা দিন যাতে তিনি কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ্য সভায় যোগ না দেন এবং তাঁর বাসস্থান যাতে ভালভাবে রক্ষিত হয়—তার ব্যবস্থা করা।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। অনেকে মনে করেন যে, গ্রহের শক্তিই একমাত্র শক্তি এবং গ্রহ যা নির্দেশ করে তার নড়চড় নেই। এই ধারণা একটা মস্ত বড় ভুলধারণা। বস্তুতঃ জ্যোতিষ থেকে আমরা নির্দেশ পাই, কোন্ কোন্ সময় গ্রহের প্রভাব কোন ব্যাপারের সঙ্গে অনুকূল বা প্রতিকূল। আমরা যদি তা বুঝে সেই হিসাবে আচরণ নিয়ন্ত্রিত করি, তা হ'লে গ্রহের প্রভাবের বহু কুফল এড়াতে পারি এবং শুভফল বাড়াতে পারি।

সে যা-ই হোক উপরে মহাত্মার কুণ্ডলী থেকে তাঁর মূল্যবান্ জীবনের শোচনীয় অবসান সম্বন্ধে গ্রহের প্রভাবের যে বিশ্লেষণ দিয়েছি, তাতে জ্যোতিষের ফলাফলে যে আস্থাবান্ হওয়া যায়, এ কথা যদি শিক্ষিত সমাজ বোঝেন, সেটাও একটা পরম লাভ। আমাদের নেতারা যাঁরা সময়ে অসময়ে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি ব'লে কলরব করেন, তাঁদের মনে রাখতে অনুরোধ করি যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জ্যোতিষের বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এদিকে লক্ষ্য রাখলে, রাষ্ট্রকেও তাঁরা অনেক বিভ্রাটের ব্যাপার থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন।

বেশী বলা অনাবশ্যক।

বিস্ময়

শ্রীশান্তশীল দাশ

যেদিকে তাকাই বিস্ময় জাগে মনে,
অর্থ কিছুই পাই নাকো খুঁজে তার;
একদিকে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল অকারণে,
ওদিকে জাগিয়ে ক্রন্দন, হাহাকার।

একদিকে শুধু বিলাসের সম্ভার,
অপব্যয়ের নিত্য নব আয়োজন।
আর দিকে দেখি দারিদ্র্য অনাহার,
তিলে তিলে চলে মরণের আরাধন।

প্রাসাদের মাঝে জীবনের অবসান,
হাসি, আনন্দ, সংগীত অবিরত;
পথের ধূলায় লোটে সহস্র প্রাণ,
দৃষ্টির দ্বারা তবুও অব্যাহত!

কোন সে খেয়ালী ভাবিতে বুঝি না-যে,
এ বিশ্বের খেলা খেলিছে ধরণী মাঝে।

শ্রীপাদপদ্ম

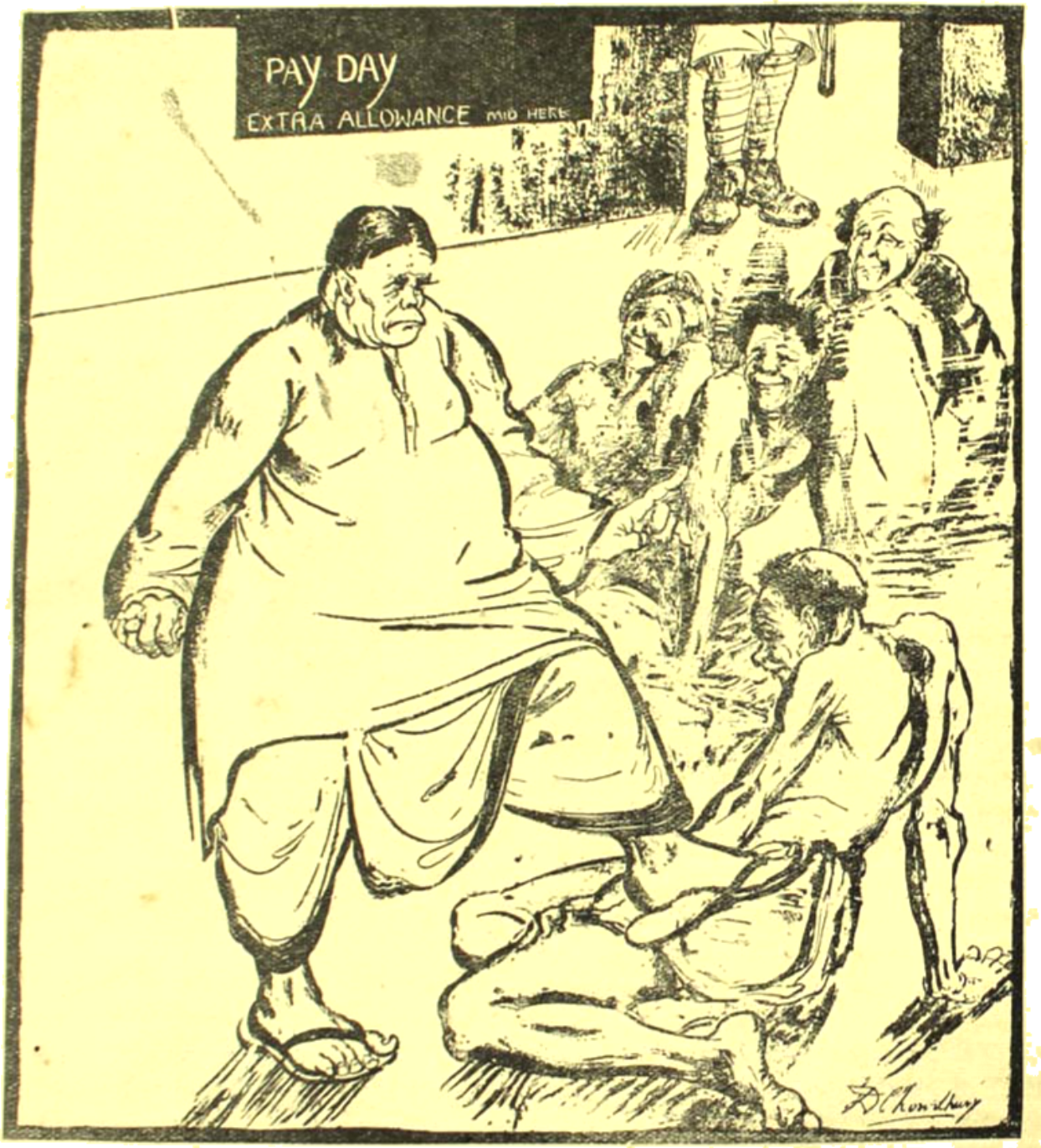

পেটে খেলে পিঠে সয়

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

জাহানারার আত্মজীবনী*

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(দ্বিতীয় স্তবক)

[আত্মকাহিনীর দ্বিতীয়ের পূর্ব পরিচয়ের কথা বলা হয় নি। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের মধ্যে বর্ষাধিকের কাহিনী অবলুপ্ত]

* * * *

সূর্য অস্ত যাচ্ছে ; বাতাস মৃদুগতি, সুন্দর পুষ্পগন্ধে বরষী আমোদিত হচ্ছে, আগ্রা-প্রাসাদের আঙুরীবাগের(১) প্রত্যেকটি ফুলের সঙ্গে আমার একটি অতীত স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

রক্তোজ্জ্বল ফুলের রক্তস্তবক দেখে মনে হচ্ছে যেন ভোজনাগারের পথে রক্ত-আলোর শিখা। আমার ভ্রাতাদের বিবাহের উৎসবে আমি কত রজনীতে এই রক্তোজ্জ্বল গুচ্ছ দিয়ে বাদর ঘরের মালা গেঁথেছি। নীলাভ হোলিওট্রোপ মৃদু বাতাসে দুলছে—তাদের স্নিগ্ধ গন্ধ বাতাসের সঙ্গে এক দুঃখের নিঃশ্বাস বয়ে আনছে, আমি অতীতের স্মৃতিভারে জড়িয়ে আছি।

দেওয়ান-ই-আমের(২) সঙ্গীত বিস্মৃত, কিন্তু সন্ধ্যার আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে এক করুণ সুর। মনে হচ্ছে যেন রক্তপোলাপের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে "বুলেবার"(৩) সঙ্গীত। তার সুরের শিহরণ এই দুর্বিষহ ক্লেদ ভেদ করে আমার কামনার রাজ্যে নিয়ে পৌঁছায়। আমি বুলেবার নাম দিয়েছি "ঘর"। বুলেবার বামপাশে আমি উত্তেজনাকে আনন্দমুহূর্তে বলে কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গীত আমাকে নিয়ে গেছে সেই রাজ্যে যেখানে আমার চরণ কখনও ভূমিস্পর্শ করে নি। আজ তার রূপ আমার স্মৃতিপটে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবু তার সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি.....

দ্বিতীয় প্রাসাদে শালিমার বাগে যৌবনের মত আমি উড়ে বেড়িয়েছি। যৌবনি প্রতিমুহূর্তে পুষ্পপাত্রে ঘুঁজে বেড়িয়েছে উত্তেজনা। প্রতিমুহূর্তে সে উত্তেজনার এগিয়ে এসেছে বিভীষিকার প্রান্তে অন্ধকার মৃত্যুর অন্বেষণে। মণিমাণিক্যোজ্জ্বল বক্ষিয়ানী খঞ্জরেণু পাখার মেখে নৃত্য করতে করতে সূর্যের দিকে ছুটে চলেছে ; চিরন্তন আলোর সাথে যে নব-জীবন লাভ করবে, সে মরবে না—কারণ আকাশে তারার মালা জ্বলছে।

আমি ভয়ে শিউরে উঠেছি, আমার রূপ আমি আমার কল্পলোকে পৌঁছবার আগেই যদি ম্লান হয়ে যায়, তখন ত আমি আর সেই বেগম জাহানারা থাকব না। আমার প্রিয়তমের হৃদয়রাণী হয়ে জীবনের শেষমুহূর্ত শেষ করতে পারব না। ভাগ্যদেবীর পানপাত্র পান করেছি আমি আকণ্ঠ। তবু আজও আমি তৃষ্ণাতুরা।

ঐ অস্তসূর্যের রক্তিমরশ্মি জীর্ণ পত্রপিয়ের সোণার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। তেমনি আমার প্রিয় "রাজার" (বুলেবার) শিরে আমি পরিয়ে দিচ্ছি স্মৃতির মুকুট।

আমি আজও সেই ছবি দেখছি—যেদিন দেওয়ান-ই-আমের দরবার কক্ষে আমার প্রিয়তম প্রথম সম্রাট শাহজাহানকে অভিবাদন করেছিল। সেদিন আমি ছিলাম তরুণী, ষোড়শবসন্তের মদ চোখের দৃষ্টি অতিক্রম করে চলে গেল। বাঁশীর সুর, করতল ধ্বনি শান্ত—চারিদিকে গম্ভীর গৌরবতা, আমি মহলের কারোয়ার(৪) পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ঐ আমার রাজা ধীর পদক্ষেপে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার সমস্ত রক্ত জমাট হয়ে যাচ্ছে। একি? বিশ্বজয়ী নল(৫)? রাজা নল কি আমার গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছেন? তাঁর চক্ষে ভাস্বর অপরূপ জ্যোতি—মনে হচ্ছে যেন অতিসুদূর বন্যসুরভি স্বপ্নের আবেশ। তাঁর আকৃতিতে রয়েছে তাঁর ক্ষাত্রবল ঐশ্বর্যের পরিচয়—ক্ষত্রিয় বংশই ভারতবর্ষ শাসন করার উপযুক্ত বটে। যে মুহূর্তে চারণ তার বীণায় যুদ্ধের গানে ঝঙ্কার দেয়—রাজপুত কৃষ্ণকায় অশ্বকে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আনে। বরবর্ণী যেমন একদিন দেবতাদের বাদ দিয়ে নলকে বরণ করেছিলেন আমিও আমার হৃদয়ে তেমনি এই রাজপুতের চরণে আমাকে নিবেদন করেছিলাম। এমন নতি এর আগে

---

(১) আগ্রা রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের জন্য নির্দিষ্ট দেওয়ান-ই-আমের অপর পার্শ্বে লালের উদ্যান।

(২) মোঘল প্রাসাদের সাধারণ দরবার কক্ষ।

(৩) শাহজাহানের বিশ্বস্ত রাজপুত সামন্ত বুন্দীরাজ ছত্রশালের ছত্রবাস।

(৪) মোঘল রূপসীতে প্রাচীর ও জানালার পার্শ্বে সাদা কিংবা মশলা দিয়ে তৈরী জালের কাজ—অপরিবর্তনীয় পর্দার মত ব্যবহার করা যায়।

(৫) মহাভারত বর্ণিত রাজা নল, দময়ন্তীর স্বামী, স্বয়ম্বর সভায় দেবতাকে উপেক্ষা করে দময়ন্তী নলরাজাকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। জাহানারা হিন্দুশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর জীবনীতে হিন্দু-শাস্ত্রালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

---

* গতবারে ভুলক্রমে জাহানারার আত্মজীবনীর প্রথম স্তবক "মোঘল রাজকুমারী" নামে প্রকাশিত হয়। অবিকল বদলে নামে প্রকাশিত হবে।

কারও কাছে স্বীকার করি নি—এর পরেও করি নি। প্রথম দর্শনে আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের পূজা সমর্পণ করলাম। এখনও তাঁকেই তিনি আমার অন্তরের দেবতা—আজও তিনি আমার দেবতাই আছেন।

প্রজাপতি সূর্য্যের আলোয় মৃত্যু করছে—আমি আমার পাষাণের মধ্যে বিলীন হয়ে যাব, সাবিত্রীর মত মৃত্যুকে আমি জয় করব। পৃথিবীর অপর তীরে আমি আমার রাজার অনুসরণ করব আমার সীমাহীন কামনা রাজ্যের মধ্য দিয়ে—যেখানে আমার কোনও পথ নেই।

আমার ভ্রাতা আওরঙ্গজেব সঙ্গীত বিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। সঙ্গীত-শিল্পীরা তাদের বাদ্যযন্ত্র পথযাত্রার সমারোহে সমাধিস্থ করেছে(৩)। কিন্তু সম্রাটের কোনও অনুশাসনই আমার অন্তরের সঙ্গীতকে স্তব্ধ করতে পারে নি।

প্রাচীরের মত কঠোর মৃত্যু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোষণা রাজকুমারীর বিবাহ হবে না—এই ছিল সম্রাট আকবরের আদেশ। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সম্রাট আকবর ঘোষণা রাজকুমারীকে উৎসর্গ করেছিলেন।

দূরে ঐ স্বপ্নের অপর প্রান্তে পাহাড়ের উপরে একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সেই প্রাসাদের শুভ্র মর্ম্মর তোরণ আর সুবর্ণখচিত দ্বার শান্ত জলরাশির উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। জলধারার অন্তরে বাইরের অপার বিস্তৃতা। কারণ সেখানে তিনি আর নেই। কিন্তু সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাঁকে বেষ্টন করে আমি রচনা করতাম আমার রাজসভা। সেই সভায় ঘোষণা রাজকুমারীর জোড়-উৎসবে স্বর্গের দেবতারা চর্চ্চারিত হয়ে উঠতেন। সে ভোজন কক্ষে সুশীতল মর্ম্মর শিলাতলে মর্ম্মরীর নূপুরনিক্কণ কম্পন জাগাত। ভোজনের অবসরে কাবুল কাশ্মীরের রত্নখচিত পাত্রের সুরাধারা চিন্তার স্রোতকে স্তব্ধ করে দিত। না, না, আমি আমার ভ্রাতা দারার স্বপ্ন সফল করে দিতাম। হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি—সুধারায় মিলন করিয়ে দিতাম। সরযূ সুধা সাধু সন্ত যোগীদের প্রেমবারি সিঞ্চন করে অমূল্য সুধারসে তৈরী করে দিতাম। সে সুরা রূপ নিত কাব্যের ঝঙ্কারে, আমার মূর্চ্ছনায়। মনে পড়ে একদিন সম্রাট আকবরের রাজসভায়……

ঐ সোন প্রোতস্বিনীর বুকে জলের বদলে বইত কলতান—অমৃতী-বাগের পাশ দিয়ে চলেছে যমুনার স্বচ্ছ শান্ত জলধারা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আজ আমার কর্ণে এই শান্ত করুণ সুর দিল্লীর ঐশ্বর্য্যভরের মত মুখর হয়ে উঠছে। এই স্রোতস্বিনীর তীরে আমার কাছে ছিল আমার ফিরোজাবাদের পরিখার পাশে আমার উদ্যানবাটিকার সুখাতুর স্মৃতি। ঐ কারতালের কলরোল, ঐ বীণার ঝঙ্কার আজ যমুনার জলে ভেসে এসে আমার নিশাবসানে ঐ স্থানের চিন্তায় মুখরিত করে দিচ্ছে। ঐ দিল্লীর প্রাসাদের ঐকতান সঙ্গীত যেন আমার বিগতের আশঙ্কায় মানুষের আর্ত্তনাদ, আমার অভিশাপের অনুভূতি।

তখনও আমার ভ্রাতা সুজা বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হন নি, তখনও সেই রাজপুরীর পাশ দিয়ে অসংখ্য বাসিনীর অভিযান(৭) তার দৃষ্টিপথে ধরা দেয় নি। অর্থলোভী গণক তাকে তখনও বলে নি যে ঐ ক্ষুদ্র শ্বেত সর্প যেটি বিরাট কাল ফণিনীর শিরে ফণেছিল(৮) সেটা সুজার ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য প্রাপ্তির ইঙ্গিত। তখনও ভ্রাতৃবিরোধের শিখা জ্বলে ওঠে নি। কিন্তু ক্লান্তি মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর ছড়িয়ে পড়ছিল। উৎসব দিনের বিশ্লেষণে সূর্য্যের শেষ রশ্মি-রেখার মত রাজপ্রাসাদে তার উৎসবের দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে।

আমার উদ্যানবাটিকায় আমি প্রতীক্ষা করেছিলাম। আমার রাখী-বন্ধ ভাই(৯) কি আসবে না। যখন হিন্দুস্থানে সমস্ত বৈরীশক্তি উধাও হয়ে উঠেছে সে কি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে না? কোন নারী কি তাকে আমার চেয়ে মূল্যবান রাখীবন্ধন দিয়েছে? আমি আমার ঘুণ্যমান ভ্রাতাকে যে প্রীতির বাঁধনে বেঁধে দিয়েছি তার মূল্য যে অমূল্য।

আমার প্রিয়তম এসেছিল যখন প্রথম সান্ধ্যতারা আকাশে উঠেছিল—তখন সূর্য্যাস্তের লজ্জা আকাশে রক্তিমরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল। তার আগমনের পদধ্বনি শুনে আমি বহুধাতু হয়ে অভিবাদন করলাম।

(ক্রমশঃ)

---

(৩) আওরঙ্গজেব সঙ্গীত নিষিদ্ধ করার পর সঙ্গীতশিল্পীরা একদিন এক শবযাত্রা বের করে। কৌতূহলী হয়ে যখন আওরঙ্গজেব প্রশ্ন করলেন—"কার শবযাত্রা?" উত্তর দেলেন—"সঙ্গীতের।" আওরঙ্গজেব বললেন—"কবর যেন ভালভাবে দেওয়া হয়।"

(৭) কথিত আছে শাহ সুজার প্রমোদকক্ষের সম্মুখ দিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় এক সহস্র নারী পথ অতিক্রম করত। সে বৃদ্ধ সুজার নয়ন চরিতার্থ করত।

(৮) মোগল রাজবংশে জ্যোতিষ চর্চ্চার অত্যন্ত প্রসার ছিল। জীবনের প্রত্যেক ঘটনার ব্যাখ্যায় জন্য রাজজ্যোতিষীকে আহ্বান করা হত। একদিন একটি কৃষ্ণসর্পের মস্তকোপরি সমাসীন একটি ক্ষুদ্র শ্বেতসর্প রাজপুরীর প্রাঙ্গণে দেখা যায়। এই অদ্ভুত দৃশ্য ব্যাখ্যার জন্য রাজজ্যোতিষী আহূত হন। জাহানারার জীবনীতে সেই ঘটনারই ইঙ্গিত রয়েছে।

(৯) মোগল সমাজ-জীবনে হিন্দুর রাখীবন্ধ উৎসব সাদরে সমাপন হত। প্রতি বৎসর নিকট আত্মীয় বা প্রিয়জনকে সংখ্যায় ভিন্নরূপে রাখী প্রেরণ করে হিসেব লক্ষ্য স্থাপন করা হত। বুন্দেলা পরিবারের সঙ্গে এবনি করে গড়ে উঠেছিল তৈমুর পরিবারের প্রীতির বন্ধন। আহানারার রাখীবন্ধ ভাই ছত্রসাল বুন্দেলা বা "বুন্দেলা"।

কংগ্রেসের নীতি বিবর্তন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের মিলন-মন্ত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে স্বাধীন ভারতে আজ আবার নতুন নীতি গ্রহণ করেছে, তার নবযাত্রার পথে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বৃটিশের কবল থেকে পরাধীন ভারতকে মুক্ত করা। কংগ্রেসের সেই মূল উদ্দেশ্য সফল হওয়ায়, এবার সে তার নীতি পরিবর্তন ক'রে চলেছে, গ্রামে-পাথা-ভারতের দুঃস্থ জনগণের সেবার পথে।

আজ হ'তে ৬০ বছর আগে, ভারতের এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান প্রথম নিন্দিত হয়েছিল, বোম্বাইএর গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত ভবনে। সেদিন সারা ভারতের মাত্র ৭২ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন সেই সম্মেলনে। তারপর কালের সঙ্গে সঙ্গে সেই নবোদগত প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতের দিকে দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে পরিণত হ'ল এক সুবিশাল মহীরুহে। শোষক শাসকের কাছ হ'তে নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতন মাথায় নিয়ে, চলার পথ পরিবর্তন করতে করতে সেদিনের যে কংগ্রেস, কেমন ক'রে যে আজকের এই কংগ্রেসে পরিণত হয়েছে, সে ইতিহাস যেমনি রোমাঞ্চকর, তেমনি আবার মর্মন্তুদও।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইএ কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন বসেছিল, তাতে তখন কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল, তা হচ্ছে—(১) ভারতের বিভিন্ন স্থানের দেশসেবক কর্মীদের মধ্যে সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। (২) পরিচয়ক্ষেত্রে জাতিগত, ধর্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা দূর করা এবং লর্ড রিপণের শাসনকালে যে জাতীয় একতাবোধের সৃষ্টি হয় তার পরিপুষ্টি সাধন করা। (৩) ভারতের সামাজিক সমস্যা সমাধানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত সংগ্রহ করা এবং (৪) পরবর্তী বৎসরের জন্য রাজনীতিবিদগণের কার্যপ্রণালী কি হবে, তা নির্ধারণ করা।

আর কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—(১) ভারতের শাসন কার্য সম্পর্কে তথ্য করবার জন্য একটি রয়াল কমিশন নিযুক্ত করতে হবে। (২) ভারত সচিবের পরামর্শ পরিষদের বিলোপ সাধন করতে হবে। (৩) নির্বাচিত সদস্য গ্রহণ ক'রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সংস্কার করতে হবে। (৪) সামরিক ব্যয় কমাতে হবে। (৫) বিলাতের ন্যায় ভারতেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

কংগ্রেসের এই প্রথম বৈঠকের পর থেকে প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হতে লাগল এবং নেতারা প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে, সরকারের নিকটে আবেদন নিবেদন জানাতে লাগলেন। এই ভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। তার পর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন বসল। এই সময় থেকে কংগ্রেসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। কংগ্রেসের মধ্যে এক দল চরমপন্থী দেখা দিলেন। মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলক, বঙ্গবীর বিপিনচন্দ্র পাল, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় প্রভৃতি এই চরমপন্থীদলের নেতা হলেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ এই চরমপন্থী-দল আবেদন নিবেদন ছেড়ে কংগ্রেসকে সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়তে চাইলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নরমপন্থীরা এতে বাধা দিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে এই দুই দলের বাদানুবাদ চলল কিছুদিন।

এরপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাশীতে মহামতি গোখলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল, তাতে বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বিদেশী পণ্য বর্জনকে অন্যতম রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হল। পরবৎসর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসে, তাতেই সর্বপ্রথম স্বরাজ স্থাপনের দাবী জানান হয়।

তারপর আরও কয়েক বছর কেটে গেল। এল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। তখন পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ সবেমাত্র ফেটেছে। ভারতবর্ষ এই মহাযুদ্ধে ইংরাজকে প্রায় দশ লক্ষ সৈন্য ও প্রভূত অর্থ সাহায্য ক'রে লাভ করল, রাউলাট আইন।

ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশের এই প্রত্যুপকারের বিশ্বাসঘাতকতায় দেশবাসী একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। ভারতের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে এসে দেখা দিলেন, মহাত্মা গান্ধী। ইতিপূর্বে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে এক অভিনব পন্থায় সংগ্রাম চালিয়ে জয়যুক্ত হয়েছেন। এবার রাউলাট আইনের প্রতিবাদে সেই সত্যাগ্রহ নীতিতেই দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। তাঁর সেই উদাত্ত আহ্বানে আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারত মুহূর্তকাল মধ্যেই বহুকালের জড়তা ত্যাগ ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াল।

সেই থেকেই মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সঙ্গে পুরাপুরিভাবে জড়িয়ে পড়লেন এবং কংগ্রেস ও গান্ধীজী ওতঃপ্রোতভাবে এক হয়ে গেল। গান্ধীজী কংগ্রেসে যোগদান করলে তাঁর উদ্যমেই কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ভার দেওয়া হল। গান্ধীজী, তিলক ও দেশবন্ধুর মনোনীত দুজন সদস্যকে নিয়ে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনা করলেন।

গান্ধীজীর কংগ্রেসে যোগদানের পূর্বে কংগ্রেস একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল। জনসাধারণের প্রবেশ এর মধ্যে একরূপ ছিলই না। গান্ধীজীই একে প্রথম ভারতের সর্বজনসাধারণের

প্রতিষ্ঠান ক'রে তুললেন এবং কংগ্রেসের মুক্তির বাণী সুদূরতম পল্লীর বিস্তৃত ভূমিতে পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপন্থা গ্রহণ করালেন। পরে ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সমর্থিত হল এবং কংগ্রেসের মূলনীতি পরিবর্তন ক'রে স্থির করা হল—সকল প্রকার বৈধ ও নিরুপদ্রব উপায়ে ভারতের জনসাধারণের জন্য স্বরাজ লাভ করাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

এই স্বরাজ সম্বন্ধে তখন বলা হয়েছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে অথবা আবশ্যক হলে সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে স্বরাজ লাভ করতে হবে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের নীতি পুনরায় গৃহীত হয় এবং তাঁকে এই আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত করা হয়। কংগ্রেস মহাত্মার এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করায় কংগ্রেসে এযুগ থেকেই এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সুরু হল।

সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। বিদেশী বয়কট, বিলাতী বস্ত্রের বহ্নুৎসব, খাজনা বন্ধ, স্কুল, কলেজ, আদালত প্রভৃতি বর্জন আরম্ভ হল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট আন্দোলন দমন করবার জন্য সত্যাগ্রহীদের উপর অকথ্য নির্যাতন সুরু করল। এই সময় চৌরীচৌরায় সত্যাগ্রহীরা ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন ক'রে ২২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারল। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহীদের এই হিংসা পথ অবলম্বন করায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন তখনকার মত বন্ধ ক'রে দিলেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য বলে প্রথম ঘোষণা করা হল এবং এই সময়েই কংগ্রেসে স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য গ্রহণের নীতি প্রবর্তন করা হল। সেই অনুযায়ী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী প্রথম স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাক্য গ্রহণ করা হয়। এর কয়েকদিন পরেই মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসল এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হবে স্থির করা হল। মহাত্মা গান্ধী এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লবণ আইন ভঙ্গ করাই স্থির করলেন। তিনি ১২ই মার্চ তারিখে ৭৯ জন সত্যাগ্রহীকে সঙ্গে নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে পায়ে হেঁটে ২০০ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে ডাণ্ডী অভিমুখে রওনা হলেন। ৫ই এপ্রিল সেখানে পৌঁছে তিনি লবণ-আইন অমান্য করলেন।

মহাত্মার ডাণ্ডি অভিযানে সমগ্র ভারতে আবার এক প্রবল সাড়া পড়ে গেল। ভারতের সর্বত্রই আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হল। বৃটিশ আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য পশু অত্যাচার সুরু করল। কংগ্রেসের নেতা ও সত্যাগ্রহীদের দিয়ে কারাগার ভর্তি করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা মুক্তি পেলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হল এই সময়ে এবং লোকের বিনা বিনা প্রয়োজনে সবর প্রস্তুত করতে পারবে তা গবর্মেণ্ট মেনে নিল।

এর পর আরও কয়েক বছর কেটে গেল। গান্ধীজী কংগ্রেস কর্মীদের ছোটখাট সংগ্রাম ও নানাবিধ গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে আগিয়ে নিয়ে চললেন। আবার দেখা দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। গান্ধীজী এই সময় ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন না ক'রে, ব্যক্তিগত ভাবে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা ক'রে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাতে নির্দেশ দিলেন। ফলে আবার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দসহ বহু কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার হলেন।

এর কিছুদিন পরে ১৯৪২এর ৮ই আগষ্ট বোম্বাইএ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করল। কিন্তু ৯ই আগষ্টে গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের সকল নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। এই নিয়ে সমগ্র দেশে মহা বিপ্লব সুরু হয়ে গেল। ইহাই কংগ্রেসের ইতিহাসে আগষ্ট-বিপ্লব নামে খ্যাত।

কংগ্রেসের এই আগষ্ট-অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায়ই হল স্বাধীনতার অধ্যায়।

এরপর বৃটিশ গবর্মেণ্ট ভারতে মন্ত্রীমিশন পাঠাতে বাধ্য হয় এবং তারই ফলে মন্ত্রীমিশন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপোষ আলোচনা ক'রে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা করেন এবং বহুদিনের দীর্ঘ সংগ্রামের পর কংগ্রেস তার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায়।

ভারতের স্বাধীনতা লাভে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, প্রচার ও পার্লামেণ্টারী কাজের পরিচালনার যন্ত্র হিসাবে কংগ্রেসের যে প্রয়োজন ছিল, তারও অবসান হল। কিন্তু কংগ্রেস দেশের কাছ থেকে যে মর্যাদা পেয়ে এসেছে, পাছে তার সেই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে, তাই মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে একেবারে তুলে না দিয়ে, তার নীতি পরিবর্তনের কথা চিন্তা করলেন। মহাত্মা গান্ধী ৩০শে জানুয়ারী তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন প্রাতে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্রের এক খসড়া রচনা ক'রে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদককে দিলেন।

এই গঠনতন্ত্রের খসড়ায় মহাত্মাজী প্রস্তাব করেছিলেন—কংগ্রেসকে এবার গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন ক'রে জনসেবক সংঘরূপে রূপান্তরিত করতে হবে। কংগ্রেসসেবীরা ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামের প্রকৃত সেবক হবে, লোকের নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক মুক্তি অর্জনের সহায়ক হবে। এই সব কর্মীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্য থেকেই নেতা ঠিক করবেন, সেই নেতারা আবার একজন সর্বজনীন নেতা বেছে নেবেন। তিনিই সকলকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করবেন। কর্মীদের খাদি পরিধান, মাদকদ্রব্যবর্জন, সর্বধর্ম সমভাব ও নারী-পুরুষে কেবলমাত্র এই সব নীতি পালন করতে হবে। কর্মীরা পল্লীবাসীদের কল্যাণে, তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও তাদের স্বাস্থ্যোন্নয়নে সহায়তা করবে এবং তাদের একটা না একটা রচনাত্মক কাজে নিযুক্ত থাকতে

হবে। নিখিল ভারত চরকাসংঘ, নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগসংঘ প্রভৃতি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সেবাগ্রাম ফিরোবার পর ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে মহাত্মাজীর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয়, তাতে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথই মূলত গ্রহণ করা হয়।

পরে এই সেদিন ২৮শে এপ্রিল বোম্বাইএ গান্ধীনগরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে প্রকাশ্য অধিবেশন হয়ে গেল, তাতে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। কংগ্রেসের এই গৃহীত গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে—

কংগ্রেস কর্মীদের যে সব জাতীয় বা গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে, নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান তা পরে নির্দ্ধারণ করে দেবে। প্রাথমিক কংগ্রেস পক্ষাদের গঠন করা হবে এবং তার কার্যকাল থাকবে তিন বৎসর। সভ্যদের নামের রেজিষ্ট্রার থাকবে এবং ২১ বৎসর বয়স্ক সকলেই ভোট দিতে পারবে। নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সভ্যরা এক তৃতীয়াংশের অধিক থাকতে পারবেন না। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য সংখ্যা সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষসহ মোট থাকবে ২০ জন।

কংগ্রেসের এই নূতন নীতি গ্রহণ করা হলে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেই কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনীর ঘোষণা করেছেন যে, কংগ্রেসের এই গঠনতন্ত্রকে কার্যকরী করতে অবশ্য কিছু সময় লাগবে।

দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার পর ভারত আজ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হলেও দেশের নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক মুক্তি এখনও লাভ হয়নি। তাই কংগ্রেস এবার তার নীতির পরিবর্তন ক'রে দেশের আভ্যন্তরীণ গলদ দূর করবার জন্য প্রকৃত জন-সেবক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। যে কংগ্রেস আমাদের আজকের এই ভারতীয় রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করেছে, সেই কংগ্রেসের পতাকার তলে থেকে দেশবাসী যে কংগ্রেসের এই নবতম উদ্যমকে সফল করতে এগিয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের এই শুভযাত্রা আমাদের জাতীয় জীবনকে আরও উন্নততর করে তুলুক এই আমাদের সর্বান্তঃকরণের প্রার্থনা।

মোহন-বীর

মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

শঙ্কা-হরণ নাম যে তোমার
শঙ্কা কোথা যা থাকে।
শঙ্কা হর গো, শঙ্কা-হরণ!
যে জন তোমারে ডাকে।
চির-শঙ্কা যে, শরণ নিয়েছে
তোমারি চরণ-তলে,
তোমার চরণ শঙ্কারে হরে
প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে।
অভয়া-অভয় মুগ্ধ নামেতে
বিরাজ সকল ঠাঁই,
যুগল-চরণে যে মেগে শরণ
শঙ্কা তাহার নাই।
এই কথা কহি বীরে—
সব শঙ্কারে দূর যেন করি
এ-দুটী নয়ন নীরে।
মানবের রূপে দেবতা আসিবে
এনেছিলে ধরা-ধামে,
বিশ্ব-মানব চিরকাল যেন
তব নামে তব নামে।

মোহন চন্দ্র! কর্ম্ম-চন্দ্র!
স্নিগ্ধ-আলোকে ভরি
চন্দ্র-লোকেতে ফেলে কি গো তুমি
ধরাধাম পরিহরি?
যেখানেই থাক, জানি তুমি আছ
এই শুধু সম্বল,
মিথ্যা-কথা এ, শুধু শুধু কহি
এই তো পরম বল।
শ্রীরামচন্দ্র জাহ্নবী মাতার
চরণ-সেবার লাগি
মহাবীর সাথে মহাবীর তুমি
যুগল-শ্রীপদ মাগি!
চলে গেছ তুমি তবু তো বন্ধু!
মোরা তো জানাই আমি
ভারত-মাতার যুগল-চরণ
বর ভাগ্যেতে মানি
হৃদয়ে তোমার ধ্রুব আছ সখা
ওগো বীর, মহাবীর।
আসিব ধরণ আমাদের সবে

ধরি ধ্রুব আঁখি নীর
অমরের লাগি যেন তাহা ঝরে
ত্রিকাল-বিজয়ী বীর।
সম্পদে সদা বিপদ ভাবিয়া
সম্পদে রাখি দূরে
বিশ্ব মানবে সত্য-পথ ভাবি
বাঁশী বাজালে সুরে।
সে-সুর ভরিয়া সুর-লোক হতে
জয়-ধ্বনি উঠে ধীরে
নীরবে তোমারে সিঞ্চিত করে
মানব রহস-নীরে।
ওগো তুমি জয়ী, চিরকাল জয়ী
ত্রিকাল-বিজয়ী বীর
তোমারে অর্ঘ্য প্রদানিয়ে আজি
বিশ্ব-মোহন-বীর
ক্ষুদ্র মৃন্ময় মিনারা কোণেতে
যদি এ-গন্ধ ভরি
চিত্তে তাহার বেজেছিল আজ
তোমারই অমর ছবি।

ভারতসরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ৬ই এপ্রিল ভারতীয় পার্লামেন্টে যে সরকারী শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, ৭ই এপ্রিল পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক তাহা গৃহীত হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পরও ভারতবর্ষকে যে সব বিষয়ের জিহাদ চালিতে হইতেছে তন্মধ্যে বেসরকারী অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলতার কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। দেশে যুদ্ধকালীন কাঁপাই টাকার চাপ এখনো পুরোপুরি রহিয়াছে, অথচ যুদ্ধের সময় লোকের অর্থাগমের যে সব পথ খুলিয়া গিয়াছিল, বর্তমানে তাহার অনেকগুলিই বন্ধ হইয়াছে বা বন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে সরকার আমদানী নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হইয়াছেন; এদিকে নূতন কলকারখানা না হওয়ায় এবং যন্ত্রপাতির অভাবে পুরাতন কলকারখানাগুলির একাংশ অকেজো হইয়া পড়ায় অন্তর্বর্তীকালীন চাহিদার সহিত পণ্য-উৎপাদনের হার কিছুতেই সমতা রাখিতে পারিতেছে না। ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দের ন্যায় এবারও জগৎজোড়া যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিবে, এইরূপ ধারণা বর্তমানে শিল্পপতি ও বিত্তবান শ্রেণীর মনে ক্রমেই সঞ্চারিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া এইজন্য শিল্পপতিরা ব্যক্তিগত দায়িত্বে শিল্পপ্রসার বা পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতে সাহস করিতেছেন না।

এছাড়া শিল্প-সম্পর্কে ভারতসরকারের স্পষ্ট কোন নীতি এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এমতও শিল্পপতিরা অনিশ্চিত অবস্থায় ঝুঁকি লইয়া শিল্পক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন। বিদেশী সরকারের আমলে যাহাই হইয়া থাকুক, জাতীয় সরকারের আমলে ভারতীয় শিল্প কতটা ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে, এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটুকু জানিতে দেশের ছোট বড় সকল শিল্পপতিই আগ্রহান্বিত ছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এদিক হইতে দেখিলে ভারতসরকারের শিল্পনীতি ঘোষণার সময় ইতিপূর্বেই উপস্থিত হইয়াছিল, বর্তমানে এই নীতি ঘোষিত হওয়ায় ভারতীয় শিল্প নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে।

ডাঃ মুখার্জি কর্তৃক উপস্থাপিত শিল্পনীতিতে ভারতের প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করিয়া তিন শ্রেণীর শিল্পে তিনপ্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ চালু করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রথম বা 'ক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে অস্ত্রশস্ত্র কারখানা ও রেলপথসমূহকে এবং বলা হইয়াছে যে এই শিল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে সরকারী পরিচালনাধীনে থাকিবে। দ্বিতীয় বা 'খ' শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলি সংখ্যায় ছয়টি এবং ইহাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইবে একটু ভিন্ন ধরণের। কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, বিমান, জাহাজ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রাদি (রেডিও রিসিভার সমেত) এবং খনিজ তৈল এই শ্রেণীর শিল্প। বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে দেশে এই সব শিল্পের যে কারখানাগুলি আছে, সেগুলি উপস্থিত দশবৎসর এখনকার মতই বেসরকারী পরিচালনায় পরিচালিত হইবে, ১০ বৎসর পরে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সমীচীন মনে করিলে এগুলির পরিচালনা-ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অতঃপর এই শ্রেণীর যে সব নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে সরকারী দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইবে। তৃতীয় বা 'গ' শ্রেণীর শিল্পগুলিকে অবশ্য এখন বেসরকারী পরিচালনা ও মালিকানায় চলিতে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই শ্রেণীর শিল্পের সংখ্যা ধরা হইয়াছে ১৮টি এবং ইহার মধ্যে লবণ, মোটরগাড়ী ও ট্রাক্টর, মূল রাসায়নিক পণ্যসমূহ, রাসায়নিক সার, ঔষধ, সুতি ও পশমবস্ত্র, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ, সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ বা নিউজপ্রিন্ট, খনিজদ্রব্য প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প এবং জাহাজ ও বিমান, যাবতীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব শিল্প এখন বেসরকারী পরিচালনাধীন থাকিবে বটে, তবে সরকার দেশের অবস্থা অনুসারে এইগুলির কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং ধীরে ধীরে এগুলির উপরও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করিবেন। এই সঙ্গে যন্ত্রশিল্প ছাড়া কুটির শিল্প সম্পর্কেও সরকারী নীতি ঘোষিত হইয়াছে। ভারতসরকার দেশের কুটিরশিল্প সমধিকভাবে সমৃদ্ধ করিতে চান এবং শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছে যে সমবায়ের ভিত্তিতে কুটির শিল্পের উন্নতি-সাধনে সাহায্য করিবার জন্য শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরেট জেনারেলের বা প্রধান কর্মকর্তার অধীনে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পগুলির জন্য একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হইবে। দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের দায়িত্বও সরকার নিজের হাতে রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সম্প্রতি ভারতে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে ঘন ঘন সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় শিল্প প্রচেষ্টা এবং পণ্য উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। এই দুর্ভাগ্য হইতে দেশকে উদ্ধার না করিলে ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত যে উত্তরোত্তর অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতসরকার তাঁহাদের আলোচ্য শিল্পনীতিতে এই বিষয়ের সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দেশে পণ্য উৎপাদন বাড়ানো তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যের অনুপূরক হিসাবে তাঁহারা চান মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ী সদ্ভাবের সৃষ্টি করিতে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারা গত ডিসেম্বর

যাদের অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনে মূর্তীভূত শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মিলন-সূচক প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পণ্যব্যবহারকারী জনসাধারণের এবং প্রাথমিক পণ্য-উপাদান উৎপাদন-কারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার পর সরকার প্রয়োজনানুযায়ী শুল্কনীতি সংশোধনের সাহায্যে লক্ষ্য রাখিবেন—যাহাতে শিল্প সুরক্ষা খুব বেশী না হয় এবং এই নিয়ন্ত্রিত সুরক্ষা হইতে শিল্প পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরাইয়া রাখিয়া বাকী টাকা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ভায়সঙ্গতভাবে বণ্টিত হইবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে বর্তমান ব্যবস্থার সহিত ইহার প্রভেদ হইবে এই যে—বর্তমানে শ্রমিককে ভৃত্য হিসাবে নিয়তম পরিমাণ বেতন দিয়া মালিক সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা লুটিবার চেষ্টা করে। এখন হইতে শ্রমিক ভৃত্য না হইয়া মালিকের সহকারীরূপে কারবারের অংশীদার হইবে এবং কারবারের মুনাফার উপর তাহার ন্যায্য দাবী থাকিবে।

মহামনীষী অ্যাডাম স্মিথ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইহুদি, আর্মান, ইংরেজ, তুর্কী প্রভৃতি জাতিতে ভাগ না করিয়া ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে এই দুই শ্রেণীভুক্ত লোকেদের মধ্যে পরস্পরের সহিত কোনই মিল নাই। তাহাদের আচার-ব্যবহার, বেশবাস, কথাবার্তা ইত্যাদি সবই ভিন্ন প্রকার। স্মিথের এই অভিমত মুনাফানীতির চাপে বিপন্ন ভারতবর্ষে সর্বাংশে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের জাতীয় সরকার শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা—এদেশে বিত্তবান বা দরিদ্র কোনশ্রেণীর লোকই তাঁহাদের এই শিল্পনীতিতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে না। ধনী বা শিল্পপতিরা যে এই নীতি গ্রহণ করেন নাই, তাহা শেয়ারবাজারসমূহের অবস্থার ক্রমাবনতি হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। প্রকাশ, ভারতসরকারের শিল্পনীতি ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হইবার পূর্বেই ফাঁস হইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে বোম্বাইয়ের শেয়ারবাজারে ৮ দিনের মধ্যে শেয়ারসমূহের গড়পড়তা মূল্য শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ কমিয়া যায়। (ফ্রী প্রেস জার্নাল, ৬ই এপ্রিল, ১৯৪৮) শিল্পপতিদের মতে ভারতসরকার যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্তিগত চেষ্টায় শিল্পসম্প্রসারণের সুযোগ একান্তভাবে কমিয়া গিয়াছে। 'ক' শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির উপর সরকারী পূর্ণ কর্তৃত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য সমস্ত শিল্পে সরকার যেভাবে নিয়ন্ত্রণনীতি চালু করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে শিল্পোৎসাহীদের মুনাফার হার অত্যন্ত কমিয়া যাইবে। 'খ' শ্রেণীর ছয়টি চালু শিল্পপ্রসারের বা পরিচালনার ভার অবশ্য এখনো শিল্পপতিদের হাতে থাকিবে, তবে দশবৎসর পরে সরকার এগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া বিবেচনা করিবার কথা ঘোষণা করায় ব্যক্তিগত শিল্পোন্নয়ন-প্রয়াসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। 'গ' শ্রেণীর শিল্পও নিঃসন্দেহে কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে এবং এইরূপ বিপুল আর্থিক দায়িত্বযুক্ত শিল্পের ক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলের স্বাধীনতা যা থাকিবে-তাহাদের পক্ষে মূলধন বিনিয়োগে ইতস্ততঃ করা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ভারতসরকারের শিল্পনীতি প্রকাশিত হইবার পর হইতে এদেশে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে বেশ একটু মন্দাভাব দেখা দিয়াছে।

আবার দরিদ্রদের সরকারের শিল্পনীতিতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি এবার স্পষ্টভাষায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহের জাতীয়-করণের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছিলেন। এখন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ দেশের শাসনাধিকার লাভ করার পর জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সেই অভিমতের পূর্ণ মূল্য দিতে কার্পণ্য করিবেন, ইহা সত্যই কেহ আশা করে না। ভারত-সরকার 'খ' শ্রেণীর মূলত শিল্পগুলি এবং 'ক' শ্রেণীর শিল্প তিনটিকে নিজেরা পরিচালনা করিবেন বলিয়াছেন। এগুলি প্রায়ক্ষেত্রেই দেশরক্ষা সংক্রান্ত শিল্প, কাজেই এগুলির সম্পর্কে সরকারের মনোযোগ প্রকাশে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু 'গ' শ্রেণীর ১৮টি শিল্পই দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এইগুলির জাতীয়করণের কোন ব্যবস্থাই হইল না। প্রকৃতপক্ষে চিনি, ঔষধ, সিমেন্ট, কাপড়-কাগজ প্রভৃতির মত অত্যাবশ্যক পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প যদি মুনাফাখোর শিল্পপতিদের হাতে থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণের দুর্দশার সুযোগ লইয়া এইসব শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মাফ মালাল ক্রমশঃ অধিকতর স্ফীত হইবারই সম্ভাবনা। যুদ্ধের ফলাফলে এখন আর কাহারও সন্দিহে বাকী নাই যে ব্যবসায়ের বা শিল্পপতিদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরাই জাতীয়তাবোধ বলিয়া কোন পদার্থ আছে এবং মুনাফা বেশী হইলে দেশের দুর্গত লোককে অত্যাবশ্যক পণ্য হইতে বঞ্চিত করিতে তাহাদের এতটুকু বাধে না। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক কে টি শা'র ন্যায় ব্যক্তিও ভারতসরকারের শিল্পনীতিতে খুশী হইতে পারেন নাই।

সরকারী শিল্পনীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ—সরকারী শিল্পনীতিতে সোজাসুজি বা স্পষ্টভাবে কোন বিধিনীতি মানিয়া লওয়া হয় নাই। এই অভিযোগের যথার্থতা অবশ্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ বর্তমানে কিরূপ সঙ্কটজনক অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতেছে তাহাও স্মরণ রাখা দরকার। যুদ্ধের পূর্বাবস্থার তুলনায় সম্প্রতি এদেশে শিল্পপণ্য উৎপাদনের হার কিভাবে হ্রাস পাইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। আবার পণ্য উৎপাদন যখন কমিতেছে তখন দেশের লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বৎসরে ৪০ লক্ষ হারে। বিদেশ হইতে আমদানী একরকম বন্ধ, তাছাড়া ডলার ইত্যাদি বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ইহার উপর এখন সাম্প্রদায়িক ছুরিকা শিল্পপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে ব্যাপক সংঘর্ষ। এ অবস্থায় ভারতসরকারকে একরূপ বাধ্য হইয়াই ঘোষিত শিল্পনীতিতে মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ভাষণ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ সরকারের নীতি, তবে উপস্থিত সাময়িক-

ভাবে প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া বিপুলায়তন শিল্পের দায়িত্বগ্রহণে ভারতসরকার যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছেন না এবং এইজন্যই প্রচলিত 'ক' শ্রেণীর শিল্প এবং 'খ' শ্রেণীর শিল্পসমূহ হইতে তাঁহারা শিল্পপতিদের অধিকারে সরাইয়া দিতে চাহেন নাই। শ্রমিকদের কারখানার অংশীদারের মর্য্যাদা দিয়া তাহারা যেমন শ্রমিকশ্রেণীকে দেশের পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতা করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন, তেমনি অধিকাংশ লাভজনক শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহারা শিল্পপতিদের সন্তুষ্ট করিবারও আশা করিয়াছেন। শিল্পনীতি খুব দৃঢ়তার সহিত নির্দ্ধারিত হয় নাই একথা সত্য, তবে বর্ত্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে সকলকে খুশী করিবার যে দুঃসাধ্য চেষ্টা ভারতসরকার করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি না করিয়াই সাধারণে এই শিল্পনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখের হইবে।

সরকারী শিল্পনীতি সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইলে অবশ্যম্ভাবী দেশের পণ্য উৎপাদন শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া শিল্পমন্ত্রী ডাঃ মুখার্জ্জি আশা প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বিস্তারোজন, শ্রমিক ও মালিক উভয়ের সুচেষ্টা ছাড়া এই লক্ষ্যলাভ সম্ভব নয়। ডাঃ মুখার্জ্জি বলিয়াছেন, শ্রমিক যাহাতে উপযুক্ত বেতন পায় এবং মূলধন যাহাতে ন্যায্য লাভ পায়, সে সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শদানের জন্যোচিত ব্যবস্থা দীঘই অবলম্বিত হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থার জন্য সরকার শ্রমিক ও শিল্পপতিদের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিবেন এবং সর্ব্বসম্মত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যদি একান্ত অসম্ভব হয় তাহা হইলে প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার আইন প্রণয়নের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য, শিল্প সম্বন্ধের এই বুদ্ধিসঙ্গত ঘোষণার পর সরকারী শিল্পনীতি সম্পর্কে দেশবাসীর অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাব আমরা অবশ্যই আশা করি। পণ্ডিত নেহেরুর ন্যায় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন জননেতা বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের পুরোভাগে রহিয়াছেন, একথা সরকারী নীতি সমালোচনার সময় কাহারও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। শিল্পমন্ত্রী পরিষদ, বিভাগ ও সঙ্ঘবদ্ধ শিল্পপতিদের ক্ষমতা কতখানি বিরাট, তাহাও লোকের বুঝা উচিত এবং এখনি শিল্পপতিদের বিরাগভাজন হইলে কর্ত্তৃপক্ষের কত অসুবিধা এবং পণ্যব্যবস্থার অনিশ্চয়তার ফলে দেশের জনসাধারণের কতখানি ক্ষতি অনিবার্য্য তাহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। হোয়াইটহল পার্লামেন্টে গত ৭ই এপ্রিল শিল্পনীতি সম্পর্কে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু দেশের প্রচলিত শিল্পকাঠামোর উপর খুব বেশী আঘাত না হানিবার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাইয়াছেন। আমাদের মনে হয় প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদনে দেশবাসী কাম্য সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধের সহিত সাড়া দিতেছেন না এবং ইহার ফলেই দেশে লক্ষ্মীর অস্থিরতা দেখা যাইতেছে। সংপ্রতিবে দেশের স্বার্থেই এই অবস্থার অবিলম্বে পরিবর্ত্তন ঘটা দরকার।

ভারতে মোটর গাড়ী শিল্প

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর এদেশে মোটর গাড়ী, ট্রাক প্রভৃতির প্রয়োজন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। স্বভাবতই ব্রিটেন আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে মোটর গাড়ী ও ইহার যন্ত্রপাতি আমদানী হইয়া থাকে, স্বাধীনতা লাভের পরও যদি এইরূপ পরনির্ভরতা স্থায়ী হয়, তাহা সত্যই দুঃখের বিষয়। ভারতবর্ষে পাকা রাস্তার পরিমাণ বর্ত্তমানে এক লক্ষ মাইলের মত, ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা আড়াই গুণ বাড়াইবার একটি পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে এদেশে মোটর গাড়ীর প্রয়োজন যে আরও বাড়িয়া যাইবে তাহা বলাইবাহুল্য। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ হাজার, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩৬ হাজার ও ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ হাজার মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হইবে।

সকলেই জানেন, যুদ্ধের সময় ভারতে মোটরগাড়ী শিল্প সংগঠনের একটা উৎসাহ দেখা দিয়াছিল এবং ইহার ফলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ বোম্বাইয়ে (প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস্) এবং শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা কলিকাতায় (হিন্দুস্থান মোটরস্)—দুইটি মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা গঠনের আয়োজন করেন। ভারতসরকার দেশের চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া এই প্রতিষ্ঠান দুইটিকে করমুক্ত, ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি এদেশের দুর্লভ জিনিষপত্র জোগাইয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠান দুইটি পূর্ণাঙ্গভাবে না হইলেও এখন অনেকটা সংগঠিত হইয়াছে এবং আশা করা যায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই উক্ত কারখানার মোটরগাড়ী ও ট্রাক বাজারে পাওয়া যাইবে। ভারতে মোটরগাড়ী শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যাপারে স্বার্থবাহী ব্রিটিশ ও মার্কিণ মোটরগাড়ী নির্ম্মাতারা যে কিরূপ অসহযোগী মনোভাব পোষণ করেন, তাহা ভারতীয় শিল্প মিশনের সহিত লর্ড নুফিল্ড প্রভৃতি শিল্পনায়কদের ব্যবহারেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই সব শিল্পপতি যদিও শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় মোটর গাড়ী শিল্প সংগঠনে সাহায্য করেন, এই সাহায্যের বিনিময়ে শিল্পটিতে কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করিতে তাঁহারা ত্রুটী করিবেন না। এক্ষেত্রে ভারত সরকার ও ভারতীয় শিল্পপতিগণের উচিত মোটর-শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উপর হইতে বিদেশী প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করিতে এদেশে মোটর গাড়ী তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানারও প্রতিষ্ঠা করা। প্রকাশ এ পর্য্যন্ত উপরিউক্ত কারখানা দুইটিতে ২ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরও ৩ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আসিবার কথা আছে। ইতিমধ্যেই মোটর গাড়ীর কারখানার যন্ত্রপাতি ভারতে নির্ম্মাণ করিবার ব্যাপক চেষ্টা হওয়া দরকার। সম্প্রতি প্রকাশিত ভারত সরকারের শিল্পনীতিতে মোটর গাড়ী শিল্প 'গ' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং ইহার পরিচালনাভার উপযুক্ত বেসরকারী পরিচালকবর্গের হাতে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে, বিমান প্রভৃতির মত এই প্রয়োজনীয় শিল্পটিকেও 'ক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিলেই ভারত সরকার ভাল করিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাহা হউক, শিল্পপতিদের পরিচালনাধীনে এই শিল্প যাহাতে দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য এখন ভারত সরকারের উচিত দূরদৃষ্টির সহিত শিল্পটিকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়া সাহায্য করা। এই শিল্প যাহাতে ব্যক্তিগত মুনাফা লুটিবার ক্ষেত্র না হইয়া সত্যকার জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাও এখন বিশেষ দরকার।

আশা করা হইয়াছে শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়লার উল্লিখিত মোটর গাড়ীর কারখানা দুটি হইতে বৎসরে ৩০ হাজারের মত মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইবে। ৩।৪।৪৮

বাঙ্গালা দেশের আয়তন বৃদ্ধি—

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা তথা পূর্ব্ব-পাকিস্তানে বাঙ্গালী—প্রধানতঃ হিন্দুদের, বাঙ্গালী মুসলমানদের সহিত—বসবাস ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এত অধিক লোক পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে যে বাঙ্গালার আয়তন বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গালীকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের বহু স্থান—বাঙ্গালা ভাষাভাষী ও বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চল গত কয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিহার ও আসামের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। ইংরাজ শাসনের সুবিধার কথা বলিয়া তাহা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল—বাঙ্গালাকে বিভক্ত করিয়া দুর্ব্বল করিয়া দেওয়া। ১৯১২ সালে পূর্ণিয়া, ভাগলপুর জেলার অংশ, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম ও সিংহভূমের ধলভূম—বাঙ্গালী অধিবাসীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাঙ্গালা হইতে পৃথক করিয়া বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করা হয়। পূর্ণিয়া জেলার তিনটি মহকুমার মধ্যে কিষণগঞ্জ ও সদর মহকুমার বাঙ্গালা ভাষাভাষীর সংখ্যা অধিক। শুধু আররিয়া মহকুমায় বিহারী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। ভাগলপুর জেলার পূর্ব্বাংশে চাকা নামক মহকুমার কাজরেলী ও কোলাপুর অঞ্চলেও বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। সাঁওতাল পরগণার দুমকা, গোড্ডা, জামতাড়া, রাজমহল ও পাকুড়—সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী অধিবাসী অধিক। ঐ জেলার অধিকাংশ লোকই বিহারী ভাষা বলিতে বা বুঝিতে পারে না। ঐ জেলার সংলগ্ন হাজারিবাগ জেলার তুমিয়া, বাগোদার ও রামগড় থানায় বাঙ্গালা ভাষাভাষী লোক অধিক বাস করেন। রাঁচী জেলার ৫টি থানাতেও—বুরমু, বুকরু, টাপার, সিল্লি ও বোরো—বাঙ্গালীই অধিক সংখ্যায় বাস করে—ঐ অঞ্চল মানভূম জেলার সংলগ্ন।

সিংহভূম জেলার ধলভূম মহকুমায় অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী বাস করে। উহা এক সময়ে মেদিনীপুরেরই অংশ ছিল। ঐ জেলার ধলভূম ও সদর মহকুমার মধ্যে সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান রাজ্য দুইটিও বাঙ্গালী অধ্যুষিত প্রদেশ। ঐ স্থানগুলিরও বাঙ্গালার মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত। ধলভূমের আদিবাসীরাও স্কুলে বাঙ্গালা ভাষাই শিক্ষা করিয়া থাকে। মানভূম জেলার অধিবাসীদের মধ্যে ১২ লক্ষ লোক বাঙ্গালা ভাষা ও মাত্র ৩ লক্ষ লোক হিন্দী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। ভৌগোলিক দৃষ্টিতেও বাঁকুড়া ও মানভূম এক ও অভিন্ন।

এই সকল হিসাব হইতে বেশ বুঝা যায়—উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে বাঙ্গালীরাই বাস করে এবং বাঙ্গালার সংস্কৃতি তথায় পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। এখন রাজ্যপরিষদ নূতন করিয়া প্রদেশ গঠন করিবেন। সে সময় যাহাতে উপরোক্ত অঞ্চলগুলি পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, প্রত্যেক বাঙ্গালী জননায়ক ও চিন্তা-নায়কের সে জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আসাম ও বাঙ্গালা—

আসাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হইলেও এবং তাহার নাম আসাম হইলেও ঐ প্রদেশে মাত্র তিনভাগের একভাগ লোক আসমিয়া ভাষা ব্যবহার করে ও দুইভাগ লোক বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করে। বিশেষ করিয়া গোয়ালপাড়া ও কাছাড় জেলায় বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। গোয়ালপাড়া ও কাছাড়কে বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করিতে বাঙ্গালার পক্ষে গারো পাহাড়, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় ও লুসাই পাহাড় পাওয়া আবশ্যক। ঐ তিনটি পাহাড় জেলায় আসামী নাই বলিলেই চলে। ১৯০১ সালে

কাছাড় জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ৩৬৭১২জন ও আসামীর সংখ্যা মাত্র ২২১৫জন।

কাছাড়ের সহিত যে থানাগুলি শ্রীহট্ট জেলা হইতে ন্যাড্‌ক্লিফ এওয়ার্ডে বাদ গিয়াছে, সেই থানাগুলিও পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত করা উচিত। আসামে বর্ত্তমানে বাঙ্গালী-খেদা আন্দোলন হইতেছে ও আসামবাসী বাঙ্গালীদের অসমিয়ারা 'চোখের বালি' বলিয়া থাকে। এই আন্দোলন চলিলে আসাম ও পশ্চিম বাঙ্গালা উভয় প্রদেশই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং উভয় প্রদেশেরই উন্নতির পথ রুদ্ধ

আলমোড়ায় বাঙ্গালীদের বনভোজন উৎসব ফটো—বিরেন মল্লিক

হইবে। আসামের উক্ত অঞ্চলগুলি পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে পশ্চিম বাঙ্গালা সমৃদ্ধ হইবে ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে আগত হিন্দু-মুসলমান সকল অধিবাসীকেই পশ্চিম বাঙ্গালায় স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে। বাঙ্গালার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে এখন এ বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রদেশ বিভাগ সম্পাদিত হইবে—তৎপূর্ব্বে যেন পশ্চিম বাঙ্গালার এই দাবীগুলি উপযুক্তভাবে যথাস্থানে পেশ করার ব্যবস্থা হয়—ইহাই আমাদের নিবেদন।

সিংহলে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র—

১৮ই এপ্রিল সিংহলের রাজধানী কলম্বো সহরে এক উৎসবে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সেনানায়ক ঘোষণা করিয়াছেন যে সিংহলের কম্যুনিষ্টরা গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া সিংহল রাজ্যটি রুশিয়াকে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করিয়াছেন। সিংহল স্বাধীনতা লাভ করিলেও গৃহ-শত্রুর আক্রমণ এখনও তথায় বন্ধ হয় নাই।

চীনে নূতন সভাপতি—

১২শে এপ্রিল চীনের রাজধানী নানকিং সহরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চিয়াং-কাই-সেক চীনের গণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ২৪৩০ ভোট ও বিপক্ষে ২৬৯ ভোট হইয়াছিল। ওয়াসিংটনস্থ ভূতপূর্ব্ব চীনা রাষ্ট্রদূত ডাঃ হো সিহকে প্রধান মন্ত্রী করা হইবে এই সর্ত্তে চিয়াং সভাপতিপদ গ্রহণে সম্মতি দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মে কম্যুনিষ্ট দলন—

মধ্য ব্রহ্মের পিনমানা জেলায় কম্যুনিষ্টরা প্রবল হইলে তাহাদের দমন করিতে যাইয়া সরকারী সৈন্যদল ১০জন ব্রহ্মদেশীয় কম্যুনিষ্টকে হত্যা করিয়াছে ও তাহাদের নিকট হইতে ২শত বন্দুক উদ্ধার করিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র কম্যুনিষ্ট উপদ্রব চলিতেছে—উহার পরিণতি কোথায়?

কারিগরী শিক্ষা পরিষদ—

গত ২৪শে এপ্রিল বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সম্মিলনে স্থির হইয়াছে যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সাহায্যে শীঘ্রই ১৩টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হইবে ও সে জন্য ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। বাঙ্গালা দেশে হিজলীতে পূর্ব্ব আঞ্চলিক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইবে—ঐ স্থান বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তেরও নিকটবর্ত্তী। ঐ বিষয়ে যাহাতে সত্বর কাজ আরম্ভ হয়—সেজন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিশ্বসভার অর্থ-নৈতিক সম্মিলন—

বিশ্বসভার (ইউ-এন-ও) উদ্যোগে আগামী ১লা জুন দক্ষিণ ভারতের উতকামুণ্ডে প্রথম পূর্ব্ব-এসিয়া অর্থ-নৈতিক সম্মিলন হইবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাহার উদ্বোধন করিবেন। এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় সকলে কি ভাবে অর্থ-নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারেন, সম্মিলনে তাহাই স্থির করা হইবে। তিন সপ্তাহ ধরিয়া সম্মিলনের কাজ চলিবে।

প্রস্তাবিত ক্যান্সার ইন্সিটিটিউট—

ভারতবর্ষে প্রায় ১০ লক্ষ লোক ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছে—কিন্তু তাহাদের চিকিৎসার কোন ভাল ব্যবস্থা নাই। সেজন্য কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সুধাংশুচন্দ্র মিত্র কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সহিত একটি ক্যান্সার চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছেন। ঐ কার্য্যে ৩০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন—গত ৩ বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গত ১১ই বৈশাখ হুগলী ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ২৫ হাজার টাকা ঐ কার্য্যের জন্য প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে প্রদান করা হইয়াছে। হুগলী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত বীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

কলিকাতা পুলিসের তৎপরতা—

কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ গত ১ মাসে তিন শত পকেটমারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সেজন্য শিয়ালদহ ষ্টেশন, এসপ্লানেড, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার প্রভৃতি স্থানে পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ডাকাতি সম্পর্কেও কলিকাতা সহরে ৪১খানি বে-আইনি ঘিপগাড়ী ও একখানি মোটর সাইকেল সম্প্রতি ধরা হইয়াছে। ইটালী, ট্যাংরা, তালতলা ও চীনাপটীতে ঐ সকল ঘিপগাড়ী ছিল। গাড়ীর সহিত ৪৪জন লোকও ধৃত হইয়াছে।

ভেষজশিল্প গবেষণা মন্দির—

ভারত হইতে বৎসরে ৪ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ঐ চামড়া এ দেশে রাখিয়া কাজে লাগাইবার জন্য মাদ্রাজের ওইতিতে গত ২৪শে এপ্রিল ভারত সরকারের শিল্প-সচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক কেন্দ্রীয় চর্ম্ম গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহার জন্য একবালীন ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও বার্ষিক সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ—

বিশ্বসভা কাশ্মীর সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে না। কাজেই কাশ্মীর যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি করিয়া কাশ্মীর হইতে হানাদারদের দূর করিয়া আবদুল্লার নবগঠিত জনপ্রিয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করার দায়িত্ব ভারত সরকার পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবেন।

পুলিসার্চি ট্রেনিং কোরের হাতের দ্বারা হায়দ্রাবাদকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

হানাদারদের বিতাড়িত না করা পর্য্যন্ত কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের সম্ভাবনা নাই—কাজে গণভোট গ্রহণ সম্পর্কে বিশ্বসভার সাহায্যদানের প্রস্তাব ভারত সরকার প্রত্যাখ্যান করিবেন। অন্যদিকে যে কোন উপায়ে ভারত সরকার হায়দ্রাবাদকে ভারতের সহিত যোগদান করিতে বাধ্য করিবেন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা নেতা, ডন সোসাইটীর প্রবর্ত্তক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৮ই এপ্রিল ৮৩ বৎসর বয়সে কাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৯৩ সালে 'ডন' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তিনি যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে আত্মোন্নতি প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হইলে সতীশবাবু তাহার প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। ৫৫ বৎসর কাল তিনি একভাবে দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার আন্সেলকরের তৃতীয় দল—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আইন-সচিব ডাক্তার বি-আর আম্বেদকর আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার

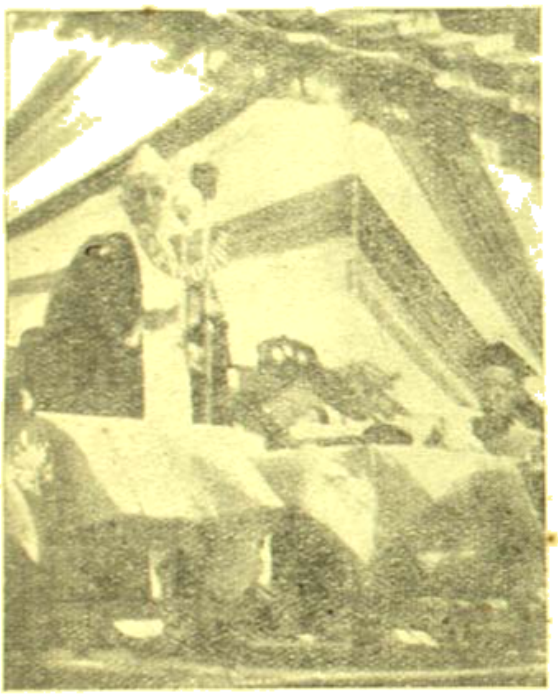

ইনিভার্সিটি কনভোকেশন সভায় কে-এম-মুন্সীর বক্তৃতা
ফটো—অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

করিতেছেন। সমাজতন্ত্রী কর্ম্মীরা কংগ্রেস ত্যাগ করায় তিনি বলিয়াছেন—তপশীলীদের লইয়া তিনি তৃতীয় দল গঠন করিবেন—কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রী দলে বিরোধের সময় তাঁহার তৃতীয় দল প্রবল হইবে ও তিনি যে দলে যোগদান করিবেন, সেই দলকে প্রধান দলে পরিণত করিয়া নিজে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। ইহা তাঁহার দিবাস্বপ্ন কিনা কে জানে।

গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ—

গত ১১ই বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়া 'সালিখা হাউসে' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে সালিখা 'গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের' উনবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় খ্যাতনামা ধনী শ্রীবাবুলাল জালান প্রধান অতিথিরূপে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, স্থানীয় মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। সভ্যগণ কর্ত্তৃক 'বিজয়া' ও 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে 'কথা ও কাহিনী' নাম দিয়া সমাজের এক বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সভায় বিতরণ করা হইয়াছে। ইহাতে সমাজের ৩৭ বৎসরের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম—তাহাদের উৎসব বিরাট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী—

মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী গত ২৫শে এপ্রিল ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে ঠুংরী গানে তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সঙ্গীতকে তিনি জীবনে সাধনারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি—

গত ২৬শে এপ্রিল ওয়াশিংটনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনানী-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল ওমর ব্রাডলি বলিয়াছেন—যুদ্ধের আশঙ্কা গত তিন মাস অপেক্ষা আজ অধিক বাড়িয়াছে। শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া আমরা ভীত হইয়াছি। রুসিয়ার ভয়ে সকল দেশ ভীত হইয়াছে ও রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া আমেরিকা জল্পনা করিতেছে।

ছাত্রগণকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের কলেজের ছাত্রদের লইয়া কতকগুলি দল গঠন করিবেন ও ছাত্রদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিবেন—একজন করিয়া অধ্যাপকের অধীনে ৩০জন করিয়া শিক্ষার্থী থাকিবে। রায়পুর

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, বেলগেছিয়া আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ, হুগলী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ, বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি, হাওড়া ও শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রগণও সুযোগ পাইবে। কলিকাতা কলেজের ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইবে। স্কুলের ছাত্রগণও শিক্ষার্থী হিসাবে গৃহীত হইবে। আপাততঃ ১০০ স্কুল শিক্ষক ও ৫১জন কলেজ-শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ১৫ই মে শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। মোটের উপর এ বিষয়ে সত্বর কার্য্যারম্ভ করা প্রয়োজন ও দেশে বহু লোককে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষাদান আজ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

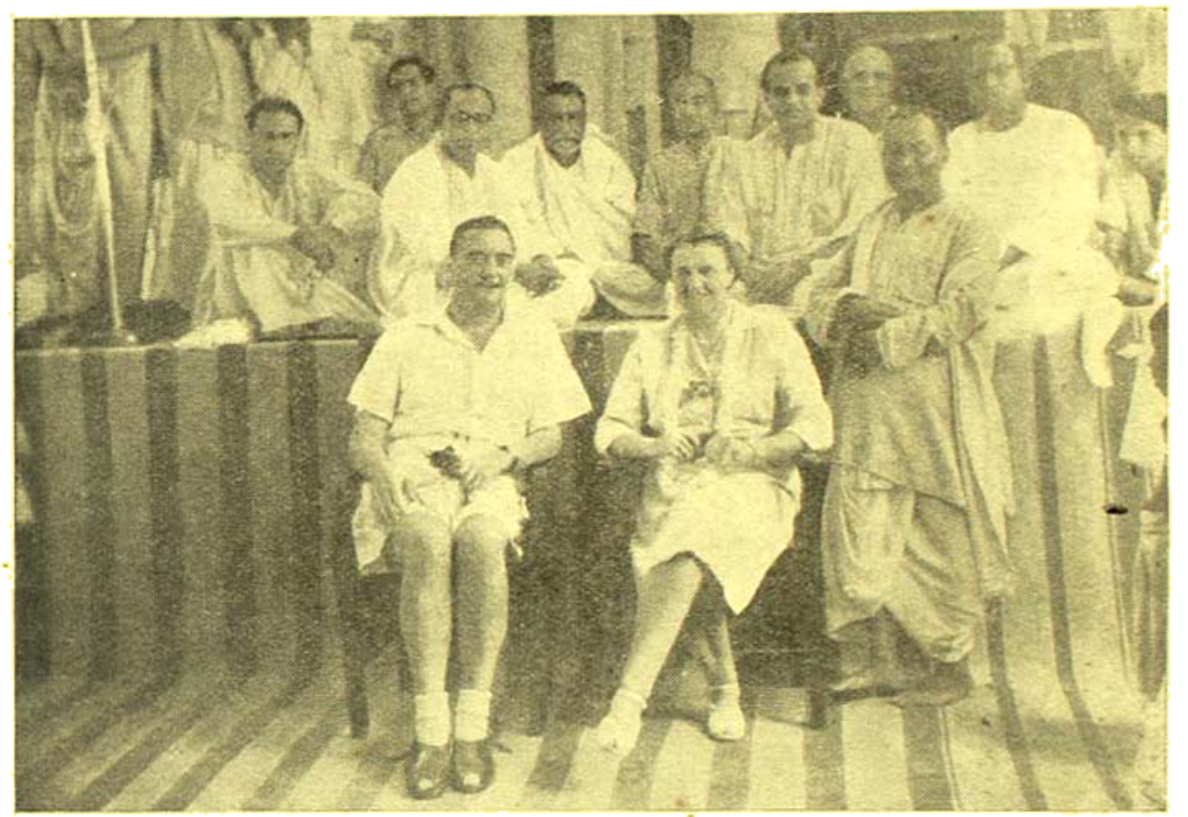

খড়দহে শত শ্রীঘোষ উৎসবে সমাগত অতিথিবর্গ

খড়দহে শত শ্রীঘোষ উৎসব—

গত ২২শে চৈত্র রবিবার ২৪ পরগণা জেলার শ্রীপাট খড়দহে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বাসভবনে দক্ষিণেশ্বরবাসী ৺মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত শত শ্রীঘোষ উৎসবের চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ঐ উপলক্ষে প্রায় বেতনভুক কীর্ত্তনীয়া তাঁহাদের মৃদঙ্গ ও দল লইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বেলা ২টায় তথায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বৈষ্ণব সভার নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করিয়াছেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করেন ও কয়েকশত ভক্তকে প্রসাদ দান করা হইয়াছিল।

বস্ত্রাভাব—

২৮শে এপ্রিল বাঙ্গালার কাপড়ের কলওয়ালা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায় এক বক্তৃতায় এদেশে বস্ত্রাভাব ও তাহার প্রতীকারের কথা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—দেশে বহু নূতন কাপড়ের কল তৈয়ার হইতেছে—কিন্তু নানা কারণে তাহাদের কাজ অগ্রসর হইতেছে না। কাজেই লোককে বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে

সংযমী হইতে হইবে। কণ্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ায় কাপড়ের দাম বাড়িয়াছে—এ অবস্থায় লোক যথাসম্ভব বস্ত্রব্যয় হ্রাস করিলে কাপড়ের দাম কমিয়া যাইবে। আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য—দেশে মিহি কাপড়ের চাহিদা বাড়িয়াছে—কিন্তু মোটা কাপড় প্রচুর উৎপন্ন হয়। সেজন্য এখন কিছুকাল লোককে মোটা কাপড় পরিয়া দিন কাটাইতে হইবে। ক্রেতারা সাবধান হইলে আর চোরা-বাজারে কাপড় বিক্রয় সম্ভব হইবে না। শ্রীযুত রায় এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া কাজ করিলে লোকের মন হইতে আশঙ্কা চলিয়া যাইতে পারে।

পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীহরিপদ ভৌমিক। তদন্তের ফলে কি হয়, তাহার জন্য জনসাধারণ সাগ্রহে অপেক্ষা করিবে।

কলিকাতায় প্লেগ ও কলেরা—

গত এপ্রিল মাসের প্রথম হইতেই কলিকাতা সহরে ব্যাপক প্লেগ ও কলেরা দেখা দিয়াছে। স্বাস্থ্য বিভাগের চেষ্টায় প্লেগ অধিক বিস্তৃত হয় নাই বটে, কিন্তু কলেরায় প্রত্যহ বহু লোক মারা গিয়াছে। নানাস্থান হইতে আশ্রয়-প্রার্থী আসায় কলিকাতা সহরের লোক সংখ্যা দ্বিগুণেরও

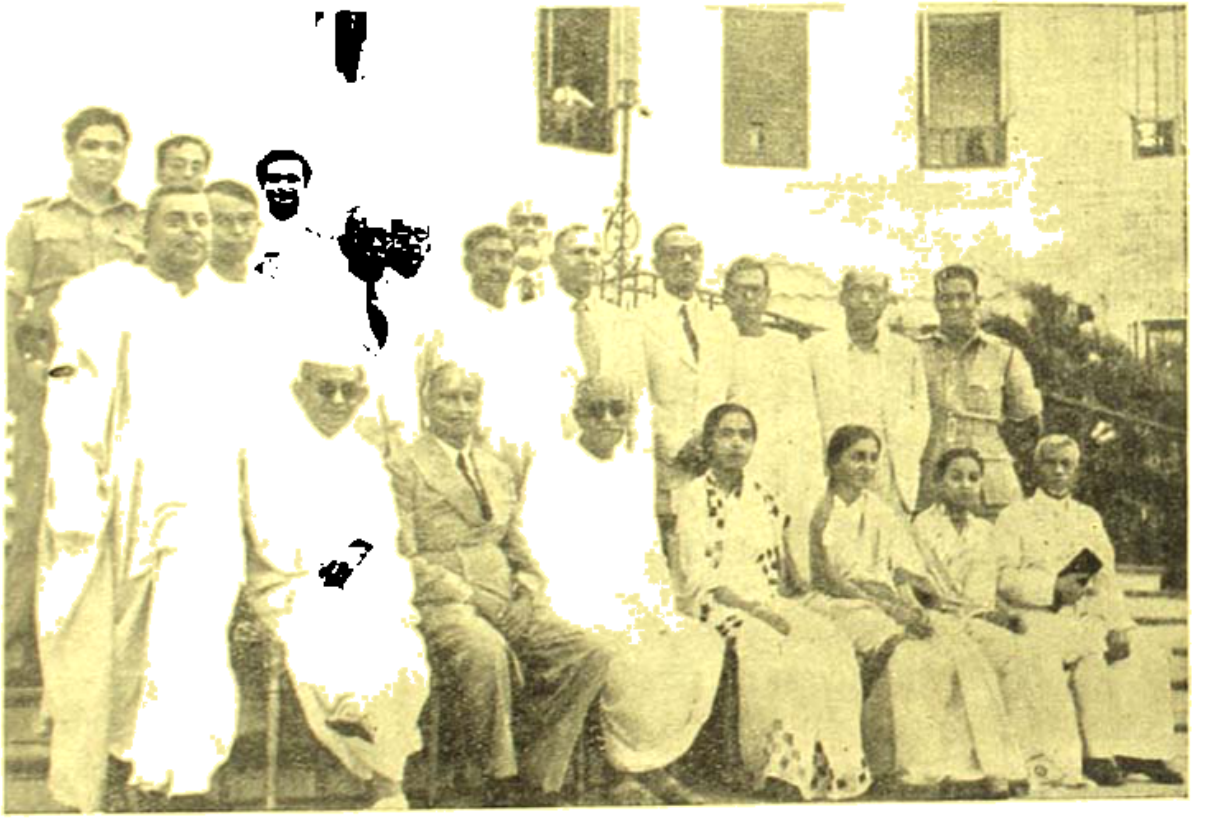

দেশের চিকিৎসা পদ্ধতির সম্প্রসারণ কমিটীতে শ্রীরাজগোপালাচারী

কর্পোরেশন তদন্ত কমিটী—

কলিকাতা কর্পোরেশনের অব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উপযুক্তভাবে পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ৩জনকে লইয়া একটি তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছেন—(১) বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস—সভাপতি (২) বাঙ্গালার অবসরপ্রাপ্ত একাউণ্টেণ্ট জেনারেল শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী ও (৩) মাদ্রাজের অবসরপ্রাপ্ত

অধিক হইয়াছে—তাহাদের জন্য প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা নাই—ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নহে। তাহার উপর খাদ্যাভাবে লোক অখাদ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ স্বাভাবিক। কর্তৃপক্ষ সহর হইতে লোক সরাইয়া গ্রামাঞ্চলে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা না করিলে কলিকাতা সহরকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা কঠিন হইবে।

পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্যাবস্থা—

গত ২৮শে এপ্রিল হইতে দিল্লীতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রদেশের খাদ্য-মন্ত্রীরা সমবেত হইয়া খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঐ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্যাবস্থাকে আশঙ্কাজনক বা আশাপ্রদ কোনটাই বলা যায় না। আউস ধান কি পরিমাণ পাওয়া যাইবে, তাহার উপর অবস্থা অনেকটা নির্ভর করে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ লোক আসিতেছে, তাহাতে এখানকার খাদ্যাবস্থা বহুদিন অনিশ্চয় অবস্থায় থাকিবে—ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ না করিলে বাঙ্গালা দেশে খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশে অধিক খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বিপুল চেষ্টা ও প্রভূত অর্থব্যয় করা প্রয়োজন।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র জন্ম-বার্ষিকী—

গত ১৫ই বৈশাখ বুধবার কলিকাতা শ্রীরঙ্গম নাট্যমঞ্চে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের ১০৭তম জন্ম-বার্ষিক উপলক্ষে গভর্ণর শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও সভাপতি প্রভৃতির বক্তৃতার পর গিরিশ সংঘের সম্পাদক শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন—গিরিশ-চন্দ্রের বাগবাজার ১৩নং বসুপাড়া লেনস্থ বাসভবন জাতীয় নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ গৃহের সহিত

আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর

মহাকবির জীবনের বহু স্মৃতি জড়িত। কাজেই উহা রক্ষা করার ভার পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা ভূতনাথবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করি ও আশা করি এ বিষয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন হইবে।

পরিচ্ছন্ন কলিকাতা আন্দোলন—

কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুত প্রণব সেন গত ২৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে কলিকাতা সহরকে পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য আন্দোলন

ও কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের বৃহত্তম মহানগরী কলিকাতার যাত্রা ঘাটের অপরিচ্ছন্ন অবস্থা সত্যই শোচনীয়। স্থানে স্থানে ডাষ্টবিন উপচাইয়া ময়লা বাহিরে পড়িয়া থাকে, কোথাও ফুটপাথের উপর বিক্ষিপ্ত কলার খোলা অসতর্ক পথিকের বিপদ ঘটাইতেছে—ইহা হইল সর্ব্বদার ঘটনা। কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালক শ্রীযুত এস এন রায় এ বিষয়ে শ্রীযুত প্রণব সেনকে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করিবেন। জনগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিতে পারিলেই কলিকাতার অপরিচ্ছন্নতা দূর হওয়া সম্ভব।

কৃপালাভ করিবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া নিজের কারবারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ কাজে অবহেলা করাই স্বাভাবিক। একেই ভারতীয় শাসনযন্ত্রের নানা স্থানে দুর্ব্বল লোক আসন পাইয়া উহার মর্য্যাদাহানির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহার পুনরাবৃত্তির পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারের মধ্যে দেখা দেয়, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা মনে করি এই দুষ্ট ও ভ্রান্তিকর "খাওয়া" নীতি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম বাঙ্গালা সরকার ভারতবর্ষে

আন্তর্ভোমিনিয়ন বৈঠকের পূর্ব ভারত গভর্ণমেণ্ট, পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার, যুক্তবিহার ও ত্রিপুরার সদস্যবৃন্দের ঘরোয়া সম্মেলন

মন্ত্রিদের খাস কারবার—

ব্রহ্ম সরকার আদেশ দেন—যাঁহারা মন্ত্রির পদগ্রহণ করিবেন তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব কোনও কারবারের সহিত যুক্ত থাকিতে পারিবেন না। আমাদের মতে এই নিয়মটী রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর। ইহা না হইলে, মানুষের স্বভাব অনুযায়ী এই সকল কারবার মন্ত্রীদের অন্যেক আদর্শ স্থাপন করিবেন। ব্রহ্ম সরকার যাহা করিতে পারিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকার তাহা না পারিলে জগতের নিকট আমাদের মাথা হেঁট হইবে।

রাজনীতিকগণকে সাহায্য দান—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন বিভিন্ন শ্রেণীর নির্য্যাতীত অসহায় রাজনীতিক কর্ম্মী বা তাঁহার পরিবারকে মাসিক বৃত্তি ও ভাতা এবং এককালীন অর্থ সাহায্য করা হইবে। এই বৃত্তি, ভাতা বা এককালীন সাহায্যের

পরিমাণ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্রিয় বা সর্ব্বোচ্চ কোন হার নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহেন না—কারণ প্রত্যেক আবেদনকারীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে যে ঐ সাহায্যের পরিমাণ স্থির করা হইবে।

শ্রীমতী সুহাসিনী সেন—

নাগপুর ক্রানানাল কলেজের ইংরাজির অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুহাসিনী সেন এবার নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্যা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। এই প্রথম বাঙ্গালী মহিলা এই সম্মান পাইলেন এবং তিনি কোর্টের সর্ব্বকনিষ্ঠা সদস্যা। তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী আদরিণী সেনও নাগপুর এস-বি-সিটি কলেজের অধ্যাপিকা।

শিশু নৃত্য-শিল্পী—

সম্প্রতি কলিকাতায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে শিশু নৃত্য শিল্পী শিখারাণী বাগ শ্রীকৃষ্ণের লাস্য নৃত্য দেখাইয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। বালিকার বয়স মাত্র চারি বৎসর; এত অল্প বয়সে এইরূপ উচ্চাঙ্গ নৃত্য সচরাচর দেখা যায় না।

কুমারী শিখারাণী বাগ

অঘুরাপুর সেবাশ্রম—

কুষ্টিয়ার শ্রীরামপুর সাধনাশ্রমের স্বামী সেবানন্দ পুরী বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শত জন্মতিথিতে ২৪পরগণা জেলায় অঘুরাপুরে নূতন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় বালিকা বিদ্যালয়, ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ও নিকটস্থ গ্রামগুলিতে ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান করিয়া ঐ অঞ্চলে নূতন আদর্শ প্রচার করিতেছেন।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বেলিয়াঘাটা ৪২নং তালপুকুরনিবাসী স্বর্গত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি অপরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১৫ সালে সরকারী বৃত্তি লইয়া তিনি বিলাত যান ও ৪ বৎসর পরে ফিরিয়া রেলে উচ্চপদ লাভ করেন—পরে তিনি চিক মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার হন ও কিছুদিন কাঁচড়াপাড়া কারখানার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হন। তিনি জনপ্রিয়তা ও কর্ম্মনিষ্ঠার জন্য সর্ব্বজন-পরিচিত ছিলেন।

ডাক্তার গণপতি পাঁজা—

কলিকাতার ট্রপিকাল মেডিসিন স্কুলের জীবাণুবিদ্যা ও রোগনিদানের অধ্যাপক চিকিৎসা শাস্ত্রে নূতন গবেষণার

ডাঃ গণপতি পাঁজা

জন্য এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোট্‌স মেডেল' লাভ করিয়াছেন। তিনি চর্ম্মরোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ এবং কলিকাতায় একটি চর্ম্মরোগের হাসপাতাল ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন।

শিক্ষকেন্দ্র সম্মান—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবার কবিশেখর শ্রীযুত কালিদাস রায় মহাশয়কে র‍্যাট্‌ক্লুলেসন পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। কালিদাস-বাবু প্রবীণ শিক্ষক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক। এই সম্মান অতি নগণ্য হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কার্য্যে সকলে

প্রীত হইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু পণ্ডিত ও মনীষীকে এখনও সম্মানিত করেন নাই। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযুত রাজশেখর বসু, শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মত ব্যক্তিদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিলে তাঁহাদের সম্মান যত বাড়িবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব তদপেক্ষা অধিক হইবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার

বাঁকুড়ায় আদিবাসী সম্মিলন—

গত ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ থানার অন্তর্গত বুড়িডাঙ্গা গ্রামে ঐ জেলার আদিবাসী মহাসভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় অর্দ্ধেকের অধিক অধিবাসী আদিবাসী। মেদিনীপুর, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি হইতেও প্রায় ১০ হাজার আদিবাসী ঐ সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আদিবাসী জাতির রাষ্ট্রজীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও সমাজ জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির বিষয় তথায় আলোচিত হইয়াছে। স্থানীয় স্পেশাল অফিসার শ্রীসুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আদিবাসীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে কেমন করিয়া রাষ্ট্রের সাহায্যে নিজেদের উন্নতি করিতে পারা যায়। আদিবাসীরা বুঝিয়াছে, বাঙ্গালী জাতির সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টা না করিলে তাহাদের উন্নতি সম্ভব হইবে না।

পরলোকে কমলা দেবী—

ব্যারিষ্টার ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্তের সহধর্ম্মিণী কমলা দেবী গত ৬ই চৈত্র কর্কট রোগে মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে

৺কমলা দেবী

পরলোক গমন করিয়াছেন। কমলা দেবী দক্ষিণ ও উত্তর কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। গত যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের সেবায় ও দুর্ভিক্ষের সময় অন্নসত্র খুলিয়া দ্বারা বুভুক্ষুদের অন্নদানে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী যুবকদিগের অস্ত্র শিক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের আই-বি বিভাগের ডি-আই-জি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার ১১ই এপ্রিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, দক্ষিণ কলিকাতায় বাঙ্গালী যুবকগণকে বন্দুক চালনা শিক্ষা দিবার জন্য একটি রাইফেল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে অন্য সম্প্রদায়কে এ শিক্ষা দেওয়া হইত বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদের বন্দুক-চালনা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

যাদুকর পি-সি-সরকার—

গত বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ষ্টেজ ম্যাজিকের জন্য প্রসিদ্ধ ভারতীয় যাদুকর শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকারকে এবার নিউ ইয়র্ক হইতে 'ফিনিক্স মেডেল ১৯৪৮' প্রদান করা হইয়াছে।

যাদুকর পি-সি সরকার

এবার এই পৃথিবী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন হলাণ্ডের প্রসিদ্ধ যাদুকর ওকিটো সাহেব। ভারতের বেদিয়াদের ম্যাজিক বিশ্বের বিস্ময় ছিল—কিন্তু যাদুকর সরকার ষ্টেজ ম্যাজিকেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।

গঙ্গার উপর বাঁধ নির্ম্মাণ—

দেশ বিভাগের ফলে যাতায়াতে কয়েকটি অসুবিধা হওয়ায় তাহা দূর করিবার জন্য ভারত সরকার গঙ্গা নদীর উপর একটি বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত বাঁধ দ্বারা কলিকাতা ও গঙ্গার মধ্যে সর্ব্ব ঋতুতে ও সহজসরিতাবে যাতায়াতের একটি নৌ-পথ পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া উত্তর-পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যে বহু অনাবাদী জমী পড়িয়া আছে, তাহাও চাষযোগ্য হইবে। বাঁধ দ্বারা নিম্নলিখিতরূপ উপকার হইবে—(১) অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ও বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া একটি রেলপথ ও সেতু নির্ম্মাণ করা যাইবে। বাঁধ না বাঁধিয়া সেতু নির্ম্মাণ করা সম্ভব নহে (২) মৃতকল্প ভাগীরথী নদী এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলার এই নদীর হাজামজা মাথাগুলিতে জল সরবরাহ করা যাইবে ও সেচের ব্যবস্থা হইবে। সেচের প্রধান লক্ষ্য হইল এই তিনটি জেলার পতিত জমিগুলিকে চাষযোগ্য করা। ইহাতে পূর্ব্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুগণের পুনর্বসতিরও বহুলাংশে সহায়তা হইবে। (৩) কলিকাতা বন্দরের উপকারের জন্য হুগলী নদীতে জল সরবরাহের উন্নতি করা যাইবে। কলিকাতা বঙ্গোপসাগরের মুখ হইতে ১০০ মাইল দূরে বলিয়া জেটি ও মধ্যবর্ত্তী জলধারার উপরই কলিকাতা বন্দরের অস্তিত্ব নির্ভর করে। (৪) কলিকাতা ও গঙ্গার মধ্যে সমস্ত ঋতুতেই সহজসরিতাবে নৌ-চলাচল করিতে পারিবে।

বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এখন বস্তুতঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতা ও পাটনার (দিঘা) মধ্যে নিয়মিত জাহাজ চলাচল করে বটে, কিন্তু নদীবাহু নদীগুলি (ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণী) বৎসরের মধ্যে ৮ মাস শুষ্ক থাকে বলিয়া কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব পাকিস্থানের সদর দিয়া সাড়ে ৫ শত মাইল পথ ঘুরিয়া যাইতে হয়। বর্ত্তমান পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হইবে ও নদীপথে ভারী মাল অল্প ব্যয়ে প্রেরণ করা যাইবে।

বহড়া বালকাশ্রমে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব

ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

রাজস্থান রাষ্ট্রসংঘ—

গত ১৮ই এপ্রিল পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উদয়পুরে রাজস্থান রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, উদয়পুরের ৬০

বৎসর বয়স্ক মহারাণা সংঘের রাজপ্রমুখ হইয়াছেন এবং কোটা, বুন্দী ও ডুঙ্গরপুরের শাসকগণ সহরাজপ্রমুখ হইয়াছেন। এই রাষ্ট্রসংঘ আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ —৩০ হাজার বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪২ লক্ষ ও বার্ষিক আয় তিন কোটি টাকা। ১০টি দেশীয় রাজ্য এই সংঘে যোগদান করিয়াছে। গণপরিষদের সদস্য শ্রীযুত মাণিকলাল বর্ম্মা সংঘের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বরদম বিমান ঘাটিতে শ্রীযুতা সরলা আসফ আলি
কর্ত্তে—ফটো—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

স্কুল শিক্ষার উন্নতি বিধান—

পশ্চিম বাঙ্গালায় স্কুল শিক্ষার উন্নতি বিধানের উপায় স্থির করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক কমিটী গঠন করিয়াছেন—শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতি। জনাব তাসাদ্দক আলেম, ডাইস চ্যান্সেলার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ জি-চক্রবর্ত্তী, অনিলকুমার চন্দ, অপূর্ব্বকুমার চন্দ, হরিদাস গোস্বামী, কুমারী জ্যোতিপ্রভা দাসগুপ্ত, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, মেঘেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুতা সুপ্রভা রায়, ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন (শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী), নগেন্দ্রনাথ সেন (শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল) ত্রিগুণাচরণ সেন (যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল)—সদস্যগণ। শ্রীক্ষেত্র পাল দাসঘোষ—সম্পাদক।

দিল্লীতে বিজ্ঞান মন্দির—

১৯শে এপ্রিল পণ্ডিত জহরলাল নেহরু দিল্লীতে ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ইনষ্টিটিউটের সভাপতি হইলেন। নূতন মন্দিরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করার চেষ্টা হইবে।

আসাম ও বাঙ্গালা—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রায় ২ লক্ষেরও অধিক লোক আসামে গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী। আসামে প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র ষেড়শত লোক বাস করে—সুতরাং তথায় এখন বহু লোককে বাস করিতে দেওয়া যায়। আমাদের সমতল অঞ্চলের জেলাগুলিতে প্রায় ১ কোটি একর অনাবাদী জমী আছে। আসাম গভর্ণমেণ্টের কৃষি ও রাজস্ববিভাগ এই সংবাদ দিয়াছেন। কিন্তু এত পতিত ও অনাবাদী জমী সত্ত্বেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের তথায় বাসের সুযোগ দেওয়া হইতেছে না। এ সময়ে আসাম গভর্ণমেণ্ট এমন কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন, যাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের অনুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের আসামে বসবাস করা অসম্ভব হইয়াছে। আসাম গভর্ণমেণ্টের এই মনোভাবে ভারতীয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ও কংগ্রেসের প্রতীকার-ব্যবস্থা করা উচিত।

পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালাই রাষ্ট্রভাষা—

৮ই এপ্রিল ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাবে স্থির হইয়াছে—(১) পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে ইংরাজির স্থলে বাঙ্গালাই সরকারী ভাষা বলিয়া গণ্য করা উচিত ও (২) শিক্ষায়তনগুলিতে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে যথাসম্ভব বাঙ্গালা ভাষা বা অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। প্রধান মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে—বাস্তব অসুবিধাগুলি দূরীভূত হইলেই এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করা হইবে।

বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা সমস্যা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের ২২জন সদস্য গত ২২শে এপ্রিল দলপতি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট পত্র লিখিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি কংগ্রেস দলের সভায় উত্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন—"যেহেতু বর্ত্তমান মন্ত্রি-সভায় বাহিরের লোক আছেন, সেই হেতু উহা মূলতঃ কংগ্রেসভাবাপন্ন নহে এবং যেহেতু কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শ ক্ষুণ্ন হইতেছে, তাহাতে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পদপ্রার্থীদের সাফল্য বিঘ্নিত হইতেছে এবং যেহেতু উহা ব্যাপকতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সেই হেতু আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করি।" ডাক্তার রায় ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত ৫ই মে বুধবার বিকাল ৪টার সময় তাঁহার গৃহে (৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট) দলের এক সভা ডাকিয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত হইয়া উক্ত ২২জন সদস্য তাঁহাদের প্রেরিত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। উক্ত সদস্যদের নাম—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মোহিনীমোহন বর্ম্মণ, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, যোগেন সেন, বঙ্কু-বিহারী মণ্ডল, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, যজ্ঞেশ্বর রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল দে, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দু নস্কর, কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, হেমচন্দ্র নস্কর, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, বিমলকুমার ঘোষ, জে-সি-গুপ্ত, অরবিন্দ গায়েন, কুবের হালদার, শ্রীমতী বীণাদাস ভৌমিক ও ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইলে সভার কার্য্য বন্ধ হয়। পরিষদ দলের অপর ৩১জন সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন যে ২২জন সদস্যের প্রস্তাবে যে ইঙ্গিত আছে, তাহার সহিত তাঁহারা একমত নহেন। ঐ ৩১জন সদস্যের নাম—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীউদয়চাঁদ মহাতাব, শ্রীআশুতোষ মল্লিক, কমলকৃষ্ণ রায়, হেমন্তকুমার বসু, সতীশচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, চারুচন্দ্র মোহান্তি, হরেন্দ্রনাথ দলুই, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, মনোমোহন প্রামাণিক, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, আনন্দীলাল পোদ্দার, কানাইলাল দাস, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, প্রবুদ্ধলাল হিরংসিংকা, বসন্তলাল মুরারকা, নিশাপতি মাঝি, যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ত্র্যম্বকনাথ ধাল, নাগেন্দ্রেন্দু দত্ত মজুমদার, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র দাস, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র সিংহ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও সুকুমার দত্ত। এই ৩০জন ছাড়া ডাক্তার রায় একজন। সভায় তিনজন সদস্য উপস্থিত হন নাই—তন্মধ্যে শ্রীঈশ্বরদাস জালান ও শ্রীভূপতি মজুমদার—দুইজন বিবাদের সময় নিরপেক্ষ থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ডাঃ রায়কে পত্র দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য অসুস্থ বলিয়া সভায় আসিতে পারেন নাই—তিনিও ডাক্তার রায়ের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে ডাক্তার রায়ের গৃহে দলের আর একটি সভা হয়। তাহাতে ৪৬জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের উপর দলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও কর্ম্মকর্ত্তা মনোনয়নের ভার দেওয়া হইয়াছে।

বুধবার সভার পর রাত্রিকালে ডাক্তার রায় প্রদেশ পাল শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদত্যাগ করেন। পরদিন আবার তাঁহাকেই নূতন মন্ত্রী-সভা গঠন করিতে আহ্বান করা হইলে তিনি নিম্নলিখিত ১০জনকে লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন—(১) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (২) শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার (৩) শ্রীকিরণশঙ্কর রায় (৪) রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (৫) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (৬) শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (৭) শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ (৮) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি (৯) শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও (১০) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়। পূর্ব্ব মন্ত্রিসভার সদস্য শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ও শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মণ ডাক্তার রায়ের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করায় ও শ্রীভূপতি মজুমদার মন্ত্রী হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাঁহাদের নূতন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয় নাই।

আন্তঃ ডোমিনিয়ান চুক্তি—

ওরা যে ভারত সরকার ও পাকিস্থান সরকার এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়া বলিয়াছেন—১৯শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় যে আন্তঃ-ডোমিনিয়ান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিবার পর

ভারত সরকার ও পাকিস্থান সরকার এই কথা ঘোষণা করিতে চাহেন যে, তাঁহারা ঐ চুক্তি অনুমোদন করিয়াছেন এবং উভয় ডোমিনিয়নে ঐ চুক্তি কথায় ও কাজে তাঁহারা পালন করিবেন।

স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

৩২ বৎসর পূর্ব্বে ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের কার্য্যারম্ভ করিয়া স্বর্গত সুধী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার দান চিরদিন বঙ্গভাষাভাষীদিগকে আনন্দ দান করিবে। সঙ্গীতজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলাল, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল, সর্ব্বোপরি কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথা বাঙ্গালী কোন দিন বিস্মৃত হইবে না। আজ দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর তাঁহাকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করার সময় আসিয়াছে—কারণ জাতীয়তা প্রচারক দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীন জাতির জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা এই সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর পরে তাঁহার অমর দানের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি ও তাঁহার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা প্রণাম জ্ঞাপন করি।

ভারত-পাকিস্থান চুক্তিনামা—

৫ দিন ধরিয়া কলিকাতায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক বসিয়াছিল এবং তাহা গত ১৯শে এপ্রিল শেষ হইয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠগণের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন সম্বন্ধে রচিত এক চুক্তিনামায় ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র নিয়োগী ও পাকিস্থান প্রতিনিধিবর্গের নেতা মিঃ গোলাম মহম্মদ স্বাক্ষর করেন। উভয় পক্ষই এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের ব্যাপক বাস্তু ত্যাগ কোন রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল নহে। উভয় রাষ্ট্রই সংখ্যালঘিষ্ঠদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের বাস্তু ত্যাগ প্রশমিত ও বাস্তুত্যাগীদের প্রত্যাবর্ত্তনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য সত্বর সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আরও ঠিক হইয়াছে সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষ হইতে যে ক্ষেত্রে এরূপ অভিযোগ করা হইবে যে, অনাচার ও অন্যায় আচরণ সম্পর্কে তাঁহাদের আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করা হয় নাই, সে ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হইবে এবং সে বিষয়ে সত্বর প্রতীকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রে কোন সরকারী কর্ম্মচারী সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, তাহা হইলে দৃষ্টান্তস্থানীয় কঠোর শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে। উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের ও বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বোর্ড গঠনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থিতাবস্থা চুক্তির বিষয়ের পরের অবস্থায় যাত্রী ও দ্রব্যাদির চলাচল সম্পর্কে অর্থনীতিক কারণে আরোপিত বাধা নিষেধের ফলে জনসাধারণকে যে সকল দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বন্ধ করার জন্য উভয় রাষ্ট্রই কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে অপর রাষ্ট্রকে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহের উদ্দেশে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত করিতে হইবে। এই সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, আটা ফল, সবজী, দুধ, দুগ্ধজাতদ্রব্য, হাঁস মুরগী, ডিম, স্থানীয় থালিপাত্র, বাঁশ, আলানী কাঠ প্রভৃতি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে চলাচল সম্বন্ধে যে বাধা নিষেধ ও শুল্ক বসান হইয়াছে, তাহা দূর করা হইবে। ভারত সরকার পূর্ব্ববঙ্গে সরিষার তৈল সরবরাহের ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন। যতদিন এ সকল বিষয়ে আলোচনা শেষ না হয়, ততদিন পাকিস্থান রাষ্ট্র বিনাশুল্কে পশ্চিম বাঙ্গলায় টাটকা ও শুষ্ক মৎস্য আমদানী চালান করিতে দিবেন। ডাক, তার, টেলিফোন প্রভৃতির হার, যাত্রী ও তাহাদের মালপত্র অনুসন্ধান প্রভৃতি সম্পর্কেও আবশ্যক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চুক্তিনামায় যে সকল সর্ত্ত স্থির হইয়াছে সে গুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সে জন্য পূর্ব্ব বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ও পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উভয়েই আবশ্যক ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভারতবর্ষে পাকিস্থানী হাই কমিশনার খাজা সাহাবুদ্দীন ও পাকিস্থানে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ উভয়েই ঐ চুক্তি সম্পর্কে পূর্ণ সহযোগিতা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন। এইভাবে যে আপোষ হইল, ইহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণ উপকৃত হইলে দেশের উন্নতিবিধান সম্ভব হইবে।

পশ্চিম বাঙ্গালায় খাদ্যাভাব—

পশ্চিম বাঙ্গালায় সম্প্রতি দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। চাউল ছাড়া তরিতরকারী, দুধ, মাছ, ফলমূল প্রভৃতি বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। তাহার কোনটিই এখন এদেশে পাওয়া যায় না। গত যুদ্ধের পর হইতে কৃষির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। তরিতরকারী এদেশে অপ্রচুর—কারণ চাষের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে ও খাইবার লোক বাড়িয়াছে। দুধ এক টাকা সের—মাছের সের সাড়ে তিন টাকা। ফলের বাগান আর কেহ করে না—কাজেই গ্রীষ্মকালে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল প্রভৃতি ফল আর পাওয়া যায় না। সরিষার তেল দুই টাকা সের—ডাল এদেশে কম হয় বলিয়া প্রায় সকল ডাল এক টাকা সের। এ অবস্থায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলে পশ্চিম বাঙ্গালায় লোক বাঁচিবে না। পূর্ব্ব-বাঙ্গলা হইতে হয় ত ৫০ লক্ষ লোক পশ্চিম বাঙ্গালায় আসিয়াছে—অধিকাংশ লোক নানা কারণে সহর ও সহরতলীতে বাস করিতেছে—কেহ গ্রামে যাইতে চাহে না। সরকারী ব্যবস্থাও এদিকে অপ্রচুর। লোককে জোর করিয়া সহর বা সহরতলী হইতে গ্রামে ফিরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এইভাবে চলিলে নানা ব্যাধিতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইবে।

ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট—

বিলাতের বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ১৯৪৮ সালের ২১শে জুন ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্ম্ম ত্যাগ করিলে সেই পদে পশ্চিম-বঙ্গের গবর্ণর শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ—

গত ২৪শে এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত জগজীবন রাম ইন্দোরে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় বলিয়াছেন—"আমরা পুঁজিপতিদের শত্রু নহি, তবে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেশ হইতে ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" শ্রীযুত জগজীবন রাম তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিতে কতটা সফল হইবেন জানি না—তবে আজিকার দিনে ধনিক-শ্রমিক বিরোধ যখন চরম অবস্থায় উপনীত—তখন একথা সর্ব্বদা ঘোষণা করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

শিক্ষার মাধ্যম স্থির—

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য ভারতের ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারগণ এবং ডক্টর এস-এস-ভাটনগর ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া ভারতসরকার যে কমিটী গঠন করিয়াছিলেন গত ১লা ও ২রা মে দিল্লীতে তাহার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতসরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ডক্টর তারাচাঁদ কমিটীর সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্থির হইয়াছে যে আরও ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজি ভাষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হইবে। ইতিমধ্যে আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রভাষার উন্নতি বিধানের ও ব্যবস্থা চলিবে।

আগামী আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ

গত পঞ্চত্রিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' কি ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদের সহিত পূর্ব্বের মতই সহযোগিতা করিয়া আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৩৷০, ভি:-পিতে ৩৷৶০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০, ভি: পিতে ১৷৶০। ভি:-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক। ভি: পিতে টাকা অনেক সময় বিলম্বে পাওয়া যায়, ফলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা বৈশাখের মধ্যে না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি:-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকই দয়া করিয়া মণিঅর্ডার কূপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কূপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন।

মণিঅর্ডার পাঠাইবার ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

হুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অলিম্পিক ভারতীয় ফুটবল দল ঃ

লণ্ডনে বিশ্ব-অলিম্পিক গেমসের ফুটবল খেলায় ভারতীয় ফুটবল দল যে যোগদান করবে তা একরূপ ঠিক হয়ে গেছে। সম্প্রতি দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন কাজও শেষ হয়েছে। ক'লকাতায় মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল সম্মিলিত দলের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ফুটবল খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত অলিম্পিক দলের একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলা হয়ে গেল। অলিম্পিকগামী ভারতীয় ফুটবল দলকে আর্থিক সাহায্যদানের জন্যই এই খেলাটি চ্যারিটি করা হয়। খেলায় আশাতীত দর্শক সমাগম হয়েছিল কিন্তু খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের দিক থেকে সকলকে হতাশ হ'তে হয়েছে। খেলায় মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল সম্মিলিত দল ২-১ গোলে অলিম্পিক দলকে পরাজিত করে। অলিম্পিক দলের গুরুত্ব এই কারণে বেশী ছিল যে, সেদিনের খেলায় অলিম্পিক নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে এগারজন খেলোয়াড়ই অলিম্পিক দলে যোগদান করেছিল; অন্যদিকে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল দলে মাত্র একজন অলিম্পিক খেলোয়াড় খেলেছিল। খেলায় ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছে বলেই আমরা অলিম্পিক দলের খেলায় হতাশা জ্ঞাপন করছি না। দলগত এবং ব্যক্তিগত খেলার বিচার করার পর অলিম্পিক খেলায় ভারতীয় দলের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করে, এতগুলি কথা লিখতে বসেছি। সত্য বলতে কি, আমাদের দেশের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অলিম্পিক ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সমান নয়, কি খেলোয়াড়দের মৈহিক শক্তি ও গঠন সৌষ্ঠবে কি খেলার দক্ষতার দিক থেকে। প্রদর্শনী খেলায় এই দুইদিক থেকেই আমরা যায়ঘায় সে অভাব অনুভব করেছি। বলতে কি ফুটবল খেলা বাংলা দেশে জাতীয় খেলায় পরিণত হয়েছে এবং একথা বললে পক্ষপাতিত্ব হবে না যে, বাংলা দেশের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ কেন সম্মিলিত প্রদেশগুলির ফুটবল খেলার থেকে উন্নত। বাংলা প্রদেশ ভারতীয় ফুটবল খেলায় অধিকবারই নিজ প্রদেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এর অন্যতম কারণ বাংলা দেশে ফুটবল খেলার প্রচলন বেশী, জনপ্রিয়তাও বেশী। আজ মানুষের জীবনের সর্ব্ববিষয়ের মান নিম্নগামী হয়েছে। বাংলার ফুটবল খেলায় এর ব্যতিক্রমও হয়নি; তবু বাংলার ফুটবল শক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্মিলিত প্রদেশগুলির পরীক্ষা করে দেখলে বাংলা খুব বেশী লোক হারাবে না বলেই আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস। একথা আমরা ঐ দিনের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী খেলার ফলাফল এবং খেলার সর্ব্বাঙ্গিক বিচার করেই বলতে পারি। দর্শকেরাও সে কথাই বলছিলেন, পূর্ব্বের তুলনায় ভারতীয় ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্নগামী, তার উপর খেলোয়াড় নির্ব্বাচনে নিরপেক্ষতা অবলম্বন না করার অলিম্পিক দলে অনেক অযোগ্য খেলোয়াড়ের স্থানলাভ হয়েছে। ইহা দর্শকদের অনুমান মাত্র নয়—পরীক্ষা ক্ষেত্রেই তা প্রমাণিত হয়েছে। অলিম্পিক খেলায় ভারতীয় ফুটবল দলের জন্য সুদূর পরাহত, ইহাই কি নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ব্যাপারে ঔদাসীন্য এবং পক্ষপাতিত্ব অবলম্বনে উৎসাহিত করেছে? দু'একটি লোভনীয় পদের নির্ব্বাচন নির্ভর করেছিল বিভিন্ন প্রদেশের ফুটবল এসোসিয়েশনের ভোটের উপর। যাতে

বহু দর্শকের মুখে একথা শুনা যাচ্ছিল সাধারণের অর্থে এই সুযোগে সুখকর বিদেশ ভ্রমণ হয়ে যাবে এবং তার জন্য ভোট সংগ্রহ করতে গিয়ে এ কেলেঙ্কারী হয়েছে। বহু অযোগ্য খেলোয়াড়কে দলে নির্ব্বাচন করা হয়েছে চক্ষু-লজ্জায় খাতিরে এবং দেশ ও দলের কাছে অনেকখানি সর্ব্ব-ভারতীয় দল হিসাবে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে তা না হলে প্রাদেশিকতার কথা উঠবে, সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। ইহা নিন্দুকের কথা নয়—জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য প্রকৃত দেশাত্মবোধের কথা।

দৈনিক সংবাদ পত্রিকাগুলিতে এই খেলোয়াড় নির্ব্বাচন এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে যে সমালোচনা বের হয়েছে তা খুবই সময়োচিত হয়েছে এবং জাতীয় সম্মানের দিক থেকে জনমত প্রকাশই হয়েছে। কোন কোন কাগজ এরূপ প্রস্তাব করেছে, বর্ত্তমান বৎসরে অলিম্পিক টীম পাঠিয়ে অর্থব্যয় না করে সেই অর্থে ভাল 'কোচ' এনে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। এ প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন।

খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক ক্রীড়ামোদী এরূপ সংবাদ পরিবেশন করেন যে, তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষ মহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট সভ্যের আলোচনা হয়েছিল। সভ্যের যুক্তি নাকি এরূপ, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও অলিম্পিক গেমে ভারতীয় দলের যোগদান করা উচিত যেমন অন্য দেশ হকি খেলায় ভারতীয় হকি দলের সঙ্গে পোচনায় পরাজয় স্বীকার করেও প্রতিবারের অলিম্পিকে যোগদান করে। একথা সত্য, ভারতীয় হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কাছে অন্য দেশ এ পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তবে ভারতবর্ষের হকি খেলা বাদ দিয়ে অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে খেলার একটা অলিম্পিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড আছে এবং উচ্চাঙ্গ ক্রীড়ানৈপুণ্য অর্জ্জনের জন্য অন্য দেশের অনুশীলন এবং গবেষণার শেষ নেই। আমাদের ফুটবল খেলায় তার কোন বালাই নেই। খেলার জয়—পরাজয়ের উপর দলের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। সুতরাং এক পক্ষের হার স্বীকার না হলে অপর দলের বিজয় গৌরব লাভ আর হয় না। পরাজয়ের কালিমা নিতে হবে একথা ভাবলে খেলায় যোগদান চলে না। পরাজয়ের মধ্যেও আত্মপ্রসাদ আছে বৈকি! তা না হলে 'গৌরবজনক পরাজয়' আখ্যা পেত না। খেলার উদ্দেশ্য হল শরীর ও মন সুস্থ রাখা এবং দর্শকদের আনন্দ দিয়ে তাদের খেলায় অনুরাগী করা।

ভারতীয় ফুটবল দল আগামী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় গিয়ে শোচনীয় ব্যর্থতায় নিজেরা আনন্দ না পেয়ে নিজেদের বহুবিধ অভাব ও দুর্ব্বলতায় খেলার মাঠে সংযের নাচ নাচবে এবং এ নৃত্য দর্শকদের কাছে আনন্দের চেয়ে পীড়াদায়ক হবে। ইংলণ্ডের রেড ক্রশ সোসাইটির সুনাম পৃথিবী জুড়ে; তাদের কর্ম্মদক্ষতা এবং সেবা-আতিথ্য কার্য্য সুবিদিত; মাঠে উপস্থিত থাকার জন্য দলের সঙ্গে ভারতীয় রেড ক্রশ বাহিনী বহন করার অর্থব্যয় থেকে ভারতবর্ষ রক্ষা পাবে এই যা আমাদের সান্ত্বনা।

সন্তরণে পৃথিবীর রেকর্ডভঙ্গ ঃ

২০০ মিটার ব্রেষ্ট্রোকে ফিলাডেলফিয়ার লা সেলী কলেজের ছাত্র J Verdena দু'বার তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। ১৯৪৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি উক্ত দূরত্ব ২ মিঃ ৩২ সেকেণ্ড সময়ে অতিক্রম করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। গত এপ্রিল মাসে ন্যাশনাল এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন ২ মিঃ ০০৩ সেকেণ্ডে। বিটে তাঁর সময় ছিল ২ মিঃ ৩১·৩ সেকেণ্ড;

লণ্ডনের এফ এ কাপ ফাইনাল ঃ

ইংলণ্ডের এফ এ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় আকর্ষণ সারা পৃথিবীর ফুটবল খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদী জুড়ে। এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় যে দর্শক সমাগম হয়.তার সংখ্যা আমাদের দেশে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এ বছর এফ এ কাপ ফাইনালে ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড ৪-২ গোলে ব্লাকপুলকে পরাজিত ক'রে ১৯০৯ সাল থেকে খেলে এই প্রথম এফ এ কাপ বিজয়ী হয়েছে। উইম্বলি ষ্টেডিয়ামে ৯৯,০০০ হাজার দর্শক ফাইনাল খেলা দেখবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। রাজা ও রাণী, রাজকুমারী এবং বৃটিশ মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ ঃ

আমেরিকার দু'জন নিগ্রো এ্যাথলেট Mr. Charles Founvill ও Mr. Harrison Dillard দু'টি বিষয়ে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

১৯৩৪ সালে নরওয়েতে সট পুটে আমেরিকান এ্যাথলেট Jack Torrance ৪৭ ফিট ½ ইঞ্চি রেকর্ড করেন। Mr. Fonville ১৬ পাউণ্ড ওজনের বল ৪৮ ফিট ½ ইঞ্চি দূরত্বে ছুড়ে উক্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। ১১০ গজ হার্ডল রেসে Mr. Forrest ও Mr. Fred Wolcott পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। Mr. Dillard উক্ত দূরত্ব ১৩·৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

অমরনাথের উক্তি ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট খেলার দলাদলি বেশ মাথা তুলে উঠেছে। দলাদলি সব দেশেই আছে। এই দলাদলি থেকে দূরে থাকা অনেক সময় সম্ভবও হয় না কিন্তু যেখানে জাতীয় সম্মান রক্ষার আহ্বান আসে সেখানে দলাদলি এবং স্বার্থ চিন্তা ভুলে জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য এগিয়ে যাওয়াই প্রকৃত খেলোয়াড়চিত চরিত্র এবং মহত্বত্বের পরিচয়। প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেট খেলার দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচন এবং খেলোয়াড় মনোনয়ন ব্যাপারে আমাদের দেশে একাধিকবার ক্রিকেট মহলে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। এসব ব্যাপারে খেলোয়াড়রা প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা না ক'রে নানা অজুহাতে খেলায় যোগদান করে না, আবার খেলায় যোগদান করেও স্বাভাবিক ক্রীড়া প্রদর্শন থেকে বিরত থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া দেশ থেকে ভারতীয় ক্রিকেটদল ক্রিকেট খেলে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে। উক্ত দলের অধিনায়ক লালা অমরনাথ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয় ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে খেলতে এলে তিনি যদি ভারতীয় দলে স্থান পান তাহলে যে কোন খেলোয়াড়ের অধিনায়কত্বে খেলতে প্রস্তুত আছেন। তিনি অপর খেলোয়াড়দের নিকট থেকেও অনুরূপ আচরণ পাবার জন্য আশা পোষণ করেন। তিনি আরও বলেন, যদি দলের অধিনায়ক পদ না পাওয়ার জন্য আমরা নিজ দলের বাইরে চলে যাই তাহলে আর ক্রিকেট খেলা হয় না। আমরা সকলকেই তাঁর উক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করতে অনুরোধ করছি।

আগা খাঁ হকি ঃ

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত আগা খাঁ হকি খেলার ফাইনালে কিয়কি ইউনাইটেডদল ৩-০ গোলে বি বি এণ্ড সি আই রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে উক্ত কাপবিজয়ী হয়েছে। বি বি এণ্ড সি আই রেলদল প্রতিযোগিতায় সেমি ফাইনালে কলিকাতার পোর্ট কমিশনার দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

হকি ঃ প্রথম বিভাগ লীগ চ্যাম্পিয়ান—পোর্ট-কমিশনার। বাইটন কাপ ফাইনাল বিজয়ী—পোর্ট-কমিশনার ও ইউ পি।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীহরিসাধন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "আমাই বিয়ে—১৯৩৮"—২৲

ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ইণ্ডিগেসন হিন্দু ?"—৸৹

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "খেলোয়াড়"—১৷৹

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ প্রণীত "সুগম হিন্দী শিক্ষা"—১৷৹

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু প্রণীত "হিন্দী স্বয়ং-শিক্ষা" (১ম ভাগ)—৷৵৹

প্রভাতকুমার গোস্বামী প্রণীত "বিজ্ঞানের যুগান্তর"—৸৹

রাজি মহারাজ প্রণীত "One Truth One People"—৹৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত